বঙ্গদর্শন

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রবর্ত্তিত
বঙ্গদর্শন
THE NATIONAL LITERATURE CO.
CALCUTTA

ষষ্ঠ খণ্ড

বিষয়		পৃষ্ঠা

মাসিকপত্র ও সমালোচন

৬ষ্ঠ খণ্ড বৈশাখ ১২৮৫ ১ম সংখ্যা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অনন্ত মিশ্র, চঞ্চলকুমারীর পিতৃকুল-পুরোহিত। কন্যানির্ব্বিশেষে, চঞ্চলকুমারীকে ভালবাসিতেন। তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। সকলে তাঁহাকে ভক্তি করিত। চঞ্চলের নাম করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইবামাত্র তিনি অন্তঃপুরে আসিলেন—কুলপুরোহিতের অবারিত দ্বার। পথিমধ্যে নির্ম্মল তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল।—এবং সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিল।

বিভূতিচন্দনবিভূষিত, প্রশস্তললাট, দীর্ঘকায়, রুদ্রাক্ষশোভিত, হাস্যবদন সেই ব্রাহ্মণ চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নির্ম্মল দেখিয়াছিল যে, চঞ্চল কাঁদিতেছে কিন্তু আর কাহারও কাছে চঞ্চল কাঁদিবার মেয়ে নহে। গুরুদেব দেখিলেন, চঞ্চল স্থিরমূর্ত্তি। বলিলেন, "মা লক্ষ্মী,—আমাকে স্মরণ করিয়াছ কেন?"

চ। আমাকে বাঁচাইবার জন্য। আর কেহ নাই যে আমায় বাঁচায়।

অনন্ত মিশ্র হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছি রুক্মিণীর বিয়ে, সেই পুরোহিত বুড়াকেই দ্বারকায় যেতে হবে। তা দেখ দেখি মা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে কিছু আছে কিনা—পথ খরচটা জুটিলেই আমি উদয়পুরে যাত্রা করিব।"

চঞ্চল, একটী জরির থলি বাহির করিয়া দিল। তাহাতে আশরফি ভরা। পুরোহিত দুইটা আশরফি লইয়া অবশিষ্ট ফিরাইয়া দিলেন—বলিলেন, "পথে অন্নই খাইতে হইবে—আশরফি খাইতে পারিব না। একটি কথা বলি, পারিবে কি?"

চঞ্চল বলিলেন, "আমাকে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলিলেও, আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য তাও পারি। কি আজ্ঞা করুন।"

মিশ্র। রাণা রাজসিংহকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতে পারিবে?

চঞ্চল ভাবিল। বলিল, "আমি বালিকা—পুরস্ত্রী; তাঁহার কাছে অপরিচিতা—কি প্রকারে পত্র লিখি? কিন্তু আমি তাঁহার কাছে যে ভিক্ষা চাহিতেছি, তাহাতে লজ্জারই বা স্থান কই? লিখিব।"

মিশ্র। আমি লিখাইয়া দিব, না আপনি লিখিবে?

চ। আপনি বলিয়া দিন।

নির্ম্মল সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "তা হইবে না। এ বামুনে-বুদ্ধির কাজ নয়—এ মেয়েলী বুদ্ধির কাজ। আমরা পত্র লিখিব। আপনি প্রস্তুত হইয়া আসুন।"

মিশ্রঠাকুর চলিয়া গেলেন, কিন্তু গৃহে গেলেন না। রাজা বিক্রমসিংহের নিকট দর্শন দিলেন। বলিলেন, "আমি দেশ পর্য্যটনে গমন করিব, মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছি।" কি জন্য কোথায় যাইবেন, রাজা তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহা কিছুই প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। তথাপি তিনি যে উদয়পুর পর্য্যন্ত যাইবেন তাহা স্বীকার করিলেন, এবং রাণার নিকট পরিচিত হইবার জন্য একখানি লিপির জন্য প্রার্থিত হইলেন। রাজাও পত্র দিলেন।

অনন্ত মিশ্র রাজার নিকট হইতে পত্র সংগ্রহ করিয়া চঞ্চলকুমারীর নিকট পুনরাগমন করিলেন। ততক্ষণ চঞ্চল ও নির্ম্মল দুইজনে দুই বুদ্ধি একত্র করিয়া একখানি পত্র সমাপন করিয়াছিল। পত্র শেষ করিয়া রাজনন্দিনী, একটী কৌটা হইতে অপূর্ব্ব শোভাবিশিষ্ট মুক্তাবলয় বাহির করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া বলিলেন, "রাণা পত্র পড়িলে, আমার প্রতিনিধি স্বরূপ এই রাখি বাঁধিয়া দিবেন। রাজপুত-কুলের যিনি চূড়া তিনি কখন রাজপুতকন্যার প্রেরিত রাখি অগ্রাহ্য করিবেন না।"

মিশ্রঠাকুর স্বীকৃত হইলেন। রাজকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরিধেয় বস্ত্র, ছত্র, যষ্টি, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সঙ্গে লইয়া অনন্ত মিশ্র গৃহিণীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া উদয়পুর যাত্রা করিলেন। গৃহিণী বড় পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল, "কেন যাইবে?" মিশ্রঠাকুর বলিলেন, "রাণার কাছে কিছু বৃত্তি পাইব।" গৃহিণী তৎক্ষণাৎ শান্ত হইলেন; বিরহ যন্ত্রণা আর তাঁহাকে দাহ কবিতে পারিল না, অর্থলাভের আশা স্বরূপ শীতলবারিপ্রবাহে সে প্রচণ্ড বিচ্ছেদবহ্নি বাব কত ফোঁস ফোঁস করিযা নিবিয়া গেল। মিশ্রঠাকুর একাকী যাত্রা করিলেন।

পথ অতি দুর্গম—বিশেষ পার্ব্বত্য পথ বন্ধুর, এবং অনেক স্থানে আশ্রয়-শূন্য। একাহাবী ব্রাহ্মণ যেদিন যেখানে আশ্রয় পাইতেন, সেদিন সেখানে আতিথ্য স্বীকার কবিতেন; দিনমানে পথ অতিবাহন কবিতেন। পথে কিছু দস্যুভয় ছিল—ব্রাহ্মণেব নিকট বহুবলয আছে বলিয়া ব্রাহ্মণ কদাপি একাকী পথ চলিতেন না। সঙ্গী জুটিলে চলিতেন। সঙ্গী ছাড়া হইলেই আশ্রয় খুঁজিতেন। একদিন রাত্রে এক দেবালয়ে আতিথ্য স্বীকার করিয়া, পরদিন প্রভাতে গমনকালে তাঁহাকে সঙ্গী খুঁজিতে হইল না। চারিজন বণিক্ ঐ দেবালয়ের অতিথিশালায় শয়ন কবিয়াছিল, প্রভাতে উঠিয়া তাহারাও পার্ব্বত্য পথে আরোহণ কবিল। ব্রাহ্মণ দেখিয়া উহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা যাইবে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন "আমি উদয়পুর যাইব।" বণিকেরা বলিল, "আমরাও উদয়পুব যাইব। ভাল হইয়াছে, একত্রে যাই চলুন।" ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া তাহাদিগের সঙ্গী হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "উদয়পুর আর কত দূর?" বণিকেরা বলিল, "নিকট। আজি সন্ধ্যার মধ্যে উদয়পুর পৌছিতে পারিব। এ সকল স্থান বাণাব রাজ্য।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে কবিতে তাহারা চলিতেছিল। পার্ব্বত্য পথ অতিশয় দুরাবোহণীয়, এবং দুরবরোহণীয় এবং সচরাচর বসতিশূন্য। কিন্তু এই দুর্গম পথ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল—এখন সমতল ভূমিতে অবরোহণ করিতে হইবে। পথিকেরা এক অনির্ব্বচনীয় শোভাময় অধিত্যকায় প্রবেশ করিল। দুইপার্শ্বে অনতিউচ্চ পর্ব্বতদ্বয়, হরিৎ বৃক্ষাদি শোভিত হইয়া আকাশে মাথা তুলিয়াছে; উভয়ের মধ্যে কলনাদিনী ক্ষুদ্রা প্রবাহিণী নীলকাচপ্রতিম সফেণ জলপ্রবাহে উপলদল ধৌত করিয়া বনাসের অভিমুখে চলিতেছে। তটিনীর ধার দিয়া মনুষ্যগম্য পথের রেখা পড়িয়াছে। সেখানে নামিলে, আর কোন দিক্ হইতে কেহ পথিককে দেখিতে পায় না; কেবল পর্ব্বতদ্বয়ের উপর হইতে দেখা যায়।

সেই নিভৃত স্থানে অবরোহণ করিয়া, একজন বণিক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ঠাঁই টাকাকড়ি কি আছে ?"

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন শুনিয়া চমকিত ও ভীত হইলেন। ভাবিলেন বুঝি এখানে দস্যুর বিশেষ ভয়, তাই সতর্ক করিবার জন্য বণিকেরা জিজ্ঞাসা করিতেছে। দুর্ব্বলের অবলম্বন মিথ্যা কথা। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আমার কাছে কি থাকিবে ?"

বণিক্ বলিল, "যাহা কিছু থাকে আমাদের নিকট দাও। নহিলে এখানে রাখিতে পারিবে না।"

ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন "রত্নবলয় রক্ষার্থ বণিক্দিগকে দিই ;" আবার ভাবিলেন, "ইহারা অপরিচিত, ইহাদিগকেই বা বিশ্বাস কি ?" এই ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিয়া ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ বলিলেন, "আমি ভিক্ষুক আমার কাছে কি থাকিবে ?"

বিপদকালে যে ইতস্ততঃ করে সেই মারা যায়। ব্রাহ্মণকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া ছদ্মবেশী বণিকেরা বুঝিল যে অবশ্য ব্রাহ্মণের কাছে বিশেষ কিছু আছে। একজন তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের ঘাড় ধরিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার বুকে হাঁটু দিয়া বসিল—এবং তাহার মুখে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল। ব্রাহ্মণ বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে না পারিয়া নারায়ণ স্মরণ করিতে লাগিলেন। আর একজন, তাহার গাঁটরি কাড়িয়া লইয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার ভিতর হইতে চঞ্চলকুমারী প্রেরিত বলয়, দুইখানি পত্র, এবং দুই আশরফি পাওয়া গেল। দস্যু তাহা হস্তগত করিয়া সঙ্গীকে বলিল, "আর ব্রহ্মহত্যা করিয়া কাজ নাই। উহার যাহা ছিল তাহা পাইয়াছি। এখন উহাকে ছাড়িয়া দে।"

আর একজন দস্যু বলিল, "ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। ব্রাহ্মণ তাহা হইলে এখনই একটা গোলযোগ করিবে। আজকাল রাণা রাজসিংহের বড় দৌরাত্ম্য—বীর পুরুষে তাহার শাসন আর বাহুবলে অন্ন করিয়া খাইতে পারে না। উহাকে এই গাছে বাঁধিয়া রাখিয়া যাই।"

এই বলিয়া দস্যুগণ মিশ্রঠাকুরের হস্ত পদ এবং মুখ তাহার পরিধেয় বস্ত্রে দৃঢ়তর বাঁধিয়া পর্ব্বতের সানুদেশস্থিত একটী ক্ষুদ্রবৃক্ষের কাণ্ডের সহিত বাঁধিল। পরে চঞ্চলকুমারীদত্ত রত্নবলয় ও পত্র প্রভৃতি লইয়া ক্ষুদ্রনদীর তীরবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিয়া পর্ব্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল। সেই সময়ে পর্ব্বতের উপরে দাঁড়াইয়া একজন অশ্বারোহী তাহাদিগকে দেখিল। তাহারা অশ্বারোহীকে দেখিতে পাইল না ; পলায়নে ব্যস্ত।

দস্যুগণ পার্ব্বতীয়া প্রবাহিণীর তটবর্ত্তী বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি দুর্গম ও মনুষ্যসমাগমশূন্য পথে চলিল। এইরূপ কিছুদূর গিয়া এক নিভৃত গুহামধ্যে প্রবেশ করিল।

গুহার ভিতর খাদ্যদ্রব্য, শয্যা, পাকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল প্রস্তুত ছিল। দেখিয়া বোধ হয়, দস্যুগণ কখন কখন এই গুহা মধ্যে লুকাইয়া বাস করে। এমন কি কলসীপূর্ণ জল পর্য্যন্ত ছিল। দস্যুগণ সেইখানে উপস্থিত হইয়া তামাকু সাজিয়া খাইতে লাগিল। এবং একজন পাকের উদ্যোগ করিতে লাগিল। একজন বলিল, "মাণিকলাল, রসুই পরে হইবে। প্রথমে মালের কি ব্যবস্থা হইবে, তাহার মীমাংসা করা যাউক।"

মাণিকলাল বলিল, "মালের কথাই আগে হউক।"

তখন আশরফি দুইটি কাটিয়া চারিখণ্ড হইল। এক এক জন এক এক খণ্ড লইল। রত্নবলয় বিক্রয় না হইলে ভাগ হইতে পারে না—তাহা সম্প্রতি অবিভক্ত রহিল। পত্র দুইখানি কি করা যাইবে, তাহার মীমাংসা হইতে লাগিল। দলপতি বলিলেন, কাগজে আর কি হইবে—উহা পোড়াইয়া ফেল। এই বলিয়া পত্র দুইখানি সে মাণিকলালকে অগ্নিদেবকে সমর্পণ করিবার জন্য দিল।

মাণিকলাল কিছু কিছু লিখিতে পড়িতে জানিত। সে পত্রদুইখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া আনন্দিত হইল। বলিল, "এ পত্র নষ্ট করা হইবে না। ইহাতে রোজগার হইতে পারে।"

"কি ? কি ?" বলিয়া আর তিনজন গোলযোগ করিয়া উঠিল। মাণিকলাল তখন চঞ্চলকুমারীর পত্রের বৃত্তান্ত তাহাদিগকে সবিস্তারে বুঝাইয়া দিল। শুনিয়া চোরেরা বড় আনন্দিত হইল।

মাণিকলাল বলিল, "দেখ এই পত্র রাণাকে দিলে কিছু পুরস্কার পাইব।"

দলপতি বলিল, "নির্ব্বোধ! রাণা যখন জিজ্ঞাসা করিবে তোমরা এ পত্র কোথা পাইলে তখন কি উত্তর দিবে? তখন কি বলিবে যে আমরা রাহাজানি করিয়া পাইয়াছি? রাণার কাছে পুরস্কারের মধ্যে প্রাণদণ্ড হইবে। তাহা নহে। এ পত্র লইয়া গিয়া বাদশাহাকে দিব—বাদশাহের কাছে এরূপ সন্ধান দিতে পারিলে অনেক পুরস্কার পাওয়া যায় আমি জানি। আর ইহাতে—"

দলপতি কথা সমাপ্ত করিতে অবকাশ পাইল না। কথা মুখে থাকিতে থাকিতে তাহার মস্তক স্কন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অশ্বারোহী পর্ব্বতের উপর হইতে দেখিল; চারিজনে একজনকে বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। আগে কি হইয়াছে, তাহা সে দেখে নাই, তখন সে পৌঁছে নাই। অশ্বারোহী নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতে লাগিল উহারা কোন্ পথে যায়। তাহারা যখন নদীর বাঁক ফিরিয়া পর্ব্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল, তখন অশ্বারোহী অশ্ব হইতে নামিল। পরে অশ্বের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, "বিজয়! এখানে থাকিও—আমি আসিতেছি—কোন শব্দ করিও না।" অশ্ব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার আরোহী পাদচারে অতি দ্রুতবেগে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন। পর্ব্বত যে বড় উচ্চ নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

অশ্বারোহী পদব্রজে মিশ্রঠাকুরের কাছে আসিয়া তাঁহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, অল্প কথায় বলুন।"

মিশ্র বলিলেন, "চারিজনের সঙ্গে আমি একত্রে আসিতেছিলাম। তাহাদের চিনি না—পথের আলাপ; তাহারা বলে আমরা বণিক্। এইখানে আসিয়া তাহারা মারিয়া ধরিয়া আমার যাহা কিছু ছিল কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।"

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কি লইয়া গিয়াছে?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, একগাছি মুক্তার বালা, দুইটি আশরফি, দুই খানি পত্র।"

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন, "আপনি এইখানে থাকুন। উহারা কোন্‌দিকে গেল, আমি দেখিয়া আসি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আপনি যাইবেন কি প্রকারে? তাহারা চারিজন, আপনি একা।"

আগন্তুক বলিলেন "দেখিতেছেন না, আমি রাজপুত সৈনিক!"

অনন্ত মিশ্র দেখিলেন, এই ব্যক্তি যুদ্ধ ব্যবসায়ী বটে। তাহার কোমরে তরবারি এবং পিস্তল, এবং হস্তে বর্শা। তিনি ভয়ে আর কথা কহিলেন না।

রাজপুত, যে পথে দস্যুগণকে যাইতে দেখিয়াছিলেন, সেই পথে অতি সাবধানে তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বনমধ্যে আসিয়া আর পথ পাইলেন না, অথবা দস্যুদিগের কোন নিদর্শন পাইলেন না।

তখন রাজপুত আবার পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিলেন যে, দূরে বনের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, চারিজনে যাইতেছে। সেইখানে কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ইহারা কোথায় যায়। দেখিলেন কিছু পরে উহারা একটা

পাহাড়ের তলদেশে গেল, তাহার পর উহাদের আর দেখা গেল না। তখন রাজপুত সিদ্ধান্ত করিলেন যে উহারা হয় ঐখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, বৃক্ষাদির জন্য দেখা যাইতেছে না; নয় ঐ পর্ব্বততলে গুহা আছে দস্যুরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

রাজপুত, বৃক্ষাদি চিহ্ন দ্বারা সেই স্থানে যাইবার পথ বিলক্ষণ করিয়া নিরূপণ করিলেন। পরে অবতরণ করিয়া বন্যপথে প্রবেশপূর্ব্বক, সেই সকল চিহ্ন লক্ষিত পথে চলিলেন। এইরূপে, বিবিধ কৌশলে তিনি পূর্ব্বলক্ষিত স্থানে আসিয়া দেখিলেন, পর্ব্বততলে একটী গুহা আছে। গুহামধ্যে মনুষ্যের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন।

এই পর্য্যন্ত আসিয়া রাজপুত কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। উহারা চারি জন—তিনি একা; এক্ষণে গুহামধ্যে প্রবেশ করা উচিত কি না। যদি গুহাদ্বার রোধ করিয়া উহারা চারিজনে সংগ্রাম করে, তবে তাঁহার বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ কথা রাজপুতের মনে বড় অধিকক্ষণ স্থান পাইল না—মৃত্যুভয় আবার ভয় কি? মৃত্যুভয়ে রাজপুত কোন কার্য্য হইতে বিরত হয় না! কিন্তু দ্বিতীয় কথা এই যে তিনি গুহা মধ্যে প্রবেশ কবিলেই তাঁহার হস্তে দুই একজন অবশ্য মবিবে। যদি উহারা সে দস্যুদল না হয়? তবে নিবপরাধাব হত্যা হইবে।

এই ভাবিয়া রাজপুত সন্দেহভঞ্জনার্থ অতি ধীরে ধীরে গুহাদ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিগণেব কথাবার্ত্তা কর্ণপাত করিয়া শুনিতে লাগিলেন। দস্যুরা তখন অপহৃত সম্পত্তির বিভাগেব কথা কহিতেছিল। শুনিয়া রাজপুতের নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, ইহারা দস্যু বটে। রাজপুত তখন গুহা মধ্যে প্রবেশ করাই স্থির করিলেন।

ধীরে ধীবে বর্শা বনমধ্যে লুকাইলেন। পরে অসি নিষ্কোষিত করিয়া দক্ষিণ হস্তে দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। বাম হস্তে পিস্তল লইলেন। দস্যুরা যখন চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষায় বিমুগ্ধ হইয়া অন্যমনস্ক ছিল—সেই সময়ে রাজপুত অতি সাবধানে পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে গুহা-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দলপতি গুহাদ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়াছিল। প্রবেশ করিয়া রাজপুত দৃঢ়মুষ্টিধৃত তরবারিতে দলপতির মস্তকে আঘাত করিলেন। তাঁহার হস্তে এত বল যে এক আঘাতেই মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

সেই মুহূর্ত্তেই, দ্বিতীয় একজন দস্যু যে দলপতির কাছে বসিয়াছিল, তাহার দিকে ফিরিয়া রাজপুত তাহার মস্তকে ঐরূপ কঠিন পদাঘাত করিলেন

যে, সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল। রাজপুত, অন্য দুইজনের নিকট দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, একজন গুহাপ্রান্তে থাকিয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর তুলিতেছে। রাজপুত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উঠাইলেন; সে আহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মাণিকলাল বেগতিক দেখিয়া, গুহাদ্বারপথে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। রাজপুতও বেগে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই সময়ে রাজপুত যে বর্শা বনমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা মাণিকলালের পায়ে ঠেকিল। মাণিকলাল, তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া রাজপুতের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মহারাজ! আমি আপনাকে চিনি। ক্ষান্ত হউন, নইলে এই বর্শায় বিদ্ধ করিব।"

রাজপুত হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে বর্শা মারিতে পারিতে, তাহা হইলে আমি উহা বাম হস্তে ধরিতাম। কিন্তু তুমি উহা মারিতে পারিবে না—এই দেখ।" এই কথা বলিতে না বলিতে রাজপুত তাঁহার হাতের খালি পিস্তল দস্যুর দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিলেন; দারুণ প্রহারে বর্শা খসিয়া পড়িল। রাজপুত তাহা তুলিয়া লইয়া, মাণিকলালের চুল ধরিলেন। এবং অসি উত্তোলন করিয়া তাহার মস্তক ছেদনে উদ্যত হইলেন।

মাণিকলাল তখন কাতরস্বরে বলিল, "মহারাজাধিরাজ! আমার জীবন-দান করুন—রক্ষা করুন—আমি শরণাগত।"

রাজপুত তাহার কেশ ত্যাগ করিলেন, তরবারি নামাইলেন। বলিলেন, "তুই মরিতে এত ভীত কেন?"

মাণিকলাল বলিল, "আমি মরিতে ভীত নহি। কিন্তু আমার একটি সাত বৎসরের কন্যা আছে; সে মাতৃহীন, তাহার আর কেহ নাই—কেবল আমি। আমি প্রাতে তাহাকে আহার করাইয়া বাহির হইয়াছি, আবার সন্ধ্যাকালে গিয়া আহার দিব, তবে সে খাইবে, আমি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিতেছি না। আমি মরিলে সে মরিবে। আমাকে মারিতে হয়, আগে তাহাকে মারুন।"

দস্যু কাঁদিতে লাগিল, পরে চক্ষের জল মুছিয়া বলিতে লাগিল, "মহা-রাজাধিরাজ! আমি আপনার পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আর কখন দস্যুতা করিব না। চিরকাল আপনার দাসত্ব করিব। আর যদি জীবন থাকে, একদিন না একদিন এ ক্ষুদ্র ভৃত্য হইতে উপকার হইবে।"

রাজপুত বলিলেন, "তুমি আমাকে চেন?"

দস্যু বলিল, "মহারাণা রাজসিংহকে কে না চিনে ?"

তখন রাজসিংহ বলিলেন, "আমি তোমার জীবনদান করিলাম। কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়াছ, আমি যদি তোমাকে কোন প্রকার দণ্ড না দিই তবে আমি রাজধর্ম্মে পতিত হইব।"

মাণিকলাল বিনীতভাবে বলিল, "মহারাজাধিরাজ! এ পাপে আমি নূতন ব্রতী। অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি লঘু দণ্ডেরই বিধান করুন। আমি আপনার সম্মুখেই শাস্তি লইতেছি।"

এই বলিয়া দস্যু কটিদেশ হইতে ক্ষুদ্র ছুরিকা নির্গত করিয়া, অবলীলাক্রমে, আপনার তর্জ্জনী অঙ্গুলি ছেদন করিতে উদ্যত হইল। ছুরীতে মাংস কাটিয়া, অস্থি কাটিল না। তখন মাণিকলাল ঐ শিলাখণ্ডের উপর হস্ত রাখিয়া ঐ অঙ্গুলির উপর ছুরিকা বসাইয়া, আর একখণ্ড প্রস্তরের দ্বারা তাহাতে ঘা মারিল। আঙ্গুল কাটিয়া মাটিতে পড়িল। দস্যু বলিল, "মহারাজ এই দণ্ড মঞ্জুর করুন।"

রাজসিংহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, দস্যু ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। বলিলেন, "ইহাই যথেষ্ট। তোমার নাম কি ?"

দস্যু বলিল, "এ অধমের নাম মাণিকলাল সিংহ। আমি রাজপুতকুলের কলঙ্ক।"

রাজসিংহ বলিলেন, "মাণিকলাল, আজি হইতে তুমি আমার কার্য্যে নিযুক্ত হইলে। এক্ষণে তুমি অশ্বারোহী সৈন্যভুক্ত হইলে—তোমার কন্যা লইয়া উদয়পুরে যাও ; তোমাকে ভূমি দিব বাস করিও।"

মাণিকলাল তখন রাণার পদধূলি গ্রহণ করিল। এবং রাণাকে ক্ষণকাল অবস্থিতি করাইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে অপহৃত মুক্তাবলয়, পত্র দুইখানি, এবং আশরফি চারিখণ্ড আনিয়া দিল। বলিল, "ব্রাহ্মণের যাহা আমরা কাড়িয়া লইয়াছিলাম, তাহা শ্রীচরণে অর্পণ করিতেছি। পত্র দুইখানি আপনারই জন্য। দাস যে উহা পাঠ করিয়াছে, সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

রাণা পত্র হস্তে লইয়া দেখিলেন, তাঁহারই নামাঙ্কিত শিরোনামা। বলিলেন, "মাণিকলাল—পত্র পড়িবার এ স্থান নহে। আমার সঙ্গে আইস—তোমরা পথ জান, পথ দেখাও।"

মাণিকলাল পথ দেখাইয়া চলিল। রাণা দেখিলেন যে দস্যু একবার তাহার ক্ষত ও আহত হস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে না, বা তৎসম্বন্ধে একটী কথাও বলিতেছে না—বা একবার মুখ বিকৃত করিতেছে না। রাণা শীঘ্রই বন হইতে বেগবতী ক্ষীণাতটিনীতীরে এক সুরম্য নিভৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তথায়, উপলঘাতিনী কলনাদিনী তটিনীবব. সঙ্গে সুমন্দ-মধুর-বায়ু, এবং স্বরলহরী বিকীর্ণকাবী কুঞ্জবিহঙ্গমগণ ধ্বনি মিশাইতেছে। তথায় স্তবকে স্তবকে বন্যকুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া, পার্ব্বতীয় বৃক্ষরাজি আলোকময় কবিতেছে। তথায়, রূপ উছলিতেছে, শব্দ তবঙ্গায়িত হইতেছে, গন্ধ মাতিয়া উঠিতেছে, এবং মন প্রকৃতির বশীভূত হইতেছে। সেইখানে বাজসিংহ এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন কবিয়া, পত্র দুইখানি পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথম রাজা বিক্রমসিংহেব পত্র পড়িলেন। পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন—মনে কবিলেন, ব্রাহ্মণকে কিছু দিলেই পত্রের উদ্দেশ্য সফল হইবে। তারপর চঞ্চলকুমারীর পত্র পড়িতে লাগিলেন। পত্র এইরূপ ;—

"বাজন্—আপনি বাজপুত-কুলেব চূড়া—হিন্দুব শিবোভূষণ। আমি অপবিচিতা হীনমতি বালিকা—নিতান্ত বিপন্না না হইলে কখনই আপনাকে পত্র লিখিতে সাহস করিতাম না। নিতান্ত বিপন্না বুঝিয়াই আমাব এ দুঃসাহস মার্জ্জনা করিবেন।

যিনি এই পত্র লইয়া যাইতেছেন, তিনি আমাব গুরুদেব। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিলে জানিতে পাবিবেন—আমি বাজপুত কন্যা। রূপনগব অতি ক্ষুদ্র বাজ্য—তথাপি বিক্রমসিংহ সোলাঙ্কি বাজপুত—রাজকন্যা বলিয়া আমি মধ্যদেশাধিপতিব কাছে গণ্যা না হই,—বাজপুতকন্যা বলিয়া দয়াব পাত্রী। কেন না আপনি বাজপুতপতি—বাজপুত-কুলতিলক।

অনুগ্রহ কবিয়া আমাব বিপদ শ্রবণ করুন। আমাব দুরদৃষ্টক্রমে, দিল্লীর বাদশাহ আমাব পাণিগ্রহণ করিতে মানস করিয়াছেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার সৈন্য, আমাকে দিল্লী লইয়া যাইবাব জন্য আসিবে। আমি বাজপুতকন্যা, ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভবা—কিপ্রকারে তাতারেব দাসী হইব? রাজহংসী হইয়া কেমন করিয়া বকসহচরী হইব? হিমালয়নন্দিনী হইয়া কি প্রকারে পঙ্কিল তড়াগে মিশাইব? রাজপুতকুমারী হইয়া কি প্রকারে তুরকী বর্ব্বরের আজ্ঞাকারিণী হইব? আমি স্থির করিয়াছি, এ বিবাহের অগ্রে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ করিব।

মহারাজাধিবাজ! আমাকে অহঙ্কৃতা মনে করিবেন না। আমি জানি যে আমি ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর কন্যা—যোধপুর, অম্বর প্রভৃতি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী রাজাধিরাজগণও দিল্লীর বাদশাহকে কন্যাদান করা কলঙ্ক মনে করেন না—কলঙ্ক মনে করা দূরে থাক, বরং গৌরব মনে করেন। আমি সে সব ঘরের কাছে কোন ছার? আমার এ অহঙ্কার কেন? এ কথা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কিন্তু

মহারাজ! সূর্য্যদেব অস্তে গেলে খদ্যোত কি জ্বলে না? শিশরভরে নলিনী মুদিত হইলে, ক্ষুদ্র কুন্দ কুসুম বিকশিত হয় না? যোধপুর অম্বর কুলধ্বংস করিলে রূপনগরে কি কুলরক্ষা হইতে পারে না? মহারাজ ভাটমুখে শুনিয়াছি, যে বনবাসী রাণা প্রতাপের সহিত মহারাজা মানসিংহ ভোজন করিতে আসিলে, মহারাণা ভোজন করেন নাই, বলিয়াছিলেন যে তুর্ককে ভগিনী দিয়াছে তাহার সহিত ভোজন করিব না। সেই মহাবীরের বংশধরকে কি আমায় বুঝাইতে হইবে যে এই সম্বন্ধ রাজপুতকুলকামিনীর পক্ষে ইহলোকে পরলোকে ঘৃণাস্পদ? মহারাজ! আজিও আপনাব বংশে তুর্ক বিবাহ কবিতে পারিল না কেন? আপনারা বীর্য্যবান্ মহাবলাক্রান্ত বংশ বটে, কিন্তু তাই বলিয়া নহে। মহাবল পবাক্রান্ত রুমের বাদশাহ কিম্বা পাবস্যের শাহ দিল্লীব বাদশাহকে কন্যাদান গৌরব মনে করেন। তবে উদয়পুবেশ্বব কেবল তাহাকে কন্যাদান কবেন না কেন? তিনি রাজপুত বলিয়া। আমিও সেই বাজপুত। মহাবাজ! প্রাণত্যাগ করিব তবু কুল রাখিব প্রতিজ্ঞা কবিযাছি।

প্রযোজন হইলে প্রাণবিসর্জ্জন কবিব, প্রতিজ্ঞা কবিয়াছি, কিন্তু তথাপি এই অষ্টাদশ বৎসব বয়সে, এ অভিনব জীবন বাখিতে বাসনা হয়। কিন্তু কে এ বিপদে এ জীবন বক্ষা কবিবে? আমাব পিতাব ত কথাই নাই, তাঁহার এমন কি সাধ্য যে আলমগীবেব সঙ্গে বিবাদ কবেন। আব যত বাজপুতবাজা, ছোট হউন বড় হউন, সকলেই বাদশাহেব ভৃত্য—সকলেই বাদশাহের ভয়ে কম্পিতকলেবব। কেবল আপনি—বাজপুতকুলের একা প্রদীপ—কেবল আপনিই স্বাধীন—কেবল উদয়পুরেশ্ববই বাদশাহেব সমকক্ষ। হিন্দুকুলে আর কেহ নাই—যে এই বিপন্না বালিকাকে রক্ষা কবে—আমি আপনার শবণ লইলাম—আপনি কি আমাকে রক্ষা করিবেন না?

কত বড় গুরুতর কার্য্যে আমি আপনাকে অনুবোধ করিতেছি, তাহা আমি না জানি, এমত নহে। আমি কেবল বালিকাবুদ্ধির বশীভূতা হইয়া লিখিতেছি এমত নহে। দিল্লীশ্ববের সহিত বিবাদে সহজ নহে জানি। এ পৃথিবীতে আর কেহই নাই, যে তাহার সঙ্গে বিবাদ কবিয়া তিষ্ঠিতে পারে। কিন্তু মহারাজ! মনে করিয়া দেখুন, মহারাণা সংগ্রামসিংহ বাবরশাহকে প্রায় রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। মহারাণা প্রতাপসিংহ আকবরশাহকেও মধ্যদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। আপনি সেই সিংহাসনে আসীন—আপনি সেই সংগ্রামের, সেই প্রতাপের বংশধর—আপনি কি তাঁহাদের অপেক্ষা হীনবল? শুনিয়াছি নাকি মহারাষ্ট্রে এক পার্ব্বতীয় দস্যু আলমগীরকে পরাভূত করিয়াছে—সে আলমগীর কি রাজস্থানের রাজেন্দ্রের কাছে গণ্য?

আপনি বলিতে পারেন "আমার বাহুতে বল আছে—কিন্তু থাকিলেও আমি তোমার জন্য এত কষ্ট কেন করিব ? আমি কেন অপরিচিতা মুখরা কামিনীর জন্য প্রাণিহত্যা করিব ?—ভীষণ সমবে অবতীর্ণ হইব ? মহারাজ ! সর্ব্বস্ব পণ করিয়া শরণাগতকে বক্ষা কবা কি বাজধর্ম্ম নহে ? সর্ব্বস্ব পণ করিয়া কুলকামিনীর রক্ষা কি রাজপুতের ধর্ম্ম নহে ?

মহারাজ ! আর একটী কথা বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু না বলিলেও নহে। আমি এই বিপদে পড়িয়া পণ করিয়াছি যে, যে বীর আমাকে মোগল হস্ত হইতে রক্ষা কবিবেন, তিনি যদি রাজপুত হয়েন, আর যদি আমাকে যথাশাস্ত্র গ্রহণ করেন, তবে আমি তাঁহার দাসী হইব। হে বীরশ্রেষ্ঠ ! যুদ্ধে স্ত্রীলাভ বীবের ধর্ম্ম। সমগ্র ক্ষত্রকুলেব সহিত যুদ্ধ করিয়া, পাণ্ডব দ্রৌপদীলাভ কবিয়াছিলেন। যাদবী-সেনাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অর্জ্জুন সুভদ্রাকে পাইয়াছিলেন। কাশীরাজ্যে সমবেত রাজমণ্ডলসমক্ষে আপন বীর্য্য প্রকাশ কবিয়া ভীষ্মদেব বাজকন্যাগণকে লইয়া আসিযাছিলেন। হে বাজন্ ! রুক্মিণীব বিবাহ কি মনে পড়ে না ? আপনি এই পৃথিবীতে আজিও অদ্বিতীয় বীব—আপনি কি বীবধর্ম্মে পবাঙ্মুখ হইবেন ? আমি মুখরা, কতই বলিতেছি—পাছে বাক্যে আপনাকে না বাঁধিতে পাবি—এজন্য গুরুদেবহস্তে রাখির বন্ধন পাঠাইলাম। তিনি রাখি বাঁধিয়া দিবেন—তার পর আপনাব রাজধর্ম্ম আপনার হাতে। আমাব প্রাণ আমার হাতে। যদি দিল্লী যাইতে হয়, দিল্লীর পথে বিষভোজন কবিব।"

পত্র পাঠ কবিয়া রাজসিংহ কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হইলেন ; পরে মাথা তুলিয়া মাণিকলালকে বলিলেন, "মাণিকলাল, এ পত্রের কথা তুমি ছাড়া আর কে জানে ?

মাণিক। যাহারা জানিত মহারাজ গুহামধ্যে তাহাদিগকে বধ করিয়া আসিয়াছেন।

রাজা। উত্তম। তুমি গৃহে যাও। উদযপুরে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিও। এ পত্রেব কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ কবিও না।

এই বলিয়া রাজসিংহ, নিকটে যে কয়টি স্বর্ণমুদ্রা ছিল, তাহা মাণিকলালকে দিলেন। মাণিকলাল প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

আকবর শাহের খোষরোজ

(১)

রাজপুরী মাঝে   কি সুন্দর আজি
  বসেছে বাজার, রসের ঠাট।
রমণীতে বেচে   রমণীতে কিনে
  লেগেছে রমণী রূপের হাট॥
বিশালা সে পুরী   নবমীর চাঁদ,
  লাখে লাখে দীপ উজলি জ্বলে।
দোকানে দোকানে   কুলবালাগণে
  খরিদ্দার ডাকে, হাসিয়া ছলে॥
ফুলের তোরণ,   ফুল আবরণ
  ফুলের স্তম্ভেতে ফুলের মালা।
ফুলের দোকান,   ফুলের নিশান,
  ফুলের বিছানা ফুলের ডালা॥
লহরে লহরে   ছুটিছে গোলাব,
  উঠিছে ফোয়ারা জ্বলিছে জল।
তাধিনি তাধিনি   নাচিতেছে নটী,
  গায়িছে মধুর গায়িকা দল॥
রাজপুর মাঝে   লেগেছে বাজার,
  বড় গুলজার সরস ঠাট।
রমণীতে বেচে   রমণীতে কিনে
  লেগেছে রমণী রূপের হাট॥
কত বা সুন্দরী,   রাজার দুলালী
  ওমরাহ জায়া, আমীর জাদী।
নয়নেতে জ্বালা,   অধরেতে হাসি,
  অঙ্গেতে ভূষণ মধুর-নাদী॥
হীরা মতি চুণি   বসন ভূষণ
  কেহ বা বেচিছে কেনে বা কেউ।
কেহ বেচে কথা   নয়ন ঠারিয়ে
  কেহ কিনে হাসি রসের ঢেউ॥
কেহ বলে সখি   এ রতন বেচি
  হেন মহাজন এখানে কই?
সুপুরুষ পেলে   আপনা বেচিয়ে
  বিনামূলে কেনা হইয়া রই॥
কেহ বলে সখি   পুরুষ দরিদ্র
  কি দিয়ে কিনিবে রমণী-মণি।
চারি কড়া দিয়ে   পুরুষ কিনিয়ে
  গৃহেতে বাঁধিয়ে রেখো লো ধনি॥
পিঞ্জরেতে পুরি,   খেতে দিও ছোলা,
  সোহাগ শিকলি বাঁধিও পায়।
অবোধ বিহঙ্গ   পড়িবে আটক
  তালি দিয়ে ধনি, নাচায়ো তায়॥

(২)

এক চন্দ্রাননী,   মরাল-গামিনী,
  সে রসের হাটে ভ্রমিছে একা।
কিছু নাহি বেচে   কিছু নাহি কিনে,
  কাহারও সহিত না করে দেখা॥
প্রভাত নক্ষত্র   জিনিয়া রূপসী,
  দিশাহারা যেন বাজারে ফিরে।
কাণ্ডারী বিহনে   তরণী যেন বা
  ভাসিয়া বেড়ায় সাগরনীরে॥

রাজার দুলালী রাজপুতবালা,
চিতোরসম্ভবা কমলকলি।
পতির আদেশে আসিয়াছে হেথা,
সুখের বাজার দেখিবে বলি ॥
দেখে শুনে রামা সুখী না হইল—
বলে ছি ছি এ কি লেগেছে ঠাট।
কুলনারীগণে, বিকাইতে লাজ
বসিয়াছে ফেঁদে রসের হাট!
ফিরে যাই ঘরে কি করিব একা
এ রঙ্গ সাগরে সাঁতার দিয়ে?
এত বলি সতী ধীরি ধীরি ধীরি
নির্গমের দ্বারে গেল চলিয়ে ॥

নির্গমের পথ অতি সে কুটিল,
পেঁচে পেঁচে ফিরে, না পায় দিশে।
হায় কি করিনু বলিয়ে কাঁদিল,
এখন বাহির হইব কিসে?
না জানি বাদশা কি কল করিল
ধরিতে পিঞ্জরে, কুলের নারী।
না পাই ফিরিতে নারি বাহিরিতে
নয়নকমলে বহিল বারি ॥

(৩)

সহসা দেখিল, সমুখে সুন্দরী,
বিশাল উরস পুরুষ বীর।
রতনের মালা দুলিতেছে গলে
মাথায় রতন জ্বলিছে স্থির ॥
যোড় করি কর, তারে বিনোদিনী
বলে মহাশয় কর গো ত্রাণ।
না পাই যে পথ পড়েছি বিপদে
দেখাইয়ে পথ, রাখ হে প্রাণ ॥
বলে সে পুরুষ অমিয় বচনে
আহা মরি হেন না দেখি রূপ।
এসো এসো ধনি আমার সঙ্গেতে
আমি আকব্বর—ভারত-ভূপ!
সহস্র রমণী রাজার-দুলালী
মম আজ্ঞাকারী, চরণ সেবে।
তোমা সমা রূপে নহে কোন জন,
তব আজ্ঞাকারী আমি হে এবে ॥
চল চল ধনি আমার মন্দিরে
আজি খোষ রোজ সুখের দিন।
এ ভারত ভূমে কি আছে কামনা
বলিও আমারে, শোধিব ঋণ ॥
এত বলি তবে রাজরাজপতি
বলে মোহিনীরে ধরিল করে,
যূথপতি বল সে ভুজ বিটপে
টুটিল কঙ্কণ তাহার ভরে ॥
শুকাল বামার বদন-নলিনী
ডাকে ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মে দুর্গে।
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি বাঁচাও জননি!
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মে দুর্গে ॥
ডাকে কালি কালি ভৈরবি করালি
কৌষিকি কপালি কর মা ত্রাণ।
অপর্ণে অম্বিকে চামুণ্ডে চণ্ডিকে
বিপদে বালিকে হারায় প্রাণ ॥
মানুষের সাধ্য নহে গো জননি
এ ঘোর বিপদে রক্ষিতে লাজ।
সমর-রঙ্গিণি অসুর-ঘাতিনি
এ অসুরে নাশি, বাঁচাও আজ ॥

(৪)

বকুল পুণ্যেতে অনন্ত শূন্যেতে
দেখিল রমণী, জ্বলিছে আলো।
হাসিছে রূপসী নবীনা ষোড়শী,
করীন্দ্র বাহনে, মুরতি কালো ॥
নরমুণ্ডমালা দুলিছে উরসে
বিজলি ঝলসে লোচন তিনে।
দেখা দিয়ে মাতা দিতেছে অভয়
দেবতা সহায় সহায়হীনে ॥

আকাশের পটে নগেন্দ্র-নন্দিনী
দেখিয়া যুবতী প্রফুল্ল মুখ।
হৃদি সরোবর পুলকে উছলে
সাহসে ভরিল, নারীর বুক॥

তুলিয়া মস্তক গ্রীবা হেলাইল
দাঁড়াইল ধনী ভীষণ রাগে।
নয়নে অনল অধরেতে ঘৃণা
বলিতে লাগিল নৃপের আগে॥

ছিছি ছিছি ছিছি তুমি হে সম্রাট্,
এই কি তোমার রাজধরম।
কুলবধূ ছলে গৃহেতে আনিয়া
বলে ধর তারে নাহি শরম॥

বহু রাজ্য তুমি বলেতে লুটিলে
বহু বীর নাশি বলাও বীর।
বীরপণা আজি দেখাতে এসেছ
রমণীর চক্ষে বহায়ে নীর?

পরবাহুবলে পর রাজ্য হর,
পরনারী হর করিয়ে চুরি।
আজি নারী হাতে হারাবে জীবন
ঘুচাইব যশ মারিয়ে ছুরি॥

জয়মল্ল বীরে ছলেতে বধিলে
ছলেতে লুটিলে চারু চিতোর।
নারীপদাঘাতে আজি ঘুচাইব
তব বীরপণা, ধরম চোর!

এত বলি বামা হাত ছাড়াইল
বলেতে ধরিল রাজার অসি।
কাড়িয়া লইয়া, অসি ঘুরাইয়া,
মারিতে তুলিল, নবরূপসী॥

ধন্য ধন্য বলি রাজা বাখানিল
এমন কখন দেখিনে নারী।
মানিতেছি হার ধন্য সতী তুমি
রাখ তরবারি; মানিনু হারি॥

(৫)

হাসিয়া রূপসী নামাইল অসি,
বলে মহারাজ এ বড় রস।
রমণীর রণে হারি মান তুমি
পৃথিবীপতির বাড়িল যশ॥

দুলায়ে কুণ্ডল, অধরে অঞ্চল,
হাসে খল খল, ঈষৎ হেলে।
বলে মহাবীর, এই বলে তুমি
রমণীরে বল করিতে এলে?

পৃথিবীতে যারে, তুমি দাও প্রাণ,
সেই প্রাণে বাঁচে, বলে হে সবে।
আজি পৃথ্বীনাথ আমার চরণে
প্রাণ ভিক্ষা লও, বাঁচিবে তবে॥

যোড়ো হাত দুটো, দাঁতে কর কুটো
করহ শপথ ভারত প্রভু।
শপথ করহ হিন্দুললনার
হেন অপমান না হবে কভু॥

তুমি না করিবে, রাজ্যেতে না দিবে
হইতে কখন এ হেন দোষ।
হিন্দুললনারে যে দিবে লাঞ্ছনা
তাহার উপরে করিবে রোষ॥

শপথ করিল, পরশিয়ে অসি,
নারী আজ্ঞামত ভারতপ্রভু।
আমার রাজ্যেতে হিন্দুললনার
হেন অপমান না হবে কভু॥

বলে শুন ধনি হইয়াছি প্রীত
দেখিয়া তোমার সাহস বল।
যাহা ইচ্ছা তব মাগি লও সতি,
পূরাব বাসনা, ছাড়িয়া ছল॥

এই তরবারি দিনু হে তোমারে
হীরক খচিত ইহার কোষ।
বীর বালা তুমি তোমার সে যোগ্য
না রাখিও মনে আমার দোষ॥

আজি হতে তোমা ভগিনী বলিনু
ভাই তব আমি ভাবিও মনে।
যা থাকে বাসনা মাগি লও বর
যা চাহিবে তাই দিব এখনে ॥
তুষ্ট হয়ে সতী বলে ভাই তুমি
সম্প্রীত হইনু তোমার ভাষে।
ভিক্ষা যদি দিবা, দেখাইয়া দাও
নির্গমের পথ, যাইব বাসে ॥
দেখাইল পথ, আপনি রাজন্
বাহিরিল সতী, সে পুরী হতে।
সবে বল জয়, হিন্দুকন্যা জয়,
হিন্দুমতি থাক ধর্ম্মের পথে ॥

৬

রাজপুরী মাঝে, কি সুন্দর আজি
বসেছে বাজার রসের ঠাট।
রমণীতে কেনে রমণীতে বেচে
লেগেছে রমণী রূপের হাট ॥

ফুলের তোরণ ফুল-আবরণ
ফুলের স্তম্ভেতে ফুলের মালা।
ফুলের দোকান ফুলের নিশান,
ফুলের বিছানা ফুলের ডালা ॥
নবমীর চাঁদ বরষে চন্দ্রিকা
লাখে লাখে দীপ উজলি জ্বলে।
দোকানে দোকানে কুলবালাগণে
অলসে কটাক্ষ হাসিয়া ছলে ॥
এ হতে সুন্দর, রমণী ধরম,
আর্য্যনারী ধর্ম্ম, সতীত্ব ব্রত।
জয় আর্য্য নামে, আজ (ও) আর্য্যধামে
আর্য্যধর্ম্ম রাখে রমণীতে যত ॥
জয় আর্য্যকন্যা, এ ভুবনে ধন্যা,
ভারতের আলো, ঘোর আঁধারে।
হায় কি কারণে, আর্য্য পুত্রগণে
আর্য্যের ধরম রাখিতে নারে ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা জ্ঞাতিবিবাহের ফল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়াছি। স্বগোত্রে বিবাহ করা আমাদের মধ্যে নিষেধ আছে সত্য, কিন্তু তাহা পিতৃগোত্র সম্বন্ধে; মাতৃগোত্র সম্বন্ধে বিশেষ নিষেধ নাই। শাস্ত্রকারদিগের বিশ্বাস ছিল যে পিতাই জনক, সন্তান কেবল পিতা হইতে জন্মে, মাতা ক্ষেত্র মাত্র। এই জন্য পিতৃগোত্রে বিবাহ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু এক্ষণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে জন্ম সম্বন্ধে মাতাই প্রধান। পিতৃবীজ কেবল উত্তেজক মাত্র; পিতৃবীজ অভাবেও গর্ভ হইতে পারে তবে গর্ভরক্ষা বড় হয় না। অনেকেই দেখিয়াছেন পিঞ্জরবদ্ধা পালিতা পক্ষিণী গর্ভবতী হইয়া অণ্ড প্রসব করিয়াছে, পক্ষীর সহিত সাক্ষাৎ নাই অথচ পক্ষিণী অণ্ড প্রসব করে। যাঁহারা গৃহে হংসী পালন করেন তাঁহারাই দেখিয়াছেন নিকটে কোথাও হংস নাই অথচ হংসী অণ্ড* প্রসব করে। অতএব পক্ষী ব্যতীত পক্ষিণী গর্ভবতী হয়। কীট পতঙ্গের মধ্যে এরূপ গর্ভে শাবক পর্য্যন্তও জন্মে; তবে অধিক নহে, যাহাও জন্মে, তাহাও দীর্ঘজীবী হয় না।† পুরুষ সংস্রব ব্যতীত জন্মকে ইংরেজিতে Parthenogenisis বলে। জীব জন্তুর

* এই অণ্ডকে সচরাচর লোকে "বাওয়া ডিম" বলে।

† Mr. Jourdan found that, out of about 58,000 eggs laid by unimpregnated silk moths, many passed through their early embryonic stages, shewing that they were capable of self developement, but only twenty nine out of the whole number produced caterpillers—Darwin's *Variation of Animals. Vol. II page 357.*

Weijenbergh raised two successive generations from unimpregnated females of a lepidopterous insect. These insects did not produce at most one twentieth of their full complement of eggs, and many of the eggs were worthless. Moreover the caterpillars raised from these unfertilised eggs possessed far less vitality than those from fertilised eggs. In the third parthenogenitic generation not a single egg yielded a caterpiller. *Nature, Decr, 91, 1872 quoted in Ibid.*

বোধ হয় অনেকেই কুলীনদিগের এই নিয়মটি সবিশেষ না জানায় এই অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারিতেছেন না। অনেকেই মনে করিতে পারেন যে মুখোপাধ্যায় মাত্রেই একইরূপ নিয়মে বদ্ধ। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। অনেক শ্রেণীর মুখোপাধ্যায় আছেন। সেইরূপ অনেক শ্রেণীর বন্দ্যোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায় আছেন। তাহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর নিমিত্ত দেবীবর পৃথক্ পৃথক্ নিয়মবদ্ধ করিলেন। মুখোপাধ্যায় মাত্রেই যে, যে কোন বন্দ্যোপাধ্যায় বা চট্টোপাধ্যায় বংশে কন্যাদান করিবেন সে ক্ষমতা রহিল না। উদাহরণ উপলক্ষে কানাই ছোট ঠাকুরের কথা বলা যাইতেছে। তিনি মুখোপাধ্যায়। তাহার সহিত চট্টোপাধ্যায়ের পাল্টি বদ্ধ হইল। চট্টোপাধ্যায় গোষ্টি চৌতল, ধন, অবসথি প্রভৃতি অনেক আছে; তন্মধ্যে অবসথি বংশের এক প্রশাখা গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাহার আদান প্রদান স্থির হইল। সেই অবধি কানাই ছোট ঠাকুরের সন্তানেরা পুরুষানুক্রমে গঙ্গানন্দ বংশে বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন। আবার গঙ্গানন্দের সন্তানেরা ঐরূপ পুরুষানুক্রমে কানাইয়ের বংশে বিবাহ করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় কিছুকাল পরে উভয় বংশের রক্ত সম্পূর্ণভাবে মিশ্রিত হইয়া গেল তখন ইহাদের মধ্যে যে স্ত্রী বা যে পুরুষ দেখাইবেন তাহারই শরীরে অর্দ্ধেক কানাই ছোট ঠাকুরের রক্ত অর্দ্ধেক গঙ্গানন্দের রক্ত। তদ্ভিন্ন আর কাহার রক্ত নাই। এই অবস্থায় যাহাকে মুখোপাধ্যায়ের কন্যা বলিয়া চট্টোপাধ্যায়ের বংশে বিবাহ দিতে হইল তাহার রক্ত যত ভাগ মুখোপাধ্যায় হইতে উৎপন্ন তত ভাগ আবার চট্টোপাধ্যায় হইতে উৎপন্ন, কাজেই তাহার সহিত চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ দিলে জ্ঞাতি বিবাহের আর কোন অংশে বাকি রহিল না। বোধ হয় মধ্যে মধ্যে শ্রোত্রীয় বংশে বিবাহ করায় অনেকের বংশ রক্ষা পাইয়াছে। কুলীনেরা আপন পাল্টীবংশে ভিন্ন অন্যকে কন্যা দান করিতে পারিবেন না কিন্তু শুদ্ধ শ্রোত্রীয়ের বংশে বিবাহ করিলে করিতে পারিবেন এমত অনুমতি ছিল। তদনুসারে কখন কখন বিবাহ হইত। বিজ্ঞানবিদেরা বলেন যে, যে স্থলে কুলরক্ষক রীতি পুরুষানুক্রমে চলিয়া আইসে সেখানে কখন কখন নূতন রক্ত সংযোগ করাইতে পারিলে বংশ রক্ষা হয়।* বোধ হয় আমাদের কুলীনদিগের মধ্যে শ্রোত্রীয় রক্ত কখন কখন মিশ্রিত হওয়ায় তাহাদের বংশ একেবারে লোপ পায় নাই।

---

* It is a great law of nature that all organic beings profit from an occasional cross with individuals not closely related to them in blood—*Darwin.*

The Revd. W.D. Fox has communicated to me the case of a small lot of bloodhounds long kept in the same family, which had become very bad breeders and nearly all had a bony enlargement in the tail.

কৌলীন্য প্রথাকে আমরা নিন্দা করি না বরং শত শত প্রশংসাই করি। দেবীবর ঘটক যে পাল্টী প্রকৃতি মেল ইত্যাদির নিয়ম করিয়া গিয়াছেন তাহারই প্রশংসা করিতে পারি না। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠদল যে এত অপকৃষ্ট হইয়াছে তাহা কেবল দেবীবরের দোষে। তাহার সমুদয় নিয়ম বৈজিকতত্ত্বের বিরোধী। বল্লালের সমুদয় নিয়ম বৈজিকতত্ত্বের অনুযায়ী। বিজ্ঞান শাস্ত্র তখন বাঙ্গালায় ছিল না, না থাকুক, বল্লাল তাহা বুঝিয়াছিলেন, শারীরিক ও মানসিক উন্নতির একেবারে মূল ধরিয়া তিনি আইন করিয়াছিলেন। গুণবানের সন্তান গুণবান্ হয়। অতএব গুণবানের সঙ্গে গুণবানের বিবাহ দিয়া রাজ্যে গুণবানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে এই তিনি স্থির করেন। পরে বাঙ্গালার মধ্যে ১৯ জন* অতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া, তাহাদিগকে কুলীন করিলেন এবং তৎসঙ্গে তাঁহাদের বিবাহ কিরূপ কাহার সহিত হইবে তাহার নিয়মবদ্ধ করিয়া দিলেন। এই শেষ ভাগটী নূতন। সকল রাজাই আপন ইচ্ছানুরূপ কৌলীন্য বিতরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা গুণগ্রাহী, গুণের পুরস্কার করেন, অর্থ দেন, সম্মান দেন, কৌলীন্য দেন তাঁহাদের রাজ্যে আর গুণবানের অভাব থাকে না, কিন্তু তাহাতে একটী দোষ ঘটে, তথায় পুরস্কারের লোভে গুণের আদর হয় বটে কিন্তু পুরস্কারের শিথিলতা হইলে গুণেরও হ্রাস হয়। বল্লাল সেইজন্য নিয়মবদ্ধ করিলেন তাহাতে সে দোষ রহিল না। গুণবানের সঙ্গে গুণবানের বিবাহ হইলে সন্তান অবশ্য গুণবান হইবে, গুণ [illegible]

A single cross with a distinct stamp of bloodhounds restored their fertility and drove away the tendency to malformation in the tail — *Darwin* Mr Clerk, whose fighting cocks were so notorious continued to breed from his own kind till they lost all their disposition to fight, but stood to be cut up without making any resistance, and were so reduced in size as to be under those weights required for the best prize , but on obtaining a cross from Mr Leighton they again resumed their former courage and weight— *Wright*

* বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে জাহ্লন, মকরন্দ, ঈশান, মহেশ্বর, দেবল ও বামন এই ছয় জন।

চট্টোপাধ্যায় বংশে হলায়ুধ, বহুরূপ, অরবিন্দ, শুচ, ও বাঙ্গাল এই পাঁচ জন।

মুখোপাধ্যায় বংশে উৎসাহ ও গরুড় এই দুই জন।

কাঞ্জিলাল বংশে কুতুহল ও কানু এই দুই জন।

ঘোষাল বংশে শিব।

গাঙ্গুলি বংশে শিশু।

পুতিতুণ্ড বংশে গোবর্দ্ধন আচার্য্য।

কুন্দিগ্রাম বংশে রোষাকর।

নিয়ম, প্রায় অকাটা, পুরস্কার থাকুক বা না থাকুক, রাজ্যে গুণবানের অভাব থাকিবে না।

কিন্তু যে নয়টি* গুণ বল্লাল আপন রাজ্যে বিস্তার করিবার নিয়ম স্থাপন করিলেন তাহাতে রাজ্যের বড় উন্নতি বা খ্যাতির সম্ভাবনা ছিল না। গুণগুলি প্রার্থনীয় বটে, থাকিলে সংসার উজ্জ্বল হয় কিন্তু রাজ্য সম্বন্ধে তাহার কোনটিই কিছুই নহে। সেই জন্য রাজ্যের কোন উপকারই হয় নাই। কিন্তু সংসার সম্বন্ধে ফল অতি চমৎকার হইয়াছিল। বাঙ্গালার ন্যায় পবিত্র সংসার, সুখের সংসার, বোধ হয় আর কোন রাজ্যেই ছিল না। বহুদিন অবধি তাহা নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে তথাপি যাহা অদ্যাপি আছে তাহা বোধ হয় আর অন্যত্র বড় অধিক নাই।

অন্য দেশের রাজারা কুলীনদিগের বিবাহে হস্তক্ষেপ করেন নাই, করিলে হয় ত রাজ্যের উপকার হইত। এক্ষণে প্রায় লোকে নিজ নিজ প্রণয় পবিতৃপ্তির নিমিত্ত অথবা মর্য্যাদা রক্ষার্থ বিবাহ করেন। যে সকল বিবাহে নিজ সুখ সমৃদ্ধি ভিন্ন দেশের কোন উন্নতি হয় না সে সকল বিবাহ লোকবিশেষের নিকট স্বার্থপর বলিয়া ঘৃণিত। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে বিবাহ প্রণয় পবিতৃপ্তির নিমিত্ত হইত, তাহার অন্যথা করিলে অনিষ্ট আছে, কিন্তু যে বিবাহ কেবল মর্য্যাদা রক্ষা নিমিত্ত সে বিবাহ অনেক সময় না হইলেই ভাল। যাঁহারা পুরুষানুক্রমে ধনবান্ বা উচ্চপদস্থ তাঁহাদের সন্তানেরা প্রায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে প্রায় দেখা যায় যাহারা আপন আপন বিষয় কার্য্যে অক্ষম, তাহাদিগের অপ্রাপ্ত বয়সে কোর্ট অব ওয়ার্ডস, প্রাপ্ত বয়সে দেওয়ান, বিষয় রক্ষা করে। এরূপ ব্যক্তি যদি তদবস্থাগ্রস্ত বংশে বিবাহ করেন তাহা হইলে তাঁহার সন্তান আরও অপটু হইবার সম্ভাবনা।

---

* আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপ, দান, এই কুললক্ষণ।

আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, দুই একটী শিশু কান্দিয়া হাত তুলিয়া ভয়ে অপরিচিত জনের কোলে চড়িলেন, কিন্তু গোলাম সরদার সাহেব আমার পুরাতন বন্ধু, আমাকে দেখিয়া মনে করিলেন জটার কাছে ফাঁকি নাই। ভাবিলেন, যতগুলি টাকা গুণে লইয়াছি, জটা সব দেখিয়াছে—সব মনে মনে গণিয়াছে। সহাস্য বদনে আমায় কহিলেন "ক্যা লেড়কা বহুত রোজ সে মুলাকাত নাহি।" আমি বিনাবাক্যে একটি সেলাম করিলাম। দারগা সাহেব নিকটে আসিয়া চাপকানের নীচে সামনের জেবে হাত দিলেন, ঝনাত করিয়া উঠিল, তিনি যেন শিহরিয়া উঠিলেন, আবার বড় সাবধানে একটি টাকা বাহির করিয়া গ্রামের ছেলেদিগকে মেঠাই খাইতে দিলেন, গ্রামস্থ সকলে সন্তুষ্ট হইল—একটি ঘুসের উপর ঘুস চড়িল।

দারগা সাহেব অশ্বারোহণে উদ্যত। এমন সময় রঘুবাবের একটি নূতন নালিশ উপস্থিত হইল, সে হঠাৎ কহিয়া উঠিল, "দারগা সাহেব হুজুর। আমার বিচার হল না ধর্ম্মাবতার।"

দা। ঘোঁড়া চড়িতে পেছু ডাকিলি।

হিতে বিপরীত, দারগা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "হারামজাদা—পাঁচ রূপেয়া জরিমানা।" রঘু কহিল "জরিমানা করুন, মেরে ফেলুন, কেটে ফেলুন, আজ রঘু হুজুরের অনুগত, পদানত—ও প্রভু! পিঠে চিহ্ন দেখুন—জায়গা নাই—গন্ধর্ব্ব উড়ে গেছে।"

রঘুর পৃষ্ঠদেশের বস্ত্র উত্তোলন করিয়া, লাঠি ও বেতের দাগের উপর দাগ দেখাইল। "ও দাগ কিসে হল?" এই কথাগুলি দারগা কহিতে না কহিতে রঘুবাব নয়নজলে ভাসিয়া গেল। কাঁদ কাঁদ অর্দ্ধোচ্চারিত কথায় কহিল "মেরে গেছি কর্ত্তা।" আবার কহিতে কহিতে ভূমে পতিত হইল।

গজানন এই সময়ে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত, "ওরে-রে রঘুরে! ছ্যা! —কান্দিস্ না—সকল কথা বল, এবার সিংহের পোয়েদের—শ্রাদ্ধ হবে—হবেই হবে—করবই করব।" অমনি বাম হস্তের মুষ্টিতে দক্ষিণ হস্তে দুই তিনটী চপেটাঘাত করিলেন। গজাননের কথায় দারগা সাহেব উঠেন, বসেন, তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন; রঘুবাবের অভিযোগ আরম্ভ হইল, আবার কাছারী গরম হইল। রঘুবাব আরম্ভ করিল "হুজুর চড়, চাপড়, কিল, গড়াবি, ঘাড়ধাক্কা, মারপিট, গুতাগুতি, লাঠালাঠীর কিছু বাঁকি নাই।" বলিয়াই আবার রোদন আরম্ভ করিল।

গজানন কহিলেন, "রঘু এতদ্রূপ বলবান্ না হইলে বোধ হয় মারা পড়িত। ও ফেরার ছিল, মনে মনে আপনাকে দোষী না জানিলে একাই দশ গ্রামের

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গুরুতর মোকদ্দমা

দারগা সাহেব থানা অভিমুখী। তাঁহার ঘোটক-পৃষ্ঠে লাল্ রঙ্গের পায়জামা চড়িয়াছে, গলায় ঘুঙ্গুরের মালা ঝুলিতেছে, তার উপর নীল সূতে জরি জড়ান দুটি চাক্‌চিক্যমান পৈচ, কর্ণদ্বয়ের কিঞ্চিৎ নিম্নে গলদেশে শোভমান। অশ্বের অগ্রপদদ্বয়ের কিঞ্চিৎ উপরে আদুরে ছেলের সজ্জিত বক্ষদেশের মত রৌপ্য-নির্ম্মিত দ্বাদশটি তক্তি-মালা সুশোভিত নোক্তা ও খলিন রজ্জু আবার আর এক প্রকার সিন্দুরের রঙ্গের মুলতানী বনাতে জড়িত। উভয় কর্ণের পাশে নোক্তার কোণে দুটী রূপার চাঁদ ও নোক্তার উপরিভাগে মধ্যদেশ হইতে অশ্বের অক্ষিদ্বয়ের কিঞ্চিৎ নিম্নতলে একটী উজ্জ্বল জরির তবক ও জরির ফুল ঝুলিতেছে। গোল, স্থূল, তাজি ঘোড়া যথার্থই গাজি মরদ সাজিয়াছে। বাগডোর সহিস ধরিয়া রহিয়াছে—কিন্তু অশ্বটী অস্থির, ঘুরিতেছে নাচিতেছে, হ্রেষা রবে হাসা ঘোড়া সকলকে জাগরিত রাখিয়াছে, আজ পাড়ার ছেলের নিদ্রা নাই, একটী যেমন তেমন তামাসা মজুদ থাকিলে কি ছেলেরা সুস্থির থাকে? আমি আপনার অনুচরগণকে ঘর হইতে, ঘাট হইতে, পাঠশালার কানাচ হইতে ইসারা করিয়া "দারগার ঘোড়া দেখ্‌বি" বলিয়া একত্রিত করিয়াছি। ঘোড়াটি চেঁ চেঁ করিলে এক একটী ছেলে চেঁ চেঁ করিতেছে। দারগার ভয় প্রবল, তবু কেহ কেহ সুগুপ্তস্বরে "ঘোঁড়া মুখে নাড়া" কেহ "ঘোঁড়া বাগ্‌না পাড়া—নাকে দড়ি" কহিয়া কপচাইতেছে। আবার কেহ বচন সংশোধন করিয়া দিতেছে—

"এ ঘোঁড়া তোর নাকে দড়া
নিয়ে যাব বাগনাপাড়া।"

এমন সময় দারগা সাহেব গোলাবাটীর বৈঠক হইতে চাবুক হস্তে বহির্গত হইলেন, তাঁহার বৃহৎ শ্মশ্রু দর্শনে অনেক ছেলে বৃক্ষের অন্তরালে

আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, দুই একটী শিশু কান্দিয়া হাত তুলিয়া ভয়ে অপরিচিত জনের কোলে চড়িলেন, কিন্তু গোলাম সবদার সাহেব আমার পুরাতন বন্ধু, আমাকে দেখিয়া মনে করিলেন জটার কাছে ফাঁকি নাই। ভাবিলেন, যতগুলি টাকা গুণে লইয়াছি, জটা সব দেখিয়াছে—সব মনে মনে গণিয়াছে। সহাস্য বদনে আমায় কহিলেন "ক্যা লেড়কা বহুত রোজ সে মুলাকাত নাহি।" আমি বিনাবাক্যে একটি সেলাম করিলাম। দারগা সাহেব নিকটে আসিয়া চাপকানের নীচে সামনের জেবে হাত দিলেন, ঝনাত করিয়া উঠিল, তিনি যেন শিহরিয়া উঠিলেন, আবার বড় সাবধানে একটি টাকা বাহির করিয়া গ্রামের ছেলেদিগকে মেঠাই খাইতে দিলেন, গ্রামস্থ সকলে সন্তুষ্ট হইল—একটি ঘুসের উপর ঘুস চড়িল।

দারগা সাহেব অশ্বারোহণে উদ্যত। এমন সময় রঘুবীরের একটি নূতন নালিশ উপস্থিত হইল, সে হঠাৎ কহিয়া উঠিল, "দারগা সাহেব হুজুর! আমার বিচার হল না ধর্ম্মাবতার।"

দা। ঘোঁড়া চড়িতে পেছু ডাকিলি।

হিতে বিপরীত, দারগা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "হারামজাদা—পাঁচ রূপেয়া জরিমানা।" রঘু কহিল "জরিমানা করুন, মেরে ফেলুন, কেটে ফেলুন, আজ রঘু হজুরের অনুগত, পদানত—হে প্রভু! পিঠে চিহ্ন দেখুন—জায়গা নাই—গন্ধর্ব্ব উড়ে গেছে।"

রঘুবীর পৃষ্ঠদেশের বস্ত্র উত্তোলন করিয়া, লাঠি ও বেতের দাগের উপর দাগ দেখাইল। "এত দাগ কিসে হল?" এই কথাগুলি দারগা কহিতে না কহিতে রঘুবীর নয়নজলে ভাসিয়া গেল। কাঁদ কাঁদ অর্দ্ধোচ্চারিত কথায় কহিল "মোরে গেছি কর্ত্তা!" আবার কহিতে কহিতে ভূমে পতিত হইল।

গজানন এই সময়ে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত, "ওরে-রে রঘুরে! ছ্যা! —কান্দিস্ না—সকল কথা বল, এবার সিংহের পোয়েদের—শ্রাদ্ধ হবে—হবেই হবে—করবই করব।" অমনি বাম হস্তের মুষ্টিতে দক্ষিণ হস্তে দুই তিনটী চপেটাঘাত করিলেন। গজাননের কথায় দারগা সাহেব উঠেন, বসেন, তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন; রঘুবীরের অভিযোগ আরম্ভ হইল, আবার কাছারী গরম হইল। রঘুবীর আরম্ভ করিল "হজুর চড়, চাপড়, কিল, গড়াবি, ঘাড়ধাক্কা, মারপিট, গুতাগুতি, লাঠালাঠীর কিছু বাঁকি নাই।" বলিয়াই আবার রোদন আরম্ভ করিল।

গজানন কহিলেন, "রঘু এতদ্রূপ বলবান্ না হইলে বোধ হয় মারা পড়িত। ও ফেরার ছিল, মনে মনে আপনাকে দোষী না জানিলে একাই দশ গ্রামের

লোক ভাগাত।" আবার রঘুর দিকে দেখিয়া কহিলেন, "রহ—রহ তোর হয়ে আমি বলিতেছি—বল্‌ছি, তুই থাম—থামরে থাম।"

"যখন আত্মহত্যার মোকর্দ্দমা—"

রঘু। আমার আত্মহত্যা হওয়া ছিল ভাল—বাপ! এত অপমান!

গজা। থামরে রঘু থাম—কথা কৈতে দিবি, না গোলযোগ করবি? দারগা সাহেব! যখন আত্মহত্যার উপযোগিতা জন্য, আপনি রঘুবীরকে গ্রেপ্তার করিতে হুকুম দেন, সে ফেরার হইয়া গ্রামে ফিরিতেছিল। মাঠে মাঠে—রৌদ্রে রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া শান্তিপুরের সিংহ বাবুদের বাটীর পশ্চাদ্ভাগে পুষ্করিণীর বান্ধাঘাটে শ্রান্তি দূর করিতে গিয়াছিল—ওর গ্রহ!

রঘু অংসভাগ কুঞ্চিত করিয়া কহিল "না গেলেই ভাল হত—বাপ!"

গজানন কহিলেন, "থাম—থামরে থাম—তার পর আপন বস্ত্রে পাথেয় খাদ্য বান্ধিয়া রঘু ঘাটে হাত পা ধুইতে অগ্রসর হইল, তখন ঘাটে সেই সিংহ বাবুদের একটিমাত্র কিশোরী কন্যা স্নান করিতেছিলেন—"

রঘু। সেই কাল, সেই কন্যাই কাল—

গ। এদিকে রঘু রৌদ্রতাপে তপ্ত হইয়া জলে নামিতেছে, যত নামে তত অঙ্গ শীতল বোধ হয়, আরো জলে নামে—ও দিকে কন্যা ভীতা হইয়া জলের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে গভীর জলে পতিত হইয়া রোদন করিয়া উঠিল। নিকটে ক্ষেত্রে কতকগুলি কৃষী ঐ ক্রন্দন শুনিয়া ঘাটে উপস্থিত হইল, মনে করিল কন্যা ঘোর বিপদে পতিত—মনে করিল রঘুবীর জলতৃষ্ণাচ্ছলে দস্যু কার্য্যে প্রবৃত্ত, কারণ কন্যা সালঙ্কারা ছিলেন।

রঘু। দস্যু! চুরি! আমার চৌদ্দ পুরুষ কখন কাহার পাতকেটে ভাত খায় না, তাতে মা জননীর অঙ্গ।

গজা। থাম্—পরে সিংহবাবু স্বয়ং লাঠিয়ালসহ ঘাটে উপস্থিত হইয়া রঘুকে বন্দী করিলেন—তার পর যা হইল উহার সর্ব্বাঙ্গে বর্ত্তমান। ওর ঘোর বিপদ মহাশয়!

রঘু। বিপদের উপর বিপদ বলুন—বাপ! সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা!

দারগা সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া কেবল মাত্র কহিলেন "ও খফিফ মারপিট—"

রঘু। এ ছোল—দাগ নহে—ছোল মার কি আমরা মারপিট বলি—ইহাতে রক্তপাত হয়েছিল, জিব বেরিয়ে পড়েছিল, অজ্ঞান হয়েছিলাম।

দা। হাঁ, বেহুঁস হইলে আলবৎ মোকর্দ্দমা সঙ্গীন হইত, অপরাধীকে এই ক্ষণেই ধৃত করিতাম।

গজানন কহিলেন "তবে নিগূঢ় কথা সব বলি, ওরে যাও সকলে বাহিরে যাও"—হুকুম হইবামাত্র সকলে গোলাবাটীর বহির্দ্দেশে আসিল, কেবল আমি নিকটস্থ একটী পাল্কীর ভিতর বসিয়া বিনা সন্দেহে সকল মনোযোগ দিয়া শুনিতে থাকিলাম--"

গজানন হস্ত উত্তোলন করিয়া পঞ্চঅঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ক্ষীণস্বরে দারগা সাহেবকে কহিলেন "বড়—কম নহে—টাকা!—এক চাপড় টাকা! সিংহ বাবুদের চরিত্র আপনি কি জ্ঞাত নহেন? দাঙ্গা করিয়া লাঠী চালাইয়া, সড়কি মারিয়া সেই বাদশাহী জায়গীর গ্রাম সমস্ত বাজেয়াপ্তির সময় আমাদের কি না কষ্ট দিয়েছে? ভুলে গেলেন—হে মহাশয় অল্পদিনে সব ভুলিলেন! একটা পাক লাগান—দুটা মোচড় দিন—অমনি অমনি যাবে, ওরা যে এ সরকারের চির শত্রু—চালান না করিলে আমরা মহাশয়কে ছাড়িব না। কৈ? আপনি কেমন আমাদের কথা ভেলা করে যাবেন যান্ ত?"

রঘু এই সকল কথা শুনিয়া কহিয়া উঠিল, "যেমন সওয়াল করিতে হয় তা দেওয়ানজী করলেন।" ও নিম্নস্বরে গান করিয়া কহিল

"রাঙ্গা বরণ, দুখানি চরণ,
হৃদে লব জোব করিয়া!"

গজানন অমনি কহিয়া উঠিলেন, "রঘু মারের আঘাতে প্রায় পাগল হইয়াছে। বলি বেহুঁস? তা সব হবে—ও বেহুঁসই ত ছিল কেবল অপার্য্যমাণে কি করে কথা না কহিলে চলে না, এজন্যই রঘু—আমি অনেক বলায়—বসিয়াছে নচেৎ ও ত শুইয়াই ছিল—ঐ দেখুন" (উচ্চস্বরে) "আবার শুইল—"

বলিতে বলিতে রঘু ভূমিশয্যাগত, অচেতন চোখের গোলা উল্‌টাইয়া পড়িল। গজানন দারগা উভয়ে তাহার নিকট আগত—স্নিগ্ধ জল আসিল, হিমসাগর তৈল আসিল, রঘুবীর অজ্ঞান, দাঁতে খিল লাগিয়াছে—বেতাব হইয়াছে। আবার মুহূর্ত্তে লোক জমা হইল, অনেক কষ্টে রঘু ঈষৎ চাহিল, চক্ষু মেলিল কিন্তু বাক্য রোধ হইয়াছে—সর্ব্বাঙ্গ গুরুতর ব্যথায় কাতর—আর মোকর্দ্দমাও গুরুতর হইবার বাঁকি নাই, সিংহদের ভিটায় ঘুঘু চরাইবার বাঁকি নাই! দারগা সাহেব খাটিয়া আনিতে হুকুম দিলেন, রঘুবীর সত্য সত্য খাটিয়াশায়ী হইল, সকলে কহিল এবার লাস চালান যাইবে, একে লোকের ভিড়ে পাল্কী অন্ধকার, তাহাতে লাসের নাম, তাহাতে হঠাৎ দেখিলাম, একটী কাল কুক্কুরের আঁখিদ্বয় শিবিকার ছাউনিতলে জ্বলিতেছে, শশব্যস্তে শিবিকার দ্বার খুলিয়া বাহির হইলাম। দারগা সাহেব কহিলেন, "এ কোথায় ছিল।" মনে করিলেন জটাধারী আবার সব কথা শুনিয়াছে।

মুহূর্ত্তে বাহকগণ উপস্থিত হইল, রঘুবীর খাটসহ তাহাদের স্কন্ধে বাহিত হইল—কেহ কেহ "হরিবোল" দিয়া উঠিল, রঘুবীর একবার বেতাব অবস্থা ভুলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল "সমুন্দির পো ! আমি কি যথার্থই মরিয়াছি ?" গজানন কহিলেন, "বেদনা মস্তকে চড়িয়াছে প্রলাপ দেখিতেছে।" এ দেওয়ানজীর কৃত প্রলাপ !

দাবগা সাহেব মনে করিলেন তাঁহার এক কর্ম্মে দুই কর্ম্ম সিদ্ধ হইল। লোকে জানিল রঘুবীর মারপিটের মোকর্দ্দমায় বাদী হইয়া চলিতেছে ; দারগা তাহার সহিত একটী আত্মহত্যাব সাহায্যের অপবাধী বলিয়া চালান গোপনে লিখিয়া দিলেন, আপনাব শাফায় ও নিজ বৈবাহিক নাজির সাহেবের পূজার পন্থা করিয়া দিলেন। গজাননের একবুদ্ধি ত দারগাব শত বুদ্ধি ; কিন্তু দারগার মনের কথা তাঁহার মনই জানিল। এদিকে আবার সিংহ বাবুদের কন্যাটিকে হাজির করিবার জন্য একটী হুকুম নামা লিখা হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তোমরা কেউ সাহেব দেখেছ ?

একদিন দুই প্রহব দুইটাব সময়, লাউসেন দত্ত গুরুমহাশয় আহাবান্তে পাঠশালাব দেওয়ালে ঠেস দিয়া ঢুলিতেছেন, উর্দ্ধকর্নিবাবণী মলমলেব এক পাট্টা মিহি পাগড়ি কপালের উপর একটি গিব দিয়া বান্ধিয়াছেন ; গিরাব ফুঁপি ও মাথার ঋজু পলিত কেশ একত্র হইয়া টাকশালাব শোভা ধাবণ কবিয়াছে, মাথাটী বক্র হইয়া বক্ষঃস্থলেব দিকে—বাঁশ ঝাড়েব পুচ্ছময় অগ্রভাগেব ন্যায় নত হইয়া আসিতেছে ; দক্ষিণ হস্তের মুষ্টিতে বেত গাছটি তবু ধবা বহিয়াছে। তখন আহারান্তে সকল বালক লিখিতে উপস্থিত হয় নাই, গঙ্গাধর সমুপযুক্ত কয়েকটি সঙ্গী লইয়া মুখে "মহামহিম" উচ্চাবণ কবিয়া খতেব মুসবিদা হাঁকিতেছেন : তাতে পাঠশালের দেওয়ালে একটী হবিণের আকৃতি আঁকিতেছেন। নিদ্রার প্রাবম্ভে গুরুমহাশয়ও মধ্যে মধ্যে আমাদেব স্ববে সুস্বব মিশাইয়া "হা হয়ে দাঁড়ি হস্তিকার" কহিতে কহিতে নাক ডাকাইয়া ফেলিলেন। এমন সময় বেণেদের গোপাল আসিয়া আমার কাণে কাণে কহিল, "ওবে সাহেব দেখেচিস্ ?" সাহেব দেখিতে ব্যগ্র হইলাম। কিন্তু আমি বিলক্ষণ জানিতাম দত্তজ মহাশয় কখন কখন কপটনিদ্রা যান ও আমরা কি করি ঈষৎ চাহিয়া দেখেন। সময়ে সময়ে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় আলস্যপ্রিয় বালকের পিঠে বেত্রাঘাতও বর্ষণ করেন, অতএব গুরুমহাশয় প্রকৃতরূপে নিদ্রিত কি না তাহা পাঠশালার বাহির হইবার পূর্ব্বে নিশ্চয় জানা আবশ্যক।

ভঙ্গী করিয়া মহাশয়ের নিকট যাইয়া বসিলাম, নিম্নস্বরে "মশয় মশয়" বলিয়া ডাকিলাম ও অবশেষে বেতের অগ্রভাগ ধরিয়া ধীরে একবার টানিলাম, মহাশয় তাহাতেও চমকাইলেন না, জানিলাম তিনি যথার্থই নিদ্রিত। সঙ্গিগণকে ইঙ্গিত করিয়া এক লম্ফে পাঠশালার বহির্দ্দেশে উপস্থিত হইলাম; পরক্ষণেই দেখিলাম দত্তজ মহাশয় কহিতেছেন, "কে ছেলেটা আমার বেত ধরিয়া টানিল রে? নষ্ট জটা—আমার সঙ্গেও ব্যঙ্গ?" এই কথা কহিতে কহিতে বেত হস্তে আমাদের পশ্চাতে ধাবমান হইলেন, অগ্নিমুখে পতঙ্গেব ন্যায় এই সময়ে পাঠশালায় প্রত্যাগমন করা অবিধেয় মনে করিয়া অগ্রভাগে আরও দ্বিগুণ ধাবমান হইলাম, কিয়দ্দূর আসিয়া মহাশয়ও শুনিলেন "সাহেব আসিয়াছে।" তখন আমরা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসি নাই এই অভিমানেই পূর্ব্ব ক্রোধ ভুলিয়া তিনিও সাহেব দেখিতে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া লম্বা পদদ্বয় চালাইয়া দিলেন। সাহেব দেখিতে গ্রাম সমস্ত এত ব্যস্ত কেন? ইহার কারণ আছে; তখন পল্লীগ্রামে সাহেবের প্রায় আগমন ছিল না। এখন যেমন বায় সাহেব, পল সাহেব, কব সাহেব, দে সাহেব, দত্ত সাহেব, চটবজি, বানরজি, পালিত সাহেবদেব কৃষ্ণাঙ্গে কালকোট পেন্‌টলুনেব বাহার দেখা যায় সে সময়ে এ শোভা কোথাও দেখা যাইত না, কেবল শ্যামাঙ্গ সাহেবের মধ্যে মহাত্মা রাজা বামমোহন বায়েব সহিত বিলাতগামী এক রামহরি মালী সাহেবকে সাহেবী পরিচ্ছদে ভ্রমণ কবিতে দেখা যাইত ও কোন মহারাজাব বিখ্যাত উদ্যানে অধীনস্থ মালী সকলকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কবিয়া "টুমি নিটাণ্ট ঠক্ আডমি" বলিয়া ভৎর্সনা কবিতে শুনিতাম। এখন রামহবি সাহেবেব নাম ডুবিয়া গিয়াছে, পুঞ্জ পুঞ্জ রামহরি সাহেব দেখা দিয়াছেন। সাহেব দেখিতে কৌতুকেরও হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু যে সময় হইতে আমাব এই বৃত্তান্ত উদ্ধৃত হইতেছে তখন প্রশস্ত দেশবিভাগের মধ্যে দুই তিনটি শ্বেত কলেবর সাহেব দেখা যাইত। আমরা শুনিলাম ইহাদেরই মধ্যে একটী সাহেবের আশুতোষ বাবুর বৈঠকখানায় আবির্ভাব হইয়াছে। বৈঠক-খানার বৃহৎ কক্ষে প্রবেশ কবিয়া দেখিলাম বড় ভিড়, দুই পার্শ্বে দেওয়ালে দুটি বৃহৎ আরসি আলম্বিত থাকায় একজন লোকের দশ দশ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম, একা গুরুমহাশয় দশ অবতার দেখিয়া ভীত হইলাম; যাঁহার এক সংহার মূর্ত্তিতেই রক্ষা নাই তাঁর দশমূর্ত্তি! কিন্তু এই মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হয় দত্তজা মহাশয়ের বিশেষ স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি হইল, আপনার বালকের দলবৃদ্ধিতে রাজত্ববৃদ্ধি দেখিলেন ও ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি শীতল করিয়া এখন আমায় সম্মুখে রাখিয়া দাঁড়াইলেন; তখন আমাদের সাহেব দর্শন হইল, তাঁহার আয়ত লোচনে নীলপদ্মের আভা প্রশস্ত ললাট ও প্রকাণ্ড মস্তক দেখিয়া বোধ হইল ইনি রাজপুরুষ মধ্যে যথার্থই অগ্রগণ্য। ইতিমধ্যে সাহেব একবার চুরুটের পাইপে টান দিলেন, অগ্নির আভায় তাঁহার আঁখি, মুখ

রাঙ্গা শ্মশ্রুদল ও প্রকাণ্ড বক্ষবস্ত্র প্রভাশালী হইল, বোধ হইল যেন একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র ঝাঁপ দিতে উদ্যত। তাঁহার পার্শ্বে আর একটি আসনে আশুতোষ বাবু মহাশয় উপবিষ্ট, একজন শ্বেত কলেবর একজন গৌরাঙ্গ, কিন্তু গঠন প্রত্যঙ্গ দেখিলে বোধ হয় উভয়ে এক শ্রেণীস্থ লোক—উভয়েই প্রশস্ত অঙ্গশালী গম্ভীবমূর্ত্তি ভক্তির আস্পদ। উভয়ে নানা বিষয়েব কথা হইল ; পত্তনী লইবেন, নীলকুটি খুলিবেন, বেসমের ও লায়ের কারবার আরম্ভ হইবে। আশুতোষ বাবুর নিকট কেবল বিংশতি সহস্র মুদ্রা ঋণের প্রার্থনা রাখেন, তাহা দিতেও আশুতোষ বাবু সম্মত হইলেন, বিষয় কার্য্য প্রায় শেষ হইল। আমি জানিলাম ইনিই বাবু মহাশয়ের পরম বন্ধু ডাক্তার ইটুযাল সাহেব, কথা কহিতে কহিতে যখনই সাহেবের চক্ষু আমাদের দিকে পড়িতেছে অমনি গুরুমহাশয় দুই এক পদ পশ্চাতে গমন করিয়া আমার পৃষ্ঠভাগে চিমটি কাটিয়া কহিতেছেন "চুপ কর, পালিয়ে আয়।" কিন্তু আমি সাহেবের একটি অভ্যাস দেখিয়া বিস্মিত হইতেছিলাম, রুমাল লইয়া তিনি দন্তপাটি হইতে এক একটি ক্ষুদ্র দ্রব্য বাহিব কবিতেছেন পুনরায় বদনে নিক্ষেপ করিতেছেন। গুরুমহাশয় আমাব কাণে কাণে কহিলেন "এ কি ? মাংস খণ্ড ?" আমি কহিলাম "চুপ করুন, সাহেবেব ছোট হাজিরি হইতেছে।" দত্তজ কহিলেন "ম্লেচ্ছ ! যাঁহারা সাহেব সাজেন তাঁহাবাও এইরূপ ছোট হাজিরি কবেন।" পরক্ষণেই গুরুমহাশয় ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ক্রমে কার্য্য শেষ করিয়া ২০ হাজার টাকার একটী হুণ্ডি পকেটে ভরিয়া অগণিত ধন্যবাদ দিতে দিতে সাহেব বাহাদুর দাঁড়াইলেন ও হস্ত প্রসারিয়া বাবু মহাশয়েব করাবলম্বন করিয়া কহিলেন নগরে গমন হইলে আবার সাক্ষাৎ হইবেক। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহণ করিলেন, চারিদিকে সেলামের ধুম পড়িয়া গেল।

আবার আমার দিকে আশুতোষ বাবু চাহিয়া কহিলেন 'কি হে জটাধারী, সাহেবের ইংরেজি কথা বুঝিতে পারিলে ?" আমি কহিলাম "মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া, বুঝাইলে পারি।" দয়াব শরীব আর্দ্র হইল, বাবু মহাশয় হাসিয়া কহিলেন বল "রিং দি বেল" "বাজাও ঘণ্টা" আবার কহিলেন "সট দি বক্স" আমি কহিলাম "সট দি বক্সো—" হল না বক্সো নয়—বক্স দুটি পাঠই আমার সত্বর অভ্যাস হইল, তখন বৃদ্ধ ভৈরব ভৃত্যকে ডাকিয়া একটি বৃহৎ আলমারী খুলিতে অনুমতি দিলেন। ভৈরব আলমারির নিকট গেল, কহিল "আলমারি খুলিল না, কপাট ঝাড়ের ঝালরে ঠেকিতেছে।" আমাদের সকল বন্দবস্তই এইরূপ সন্তোষজনক ! কোন মতে কপাট কতক দূর খুলিয়া একটি দপ্তর বাহির করিলেক, তাহাতে বাঙ্গালা, ফারসী ও ইংরেজি কতকগুলি পুরাতন পুস্তক দেখিলাম, এক একটী ফারসী পুস্তক এক এক হাত পরিমাণ, মনে করিলাম এসব কবে পড়িব। বাবু

মহাশয় একখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পুস্তক লইয়া আমায় দিলেন ও কহিলেন “এটি মার্চ্চস্ ইস্পেলিং। ভায়া! যে সময় আসিতেছে ইংরেজি বিদ্যা উপার্জ্জন না করিলে আর বড়লোক হইবার উপায় থাকিবে না।” আশুতোষ বাবু বিদ্যাব বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার এই কথাগুলি এখন ভবিষ্যৎ বচন স্বরূপ জ্ঞান হয়; মনে হয় এক জন প্রকৃত হিতৈষী দূরদর্শী পুরুষ উপযুক্ত সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যয়ে যত্নে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন হয় ও ইংরেজি শিক্ষার আমার হাতেখড়ি পড়ে।

পাঠকেরা তুলনায় সমালোচনা বড় ভালবাসেন। সেইজন্য অদ্য আমরা কালিদাস ও শেক্ষপীয়র এই দুইজন বড় বড় কবিকে তুলনায় সমালোচনা করিব স্থির করিয়াছি। ছোট খাট বটতলার ও গ্রবষ্ট্রীটের বহুসংখ্যক কবি থাকিতে এত বড় দুইজন কবির উপর হস্তক্ষেপ করা কেন? একথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে বলিব "মারি ত হাতি লুটি ত ভাণ্ডার", এদের দুজনের একজনেরও ভাল করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে পারিলে সেই সঙ্গে আমারও কিছু হইতে পারে এই এক ভরসা। আমরা কালিদাস ও শেক্ষপীয়র মধ্যে কে কেমন লিখিয়াছেন দেখাইতে চেষ্টা করিব। কোন একটা বিষয় লইয়া দেখিব কে জিতিয়াছেন কে হারিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের দুজনের মধ্যে কে বড় কে ছোট, কাহার কবিত্বশক্তি অধিক, কাহার অল্প, তাহা নির্ণয় করা বড় শক্ত; বিশেষতঃ আমার মত ক্ষুদ্রজীবী লোকের পক্ষে। যাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির পার নাই তাঁহারাই হঠাৎ বলিতে পারেন শেক্ষপীয়র—ছ্যা—কালিদাসের ছাঁইচ পর্য্যন্ত মাড়াইতে পারে না।

কালিদাস একজন সুনিপুণ চিত্রকর। রঙ ফলাইতে অদ্বিতীয়। সেড দিবার ক্ষমতাও খুব আছে। সকলের অপেক্ষা তাহার বাহাদুরী সাজানতে আর বাছিয়া লওয়াতে। কোন্ কোন্ জিনিস্ বাছিয়া লইতে হইবে আর কেমন করিয়া বসাইলে সে সব গুলি ভাল করিয়া খুলিবে এই দুটী বুঝিতে তাঁহার মত ওস্তাদ মিলিয়া উঠা ভার। তিনি চিত্রকরের চক্ষে জগৎ দেখিতেন ও কবির কলমে লিখিতেন। প্রকৃতিতে যা কিছু আছে সবই সুন্দর অথবা লিপিচাতুর্য্যে সব সুন্দর করিয়া তুলিব এ ভাব তাঁহার মনে কখন উদয় হয় নাই। তিনি স্বভাবশোভা কাহাকে বলে জানিতেন, চিনিতেন, এবং সেগুলি বাছিয়া লইতে ও সাজাইতে খুব মজবুদ ছিলেন।

শেক্ষপীয়রের পক্ষে বাছিয়া লইবার কিছু দরকার ছিল না। তাঁহার দুই চক্ষে যাহাই পড়িত, তাহাই লইতেন, কিন্তু কাজের সময় সে গুলিকে ছাঁটিয়া

পরিষ্কার করিয়া নিজব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতেন। সৌন্দর্য্য বাছিয়া লইবার তাঁহার দরকার ছিল না, যেহেতু অসুন্দরকে সুন্দর করিবার ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। পরের লেখা ছাই ভস্ম পরিষ্কার করিয়া তিনি শিক্ষানবিসি সাঙ্গ করেন সুতরাং পরের জিনিস কিরূপে আপন করিতে হয় সেটুকু তাঁহার খুব অভ্যস্ত ছিল। অসুন্দর বস্তুর উপর কালিদাসের এমনি বিতৃষ্ণা যে তাঁহার সমস্ত গ্রন্থমধ্যে কোথাও পাপের বর্ণনা বা কোন বীভৎস রসের বর্ণনা নাই। কিন্তু শেক্ষপীয়রের পাপের ছবিই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক উজ্জ্বল বর্ণে বঞ্জিত। আমবা কালিদাসে শ্মশান বর্ণনা পাই না, নরক বর্ণনা পাই না, ম্যাক্‌বেথ পাই না, ইয়াগোও পাই না। কিন্তু শেক্ষপীয়রে অদ্ভুত পাপ সৃষ্টি কালিবানকে প্রশংসা না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। কালিদাস হিমালয় বর্ণনা করিতে গিয়া কোথায় হিমালয়েব প্রকাণ্ডতা দেখাইবেন, প্রকাণ্ড বস্তুর বর্ণনে পাঠকেব শরীর কণ্টকিত কবিবেন তাহা না করিয়া হিমালয়ে অপ্সবাগণেব মতিভ্রম দেখাইতে বসিলেন ; সূর্য্যকিরণ বক্র করিয়া পুষ্করিণীব পদ্ম ফুটাইতে বসিলেন ; আরো কত সুন্দর বস্তু দেখাইয়া হিমালয়কে বিলাসকাননবৎ করিয়া তুলিলেন। কালিদাসেব এইরূপ উৎকট সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা হেতুই তাঁহাব পুস্তকাবলীতে এত বমণীয বর্ণনা দৃষ্ট হয়, এই জন্যই তিনি কটমট ছন্দঃ সূত্র লিখিঁতে গিয়াও সেগুলিকে প্রিয়া বিশেষণ পদ প্রয়োগে ললিত করিয়া তুলিয়াছেন।

পৃথিবীতে বর্ণনীয় জিনিস দুই—অন্তর্জ্জগৎ—মনুষ্যের মন ; আব বাহ্যজগৎ। নির্ম্মল আকাশ, সুদূরবিস্তৃত অবণ্যশ্রেণী, মেঘমালাবৎ প্রতীয়মান পর্ব্বতশ্রেণী ইত্যাদি। কালিদাসের বই পড়িলে বোধ হয় এই দুইএর মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর সবই তাঁহার একচেটে। মনুষ্যজাতির মধ্যে সুন্দর রমণীগণ ; রমণীহৃদয়ে পবিত্র প্রণয়, পরম সুন্দর। কালিদাস সেই প্রণয়ই নানাপ্রকারে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। হৃদয়ের অন্যান্য প্রবৃত্তিব মধ্যে যেগুলিতে লোকের মন আকর্ষণ করে সেগুলি সব তাঁহার পুস্তকে আছে। বাপ ছেলেকে কোলে লইয়া চুম্বন করিতেছে, বাপ বনে যাবেন শুনিয়া ছেলে কাঁদিয়া আকুল হইতেছে, মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাইবে বুড়া বাপ কাঁদিতেছে, প্রিয়তমার অকালমৃত্যুতে পতি শোকে অভিভূত হইয়াছে, স্বামীর অকালমৃত্যুতে নববিধবা মোহপরায়ণ হইয়া পড়িয়া আছে, প্রিয়ার হঠাৎ বিরহে প্রিয় উন্মত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে আর যাহাকে পাইতেছে প্রিয়ার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছে ; কোথাও লতা কোথাও ময়ূরকে প্রিয়া বোধে আলিঙ্গন করিতেছে—এ সব মনুষ্যহৃদয়েব মোহিনীময় ভাব। এ ভাবের প্রকৃত ওস্তাদ কালিদাস। কিন্তু যেখানে দশ পনরটী পরস্পর বিরোধী ভাব যুগপৎ উদয় হইয়া অন্তরাকাশকে অন্ধকার করে, যেখানে হৃদয়-ক্ষেত্রে যুদ্ধ

উপস্থিত, যেখানে ভাবসন্ধি ভাবশবল হইবার কথা সেখানে কালিদাস আসিবেন না, সেখানে শেক্ষপীয়র ভিন্ন গতি নাই। একদিকে দুর্জ্জয় দুরাকাঙ্ক্ষা রাশি রাশি পাপকার্য্যে রত হইতে বলিতেছে, আর একদিকে স্নেহ দয়া কৃতজ্ঞতা বাধা দিতেছে ; একদিকে পাপের স্মৃতি অনুতাপের ভরে হৃদয় ভারাক্রান্ত করিতেছে, আর তখনই সেই পাপ ঢাকিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইতেছে, তখনি সে ভাব গোপনের জন্য কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া যেন সে নয়, এইরূপ দেখাইতে হইতেছে ;—এ সব হৃদ্বৃত্তির জটিলতা, মনুষ্যস্বভাবেব অস্থিরতা, পবস্পর বিরোধী ভাবসমূহের যুগপৎ বিকাশ, শেক্ষপীয়ব ভিন্ন আর কেহ পরিষ্কার করিয়া দেখাইতে পারেন নাই পাবিবেনও না। শেক্ষপীযর মানুষ সৃষ্টি করিতে পারেন। তুমি যেমন মানুষ চাও, শেক্ষপীয়র তেমনি মানুষ তোমায় দিবেন। তুমি শকুন্তলাব মত সরলা মুগ্ধহৃদয়া সামাজিক কুটিলতানভিজ্ঞা বালিকা চাও মিরন্দা দেশদিমোনা লও। পাকা গিন্নী ঘরকন্নায় মজপুত, ভাঙ্গে না, মোচকায় না, এমন মেয়ে চাও, আচ্ছা তোমাব জন্য ডেম কুইকলি আছে। পতিপবায়ণা পতিব্রতা যুবতী চাও পোর্সিয়া আছে ; জগৎ মোহিত কবিবার জন্য মায়াজাল ছড়াইয়া বসিয়া আছেন, যে জালে পা দিতেছে তাহাবই সর্ব্বনাশ করিতেছেন, এমন দুর্ব্বুদ্ধিশালিনী ভুবনমোহিনী চাও, ক্লিয়োপেট্রা আছে। দুরাকাঙ্ক্ষায় জর্জ্জবিতহৃদয়া, লোকের উপব আধিপত্য কবিবার ইচ্ছায় পাষাণবৎ দৃঢ়সংকল্পা, পুরুষকে পাপে প্রেরণ করিবার জন্য শয়তানরূপিণী পাপিষ্ঠা দেখিতে চাও লেডি ম্যাকবেথ আছে। দেখিবে এ গুলি সব মানুষ, অমন যে পাষাণহৃদযা ম্যাকবেথপত্নী, যে রাজ্যলোভে ক্রোড়স্থিত স্তন্যপায়ী আপন শিশুকে আছড়াইয়া মারিতে ক্ষুব্ধ হয় না, সেও স্ত্রীলোক। রাজার মুখ আপন পিতার মুখেব মত বোধ হওয়াতে স্বহস্তে রাজহত্যা করিতে পারিল না।

কালিদাস এরূপ মনুষ্য সৃষ্টি করিতে অক্ষম, তিনি মনুষ্যহৃদয়ের সুন্দব অংশ দেখাইতে পারেন। উদাহরণ—তিনি কণ্বমুনিকে শকুন্তলার ঠিক যাত্রার সময় বাহির করিলেন। যেহেতু কন্যা প্রেরণের সময়, পিতার কান্না বড়ই সুন্দর। সেটি দেখান হইল, অমনি কণ্বমুনি ডিস্‌মিস। কালিদাস তাঁহাকে একেবারে লুকাইয়া ফেলিলেন, আর বাহির করিলেন না। শকুন্তলার চিত্রটি পরম সুন্দর, এই জন্য আগা গোড়া শকুন্তলা চবিত্র আমরা পড়িতে পাই। ওরূপ মুগ্ধ বালিকার প্রথম প্রণয় সুন্দর। সেই প্রণয়ের অনুরোধে দারুণ কষ্ট হইলেও পিতা মাতা সমদুঃখসুখসখী চিরলালিত হরিণশিশু চিরবর্দ্ধিত নবমালিকা লতা ত্যাগ করিয়া যাওয়া সুন্দর। রাজা প্রত্যাখ্যান করিলে তাঁহাকে হাবা মেয়ের মত লুকাইবার চেষ্টা সুন্দর। সে সময়ে একটু রাগ (এ রাগে বাহানা নাই) সুন্দর। এত

অপমানের পর নিশ্চয় মিলনের আশা সুন্দর, কশ্যপ-তপোবনে দেখিবামাত্র সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া একেবারে পামর প্রণয়ীর হস্তে আত্মসমর্পণও সুন্দর। কালিদাস বড় কবি, এত সৌন্দর্য্য কে দেখাইতে পারে! আবার একটি সুন্দর মনুষ্যের চিত্র দেখিবে? বিক্রমোর্ব্বশী খোল। রাজার স্বভাবটী কেমন সুন্দর রাজা সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিয়া সূর্য্যলোক হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, হঠাৎ অপ্সরাদিগের আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল। রাজা শুনিলেন দৈত্যকেশরী অপ্সরা চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি কেশরীহস্ত হইতে উর্ব্বশীর উদ্ধার করিলেন। বীরত্বে যেমন মেয়েদের চিত্ত সহসা আকর্ষণ করে, এমন আর কিছুতেই নয়। রাজার বীরত্বে উর্ব্বশীর তাঁহার প্রতি অনুরাগ জন্মিল। ওরূপ অনুরাগ সুন্দর নয়? সুন্দরী অপ্সরা বিদ্যাধরীর অনুরাগ প্রায় নিষ্ফল হয় না। রাজারও মন কেমন হইয়া উঠিল, তিনি ক্রমে ধারিণীর প্রতি বীততৃষ্ণ হইলেন। কিন্তু ধারিণী তাঁহাকে অপমানের শেষ করিলেও তিনি ধারিণীকে একটী উচ্চ বাক্যও বলেন নাই। শেষ ধারিণী প্রিয়প্রসাধন ব্রত করিয়া চন্দ্র সূর্য্য দেবতা সাক্ষী করিয়া বলিল যে, যে অদ্যাবধি আমার স্বামীব প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইবে, আমি তাহাকে ভগিনীর মত দেখিব। কেমন এটী সুন্দব নয়?

উর্ব্বশীব সহিত বাজাব মিলনের কিছু দিন পরে হিমালয় পর্ব্বতের রম্য স্থান সকলে বিহার কবিবাব জন্য উভয়ে প্রস্থান করিলেন। সেখানে বসন্ত সময়ে পুষ্পবনমধ্যে নির্জ্জন প্রদেশে নির্ঝরিণীতটে সান্ধ্যসমীরে শিলাপট্টে পরস্পরের সহবাসে পবম সুখে কালযাপন করেন। একদিন উর্ব্বশী কার্ত্তিকের বাগানে উপস্থিত। কার্ত্তিক চিরকুমার, তাঁহার বাগানে স্ত্রীলোক গেলে পাছে দেবকার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে, এই জন্য শাপ ছিল স্ত্রীলোক সেখানে গেলেই লতা হইয়া যাইবে। উর্ব্বশী লতা হইয়া রহিলেন, রাজা তাঁহার বিরহে উন্মত্ত। মেঘ দেখিয়া ভাবিলেন বুঝি দৈত্য আবার উহাকে চুরি করিয়াছে। মেঘকে কতকগুলা গালাগালি দিলেন। মেঘ তাঁহার মাথার উপর জলধারা বর্ষণ করিল। রাজা বলিলেন, রে পাপ দৈত্য আমারই সর্ব্বনাশ করিয়াছিস, আবার আমারই উপর বাণ বর্ষণ। সে ভয়ে থামিল। একটা গাছের উপর ময়ূর গলা বাড়াইয়া কি দেখিতেছে, রাজা বলিলেন অনেক দূর দেখিতেছ আমার প্রিয়াকে দেখিতেছ কি? ময়ূর বলিল কক্ কক্। রাজার মহা রাগ, আমি মহারাজ পুরুরবা আমায় চেন না? বল কি-না "কঃ কঃ" বলিয়াই ঢিল, ময়ূরও উড়িয়া যাক। রাজা অনেক কষ্টের পর গৌরীপাদভ্রষ্ট অলক্তমণিসংযোগে উর্ব্বশীর উদ্ধারসাধন করিলেন। উর্ব্বশী বলিলেন তুমি মেঘ হও, উর্ব্বশী মেঘ হইলেন, রাজা তদুপরি আরোহণ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রয়াগে উপস্থিত। ইহা অপেক্ষা চিত্তবিনোদন আর কি আছে? যে কেহ

কালিদাসের গ্রন্থ পড়িয়া রাজার সহিত কার্ত্তিকের প্রমোদকাননে ভ্রমণ করে নাই তাহার সংস্কৃত পড়াই অসিদ্ধ।

আমরা এতক্ষণ নাটকের কথাই কহিতেছিলাম, আরও কিছুক্ষণ কহিব। নাটক মনুষ্যহৃদয়ের চিত্র লইয়াই ব্যস্ত। সে চিত্রে অনেক সৌন্দর্য্য কালিদাস দেখাইয়াছেন কিন্তু আরও অনেক বাকী আছে। সেগুলি কালিদাসে মিলিবে না তাহার জন্য শেক্ষপীয়রের শরণ লইতে হইবে। কালিদাস গ্রথিত সৌন্দর্য্য শেক্ষপীয়রেরও আছে। কালিদাসের পুরুরবা কালিদাসের শকুন্তলা অন্যত্র মিলিলেও মিলিতে পারে। কিন্তু শেক্ষপীয়রের প্রস্‌পেরো আর কোথায় পাওয়া যাইবে? প্রস্‌পেরোর স্বভাব মনুষ্যহৃদয়গত সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা। যে শত্রু তাঁহাকে জীর্ণ শীর্ণ ডিঙ্গি মাত্রে চড়াইয়া অগাধসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছে, যাহার জন্য বার বৎসর রাজ্য হারাইয়া একাকী জনশূন্য দ্বীপে বাস করিতে হইয়াছিল তাহাদের ক্ষমা করা সামান্য ঔদার্য্যের কথা নহে। প্রস্‌পেরোর গুণে সকলেই বাধ্য। কন্যা পিতার একান্ত বশম্বদ। নেপল্‌সের রাজা উহার রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন। ফর্দ্দিনান্দ উহাকে দেবতা মনে করে। প্রস্‌পেরো সংসারের কার্য্যে কেমন দক্ষ সমস্ত নাটকে তাহার দৃষ্টান্ত আছে। প্রস্‌পেরো মূর্ত্তিমান্ শান্তি, পরোপকার ক্ষমা তাঁহার আভরণ। কলিবানকে শত অপরাধ সত্ত্বেও তিনি স্বাধীনতা দিলেন যেহেতু সে তাহাই চায়। এরিএলের সময় পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। অন্তোনিওর দোষ প্রমাণ করিয়া দিলে তাহার প্রাণ-দণ্ড হয়, তিনি কেবল একবার ভয় দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন। তিনটা মাতাল তাহার ঘর লুঠ করিতে আসিয়াছিল তাহারাও ক্ষমা পাইল। প্রস্‌পেরো ক্ষমা করিলেন কিন্তু সকলকেই এক একবার জব্দ করিবার পর। প্রস্‌পেরোর চরিত্র পাঠ করিলেই তাঁহাকে ভক্তি করিতে ও ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। এ একরকম সৌন্দর্য্য। আবার যখন ধর্ম্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধিতে বিবাদ হয় সে সময়ের বর্ণনা কি সুন্দর নয়? ব্রুটস এণ্টনি হ্যমলেট এমন কি ম্যাক্‌বেথ এই বিবাদহেতু কোন কাজই করিতে পারিতেছে না, একবার এদিকে একবার ওদিকে করিয়া দোলাচল-চিত্তবৃত্তি হইয়া রহিয়াছে ইহা কি সুন্দর নয়? উহাদের জন্য কি আমাদের ক্ষুদ্রজীবী মনুষ্যের সহানুভূতি হয় না? ওরূপ সৌন্দর্য্য কালিদাসের কোথায়?

তাহার পর আর এক কথা। শুদ্ধ সৌন্দর্য্য হইলেই কি কাব্যের চরম হইল? সৌন্দর্য্য ছাড়া আরও অনেক জিনিসে কাব্য হয়। তাহার মধ্যে প্রধান দুইটি; পণ্ডিতেরা বলেন তিন পদার্থে কল্পনাজনিত আনন্দের উৎপত্তি হয়,—প্রকাণ্ড বস্তু দেখিলে, নূতন বস্তু দেখিলে, আর সুন্দর বস্তু দেখিলে। এই কথাটি যেমন বাহ্যজগতে খাটে তেমনি অন্তর্জ্জগতে। অন্তর্জ্জগতে যখন আমরা কাহাকেও

লোকাতীত ক্ষমতাশালী দেখিতে পাই, যখন দেখিতে পাই যে জিনদেব ব্যাঘ্রী জন্য স্বদেহ অর্পণ করিলেন, যখন দেখি যে রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ বনগমন করিলেন, তখনই আমরা প্রকাণ্ড বস্তু দেখি। তখনই আমাদের মনে বিস্ময়ের আবির্ভাব হয় এবং সেই বিস্ময়মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব আনন্দ ও ভক্তির উদয় হয়। কালিদাস এরূপ পুরুষপ্রকাণ্ডের চিত্র দেখাইতে পারেন নাই। রঘু রাজা যখন বিশ্বজিৎ যজ্ঞে "মৃৎপাত্র শেষামকরোৎ বিভূতিম্ :" পার্ব্বতী যখন মদন দহনের পর কঠোর তপস্যায় তনু অঙ্গে তাপ দিতে লাগিলেন তখন যেন এইরূপ প্রকাণ্ড চিত্র দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে বোধ হয় কিন্তু এক পার্ব্বতীর তপস্যা ভিন্ন আর কোথাও বিস্ময় উদয় করণে তিনি সমর্থ হয়েন নাই। শেক্ষপীয়রের এরূপ বিস্ময় উৎপাদক মনুষ্যহৃদয়ের চিত্র অসংখ্য। এরূপ উজ্জ্বল চিত্রের সংখ্যা নাই। সর্ব্বপ্রধান লেডি ম্যাক্‌বেথ, একবার অনুতাপ নাই বরং প্রতিজ্ঞা, একবার যখন নামিযাছি দেখা যাক পাতাল কত দূব। একবার হৃদয়দৌর্ব্বল্য প্রকাশ নাই, কেমন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব! যখন সভামধ্যে ব্যাঙ্কোব প্রেতমূর্ত্তি আসিয়া ম্যাক্‌বেথকে বিহ্বল কবিযা তুলিল, যখন ম্যাক্‌বেথ ভযে অনুতাপে জড়ীভূত হইয়া অতি গোপনীয় কথা সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন লেডি ম্যাক্‌বেথের কেমন ক্ষমতা। অন্য মেয়ে হইলে, "ওগো আমাব কি হোলো" বলিয়া কাঁদিয়াই অস্থির হয়। লেডি ম্যাক্‌বেথ সভাশুদ্ধ লোককে বুঝাইয়া দিলেন যে রাজার ঐরূপ মূর্চ্ছা মাঝে মাঝে হয়, এ সময়ে কাছে কেহ আসিলে তিনি বিরক্ত হন। এই বলিয়া নিজে ম্যাক্‌বেথের কাছে বসিয়া তাহার দুর্ব্বল মনের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এরূপ চরিত্র পাঠ করিলে কাহার মনে বিস্ময়ের উদয় না হয়?

কল্পনাজনিত আনন্দের আর এক কাবণ নূতনতা, অর্থাৎ আজগবি জিনিস বর্ণনা কবা। আবব্য উপন্যাসে ইহার ভূবি ভূরি উদাহবণ পাওয়া যায়। এরূপ নূতন জিনিস কালিদাস বা শেক্ষপীয়র কাহারই নাই। তবে শেক্ষপীয়রের স্পিরিট্ ওয়ারল্ড বা পরীস্থান; সেটী যেমন নূতন তেমনি সুন্দর। সবই মনুষ্যের মত কিন্তু কেমন পবিত্র আনন্দময়, কোনরূপ শোক দুঃখ নাই। শোক দুঃখ যে বৃত্তি দ্বারা অনুভব হয় সে বৃত্তিও তাহাদেব নাই। অথচ মানুষের কষ্ট দেখিলে মনটা কেমন কেমন হয়।

Ariel. Your charm so strongly works them
That if you now behold them your affection
Would become tender.

Pros. Dost thou think so, spirit?

Ari. Mine would sir, were I human.

যদি আরিয়াল মানুষ হইত, তবে লোকের দুঃখ দেখিয়া তাহার চিত্ত দ্রবীভূত হইত। ওবেবণের অধীন দেবযোনিগণ মনুষ্যের অদৃষ্ট লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, মানুষের কাণে একপ্রকার পাতার রস ঢালিয়া দিয়া এর প্রাণটী ওর ঘাড়ে, ওর পিয়ারের লোক তার ঘাড়ে দিয়া কেমন আমোদ করিতেছে; পড়িলে নূতন জগৎ, নূতন আমোদ, নূতন পবিবর্ত্ত বলিয়া বোধ হয়, পাঠক নিজেও যেন পরীগণমধ্যে বিলীন হইয়া যান। কালিদাসের চিত্রলেখা, সহজন্যা, মিশ্রকেশী, এমন কি উর্ব্বশী শেক্ষপীয়রের পবীস্থানে স্থান পান না।

শেক্ষপীয়রের হাস্যরসাকর চরিত্র বর্ণনা এক আশ্চর্য্য জিনিস। এ স্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। ফলষ্টাফ কতবার অপ্রস্তুত হইল, কিন্তু সে অপ্রস্তুত হইবাব পাত্র নহে। যতবার তাহাব বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ হইয়া পড়ে, ততবারই সে নূতন নূতন চালাকি বাহিব করে, ঠকিবার পাত্র ফলষ্টাফ একেবারেই নহে। প্যারোলস ফলষ্টাফের সঙ্গে তুলনা করিলে কালিদাসের বিদূষকগুলি কোন কর্ম্মেবই নহে। জীবনশূন্য প্রভাশূন্য খোসামুদে বামুন মাত্র।

এতদূরে আমরা কালিদাস ও শেক্ষপীযবেব তুলনার এক অংশ কথঞ্চিৎ শেষ করিলাম। বিষয় এত বিস্তৃত, সমালোচনায় এত আমোদ যে, সংক্ষেপ করিতে গেলেই কষ্ট হয়। যে অংশ সমালোচিত হইল, ইহাতে হৃদয়ের প্রবৃত্তি বর্ণনায় কাহাব কত বাহাদুরী দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কল্পনাজনিত সুখ তিন কারণে জন্মে, প্রকাণ্ডতা—সৌন্দর্য্য ও নূতনতা। প্রকাণ্ডতা—বিস্ময়কর হৃদয় ভাবের ঔজ্জ্বল্য—বর্ণনায় শেক্ষপীয়রের অনুকরণেও কেহ সমর্থ নয়। অতি নৈসর্গিক পদার্থ সৃষ্টিতে শেক্ষপীয়ব অতীব মনোহর, হাস্যবসের বর্ণনায় তাঁহার বড়ই ওস্তাদি। সৌন্দর্য্য বর্ণনা ও যেখানে হৃদয়বৃত্তির জটিলতা, গভীরতা সেখানে কালিদাস শেক্ষপীয়র হইতে অনেক ন্যূন। যে চরিত্র পাঠে মনের ঔদার্য্য জন্মে যে চরিত্র অনুকরণ করিয়া শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তাহার গন্ধও কালিদাসের নাটকে নাই। তবে যেখানে সহজ অবিমিশ্র হৃদয়ভাবের বর্ণনা আবশ্যক, সেখানে কালিদাসের বড়ই বাহাদুরী। কালিদাসের নাটক পড়িলে গেটের সঙ্গে বলিতে ইচ্ছা করে "যদি কেহ বসন্তের কুসুম, শরতের ফল, সর্গ ও পৃথিবী একত্র দেখিতে চায় তবে শকুন্তলে তোমায় দেখাইয়া দিব।"

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহা দেখা গেল তাহাতে কালিদাস, শেক্ষপীয়র হইতে ন্যূন বলিয়া বোধ হইবে। কালিদাসের আর এক মূর্ত্তি আছে, সে মূর্ত্তিতে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। বাইরণ জাঁক করিয়া বলিয়াছেন Description is my forte কিন্তু সেই বাহ্য জগদ্বর্ণনায় কলিদাস অদ্বিতীয়। শেক্ষপীয়র বাহ্যজগদ্বর্ণনায়

হাত দেন নাই, বাহ্যজগৎ বড় গ্রাহ্যও করিতেন না। মনুষ্যের হৃদয়ের উপর, তাঁহার আধিপত্য সর্ব্বতোমুখ। তাঁহার যেমন অন্তর্জ্জগতের উপর কালিদাসের তেমনি বাহ্যজগতের উপর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা। যখন স্বয়ম্বর স্থলে ইন্দুমতী উপস্থিত হন, তখন কালিদাস দুই চারি কথায় কেমন জম জমাট করিয়া দিলেন। একেবারে কল্পনানেত্র উন্মীলিত হইল। দেখিলাম প্রকাণ্ড উঠান, বহুসংখ্যক মঞ্চ, অর্থাৎ কথকঠাকুরদিগের মত বেদী, নানা কারুকার্য্যখচিত মহার্ঘ বস্ত্রাস্তরণোপপন্ন, তদুপরি পৃথিবীর রাজগণ বিচিত্র বেশভূষা করিয়া স্বীয় সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে বসিয়া আছেন।

তাসু শ্রিয়া রাজ পরম্পরাসু প্রভাবিশেষোদয়দুর্নিরীক্ষ্যঃ।
সহস্রধাত্মা ব্যরুচদ্বিভক্তঃ পয়োমুচাং পঙ্ক্তিষু বিদ্যুতেব॥

যেমন মেঘমালায় একটি বিদ্যুৎ হইলে সমস্ত মেঘ উদ্দীপ্ত হয় এবং সেই নিবিড় নীলনীরদমালার মধ্যে সেই বিদ্যুৎ যেমন গাঢ়োজ্জ্বল দীপ্তি বিকাশ করে, তেমনি রাজারা সব মঞ্চোপবি আসীন হইলে রাজসভাব কেমন এক গভীরতা মিশ্রিত লোকাতীত শোভা হইল। সব জম জম করিতে লাগিল। এমন সময়ে বন্দিরা স্তুতি পাঠ আরম্ভ করিল—রাজাদেব বংশাবলী বর্ণনা সমাপন হইল।

অথ স্তুতে বন্দিভিরন্বয়জ্ঞৈঃ সোমার্কবংশে নরদেবলোকে।
প্রসারিতে চাগুরুসারযোনৌ ধূপে সমুৎসর্পতি বৈজয়ন্তীঃ॥
পুরোপকণ্ঠোপবনাশ্রয়াণাং কলাপিনামুদ্ধতনৃত্যহেতৌ।
প্রধ্মাত শঙ্খে পরিতোদিগন্তান্ তূর্য্যস্বনে মূর্চ্ছতি মঙ্গলার্থে॥
মনুষ্যবাহ্যং চতুরস্রযান মধ্যাস্য কন্যা পরিবারশোভি।
বিবেশ মঞ্চান্তর রাজমার্গং পতিম্বরাক্লৃপ্ত বিবাহবেশা॥*

কালিদাস রাজসভার কবি, তিনি নিজেও হয়ত একজন প্রধান রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি পুস্তক লিখেন সভাস্থ ওমরাহদিগের তৃপ্তির জন্য, তাঁহার নিকট আমরা রাজসভা, বিবাহ সভা, দরবার প্রভৃতি বড়মানুষি জিনিসের উৎকৃষ্ট বর্ণনা পাইব, ইহা এক প্রকার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। কিন্তু স্বভাববর্ণনায়ও

---

*চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় রাজগণের বংশাবলী পাঠ হইলে পর উৎকৃষ্ট অগুরুচন্দনের ধূম চারিদিকে প্রসারিত হইল। সে ধূম ক্রমশঃ অত্যুচ্চ পতাকা আক্রমণ করিতে লাগিল। মঙ্গল সূচক তূর্য্যধ্বনি সবলে ধ্বনিত হইল। তাহার সঙ্গে শঙ্খপ্রধ্মাত হইয়া শব্দ আবর্ত্ত ঘন গাঢ় হইয়া দিগন্ত পরিপূর্ণ করিল। নগরের প্রান্তবর্ত্তী যে ময়ূরেরা ছিল তাহার মেঘগম্ভীর তূর্য্য মিশ্রিত শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এমন সময়ে স্বয়ম্বরা রাজকন্যা বিবাহ বেশ ধারণ করতঃ মনুষ্যবাহ্য চতুষ্কোণ যান আরোহণ করিয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার সমান্তরাল কেহ নাই। বাহ্যজগৎ বর্ণনায় তিনি যে শুদ্ধ সৌন্দর্য্য মাত্র বর্ণন করিয়াছেন এমন নহে, হিমালয় বর্ণনস্থলে যাহাই করুন, তাঁহার অনেক বর্ণনা এত গভীর যে ভাবিতে গেলে হৃদয় কম্পিত হয়। কিন্তু তাঁহার স্বভাবসৌন্দর্য্য বর্ণনাই আমরা বড ভালবাসি এবং তাহাই অধিক।

কালিদাসেব আরও একটি নিসর্গ বর্ণনা এখানে দেখাইতে হইল। এটী কালিদাসের রঘুর ত্রয়োদশ সর্গ হইতে। রাবণবধ ও বিভীষণেব অভিষেক সম্পন্ন হইয়াছে। রাম সীতায় অনেক হাঙ্গামেব পব পুনর্ম্মিলন হইযাছে। পুষ্পকরথ প্রস্তুত। সকলে আবোহণ কবিল। পুষ্পকবথ আকাশ পথে উড্ডীন হইল। রাম সীতাকে দেখাইতে লাগিলেন। প্রথমেই সমুদ্র।

বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্বিভক্তং মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিং।
ছায়াপথেনেব শরৎ প্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্॥
তাম্তামবস্থাং প্রতিপদ্যমানং স্থিতং দশ ব্যাপ্যদিশোমহিম্না।
বিষ্ণোরিবাস্য নবধারণীয়মীদৃক্তয়ারূপমীয়ত্তয়া বা॥*

সমুদ্রে প্রকাণ্ড তিমি মৎস্যসমূহ রহিযাছে।

সসত্ত্বমাদায় নদীমুখাম্ভঃ সম্মীলয়ন্তো বিবৃতাননত্বাৎ
অমী শিরোভিঃ তিময়ঃ সরন্ধ্রৈঃ উর্দ্ধং বিতন্বন্তি জলপ্রবাহান্।†

প্রকাণ্ড অজগরগণ সমুদ্রতীরে জল-তরঙ্গের সঙ্গে একাকার হইয়া শয়ন করিয়া আছে।

বেলানিলায় প্রসৃতাঃ ভুজঙ্গাঃ মহোর্ম্মি বিস্ফূর্জ্জথুনির্ব্বিশেষাঃ
সূর্য্যাংশু সম্পর্ক সমৃদ্ধরাগৈঃ ব্যজ্যন্ত এতে মণিভিঃ ফণস্থৈঃ।‡

---

* বৈদেহি আমার সেতুতে বিভক্ত অনন্ত ফেনিল নীল সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। যেন শরৎকালের অগণ্য তারকা ঘটিত নির্ম্মেঘ গগনতল ছায়াপথ দ্বারা... হরিতালীতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে।

ঐ দেখ অনন্ত সমুদ্র দশদিক্ ব্যাপিয়া পড়িয়া আছে। প্রতিক্ষণেই উহার আকার পরিবর্ত্তন হইতেছে। সমুদ্রের রূপ বিষ্ণুর ন্যায়, কিরূপ ও কত বড় কেহই স্থির করিয়া উঠিতে পারে না।

† তিমি মৎস্য সকল বিকট হাঁ করিয়া নদীমুখের জল মুখে পুরিতেছে। শেষ মাথার ছিদ্র দিয়া সে জল বাহির করিয়া দিয়া নদী হইতে আগত সমস্ত জীবজন্তু ভক্ষণ করিতেছে।

‡ বৃহৎ বৃহৎ অজগর সকল সমুদ্রতীরবায়ু সেবন করিবার জন্য লম্বা হইয়া পড়িয়া আছে। সমুদ্রতরঙ্গের সহিত তাহাদের ভেদ নিরূপণ অতীব কষ্টকর। যদি সূর্য্যরশ্মি পড়িয়া উহাদের মাথার মণি দ্বিগুণ দীপ্তি না করিত কাহার সাধ্য চিনিয়া উঠে কোনটা সাপ আর কোনটা নয়।

দেখিতে দেখিতে সমুদ্রের কূল দেখা গেল।

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্দ্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।*

রথ রামের যেমন অভিলাষ তেমনি চলিতেছে। মুহূর্ত্ত মাত্রে সমুদ্রতীরে উপস্থিত। রাম দেখাইলেন সীতে দেখ—

এতে বয়ং সৈকতভিন্নশুক্তি পর্য্যস্তমুক্তাপটলং পয়োধেঃ
প্রাপ্তা মুহূর্ত্তেন বিমানবেগাৎ কূলং ফলাবর্জ্জিতপূগমালম্।†

আকাশ নীরধির স্বৈরগামী প্রমোদ নৌকার ন্যায় রামের পুষ্পকরথ জনস্থান, মাল্যবান্, পঞ্চবটী, পম্পা, শরভঙ্গাশ্রম প্রভৃতি পার হইয়া প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা সংগমস্থলে উপস্থিত। এখানে নির্ম্মল শ্বেতকান্তি গঙ্গাপ্রবাহ কৃষ্ণকান্তি যমুনাপ্রবাহের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে।

ক্বচিৎ প্রভালেপিভি রিন্দ্রনীলৈঃ মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালা সিতপঙ্কজনামিন্দীবরৈরুৎ খচিতান্তরেব॥
ক্বচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাং কাদম্ব সংসর্গবতীব পংক্তিঃ।
অন্যত্র কালাগুরুদত্তপত্রা ভক্তিভুর্বশ্চন্দনকল্পিতেব॥
ক্বচিৎ প্রভা চান্দ্রমসী তমোভিঃ ছায়াবিলীনৈঃ শবলীকৃতেব।
অন্যত্র শুভ্রা শরদভ্রলেখা রন্ধ্রেম্বিবা লক্ষ্যনভঃপ্রদেশা॥
ক্বচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি বিভাতি গঙ্গা ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ॥‡

---

* দূর হইতে সমুদ্রের বেলা দেখা যাইতেছে। বেলা কেমন? তমাল ও তালবনে নীলবর্ণ। বোধ হয় যেন একখানি প্রকাণ্ড লৌহচক্রের কানায় সরু কলঙ্কের রেখা দেখা যাইতেছে।

† এই ত আমরা রথবেগ হেতু মুহূর্ত্ত মধ্যে সমুদ্রের তীরভূমিতে উপস্থিত হইলাম। এই তীরভূমিতে অসংখ্য সুপারিবৃক্ষ ফলভরে অবনত এবং বালুকার উপরে শুক্তি বিভক্ত হওয়ায় চারিদিকে মুক্তা ছড়ান রহিয়াছে।

‡ হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! গঙ্গা যমুনা তরঙ্গের সহিত মিশ্রিত হইয়া কেমন শোভা হইয়াছে দেখ। কোথাও বোধ হয় মুক্তার হারের মাঝে মাঝে নীলমণি থাকিয়া আপনার প্রভা যেন মুক্তায় লেপন করিয়া দিতেছে। আর এক জায়গায় শাদা পদ্মের মালায় যেন মাঝে মাঝে নীলপদ্ম বসান রহিয়াছে। কোনস্থানে যেন হংসশ্রেণী মানস সরোবরে যাইতেছে তাহাদের মধ্যে মধ্যে কাদম্ব হংসও দুই পাঁচটা আছে। আবার কোথাও যেন পৃথিবী সার চন্দনের টিপ কাটিয়া মধ্যে মধ্যে কালাগুরু দিয়া তাহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। কোথাও বোধ হয় পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, কেবল মাঝে মাঝে ছায়ার অন্ধকার লুকাইয়া আছে। কোথাও যেন শরৎকালের নির্জ্জল মেঘ, মধ্যে মধ্যে ফাক দিয়া নীল আকাশ উঁকি মারিতেছে। আবার একস্থান দেখিতে হঠাৎ বিভূতিভূষিত শিব অঙ্গে কৃষ্ণসর্প বিহার করিতেছে বোধ হইবে।

এত মিষ্ট, এত সুন্দর, এমন হৃদয়োন্মাদকর বর্ণনা, প্রকৃতির এত সুনিপুণ অনুকরণ, কল্পনার এমন স্নিগ্ধ দীপ্তি আর কোথায় মিলিবে ? আমার ইচ্ছা ছিল আরও উৎকৃষ্ট বর্ণনা উদ্ধার করি, কিন্তু বঙ্গদর্শনের স্থান বড় অল্প ; সবই যদি ভাল জিনিসে পুরাইয়া দিই ত আর সব ছাই ভস্ম কোথায় যাইবে ?

যখন নাটক ছাড়িয়া মহাকাব্যে উপস্থিত হইয়াছি, তখন কালিদাসের হইয়া আর একটি কথা না বলিয়া থাকা যায় না। নাটকে কালিদাস মনুষ্যহৃদয়ের যেমন একই রকম চিত্র দেখাইয়াছেন, মহাকাব্যে সেরূপ নহে। মহাকাব্যে মনুষ্যচরিত্র বর্ণনায় তিনি অপেক্ষাকৃত অধিক কারুকরী প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি মনুষ্যহৃদয়ের উদাবতা, বিশালতা, জটিলতা, অহম্মুখতা, চিন্তাপ্রিয়তা প্রভৃতি বর্ণনে তিনি শেক্ষপীযরের ছাত্রানুছাত্রবৎ। তাঁহার কেবল একটি মনুষ্যচিত্র অনুকরণের অতীত। সেটি কুমারসম্ভবের পার্ব্বতী। কেন ? ভারত মহিলাপ্রস্তাবে লিখিত আছে, পাঠক মহাশয়ের ইচ্ছা হয় একবার খুলিয়া দেখিবেন আমাদের আর স্থান নাই।

শেক্ষপীযব মহাকাব্য লিখিতে গিয়া যেরূপ বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছেন, কালিদাসকে সেরূপ হইতে হয় নাই। প্রত্যুত তাঁহার মহাকাব্যই তাঁহার মহাকবি খ্যাতিলাভেব মূল কাবণ। এ সকলের উপব তাঁহার মেঘদূত। সমস্ত সাহিত্য সংসারে মেঘদূতেব মত সাববান্ কাব্য অতি বিবল। আডিশন পোপের রেপ অব্ দি লক্‌কে "*Merumsal* or the delicious little thing" বলিয়াছেন। তিনি যদি মেঘদূত দেখিতেন তবে *Merumsal* এ নাম রেপ অব্ দি লকের দুষ্প্রাপ্য হইত। মেঘদূতেব সঙ্গে তুলনায় অন্য কাব্য আতবেব তুলনায় গোলাবজলের মত। একটী উৎকৃষ্ট পদার্থের সার অংশের উৎকৃষ্টভাগ সংগ্রহ, আর একটি গন্ধ কবা জল মাত্র।

এতক্ষণ আমবা কাব্যের বিষয় লইয়া কালিদাস ও শেক্ষপীয়রের তুলনা করিতেছিলাম। তাহাতে এই দাঁড়াইল যে কালিদাসের বাহ্য জগতে যেরূপ অসীম আধিপত্য শেক্ষপীয়বেব অন্তর্জ্জগতে তেমনি। অন্তর্জ্জগতেরও এক অংশে কালিদাস শেক্ষপীয়র হইতে ন্যূন নহেন। যেখানে হৃদয়ের সুন্দর ও কোমল ভাবগুলি বর্ণনা করিতে হইবে সেখানে বোধ হয় কালিদাস অনেক অধিক মিষ্ট লাগে। কিন্তু অন্য সর্ব্বত্র শেক্ষপীয়র উপমা-বিরহিত।

বিষয়ের কথা শেষ হইল, এখন কাব্যের আকার লইয়া তর্ক হইতে পারে। এ তর্কেও কাহার কি দাঁড়ায়, দেখা উচিত। কাব্য তিন প্রকার, শ্রব্য, দৃশ্য, আর গীতিকাব্য। ইহার মধ্যে গীতিকাব্যে দুজনেই সমান। কেহই গীতিকাব্য লিখেন নাই, কিন্তু শেক্ষপীয়র তাঁহার নাটকমধ্যে যে সমস্ত গান

দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে উৎকৃষ্ট গীতিলেখক বলা যাইতে পারে। কালিদাসও কয়েকটা গান দিয়াছেন। বিক্রমোর্ব্বশীর পাহাড়িয়া ভাষায় গানগুলি বড় মিষ্ট। তাহার উপর কালিদাসের মেঘদূত। মেঘদূতকে দেশীয় আলঙ্কারিকেরা খণ্ডকাব্য বলেন। খণ্ডকাব্য বলিয়া কাব্য ভেদ করা তাঁহাদের গায়ের জোর মাত্র। মেঘদূত সার ধরিতে গেলে একখানি গীতিকাব্য, এবং উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকে উহাকে গীতিকাব্যই বলিয়া থাকেন। যখন হৃদয়ে আনন্দ বা শোক ধরে না, তখন তাহাকে কাব্যাকারে বাঁহির করিয়া দেওয়াই গীতিকাব্য। তবে মেঘদূত গীতিকাব্য কেন না হইবে ?

শেক্ষপীয়রের শ্রব্যকাব্য প্রায় লোকে পড়ে না। কালিদাসের শ্রব্যকাব্য গুলি রঘু কুমার ঋতুসংহার সকলই পণ্ডিত সমাজে বিশেষ আদরের বস্তু।

দৃশ্যকাব্য নানারূপ। তন্মধ্যে নাটক প্রধান। সংস্কৃত অলঙ্কারে নাটকের আকার লইয়াই বাঁধাবাঁধি—পাঁচ অঙ্ক নয় সাত অঙ্ক হইবে, রাজা নায়ক হইবে, মন্ত্রী হইলে হইবে না। নাটকের যেটুকু নহিলে নয় সেটুকুর উপর তত নজর নাই। কথাচ্ছলে বিচ্ছিত্তি পূর্ব্বক হৃদযের ভাব প্রকাশ ও সেই ভাব দ্বারা পরহৃদয়ের ভাব আকর্ষণ এই দুইটি নাটকেব সার। নাটকেব প্রধান উদ্দেশ্য কোন উন্নত নীতির শিক্ষা। আমাদের কবিদেব এ দুটিতে নজর বড় নাই। এমন কি যে বীজ লইয়া নাটক, অনেক সময় বাজে কথায় ৬ অঙ্ক কাটাইয়া ৭ম অঙ্কে সেই বীজেব অবতারণা করা হয়। অভিজ্ঞান শকুন্তলায় ১ম ২য় অঙ্ক না থাকিলে নাটকের কোন হানিই ছিল না; নাটকের বীজ তৃতীয় অঙ্কে। চতুর্থ অঙ্কেও নাটকের কোন উপকাব নাই। নাটকের জন্য দরকার রাজার প্রণয়, প্রত্যাখ্যান, অভিজ্ঞান ও মিলন। কিন্তু কালিদাস ত নাটক লিখিতে যান নাই, তাঁহার উদ্দেশ্য এই আদরার উপর এই কাটামতে তাঁহার কাব্য গালারি হইতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র দেখান। তাহা তিনি খুব দেখাইয়াছেন। একটা দৃষ্টান্ত দেখাই। শকুন্তলার মত বালিকার প্রথম প্রণয়ে আড়নয়নে চাহনি বড় সুন্দর ? না ? কালিদাস সেইটি দেখাইবেন। অনেক চেষ্টা হইল, এক অঙ্ক পূরিয়া গেল, সেটা আর দেখান হয় না, ক্রমে এক ঘেয়ে রকম হইয়া দাঁড়াইল। কালিদাস বিনা প্রয়োজনে একটা হাতী হাতী বলিয়া গোল (নেপথ্যে) তুলিয়া দিলেন। রাজার গল্প ভাঙ্গিবার উপায় হইল, শকুন্তলারও আড়ে আড়ে দেখিবার সুবিধা হইল, সে হাতী কালিদাসের উপকার করিল বটে, কিন্তু নাটকের কিছুই করিল না। শেক্ষপীয়র কিন্তু একটি সিন, একটি উক্তিও বিনা প্রয়োজনে সন্নিবেশিত করেন নাই। অনেক অবুঝ লোকে মনে করিত যে ম্যাক্‌বেথে ঐ যে দরজায় ঘামারা আছে ওটা কেবল সকাল হইয়াছে, জানাইবার জন্য, সুতরাং

উহাতে নাটকের কোন উপকার নাই। কিন্তু ডিকুইন্‌সি দেখাইয়া দিলেন যে ঐ দ্বারে আঘাতে অনেক উপকার হইয়াছে। পাপিষ্ঠ দম্পতী হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করিয়া পাপচিন্তায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিল; তাহাদের মন তাহাদের ছিল না, তাহারা আপন পার্থিব অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়াছিল। দ্বারে আঘাত হইবামাত্র তাহাদের বজ্রধ্বনিবৎ বোধ হইল, তাহাদের মন আকাশভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আবার দেহপিঞ্জরে প্রবেশ করিল। অন্য কবিরা বারবাব বজ্রধ্বনি করিয়া যে গাম্ভীর্য্য উৎপাদনে অক্ষম, শেক্ষপীয়র সময় মত বার কত দরজায় ঘা মারিয়া তাহার দশগুণ করিলেন। যে বুঝিল তাহার পর্য্যন্ত হৃৎকম্প হইল।

এক্ষণে কালিদাস ও শেক্ষপীয়র এই উভয়ের তুলনায় সমালোচনা শেষ হইল। শেক্ষপীয়ব Prince of the Dramatists একথা সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু কালিদাস সকল প্রকাব কাব্যই লিখিয়াছেন এবং বোধ হয় নাটক ভিন্ন সর্ব্বত্র কৃতকার্য্য হইয়াছেন। মহাকাব্যে তিনি বাল্মীকিব সমান নহেন সত্য, কিন্তু তিনি ফেলা যান না। নাটকেও তিনি যে ভাবতবর্ষেব কোন কবি অপেক্ষা হীন, এমত বলিতে পারি না। কালিদাস সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক, সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর্ণনাময় কাব্য ঋতু-সংহার লিখিয়াছেন এ কথা বলিলে "ভারতেব কালিদাস জগতের তুমি" এই যে অতি অন্যায় সমালোচনা প্রচলিত আছে, তাহাবই সপক্ষতা করা হয়। শেক্ষপীয়রও যেমন জগতের কালিদাসও তেমনি জগতেব। জগতেব সর্ব্বত্রই তাঁহার কবিতাব সমান সমাদর। তবে তিনি ভারত ছাড়া কোন কথা লিখেন নাই। ভারতের কথাই তাঁহাব কাব্য।

আমাদের উপসংহাবকালে বক্তব্য এই যে, শেক্ষপীয়র মেনকা হইতে পারেন—বাল্মীকি উর্ব্বশী হইতে পারেন, হোমাব রম্ভা হইতে পারেন কিন্তু কালিদাস সর্ব্বলোকদুর্লভা তিলোত্তমা। সকলেরই উৎকৃষ্টাংশ তাহাতে আছে—কিন্তু অল্পপরিমাণে প্রবন্ধ শেষ করিবার সময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি—

কালিদাস কবিতা নবং বয়ঃ মাহিষং দধি শশর্করংপয়ঃ।
এনমাংসমবলাচ কোমলা সম্ভবন্তু 'মম' জন্ম জন্মনি॥*

সেই সঙ্গে পাঠকমহাশয়দেরও যেন ফাঁক না যায়।

---

* কালিদাসের কবিতা, যৌবন বয়স, মহিষের দধি, চিনি, হরিণের মাংস, কোমলা অবলা এই কয়টি যেন আমার জন্ম জন্ম হয়।

পঞ্চম তর্ক—কারণ কি ?

আমরা এই জগৎ কার্য্যের প্রতি যে তিনটী প্রসিদ্ধ কারণ, তাহাদের ক্রমশঃ নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে কারণ কাহাকে বলে? তাহার স্বরূপ কি? তাহা কত প্রকার হইতে পারে এবং কার্য্যের সহিত তাহার কিরূপ সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে নৈয়ায়িকগণ যেরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপে উল্লেখ করা বিধেয় বোধ করিতেছি।

কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন—

"অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ব্ববর্ত্তিতা কারণত্বং ভবেৎ।" কারিকাবলী।

অন্যথাসিদ্ধিশূন্য হইয়া কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে বর্ত্তমান হয় তাহার নাম কারণ।

অন্যথা সিদ্ধি যাহাতে থাকে তাহার নাম অন্যথাসিদ্ধ। এই অন্যথা-সিদ্ধের ঠিক বাঙ্গালা অর্থ দুর্ল্লভ, তবে সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে কার্য্যোৎপত্তির প্রতি যাহার কোন সাক্ষাৎ বা ক্লিপ্ত সম্বন্ধ নাই তাহার নাম অন্যথাসিদ্ধ। প্রাচীনদিগের মতে এই অন্যথাসিদ্ধ পাঁচ প্রকার। যথা—

"যেন সহ পূর্ব্ব ভাবঃ, কারণ মাদায় বা যস্য।
অন্যং প্রতি পূর্ব্বভাবে জ্ঞাতে যৎ পূর্ব্বভাব বিজ্ঞানম্॥
জনকং প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তিতা মপরিজ্ঞায় ন যস্য গৃহ্যতে।
অতিরিক্তমথাপি যদ্ভবেন্নিয়তাবশ্যক পূর্ব্বভাবিনঃ॥

প্রথম "যেন সহ পূর্ব্বভাবঃ" অর্থাৎ যে ধর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়া কারণ কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়, সেই ধর্ম্ম; কারণের ধর্ম্ম কার্য্যের কারণ নয় কিন্তু অন্যথাসিদ্ধ। যেমন ঘটের প্রতি দণ্ড* কারণ। অতএব দণ্ডের ধর্ম্ম দণ্ডত্ব ঘটের কারণ নয় কিন্তু

* দণ্ড শব্দে কুম্ভকারের চক্র ঘুরাইবার লাঠি, যথা "কলসে নিজ হেতু দণ্ডজঃ কিমু চক্র ভ্রমিকারিতা গুণঃ ?" নৈষধ।

অন্যথাসিদ্ধ। কারণ দণ্ডত্ব দণ্ড সমুদয়ের একটী সাধারণ ধর্ম্ম, যাহা দ্বারা সমুদয় দণ্ডের একবারে বোধ হয়। এদিকে ঘটোৎপত্তির দিকে একটী মাত্র দণ্ড কারণ, সমুদয় দণ্ড নহে। সুতরাং দণ্ডত্ব ঘটের কারণ নয় ; দণ্ডত্ব থাকিলেই ঘট হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই অর্থাৎ দণ্ডত্বের সহিত ঘটোৎপত্তির কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই।

দ্বিতীয়। "কারণ মাদায় বা যস্তঃ"—যাহাদের সহিত কার্য্যের পৃথকরূপে এরূপ কোন সম্বন্ধ নাই যে তাহারা থাকিলে কার্য্য অবশ্যই হইবে এবং তাহারা না থাকিলে কার্য্য একবারে হইবে না, অথচ যাহারা কারণে বর্ত্তমান হইয়া কার্য্যের সহিত ঐরূপ সম্বন্ধ রক্ষা করে। যেমন ঘটের প্রতি দণ্ডের রূপ (পরিমাণাদি।) দেখ, দণ্ডের পবিমাণাদি পৃথক্‌রূপে ঘটের উৎপত্তির বা অনুৎপত্তিব কারণ নহে, কারণ একথা বলা যাইতে পাবে না যে এইরূপ পরিমাণাদি না থাকিলে ঘট হইবে না। কিন্তু কোন পরিমাণাদি বিশিষ্ট দণ্ড থাকিলেই ঘটের উৎপত্তি হইবে এবং তাহার অভাবে ঘট হইবে না। অতএব দণ্ডের পরিমাণাদিব সহিত ঘটোৎপত্তির কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকায় তাহাবা ঘটের কাবণ নহে, কিন্তু অন্যথাসিদ্ধ।

তৃতীয়। "অন্যং প্রতি পূর্ব্বভাবে জ্ঞাতে যৎ পূর্ব্বভাব বিজ্ঞানম্" যাহাকে প্রথমে অপর কার্য্যের কারণ বোধ কবিয়া পবে অভিলষিত কার্য্যের কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, উহা অভিলষিত কার্য্যের কাবণ নহে কিন্তু অন্যথাসিদ্ধ। ঘটের প্রতি আকাশ। নৈয়ায়িকগণ শব্দের সমবায়িকারণের নাম আকাশ রাখিয়াছেন—(শব্দ সমবায়ি কারণত্বং আকাশত্বং) অর্থাৎ আকাশকে প্রথমে শব্দের সমবায়ি কারণ রূপে বুঝিয়া পরে ঘটের কারণ বুঝিতে হয়, অর্থাৎ শব্দের কারণ ঘটের কারণ এই রূপ জ্ঞান করিতে হয়। কিন্তু বিবেচনা কর যে সময় আকাশকে শব্দের কারণ বলিয়া বুঝা যাইতেছে সেই সময় তাহাকে ঘটের কারণ বলিয়া কখনই বুঝা যাইতে পারে না। এই নিমিত্ত আকাশ শব্দ ভিন্ন আর কোন বস্তুর কারণ নহে কিন্তু অন্যথাসিদ্ধ।

কেহ কেহ বলেন "অন্যং প্রতি" ইত্যাদি তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ লক্ষণের যদি যথাশ্রুত অর্থ করা যায় (আমরা উপরে যেরূপ অর্থ করিলাম এইরূপ অর্থ করা যায়) তাহা হইলে অপূর্ব্বের* প্রতি যাগের যে সর্ব্ববাদিসম্মত কারণতা আছে তাহার অন্যথা হয়, যাগ অপূর্ব্বের কারণ না হইয়া অন্যথাসিদ্ধ হয়, কারণ যাগ "স্বর্গের কারণ"† প্রথমে এইরূপ বোধ করিয়া পরে অপূর্ব্বের কারণ বলিয়া বোধ

* অপূর্ব্ব কাহাকে বলে তাহা এক প্রকার "অদৃষ্ট" বিষয়ক প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে।

† "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা যাগের স্বর্গকারিতা (স্বর্গের অভিলাষে যাগ করিবে) সিদ্ধ হইতেছে।

করিতে হয়, কিন্তু যে সময় "স্বর্গের কারণ" বলিয়া যাগের বোধ হইতেছে সে সময়ই অপূর্ব্বের কারণ বলিয়া বোধ হইতে পারে না। এই দোষ নিবারণের জন্য তাঁহারা ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, "পূর্ব্ববৃত্তিত্ব ঘটিত রূপেণ যস্য যজ্জনকত্বং তস্য তেন রূপেণ তং প্রত্যন্যথাসিদ্ধত্বম্" "যে পূর্ব্ববৃত্তিত্ব ঘটিত রূপে কোন বস্তুকে এক বস্তুর কারণ বুঝাইবে সেই পূর্ব্ববৃত্তিত্ব ঘটিতরূপে সেই বস্তু অন্য এক বস্তুর কারণ হইতে পারে না কিন্তু অন্যথাসিদ্ধ হয়।" "স্বর্গের পূর্ব্ববৃত্তি" ("স্বর্গের কারণ') এই রূপে যাগ অপূর্ব্বের কারণ নহে, অন্যথাসিদ্ধ; কিন্তু যাগত্বরূপে অপূর্ব্বের কারণ হইবে তাহাতে বাধা কি? অর্থাৎ যাগ, যে সময় "স্বর্গের কারণ" বলিয়া প্রতীত হইতেছে, সেই সময় অপূর্ব্বের কাবণ বলিয়া প্রতীত না হউক কিন্তু "স্বর্গের কারণ" বলিয়া যাগ যে একবারে অপূর্ব্বের কারণ হইবে না একথা কোন কাজের নহে। এইরূপ আকাশ "শব্দের কাবণ" রূপে অন্য বস্তুর কারণ নাই হউক কিন্তু শব্দাশ্রয়রূপে* অন্য বস্তুর কারণ হইতে পাবে। আমাদেরও এই রূপ অর্থ অভিপ্রেত। আমরা একথা অবশ্য স্বীকাব করি যে কোন বস্তুকে যখন এক বস্তুর কাবণ রূপে বোধ করা যায় তখন তাহাকে অবশ্যই অন্য এক বস্তুর কারণ রূপে জানা যাইতে পারে না কিন্তু উহা যে একবারে দ্বিতীয় বস্তুর কারণ হইবে না ইহা কখনই যুক্তিসিদ্ধ নয়। বাস্তবিকও দেখ যে দণ্ড দ্বারা একটি ঘট হইয়াছে তাহা দ্বারা যদি আব ঘট বা হাঁড়ী না গড়া যায় তাহা হইলে কুম্ভকারের আর ব্যবসায় চালাইতে হয় না, সর্ব্বদা দণ্ডের অন্বেষণেই দা হাতে করে বনে বনে ভ্রমণ করিতে হয়।

চতুর্থ। "জনকং প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তিতা অপরিজ্ঞায় ন যস্য গৃহ্যতে" যাহাকে প্রথমে কোন কার্য্যোৎপাদকেব কাবণ বলে না জানিয়া সেই কার্য্যের কারণ রূপে জানা যায় না তাহাও অন্যথাসিদ্ধ। যেমন ঘটেব প্রতি "কুম্ভকারের পিতা"। ঘটের কারণ কুম্ভকার, কুম্ভকারের কারণ কুম্ভকারের পিতা। এক্ষণে দেখ কুম্ভকারের পিতা বলিলে প্রথমে তাহাকে কুম্ভকারের কারণ বলিয়া বোধ হয় তাহার পর সে কুম্ভকাবের কারণ বলিয়া কুম্ভকারকৃত ঘটেরও কারণ এইরূপ বোধ করিয়া, কুম্ভকারের পিতাকে কখনই ঘটের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা উচিত নয়। কারণ কুম্ভকারের পিতার সহিত আর কুম্ভকারকৃত ঘটের সহিত কোন এরূপ সম্বন্ধ নাই যে তাহার অবর্ত্তমানে তাহার পুত্রের ঘট

---

*"শব্দো দ্রব্যাশ্রিতোগুণত্বাৎ" গুণমাত্রেই দ্রব্যে আশ্রিত। শব্দ গুণ অতএব শব্দও দ্রব্যে আশ্রিত, এই অনুমান দ্বারা নৈয়ায়িকেরা আকাশকে শব্দাশ্রয় সিদ্ধ করিয়াছেন। নৈয়ায়িকদিগের মতে আকাশ, দ্রব্য, শব্দ, গুণ।

গড়িতে কোন ব্যাঘাত হয়, বরং আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে পিতার পরলোক হইলে শ্রাদ্ধে কিছু ঘটা করিবার জন্য কুম্ভকারেরা দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া ঘটাদি নির্ম্মাণ করিতে থাকে। এই নিমিত্ত কুম্ভকারের পিতা ঘটের প্রতিকারণ নয় কিন্তু অন্যথাসিদ্ধ।

পঞ্চম। "অতিরিক্ত মথাপি যস্তবেন্নিয়তাবশ্যক পূর্ব্বভাবিনঃ" একটী কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে যতগুলি পদার্থের থাকা আবশ্যক তদতিবিক্ত সমুদয়ই অন্যথাসিদ্ধ। যেমন কুম্ভকার যে স্থানে বসিয়া ঘট নির্ম্মাণ করে যদি একটা গর্দ্দভ তাহাব এক পার্শ্বে বসিয়া থাকে তাহা হইলে কুম্ভকাব যতগুলি ঘট গড়িবে গাধা সে সকলেই অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তি হইলেও কাবণ নয় কিন্তু অন্যথাসিদ্ধ। কারণ গাধা সেস্থলে না থাকিলেও ঘটোৎপত্তির কোন ব্যাঘাত হয় না।

প্রথমে প্রাচীনেরা এই পাঁচ প্রকার অন্যথাসিদ্ধ বলেন। তাহার পর মণিকার প্রভৃতি কতকগুলি নৈযায়িকেবা বলেন অন্যথাসিদ্ধ পাঁচ প্রকার নহে তিন প্রকাব। কাবণ পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকাবের মধ্যে প্রথম আব দ্বিতীয়টার মধ্যে তাদৃশ ভেদ না থাকায় ঐ দুইটি এক বলিলে চলে। এইরূপ তৃতীয়েব সহিত চতুর্থের বিশেষ প্রভেদ না থাকায় তাহাদিগকেও এক বলিলে চলে। নব্যগণ বলেন এই শেষোক্তই অন্যথাসিদ্ধের চূড়ান্ত লক্ষণ, অপব সকলগুলিকে ইহার অন্তর্গত করা যাইতে পাবে, অন্যথাসিদ্ধেব এই একমাত্র লক্ষণ কবিলে সকল চরিতার্থ হয় অধিক করা বাহুল্য মাত্র। তবে তাঁহারা পঞ্চম লক্ষণের একটু পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন। তাঁহারা কেবল নিয়তাবশ্যক পূর্ব্ববর্ত্তীর অতিরিক্তকে অন্যথাসিদ্ধ না বলিয়া এইরূপ বলেন যে, লঘু অথচ নিয়তাবশ্যক পূর্ব্ববর্ত্তী যে, তাহার অতিরিক্তের নাম অন্যথাসিদ্ধ। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে অবশ্য ক্লিপ্ত অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তীর মধ্যে যাহাদেব অবচ্ছেদক (বিশেষ কারক ?) ধর্ম্ম লঘু হইবে তাহারাই কারণ, তদতিরিক্ত অন্যথা সিদ্ধ। যেমন প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্বই কারণ অনেক দ্রব্য সমবেতত্ব অন্যথাসিদ্ধ।* কারণ অনেক দ্রব্য সমবেতত্ব অপেক্ষা মহত্ত্ব লঘু।

যাহাহউক "অন্যথাসিদ্ধ" কাহাকে বলে বোধ হয় পাঠকগণ এক প্রকার বুঝিতে পারিলেন। এই অন্যথাসিদ্ধ ভিন্ন হইয়া কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী যে হইবে তাহাব নামই কারণ। সংক্ষেপে বলিতে হইলে এই বলিতে হইবে যে যাহা পূর্ব্বে না থাকিলে কার্য্য হইতে পারে না তাহার নাম কারণ। যদি কেবল কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তীকে কারণ বলা যাইত তাহা হইলে কুম্ভকারের গৃহের পার্শ্বস্থিত

* অনেক দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান ধর্ম্মের নাম অনেক দ্রব্য সমবেতত্ব।

গর্দ্দভ ঘটের কারণ হইতে পারিত, দিন রাত্রির কারণ হইত, রাত্রি দিনের কারণ হইত, অধিক কি সামান্যতঃ প্রাণবিয়োগ পর্য্যন্ত চিকিৎসাকারী মহানুভব ডাক্তার-দিগের চিকিৎসাও মৃত্যুর কারণ হইতে পারিত এবং হিন্দু মহিলার * সূতিকা গৃহের পার্শ্বস্থিত ঢেঁকি বা গোগণ সন্তানের জনক (কারণ) বলিয়া অভিহিত হইতে পারিত।

যাহাহউক পাঠকগণ এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন "অন্যথাসিদ্ধ" শূন্য হইয়া কার্য্যের অব্যহিত পূর্ব্বে যে বর্ত্তমান হইবে তাহাকে কারণ বলিয়া আমাদিগের প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ কিরূপ বিশুদ্ধ এবং সম্পূর্ণ কারণের লক্ষণ

---

* ভক্ত হিন্দুগণ প্রায় ঢেঁকিশালা বা গোশালার একপার্শ্বে স্ববংশধরের প্রসব ভূমি নির্দ্দেশ করিয়া রাখেন।

হেলেনা কাব্য। সটীক। আনন্দ চন্দ্র মিত্র প্রণীত। ময়মনসিংহ ভারত মিহির যন্ত্রে শ্রীযদুনাথ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ১৭৯৮ শক।

বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র কাব্য লিখিয়াছেন—আর বাবু শ্রীনাথ চন্দ তাহার ভূমিকা লিখিয়াছেন। গ্রন্থ সমালোচনার জন্য আমাদিগের যে একটু প্রবৃত্তি ছিল, শ্রীনাথ বাবুর ভূমিকা পড়িয়া তাহা তিরোহিত হইল। ভূমিকার যে অংশ, আমাদিগের এই অপ্রবৃত্তির কারণ, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"গ্রন্থকারের জীবনী লিখিবার সময় হয় নাই। ইনি একজন বিলক্ষণ মনস্বী এবং প্রতিভাসম্পন্ন লোক। দারিদ্র্য বশতঃ উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু অগ্নি কখনও ভস্মাচ্ছাদিত থাকে না! সহস্র বাধা সত্ত্বেও ইঁহার প্রকৃতি প্রদত্ত গুণনিচয় ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। সম্প্রতি ইনি শিক্ষা-লাভার্থ ইউরোপে গমন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। জন্‌সন যেমন মাতৃ-প্রেতকৃত্য নির্ব্বাহের জন্য সপ্তাহমধ্যে রাসেলাস উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ উল্লিখিত বিশেষ উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া এবং দুইখানি উৎকৃষ্ট মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের প্রধান লেখকতার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াও তিন মাস মধ্যে এই কাব্য লিখিয়াছেন, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এমন কি গ্রন্থ কলেবরের তিন চতুর্থাংশ লিখিত হইলেই মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হইয়াছে। আমরা ভরসা করি গ্রন্থকারের মনোরথ সংসিদ্ধ হইবে।"

আমরা ইহাতে বুঝিতেছি যে লেখক তরুণবয়স্ক—এখনও শিক্ষার্থী—এবং সম্পন্ন ব্যক্তি নহেন—অর্থাভাবে সুশিক্ষায় বঞ্চিত। কাব্য পাঠেও আমরা এ দুইটী কথার পরিচয় পাইয়াছি। তিনি বিলাত যাইবার ইচ্ছুক হইয়াছেন, এবং পাথেয় সংগ্রহের জন্য হেলেনা কাব্যকে বঙ্গসমাজে প্রেরণ করিয়াছেন। এমত অবস্থায় গ্রন্থের সমুচিত সমালোচনা করিয়া, আমরা তাঁহার মনোরথ ভঙ্গ করিতে অনিচ্ছুক। বিলাত গেলেই বাঙ্গালীর ছেলে একটা কিছু হইয়া আইসে—আর কাহারও কিছু

হউক না হউক দরজিদিগের কিছু উপকার হয়—অতএব এরূপ মহৎ উদ্দেশ্যের বিঘ্ন করা আমাদের ইচ্ছা নহে। হেলেনা মনুষ্যাকারে গ্রীক্‌দিগকে আসিয়ায় আনিয়াছিলেন ; ভরসা করি তিনি কাব্যাকারের আনন্দ বাবুকে ময়মনসিংহ হইতে ইউরোপে লইয়া ফেলিবেন।

পরন্তু আমাদিগের দ্বারা এ গ্রন্থ সমালোচিত হইবার তাদৃশ প্রয়োজনও নাই। কেন না, বাবু শ্রীনাথ চন্দ ময়মনসিংহের জেলা স্কুল হইতে ইহার সমালোচনা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার লিখিত ভূমিকা হইতে আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

"কবিকেশরী মধুসূদন অমিত্রচ্ছন্দে মেঘনাদবধ প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালা ভাষা যে কেবল আবেশময়ী ললিত পদাবলীব উপযোগী নহে, ইহাতে যে ভেরী তূরী দুন্দুভিধ্বনির সহিত স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের চিত্তবিস্ময়কর অপূর্ব্ব চিত্র চিত্রিত হইতে পারে, তাহার বিলক্ষণ পবিচয় দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালীর ভাগ্যে সে সুখ অধিকদিন সহ্য হইল না! অকালে মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে। বাঙ্গালা কাব্য পুনশ্চ আপন পথ চিনিয়া তাহাতেই প্রবাহিত হইতেছে। বঙ্গীয় কবিগণ আবাব যেন মত্বল মৃত্বল মোহন স্বরে বীণাধ্বনি করিতেছেন। বাঙ্গালীব হৃদয় অবেশে নৃত্য কবিতেছে। আব গীতি কবিতা ভাল লাগে না। অবিবত বীণাধ্বনিতে শ্রবণ তৃপ্ত হয় না, তুই একবাব শঙ্খধ্বনি শুনিলে মনে একটু একটু সজীবতা জন্মে। মেঘনাদবধেব পব এ প্রকৃতির কাব্য বাঙ্গালায় জন্মিল না, বলিতে কি বৃত্রসংহাব এবং পলাশীব যুদ্ধেও গীতি কবিতাবই প্রাধান্য ঘটিয়াছে। হেলেনা কাব্য কোন্ শ্রেণীতে স্থান পাইবাব যোগ্য, বঙ্গকবিদিগের মধ্যে আনন্দচন্দ্র কোন্ আসন লাভ করেন, তাহা বলিবার সময় হয় নাই ; কিন্তু অনেক দিন পরে আমাদের কর্ণে একটী বহু দূর সমানীত শঙ্খধ্বনি প্রবেশ করিল, শ্রবণ পরিতৃপ্ত হইল। অন্যেরও হইবে কি?"

হায়! হেমচন্দ্র! তোমার দশা কি হইবে! তুমি অপূর্ব্ব মহাকাব্য সৃজন করিয়া পায়ের উপর পা দিয়া মনে মনে ভাবিতেছ, তোমার যশ পুরুষানুক্রমে বঙ্গদেশে ঘোষিবে! কিন্তু হায়! ময়মনসিংহের স্কুলের ছেলে মহলে শাঁক বাজিয়াছে! যেমন শাঁক বাজিয়াছে অমনি তোমার যশঃপক্ষী ডানা বাহির করিয়া ফুড়ুক্ করিয়া উড়িয়া পলাইয়াছে। তুমি আর বৃথায় কলম ধর।

ফলতঃ শ্রীনাথ বাবুর মত নির্লজ্জ সমালোচক আমরা দেখি নাই—অথবা কেবল বাঙ্গালা সম্বাদপত্রেই দেখিতে পাই। বাস্তবিক এই হেলেনা কাব্য কিছুই নহে—কেবল অপক্কবুদ্ধি অশিক্ষিত ব্যক্তিরচিত মধুসূদন দত্তের অসার অনুকরণ।

লেখকের অনুকরণেও বিশেষ ক্ষমতা নাই—গুণ গুলির অনুকরণ হয় নাই কিন্তু দোষ গুলির ট্রু কাপি। সেই অনুকরণ-প্রবৃত্তি এত বলবৎ যে ট্রয়ের যুদ্ধে ইন্দিরা ও রাজলক্ষ্মীর শ্রাদ্ধ! কেবল ইহাতে কবি ও সমালোচক সন্তুষ্ট নহেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ত হইল—দালিল, ভানিল, প্রাণিল প্রভৃতি অশ্রুতপূর্ব্ব ক্রিয়াপদও হইল, ফণীন্দ্র করীন্দ্র দেবেন্দ্র ইন্দিরা দম্ভোলি প্রভৃতি শব্দে মাইকেলি শব্দ ঘটাও জুটিয়া গেল—মেঘনাদ বধ হইতে নামিয়া রাজলক্ষ্মী হেলেনা কাব্যে প্রবেশ করিলেন—তবু ট্রু কাপির একটা বাকি রহিল—টীকা কই? হেমবাবু মেঘনাদ বধের টীকা করিয়াছেন—হেলেনারও টীকা চাই। সুতরাং যেমন শুকদেব একেবারে দাড়ি গোঁপ সহিত মাতৃগর্ব্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন, হেলনা কাব্যও তেমনি একেবারে সটীক মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাহির হইয়াছে। বাবু শ্রীনাথ চন্দ এই টীকার প্রণেতা। কাব্য যেমন হৌক আমরা এই টীকাতেই অধিক আমোদ পাইয়াছি। পাঠকগণকে সে রসে আমরা বঞ্চিত করিব না। কয়েকটি টীকা উদ্ধৃত করিতেছি;—

ডমরুধ্বনি—বীবরসপূর্ণ কবিতা।

অস্ত্রের ঝলকে—অস্ত্রের ঝকমকিতে।

গিরিজা গিরিশে হেরি—(কঠিন পদ্য!) দুর্গা শিবকে দেখিয়া।

বীচিমালা—তরঙ্গমালা

গঙ্গ মহাবলী—মহাবলী গঙ্গা

জলেশের পুরী—বরুণালয়

সৃষ্টিস্থিতি হেতু—সৃষ্টি রক্ষার মূল

উলিসিস্—Ulysses!

কুমার যেন—কার্ত্তিক সদৃশ।

আর চাই?

বীণা। (নানা বিষয়িনী কবিতা প্রকাশিনী মাসিক পত্রিকা।) শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত। প্রথম খণ্ড—প্রথম সংখ্যা। আলবার্ট প্রেস—কলিকাতা। ১২৮৫। পত্রিকাখানি এত ক্ষুদ্রকার যে আমাদিগের প্রথমে বোধ হইয়াছিল যে এখানি খেলা ঘরের মেগেজিন—অথবা লিলিপট হইতে প্রেরিত হইয়াছে। তার পর ভাবিলাম যে যখন পত্রিকাখানি কেবল কবিতাময়ী, তখন ইহা যত ছোট হয় ততই ভাল।—আমরা রাজকৃষ্ণ বাবুর কবিতার নিন্দা করি না। তিনি উত্তম পদ্য লিখিয়া থাকেন এবং বীণার প্রথম সংখ্যায় যে কবিতাগুলি বাহির হইয়াছে, তাহা সুমিষ্ট। উদাহরণ—

(১)

প্রণমি' বাণীর পদে, এ ভাঙ্গা বীণায়
এই ত বাঁধিনু তার, কিন্তু কে বাজায়?
চারিদিকে চেয়ে আজ,
সভয়ে বীণায় সাজ
চড়া'য়ে মিলানু সুর অঙ্গুলির ঘায়;
যা' জানি—করিনু তাই;—কিন্তু কে বাজায়?

(২)

সে দিনের কথা মনে জাগিয়া উঠিল;
কি সে' কথা'?—'মহাবজ্র মস্তকে পড়িল!'
এ বজ্র ইন্দ্রের নয়,
এ বজ্র লৌহের নয়,
এ বজ্র বিষম বজ্র!—হায়, কে গড়িল?
অই যা,—বীণার তার আবার ছিঁড়িল!

(৩)

ছি ছি রে, এ কা'র কাজ,
কি করি' সে ভুলি' লাজ,
গড়িল এ ভীম বাজ,
সে কি দয়াহীন?
তা'রি এ বজ্রের ঘায়,
কি ক'ব রে, হায় হায়!
ভেঙ্গেছে সাধের মোর
আদরের বীণ!

(৪)

নিতান্ত বিষণ্ন হ'য়ে,
ভাঙ্গা বীণা করে ল'য়ে,
যোড়েতাড়ে সাজাইনু
বাজা'তে আবার;
মনে আশা,—বাজা'বার,
কিন্তু কি বাজা'ব আর,
সভয়ে অঙ্গুলি-ঘায়
ছিঁড়ে যায় তার!

(৫)

ছিঁড়ুক যতই বার,
আমিও ততই বার
যতনে বাঁধি না তার?—
দেখি না কি হয়?
ফুরা'লে ধাতুর তার,
উপাড়িয়া কেশভার
বাঁধিব বীণায় ফের,
দেখি কি না রয়?

(৬)

তাও যদি ছিঁড়ে যায়,
শিরা ছিঁড়ে পুনরায়
বাঁধিব বীণায়, মোর
যতক্ষণ প্রাণ;
তথাপি ক্ষণেক তরে
ফেলিব না ভূমি'পরে
বীণারে;—হৃদয়ে ধ'রে
গা'ব আজি গান।

কবিতা সুমিষ্ট—কিন্তু পদ্যময়ী পত্রিকার আমরা বড় গোঁড়া হইতে পারিলাম না।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নবম পরিচ্ছেদ

রাণা অনন্ত মিশ্রকে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, অনন্ত মিশ্রও তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন – কিন্তু তাঁহার চিত্ত স্থির ছিল না। অশ্বারোহীর যোদ্ধবেশ এবং তীব্র দৃষ্টিতে তিনি কিছু কাতর হইয়াছিলেন। একবার ঘোরতর বিপদ্গ্রস্ত হইয়া, ভাগ্যক্রমে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন—কিন্তু আর সব হারাইয়াছেন—চঞ্চলকুমারীর আশা ভরসা হারাইয়াছেন—আর কি বলিয়া তাঁহার কাছে মুখ দেখাইবেন? ব্রাহ্মণ এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন পর্ব্বতের উপরে দুই তিন জন লোক দাঁড়াইয়া কি পরামর্শ করিতেছে। ব্রাহ্মণ ভীত হইলেন; মনে করিলেন, আবার নূতন দস্যুসম্প্রদায় আসিয়া উপস্থিত হইল না কি? সেবার—নিকটে যাহা হয় কিছু ছিল, তাহা পাইয়া দস্যুরা তাঁহার প্রাণবধে বিরত হইয়াছিল—এবার যদি ইহারা তাঁহাকে ধরে তবে কি দিয়া প্রাণ রাখিব? এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন যে, পর্ব্বতারূঢ় ব্যক্তিরা হস্তপ্রসারণ করিয়া তাঁহাকে দেখাইতেছে এবং পরস্পর কি বলিতেছে। ইহা দেখিবামাত্র, ব্রাহ্মণের যা কিছু সাহস ছিল, তাহা গেল—ব্রাহ্মণ পলায়নের উদ্যোগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময়ে পর্ব্বতবিহারীদিগের মধ্যে একজন পর্ব্বত অবতরণ করিতে আরম্ভ করিল—দেখিয়া ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন।

তখন ধর ধর করিয়া তিন চারি জন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। ব্রাহ্মণও ছুটিলেন—অজ্ঞান, মুক্তকচ্ছ, তথাপি নারায়ণ নারায়ণ স্মরণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ তীরবৎ বেগে পলাইলেন। যাহারা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে শেষে আর না দেখিতে পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল।

তাহারা অপর কেহই নহে—মহারাণার ভৃত্যবর্গ। মহারাণার সহিত এস্থলে কি প্রকারে আমাদিগের সাক্ষাৎ হইল, তাহা এক্ষণে বুঝাইতে হইতেছে।

রাজপুতগণের শিকারে বড় আনন্দ, অদ্য মহারাণা শত অশ্বারোহী এবং ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারা শিকাবে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া উদয়পুরাভিমুখে যাইতেছিলেন। রাজসিংহ, সর্ব্বদা প্রহরিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, রাজা হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন না। কখন কখন অনুচর-বর্গকে দূরে রাখিয়া একাকী অশ্বারোহণ করিয়া ছদ্মবেশে প্রজাদিগের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতেন। সেইজন্য তাঁহার রাজ্যে প্রজা অত্যন্ত সুখী হইয়া উঠিয়াছিল; স্বচক্ষে সকল দেখিতেন, স্বহস্তে সকল দুঃখ নিবারণ কবিতেন।

অদ্য মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি অনুচরবর্গকে পশ্চাতে আসিতে বলিয়া দিয়া, বিজয়নামা দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় অনন্ত মিশ্রেব সহিত সাক্ষাৎ হইলে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কথিত হইয়াছে। বাজা দস্যুর কৃত অত্যাচার শুনিয়া স্বহস্তে ব্রহ্মস্ব উদ্ধারের জন্য ছুটিযাছিলেন। যাহা দুঃসাধ্য এবং বিপদপূর্ণ তাহাতেই তাঁহার আমোদ ছিল।

এদিকে অনেক বেলা হইল দেখিয়া কতিপব বাজভৃত্য দ্রুতপদে তাঁহার অনুসন্ধানে চলিল। নীচে অবতবণকালে দেখিল বাণার অশ্ব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—ইহাতে তাহাবা বিস্মিত এবং চিন্তিত হইল। আশঙ্কা কবিল যে রাণার কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে। নিম্নে শিলাখণ্ডোপবি অনন্ত ঠাকুর বসিয়া আছেন দেখিয়া তাহারা বিবেচনা করিল যে এই ব্যক্তি অবশ্য কিছু জানিবে। সেই জন্য তাহারা হস্তপ্রসারণ করিয়া সে দিকে দেখাইয়া দিতেছিল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা বাদ করিবার জন্য তাহারা নামিতেছিল, এমত সময়ে ঠাকুরজি নাবায়ণ স্মরণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তখন তাহাবা ভাবিল, তবে এই ব্যক্তি অপরাধী। এই ভাবিয়া তাহারা পশ্চাৎ ধাবিত হইল। ব্রাহ্মণ এক গহ্বরমধ্যে লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

এদিকে মহাবাণা চঞ্চলকুমারীর পত্রপাঠ সমাপ্ত ও মাণিকলালকে বিদায় করিয়া অনন্ত মিশ্রের তল্লাসে গেলেন। দেখিলেন সেখানে ব্রাহ্মণ নাই—তৎ-পরিবর্ত্তে তাঁহার ভৃত্যবর্গ, এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী অশ্বারোহিগণ আসিয়া অধিত্যকার তলদেশ ব্যাপিত করিয়াছে। রাণাকে দেখিতে পাইয়া সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। বিজয়, প্রভুকে দেখিতে পাইয়া, তিন লম্ফে অবতরণ করিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল। রাণা তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহার বস্ত্র রুধিরাক্ত দেখিয়া সকলেই বুঝিল, যে একটা কিছু ক্ষুদ্র ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজপুতগণের ইহা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার—কিছু কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।

রাণা কহিলেন, "এইখানে এক ব্রাহ্মণ বসিয়াছিল; সে কোথায় গেল—কেহ দেখিয়াছ?"

যাহারা উহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল তাহারা বলিল; "মহারাজ সে ব্যক্তি পলাইয়াছে।"

রাণা। শীঘ্র তাহার সন্ধান করিয়া লইয়া আইস।

ভৃত্যগণ তখন সবিশেষ কথা বুঝাইয়া নিবেদন করিল যে, আমরা অনেক সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু পাই নাই।

অশ্বারোহিগণ মধ্যে রাণার পুত্রদ্বয়, তাঁহার জ্ঞাতি ও অমাত্যবর্গ প্রভৃতি ছিল। রাজা পুত্রদ্বয় ও অমাত্যবর্গকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া কথাবার্ত্তা বলিলেন, "প্রিয়জনবর্গ! আজি অধিক বেলা হইযাছে; তোমাদিগের সকলের ক্ষুধা-তৃষ্ণা পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ উদযপুবে গিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবাবণ করা আমাদিগেব অদৃষ্টে নাই। এই পার্ব্বত্য পথে আবার আমাদিগকে ফিবিয়া যাইতে হইবে। একটু ক্ষুদ্র লড়াই জুটিযাছে—লড়াইয়ে যাহাব সাধ থাকে আমার সঙ্গে আইস—আমি এই পর্ব্বত পুনরাবোহণ কবিব। যাহাব সাধ না থাকে, উদয়পুরে ফিবিয়া যাও।"

এই বলিযা বাণা পর্ব্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি "জয় মহারাণা কি জয়! জয় মাতা জী কি জয়!" বলিয়া সেই শত অশ্বারোহী তাঁহার পশ্চাতে পর্ব্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইল। উপবে উঠিয়া হব! হব! হব! শব্দে, রূপনগরের পথে ধাবিত হইল। অশ্বক্ষুরেব আঘাতে অধিত্যকায় ঘোরতর প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

এদিকে অনন্ত মিশ্র রূপনগর হইতে যাত্রা করার তিন চারি দিন পরে রূপনগরে মহাধূম পড়িয়াছিল। মোগল বাদশাহের দুই সহস্র অশ্বারোহী সেনা রূপনগরের গড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা চঞ্চলকুমারীকে লইতে আসিয়াছে।

নির্ম্মলের মুখ শুকাইল; দ্রুতবেগে সে চঞ্চলকুমারীর কাছে গিয়া বলিল, "কি হইবে সখি?"

চঞ্চলকুমারী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কিসের কি হইবে?"

নির্ম্মল। তোমাকে ত লইতে আসিয়াছে। কিন্তু এইত সেদিন ঠাকুরজি উদয়পুরে গিয়াছেন—এখনও তিনি পৌঁছিতে পারেন নাই। রাজসিংহের উত্তর আসিতে না আসিতেই তোমায় লইয়া যাইবে—কি হইবে সখি?

চঞ্চল। তার উপায় নাই—কেবল আমার সেই শেষ উপায় আছে। দিল্লীর পথে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ—সে বিষয়ে আমি চিত্ত স্থির করিয়াছি। সুতরাং আমার আর উদ্বেগ নাই। একবার কেবল আমি পিতাকে অনুরোধ করিব—যদি মোগল সেনাপতি সাত দিনের অবসর দেন।

চঞ্চলকুমারী সময়মত পিতৃপদে নিবেদন করিলেন যে, "আমি জন্মের মত রূপনগর হইতে চলিলাম? আমি আর কখন যে আপনাদিগের শ্রীচরণ দর্শন করিতে পাইব, আর কখন যে বাল্যসখীগণের সঙ্গে আমোদ করিতে পাইব এমত সম্ভাবনা নাই। আমি আর সাতদিনের অবসর ভিক্ষা করি—সাতদিন মোগল সেনা এইখানে অবস্থিতি করুক। আব সাত দিন আমি আপনাকে দেখিয়া শুনিয়া জন্মের মত বিদায় হইব।"

রাজা একটু কাঁদিলেন। বলিলেন, "দেখি সেনাপতিকে অনুরোধ করিব কিন্তু তিনি অপেক্ষা করিবেন কি না বলিতে পাবি না।"

রাজা অঙ্গীকাব মত মোগল সেনাপতির কাছে নিবেদন জানাইলেন। সেনাপতি ভাবিয়া দেখিলেন, বাদশাহ কোন সময় নিরূপিত করিয়া দেন নাই—বলিয়া দেন নাই যে এতদিনেব মধ্যে ফিবিযা আসিবে। কিন্তু সাত দিন বিলম্ব কবিতে তাহাব সাহস হইল না; ভবিষ্যৎ বেগমের অনুরোধ একেবারে অগ্রাহ্য করিতেও পারিলেন না। আর তিন দিন অবস্থিত করিতে স্বীকৃত হইলেন। চঞ্চলকুমাবীব বড় একটা ভরসা জন্মিল না।

নিশীথকালে নিদ্রাব ঘোবে চঞ্চলকুমারী স্বপ্ন দেখিলেন যে, রজতগিরি-সন্নিভ মহাকায, বৃষভারূঢ়, স্নিগ্ধমূর্ত্তি, জটাজুটসমন্বিত, দেবাদিদেব মহাদেব তাহার সম্মুখে মূর্ত্তিমান্। তিনি আজ্ঞা কবিতেছেন, "তুমি কালি হইতে ভক্তি-ভাবে আমাব পূজা কবিবে। সেই বৎসর মধ্যে তোমাব বিবাহ হইবে না। তাহার পব, উপযুক্ত সময়ে তোমার বিবাহ হইবে। যদি এক বৎসব ভক্তি-ভাবে পূজা কব, তবে অভীপ্সিত স্বামী পাইবে, ভক্তির ত্রুটি হইলে অনভিমত স্বামীর হস্তে পড়িবে।" এই বলিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন।

প্রভাতে উঠিয়া, স্নান করিয়া চঞ্চলকুমাবী যত্নসঞ্চিত গঙ্গাজল লইয়া, মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। এবং প্রণাম কবত ভক্তিভাবে দেবাদিদেবের পূজা করিলেন। স্বপ্নের কথা কাহাকে বলিলেন না।

যে তিনদিন রাজকুমারী রূপনগরে অবস্থিতি করিলেন, সে তিন দিন, তিনি ঐরূপে শিবপূজা করিলেন। কিন্তু উদয়পুর হইতে কোন সম্বাদ আসিল না—মিশ্রঠাকুর ফিরিলেন না। তখন চঞ্চলকুমারী উর্দ্ধমুখে, যুক্ত করে বলিল, "হে অনাথনাথ দেবাদিদেব! অবলাকে কি প্রবঞ্চনা করিলে?"

তৃতীয় রজনীতে নির্ম্মল আসিয়া তাঁহার কাছে শয়ন করিল। সমস্ত রাত্রি দুইজনে দুইজনকে বক্ষে রাখিয়া রোদন করিয়া কাটাইল। নির্ম্মল বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" কয়দিন ধরিয়া সে এই কথাই বলিতেছিল। চঞ্চল বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাইবে? আমি মরিতে যাইতেছি।" নির্ম্মল বলিল "আমিও মরিব। তুমি আমায় ফেলিয়া গেলেই আমি কি বাঁচিব?" চঞ্চল বলিল, "ছি! অমন কথা বলিও না—আমার দুঃখের উপর কেন দুঃখ বাড়াও?" নির্ম্মল বলিল "তুমি আমাকে নিয়ে যাও বা না যাও, আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে যাইব—কেহ রাখিতে পাবিবে না।" দুইজনে কাঁদিয়া রাত্রি কাটাইল।

এদিকে, সৈয়দ হাসান আলি খাঁ, মনসবদার মোগল সৈন্যের সেনাপতি, রাত্রি প্রভাতে রাজকুমারীকে লইয়া যাইবার সকল উদ্যোগ করিয়া রাখিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

এই সময়ে একবার মাণিকলালের কথা পাড়িতে হইল।

মাণিকলাল রাণার নিকট হইতে বিদায় হইয়া, প্রথমে আবার সেই পর্ব্বতগুহায় ফিরিয়া গেল। আর সে দস্যুতা করিবে, এমত বাসনা ছিল না, কিন্তু পূর্ব্ববন্ধুগণ মরিল কি বাঁচিল তাহা দেখিবে না কেন? যদি কেহ একেবারে না মরিয়া থাকে তবে তাহার শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইতে হইবে। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে মাণিকলাল গুহা প্রবেশ করিল।

দেখিল, দুইজন মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যে কেবল মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, সে সংজ্ঞালাভ করিয়া উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। মাণিকলাল তখন বিষণ্ণচিত্তে বন হইতে একরাশি কাট ভাঙ্গিয়া আনিল—তদ্দ্বারা দুইটি চিতা রচনা করিয়া দুইটি মৃতদেহ তদুপরি স্থাপন করিল। গুহা হইতে প্রস্তর ও লৌহ বাহির করিয়া অগ্ন্যুৎপাদন পূর্ব্বক চিতায় আগুন দিল। এইরূপ সঙ্গীদিগের অন্তিম কার্য্য করিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া গেল। পরে মনে করিল যে, যে ব্রাহ্মণকে পীড়ন করিয়াছিলাম, তাহার কি অবস্থা হইয়াছে, দেখিয়া আসি। যেখানে অনন্ত মিশ্রকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সেখানে আসিয়া দেখিল যে, সেখানে ব্রাহ্মণ নাই। দেখিল স্বচ্ছসলিলা পার্ব্বত্য নদীর জল একটু ময়লা হইয়াছে—এবং অনেক স্থানে বৃক্ষশাখা, লতা গুল্ম তৃণাদি ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। এই সকল চিহ্নে মাণিকলাল মনে করিল যে, এখানে বোধ হয় অনেক লোক আসিয়াছিল। তারপর দেখিল, পাহাড়ের প্রস্তরময় অঙ্গেও কতকগুলি অশ্বের

পদচিহ্ন লক্ষ্য করা যায়—বিশেষ অশ্বের ক্ষুরে যেখানে লতা গুল্ম কাটিয়া গিয়াছে, অর্দ্ধ গোলাকৃত চিহ্ন সকল স্পষ্ট। মাণিকলাল মনোযোগ পূর্ব্বক বহুক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল যে এখানে অনেকগুলি অশ্বারোহী আসিয়াছিল।

চতুর মাণিকলাল তাহার পর দেখিতে লাগিল অশ্বারোহিগণ কোন্দিক্ হইতে আসিয়াছে—কোন্দিকে গিয়াছে। দেখিল কতকগুলি চিহ্নের সম্মুখ দক্ষিণে—কতকগুলি সম্মুখ উত্তরে। কতকদূর মাত্র দক্ষিণে গিয়া চিহ্ন সকল আবার উত্তরমুখ হইয়াছে। ইহাতে বুঝিল অশ্বারোহিগণ উত্তর হইতে এই পর্য্যন্ত আসিয়া আবার উত্তরাংশে প্রত্যাবর্ত্তন কবিয়াছে।

এই সকল সিদ্ধান্ত করিয়া মাণিকলাল গৃহে গেল। সে স্থান হইতে মাণিকলালের গৃহ দুই তিন ক্রোশ। তথায় রন্ধন করিয়া আহারাদি সমাপনান্তে, কন্যাটিকে ক্রোড়ে লইল। তখন মাণিলাল ঘরে চাবি দিয়া কন্যা ক্রোড়ে নিষ্ক্রান্ত হইল।

মাণিকলালের কেহ ছিল না—কেবল এক পিসীর ননদের যায়ের খুল্যতাত পুত্রী ছিল। সম্বন্ধ বড় নিকট—"সইয়েব বউযেব বকুল ফুলের বনপো বউয়ের বনঝি জামাই" প্রায়। সৌজন্যবশতই হউক আব আত্মীয়তাব সাধ মিটাইবার জন্যই হউক—মাণিকলাল তাহাকে পিসী বলিয়া ডাকিতেন।

মাণিকলাল কন্যা লইয়া সেই পিসীর বাড়ী গেল। ডাকিল, "পিসি গা?"

পিসী বলিল, "কি বাছা মাণিকলাল। কি মনে করিয়া?"

মাণিকলাল বলিল, "আমার এই মেয়েটি রাখিতে পাব পিসি?"

পিসী। কতক্ষণের জন্য?

মাণিক। এই দুমাস ছয়মাসের জন্য?

পিসী। সে কি বাছা! আমি গরীব মানুষ—মেয়েকে খাওয়াব কোথা হইতে?

মাণিক। কেন পিসী মা, তুমি কিসের গরীব? তুমি কি নাতিনীকে দুমাস খাওয়াতে পার না?

পিসী। সে কি কথা? দুমাস একটা মেয়ে পোষিতে যে এক মোহর পড়ে।

মাণিক। আমি সে এক মোহর দিতেছি—তুমি মেয়েটিকে দুমাস রাখ। আমি উদয়পুরে যাইব—সেখানে আমি রাজসরকারে বড় চাকরি পাইয়াছি। এই বলিয়া মাণিকলাল, রাণার প্রদত্ত আশরফির মধ্যে একটা পিসীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল; এবং কন্যাকে তাহার কাছে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "যা তোর দিদির কোলে গিয়া বস্।"

পিসীঠাকুরাণী কিছু লোভে পড়িলেন। মনে মনে বিলক্ষণ জানিতেন যে এক মোহরে ঐ শিশুর একবৎসর গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে—মাণিকলাল কেবল দুইমাসের করার করিতেছে। অতএব কিছু লাভের সম্ভাবনা। তার পর মাণিক রাজদরবারে চাকরি স্বীকার করিয়াছে—চাহি কি বড়মানুষ হইতে পারে—তা হইলে কি পিসীকে কখন কিছু দিবে না? মানুষটা হাতে থাকা ভাল!

পিসী তখন মোহরটী কুড়াইয়া লইয়া বলিল "তাব আশ্চর্য্য কি বাছা—তোমার মেয়ে মানুষ করিব সে কি বড় ভারি কাজ? তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আয় রে জান্ আয়!" বলিয়া পিসী কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইল।

কন্যা সম্বন্ধে এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে মাণিকলাল নিশ্চিন্ত চিত্তে গ্রাম হইতে নির্গত হইল। কাহাকে কিছু না বলিয়া রূপনগবে যাইবার পার্ব্বত্যপথে আরোহণ করিল।

মাণিকলাল এইরূপ বিচাব কবিতেছিল। ঐ অধিত্যকায় অনেকগুলি অশ্বারোহী আসিয়াছিল কেন? ঐখানে রাণাও একাকী ভ্রমিতে ছিলেন—কিন্তু উদয়পুর হইতে এতদূব রাণা একাকী আসিবাব সম্ভাবনা নাই। অতএব উহারা রাণার সমভিব্যাহারী অশ্বাবোহী। তারপব, দেখা গেল উহারা উত্তর হইতে আসিয়াছে—উদয়পুব অভিমুখে যাইতেছিল—বোধ হয় রাণা মৃগয়া বা বনবিহাবে গিয়া থাকিবেন—উদয়পুব ফিবিযা যাইতেছিলেন। তাব পর দেখিলাম, উহাবা উদয়পুব যায় নাই। উত্তবমুখেই ফিবিয়াছে—কেন? উত্তরে ত রূপনগব বটে। বোধ হয় চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া রাণা অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহাবে তাহাব নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছেন। তাহা যদি না গিয়া থাকেন তবে তাঁহার বাজপুতপতি নাম মিথ্যা। আমি তাঁহার ভৃত্য—আমি তাঁহার কাছে যাইব।

কিন্তু তাঁহারা অশ্বারোহণে গিয়াছেন—আমার পদব্রজে যাইতে অনেক বিলম্ব হইবে। তবে এক ভরসা পার্ব্বত্যপথে অশ্ব তত দ্রুত যায় না। এবং মাণিকলাল পদব্রজে বড় দ্রুতগামী। মাণিকলাল দিবা রাত্রি পথ চলিতে লাগিল। যথাকালে সে রূপনগরে পৌঁছিল। পৌঁছিয়া দেখিল যে রূপনগরে দুই সহস্র মোগল অশ্বারোহী আসিয়া শিবির করিয়াছে কিন্তু রাজপুত সেনার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। আরও শুনিল পরদিন প্রভাতে মোগলেরা রাজকুমারীকে লইয়া যাইবে।

মাণিকলাল বুদ্ধিতে একটি ক্ষুদ্রতর সেনাপতি। রাজপুতগণের কোন সন্ধান না পাইয়া, কিছুই দুঃখিত হইল না। মনে মনে বলিল মোগল পারিবে না—কিন্তু আমি প্রভুর সন্ধান করিয়া লইব।

একব্যক্তি নাগরিককে বলিল, আমাকে দিল্লী যাইবার পথ দেখাইয়া দিতে পার? আমি কিছু বখশিস দিব। নাগরিক সম্মত হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া দিল। মাণিকলাল তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় করিল, পরে দিল্লীর পথে, চারিদিক্ ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে চলিল। মাণিকলাল স্থির করিয়াছিল যে, রাজপুত অশ্বারোহীগণ অবশ্য দিল্লীর পথে কোথাও লুকাইয়া আছে। প্রথমতঃ কিছুদূর পর্য্যন্ত মাণিকলাল রাজপুত সেনার কোন চিহ্ন পাইল না। পরে একস্থানে দেখিল, পথ অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। দুই পার্শ্বে দুইটী পাহাড় উঠিয়া, প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ সমান্তরাল হইয়া চলিয়াছে— মধ্যে কেবল সংকীর্ণ পথ। দক্ষিণদিকে পর্ব্বত অতি উচ্চ—এবং দুরারোহণীয়— তাহার শিখরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বামদিকে পর্ব্বত, অতি ধীরে ধীরে উঠিয়াছে। আরোহণের সুবিধা, এবং পর্ব্বত ও অনুচ্চ। একস্থানে ঐ বামদিকে, একটি রন্ধ্র বাহির হইয়াছে তাহা দিয়া একটু সূক্ষ্ম পথ আছে।

নাপোলেয়ন্ প্রভৃতি অনেক দস্যু সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। রাজা হইলে লোকে আর দস্যু বলে না। মাণিকলাল রাজা নহে সুতরাং আমরা তাহাকে দস্যু বলিতে বাধ্য, কিন্তু রাজদস্যুদিগের ন্যায় এই ক্ষুদ্র দস্যুরও সেনাপতির চক্ষু ছিল। পর্ব্বতনিরুদ্ধ সঙ্কীর্ণ পথ দেখিয়া সে মনে করিল, রাণা যদি আসিয়া থাকেন তবে এইখানেই আছেন। যখন মোগল সৈন্য এই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যাইবে—এই পর্ব্বত শিখর হইতে রাজপুত অশ্ব বজ্রের ন্যায় তাহাদিগের মস্তকে পড়িতে পারিবে। দক্ষিণদিকের পর্ব্বত দুরারোহণীয়; অশ্বারোহিগণের আরোহণ ও অবতরণের অনুপযুক্ত, অতএব সেখানে রাজপুত সেনা থাকিবে না—কিন্তু বামের পর্ব্বত হইতে তাহাদিগের অবতরণের বড় সুখ। মাণিকলাল তদুপরি আরোহণ করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

উঠিয়া কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইল না। মনে করিল, খুঁজিয়া দেখি, কিন্তু আবার ভাবিল, রাজা ভিন্ন আর কোন রাজপুত আমাকে চেনে না; আমাকে মোগলের চর বলিয়া হঠাৎ কোন অদৃশ্য রাজপুত আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারে। এই ভাবিয়া সে আর অগ্রসর না হইয়া, সেইস্থানে দাঁড়াইয়া বলিল, "মহারাণার জয় হউক!"

এই শব্দ উচ্চারিত হইবা মাত্র চারি পাঁচজন শস্ত্রধারী রাজপুত অদৃশ্য স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দাঁড়াইল, এবং তরবারি হস্তে মাণিকলালকে কাটিতে আসিতে উদ্যত হইল।

একজন বলিল, "মারিও না।" মাণিকলাল দেখিল, স্বয়ং রাণা।

রাণা বলিল, "মারিও না। এ আমাদিগের স্বজন।" যোদ্ধৃগণ তখনই আবার লুক্কাইত হইল।

রাণা মাণিককে নিকটে আসিতে বলিলেন, সে নিকটে আসিল। এক নিভৃত স্থলে তাহাকে বসিতে বলিয়া, স্বয়ং সেইখানে বসিলেন। রাণা তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ ?"

মাণিকলাল বলিল, "প্রভু যেখানে, ভৃত্য সেইখানে যাইবে। বিশেষ যখন আপনি এরূপ বিপদজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন যদি ভৃত্য কোনও কার্য্যে লাগে, এই ভরসায় আসিয়াছে। মোগলেরা দুই সহস্র—মহারাজেরব সঙ্গে এক শত। আমি কি প্রকাবে নিশ্চিন্ত থাকিব ? আপনি আমাকে জীবন দান কবিয়াছেন—একদিনেই কি তাহা ভুলিব ?"

রাণা জিজ্ঞাসা কবিলেন, "আমি যে এখানে আসিয়াছি তুমি কি প্রকারে জানিলে ?"

মাণিকলাল তখন আদ্যোপান্ত সকল বলিল। শুনিযা বাণা সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "আসিযাছ ভালই করিয়াছ—আমি তোমার মত সুচতুর লোক একজন খুঁজিতেছিলাম। আমি যাহা বলি পাবিবে ?"

মাণিকলাল বলিল, "মনুষ্যের যাহা সাধ্য তাহা করিব।"

রাজা বলিলেন, "আমরা একশত যোদ্ধামাত্র ; মোগলের সঙ্গে দুই হাজার—আমরা রণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু জয়ী হইতে পারিব না। যুদ্ধ করিয়া রাজকন্যার উদ্ধাব করিতে পারিব না। রাজকন্যাকে আগে বাঁচাইয়া পরে যুদ্ধ করিতে হইবে। রাজকন্যা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিলে তিনি আহত হইতে পারেন। তাঁহার রক্ষা প্রথমে চাই।"

মাণিকলাল বলিল, "আমি ক্ষুদ্রজীব, আমি সে সকল কি প্রকারে বুঝিব, আমাকে কি করিতে হইবে তাহাই আজ্ঞা করুন।"

রাজা বলিলেন, "তোমাকে মোগল অশ্বারোহীর বেশ ধরিয়া কল্য মোগল সেনার সঙ্গে আসিতে হইবে। রাজকুমারীর শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে থাকিতে হইবে। এবং যাহা যাহা বলিতেছি তাহা করিতে হইবে।" রাণা তাহাকে সবিস্তারিত উপদেশ দিলেন।

মাণিকলাল শুনিয়া বলিলেন, "মহারাজের জয় হউক ! আমি কার্য্য সিদ্ধ করিব। আমাকে অনুগ্রহ করিয়া একটী ঘোড়া বক্সিস করুন।"

রাণা। আমরা একশত যোদ্ধা এক শত ঘোড়া। আর ঘোড়া নাই যে তোমায় দিই। অন্য কাহারও ঘোড়া দিতে পারিব না—আমার ঘোড়া লইতে পার।

মাণিক। তাহা প্রাণ থাকিতে লইব না। আমাকে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার দিন।

রাণা। কোথা পাইব? যাহা আছে তাহাতে আমাদের নিকট কুলায় না। কাহাকে নিরস্ত্র করিয়া তোমাকে হাতিয়ার দিব? আমার হাতিয়ার লইতে পার।

মাণিক। তাহা হইতে পারে না। আমাকে পোষাক দিতে আজ্ঞা হউক।

রাণা। এখানে যাহা পরিয়া আসিয়াছি, তাহা ভিন্ন আর পোষাক নাই। আমি কিছুই দিব না।

মাণিক। মহারাজ! তবে অনুমতি দিউন আমি যে প্রকারে হউক এসকল সংগ্রহ করিয়া লই।

রাণা হাসিলেন। বলিলেন, "চুরি করিবে?"

মাণিকলাল জিহ্বা কাটিল। "আমি শপথ করিয়াছি যে, আর সে কার্য্য করিব না।"

রাণা। তবে কি করিবে?

মাণিক। ঠকাইয়া লইব।

রাণা হাসিলেন। বলিলেন, "যুদ্ধ কালে সকলেই চোর—সকলেই বঞ্চক। দেখ আমিও বাদশাহের বেগম চুরি করিতে আসিয়াছি—চোরের মত লুকাইয়া আছি! তুমি যে প্রকারে পার এ সকল সংগ্রহ করিও।"

মাণিকলাল প্রফুল্লচিত্তে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।
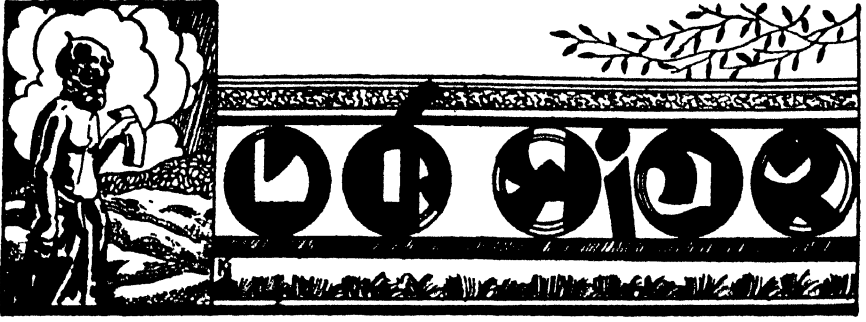
পঞ্চম তর্ক—কারণ কি ?

রিড প্রভৃতি ইউরোপীয় নবদর্শনবিদ্‌দিগের মত এই যে বস্তুর উৎপাদক বা মূল কারণ কিছুই নাই, তবে একটি বস্তু পূর্ব্বে থাকিলে আর একটি বস্তু পরে হয়। আমরা ইহাই দেখিতে দেখিতে পরিশেষে ইহাও স্থির করিতে পারি যে, অমুক বস্তু পূর্ব্বে থাকিলে অমুক বস্তু উৎপন্ন হয়, কার্য্যকারণ সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত কিছুই জানিতে পারি না। হিউম বলিয়াছেন যে, কারণ শব্দের অর্থই কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী এতদ্ভিন্ন আর কিছুই কারণ নাই।*

কোমৎ বলেন জগতীয় কার্য্যসম্বন্ধে আমরা কেবল কতকগুলি নিয়ম অবগত আছি, অমুক ঘটনা হইলে অমুক ঘটনা হয় ইত্যাদি। কিন্তু সেই কার্য্যকলাপের নৈসর্গিকভাব কিম্বা তাহাদের মূল বা উৎপাদক কারণের বিষয় আমরা কিছুই জানি না এবং সে সকল জানিবার আমাদের অধিকারও নাই।

"The laws of phœnomena are all we know respecting them, their essential nature and their ultimate causes, either efficent or final are unknown and inscrutable to us."—*Mill.*

ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে কারণের বিশুদ্ধ লক্ষণের অভাব থাকায় একটি বিশুদ্ধ কারণের লক্ষণ প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক তর্ক এবং পরিশ্রম ব্যয়িত হইয়াছে, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইলেও একখানি বৃহদ্‌গ্রন্থে স্থান পায় না। আর আমাদের সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্রে যখন বিশুদ্ধ কারণের লক্ষণ রহিয়াছে, তখন আর ইহা লইয়া পুস্তক বাড়াইবার প্রয়োজন কি ?

ডাক্তার ব্যালাণ্টাইন সাহেব তাঁহার "Method of Induction" নামক পুস্তকে কারণ নির্ণয় স্থলে বলিয়াছেন এক একটী কার্য্যের পূর্ব্বে যে এক একটী বস্তু থাকিবে তাহার কোন নিয়ম নাই। সর্ব্বত্রই অনেকগুলি বস্তু পূর্ব্বে মিলিত

* Cause, as he interprets it means the invariable antecedent.

হইয়া একটী কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে। তবে আমরা যে অনেক স্থানে এক একটাকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি তাহার প্রতি হেতু এই যে, একটী কার্য্য উৎপন্ন হইতে যে সকল ঘটনার পূর্ব্বে থাকা আবশ্যক তাহারা সকলেই যে ঠিক্ অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে সংঘটিত হয়, তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই অনেক পূর্ব্বকাল হইতে সঞ্চিত হইতে থাকে। এইরূপ সঞ্চিত হইতে হইতে উহাদিগের মধ্যে যেটী কার্য্যের ঠিক্ অব্যবহিত পূর্ব্বে সংঘটিত হয় তাহাকেই আমরা কারণ বলিয়া গণনা করি। যেমন কোন ব্যক্তিকে দুর্গোৎসব বা আদ্যশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রক্ষার পর মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া আমরা তাহার সেই ভোজনকে তাদৃশ কার্য্যের কারণ মনে করিয়া এই বলিয়া খেদ করি "আহা! ব্রাহ্মণ পেটের দায়ে প্রাণটা হারালে গা!" কিন্তু বাস্তবিক দেখিতে গেলে কেবল ভোজনই যে মৃত্যুর কারণ তাহা কখনই হইতে পারে না, ইহার পূর্ব্বে অবশ্যই ঐ ব্যক্তির শরীরে এরূপ কোন ব্যাধির সঞ্চার হইয়া থাকিবে যাহার সহিত ঐ ভোজন মিলিত হইয়া একবারে মৃত্যুর উৎপাদক হইল।

এখানে একথা বলা আবশ্যক হইতেছে যে, যেমন বিশেষ বিশেষ বস্তু পূর্ব্বে থাকিলে বিশেষ বিশেষ কার্য্য উৎপন্ন হয় সেইরূপ বিশেষ বিশেষ বস্তু পূর্ব্বে থাকিলে আবাব কোন কোন কার্য্য উৎপন্ন হয় না, উহাদিগকে কার্য্যের প্রতিবন্ধক বলা যায়। এই প্রতিবন্ধক যখন কাবণেব অপেক্ষা অধিক বলশালী হয় তখনকার ত কথাই নাই, উহা কারণের সহিত তুল্য বল হইলেও কার্য্যোৎপত্তি হয় না। যেমন কোন বস্তুব উপব যে দিকে বল প্রয়োগ কবা যায় বস্তু তদভিমুখেই গমন করে, কিন্তু বস্তুর দুই বিপবীত দিকে তুল্য বল প্রয়োগ করিলে বস্তু কোন দিকে গমন করে না একস্থানে স্থির হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা এই স্থির হইতেছে যে একটী কার্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে যেমন কোন কোন বস্তুর থাকা আবশ্যক করে সেইরূপ একটী কার্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে কোন বস্তুর না থাকাও আবশ্যক করে। দেখ পূর্ব্বোক্ত স্থির অবস্থাপ্রাপ্ত বস্তু হইতে যদি একতর দিকের বল উদ্ঘাটন করা হয়, তাহা হইলে বস্তুর অন্যতর দিকে গতি হয়। অতএব পূর্ব্বভাবের (থাকার) ন্যায় পূর্ব্বাভাবও (পূর্ব্বে না থাকাও) কার্য্যের কারণ হইতে পারে এই নিমিত্ত বৈশেষিক সূত্রের উপস্কারকার শঙ্কর মিশ্র দুই প্রকার কারণ লক্ষণ করিয়াছেন যথা—

"অনন্যথাসিদ্ধ নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তি জাতীয়ত্বং সহকারী বৈফল্য প্রযুক্ত কার্য্যাভাববত্বং বা কারণত্বম্।"

অভাবের কারণতা দেখাইবার জন্য আমরা আর দুই একটি উদাহরণ দেখাইতে বাধ্য হইলাম। যেমন দুঃখের অভাব হইলে সুখ হয়, শারীরিক নিয়ম

প্রতিপালনের অভাব হইলে পীড়া হয় এবং সম্পদের অভাব হইলে এই চতুর্দ্দিকে আত্মীয়পূর্ণ সুখময় সংসারও একবারে মহাকাশের ন্যায় শূন্যময় হইয়া উঠে।

যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে সকল কারণই যে কার্য্যের পূর্ব্বে থাকে তাহা নয়, অনেক কারণকে কার্য্যের সহিত একত্র উৎপন্ন, এবং এক সময় অবস্থিত হইতে দেখা যায়। যেমন গাত্রোত্তাপের কারণ জ্বর ও গাত্রোত্তাপ এক সঙ্গে উৎপন্ন হয় এবং যতক্ষণ গাত্রোত্তাপ থাকে ততক্ষণই জ্বর থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাস আগত হইবামাত্র বাঙ্গালাদেশে আম্র পাকিতে থাকে, যতকাল জ্যৈষ্ঠ মাস ততকালই পাকা আম্র! আবার যেমন জ্যৈষ্ঠমাস ফুরায় অমনি বাঙ্গালা দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার আনন্দের সহিত পাকা আমও অন্তর্হিত হয়। অতএব কারণ যে কেবল কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হইবে ইহা কিরূপে নিয়ম করা যাইতে পারে?

ইহার উত্তরে আমরা বলিব জ্বর গাত্রোত্তাপের কারণ নয়; জ্যৈষ্ঠ মাসও আম পাকিবার কারণ নয়। তবে যে কারণে জ্বর হয় সেই কারণেই গাত্রোত্তাপ হয় এবং বাঙ্গালা দেশে জ্যৈষ্ঠ মাস হইলে আম পাকিবার কারণ উপস্থিত হয়। গাত্রোত্তাপ জ্বরের কার্য্য নয় কিন্তু তদ্ব্যঞ্জক চিহ্ন। গাত্রোত্তাপ এবং আম পাকিবার যাহাই কারণ হউক তাহাদের কার্য্যের সহিত সমকালাবস্থিতির বিষয়ে অনেকে অনেকরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন যখন আমরা দেখি একটি কার্য্য অনেকক্ষণ স্থিতি করে, তখন যে কারণে উহা প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছে সেই কারণও তাহার সহিত বরাবর অবস্থিতি করে। যেমন যে কারণে আকাশস্থিত গ্রহনক্ষত্রগণ একবার সঞ্চালিত হইয়াছে সেই কারণ বরাবর আছে বলিয়াই উহাদিগের একরূপে গতি হইতেছে। যেরূপ বায়ুমণ্ডলীর ভারে তাপমান যন্ত্রস্থিত পারদ যে অংশে উপস্থিত হয় যতক্ষণ সেইরূপ ভার থাকে ততক্ষণ পারদও সেই অংশে থাকে, ভারের ব্যত্যয় হইলে পারদের স্থিতিরও ব্যত্যয় হয়, এইরূপ যতক্ষণ বন্ধন থাকে বন্ধন জন্য ক্লেশও ততক্ষণ, বন্ধন মোচন হইলে তজ্জন্য ক্লেশও নির্গত হয়। ইহার উপর কেহ কেহ বলিয়াছেন "কার্য্যের অনেকক্ষণের স্থিতির নিমিত্ত তদীয় কারণও যে তাহার সহিত থাকা আবশ্যক করে এরূপ অনুমান ঠিক্ নহে। ইহাতে সৎপ্রতিপক্ষতা দোষ লক্ষিত হইতেছে। দেখ পড়ন্ত রৌদ্রে বেড়াইলে শিরঃপীড়া হয়; শিরঃপীড়া সমস্ত রাত্রি থাকিতে পারে কিন্তু পড়ন্ত রৌদ্র তৎক্ষণাৎই অস্তগত হয়। কর্ম্মকারের যেরূপ যত্নে একখানি অস্ত্র প্রস্তুত হয় সেই অস্ত্রখানিকে কিছুকাল রাখিবার জন্য কিছু সেইরূপ অগ্নির সেক বা সেইরূপ মুদ্গরের আঘাত করিতে হয় না। অপরে বলিয়াছেন যে সকল কার্য্যের কারণ অভাব ধর্ম্মী তদ্ভিন্ন প্রায় কোন কার্য্যেরই অবস্থিতির সহিত তাহার কারণের অবস্থিতির আবশ্যক করে না

একটী কার্য্য একবার উৎপন্ন হইয়া ততক্ষণ অবধি অবস্থান করিতে সক্ষম হয়, যতক্ষণ অবধি তাহার নাশ বা পরিবর্ত্তনের কারণ উপস্থিত না হয়।

আমাদের নৈয়ায়িকেরা বলেন ঘটাদি কার্য্যের অবস্থিতির জন্য কেবল তাহাদের অসমবায়িকারণের অবস্থিতি আবশ্যক করে। অনেকে আবার বলিয়াছেন যেখানে কার্য্যকারণকে এক সময় অবস্থিতি করিতে দেখা যায়, সেস্থলে একটী কার্য্যকে একটি কারণের সহিত একত্র অবস্থিত এরূপ ভাবা উচিত নহে। সে স্থলে এইরূপ বিবেচনা করা উচিত যে ঐ সময়ের প্রতিক্ষণে একরূপ কারণের সংঘটন হওয়াতে একরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিলেন ভাল, এ সকল স্থলে তুমি কোনমতে যেন কারণের কার্য্যপূর্ব্ববর্ত্তিতা রক্ষা করিলে কিন্তু "বাঙ্গালীরা কোন সাহেবের চাকরী করিবার কারণ ইংরেজীবিদ্যা অধ্যয়ন করেন" "অমুক ব্যক্তি অর্থোপার্জ্জনের কারণ কলিকাতায় যাইতেছে" ইত্যাদি বাক্যে চাকরী করার কারণ ইংরেজী পড়া, এবং অর্থোপার্জ্জনের কারণ কলিকাতায় যাওয়া সুস্পষ্টই বোধ হইতেছে। কিন্তু ঐ সকল কারণ কার্য্যের পূর্ব্বে ত কখনই ঘটে না পরে সংঘটিত হয় কি না তদ্বিষয়েও সম্পূর্ণ সন্দেহ; অতএব এ স্থলে তুমি কিরূপে লক্ষণ সমন্বয় করিবে?

ইহার উত্তরে আমরা বলিব উহারা কারণশব্দে ব্যবহার হয় এই মাত্র, বাস্তবিক উহারা কারণ নয়। ন্যায়দর্শনকার মহর্ষি গৌতম উহাদিগকে প্রয়োজন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যথা

"যমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনম্"

২৪ সূ ১পা ১ অ।

"যমর্থমাপ্তব্যং হাতব্যং অধ্যবসায় তদাপ্তি
হানোপায়মনুতিষ্ঠতি প্রয়োজনস্তদ্বেদিতব্যম্"

ভাষ্যম্।

যাহা পাইবার বা ত্যাগ করিবার উদ্দেশ করিয়া কোন উপায় অনুষ্ঠান করা যায় তাহার নাম প্রয়োজন। প্রয়োজন পূর্ব্বোক্ত অধ্যয়নাদি কার্য্যের কারণ নহে, কিন্তু তাহাদের ফলস্বরূপ। তবে ঐ প্রয়োজন সাধন করিতে যে প্রবৃত্তি হয় তাহাই অধ্যয়নাদি কার্য্যের কারণ।

নবম পরিচ্ছেদ

ইংরেজি পাঠের উন্নতি

জটাধারীর প্রভুত্বে কেহ গর গর করিতেন না—আমার ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া অনেক বালকই ইংরেজি পাঠে যত্নবান হইল। আশুতোষ বাবুর আদেশানুসারে ভীমচাঁদ নামা একটি সুশিক্ষিত "গুডবেড" স্কুল মাষ্টর কলিকাতা হইতে ইম্পোর্ট হইয়া আসিলেন। তাঁহার বেতন মাসিক ১১ টাকা ধার্য্য হইল কিন্তু তাঁহার মেজাজ ওজনে ১২ হাজার টাকা অপেক্ষা গুরুবোধ হইত। ভীমচাঁদ দেখিতে মন্দ ছিলেন না; শ্যাম মুখের উপর কেশ বিন্যাসের বিশেষ পারিপাট্য প্রদর্শন করিতেন, রুমালে সুগন্ধ লেভেণ্ডর ছড়াইতেন, ইংরেজি জুতায় চরণের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেন, ইংরেজি রকম বাহ্যিক পরিচ্ছদের ইনিই আমাদের দেশের পথপ্রদর্শক বা পাইওনিয়র হইলেন। কিন্তু তাঁহার বামপদ অপর পদাপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব থাকায় তাঁহার খঞ্জ ভীম নাম খ্যাত হইল। খঞ্জ ভীম, তর্কালঙ্কার মহাশয়, লাউসেন দত্ত ও আখঞ্জির ছাত্র মণ্ডলে এক প্রধান শরিক হইয়া উঠিলেন। মাষ্টর বাবুর চাল চলন দৃষ্টে আমাদেরও মসমসে বিনামা ও কেশবিভাগের অর্থাৎ টেরি কাটিবার অভ্যাস হইল, কিন্তু এক কারণে তাঁহার উপর আমাদের বিশেষ ভক্তি ও ইংরেজি পড়িতে আস্থা বৃদ্ধি হইল। তিনি লাউসেন দত্তের ন্যায় প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেত দেখাইতেন না, আখঞ্জির মত কেবল রাঙ্গা চক্ষু ও মেহেদি রঞ্জিত শ্মশ্রুদল হেলাইয়া ভয় প্রদর্শন করিতেন না, "বড়ি কাফ" বা "আসরাফ" উচ্চারণ উদ্যমে ফুৎকারে আমাদের গাত্র সিঞ্চিত করিতেন না, সময়ে সময়ে মিষ্ট কথা ও নগরের নানাবিধ গল্পে মন হরণ করিতেন। দিবা রজনী মধ্যে ৫।৬ ঘণ্টায় পাঠাভ্যাস করাইয়া বিদায় দিতেন। যে বিদ্যা শিখিতে প্রাতে খেলিতে সময় হয়, সন্ধ্যার পর ঠাকরুণদিদির নিকট উপকথা শুনিতে সাবকাশ হয় তাহা কেন

প্রীতিকর না হইবে ? বিশেষ চাণক্যের শ্লোক অভ্যাস, শুভঙ্করের অঙ্কপাত, পিতামহের নাম, গাঁই, গোত্রাদি শিক্ষা হইতে অব্যাহতি পাইলাম। কেহ তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলে "আমরা ইংরেজি পড়ি" কহিলেই প্রকারান্তরে তাহাকে বিলক্ষণ অপ্রতিভ করা হইত। ক্রমে বাপ পিতামহের নাম না জানা একটী গৌরবের কারণ হইয়া উঠিল! বাপ পিতামহের নাম জিজ্ঞাসা করাও একটী অসভ্যতার লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইল! অধিককন্তু আর আমাদের বাটীতে বসিতে হইত না, স্কুল ঘর মেজ চৌকিতে সজ্জিত হইল, বেঞ্চে বসিয়া বাঞ্ছা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সকাল সকাল "স্কুলের ভাত" প্রস্তুত হইতে লাগিল, প্রতিদিন পরিষ্কার বস্ত্রে ও জুতার বাহারে বাহ্যিক পরিচ্ছন্ন সাধন হইতে লাগিল। দিনে দিনে বালকগণের বোল, মেজাজ, বাঙ্গালার বায়ু পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সকলের মুখেই ইংরেজি কথা! বেনেদেব রাজকুমারী "কিংস্ ডটার—" রাঙ্গাঠাকুরুণ "রেড গডেস্" খুড়া "অঙ্কল" তরকারী "করি" হইয়া গেল। স্কুলের মালি গোপীনাথ সর্দ্দার জল ছাড়িয়া "ওয়াটর" কহিতে লাগিল ও দুই এক ছিলিম গঞ্জিকায় মত্ত হইয়া শুভ্রবর্ণ গোফ যুগল হেলাইয়া "ইয়াস" "নো" করিতে আরম্ভ করিল, সেই "ইয়াস" নো" ক্রমে বিপুল পৃথিবীব্যাপী হইয়া উঠিল, ঘরে ঘরে মুখে মুখে বেড়াইয়া সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্যালঙ্কার ন্যায়রত্ন প্রভৃতির ওষ্ঠে পর্য্যন্ত আরোহণ করিল। কিন্তু বৃদ্ধ তর্কালঙ্কার মহাশয় শুদ্ধাচারী ম্লেচ্ছবর্ণ ব্যবহার দূরে থাকুক অপরের মুখে শুনিলেও বিমর্ষ হইতেন, ও কহিতেন "শাস্ত্রধর্ম্ম দূরে গত ম্লেচ্ছকৃত বিপ্লব কাল আগত।" এদিকে আখঞ্জি সাহেবও মাষ্টর বাবুর প্রাদুর্ভাবে বিরক্ত। মনে করিতেন "বাদশাহী তক্তের সহিত বাদশাহী যবানও লোপ হইল।" এক্ষণে মাষ্টরের প্রতি উভয়ের বিরক্তি হেতু পরস্পরের মধ্যে আনুরক্তির কারণ জন্মিল—মহিষের বাঁকা সিং যুদ্ধকালে একা হইয়া উঠিল। সনাতন ধর্ম্মবাদী তর্কালঙ্কার মহাশয়ও চিরদ্বেষী মোসলেম অনুচর আখঞ্জি বাহাদুর স্বার্থাশয়ে ঐক্য হইলেন ও ইংরেজি পড়া ও ইংরেজি পাঠ গ্রাম হইতে উত্যক্ত করিবার জন্য একটী গভীর প্রস্তাবনা সৃজন করিলেন।

একদিন সন্ধ্যার পর বিন্ধ সায়েরের উত্তরতীরে শিবমন্দির সম্মুখে চাঁদনির সোপানে বসিয়া গঙ্গাধর কয়েকটী সমবয়স্ক বালকসহ আপন আপন পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিলেন। বঙ্গ ইতিবৃত্ত হইতে কালাপাহাড় কর্ত্তৃক হিন্দু-দেবগণের উপর অত্যাচার সকল একটি বালক গল্পচ্ছলে কহিতেছিল এই সময় সম্মুখস্থ গঙ্গাধর মহাদেবের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। আমি কহিলাম "দেব দেবীদের যেরূপ নিস্তেজ ব্যবহার পুরাবৃত্তে পড়া যায় তাহাতে বিশ্বাস হওয়া দুষ্কর, সে সকল কথা যদি সত্য হয় তবে এইরূপ অচল দেবতার উপর ভক্তি সচল হইয়া

পড়ে।" কথা কহিবার সময় আমার মনে ছিল না যে ঐ গঙ্গাধর দেবের প্রসাদেই আমার নাম গঙ্গাধর প্রসাদ হইয়াছিল। আমার কথা শেষ না হইতেই মন্দিরের পার্শ্বে "কি সর্ব্বনাশ!" এক গর্জ্জন শুনিলাম, পরক্ষণেই দেখিলাম তর্কালঙ্কার মহাশয় ঐ গর্জ্জন প্রয়োগ করিয়া দ্রুতগতি আশুতোষ বাবুর বৈঠকখানার দিকে ধাবমান হইতেছেন। গঙ্গাধরও দৌড়িতে অপটু ছিলেন না—সত্বর বৈঠকখানায় পৌঁছিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় আমাদের নামে একটী অনর্থক অপবাদ দিতে আসিতেছেন, অদৃশ্য থাকিয়া এই কথাটী আকাশবাণীর ন্যায় বাবু মহাশয়ের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করাইয়া প্রস্থান করিলাম। ক্ষণকাল পরেই তর্কালঙ্কার মহাশয় পৌঁছিলেন ও কহিলেন "মুণ্ডপাত উচ্ছন্ন! সকলে এককালে পাষণ্ড হইল—মহাশয় স্কুল স্থাপন করিলেন, না নাস্তিকতার নিশান তুলিলেন?" তর্কালঙ্কার মহাশয় স্কুলের ছাত্রদের নাস্তিকতার সালঙ্কার পরিচয় দিলেন। আখণ্জি সাহেব কোথা হইতে আসিয়া সেই কথার অনুমোদন করিলেন। ইংরেজি পাঠের পক্ষে একটি মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল, গ্রাম সমস্ত ঐ কথায় আন্দোলিত হইল। জটাধারী নাস্তিকতায় তিলকধারী হইলেন—ক্ষীণ প্রাণী স্কুলটি জায় জায় হইল; খঞ্জভীমের পা গর্ত্তে পড়িবার সম্ভাবনা হইল—আশার মধ্যে দিবা নক্ষত্র স্বরূপ আশুতোষ বাবুর দূরদর্শিতা জাজ্জ্বল্যমান রহিল।

এই সময়ে আর একটী সুঘটনা উপস্থিত। নিকটস্থ আলমনগরে একটী নূতন মোকর্দ্দমা সৃষ্টি হইল। একদিন প্রাতে দুইজন অশ্বারোহী অর্থাৎ জেলার কালেক্টর সাহেব নূতন মোকর্দ্দমার কর্ম্মচারী নূতন হাকিম মৌলবি খাঁ বাহাদুর সহিত আমাদের গ্রামে হঠাৎ পৌঁছিলেন। গ্রামে একটি স্কুল হইয়াছে শুনিয়া ছাত্রদের দেখিতে চাহিলেন, নিমেষ মধ্যে আমাদের রাখাল বেশ ছাড়িয়া বাবু সাজিয়া সভীত মনে সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরীক্ষা আরম্ভ হইল—পরীক্ষার সেই প্রথম ঢেউ দেখিলাম। সেই ঢেউয়ে ভাষিতে ভাষিতে হাবুডুবু করিতে করিতে সংসার-সাগরে উপনীত হইয়াছি—পরীক্ষার শেষ তবু দেখিতেছি না! যাহা হউক সেইযাত্রা ঈসফের একটী ফেবল পাঠ করিয়া সাহেবের নিকট উত্তমরূপে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া দিলাম। কালেক্টর সাহেব সহস্তে একখানি হোলি বাইবল পুরস্কার দিলেন। তাহাতে জটাধারীর নামে নিকটস্থ গ্রাম সকলে জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। আরও সুখের বিষয় হইল, সাহেব মহোদয় আপন সন্তুষ্টির নিদর্শন স্বরূপ লর্ড হারডিঙ্গের দত্ত পনর মুদ্রার হিসাবে মাসিক সাহায্য আমাদের স্কুলে দান করিতে স্বীকার করিলেন—তাহাতে স্কুলের জড় নামিল খঞ্জভীমের পদে বল বৃদ্ধি হইল—তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অভিসন্ধি বিফল হইল!

কিন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয় নিষ্ফল হইয়াও নিরুৎসাহ হইলেন না—যাহাতে সাহেবী চাল চলিত না হয়, সাহেবী সাজে, কেহ না সাজে ইংরেজদের পাপানুকরণ ইংরেজি পাঠ পদ্ধতি প্লাবন দ্বারা হিন্দুসমাজের রীতিনীতি গ্রাসিত না হয় তাহাই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অনিবার চেষ্টা রহিল, যেখানে দশজন যুবাকে একত্রিত দেখিতেন অধ্যাপক মহাশয় অমনি একটি সমাজসম্বন্ধে অভ্যাসগত বক্তৃতা করিয়া সকলের হৃদয় আর্দ্র করিতেন—এই বক্তৃতার একটি পরিশিষ্ট আমার রোজনামচার অন্তর্গত ছিল।

"ও হে! তোমরা বালক, আমার কথায় বিরক্ত হতে পার কিন্তু আমার অভিপ্রায় তোমরা যেরূপ মনে কর তদ্রূপ নিন্দনীয় নহে—ইহার নিগূঢ় মর্ম্মভেদ শিশুর পক্ষে দুঃসাধ্য। নিজ নিজ হৃদয়গত ধর্ম্ম ও চিরআদরণীয় দেশীয় প্রথা রক্ষার অনেক গুণ আছে। আমাদের সমাজে কি সুখ ছিল না? আমোদ ছিল না? সে সুখ সে আমোদ যদি কোন অংশে বিশুদ্ধ না হয় তাহার দোষ পরিত্যাগ করিয়া গুণভাগের উন্নতি করিবার চেষ্টা কর—জাতীয় উন্নতিফল লাভ হইবে। যদি তা না করিয়া পরজাতির যাহা দেখিবে তাহাই অনুকরণ কর, তাহাতে তোমাদের কি উপকার হইবে একবার দূরে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া দেখ। আপনাদের আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম, সমাজমন্দির যদি কেবল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিদেশীয় ছাঁচে বা আদর্শে প্রস্তুত করিতে চাহ বঙ্গসমাজের যাহা ভাল আছে তাহা বিলয় হইবেক—উভয় জাতিতে প্রভেদ না থাকিলেও না থাকিতে পারে কিন্তু ক্রমে ক্রমে অপর জাতির দলে মিশিয়া বঙ্গদেশ হইতে বাঙ্গালির নাম লোপ হইয়া একটি প্রকৃতিবিরুদ্ধ জীব মাত্র সৃজন হইবে।

আত্মধর্ম্ম পরিত্যজ্য পরধর্ম্মেষু যোরতঃ।
স তিরস্কারমাপ্নোতি নীলবর্ণ শৃগালবৎ॥

এইখানে আমার একটী গল্প মনে পড়িল—একবার নবদ্বীপ হইতে বাটী গমন কালীন গঙ্গাতীরস্থ কোন গণ্ড পল্লীর ঘাটে স্নানান্তে পূজা আরম্ভ করিয়াছি ও শিব গড়িতেছি—গড়িতে গড়িতে শিবটি মনের মত না হওয়ায় দুই একবার ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। দুই একটী গ্রাম্যলোক ব্যঙ্গ করিয়া কহিল ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ বয়সে বিহ্বল হইয়াছে—আবার একজন কহিল একেই "বাহাত্তুরে" বলে—আমি উত্তর করিলাম 'একেই মাটীর গুণ বলে তোমার গ্রামের মাটীর একটী বিস্ময়কর শক্তি দেখিতেছি যত শিব গড়িতেছি বানর হইয়া উঠিতেছে'—সাবধান বঙ্গদেশের মাটীর প্রতি দৃষ্টি রেখ এই মাটীতে বিলাতি সাহেব গঠন হইবার নহে—দেখ যেন শিব গড়িতে বানর না গড়িয়া ফেল!"

দশম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গা ঠাকুরুণ

অতি অল্পদিন হইল, আমি কোন বুদ্ধিমতী মহিলার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত ছিলাম। বোধ হইল, জটাধারীর রোজনামচার কিয়দংশ সুমতি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন—ইহাও জটাধারীর সৌভাগ্য। কারণ স্ত্রীলোকে ত নিন্দাবাদ জানেন না। যাহা হউক সন্তুষ্টি প্রকাশের বিশেষ কারণ মহিলা এই বলিয়া নির্দ্দেশ করেন যে "এখন পর্য্যন্ত জটাধারী আমাদের অঙ্গস্পর্শ করেন নাই—যাঁহারা চিত্রপট লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা প্রথমতঃ স্ত্রীজাতির চিত্ত ভ্রম অঙ্কিত করিয়া আমাদের মুখে কলঙ্ক লেপন করেন; আবার দেখি সংসারপটে দুই একটি কোমলাঙ্গীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত না হইলেও ছবিটি শোভাহীন ও অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে।" মহিলার এ কথাগুলি শুনিয়া অবধি আমি ভাবিতেছিলাম, "স্ত্রী-নিন্দা কি গুরুনিন্দা অপেক্ষা অধোগতির মূল যে, সেই সম্বন্ধে কোন কথা সত্য হইলেও আলোচনা করিতে কাতর হইব?" আমি ত বিনাকারণে কাহারও সুন্দর অঙ্গের ক্ষুদ্র তিলটি পর্য্যন্ত দেখাইতে ইচ্ছুক নহি; যদি দেখাইয়া দিই, তখন মনে করি, যে ছুরি লইয়া চাঁচিয়া ফেল না ফেল, ঔষধ দিয়া আরাম করিতে পার, কর—গৌরাঙ্গীর গা আরও গোরা দেখাইবে। সুন্দরীদের আরো সতত মনে করা উচিত যে জটাধারী তাঁহাদের নিতান্ত বন্ধু, যখন কটু কথাও কহিয়া থাকি, তখন কেবল তাঁহাদের কোমল মন ও কোমল অঙ্গ নির্ম্মল দেখিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু বিনা দলনে মলা উঠিবার নহে, এ কথাও মনে করা উচিত।

এ দিকে যেমন তিলটী পর্য্যন্ত দেখি, অপর দিকে আবার সুন্দরীগণের স্নেহ, দয়া, প্রীতি-সুধা-সার-সুনির্ম্মিত হৃদয়ের গুণ সকলের বলিহারী দিয়া থাকি। বাল্যকাল হইতে এই স্নেহের অনেক পরিচয় পাইয়াছি—এই স্নেহ কলুষিত বিপদ্‌ জলের নির্ম্মলী বলিয়া থাকি; দরিদ্র, ভিক্ষুক পীড়া-প্রপীড়িত শয্যাগত ব্যক্তির অন্তঃকরণে সেই স্নেহ, শুষ্ক মরুভূমে অমৃতবিন্দুর ন্যায় পতিত হইয়া থাকে, সুন্দরীর মনে সুন্দর গুণ থাকিলে আরও সুন্দর দেখি; সেই জন্যই অতি অল্প বয়স হইতে আমি সুন্দরী সুধার্ম্মিকাগণের বিশেষ প্রশংসাবাদক হইয়াছি—যখন বালক ছিলাম, গ্রামের সমবয়স্ক সমস্ত বালিকার আমি "জটা দাদা" ছিলাম। কামিনীর 'পিঠে' নগা একটি কিল মারিয়া মুড়ির পালিটি লইয়া পলাইল, প্রফুল্লের চুলের-দড়িটি গোপলা লইয়া কাঠের ঘোড়ার লাগাম করিল—মোহিনীর ক্ষুদ্র ধুতিখানি দেবা পরিয়া বাজনা শুনিতে দৌড়িল, এইরূপ অনেকগুলি নালিশ আমাকে

প্রতিদিন নিষ্পত্তি করিতে হইত, আমি বালিকাগণের বিচারক ও রক্ষক ছিলাম; রাঙ্গা ঠাক্‌রুণ আমাকে সেই জন্য পাঁড়ার মেজেষ্টর বলিয়া আদর করিতেন। এই জন্যই স্ত্রীগণের দোষ গুণ বিচারের জটাধারী অনেক দিন পর্য্যন্ত অধিকারী ও আপাততঃ রাঙ্গা ঠাকুরাণীর চিত্র লিখনেও লেখনী-ধারী।

রাঙ্গা ঠাক্‌রুণ বহুগুণসম্পন্না হইয়াও দাম্পত্যসুখে চির-বঞ্চিত। তিনি যে কবে বিধবা হইয়াছিলেন, তাহা আমার মনে নাই—জ্ঞানারম্ভ হইতে তাঁহাকে শুভ্র, পবিত্র, বেশহীনা বিধবাই দেখিতাম। যে বৃহৎ পরগণার উপসত্বে আশুতোষ বাবু এতদ্রূপ সমৃদ্ধিশালী, তাঁহার অনেক অংশ রাঙ্গা ঠাক্‌রুণের স্ত্রীধন। কিন্তু ভাশুবের হস্তে সমস্ত বিষয়ই গচ্ছিত করিয়া তিনি কেবল ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকিতেন, দবিদ্রের দুঃখমোচনই তাঁহাব প্রধান কার্য্য ছিল। তিনি যখন শুভ্র পট্ট বস্ত্র পরিধানে আলু থালু কাল কেশরাশি কপালের উপরভাগে এল বন্ধনে, রাঙ্গা হস্তে দর্ব্বী ভবিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে শত শত বালক বালিকাকে স্বহস্তে অন্ন বিতরণ করিতেন, সকলে কাণাকাণি কবিত যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা হইয়াছেন। বিবাহ, শ্রাদ্ধ ক্রিয়াকলাপে সমস্ত গৃহস্থ কার্য্য নির্ব্বাহকাবিণী—রাঙ্গা ঠাকুবাণীই প্রধান ভাণ্ডাবিণী ছিলেন; তিনি নিজ হস্তে যাহাকে যাহা দিতেন তাহাই তৃপ্তিকব—তাহাব দ্বিগুণ অপবেব হস্ত হইতে প্রাপ্ত হইলেও কেহ সুখী হইত না, এজন্য জটাধাবী ব্যঙ্গ করিয়া কহিতেন, "রাঙ্গা দিদির বড় হাত-যশ" হাঁড়ি হাঁড়ি মণ্ডা হউক, থাল থাল মেওযা হউক, বড়দিঘীর বড় রুহি হউক, বা উদ্যানেব সামান্য সামন্য ফল হউক,—আম হউক বা কুল হউক—রাঙ্গা ঠাক্‌রুণ বাঁটিয়া না দিলে কাহাবও মঞ্জুব নাই। আজ অন্নমেরু, কাল তূলা, পবশ্ব সাবিত্রী ব্রতদানের আনন্দেই রাঙ্গা দিদির রাঙ্গা তবু নিয়ত ম্লান মুখভঙ্গিটি কখন কখন প্রফুল্লতায় উজ্জ্বল হইত। স্বয়ং নিঃসন্তান কিন্তু দেশের ছেলে তাঁহার সন্তান ছিল বলিলে অতুক্তি হয় না; তখন জুত মোজার চালও ছিল না, সাধও ছিল না, কিন্তু কাহার ছেলে রাঙ্গা ঠাকুবাণীর প্রদত্ত রাঙ্গা ধুতি চাদরে সজ্জিত না হইত? তাঁহার কল্যাণে গুরুমহাশয়েব শিধার অভাব ছিল না, ছাত্রদের পুস্তক কিনিবার বা পুস্তক ছিঁড়িবার কষ্ট ছিল না; বিশেষতঃ ক্রিয়াকাণ্ডের ভোজের দিনে কমলমুখীর কোমলাঙ্গ যেন ধর্ম্মবলে দৃঢ় হইত, সূর্য্যোদয় না হইতেই প্রাতঃস্নান করিয়া বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত অনাহারে দেখ রাঙ্গা দিদি শশব্যস্ত—আমি আবার ব্যঙ্গ করিয়া কহিতাম "বেশ রাঙ্গা দিদি, আজ নাটাই হইয়া ঘুরিতেছ"—তাঁহার কেবল হাসিতে অবসর থাকিত, কখন কেবলমাত্র কহিতেন, "ক্ষীরের ছাঁচ কেমন হয়েছে দেখে যাও"—জটাধারী চাকিতে তৎপর। প্রকৃতার্থ রাঙ্গা ঠাক্‌রুণ অতি প্রসিদ্ধ পাচিকা ছিলেন, নিমন্ত্রিত

প্রবীণগণ আহারকালে কখন কখন কহিতেন এই লক্ষ্মীর হস্তেই যথার্থ ই অমৃত নিবেশিত হইয়াছে।

এখন কৃতবিদ্যা ব্রাহ্মিকা, এ-বি-পড়া বিবিসজ্জিতা বালিকা, দোজবরের যুবতী বস্থনী, ঘোষাণী, ব্রাহ্মণী, সহধর্ম্মিণী ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "পাক করা ত পাচিকা বা বাবুর্চ্চির কার্য্য—তাহার প্রশংসা কি?" আমি এই মাত্র উত্তর দিতে পারি যে পাকনিপুণতার প্রশংসা তোমাদের উচ্চ শিক্ষার সহিত লুপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে পরিচয় দিবার স্থল কোথায়? কিন্তু উৎকৃষ্ট উদাহরণ অভাব বলিয়া আপনারা মনে করিবেন না যে, সুমিষ্ট পাকনৈপুণ্য রমণীগণের প্রশংসা বা শিক্ষার ভাগ নহে। আমাদের গ্রামের বিচক্ষণ ভট্টাচার্য্য সেতার কিম্বা অন্যান্য বাদ্যের রসগ্রহণে অক্ষম হইয়া কহিতেন "সর্ব্ব বাদ্যময়ো ঘণ্টা!" আমি ঘণ্টা বাজাইতে পারি—ঘণ্টার মত কি আর বাদ্য আছে? সেইরূপ হে কুলকামিনীগণ! গার্হস্থ্য শিক্ষাব প্রধান রস বিবর্জ্জিতা হইয়া আর বৃথা গৌরব করিও না—দেশের লজ্জা বৃদ্ধি করিও না আব কহিও না আমরা কার্পেট বুননেব ফাঁসি দিতে শিখিয়াছি, সেই ফাঁসের উপর কি আর শিল্পনিপুণতা আছে? কিন্তু অনুগ্রহ কবিয়া মনে করুন সেই ফাঁসিতে অনেক গবীবের গলায় ফাঁসি পড়িতেছে। আপনাবা বহুরূপিণী হইয়া ব্রাহ্মিকা সাজিয়া একদিকে "গাউন" ও "পাউডার-পট" আর একদিকে দোলযাত্রার নাম না শুনিতে বাসন্তী রঙ্গের ধুতি ও আঙ্গিয়ার জন্য ব্যস্ত কর। রাঙ্গা ঠাকুরুণের সহিত তোমাদের তুলনা করিলে আমার মনে হয়—

"পিতল-কাটারি, কামে নাই আইসু
উপরহি ঝকমকি সার".

বিষবৃক্ষের চিত্রভূমিতে দৃষ্টিপাত হইলেই কতিপয় সুন্দর চিত্র অতি উজ্জ্বল বর্ণে তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। একদিকে দেবেন্দ্র হীরার সহিত হাস্য পরিহাস করিতেছেন, অন্যদিকে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর জন্য জাগরণে নিশাবসান করিতেছেন, এমত সময়ে সূর্য্যমুখী সহসা উদিতা হইয়া তদীয় মুখকমল প্রফুল্লিত করিলেন, অপরদিকে ঐ দেখ কমলমণি সূর্য্যমুখীর পার্শ্বে বসিয়া তাহার মনোদুঃখ শ্রবণ করিতেছেন; আবার ঐ হরিদাসী বৈষ্ণবী কেমন গান গাইতে গাইতে, নৃত্য করিতে করিতে নগেন্দ্রের পৌরজনের চিত্তহরণ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। দেবেন্দ্র, হীরা, সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্র ও কমলমণি ইহারা সকলেই বর্ণগৌরবে চিত্রভূমি উজ্জ্বল করিয়াছে। কিন্তু ইহাদিগের পার্শ্বে ঐ যে অবগুণ্ঠনবতী—মৃদুরঞ্জনে রঞ্জিত হইয়া অবনতমুখী অশ্রুপাতে মনোদুঃখ বিগলিত করিতেছেন, উহাকে কি তুমি চিনিতে পারিবে—উনি কুন্দনন্দিনী। উহার চিত্র তত বিভাসিত নহে, অতি কোমলবর্ণে মৃদুরঞ্জিত, কিন্তু উহার চিত্রে এমন মাধুর্য্য, এমন সৌন্দর্য্য আছে, যাহা

এ পর্য্যন্ত বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাদির কোন সমালোচনা প্রকাশিত হয় নাই। তাহার কারণ এই যে প্রথম চারি বৎসর বঙ্কিমবাবু স্বয়ং বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন—নিজ গ্রন্থসম্বন্ধে কোন সমালোচনা পত্রস্থ করিতেন না। এক্ষণে তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদক নহেন, অধিকারীও নহেন। অন্যান্য লেখকদিগের ন্যায় তিনি বঙ্গদর্শনের একজন লেখক মাত্র। যদি হেমবাবু প্রভৃতি অন্যান্য লেখকদিগের গ্রন্থ সকল বঙ্গদর্শনে সমালোচিত হইতে পারে, তবে বঙ্কিমবাবুরও গ্রন্থ সমালোচিত হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান সম্পাদক বঙ্কিম বাবুর সহিত নিকট সম্বন্ধবিশিষ্ট—এজন্য তাঁহার ইচ্ছা নহে যে বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাদির কোন সমালোচনা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তবে এই প্রবন্ধটি পত্রস্থ করিবার কারণ এই যে পূর্ণবাবু স্বয়ং একজন সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক, তিনি যখন প্রবন্ধে স্বাক্ষর করিয়াছেন তখন এই প্রবন্ধোক্ত মতামতসম্বন্ধে সাধারণসমীপে তিনি একাই দায়ী—সম্পাদকের কোন জবাবদিহি নাই। এরূপ অবস্থা ভিন্ন বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থসম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ আমরা পত্রস্থ করিব না। পক্ষান্তরে, কোন সুপরিচিত লেখক, স্বাক্ষরিত করিয়া ইহার প্রতিবাদ পাঠাইলে তাহাও আমরা আদরে গ্রহণ করিব। বং সং।

তাহার পার্শ্বস্থ কোন উজ্জ্বল চিত্রে নাই। সূর্য্যমুখী উজ্জ্বলতরগুণে এবং কমলমণি তদপেক্ষাও উজ্জ্বলতরগুণে পরিভূষিতা বটে, কিন্তু কুন্দনন্দিনীতে যে ধীর আবরিত সৌন্দর্য্য, যে কোমল রমণীয়তা, যে অসামান্য সলজ্জ সবলতা আছে, তাহা সূর্য্যমুখী ও কমলমণিতে নাই। বঙ্কিমবাবু বিষবৃক্ষের বর্ণোদ্ভাসিত চিত্রভূমি আঁকিতে আঁকিতে কোথা দিয়া যে এই রমণীরত্নের চিত্র সুস্পষ্ট অথচ মৃদুবর্ণে আঁকিয়া গিয়াছেন, পাঠক তাহা শীঘ্র উপলব্ধি করিতে পারেন না। অপরাপর চিত্রের উজ্জ্বল অঙ্কপাতে তাঁহার চিত্ত এত আকৃষ্ট থাকে যে অশ্রুপূর্ণা বিমলিনা কুন্দনন্দিনীর দিকে তাঁহার সহজে দৃষ্টিপাত হয় না। কেহ না দেখাইয়া দিলে তিনি যেন দেখিতে পান না। এইজন্য বিষবৃক্ষের সমালোচনার আবশ্যক; নহিলে বিষবৃক্ষের সৌন্দর্য্য এবং গুণাবলী গ্রন্থকার নিজ অক্ষরেই এমন সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন যে, তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সমালোচকের জন্য আর কিছুই রাখিয়া যান নাই।

বঙ্গের অন্ধ অন্তঃপুরীমধ্যে যে সকল কুলকামিনী রমণীরত্ন জন্মে, পৃথিবীর আর কোনখানে সেরূপ জন্মে কি না সন্দেহ। অনেক কারণে এখানে অনেক রমণী পতিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। ততদূর পাতিব্রত্য অন্যদেশের কুল-কামিনী সতীতে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। সূর্য্যমুখী এদেশে তত দুর্ল্লভা নহে, কিন্তু সূর্য্যমুখী অন্যদেশে নিশ্চয় সুদুর্ল্লভা; তদপেক্ষা কমলমণি, এবং কমল-মণি অপেক্ষা কুন্দনন্দিনী। সূর্য্যমুখীর পাতিব্রত্য কায়মনোবাক্যে প্রকাশিত হইয়াছিল, কমলমণি একদিন সূর্য্যমুখীকেও পাতিব্রত্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। কুন্দ-নন্দিনীর পাতিব্রত্য কায়মনোবাক্যে প্রকাশিত নহে বটে, কিন্তু তজ্জন্য কিছুতেই ন্যূন নহে, বরং তজ্জন্যই অধিকতর উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ, এবং পবিত্র বলিয়া প্রতীত হয়। সূর্য্যমুখী অন্যদেশে দুর্ল্লভ, কিন্তু কুন্দনন্দিনী বঙ্গদেশেও দুর্ল্লভ। এখানে যদি দুই শতের মধ্যে একজন সূর্য্যমুখী থাকে, পঞ্চশতের মধ্যে একজন কমলমণি থাকে, তবে সহস্র বঙ্গগৃহবধূর মধ্যে একজন কুন্দনন্দিনী আছে কি না সন্দেহ। বঙ্গগৃহ-বধূর ভীরুতা, নম্রতা, সরলতা, অনভিজ্ঞতা ও কোমলতা যতদূর অনুমান করা যাইতে পারে কুন্দনন্দিনীর ততদূর ছিল। বাস্তবিক কুন্দনন্দিনী মৃদুপ্রকৃতি বঙ্গ-গৃহবধূর অবয়বী কল্পনা। এইজন্য কুন্দনন্দিনী এদেশেও দুর্ল্লভ। অপর দেশীয় কবি কুন্দনন্দিনীকে কল্পনাতেও আনিতে পারিবেন না। কিন্তু বিরল বলিয়াই, সূর্য্যমুখী অপেক্ষা কুন্দনন্দিনী শ্রেষ্ঠতরা নহেন। সূর্য্যমুখী বঙ্গগৃহের শোভা, কমলমণি গৃহধাম গুণে আলোকিত করেন, এবং কুন্দনন্দিনী সেই অন্ধধামের অভ্রদেশে মাণিক্যের ন্যায় গোপনে উজ্জ্বলিত রহেন। যিনি এরূপ রত্ন চিনিতে পারেন, তিনি তুলিয়া হৃদয়ে ধারণ করেন; যিনি না চিনিতে পারেন, তাঁহার মাণিক্য কুন্দনন্দিনীর ন্যায় অবশেষে সর্পের বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া যায়।

ঐ যে সরোজিনী জলাশয়ে প্রস্ফুটিত হইয়া, রূপে ঢল ঢল করিয়া, চারিদিক সৌরভে আমোদিত করিয়া, মলয়বায়ুহিল্লোলে জলতরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া প্রফুল্লমুখবিকাশে উদ্যানরাজি প্রফুল্লিত করিয়াছে উহা একদিন কমলমণির সহিত তুলনীয় হইতে পারে। আর ঐ যে পূর্ণবিকশিত, শতদলশোভিত, পরিমলসুগন্ধিত, রূপে আনন্দিত গোলাবকুসুম উদ্যানের মধ্যস্থিত গর্ব্বস্বরূপ হইয়া তোমার নয়নের তৃপ্তিসাধন করিতেছে, উহা সূর্য্যমুখীর সদৃশ চতুর্দ্দিক সুশোভিত করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু যদি কুন্দনন্দিনীর সাদৃশ্য দেখিতে চাও, তবে ঐ গোলাবেরই নিকটস্থ আব এক তরুশিরে গিয়া দেখ, একদল অর্দ্ধমুকুলিত গোলাবগুচ্ছ বৃন্তশিবে সুশোভিত রহিয়াছে; তাহার মধ্যকুসুম প্রস্ফুটিতপ্রায়, অথচ দলগুচ্ছে সম্যক্ প্রস্ফুটিতে পারে নাই। আর উহা ফুটিতে পারিবে না। তুমি অনুমানে উহাকে ফুটাইয়া লও, এবং বল দেখি, উহা সম্যক্ প্রস্ফুটিত হইলে, ঐ পূর্ণবিকসিত গোলাবের শোভা পরাজয় কবিত কি না? কুন্দনন্দিনী ঐরূপ অর্দ্ধবিকসিত অথচ প্রস্ফুটিত গোলাবস্বরূপ। অনুমানে তাহাকে ফুটাইযা লইতে হয। তাহা নিজে সম্যক্‌শোভা বিকসিত করিতে পাবে না। রূপে যেন গর্ব্বিত থাকে। পবিমলে হৃদযকন্দব পবিপূর্ণ কবিয়া বাখে, যিনি আদরে তাহাকে দেখিতে আসেন, তাহাকে আপনাব হৃদয়ধন কথঞ্চিৎ বিতরণ করিয়া আমোদিত কবেন। তাহার হৃদয়ে যে সম্পত্তিবাশি সঞ্চিত আছে, তাহা অন্যকুসুমে নাই; সেই জন্যই বুঝি সাহসভবে সম্যক্ প্রস্ফুটিতে পারে নাই।

কুন্দনন্দিনীব হৃদয়, এইরূপ, ভাবে পবিপূর্ণ। সে ভাব অবাতবিক্ষোভিত জলধিব ন্যায় গভীর, অচঞ্চল, এবং স্থির। সে জলধি মথিত করিলে অমৃত উঠে। ঘটনা বায়ু তাহাতে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়। যদি আলোড়িত ও তবঙ্গে আন্দোলিত করে, জলধি নিজ হৃদয়েই সে আন্দোলন ধাবণ করিয়া রাখেন। চন্দ্র হাসিলে তাহা আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠে, কিন্তু সে বক্ষস্ফীতি কেহ দেখিতে পায় না। চন্দ্রকে বক্ষে ধাবণ করিয়া সুখহিল্লোলে নাচিতে থাকে। চন্দ্র সরসীব কুমুদিনীর শোভাতেই মোহিত, তিনি এ জলধির আনন্দভাস দেখিতে পান না। চন্দ্র একবার এই জলধিতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন; আবার মেঘের উচ্চ সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন; বসিয়া সেই দূর পশ্চিম সরসীর কুমুদিনীর প্রতি হাসিতে লাগিলেন। মেঘে প্রবল বাত্যা বহিল। জলধি তমসাচ্ছন্ন ও আন্দোলিত হইল। আন্দোলন শেষ হইলে পর যখন শশী আবার প্রকাশিত হইলেন, তখন দেখা গেল তিনি সেই পশ্চিম সরসীর দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। শশী, জলধি পার হইয়া অস্তমিত প্রায়। তখন অর্দ্ধরাত্রের ঘন তিমির আসিয়া জলধিকে অন্ধকারে পরিপূর্ণ করিল। জলধি, রজনীর বিশ্বব্যাপী ঘন তিমিরে ডুবিয়া গেলেন।

বাঙ্গালির মত ভীরুজাতি পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ। কুন্দনন্দিনী এই ভীরুতার ফল। বাঙ্গালিনী রমণী কতদূর ভীরুস্বভাব হইতে পারে কুন্দনন্দিনী তাহা প্রকাশিত করে, সংসারের সাহসিকতা কিরূপ কুন্দনন্দিনীর ন্যায় রমণী তাহা জানে না, ভাবিতেও পারে না; সে সাহসিকতার উপন্যাস বলিলে শিহরিয়া উঠে। যে অল্প বীর্য্য ও তেজ বাঙ্গালির আছে, তজ্জন্য সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকে। কেহ উচ্চরবে কথা কহিলেও ভীত হয়। পুষ্পের আঘাতেও মূর্চ্ছা যায়। জননীর নিতান্ত অঙ্কপ্রিয় হয়। কিছু করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতে ভয় পায়। উচ্চরবে কথা কহিতে জানে না। অন্যে উচ্চরবে কথা কহিলে থমকিয়া কাঁদিয়া পড়ে। কেহ কিছু বলিলে কুটীর মধ্যে একাকিনী বসিয়া নীরবে কাঁদিতে থাকে। তাহার অবগুণ্ঠন-বিমুক্ত মুখচন্দ্রিমা অল্পালোকেই দেখিতে পায়। একাকিনী থাকিতে ভালবাসে। অন্যান্য রমণীর সহিত মিশিতে সাহস হয় না। মিশিলে তাহাদিগের সহিত দুই একটি কথামাত্র কয়। তাহাদিগের সহিত অগ্রসারিণী হইয়া কার্য্য করিতে যায় না, হয় ত এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে, অবগুণ্ঠন টানিয়া পরের সাহস ও কার্য্য দেখিতে থাকে। পরের প্রতি দুই চক্ষে চাহিতেও ভয় পায়। চক্ষে চক্ষে মিলিলে অমনি নয়নপল্লব ফেলিয়া মুখ অবনত করে। মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে পারে না; ইচ্ছা হইলে মনে মনেই বিলীন হয়। কোন ইচ্ছা প্রকাশিত করিতে নিতান্ত অনুরোধ করিলে তাহা আপনি সাহস ভরে বলিতে পারে না; সঙ্গিনীর সহিত চুপি চুপি কাণে কাণে কহিয়া দেয়। সে ইচ্ছা, দেখা যায়, অন্য রমণীর ইচ্ছার সহিত কিছু স্বতন্ত্র। অন্যের সহিত সে ইচ্ছার কিছু বিশেষ হইবেই হইবে। সে ইচ্ছাতে হয় ত ধীরতা আছে, নম্রতা আছে; উচ্চাশা নাই, সাহস নাই। হরিদাসী বৈষ্ণবী আসিলে কুন্দনন্দিনী এইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। অনুরুদ্ধ না হইলে, যাহা হইত ও ঘটিত, তিনি নীরবে ও নিঃশব্দে তাহা শুনিয়া ও দেখিয়া যাইতেন। সহিষ্ণুতা, ভীরুতার ফল। সুতরাং কুন্দের ন্যায় রমণীর সহিষ্ণুতা থাকা অবশ্যম্ভাবী ধর্ম্ম। আবার প্রকৃত সোহাগ কি, তাহা ইহারাই জানে, ইহাদিগেরই থাকে। ইহাদিগেরই প্রকৃতিতে ভীরুতা কোমলতার সহিত মিশিয়া যায়। কোমলতার সহিত না মিশিলে ইহাদিগের ভীরুতা অন্যবিধ কামিনীর স্বাভাবিক ভীরুতার সহিত সমান হইত, তাহার বিশেষ ভাব লক্ষিত হইত না। হৃদয়ের কোমলতার সহিত ভীরুতা মিশিয়া প্রকৃতি যে সুকোমলভাব ধারণ করে তাহা বাঙ্গালির প্রকৃতিতে আছে। তাহা বাঙ্গালিনী রমণীতে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালিনীতে তাহা এক সুন্দর অভূতপূর্ব্ব রমণীয়ভাব ধারণ করিয়াছে। কুন্দনন্দিনী সেই অভূতপূর্ব্ব সুকোমলতার অবয়বী কল্পনা ও সুন্দর দৃষ্টান্ত। এই সুকোমলতা প্রকৃত জীবনে এতদূর প্রাপ্ত

হওয়া যায় না। যে মাত্রায় কুন্দনন্দিনী প্রকৃত জীবনের উপর দাঁড়াইয়া আছেন, সেই মাত্রা, কবির চিত্রবিভাস, তাহাই কাব্য-সৃষ্টি। প্রকৃত জীবনে বঙ্গগৃহলক্ষ্মী তাহার অনেকদূর নিকটবর্ত্তিনী হইতে পারেন, কিন্তু ঠিক্ সেই উচ্চতায় উঠিতে পারেন না। প্রকৃত জীবনের উপর এই অত্যল্প মাত্রায় উচ্চতা দেওয়া কবির কার্য্য; এই উচ্চতা কেবল উপন্যাসে ও কাব্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি কবি নহেন, যিনি সামান্য লেখক, তিনি এই বর্ণগৌরব, প্রকৃত চিত্রে এই বর্ণবিভাস দিতে সমর্থ হয়েন না। এই ঈষৎ চিত্র-রঞ্জন সূর্য্যমুখী ও কমলমণিতেও আছে, তবে তাহাদিগের চিত্রের সহিত কুন্দনন্দিনীর চিত্রেব প্রভেদ এই, কোমলবর্ণ বঙ্গগৃহবধূ কুন্দনন্দিনীতে কোমলতর বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সূর্য্যমুখী ও কমলমণি উজ্জ্বলবর্ণে উজ্জ্বলতরা হইয়াছেন। প্রকৃত জীবনের চিত্র বঙ্কিমবাবু অল্পই লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিষবৃক্ষ সমুদায় প্রকৃত জীবনেব চিত্র। অথচ প্রকৃত জীবনের চিত্র ধরিলে, বঙ্কিমবাবুর ন্যায় ভাবচিত্রকর সেই চিত্রে কেমন কাব্য-সৃষ্টি দেখাইতে পারেন তাহা বিষবৃক্ষেব চিত্রাবলীতে স্পষ্টবর্ণে প্রতীত হয়।

ভাবময়ী কুন্দনন্দিনী কোমলতায় পবিপূর্ণ। কুন্দনন্দিনীব যদি কিছু গুণ ও সম্পত্তি থাকে তাহা তাহার হৃদয়, প্রেম, সহৃদয়তা ও কোমলতা। শেলির লজ্জাবতী লতা এতদূর কোমলপ্রকৃতি নহে। তাহাব হৃদয় ভাবে সর্ব্বদাই উদ্বেলিত হইত। তিনি স্বভাবগুণে কোমলভাবকে কোমলতব করিতেন। তাহার ভাবোদ্বেগ হৃদয়কে স্তম্ভিত কবিয়া রাখিত। কখন অশ্রুধাবায় বিগলিত হইত। অশ্রুধারাই সে হৃদয়পূর্ণতার বাহ্যবিকাশ। সূর্যামুখী হৃদয়ভাবকে সুন্দর প্রকাশিত করিতে জানিতেন। এমত কি অনেক সময় তাহার ভাবব্যক্তি হৃদয়স্থ ভাবকে সুন্দরতর করিয়া দেখাইত। কুন্দনন্দিনী ভাব প্রকাশ করিতে জানিতেন্ না। তাহার ভাব নিজেই প্রকাশিত হইয়া পড়িত, ভাবপূর্ণতা উথলিয়া পড়িত। কিন্তু তাহার এই নিগূঢ় ভাববিকাশ কি সূর্যামুখীব সহিত সমান অর্থপূর্ণ ছিল না? যিনি তাহা পড়িতে জানিতেন, অশ্রুধাবা ও অস্ফুট বাক্স্ফূর্ত্তি তাঁহার নিকট অধিকতর অর্থপূর্ণ বোধ হইত। কমলণি তাহার নিগূঢ় অর্থ তন্ন তন্ন বুঝিতেন। নগেন্দ্র তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। কুন্দনন্দিনীর অগাধভাবপূর্ণতা কখন নীরবতায় কখন অশ্রুধারায়, কখন একটিমাত্র ক্ষুদ্র কথায অর্থপূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইত। সে বিকাশ সূর্য্যমুখীর বাক্পূর্ণতা অপেক্ষাও অধিকতব অর্থ-পূর্ণ। সূর্য্যমুখীর বাক্পূর্ণতা হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট প্রকাশিত করিত। কুন্দনন্দিনীর অবাক্স্ফূর্ত্তি হৃদয়ের আভাস মাত্র দিত। সে হৃদয় কত গভীর, কত পূর্ণ সম্যক্ প্রকাশিত করিত না। যাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িত তাহা হৃদয়ের অস্ফুটভাব ব্যক্তি। সে ক্ষুদ্র আলোকে তাহার হৃদয়ের পূর্ণতা মাত্র

দেখাইত, গভীরতার আভাস মাত্র দিত। দেখাইত, কুন্দনন্দিনীর যাহা কিছু সৌন্দর্য্য তাহা তাহার ভাবপূর্ণ সরলতাময় সুন্দর হৃদয়। সেই হৃদয়ের গভীরতা কত, সে আলোকে দেখা যাইত না। বোধ হইত সেই হৃদয়গভীরে অনেক রত্ন নিহিত আছে।

এই পূর্ণ হৃদযেব কি বাহ্যবিকাশ হয়? হৃদয় ফাটিয়া ইহার কিঞ্চিন্মাত্রা সময়ে সময়ে বাহিরে বহিয়া পড়ে। নীরবতা ইহার স্তম্ভিতভাব দেখায়, অশ্রুধারা ইহার কোমলতা দেখায়, এবং দুই একটি মৃদু কথা মাত্র হইার গাম্ভীর্য্য ও সুন্দরতা দেখায়। অবাক্‌স্ফূর্ত্তি কুন্দনন্দিনীব প্রকৃতি-বিশেষ নহে, কিন্তু ইহা তাহার প্রকৃতি বিশেষেব ফল। যে বাপীকূলে প্রদোষকালে একদা কুন্দনন্দিনী বসিয়া নীলপ্রভ জলরাশিতে প্রতিবিম্বিত আকাশচিত্রে জলের গাম্ভীর্য্য দেখিতেছিলেন, কুন্দনন্দিনী জানিতেন না যে, সেই স্থির নীলবর্ণ, কাল জলরাশি তাহার হৃদয়ের সদৃশ বলিয়াই সেখানে বসিয়া তিনি হৃদয়েব প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিলেন, হৃদয় একবাব অধ্যয়ন কবিলেন, সে জলে তিনি নিজে নিমজ্জিতা হইতে পারিলেন না; তাহা অপবকে নিমজ্জিতা কবিতে পারিত। কুন্দনন্দিনীর হৃদয় তেমতি তরল, তেমতি পূর্ণ, তেমতি নীল, তেমতি কালিমায় সুগভীর। যে হৃদয়াকাশ ইহার উপব আসিয়া পড়িত, তাহার সুন্দর তারকাবলী ইহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ইহাব সন্দৌর্য্য বর্দ্ধন করিত, ইহাব গাম্ভীর্য্য দেখাইত, ইহার কালিমা এবং তরলতা প্রকাশিত করিত। সূর্য্যমুখী সেই হৃদয়াকাশ, নগেন্দ্র সেই হৃদয়াকাশ এবং কমলমণি সেই অশেষ তারারাজিত হৃদয়াকাশ। কুন্দনন্দিনী কেবল নগেন্দ্রকেই প্রতিবিম্বিত করিয়াছিলেন এমত নহে, সূর্য্যমুখীরও বিরহে-কাতরা, এবং কমলমণির সমক্ষে হৃদয়-বক্ষ খুলিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে কমল হৃদয়ের তাবারাজি ফুটিয়াছিল বটে, কিন্তু সে আলোকে কুন্দনন্দিনীর হৃদয় আলোকিত হয় নাই, তাহার নীলিমা, গভীরতা ও তরলতাই প্রকাশ করিয়াছিল।

বঙ্গগৃহবধূ যখন অবগুণ্ঠনে নিজ মুখমণ্ডল আবরিত করিয়া রাখেন, তখন কেহই জানিতে পারেন না সেই অবগুণ্ঠন মধ্যে কি রূপরাশি লুক্কায়িত আছে। সেই অবগুণ্ঠন বিমুক্ত হইলে যখন অচিরাৎ এক অপূর্ব্ব মোহিনীমূর্ত্তি তোমার নিকট প্রকাশিত হয়; তখন দেখিয়া চমকিত হও, সে কি রূপ?—না কমল-কান্তি, সেই কমলের ন্যায় প্রস্ফুটিত সুন্দর, নবীন, মধুর, প্রফুল্ল অথচ সুকুমার; সে কি রূপ?—না চন্দ্রবিভা, সেই চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ, কোমল অথচ আলোকময়; নয়ন মুদিত আছে, নহিলে সে নয়নকটাক্ষে তোমার হৃদয় এখনি অস্থির হইত, কুসুমশর কোমল কি তীক্ষ্ণ এখনি জানিতে পারিতে; অধরে বর্ণরাগ

ফুটিয়াছে, যেন চুম্বনের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছে।" অবগুণ্ঠন বিমুক্ত সেই রূপমাধুরী দেখিয়া যেমন মোহিত ও আশ্চর্য্য হইতে হয়, কুন্দনন্দিনীর হৃদয় নীরবতার আবরণ বিমুক্ত হইয়া যখন প্রকাশিত হইয়া পড়ে, আমরা তদ্রূপ মোহিত ও আশ্চর্য্য হই। আমরা এই আবরণ ভেদ করিয়া তাহার হৃদয় দেখিবার জন্য বরাবর তাহাকে অনুসরণ করিয়াছি। সেই ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা যখন মুমূর্ষু পিতার শিয়রে বসিয়া ছল ছল করিয়া চাহিয়া আছেন, ভাবিতেও পারেন না যে তাহার পিতার মৃত্যু সন্নিকট, কেন না তাহা হইলে তিনি একেবারে নিরাশ্রয়া হইবেন, মৃত্যু অঙ্কে তাহাকে শায়িত দেখিয়া ভাবিতেছেন, তিনি বুঝি আবার নিদ্রাভিভূত হইলেন; পৃথিবীর ভাবগতিক কিছুই জানেন না। তখনকার এই সরলতা দেখিয়া ভাবিলাম, ইহা বুঝি তাহার বালস্বভাবের অনভিজ্ঞতা মাত্র। কারণ, এই তাহার প্রথম পরিচয়। তৎপরে যখন চাঁপা কুন্দকে সঙ্গে করিয়া নগেন্দ্রের দিকে লইয়া যাইতেছেন, "আসিতে আসিতে দূব হইতে তখন নগেন্দ্রকে দেখিয়া, কুন্দ অকস্মাৎ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইল। তাহার আর পা সরিল না। সে বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে বিমূঢ়াব ন্যায় নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।" "দেখিল যাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছেন, নগেন্দ্র ঠিক সেই মূর্ত্তি। তখন তাহাকে ভয়বিহ্বলা ও সঙ্কুচিতা দেখিয়া নগেন্দ্র কুন্দকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন। কুন্দ কোন উত্তর কবিতে পারিল না; কেবল বিস্ময়বিস্ফাবিত লোচনে নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।" তৎপরে তাহার অনুগমনে কলিকাতায় যাইলেন। এই নিরীহ, অশক্ত, সবল বালিকা যখন স্নেহময়ী কমলের নিকট লেখা পড়া শিখেন তখন তিনি লেখা পড়া সুন্দর শিখিতে পারেন, "কিন্তু অন্য কোন কথাই বুঝেন না। বলিলে, বৃহৎ, নীল, দুইটি চক্ষু—চক্ষু দুইটি শরতের পদ্মের মত সর্ব্বদাই স্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে—সেই দুইটী চক্ষু নগেন্দ্রের মুখের উপর স্থাপিত কবিয়া চাহিয়া থাকে কিছুই বলে না—নগেন্দ্র সে চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হন।" সে চক্ষের প্রভাব নগেন্দ্র কেন, অন্য লোকেও বিলক্ষণ অনুভব করিত। সে দৃষ্টির সরলতা, অর্থপূর্ণতা, নিরাশ্রয়ের ভাবব্যঞ্জকতা, সূর্য্যমুখীও সহস্রবাক্যে তত সুন্দর প্রকাশ করিতে পারিতেন না। তারাচরণ যখন এই কুন্দনন্দিনীকে সাজাইয়া আনিয়া দেবেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন; "কুন্দ তখন দেবেন্দ্রের সঙ্গে কি আলাপ করিলেন? ক্ষণকাল ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাঁদিয়া পলাইয়া গেলেন।" তাহাব এই ব্যবহার সকলই নীরব, অথচ কত দূর ভাবব্যঞ্জক। প্রথমে তিনি থতমত খাইয়া অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জায় ঘোমটা দিলেন, অনন্তর কি করিবেন কিছুই জানেন না বলিয়া ক্ষণিক স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন। অবশেষে একদা লজ্জায়,

অপমানে, আত্মতিরস্কারে হৃদয় উদ্বেলিত হইল; তখন তিনি কাঁদিয়া পলাইয়া গেলেন। কাহাকেও কিছু বলিলেন না। আর কোন রমণী দেবেন্দ্রের নিকট আনীত হইতে হয়তো সম্মতা হইত না। কিন্তু সরলা কুন্দ কিছুই জানেন না, তিনি জড়ের মত আনীত হইলেন; আনীত হইয়া আত্মপরিচয় দিয়া পলাইয়া গেলেন। সবলা, ভাবময়ী কুন্দকে লইয়া কি কোন ক্রীড়া চলে? তাহার ভাবপূর্ণ জড়প্রায় ব্যবহার ক্রীড়াব অতীত।

ইহার পব হরিদাসী বৈষ্ণবীব অভিনয়। নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে হরিদাসী গাইতে আসিলে, শ্রোত্রীগণ নানাবিধ ফবমায়েস আবম্ভ করিলেন। বৈষ্ণবী সকলের হুকুম শুনিয়া কুন্দেব প্রতি বিদ্যুদ্দামতুল্য এক কটাক্ষ করিয়া কহিল:—

"হাঁ গা তুমি কিছু ফবমাশ করিলে না?"

"কুন্দ তখন লজ্জাবনতমুখী হইয়া অল্প একটু হাসিল, কিছু উত্তর করিল না। কিন্তু তখনই একজন বয়স্যাব কাণে কাণে কহিল, কীর্ত্তন গায়িতে বল না?" এতক্ষণ সবাই নানাবিধ ফবমাস কবিয়াছিল, কিন্তু কুন্দ চুপ করিয়াছিল। বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইলে কুন্দ আনন্দে একটু হাসিল; কিন্তু তা বলিয়া ধৃষ্টতা দেখাইয়া উত্তব কবিবার লোক তিনি নহেন। তিনি এখন পূর্ণযৌবনা, বয়স ষোড়শেরও অধিক। যুবতীব কি এই ব্যবহার? যৌবনের সে চঞ্চলতা ও অধীরতা কোথায়? কুন্দের ইচ্ছা মনে মনেই বিলীন হইতেছিল। অপরে সে ইচ্ছা জানিতে চাহিলে তিনি সাহস ভরে তাহা উচ্চরবে প্রকাশ করিতেও পারেন নাই। একজন বয়স্যার কাণে কাণে বলিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। বঙ্কিমবাবুর এই চিত্রটি কেমন স্বভাবানুরূপ, কেমন সংক্ষেপে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ! ইহা কুন্দনন্দিনীর যথাযথই চিত্র বটে। কুন্দনন্দিনীর এই প্রকৃতি বিশেষ সুস্পষ্ট দেখাইবার জন্যই তিনি নানাবিধ রমণীমণ্ডলে তাহাকে আনিলেন পরে বহুবিধ রমণীগণের সহিত তাহার প্রভেদ কি, তাহা কবির একটি মাত্র সুন্দর চিত্রলেখায় সমুদায় প্রকাশিত করিয়া দিলেন।

এতক্ষণ আমরা কুন্দনন্দিনীর প্রকৃতি বিশেষেরই পর্য্যালোচনা করিতেছি। দেখিলাম সরলতা ও বালিকাদুর্লভ অচঞ্চলতা, ভীরুতা, ও মৃদুতাহেতু নিশ্চেষ্টতা, বিচিত্রভাবে তাহার রমণীপ্রকৃতিতে মিশিয়াছে। মিশিয়া এক অসামান্য বিচিত্র রমণীকে প্রদর্শন করিল। এ প্রকৃতির রমণী কেবল বঙ্গধামেই পাওয়া যায়। বঙ্গরমণীর এই প্রকৃতিবিশেষের ব্যবধানে কিরূপ কোমল হৃদয় লুক্কায়িত থাকে তাহা বঙ্কিমবাবু এখনও প্রকাশিত করেন নাই। তিনি প্রথমে ব্যাহুরেখায় এই বিচিত্র রমণীর ছায়াপাত মাত্র করিলেন; এই ছায়াপাতেই চেনা গেল কুন্দনন্দিনী

কোন্ প্রকৃতির বঙ্গগৃহবধূ। তৎপরে বঙ্কিম বাবু সহসা অথচ ধীরে ধীরে তাহার হৃদয় আবরণ খুলিতে লাগিলেন। তখন পাঠক কুন্দের হৃদয়লাবণ্য দেখিয়া আরও চমকিত হয়েন। চমকিত হইয়া বলেন, এমন অগৌরবিণী মৃদু প্রকৃতির ভিতরে যে এমন হৃদয়মাধুরী ও সৌকুমার্য্য লুক্কায়িত থাকিবে তাহা বিচিত্র নহে। এইরূপ প্রকৃতির এইরূপ হৃদয় হওয়াই উচিত, এবং এইরূপ হৃদয়ের এইরূপ প্রকৃতিই উপযোগিনী হইয়া থাকে। আমরা পরবারে কুন্দনন্দিনীর বাহ্য ব্যবধান বিমুক্ত করিয়া তদীয় হৃদয়সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য বঙ্কিম বাবুর সহিত তাহাকে অনুসরণ করিব।

ক্রমশঃ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু

প্রায় সকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। যে সকল বাঙ্গালি ইংরেজি সাহিত্যে পারদর্শী, তাঁহারা একজন লণ্ডনী কক্‌নী বা একজন কৃষকের কথা সহজে বুঝিতে পারেন না, এবং এতদ্দেশে অনেক দিন বাস করিয়া বাঙ্গালির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে যে ইংরেজেরা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় একখানিও বাঙ্গালাগ্রন্থ বুঝিতে পারেন না। প্রাচীন ভারতেও, সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে, আদৌ বোধ হয়, এইরূপ প্রভেদ ছিল, এবং সেই প্রভেদ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষা সকলের উৎপত্তি।

বাঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষায় যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। বলিতে গেলে, কিছু কাল পূর্ব্বে দুইটি পৃথক্ ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা, অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিন্ন, দ্বিতীয়টির কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত না। সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ সকল বাঙ্গালা ক্রিয়া-পদের আদিম রূপের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধু-ভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না। লোকে বুঝুক বা না বুঝুক আভাঙ্গা সংস্কৃত চাহি। অপর ভাষা সেদিকে না গিয়া, যাহা সকলের বোধ-গম্য তাহাই ব্যবহার করে।

গদ্য* গ্রন্থাদিতে সাধু ভাষা ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার হইত না। তখন পুস্তক প্রণয়ন সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত

*পদ্য সম্বন্ধে ভিন্ন রীতি। আদৌ বাঙ্গালা কাব্যে কথিত ভাষাই অধিক পরিমাণে ব্যবহার হইত—এখনও হইতেছে। বোধ হয় আজি কালি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা পদ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতেছে; চণ্ডীদাসের গীত এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্য, অথবা কীর্ত্তিবাসি রামায়ণ এবং বৃত্রসংহার তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এ প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইল তাহা কেবল বাঙ্গালা গদ্যসম্বন্ধেই বর্ত্তে। যাঁহারা সাহিত্যের

না জানে বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই, সে বাঙ্গালা লিখিতে পারেই না। যাঁহারা ইংরেজিতে পণ্ডিত তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে না জানা গৌরবের মধ্যে গণ্য করিতেন। সুতরাং ফোঁটা কাটা অনুস্বরবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতেই তাঁহাদিগের গৌরব। তাঁহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই বুঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালি স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক না বাড়ুক ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্ত্তারা তেমনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত বাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল।

এইরূপ সংস্কৃত প্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু, বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্ব্বল, এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত। ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্য গ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় আলালের ঘরের দুলাল প্রণয়ন করিলেন। সেইদিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।

সেইদিন হইতে সাধুভাষা, এবং অপর ভাষা দুইপ্রকার ভাষাতেই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সংস্কৃতব্যবসায়ীরা জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন; অপর ভাষা, তাঁহাদিগের বড় ঘৃণা। মদ্য, মুরগী, এবং টেকচাঁদি বাঙ্গালা এককালে প্রচলিত হইয়া ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠীকে আকুল করিয়া তুলিল। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার সমালোচকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। একদল খাঁটি সংস্কৃতবাদী—যে গ্রন্থে সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ ব্যবহার হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনায় ঘৃণার যোগ্য। অপর সম্প্রদায় বলেন তোমাদের ও কচকচি বাঙ্গালা নহে। উহা আমরা কোন গ্রন্থে ব্যবহার করিতে দিব না। যে ভাষা বাঙ্গালা সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্য কার্য্য সকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালিতে বুঝে তাহাই বাঙ্গালা ভাষা; তাহাই গ্রন্থাদির ব্যবহারের যোগ্য। অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক্ষণে এই সম্প্রদায় ভুক্ত। আমরা উভয় সম্প্রদায়ে এক এক মুখপাত্রের উক্তি এই প্রবন্ধে সমালোচিত করিয়া স্থূল বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

ফলাফল অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে পদ্যাপেক্ষা গদ্য শ্রেষ্ঠ, এবং সভ্যতার উন্নতি পক্ষে পদ্যাপেক্ষা গদ্যই কার্য্যকারী। অতএব পদ্যের রীতি ভিন্ন হইলেও এই প্রবন্ধের প্রয়োজন কমিল না।

সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের মুখপাত্র স্বরূপ আমরা রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে গ্রহণ করিতেছি। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত থাকিতে আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়কে এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্র স্বরূপ গ্রহণ করিলাম ইহাতে সংস্কৃত-বাদীদিগের প্রতি কিছু অবিচার হয় ইহা আমরা স্বীকার করি। ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃতে সুশিক্ষিত কিন্তু ইংরেজি জানেন না—পাশ্চাত্য সাহিত্য তাঁহার নিকট পরিচিত নহে। তাঁহার প্রণীত বাংলা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে ইংরেজি বিদ্যার একটু পরিচয় দিতে গিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় কিছু লোক হাসাইয়াছেন।* আমরা সেই গ্রন্থ হইতে সিদ্ধ করিতেছি যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে, ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহাতে বঞ্চিত। যিনি এই সুফলে বঞ্চিত, বিচার্য্য বিষয়ে তাঁহার মত তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে অধিক গৌরব প্রাপ্ত হইবে এমত বোধ হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে সকল সংস্কৃতবাদী পণ্ডিতদিগের মত অধিক-তর আদরণীয়, তাঁহারা কেহই সেইমত, স্বপ্রণীত কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের কাহারও নাম উল্লেখ করিতে আমরা সক্ষম হইলাম না। ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বপ্রণীত উক্ত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে আপনার মত গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহাকে এ সম্প্রদায়ের মুখপাত্র স্বরূপ ধরিতে হইল। তিনি আলালের ঘরের দুলাল হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে "এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্ব্ববিধ গ্রন্থরচনায় এইরূপ ভাষা আদর্শ স্বরূপ হইতে পারে কি না?—আমাদের বিবেচনায় কখনই না। আলালের ঘরের দুলাল বল, হুতোমপেচা বল, মৃণালিনী বল—পত্নী বা পাঁচজন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি—কিন্তু পিতা পুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে কখনই ও সকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয়বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে, ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জাবোধ হয়। পাঠকগণ! যদি আপনাদের উপর বিদ্যালয়ের পুস্তকনির্ব্বাচনের ভার হয়, আপনারা আলালীভাষায় লিখিত কোন পুস্তককে পাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন কি?—বোধ হয়, পারিবেন না। কেন

* যে যে গ্রন্থ পড়ে নাই, যাহাতে যাহার বিদ্যা নাই, সেই গ্রন্থে ও সেই বিদ্যায় বিদ্যাবত্তা দেখান, বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে একটি সংক্রামক রোগের স্বরূপ হইয়াছে। যিনি একছত্র সংস্কৃত কখন পড়েন নাই—তিনি ঝুড়ি ঝুড়ি সংস্কৃত কবিতা তুলিয়া স্বীয় প্রবন্ধ উজ্জ্বল করিতে চাহেন, যিনি একবর্ণ ইংরেজি জানেন না তিনি ইংরেজি সাহিত্যের বিচার লইয়া হুলস্থুল বাঁধাইয়া দেন। যিনি ক্ষুদ্র গ্রন্থ ভিন্ন পড়েন নাই—তিনি বড় বড় গ্রন্থ হইতে অসংলগ্ন কোটেশ্যন করিয়া হাড় জ্বালান। এ সকল নিতান্ত কুরুচির ফল।

পারিবেন না ?—ইহার উত্তরে অবশ্য এই কথা বলিবেন যে, ওরূপ ভাষা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ নয় এবং উহা সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিতে লজ্জা বোধ হয়। অতএব বলিতে হইবে যে, আলালী ভাষা সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা হইলেও উহা সর্ব্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ঐরূপ ভাষায় গ্রন্থরচনা করা উচিত কি না ?—আমাদের বোধে অবশ্য উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়—মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাট্টা মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার পরিবর্ত্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণকরা পাঠকদিগের আবশ্যক।"

আমরা ইহাতে বুঝিতেছি যে প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রধান আপত্তি যে পিতা পুত্রে একত্রে বসিয়া এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে পারে না। বুঝিলাম যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিবেচনায় পিতা পুত্রে বড় বড় সংস্কৃত শব্দে কথোপকথন করা কর্ত্তব্য ; প্রচলিত ভাষায় কথাবার্ত্তা হইতে পারে না। এই আইন চলিলে বোধ হয় ইহার পর শুনিব যে শিশু মাতার কাছে খাবার চাইবার সময় বলিবে, হে মাতঃ খাদ্যং দেহি মে এবং ছেলে বাপের কাছে জুতার আবদার করিবার সময় বলিবে ছিন্নেয়ং পাদুকা মদীয়া। ন্যায়রত্ন মহাশয় সকলের সম্মুখে সরল ভাষা ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করেন, এবং সেই ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ বিবেচনা করেন না ইহা শুনিয়া তাঁহার ছাত্রদিগের জন্য আমরা বড় দুঃখিত হইলাম। বোধ হয় তিনি স্বীয় ছাত্রগণকে উপদেশ দিবার সময়ে লজ্জাবশতঃ দেড়গজী সমাসপরম্পরা বিন্যাসে তাহাদিগের মাথা ঘুরাইয়া দেন। তাহারা যে এবংবিধ শিক্ষায় অধিক বিদ্যা উপার্জ্জন করে এমত বোধ হয় না। কেন না আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে যাহা বুঝিতে না পারা যায় তাহা হইতে কিছু শিক্ষালাভ হয় না। আমাদের এইরূপ বোধ আছে যে সরল ভাষাই শিক্ষাপ্রদ। ন্যায়রত্ন মহাশয় কেন সরল ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ নহে বিবেচনা করিয়াছেন তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। বোধ হয় বাল্যসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই, সরল ভাষার প্রতি তাঁহার বীতরাগের কারণ নহে। আমরা আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলাম যে তিনি স্বয়ং যে ভাষায় বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহাও সরল প্রচলিত ভাষা। টেকচাঁদী ভাষার সঙ্গে এবং তাঁহার ভাষার সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল এই যে টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে, ন্যায়রত্নে কোন রঙ্গরস নাই। তিনি যে বলিয়াছেন যে পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসংকুচিত মুখে টেকচাঁদী ভাষা পড়িতে

পারা যায় না তাহার প্রকৃত কারণ টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে। বাঙ্গালাদেশে পিতা পুত্রে একত্র বসিয়া রঙ্গরস পড়িতে পারে না। সরলচিত্ত অধ্যাপক অতটুকু বুঝিতে না পারিয়াই বিদ্যাসাগরী ভাষার মহিমা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভাষা হইতে রঙ্গরস উঠাইয়া দেওয়া যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মত হয় তবে তাঁহারা সেই বিষয়ে যত্নবান্ হউন। কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রচলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে চেষ্টা কবিবেন না।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত সমালোচনায় আর অধিককাল হরণ করিবার আমাদিগের ইচ্ছা নাই। আমরা এক্ষণে সুশিক্ষিত অথবা নব্য সম্প্রদায়ের মত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এই সম্প্রদায়ের সকলের মত একরূপ নহে। ইহার মধ্যে এক দল এমন আছেন যে তাঁহারা কিছু বাড়াবাড়ি করিতে প্রস্তুত। তন্মধ্যে বাবু শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় গত বৎসব কলিকাতা রিভিউতে বাঙ্গালা ভাষার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধটী উৎকৃষ্ট। তাঁহার মত গুলি অনেক স্থলে সুসঙ্গত এবং আদরণীয। অনেক স্থলে তিনি কিছু বেশী গিয়াছেন। বহুবচন জ্ঞাপনে গণ শব্দ ব্যবহার করাব প্রতি তাঁহার কোপদৃষ্টি। বাঙ্গালায় লিঙ্গভেদ তিনি মানেন না। পৃথিবী যে বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ ইহা তাঁহার অসহ্য। বাঙ্গালায় সন্ধি তাঁহার চক্ষুঃশূল। বাঙ্গালায় তিনি জনৈক লিখিতে দিবেন না। ত্ব প্রত্যয়ান্ত এবং য প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহার করিতে দিবেন না। সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ যথা একাদশ বা চত্বারিংশৎ বা দুই শত ইত্যাদি বাঙ্গালায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভ্রাতা, কন্যা, কর্ণ, স্বর্ণ, তাম্র, পত্র, মস্তক, অশ্ব ইত্যাদি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভাই, কাল, কান, সোণা, কেবল এই সকল শব্দ ব্যবহার হইবে। এইরূপ তিনি বাঙ্গালাভাষার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছেন। তথাপি তিনি এই প্রবন্ধে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে অনেকগুলিন সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। বাঙ্গালা লেখকেরা তাহা স্মরণ রাখেন ইহা আমাদের ইচ্ছা।

শ্যামাচরণ বাবু বলিয়াছেন এবং সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালা শব্দ ত্রিবিধ। প্রথম সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার বাঙ্গালায় রূপান্তর হইয়াছে, যথা গৃহ হইতে ঘর, ভ্রাতা হইতে ভাই। দ্বিতীয়, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার রূপান্তর হয় নাই। যথা জল, মেঘ, সূর্য্য। তৃতীয় যে সকল শব্দের সংস্কৃতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই।

প্রথম শ্রেণীর শব্দসম্বন্ধে তিনি বলেন যে রূপান্তরিত প্রচলিত সংস্কৃতমূলক শব্দের পরিবর্ত্তে কোন স্থানেই অরূপান্তরিত মূল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে, যথা মাথার পরিবর্ত্তে মস্তক, বামনের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। আমরা বলি যে এক্ষণে বামনও যেরূপ প্রচলিত ব্রাহ্মণ

সেইরূপ প্রচলিত। পাতাও যেরূপ প্রচলিত পত্র. ততদূর না হউক, প্রায় সেই-রূপ প্রচলিত। ভাই যেরূপ প্রচলিত ভ্রাতা ততদূর না হউক প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। যাহা প্রচলিত হইয়াছে তাহার উচ্ছেদে কোন ফল নাই এবং উচ্ছেদ সম্ভবও নহে। কেহ যত্ন করিয়া মাতা, পিতা, ভ্রাতা, গৃহ, তাম্র বা মস্তক ইত্যাদি শব্দকে বাঙ্গালাভাষা হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। আর বহিষ্কৃত করিয়াই বা ফল কি? এ বাঙ্গালা দেশে কোন্ চাষা আছে যে ধান্য, পুষ্করিণী, গৃহ, বা মস্তক ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝে না। যদি সকলে বুঝে তবে কি দোষে এই শ্রেণীর শব্দ গুলি বধার্হ? বরং ইহাদের পরিত্যাগে ভাষা কিয়দংশে ধনশূন্য হইবে মাত্র। নিষ্কারণ ভাষাকে ধনশূন্য করা কোন ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে। আর কতকগুলি এমত শব্দ আছে যে তাহাদের রূপান্তর ঘটিয়াছে আপাতত বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক রূপান্তর ঘটে নাই, কেবল সাধারণের উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। সকলেই উচ্চারণ করে "খেউরি" কিন্তু ক্ষৌরী লিখিলে সকলে বুঝে যে এই সেই খেউরি শব্দ। এস্থলে ক্ষৌরীকে পরিত্যাগ করিয়া খেউরি প্রচলিত করায় কোন লাভ নাই। বরং এমত স্থলে আদিম সংস্কৃত রূপটি বজায় রাখিলে ভাষার স্থায়িত্ব জন্মে। কিন্তু এমন অনেক-গুলি শব্দ আছে যে তাহার আদিম রূপ সাধারণের প্রচলিত বা সাধারণের বোধগম্য নহে তাহার অপভ্রংশই প্রচলিত এবং সকলের বোধগম্য। এমত স্থলেই আদিম-রূপ কদাচ ব্যবহার্য্য নহে।

যদিও আমরা এমন বলি না যে "ঘর" প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহশব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে, অথবা মাথা শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া মস্তক শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে; কিন্তু আমরা এমত বলি যে অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্ত্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্ত্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্ত্তে পত্র এবং তামার পরিবর্ত্তে তাম্র ব্যবহার উচিত নহে। কেন না ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাঙ্গালা; আর গৃহ, মস্তক, পত্র, তাম্র, সংস্কৃত। বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া অকারণে বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত কেন লিখব? আর দেখা যায় যে সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিলে রচনা অধিকতর মধুর, সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হয়। "হে ভ্রাতঃ" বলিয়া যে ডাকে বোধ হয় যেন সে যাত্রা করিতেছে; "ভাই রে" বলিয়া যে ডাকে তাহার ডাকে মন উছলিয়া উঠে। অতএব আমরা ভ্রাতা শব্দ উঠাইয়া দিতে চাই না বটে, কিন্তু সচরাচর আমরা ভাই শব্দই ব্যবহার করিতে চাই। ভ্রাতা শব্দ রাখিতে চাই তাহার কারণ এই যে সময়ে সময়ে তদ্ব্যবহারে বড় উপকার হয়। "ভ্রাতৃ ভাব" এবং "ভাই ভাব" "ভ্রাতৃত্ব" এবং "ভাই গিরি" এতদুভয়ের তুলনায় বুঝা যাইবে, যে কেন ভ্রাতৃ শব্দ বাঙ্গালায় বজায় রাখা উচিত। এই স্থলে

বলিতে হয় যে আজিও অক্লান্ত প্রচলিত বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত ব্যবহারে, ভাই ছাড়িয়া অকারণে ভ্রাতৃ শব্দের ব্যবহারে অনেক লেখকের বিশেষ অনুরক্তি আছে। অনেক বাঙ্গালা রচনা যে নীরস নিস্তেজ এবং অস্পষ্ট ইহাই তাহার কারণ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ, অর্থাৎ যে সকল সংস্কৃত শব্দ রূপান্তর না হইয়াই বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে শ্যামাচরণ বাবু বিশেষ কিছু বলেন নাই, বলিবার প্রয়োজনও ছিল না; কিন্তু তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ যে সকল শব্দ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধশূন্য তৎসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সারগর্ভ এবং আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। সংস্কৃতপ্রিয় লেখকদিগের অভ্যাস যে এই শ্রেণীর শব্দ সকল তাঁহারা রচনা হইতে একেবারে বাহির করিয়া দেন। অন্যের রচনায় সে সকল শব্দের ব্যবহার শেলের ন্যায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করে। ইহার পর মূর্খতা আর আমরা দেখি না। যদি কোন ধনবান্ ইংরেজের অর্থ-ভাণ্ডারে হালি এবং বাদশাহী দুই প্রকার মোহর থাকে এবং সেই ইংরেজ যদি জাত্যভিমানের বশ হইয়া বিবির মাথাওয়ালা মোহর রাখিয়া ফার্সি লেখা মোহরগুলি ফেলিয়া দেয়, তবে সকলেই সেই ইংরেজকে ঘোরতর মূর্খ বলিবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে এই পণ্ডিতেরা সেইমত মূর্খ। এই সম্বন্ধে শ্যামাচরণ বাবু লিখিয়াছেন,

"Purism is radically unsound, and has its origin in a spirit of narrowness. In the free commingling of nations, there must be borrowing and giving. Can anything be more absurd than to think of keeping language pure, when blood itself cannot be kept pure? No human language has ever been perfectly pure, any more than any human race has been pure. Infusion of foreign elements do, in the long run, enrich languages, just as infusion of foreign blood improves races. Seeing then that languages, as men speak them, must be mixed, impure, heterogeneous; to reject words like garib (*Ar. garib*) and dag (*Ar. dag*) &. from books, on account of their foreign lineage would be most unreasonable. Current words of Persian or Arabic origin connect us Hindus of Bengal with Moosalman Bengalis, with the entire Hindustani speaking population of India, and even with Persians and Arabs. Is it wise to seek to diminish points of contact with a large section of our fellow countrymen, and with kindred and neighbouring races, with

whom we must have intercourse, in order that we may draw closer to our Sanskrit speaking ancestors ?

Human happiness would seem to be better promoted by increased points of contact with *living* men than by increased points of contact with remote ancestors. But men are very often swayed in these matters by sentiment more than by reason. The feeling that impels Bengali Hindus towards Sanskrit is perfectly intelligible. With Sanskrit are associated the days of India's greatest glory, with Persian and Arabic the days of her defeat, humiliation, and bondage. The budding patriotism of Hindus everywhere would therefore naturally eschew Persian and Arabic words as badges of slavery. In the long run, however, considerations of utility are sure to override mere sentimental predilections.

It should be understood that I do not advocate any fresh introduction of Arabic and Persian words, but insist only on the desirability of giving their full rights to such words, as have already been naturalised in the language and are in every body's mouth. Persian and Arabic words, those connected with law especially, used by Bengalis ignorant of those languages ought to be accepted as right good Bengali. As a matter of fact, many such words are employed in writing; but the purist spirit is still very active and a disincliniation to admit such words into writing is yet but too common."

তাহার পরে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দকে বাঙ্গালা ভাষায় নূতন সন্নিবেশিত করার ঔচিত্য বিচার্য্য। দেখা যায় লেখকেরা ভূরি ভূরি অপ্রচলিত নূতন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োজনে বা নিষ্প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা, তাহার অভাব পূরণ জন্য অন্য অন্য ভাষা হইতে সময়ে সময়ে শব্দ কর্জ্জ করিতে হইবে।. কর্জ্জ করিতে হইলে চিরকেলে মহাজন সংস্কৃতের কাছে ধার করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী; ইহার রত্নময় শব্দভাণ্ডার হইতে যাহা চাও তাহাই পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত হইতে শব্দ লইলে বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল মিশে। বাঙ্গালার অস্থি, মজ্জা, শোণিত,

মাংস সংস্কৃতেই গঠিত। তৃতীয়তঃ সংস্কৃত হইতে নূতন শব্দ লইলে, অনেকে বুঝিতে পারে, ইংরেজী বা আরবী হইতে লইলে কে বুঝিবে? মধ্যাকর্ষণ বলিলে কতক অর্থ অনেক অনভিজ্ঞ লোকেও বুঝে। গ্রাবিটেশ্যন বলিলে ইংরেজী যাহারা না বুঝে, তাহারা কেহই বুঝিবে না। অতএব সেখানে বাংলা শব্দ নাই, সেখানে অবশ্য সংস্কৃত হইতে অপ্রচলিত শব্দ গ্রহণ কবিতে হইবে। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে অর্থাৎ বাঙ্গালা শব্দ থাকিতে তদ্বাচক অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার যাহারা করেন, তাঁহাদের কিরূপ রুচি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এ বিষয়ে শ্যামাচরণ বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

No limit is set in fact to the extent to which words are to be borrowed from Sanskrit, so that every Sanskrit word is considered to have a rightful claim to be incorporated into Bengali. Is this to enrich the language or to overburden it? This indeed is carrying us back into the past with a vengeance. In the early flexible stage of Sanskrit, when its formative powers were active, whole hosts of words were formed to express the same thing. Those words were then, as philologists hold, transparent attributive terms, and not the arbitrary symbols that they afterwards became. Men could not, indeed, be so irrational as to invent more than one arbitrary symbol for one and the same thing. Among the many significant symbols expressive of the same idea, there was a struggle for existence and a survival, in the long run, of the the fittest. More terms than one have, in many cases, survived; but on *a priori* grounds it is quite impossible that more than one could survive at the same spot, and among the same class of people. Distance of place, or peculiarities of social organization, by limiting intercourse, could alone cause a selection of different names for the same thing. There has further been a differentiation of meaning between words that originally meant exactly the same thing, Our Sanskrit school of writers would, however, undo all this. They would bring back the dead to life. They would restore

to Bengali, which is one of the modern developments of Sanskrit, all the imperfections of the mother tongue that have been cast off for good. What a terrible legacy would a wholesale appropriation of the Sanskrit vocabulary leave to posterity? Men of capacity little think of the labor that the acquisition of a language costs; and of this labor the heaviest part is that required in mastering the vocabulary, which, consisting as it does for the most part, of arbitrary symbols, is dull, dreary matter to learn. Where arbitrary symbols furnish a key to valuable knowledge, the symbols ought surely to be learnt. In the present case, however, the labors spent on the acquisition of words would be vain, meaningless labor. What is the good of learning a new word where one does not learn a corresponding new idea with it? Perfection of language requires that no two words should express exactly the same idea, and that no two ideas should have the same name. No human language is indeed perfect like this it is true. But this is no reason why we should work the other way, and go on sanctioning and accumulating defects.

স্থূল কথা, সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে,. বোধ হয় এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য, অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য, তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই চারি শব্দ পণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষায় গ্রন্থ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখন যশ করিব না। তিনি দুই একজনের উপকার করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে পরোপকার-কাতর-খল-স্বভাব পাষণ্ড বলিব। তিনি জ্ঞানবিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে আপনার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে দূরে রাখেন। যিনি যথার্থ গ্রন্থকার তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই; জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই,

অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত—ততই গ্রন্থের সফলতা। জ্ঞানে, মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সে সর্ব্বজনের প্রাপ্য ধনকে, তুমি এমত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল যে কয় জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র।

তাই বলিয়া আমরা এমত বলিতেছি না যে, বাঙ্গালার লিখন পঠন হুতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। তাহা কখন হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমিভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমিভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই, হুতোমি-ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমিভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয় সেখানে পবিত্রতা শূন্য। হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যিনি হুতোমপেঁচা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার রুচি বা বিবেচনার আমরা প্রশংসা করি না।

টেকচাঁদিভাষা, হুতোমিভাষার এক পৈঠা উপর। হাস্য ও করুণরসের ইহা বিশেষ উপযোগী। স্কচ্ কবি বর্ণস্ হাস্য ও করুণরসাত্মিকা কবিতায় স্কচ্ ভাষা ব্যবহার করিতেন, গম্ভীর এবং উন্নত বিষয়ে ইংরেজি ব্যবহার করিতেন। গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না। কেন না এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্ব্বল, এবং অপরিমার্জ্জিত।

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য—সে স্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত, কথাবার্ত্তার ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য্য সুসিদ্ধ হয় তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা

বিদ্যাসাগর বা ভূদেব বাবু প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই। নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথা গুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না; তারপর সেই রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবে—কেন না যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে। লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দেখিয়াছি সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় লইবে।

ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া, এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদিগের বিবেচনায় ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্য্যে পুষ্টা, এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে।

আমরা স্বরবিজ্ঞান প্রস্তাবে সঙ্গীতশাস্ত্র অনুসারে স্বরসাধন প্রণালী সমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এক্ষণে এই প্রস্তাবে রাগরাগিণী সম্বন্ধে স্থূল স্থূল বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গীত, বাদ্য, নৃত্য, এই তিনের নাম সংগীত। তন্মধ্যে গীত প্রধান। প্রথমোল্লিখিত গীত বলিতে হইলে তাহার মূল কারণ যে নাদ, তাহা না বলিলে বা না বুঝিলে গীতের ভাব ও শরীর কোনক্রমেই হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই জন্য প্রথমতঃ নাদ কাহাকে বলে, সংগীত নারায়ণ তাহার নিরূপণ করিতেছেন—

তত্র প্রথমোদ্দিষ্টস্য গীতস্য বক্ষ্যমাণ স্বান্নাদং বিনা তদনুপপত্তেঃ প্রথমং তমেবাহ তদুক্তং—

আত্মা বিবক্ষমাণোঽয়ং মনঃ প্রেরয়তেমনঃ।
দেহস্থং বহ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতং। ইত্যাদি।

শরীরসংস্থান ও শারীরিক পদার্থ বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে আত্মা একটি স্বতন্ত্র পদার্থ। সেই আত্মার ইচ্ছা নামক এক গুণ আছে। আত্মার সে গুণের উদ্ভব হইলে মনুষ্যের চেষ্টা জন্মে। আত্মার তাদৃশ ইচ্ছা যখন কিছু বলিবার নিমিত্ত উদ্ভব হয়, তখন, সেই ইচ্ছা প্রথমতঃ মনকে সঞ্চালিত করে, (মনের চেষ্টা হয়) মন দেহস্থ তেজকে সঞ্চালিত করে, তেজ দৈহিক বায়ুকে প্রেরণ করে। সুতরাং নাভিস্থানের আকাশে অর্থাৎ অবকাশময়স্থানে প্রাণ বায়ু ও জাঠরাগ্নির সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে তত্রত্য নাড়ীকলাপ কম্পিত হইয়া কোনও না কোনও শব্দের উৎপত্তি করে। সেই উৎপন্ন শব্দটিকে নাদ বলে। ঐ নাদ কতকগুলি সূক্ষ্ম ধ্বনির সমষ্টি মাত্র। তাহার প্রত্যেক সূক্ষ্ম ধ্বনিগুলির নাম শ্রুতি। শ্রুতি ২২টির অতিরিক্ত নহে।

সা, রি, গ, ম, প, ধ, নি, এই স্বরের উৎপত্তি, পরিমাণ, কাল প্রভৃতির জ্ঞান জন্মান শ্রুতির ফল, অর্থাৎ কার্য্য। শ্রুতি ৭টি স্বরের উপাদান কারণ যথা—

"ষড়্জাদিক পরিজ্ঞানং শ্রুতিনাং ফলমেবতৎ।"

শ্রুতি গুলি শরীরের স্থানবিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়। সেই স্থান তিনটি। হৃদয়, কণ্ঠ, তালু। ২২টি শ্রুতি ক্রমেই উত্তরোত্তর দ্বিগুণ করিয়া উচ্চ ভাবাপন্ন অর্থাৎ প্রথম শ্রুতি যে পরিমাণে উচ্চ, দ্বিতীয় শ্রুতি তদপেক্ষা দ্বিগুণ যথা—

শ্রুতয়ঃ স্থানসম্ভূতাঃ স্থানানি ত্রীণি তত্রহি।
হৃৎ কণ্ঠঃ শির ইত্যাসাং দ্বিগুণাদুত্তরোত্তরং॥

হৃদয়, মূর্দ্ধা, ও নাভিসংলগ্ন প্রধানতঃ ২২ নাড়ী আছে। ঐ নাড়ী গুলি কতক বক্র কতক উর্দ্ধভাবে আছে। এই নাড়ী গুলিই দেহযন্ত্রের তার স্বরূপ, দৈহিক বায়ুর আঘাত লাগিবামাত্র ঐ সকল নাড়ী কম্পিত হয়, তাহাতেই শ্রুতি-রূপ সূক্ষ্ম স্বরাংশের উৎপত্তি হয়, তাহাই ক্রমে স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া স্বররূপে বহির্গত হয়। উদরকন্দর, নাড়ীপথ প্রভৃতি যে অবকাশময় স্থান শরীরাভ্যন্তরে আছে, আর পিত্ত নামক তৈজস পদার্থ শরীরে আছে, এবং শ্বাস প্রশ্বাসাদি ব্যাপার যদ্দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, সেই বায়ু, আর ঐ পদার্থত্রয়ের বলেই প্রথমতঃ নাদ (সূক্ষ্ম অবিকৃত ধ্বনি) জন্মে। পশ্চাৎ সেই নাদ ক্রমশঃ নাভির উর্দ্ধে সঞ্চালিত হইয়া ক্রমে হৃদয়, কণ্ঠ, মুখ ও গলগহ্বর দিয়া বহির্গত হয়, তখন তাহা নানাপ্রকার বিস্পষ্ট আকারে প্রকাশ পায়, যথা—

হৃন্মূর্দ্ধনাভিকালগ্না নাড্যো দ্বাবিংশতিঃ শুভাঃ।
তাশ্চবক্রাশ্চোর্দ্ধ্বস্থা ধ্বনিতো মরুতাহতাঃ॥
আকাশাগ্নিমরুজ্জাতো নাভেরূর্দ্ধ্বং সমুচ্চরন্।
ইত্যাদি।

"যোঽয়ং ধ্বনি বিশেষস্ত স্বর বর্ণ বিভূষিতঃ।
রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগঃ কথিতো বুধৈঃ।"

স্বর, বর্ণ ও মূর্চ্ছনাদি ভূষিত করিয়া যে ধ্বনিবিশেষ উচ্চারিত হয়, সেই ধ্বনিবিশেষ জনসাধারণের চিত্তরঞ্জন করে বলিয়া তাহার নাম রাগ।

এই রাগের অঙ্গ অর্থাৎ কতকগুলি প্রতিপোষক ক্রিয়া ও বস্তু আছে তাহা রাগাঙ্গ নামে বিখ্যাত। রাগাঙ্গের ন্যায় ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ নামে আরও কতকগুলি বিষয় আছে, তাহার লক্ষণ এই—

রাগচ্ছায়ানুকারিত্বাদ্রাগাঙ্গমিতি কথ্যতে।

যাহা রাগের ছায়ানুযায়ী তাহাকে রাগাঙ্গ বলে।

ভাষাচ্ছায়াশ্রিতা যেন ভাষাঙ্গ স্তেন কথ্যতে।

যেহেতু ভাষার ছায়ার আশ্রিত সেই হেতু তাহা ভাষাঙ্গ নামে কথিত হয়।

করুণোৎসাহ সংযুক্তং ক্রিয়াঙ্গং তেন হেতুনা।

করুণ ও উৎসাহাদি ক্রিয়াগুলি যাহাতে সংযুক্ত থাকে তাহাই ক্রিয়াঙ্গ।

কিঞ্চিচ্ছায়ানুকারিত্বা দুপাঙ্গমিতি কথ্যতে।

কিঞ্চিৎ অর্থাৎ কোন অংশে ছায়া লাগিলে তাহা উপাঙ্গ।

এতদ্‌ভিন্ন কাগুারণা নামক আর একটি ব্যাপার আছে সংস্কৃতে ইহার লক্ষণ এইরূপ—

কাগুারণাতু কথিতা তারস্থানেষু শীঘ্রতা।
গমকৈ বিবিধৈর্যুক্তা কৌশলেন বিভূষিতা॥

তারস্থানেতে শীঘ্রতা নানাবিধ গমকযুক্ততা সুকৌশলস্থাপিতা হইলে তাহাকে কাগুারণা বলা যায়।*

মতঙ্গমতে রাগ ৩ প্রকার। শুদ্ধ, সালঙ্ক, এবং সঙ্কীর্ণ যথা—

শুদ্ধাশ্ছায়ালগাঃ প্রোক্তা সঙ্কীর্ণাশ্চ তথৈবচ।

কল্লিনাথ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, শাস্ত্রোক্ত নিয়মে উচ্চারিত স্বর রক্তিজনক হয়, এজন্য তাহা শুদ্ধ রাগ। অন্যের ছায়াগামী হইয়াও রক্তি জন্মায় সুতরাং তাহা ছায়ালগ রাগ। উভয়ের প্রাধান্যেও অনুরক্তি জন্মায় সুতরাং তাহা সঙ্কীর্ণ রাগ যথা—

"তত্র শুদ্ধরাগত্বং নাম শাস্ত্রোক্ত নিয়মাৎ রঞ্জকং ভবতি।
ছায়ালগত্বং নাম অন্যচ্ছায়ালগত্বেন রক্তি হেতুত্বং ভবতি।
সঙ্কীর্ণ রাগত্বং নাম শুদ্ধচ্ছায়ালগমুখ্যত্বেন রক্তিহেতুত্বং ভবতি।

বস্তুতঃ ওড়ব, ষাড়ব (খাড়ব) ও সম্পূর্ণ এই ত্রিবিধ নাম এক্ষণে প্রচারিত। ৫ স্বরের রাগ ওড়ব। ৬ স্বরের রাগ ষাড়ব। ৭ স্বরের রাগ সম্পূর্ণ। যথা—

"ওড়বঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্তঃ স্বরৈঃ ষড়্‌ভিশ্চ ষাড়বঃ।
সম্পূর্ণঃ সপ্তভি র্জ্ঞেয় এবং রাগা স্ত্রিধা মতাঃ॥"

অতএব ৫ স্বরের ন্যূনে রাগ নাই।

মতবিশেষে সাধারণতঃ ২০টি রাগ প্রধান বা আদিম। শ্রী, নট্ট, বঙ্গাল, ভাব, মধ্যম, ষাড়ব, রক্তহংস, কোহ্লাস, প্রভব, ভৈরব, মেঘ, সোম, কামোদ, আম্র, পঞ্চম, কন্দর্প, দেশ, ককুভা, কৌশিক, নট্ট নারায়ণ। যথা—

"শ্রীরাগনট্টৌ বঙ্গালো ভাব মধ্যম ষাড়বৌ।
রক্তহংসশ্চ কোহ্লাসঃ প্রভবো ভৈরবো ধ্বনিঃ।
মেঘরাগঃ সোমরাগ কামোদৌচাম্র পঞ্চমঃ।
স্যাতাং কন্দর্প দেশাখ্যৌ ককুভাখ্যশ্চ কৌশিকঃ।
নট্টনারায়ণশ্চেতি রাগা বিংশতি রীরিতাঃ॥"

---

* এই কাগুারণা নামক গানাঙ্গটি অতি পুরাতন কালে ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। কেন না সংগীতের অংশবোধক যত শব্দ (প্রাচীন) পাওয়া যায় তন্মধ্যে এই শব্দ বা এতদর্থের অন্য কোন শব্দ পাওয়া যায় না। ইহাতে বোধ হয় ইহা সংগীতরত্নাকরাদি গ্রন্থোৎপত্তির কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী। মুসলমানেরা এই কাগুারণাকে বড় ভালবাসেন।

প্রাচীনমতের প্রধান ছয় রাগ। শ্রীরাগ (১) বসন্ত (২) ভৈরব (৩) পঞ্চম (৪) মেঘরাগ (৫) বৃহন্নট (৬) পুরুষজাতীয় বলিয়া বর্ণিত আছে, যথা—

শ্রীরাগোঽপ বসন্তশ্চ ভৈরবঃ পঞ্চম স্তথা।
মেঘরাগো বৃহন্নটঃ ষড়েতে পুরুষাহ্বয়াঃ॥

রাগিণী অর্থাৎ রাগভার্য্যা। রাগের অনুগত, স্ত্রীভাবান্বিত ও স্ত্রীজাতির ন্যায় কোমলা বলিয়াই রাগভার্য্যা বা রাগিণী নাম দেওয়া হইয়াছে। তদ্ভিন্ন রাগ নামক কোন প্রাণী নাই সুতরাং তাহার পত্নীও নাই।

"মালশ্রী ত্রিবণী গৌরী কেদারী মধু মাধবী।
ততঃ পাহাড়িকা জ্ঞেয়া শ্রীরাগস্য বরাঙ্গণা॥"

মালশ্রী, ত্রিবেণী বা ত্রিবণী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী, পাহাড়িকা,—ইহারা শ্রীরাগের ভার্য্যা।

"দেশী দেবগিরী চৈব বরাটী তোড়িকা তথা।
ললিতা চাঽথ হিন্দোলী বসন্তস্য বরাঙ্গণা॥"

দেশী, দেবগিবি, বরাটী, তোড়ী, ললিতা, হিন্দোলী, ইহারা বসন্তরাগের ভার্য্যা।

"ভৈরবী গুর্জ্জরী রামকিরী গুণকিরি তথা।
বাঙ্গালী সৈন্ধবী চৈব ভৈরবস্য বরাঙ্গণা।"

ভৈরবী, গুর্জ্জরী, রামকিরী, গুণকিরী, বাঙ্গালী, সৈন্ধবী, ইহারা ভৈরব রাগের স্ত্রী।

"বিভাষীচাথ ভূপালী কর্ণাটী বড় হংসিকা।
ভালবী (বা মালবী) পটমঞ্জর্য্যা সহৈতাঃ পঞ্চমাঙ্গনাঃ॥"

বিভাষী, ভুপালী, কর্ণাটী, বড়হংসিকা, (বড়ারী) ভালবী, (বা মালবী) পটমঞ্জরী, ইহারা পঞ্চম রাগের স্ত্রী।

"মল্লারী সৌরটী চৈব সাবেরী কৌশিকী তথা।
গান্ধারী হরশৃঙ্গারী মেঘরাগস্য যোষিতঃ॥"

মল্লারী, সৌরটী, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী, হরশৃঙ্গারী, ইহারা মেঘের ভার্য্যা।

"কামোদা চৈব কল্যাণী আভীরা নাটিকা তথা।
সারঙ্গী নট্টহম্বীরা, নট্টনারায়ণাঙ্গনা॥"

কামোদী, কল্যাণী, আভিরী, নাটিকা, সারঙ্গী, নট্টহম্বীরা,—ইহারা—নট্ট-নারায়ণের স্ত্রী।

এই ৩৬ রাগিণী।*

শ্রীরামদাস সেন।

---

*ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে তাহা এই। মতবিশেষে ইহার অন্যথাও দৃষ্ট হয়। ফল, প্রথমে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীই নির্ণীত হইয়াছিল, কিন্তু পরভাবী সঙ্গীতাচার্য্যেরা অনেক বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে অসংখ্য রাগ রাগিণী হইয়াছে।

সুশিক্ষিত চরিত। কলিকাতা ১২৮৫।

আজি কালি বাঙ্গালা দেশে শিরোরোগ কিছু প্রবল হইয়া উঠিতেছে। পীড়িতেরা পূর্ব্বে আঁচড়াইত, কামড়াইত, নাচিত, গায়িত। আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্য দেখিয়া বোধ হয় অনেক পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির সে সকল লক্ষণের পরিবর্ত্তে পুস্তক প্রণয়নই রোগের লক্ষণ দাঁড়াইয়াছে। আমরা সুশিক্ষিত চরিত পড়িয়া, কি বলিব ভাবিয়াই স্থির করিতে পারি নাই। প্রথম, টাইটেল পেজে দেখিলাম "পাবনান্তর্গত মালঞ্চীনিবাসীনাম্ শ্রীমধুসূদন সরকারস্য প্রণীত প্রকাশিতঞ্চ।" পড়িয়া আমরা কিছুক্ষণ ভাবিলাম যে শ্রীমধুসূদন সরকার মহাশয় একব্যক্তি না বহুব্যক্তি? "নিবাসীনাম্" দেখিয়া স্থির করিলাম যে তিনি একব্যক্তি নয়—বহু ব্যক্তি। তার পর দেখি—"সরকারস্য।" তবে ত তিনি একব্যক্তি বটে। ইহার একপ্রকার সিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম—বুঝিলাম যে তিনি একাই এক সহস্র। কিন্তু "সরকারস্য প্রণীতং" যে কি সামগ্রী তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম্ না। "সরকারেণ প্রণীতং" অর্থ লোকে জানে—কিন্তু "সরকারস্য প্রণীতং" সামগ্রীটা কি? আমরাও একটু সংস্কেকৃড়ি ঝাড়িব। আমাদিগের পরামর্শ শ্রীমধুসূদন সরকার মহাশয়ং একটু একটুং মধ্যমনারায়ণ তৈলং সেবনং করিবেনং।

এই ত গেল টাইটেল পেজ। তার পর বিজ্ঞাপন। সে অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। উদ্ধৃত না করিলে তাহার মহিমা কেহ বুঝিতে পারিবেন না—

"সম্প্রতি সুশিক্ষিত চরিত এবং সৌদামিনী প্রণয়িনী বিরহতাপ।

এই দুইখান পুস্তক মুদ্রাঙ্কন হইল। অতিশীঘ্র জ্ঞানতরঙ্গিণী নাম্নী একখান পুস্তক মুদ্রাঙ্কন হইবে। ভো ভো পণ্ডিতপ্রবরগণ এই সুশিক্ষিত চরিত একরূপ বঙ্গবিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী তাহার সন্দেহ নাই। এই পুস্তকখান বঙ্গবিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী করিয়া আমাকে উৎসাহ প্রদান করিলে আমি ক্রমশঃ নানাবিষয়ক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কন করিব। এই কয়েকখান গ্রন্থের আবশ্যক হইলে জেলা পাবনার

অন্তর্গত মালঞ্চী গ্রামে আমার নিকট পত্র প্রেরণ করিলে অনায়াসে পাইতে পারিবেন।"

এই সুশিক্ষিত চরিত একরূপ বঙ্গবিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী, তাহার সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে গঞ্জিকালয় এবং শুণ্ডিকালয় বলিয়া যে সকল চতুষ্পাঠী আছে, সেই সকল মহাবিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ বড়ই আদৃত হইবে। গ্রন্থকার ভয় দেখাইয়াছেন যে ক্রমশঃ নানাবিধ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কন করিবেন। আমরা ভয় পাই না। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, তিনি যত গ্রন্থ লিখিবেন, সকলই গঞ্জিকালয়ে চলিতে পারিবে।

বিজ্ঞাপনের পর একটী সংস্কৃত শ্লোক। মধুসূদনসরকারি সংস্কৃত, তার পর আবার অস্যার্থঃ, তার পর হঠাৎ "অন্নদা সতী অমিত্রাক্ষব প্রবন্ধ।" কবিত্ব, প্রথমের দুই চারি ছত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

"হে মাত ভুবনময়ী জীবনদায়িনী,
তব গুণচয় স্মরি ক্ষুধার্ত্ত জঠর।"

পড়িয়াই বুঝা গেল, শ্রীমধুসূদন সরকারস্য ক্ষুধা পাইয়াছে, মাত ভুবনময়ীকে ভক্ষণ করিবেন। তার পরেই—

"শীতলিল পুলকিল তনু মন প্রাণ।
শিহরিল তনু রোম ভরিল জঠর।"

দেখা যাইতেছে ক্ষুধা পাইবামাত্রেই সরকার মহাশয় ভুবনময়ীকে ভোজন করিয়াছেন। নহিলে তখনি জঠর ভরিবে কেন।

এই সুশিক্ষিত-চরিত এইরূপ আগাগোড়া পাগলামি। মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতা এবং কদর্য্য রুচির পরিচয়। বাস্তবিক এই গ্রন্থ সমালোচন করিয়া আমরা বঙ্গদর্শন কলুষিত করিতাম না। সমালোচন করার উদ্দেশ্য এই যে আমরা পাঠককে দেখাইলাম যে যাহারা আদৌ পাঠশালায় যায় নাই, তাহারাও এক্ষণে গ্রন্থ লিখিতেছে। ইহার পর আর বাঙ্গালাসাহিত্যের শোচনীয় অবস্থা কি হইতে পারে। নহিলে মধুসূদন সরকারস্য পৃষ্ঠদেশ বঙ্গদর্শনের বেত্রাঘাতের যোগ্য নহে।

নলিনী। অধরলাল সেন বিরচিত। এই নব্য গ্রন্থকার ললিতা সুন্দরী প্রভৃতি কয়েকখানি ক্ষুদ্র কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি সুইবার্ণএর উপাসক। ইঁহার কবিতা সুমধুর। অনেক স্থলে কবিত্বের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ—কিন্তু বড় একঘেয়ে। কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

"চিরিয়ে তরুণ বুক তরল শোণিতে
মদিরা, করিয়ে, প্রিয়ে, দিতাম তোমারে ;
সাধের বাসনা গুলে' অতুল অমৃতে
জুড়াতেম তো'রে ভালবাসিলে আমারে।
ভালবাসা দিলে
সুখেতে রাখিতে, প্রিয়ে, সুখেতে থাকিতে—
দুই দেহে একচিতে, একদেহ দুই চিতে,
দুলিতে কুসুমলতা আনন্দ অনিলে,
শুধু ভালবাসা দিলে।

বসন্তে বাতাস নাই, নাহিক কোকিল,
শরদে শশাঙ্ক নাই, নাহিক নীরদ,
জগতে মানুষ নাই, নাহিক অনিল,
যৌবনে প্রণয় নাই, নাহিক সুখদ।
কাতর হৃদয়
ফিরে ফিরে চেয়ে দেখে, কোথা ভালবাসা,
কোথা জনমের আশা, অমিয় সাগরে ভাসা
এই কি রে সেই নয় চন্দ্রমা উদয় ?
সেই ভালবাসা নয় ?

আন আশারজ্জু কর হৃদয় মন্থন,
অমৃত-সাগরে হ'ক গরল-উদ্ভব,
আগুনে বিরাগে মিশে যা'ক ত্রিভুবন,
জ্বলে যা'ক পুড়ে যাক, ছার হ'ক সব।
তবু নাহি পা'বে—
ভালবাসা. সুখ আশা পাইবার নয় !
অর্থ নাই, শব্দ নাই, সুখ নাই, আশাময়,
খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে শুধু হৃদয়ে হারা'বে,
কেন হৃদয়ে জ্বালা'বে ?"

টক্‌সিকোলজিকাল চার্ট। অর্থাৎ ধাতুঘটিত, ঔদ্ভিদিক ও প্রাণিঘটিত বিষ খাইলে যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয়, এবং নিশ্বাস বন্ধ (জলে ডুবা, প্রাণনাশক বায়ু কর্ত্তৃক শ্বাসরোধ, বজ্রাঘাত, উদ্বন্ধন, শ্বাসবিহীন সদ্যপ্রসূত সন্তান, অতিশয় শীত ও অতিশয় গ্রীষ্ম বা লু) জন্য অস্বাস্থ্য, তাহার বিবরণ এবং তাহার নানাবিধ প্রতিকারের ব্যবস্থা। কলিকাতা মেডিকাল কালেজের গ্রাজুয়েট শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা কৃত।

ইহা গৃহীগণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমরা ইহা হইতে জলে ডুবার চিকিৎসা উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন।

“জল যে প্রকার অগ্নিনির্ব্বাণ করে, সেই প্রকার প্রাণও নষ্ট করে। বায়ু বন্ধ হয় বলিয়াই জলে ডুবিলে জীবের প্রাণ সংশয় হয়। রোগীকে জল হইতে তুলিয়া যাহাতে বায়ু গ্রহণ করিতে পারে অর্থাৎ যাহাতে তাহার ফুস্ ফুস্ মধ্যে বায়ু প্রবেশ করে এ প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত শরীরে উষ্ণতা থাকে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি শিথিল থাকে সে পর্য্যন্ত ফুস্ ফুস্ মধ্যে বায়ু প্রবেশ করাইতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবে। সমস্ত জল মুখ দিয়া বাহির করিবে। মুখের লালা বাহির কবিবে। পরে পিঠে ও গলায় চাপ দিবে। দুই নাক বন্ধ করিবে। এবং মুখে মুখ লাগাইয়া ফুঁ দিবে যদি কামাবেব জাঁতা পাওয়া যায় তবে মুখ এবং এক নাক বন্ধ করিয়া এক নাকের মধ্যে জাঁতার নল প্রবেশ করাইয়া বাতাস দিবে। পবে জাঁতার নল খুলিয়া সে নাক বন্ধ করিয়া অপর নাকের মধ্যে জাঁতাব নল প্রবেশ কবাইয়া বাতাস দিবে পিঠ এবং গলার বায়ুনালী আস্তে আস্তে চাপিতে থাকিবে।

ফুস্‌ফুস্ বায়ুতে পরিপূর্ণ হইলে বুকের উপরে চাপিয়া কতক বায়ু বুক হইতে বাহির করিয়া দিবে। পুনরায় ফুস্‌ফুস্ পূর্ব্বমত বায়ু পরিপূর্ণ করিবে, এবং পরে পূর্ব্বমত বুক চাপিয়া বায়ু বাহির করিয়া দিবে, ইহাতে স্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাস অনুকরণ করা হয়। রোগীকে বার আনা উপুড় করিয়া শয়ন করাইবে। পরে চিত করিয়া শয়ন করাইবে। এইপ্রকার এক মিনিটে ২০ বার করিবে। কিম্বা মস্তকের উপরে দুই হাত তুলিবে। পরে দুই হাত একস্থানে সংলগ্ন হইলে নীচে নামাইবে, বুকের উপর নিয়ম মত চাপিবে। এ প্রকার এক মিনিটে ২০ বার করিবে। ইহাতে স্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাস অনুকরণ করা হইবে। গলায় কোন বন্ধনি থাকিলে তাহা তফাৎ করিবে। ভিজা কাপড় ছাড়াও, গা পুঁছিয়া দাও, গায়ে উত্তাপ দিয়া গা গরম কর। স্থানান্তরে লইতে হইলে তক্তপোষের উপরে মাথা উচ্চ করিয়া লইয়া যাইবে। বায়ুনালী অবরুদ্ধ হইনে নল চালাইয়া ফুস্‌ফুসে বায়ু প্রবেশ করাইবে। অম্লজান বায়ু অর্থাৎ অক্সিজেন্ গ্যাস প্রবেশ করাইতে পারিলে ভাল হয়।

উত্তেজক ঔষধ সেবন বিধেয়। গিলিতে না পারিলে নল দ্বারা ঔষধ দিবে। রাইচূর্ণ, লবণ বা ব্রাণ্ডী জলে মিশাইয়া পিচকারী দিবে। বুকের দক্ষিণে রক্ত ভার করিলে সাবধান পূর্ব্বক রক্ত মোক্ষণে উপকার হইবে। কিন্তু এদেশের লোকের পক্ষে রক্তমোক্ষণ প্রায় সততই অপকারী হয়। গ্যাল্‌ভ্যানিক্ ব্যাটারি দ্বারা তাড়িতশক্তি বুকে চালাইবে। কোন উপায়ে ফুসফুসে বাতাস প্রবেশ করাইতে

না পারিলে ট্রেকিয়া অর্থাৎ বায়ুনালীর নিচে কাটিয়া দিবে। ইহাতে চিকিৎসকের আবশ্যক।"

এই চার্ট সকলের ঘরে ঝুলান থাকা উচিত। ইহা কাপড় মোড়া ও কাঠের ফ্রেম দেওয়া পাওয়া যায়। মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র।

ষষ্ঠ বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মাণিকলাল তখনই রূপনগরে ফিরিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। রূপনগরের বাজারে গিয়া মাণিকলাল দেখিল যে বাজার অত্যন্ত শোভাময়। দোকানের শত শত প্রদীপের শোভায় বাজার আলোকময় হইয়াছে—নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য উজ্জ্বলবর্ণে রসনা আকুলিত করিতেছে—পুষ্প, পুষ্পমালা, থরে থরে নয়নরঞ্জিত, এবং ঘ্রাণে মন মুগ্ধ করিতেছে। মাণিকের উদ্দেশ্য অশ্ব ও অস্ত্র সংগ্রহ করা, কিন্তু তাই বলিয়া আপন উদরকে বঞ্চনা করা মাণিকলালের অভিপ্রায় ছিল না। মাণিক গিয়া কিছু মিঠাই কিনিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। সের পাঁচ ছয় ভোজন করিয়া মাণিক দেড় সের জল খাইল। এবং দোকানদারকে উচিত মূল্য দান করিয়া তাম্বুলের দোকানে তাম্বুলান্বেষণে গেল।

দেখিল একটা পানের দোকানে বড় জাঁক। দেখিল দোকানে বহুসংখ্যক দীপ বিচিত্র ফানুসমধ্য হইতে স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছে। দেওয়ালে নানা বর্ণের কাগজ মোড়া—নানা প্রকার বাহারের ছবি লট্‌কান—তবে চিত্রগুলি একটু বেশীমাত্রায় রঙ্গদার। মধ্য স্থানে কোমল গালিচায় বসিয়া—দোকানের অধিকারিণী তাম্বুলবিক্রেত্রী—বয়সে ত্রিশের উপর, কিন্তু কুরূপা নহে। বর্ণ গৌর ; চক্ষু বড় বড়, চাহনি বড় কোমল, হাসি বড় রঙ্গদার—সে হাঁসি অনিন্দ্য দন্তশ্রেণী মধ্যে সর্ব্বদাই খেলিতেছে—হাসির সঙ্গে সর্ব্বালঙ্কার দুলিতেছে—অলঙ্কার কতক পিতল কতক সোণা—কিন্তু সুগঠন এবং সুশোভন। মাণিকলাল, দেখিয়া শুনিয়া পান চাহিল।

পানওয়ালী স্বয়ং পান বেচে না—সম্মুখে একজন দাসীতে পান সাজিতেছে ও বেচিতেছে—পানওয়ালী কেবল পয়সা কুড়াইতেছে—এবং মিষ্ট হাসিতেছে।

দাসী একজন পান সাজিয়া দিল ; মাণিকলাল ডবল দাম দিল। আবার পান চাহিল। যতক্ষণ পান সাজা হইতেছিল, ততক্ষণ মাণিক পানওয়ালীর

সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া দুই একটা মিষ্ট কথা কহিতে লাগিল; পানওয়ালীর রূপের প্রশংসা করিলে, পাছে সে কিছু মন্দ ভাবে, এ জন্য প্রথমে তাহার দোকান সজ্জা ও অলঙ্কার গুলির প্রশংসা করিতে লাগিল। পানওয়ালীও একটু ভিজিল। পানওয়ালী মিঠে পানের সঙ্গে মিঠে কথা বেচিতে আরম্ভ করিল। মাণিকলাল তখন দোকানে উঠিয়া বসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে পানওয়ালীর হুঁকা কাড়িয়া লইয়া, টানিতে আরম্ভ করিল। এদিকে মাণিকলাল পান খাইয়া দোকানের মশলা ফুরাইয়া দিল। দাসী মশালা আনিতে অন্য দোকানে গেল। সেই অবসরে মাণিকলাল পানওয়ালীকে বলিল, "বিবি সাহেব! তুমি বড় চতুরা। আমি একটি চতুরা স্ত্রীলোক খুঁজিতেছিলাম। আমার একটি দুষমন্ আছে— তাহাকে একটু জব্দ কবিব ইচ্ছা। কি করিতে হইবে তাহা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি। তুমি যদি আমার সহায়তা কর, তবে এক আশরফি পুরস্কার করিব।

পান। কি কবিতে হইবে।

মাণিক চুপি চুপি কি বলিল। পানওয়ালী বড় রঙ্গপ্রিয়া—তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। বলিল আশরফির প্রয়োজন নাই—রঙ্গই আমার পুরস্কার।

মাণিকলাল তখন দোয়াত, কলম, কাগজ চাহিল, দাসী তাহা নিকটস্থ বেণিয়ার দোকান হইতে আনিয়া দিল। পানওয়ালীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এক পত্র লিখিল, "হে প্রাণনাথ! তুমি যখন নগব ভ্রমণে আসিয়াছিলে, আমি তোমাকে দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তোমাব একবাব দেখা না পাইলে আমার প্রাণ যাইবে। শুনিতেছি তোমবা কাল চলিয়া যাইবে—অতএব আজ একবার অবশ্য অবশ্য আমায় দেখা দিবে। নহিলে আমি গলায় ছুবি দিব। যে পত্র লইয়া যাইতেছে—তাহার সঙ্গে আসিও—সে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিবে।".

পত্র লেখা হইলে মাণিকলাল শিরোনামা দিল, "মহম্মদ খাঁ।"

পানওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল "কে ও ব্যক্তি?"

মা। একজন মোগল সওয়ার।

বাস্তবিক, মাণিকলাল মোগলদিগের মধ্যে একজনকেও চিনিত না। কিন্তু অভিপ্রায়, এই পত্রে লুব্ধ করিয়া কোন একজন মোগলের নিকট হইতে তাহার অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিবে। কিন্তু নিজ নাম শিরোনামায় না দেখিলে কোন মোগলই ফাঁদে যে পা দিবে না, তাহা মাণিক বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল। অথচ কাহারও নাম জানে না। সে মনে ভাবিল, দুই হাজার মোগলের মধ্যে অবশ্য একজন মহম্মদ আছেই আছে—আর সকল মোগলই "খাঁ"। অতএব সাহস করিয়া "মহম্মদ খাঁ" লিখিল; পত্র লেখা হইলে মাণিকলাল বলিল, "তাহাকে এইখানে আনিব।"

পানওয়ালী বলিল, "এ ঘরে হইবে না। আর একটা ঘরভাড়া লইতে হইবে।"

তখনই দুইজনে বাজারে গিয়া আর একটা ঘর লইল। পানওয়ালী মোগলের অভ্যর্থনা জন্য তাহা সজ্জিতকরণে প্রস্তুত হইল—মাণিকলাল পত্র লইয়া মুসলমান শিবিরে উপস্থিত হইল। শিবিরমধ্যে মহাগোলযোগ—কোন শৃঙ্খলা নাই—নিয়ম নাই। তাহার ভিতরে বাজার বসিয়া গিয়াছে—রঙ্গ তামাসা রোসনাইয়ের ধূম লাগিয়াছে। মাণিকলাল মোগল দেখিলেই জিজ্ঞাসা করে, "মহম্মদ খাঁ কে মহাশয়? তাঁহার নামে পত্র আছে।" কেহ উত্তর দেয় না–কেহ গালি দেয়;—কেহ বলে চিনি না—কেহ বলে খুঁজিয়া লও। শেষ একজন মোগল বলিল, "মহম্মদ খাঁকে চিনি না, কিন্তু আমার নাম নুর মহম্মদ খাঁ। পত্র দেখি—দেখিলে বুঝিতে পারিব পত্র আমার কি না?"

মাণিকলাল আনন্দচিত্তে তাহার হস্তে পত্র দিল—মনে জানে, মোগল যেই হউক, ফাঁদে পড়িবে। মোগলও ভাবিল—পত্র যারই হউক, আমি কেন এই সুবিধাতে বিবিটাকে দেখিয়া আসি না। প্রকাশ্যে বলিল, হাঁ পত্র আমারই বটে। চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি। এই বলিয়া মোগল তাম্বু মধ্যে প্রবেশ করিয়া চুল আঁচড়াইয়া গন্ধ দ্রব্য মাখিয়া পোষাক পরিয়া বাহির হইল। বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে ভৃত্য, সে স্থান কতদূর।"

মাণিকলাল যোড়হাত করিয়া বলিল "হুজুর, অনেক দূর! ঘোড়ায় গেলে ভাল হইত।"

"বহুত আচ্ছা" বলিয়া খাঁ সাহেব ঘোড়া বাহির করিয়া চড়িতে যান, এমত সময়ে মাণিকলাল আবার যোড়হাত করিয়া বলিল, "হুজুর! বড় ঘরের কথা—হাতিয়ার বন্দ হইয়া গেলেই ভাল হয়।"

নূতন নাগর ভাবিলেন, সে ভাল কথা—জঙ্গী জোয়ান আমি; হাতিয়ার ছাড়া কেন যাইব। তখন অঙ্গে হাতিয়ার বাঁধিয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া মাণিকলাল বলিল, "এই স্থানে উতারিতে হইবে। আমি আপনার ঘোড়া ধরিতেছি, আপনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করুন।"

খাঁ সাহেব নামিলেন—মাণিকলাল ঘোড়া ধরিয়া রহিল। খাঁ বাহাদুর সশস্ত্রে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, পরে মনে পড়িল যে হাতিয়ার বন্দ হইয়া রমণী সম্ভাষণে যাওয়া বড় ভাল দেখায় না। ফিরিয়া আসিয়া মাণিকলালের কাছে অস্ত্রগুলিও রাখিয়া গেলেন। মাণিকলালের আরও সুবিধা হইল।

গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া খাঁ সাহেব দেখিলেন যে, তক্তপোষের উপর উত্তম শয্যা; তাহার উপর সুন্দরী বসিয়া আছে—আতর গোলাবের সৌগন্ধে ঘর আমোদিত হইয়াছে—চারিদিকে ফুল বিকীর্ণ হইয়াছে। এবং সম্মুখে আলবোলায় সুগন্ধি তামাকু প্রস্তুত আছে।—খাঁ সাহেব, জুতা খুলিয়া, তক্তপোষে বসিলেন, বিবিকে মিষ্ট বচনে সম্ভাষণ করিলেন—পরে পোষাকটি খুলিয়া রাখিয়া, ফুলের পাখা হাতে লইয়া বাতাস খাইতে আরম্ভ করিলেন, এবং আলবোলার নল মুখে পুরিয়া সুখের আবেশে টান দিতে লাগিলেন। বিবিও তাঁহাকে দুই চারিটা গাঢ় প্রণয়ের কথা বলিয়া একেবারে মোহিত করিল।

অর্দ্ধদণ্ড হইতে না হইতে মাণিকলাল আসিয়া দ্বারে ঘা মারিল। বিবি বলিল, "কেও?"

মাণিকলাল বিকৃত স্বরে বলিল, "আমি।"

তখন চতুরা রমণী অতি ভীতকণ্ঠে খাঁ সাহেবকে বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে—আমার স্বামী আসিয়াছেন—মনে করিয়াছিলাম—তিনি আজ আসিবেন না। তুমি এই তক্তপোষেব নীচে একবার লুকাও। আমি উহাকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

মোগল বলিল, "সেকি? মরদ হইয়া ভয়ে লুকাইব? যে হয় আসুক না; এখনই কোতল করিব।"

পানওয়ালী জিব কাটিয়া বলিল, "সে কি সর্ব্বনাশ! আমার স্বামীকে মারিয়া ফেলিয়া আমাব অন্নবস্ত্রের পথ বন্ধ করিবে? এই কি তোমাকে ভালবাসার ফল? শীঘ্র তক্তপোষের নীচে যাও। আমি এখনই উহাকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

এদিকে মাণিকলাল পুনঃ পুনঃ দ্বারে করাঘাত করিতেছিল। অগত্যা খাঁ সাহেব তক্তপোষের নীচে গেলেন। মোটা শরীর বড় সহজে প্রবেশ করে না, ছাল চামড়া দুই এক জায়গায় ছিঁড়িয়া গেল—কি করে—প্রেমের জন্য অনেক সহিতে হয়। সে স্থূল মাংসপিণ্ড তক্তপোষ তলে বিন্যস্ত হইলে পর পানওয়ালী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলে পানওয়ালী পূর্ব্ব শিক্ষামত বলিল, "তুমি আবার এলে যে? আজ আর আসিবে না বলিয়াছিলে যে?"

মাণিকলাল পূর্ব্বমত বিকৃতস্বরে বলিল, "চাবিটা ফেলিয়া গিয়াছি।"

দুই জনে চাবি খোঁজার ছল করিয়া, খাঁ সাহেবের পরিত্যক্ত পোষাকটি হস্তে লইল। পোষাক লইয়া দুই জনে বাহিরে চলিয়া আসিয়া, শিকল টানিয়া বাহির

হইতে চাবি দিল। খাঁ সাহেব তখন তক্তপোষের নীচে, মুষিকদিগের দংশনযন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলেন।

তাঁহাকে গৃহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া, মাণিকলাল তাঁহার পোষাক পরিল। পরে তাঁহার হাতিয়ারে হাতিয়ারবন্দ হইয়া মুসলমান শিবিরে তাঁহার স্থান লইতে চলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতে মোগল সৈন্য সাজিল। রূপনগরের গড়ের সিংহ দ্বার হইতে, উষ্ণীষ কবচ শোভিত; গুম্ফ-শ্মশ্রুসমন্বিত, অস্ত্রসজ্জাভীষণ, অশ্বারোহীর দল সারি দিল। পাঁচ পাঁচ জন অশ্বারোহী এক এক সারি, সারির পিছু সারি, তার পর আবার সারি, সারি সারি সারি অশ্বারোহীর সারি চলিতেছে, ভ্রমর শ্রেণী সমাকুল ফুল্লকমল তুল্য তাহাদের বদন মণ্ডল সকল শোভিতেছিল। তাহাদিগের অশ্বশ্রেণী গ্রীবাভঙ্গে সুন্দর, বল্‌গা রোধে অধীর, মন্দগমনে ক্রীড়াশীল; অশ্বশ্রেণী, তাহাদিগের শরীর ভরে হেলিতেছে, দুলিতেছে, এবং নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে।

চঞ্চলকুমারী প্রভাতে উঠিয়া স্নান করিয়া, রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হইলেন। নির্ম্মল অলঙ্কার পরাইল। চঞ্চল বলিল, "ফুলের মালা পরাও সখি—আমি চিতারোহণে যাইতেছি।" প্রবলবেগে প্রবাহমান চক্ষের জল, চক্ষুঃপ্রান্তে ফেরৎ পাঠাইয়া নির্ম্মল বলিল, "রত্নালঙ্কার পরাই সখী তুমি উদয়পুরেশ্বরী হইতে যাইতেছ।" চঞ্চল বলিল, "পরাও! পরাও। নির্ম্মল! কুৎসিত হইয়া কেন মরিব? রাজার মেয়ে আমি; রাজার মেয়ের মত সুন্দর হইয়া মরিব। সৌন্দর্য্যের মত কোন রাজ্য? রাজত্ব কি বিনা সৌন্দর্য্যে শোভা পায়? পরা।" নির্ম্মল অলঙ্কার পরাইল, সে কুসুমিত তরুবিনিন্দিত কান্তি দেখিয়া কাঁদিল। কিছু বলিল না। চঞ্চল তখন, নির্ম্মলের গলা ধরিয়া কাঁদিল।

চঞ্চল তার পর বলিল, "নির্ম্মল! আর তোমায় দেখিব না! কেন বিধাতা এমন বিড়ম্বনা করিলেন। দেখ ক্ষুদ্র কাঁটার গাছ যেখানে জন্মে সেইখানে থাকে; আমি কেন রূপনগরে থাকিতে পাইলাম না?"

নির্ম্মল বলিল, "আমায় আবার দেখিবে। তুমি যেখানে থাক; আমার সঙ্গে আবার দেখা হইবে। আমায় না দেখিলে তোমার মরা হইবে না; তোমায় না দেখিলে আমার মরা হইবে না।"

চঞ্চল। আমি দিল্লীর পথে মরিব।

নির্ম্মল। দিল্লীর পথে তবে আমায় দেখিবে।

চঞ্চল। সে কি নির্ম্মল? কি প্রকারে তুমি যাইবে?

নির্ম্মল কিছু বলিল না। চঞ্চলের গলা ধরিয়া কাঁদিল।

চঞ্চলকুমারী বেশভূষা সমাপন করিয়া মহাদেবের মন্দিরে গেলেন। নিত্য ব্রত শিবপূজা ভক্তিভাবে করিলেন। পূজান্তে বলিলেন, "দেব দেব মহাদেব! মরিতে চলিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বালিকার মরণে তোমার এত তুষ্টি কেন? প্রভো! আমি বাঁচিলে কি তোমার সৃষ্টি চলিত না? যদি এতই মনে ছিল, কেন আমাকে রাজার মেয়ে করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছিলে?"

মহাদেবের বন্দনা করিয়া চঞ্চলকুমারী মাতৃচরণ বন্দনা করিতে গেলেন। মাতাকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কাঁদিল। পিতার চরণে গিয়া প্রণাম করিল। পিতাকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কাঁদিল! তার পর একে একে সখীজনের কাছে, চঞ্চল বিদায় গ্রহণ কবিল। সকলে কাঁদিয়া গণ্ডগোল করিল। চঞ্চল কাহাকে অলঙ্কাব, কাহাকে খেলেনা, কাহাকে অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। কাহাকে বলিলেন, "কাঁদিও না; আমি আবার আসিব। কাহাকে বলিলেন, "কাঁদিও না; দেখিতেছ না, আমি পৃথিবীশ্বরী হইতে যাইতেছি?" কাহাকেও বলিলেন, "কাঁদিও না—কাঁদিলে যদি দুঃখ যাইত; তবে আমি কাঁদিয়া রূপনগরের পাহাড় ভাসাইতাম।"

সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া, চঞ্চলকুমারী শিবিকারোহণে চলিলেন। এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য শিবিকার অগ্রে স্থাপিত হইয়াছে; এক সহস্র পশ্চাতে। রজতমণ্ডিত, রত্নখচিত সে শিবিকা, বিচিত্র সুবর্ণ খচিত বস্ত্রে আবৃত হইয়াছে; আশা সোঁটা লইয়া চোপদার বাক্জালে গ্রাম্যদর্শকবর্গকে কৌতূহলী করিতেছে। চঞ্চলকুমারী শিবিকায় আরোহণ করিলেন। দুর্গমধ্য হইতে শঙ্খ নিনাদিত হইল; কুসুম ও লাজাবলিতে শিবিকা পরিপূর্ণ হইল; সেনাপতি চলিবার আজ্ঞা দিলেন; তখন অকস্মাৎ মুক্তপথ তড়াগের জলের ন্যায় সেই অশ্বারোহীশ্রেণী প্রবাহিত হইল; বল্গা দংশিত করিয়া নাচিতে নাচিতে, অশ্বশ্রেণী চলিল—অশ্বারোহীদিগের অস্ত্রের ঝঞ্চনা বাজিল।

অশ্বারোহীগণ প্রভাত বায়ু প্রফুল্ল হইয়া কেহ কেহ গান করিতেছিল। শিবিকার পশ্চাতেই যে অশ্বারোহীগণ ছিল, তাহার মধ্যে অগ্রবর্ত্তী একজন গায়িতেছিল—যাহা গায়িতেছিল, তাহার অনুবাদ যথা—

যারে ভাবি দূরে সে যে সতত নিকটে।
প্রাণ গেলে তবু সে যে রাখিবে শঙ্কটে॥

রাজকুমারীর কর্ণে সে গীত প্রবেশ করিল। তিনি ভাবিলেন, "হায়! যদি শিপাহীর গীত সত্য হইত! রাজকুমারী তখন, রাজসিংহকে ভাবিতেছিলেন। তিনি জানিতেন না যে, আঙ্গুল কাটা মাণিকলাল তাঁহার পশ্চাতে এই গীত গাইতেছিল। মাণিকলাল, যত্ন করিয়া শিবিকার পশ্চাতে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

এ দিকে নির্ম্মলকুমারীর বড় গোলমাল বাঁধিল। চঞ্চল ত রত্নখচিত শিবিকারোহণে চলিয়া গেল—আগে পিছে দুই সহস্র কুমারপ্রতিম অশ্বারোহী আল্লার মহিমার শব্দে রূপনগরের পাহাড় ধ্বনিত করিয়া চলিল। কিন্তু নির্ম্মলের কান্না ত থামে না—একা—একা—একা—শত পৌরজনের মধ্যে চঞ্চল অভাবে নির্ম্মল বড়ই একা! নির্ম্মল, উচ্চ গৃহচূড়ার উপরি উঠিয়া দেখিতে লাগিল—দেখিতে লাগিল ক্রোশ পরিমিত অজগর সর্পের ন্যায় সেই বৃহৎ অশ্বারোহী সৈনিকশ্রেণী পার্ব্বত্যপথে বিসর্পিত হইয়া উঠিতেছে, নামিতেছে—প্রভাত সূর্য্য-কিরণে তাহাদিগের উর্দ্ধোত্থিত উজ্জ্বল বর্শাফলক সকল জ্বলিতেছে। কতকক্ষণ নির্ম্মল চাহিয়া রহিল। চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। তখন নির্ম্মল চক্ষু মুছিয়া, ছাদের উপর হইতে নামিল। নির্ম্মল একটা কিছু ভাবিয়া ছাদের উপর হইতে নামিয়াছিল। নামিয়া প্রথমে একজন সামান্যা পরিচারিকার জীর্ণ মলিনবাস চুরি করিল—তাহার বিনিময়ে আপনার চারুদর্শন পরিধেয় রাখিয়া আসিল। নির্ম্মল সেই জীর্ণ মলিন বাস পরিল।—অলঙ্কার সকল খুলিয়া কোথায় লুকাইয়া রাখিল, কেহ দেখিতে পাইল না। সঞ্চিত অর্থ মধ্যে কতিপয় মুদ্রা নির্ম্মল গোপনে সংগ্রহ করিল। কেবল তাহাই লইয়া সেই জীর্ণ মলিনবাসে নির্ম্মল একাকিনী রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল। পরে দৃঢ়পদে অশ্বারোহী সেনা যে পথে গিয়াছে সেই পথে একাকিনী তাহাদের অনুবর্ত্তিনী হইল।
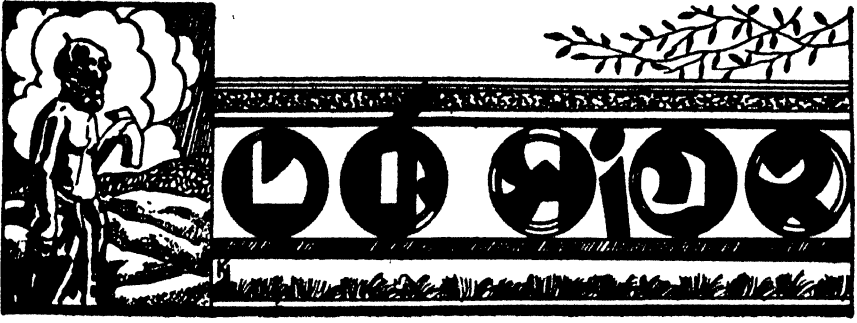
কারণ ভেদ

আমরা পূর্ব্বেই বলিযাছি যে, এক একটি কার্য্যের পূর্ব্বে যে এক একটি বস্তু থাকিবে তাহাব কোন নিযম নাই। সর্ব্বত্রই প্রায় অনেকগুলি বস্তু পূর্ব্বে মিলিত হইয়া একটি কার্য্য উৎপাদন কবে। যেমন একটি ঘটোৎপত্তির প্রতি মৃত্তিকা, জল, চক্রদণ্ড, সূত্র ও কুম্ভকাবের যত্ন এই সকলেরই পূর্ব্বে থাকা নিতান্ত আবশ্যক, ইহাদেব মধ্যে একটিব অভাব হইলে কখনই ঘট হয় না অতএব ইহারা সকলেই ঘটের কাবণ। কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে ইহারা সকলে ঘটের কারণ হইলেও ইহাদের সকলেব সহিত কি ঘটেব সমান সম্বন্ধ ? মৃত্তিকার সহিত ঘটের যেরূপ সম্বন্ধ, দণ্ডের সহিত কি সেইরূপ সম্বন্ধ ? কখনই নয়, সুতরাং ইহারা সাধারণকারণ নামে অভিহিত হইলেও ইহাদের পরস্পরের আবার ভেদ করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

এই নিমিত্ত নৈয়ায়িকরা বলেন—

"তস্য ত্রৈবিধ্যম্ পরিকীর্ত্তিতম্"
"সমবায়ি হেতুত্বং, জ্ঞেয়মথাপ্যসমবায়ি হেতুত্বং এবং ন্যায়নয়জ্ঞৈ স্তৃতীয় মুক্তং নিমিত্ত হেতুত্বম্।" কারিকাবলী

কারণ তিন প্রকার, প্রথম সমবায়িকারণ, দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ, তৃতীয় নিমিত্তকারণ। সমবায়িকারণ—যাহাতে সমবায় সম্বন্ধবিশিষ্ট* হইয়া কার্য্য উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে যাহা কার্য্যের অধিকরণ তাহার নাম সমবায়িকারণ (causa materialis) একটী বস্তুর প্রত্যেক অংশকে ঐ বস্তুর সমবায়ী কারণ বলা যায়। যেমন ধমুকের পরমাণুদ্বয়, বস্ত্রের সূত্র, সূত্রের তুলা, ঘটের কপাল,†

---

* সমবায় সম্বন্ধের বিষয় পূর্ব্বে টীকায় উল্লেখ হইয়াছে। অবয়ব অবয়বীয়, দ্রব্যগুণের দ্রব্যক্রিয়ার সম্বন্ধের নাম সমবায়।

† কপালের অর্থ ঘটের অবয়ব, যাহা একত্র করিয়া ঘট প্রস্তুত হইয়াছে।

কপালের মৃত্তিকা। এই সমবায়িকারণের নামান্তর উপাদান। নৈয়ায়িকগণ বলেন দ্রব্য—দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়ার সমবায়িকারণ।*

অসমবায়িকারণ।—সেই সমবায়িকারণের আসন্ন অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত হইয়া যাহা কার্য্য উৎপাদন করে তাহার নাম অসমবায়িকারণ। অসমবায়িকারণের মধ্যে কেহ কেহ কার্য্যের সহিত এক সমবায়িকারণে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিতি করে, কেহ কেহ বা কারণের সহিত এক সমবায়িকারণে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থান করে। প্রথম তন্তুসমূহের সংযোগ বস্ত্রের অসমবায়িকারণ, কেননা তন্তুসমূহেব সংযোগ সমবায় সম্বন্ধে তন্তুসমূহে আছে এবং বস্ত্রও সমবায় সম্বন্ধে তন্তুসমূহে থাকে, এখন দেখ, তন্তুসমূহের সংযোগ বস্ত্ররূপ কার্য্যের সহিত সমবায় সম্বন্ধে তন্তুরূপ সমবায়িকারণে বর্ত্তমান হওয়ায়, তন্তুসমূহের সংযোগ প্রথম অসমবায়িকারণ হইল! এইরূপ কপালদ্বয়ের সংযোগ ঘটের, এবং পরমাণু-দ্বয়ের সংযোগ দ্ব্যণুকের অসমবায়িকারণ। আরও দেখ, যখন একটি ঘট প্রস্তুত হয়, তখন তাহার সহিত তাহার রূপ, তাহাব পরিমাণ ইত্যাদি সকলই হয়; ঐরূপ বা পরিমাণাদির প্রতি দুটী কারণ প্রথম ঘট, দ্বিতীয় ঘটের অবয়ব (Parts) কপালদ্বয়ের রূপ ও পরিমাণাদি। ঘটের রূপাদির প্রতি ঘট সমবায়ীকারণ, যেহেতু রূপ ও পরিমাণাদি গুণ ঘটে সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান থাকে। দ্বিতীয় কপালের রূপ ও পরিমাণাদি ঘটের রূপ ও পরিমাণাদির প্রতি অসমবায়ীকারণ; কারণ, ঘটের রূপ বা পরিমাণাদি স্ব স্ব সমবায়ীকারণ ঘটের সহিত কপালরূপের সমবায়ীকারণ কপালে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত হয়। এইরূপ তন্তুর রূপ বস্ত্রের রূপের অসমবায়ীকারণ। এই অসমবায়ীকারণের নাশ হইলে কার্য্যের নাশ হয়। যেমন কপাল সংযোগের নাশ হইলে ঘটের নাশ হয়, তন্তু সংযোগের নাশ হইলে বস্ত্রের নাশ হয়, পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ নষ্ট হইলে দ্ব্যণুক নষ্ট হয়। এক্ষণে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে যদি সমবায়ীকারণে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত হইয়া যে কার্য্যোৎপাদন করে তাহার নাম অসমবায়ীকারণ তবে তুরীতন্তু† সংযোগও বস্ত্রের অসমবায়ীকারণ হৌক, কারণ উহা বস্ত্রের সমবায়ীকারণ তন্তুতে বস্ত্ররূপ

---

* দ্রব্য শব্দে পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ ইত্যাদি পরে উক্ত হইবে। ক্রিয়া শব্দে গমনাদি।

দ্রব্য দ্রব্যের সমবায়িকারণ—ঘটের প্রতি কপাল।

দ্রব্যগুণের সমবায়িকারণ—ঘটের রূপের প্রতিঘট কারণ, কপাল রূপের প্রতি কপাল কারণ।

দ্রব্য ক্রিয়ার সমবায়িকারণ—গমনাদির।

† তুরী শব্দের অর্থ মাকু, যাহাতে সূত্র জড়িত থাকে, তন্তু শব্দের অর্থ সূত্র।

কার্য্যের সহিত সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত অর্থাৎ বস্ত্রও যেরূপ আপনার অবয়ব তন্তুতে সমবায় সম্বন্ধে আছে সেইরূপ তূরীতন্তু সংযোগও তন্তুতে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত। কিন্তু এদিকে আবার তূরীতন্তু সংযোগকে বস্ত্রের অসমবায়ীকারণও বলা যাইতে পারে না, কারণ অসমবায়ীকারণ নষ্ট হইলে কার্য্যও বিনষ্ট হয় কিন্তু তূরী তন্তু সংযোগের নাশ হইলে কিছু বস্ত্রের নাশ হয় না। এই বিরোধ নিবারণের নিমিত্ত বস্ত্রের অসমবায়ীকারণ নির্দ্দেশ স্থলে এইরূপ বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে যে তূরীতন্তু সংযোগ ভিন্ন বস্ত্রের সমবায়ীকারণে যে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থান করে তাহাই বস্ত্রের অসমবায়ীকাবণ। এখানে ইহাও বক্তব্য যে আত্মার বিশেষ গুণ যে জ্ঞানাদি তাহারা আত্মাতে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত হইলেও উহারা কাহারও অসমবায়ীকারণ নহে।

নিমিত্ত কারণ। এই সমবায়ীকারণ এবং অসমবায়ীকারণের অতিরিক্ত যে সকল কারণ নৈয়ায়িকগণ তাহাদিগকে "নিমিত্ত কারণ" এই সাধারণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহারা যে অবধি একটি অনুগত সম্বন্ধ ধরিতে পারিয়াছিলেন সেই অবধি সেই সম্বন্ধ ধবিয়া কাবণ নির্দ্দেশ কবিলেন। এক্ষণে দেখিলেন কার্য্যের প্রতি অসংখ্য কাবণ হইতে পাবে, তাহাদিগেব প্রত্যেককে সম্বন্ধ ধবিযা নির্দ্দেশ কবা কঠিন এই নিমিত্ত বলিয়া উঠিলেন যে সমবায়ি এবং অসমবায়ীকারণ ভিন্ন যতগুলি কাবণ হইতে পাবে তাহারা কার্য্যের সহিত যেরূপ সম্বন্ধ রাখুক না কেন, তাহাদেব সাধারণ নাম নিমিত্ত কাবণ। যেমন ঘটের প্রতি দণ্ড, চক্র, কুম্ভকাব ইত্যাদি; বস্ত্রেব প্রতি তূবী, তূবীতন্তু সংযোগ, তন্তুবায় প্রভৃতি।

নৈয়ায়িকগণ কারণের এইরূপ বিভাগ করিয়াছেন। দ্রব্য, (পৃথিবী, জল, বায়ু আকাশ ইত্যাদি) দ্রব্য, গুণ, ও ক্রিয়ার সমবায়ীকাবণ, যখন কোন দ্রব্য অপর দ্রব্যের অংশ হইবে তখনই উহা সেই দ্রব্যের সমবায়ীকারণ। গুণের মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ (অনুষ্ণ), পরিমাণ, একত্ব, পৃথকত্ব, স্নেহ ও শব্দ ইহারা অসমবায়ী কারণ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা দ্বেষ, অদৃষ্ট এবং ভাবনা প্রভৃতি আত্মবিশেষ গুণ সকল আত্মার সমবায় সম্বন্ধে থাকিলেও কোন কার্য্যের প্রতি অসমবায়ীকারণ নহে কিন্তু নিমিত্ত কারণ।

উষ্ণস্পর্শ, গুরুত্ব, বেগ, দ্রবত্ব সংযোগ এবং বিভাগ ইহারা দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকিলেও কেবল অসমবায়ীকারণ নহে স্থলবিশেষে ইহারা নিমিত্ত কারণও হয়।

যেমন উষ্ণস্পর্শ, উষ্ণস্পর্শের অসমবায়ীকারণ কিন্তু পাকজ স্পর্শের নিমিত্ত কারণ। গুরুত্ব, গুরুত্ব এবং পতনের অসমবায়িকারণ, প্রতিঘাতের নিমিত্ত কারণ।

বেগ, বেগ ও স্পন্দনের অসমবায়ীকারণ অভিঘাতের নিমিত্ত কারণ। ভেরীদণ্ড-সংযোগ শব্দের নিমিত্ত কারণ এবং ভেরী আকাশের সংযোগ শব্দের অসমবায়ী কারণ, বংশ দলদ্বয়ের বিভাগ শব্দের নিমিত্ত বংশদল ও আকাশের বিভাগ শব্দের অসমবায়ীকারণ ইত্যাদি।

কর্ম্ম (ক্রিয়া) সকল কারণে সমবায় সম্বন্ধে থাকে এই নিমিত্ত ইহারা কার্য্যের প্রতি অসমবায়ীকারণ।

এতদ্ভিন্ন আর যত কারণ তাহারা সকলে নিমিত্ত কারণ।
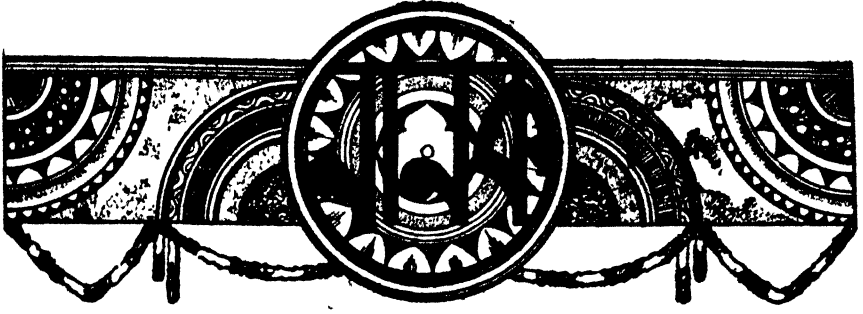
নানক সাহ অথবা বাবানানক ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের দশ মাইল দক্ষিণবর্ত্তী কানাকুচা * গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালুবেদী, তিনি ক্ষত্রিয় বংশোৎপন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নানকের বিবরণ অনেক অবাস্তবিক ও কাল্পনিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। যিনি যখন এই পরিদৃশ্যমান জগতের সমক্ষে আপনার প্রভাব বিকাশ করেন, মানব-কল্পনা তখনই উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ ঘটনা প্রচার করিতে থাকে। নানক ধর্ম্মজগতে যেরূপ ক্ষমতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে যে নানাপ্রকার কিম্বদন্তী প্রচারিত হইবে তাহা বিস্ময়জনক নহে। শিখগণ আপনাদের ধর্ম্মগুরুর মহিমা পরিবর্দ্ধিত ও ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিতে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহাতে কখনও বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। নানকের জন্মগ্রহণের সমকালে অদূরে মহতী জনতার আনন্দোৎসব, শৈশবে সর্পকর্ত্তৃক ছায়া প্রদান, যৌবনে বিশুষ্ক জলাশয়ে জলোচ্ছ্বাসের আবির্ভাব প্রভৃতি অনেক ঘটনায় অমানুষত্ব ও সর্ব্বশক্তিময় দেবত্ব সংমিশ্রিত আছে। এরূপ ঘটনায় সাধারণের বিশ্বাস জন্মিবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং এ স্থলে সমুদয়ের উল্লেখেরও আবশ্যকতা নাই।

নানক অল্পবয়সে অল্প সময়ের মধ্যে গণিত ও পারস্য বিদ্যা আয়ত্ত করেন। তিনি স্বভাবতঃ শুদ্ধাচারী ও চিন্তাশীল ছিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই সাংসারিক কার্য্য ও সাংসারিক ভোগ সুখে তাঁহার নিতান্ত বিতৃষ্ণা জন্মিল। কালুবেদী পুত্রকে সংসারধর্ম্মে আনয়ন করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইলেন, নিজ হইতে চল্লিশটী টাকা দিয়া নানককে লবণের ব্যবসায় আরম্ভ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন,

---

* কেহ কেহ বলেন, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্ত্তী তলবন্দীগ্রামে নানকের জন্ম হয়। তাঁহার পিত্রালয় এই তলবন্দী গ্রামে। কিন্তু অন্যান্য মতানুসারে নানক কানাকুচা গ্রামে, তাঁহার পিতামহের আলয়ে জন্মপরিগ্রহ করেন। কাহারও মতে নানক ১৪৬৮ অব্দে ভূমিষ্ঠ হয়েন।

কিন্তু তাঁহার যে চেষ্টা ফলবতী ও সে অনুরোধ প্রতিপালিত হইল না, নানক পিতৃদত্ত মুদ্রায় খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া অনাহারী উদাসীন ফকিরদিগকে ভোজন করাইলেন।

নানক যৌবনাবস্থাতেই হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সমস্ত ধর্ম্মানুশাসন এবং বেদ ও কোরাণের সমস্ত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলেন। এবং সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা ও প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানবলে উদার ও পরিশুদ্ধ মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সমস্ত অন্ধবিশ্বাস ও সমস্ত কুসংস্কারময় লৌকিক ক্রিয়া কাণ্ডের উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। যাহাতে হৃদয়ের শান্তিলাভ হয় যাহাতে পবিত্র ও উদার ঐশ্বরিক তত্ত্ব প্রচারিত হয়, তাহাই জীবনের সারধর্ম্ম বলিয়া তাঁহার নিকট বিবেচিত হইল। প্লেতো ও বেকন যেমন পৃথিবীর সমস্ত দর্শনশাস্ত্র আন্দোলন করিয়াও প্রকৃত জ্ঞানের ভিত্তিতে নানাবিধ জঞ্জাল দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, নানকও সেইরূপ সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে ও ধর্ম্মপদ্ধতিতে নানাবিধ কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তিনি সন্ন্যাসিবেশে ভারতবর্ষের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিলেন, অনেক সাধু ও যোগীদিগের সহিত আলাপ করিলেন, আরবের উপকূল অতিবাহিত করিয়া ফকীরদিগের কার্য্যকলাপ দর্শন করিলেন, কিন্তু কোথাও পবিত্র সত্যের আভাস দেখিতে পাইলেন না। সকল স্থানেই কুসংস্কারের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, সকল স্থানেই কর্ম্মকাণ্ডের শোচনীয় বিকার দেখিয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। স্বদেশে আসিয়া নানক সন্ন্যাসধর্ম্ম ও সন্ন্যাসিবেশ পরিত্যাগ করিলেন। গুরুদাসপুর জেলায় ইরাবতীর তটে "করতারপুর" নামে একটী ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইল। নানক এই ধর্ম্মশালায় স্বীয় পরিবার ও শিষ্যসম্প্রদায়ে পরিবৃত থাকিয়া জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রমে এই স্থানেই বাবা নানকের পবিত্র জীবনস্রোত কালের অনন্ত সাগরে মিশিয়া যায়। নানক লোদীবংশের অভ্যুদয় সময়ে প্রাদুর্ভূত হয়েন, এবং মোগলবংশের অভ্যুদয়ের পর কলেবর ত্যাগ করেন। ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ধর্ম্মচিন্তায় তাঁহার জীবিতকালের ষাটী বৎসর, পাঁচ মাস ও সাত দিন অতিবাহিত হইয়াছিল।

নানকের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ লইয়া তদীয় হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যদিগের মধ্যে ঘোরতর বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। হিন্দুরা দাহ করিতে ইচ্ছা করে, এবং মুসলমানেরা সমাধি দিতে প্রস্তুত হয়। এই বিবদমান উভয়দলই বলপূর্ব্বক শব লইবার আশায় চাদর তুলিয়া দেখে যে, তাহার তলে শব নাই। গোলযোগের সময় শিষ্যগণের কেহ অবশ্যই উহা স্থানান্তরিত করিয়া রাখিয়াছিল।

যাহা হউক, অনন্তর উভয় দলে, যে আভরণে শব আচ্ছাদিত ছিল, তাহাই দুইখণ্ডে বিভক্ত করিয়া একখণ্ড অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিধি অনুসারে দাহ ও অপর খণ্ড রীতিমত উপাসনা করিয়া সমাধিস্থ করিল। এই দাহস্থলের উপর মঠ ও সমাধিভূমির উপর স্তম্ভ নির্ম্মিত হইল। এক্ষণে এই উভয় স্মৃতিমন্দিরেরই কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। ইরাবতীর অনন্ত প্রবাহ ইহা সর্ব্ব সংহারক কালের কুক্ষিগত হইয়াছে।

নানক যে পবিত্র ও উদার ধর্ম্মপদ্ধতি প্রচার করেন, তাহার আলোক পাঞ্জাবের বলিষ্ঠ, দৃঢ়কায়, সরলস্বভাব জাঠগণের মধ্যে প্রসারিত হয়। ক্রমে মুসলমানগণও এই ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া উঠে। নানকের একজন বিশ্বস্ত মুসলমান শিষ্যের নাম মর্দ্ধানা। এ ব্যক্তি ছায়ার ন্যায় নানকের সহগামী ছিল। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকগণ যেমন নিমিষে নিমিষে উদরের চিন্তায় হা হতোঽস্মি বলিয়া আক্ষেপ করিত মর্দ্ধানাও সেইরূপ কথায় কথায় ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িত। সংগীত শাস্ত্রে মর্দ্ধানার বিশেষ আশক্তি ছিল। সে সর্ব্বদাই বীণা বাজাইয়া ঈশ্বরের গুণ গান করিত। নানক যখন মুদ্রিতনয়নে ঈশ্বরের ধ্যান করিতেন, বাহ্য জগতের সহিত কোনও সংস্রব না রাখিয়া প্রগাঢ়রূপে ঈশ্বরে অভিনিবিষ্ট-চিত্ত হইয়া পড়িতেন, তখন মর্দ্ধানা ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়াও তদ্গত চিত্তে সুমধুর বীণাসংযোগে গাইত :—

"তুহী তিরন্‌কার করতার্, নানক বন্ধু তেরা।"

নানক সুলক্ষণী নামে একটী কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। সুলক্ষণীর গর্ভে শ্রীচন্দ্র ও লক্ষ্মীদাস নামে নানকের দুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীচন্দ্র উদাসীন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

এই গুলি নানকের জীবনচরিতের কঙ্কাল মাত্র। আমরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আর দুই একখানি অস্থি আনিয়া এই কঙ্কালে সংযোজিত করিতে ইচ্ছা করি না। এস্থলে যতটুকু দেখান হইল, তাহাতেই নানক কি ভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, একরূপ বুঝা যাইবে।

নানকের লিখিত আদিগ্রন্থে* তদীয় মত সকল পরিব্যক্ত হইয়াছে। যাহাতে দেশ হইতে বাহ্য ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান ও জাত্যভিমানের উন্মূলন হয়, এবং যাহাতে দেশীয় লোকেরা পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া সুপরিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও সাধুবৃত্তি অবলম্বন করে, নানক তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহার মতে

---

* নানক 'প্রাণশঙ্কলী' নামে আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা আদি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে।

নানা জাতিতে ও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া থাকা উচিত নহে। দেবালয়ে গিয়া যাগযজ্ঞ করা ও তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজন করানও কর্ত্তব্য নহে। ইন্দ্রিয়দমন ও চিত্তসংযমই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর।

আত্মশুদ্ধি নানকের মূল মন্ত্র। বিশুদ্ধ হৃদয়ে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ করা হয়। তিনি কহিতেন, ঈশ্বর এক ভিন্ন বহু নহেন, এবং প্রকৃত বিশ্বাস এক ভিন্ন নানা নহে। তবে যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে নানাপ্রকার ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কেবল মনুষ্যের কল্পিত মাত্র। তিনি সমভাবে মোল্লা ও পণ্ডিত, দরবেশ ও সন্ন্যাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া, যে ঈশ্বর অসংখ্য মহম্মদ, বিষ্ণু ও শিবকে আসিতে যাইতে দেখিয়াছেন, সেই ঈশ্বরের ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে ও তৎপ্রতি চিত্তস্থাপন করিতে অনুরোধ করিতেন। তিনি কহিতেন, ধর্ম্ম, দয়া, বীরত্ব ও সংগৃহীত জ্ঞান বস্তুতঃ কিছুই নহে, যে জ্ঞানবলে ঈশ্বরের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহাই লাভ করিতে চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে ঈশ্বর এক, প্রভুর প্রভু ও সর্ব্বশক্তিমান্। সৎকার্য্য ও সদাচারে এই এক প্রভুর প্রভু, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদভাজন হওয়া যায়। গো ও শূকরের সম্বন্ধে হিন্দুদের সহিত মুসলমানদের যেমত বিরোধ আছে নানক বিশিষ্ট উদারতার সহিত তাহার সামঞ্জস্য করেন। তিনি কহিতেন, একপক্ষ শূকরের অধিকার আর এক পক্ষ গোর অধিকার লইয়া ব্যস্ত, কিন্তু যাহারা কোনও প্রাণীকেই আপনাদের জন্য গ্রহণ না করেন, "গুরু" ও "পীরগণ" তাঁহাদেরই প্রশংসা করিবেন।

নানকের মতে সংসারবিরাগ ও সন্ন্যাস ধর্ম্ম অনাবশ্যক। তিনি কহিতেন, সাধু, যোগী ও পরমাত্মনিষ্ঠ, গৃহী উভয়ই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের চক্ষে তুল্য। ধর্ম্মানুযায়ী মতের সম্বন্ধে নানকের আরও কতকগুলি উক্তি আছে। সেই উক্তিগুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এস্থলে তাহার কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে।

একদা নানক হরিদ্বারে গিয়া তত্রত্য গঙ্গাস্নায়ী ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন :—"ভ্রাতৃগণ! তোমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমহাশয়দিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা পাও। ইঁহারা যে তোমাদের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় আছেন, তাহা তোমরা জানিতে পারিতেছ না। আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যাবৎ মনুষ্যের মন পরিশুদ্ধি না হইবে, তাবৎ তাঁহাদের অনুষ্ঠিত জপ, যজ্ঞ, পূজা প্রভৃতি কোন কার্য্যেরই ফল জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।" অন্য একদিন ব্রাহ্মণেরা স্নান করিয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণমুখ হইয়া তর্পণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে নানক জলে দাঁড়াইয়া পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া জল সেচিতে লাগিলেন। সকলে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নানক কহিলেন, করতারপুরের ক্ষেত্র পশ্চিমদিকে আছে, তিনি সেই ক্ষেত্রে জল সেচিতেছেন। ইহা শুনিয়া সকলে উপহাসপূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন,

"করতারপুর বহুশত ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই জল কিরূপে ততদূর পৌঁছিবে?" নানক কহিলেন, "তবে তোমরা ইহলোক হইতে জল সেচিয়া পরলোকগত পূর্ব্ব-পুরুষগণের তৃপ্তি জন্মাইবার আশা করিতেছ কেন?" ১৫২৬ কি ২৭ খ্রীষ্টাব্দে নানক প্রথম মোগল সম্রাট্ বাবরসাহের দ্রব্যসামগ্রী বহন করিতে ধৃত হয়েন। বাবর নানকের আকার প্রকার, সাধুতা ও বাক্‌চাতুরীতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করেন এবং তাঁহার ভরণপোষণের জন্য অনেক সম্পত্তি দিতে চাহেন। নানক এই দানগ্রহণে অসম্মত হইয়া কহেন, "আমার কিছুরই অভাব নাই, আমার সঞ্চয় এমন অক্ষয় যে কখনও তাহার হ্রাস হইবে না।" বাবরসাহ এই কথার ভাবার্থ বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ করিলে নানক স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করেন, যে, তাঁহার হৃদয় কেবল পরমেশ্বরের সাধনাতেই পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সময়ান্তরে নানক আর একবার কহিয়াছিলেন, ঈশ্বরের নামামৃত পান করিয়া তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা সকলই একেবারে শান্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি কেবল সেই অমৃতেই সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। কথিত আছে, নানক মক্কায় গিয়া একদিন কাবানামক উপাসনামন্দিরের দিকে পা রাখিয়া শয়ন করেন। ইহাতে পবিত্রগৃহের অবমাননাকারী বলিয়া তথায় তাঁহার বড় নিন্দা হয়। নানক এজন্য ক্ষুব্ধ হইয়া তত্রত্য মুসলমানদিগকে জিজ্ঞাসা করিযাছিলেন, "ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, যেদিকে পা ফিরাইব, সেই দিকই তাঁহার অবমাননা হইতে পারে। এক্ষণে কোন্ দিকে পা রাখিলে নিস্তার পাই, বল।" নানক, অন্যসময়ে কহিয়াছিলেন, "একলক্ষ মহম্মদ, দশলক্ষ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এবং একলক্ষ রাম সেই সর্ব্বশক্তিমানের দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই মৃত্যুর শাসনাধীন, কেবল ঈশ্বরই অমর। তথাপি এই ঈশ্বরের উপাসনাতে সম্মিলিত হইয়াও লোকে পরস্পর বাদানুবাদ করিতে লজ্জিত হয় না। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, কুসংস্কারের প্রেতাত্মা এখনও সকলকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। যাহার হৃদয় সৎ তিনিই প্রকৃত হিন্দু এবং যাঁহার জীবন পবিত্র তিনিই প্রকৃত মুসলমান।"

কেহ কেহ অনুমান করেন, নানক কবীরের গ্রন্থ হইতে স্বীয় মত সঙ্কলন করিয়াছেন। অনেকস্থলে কবীরের মতের সহিত নানকের মতের একতা দৃষ্ট হয়। কবীর যেরূপ জপ, পূজা ও জাতিভেদাদির নিন্দা করিয়াছেন, নানকও সেইরূপ জপ, পূজা প্রভৃতির অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং কবীর যেরূপ ভগবৎপ্রেমে চিত্তার্পণ করিতে বারম্বার উপদেশ দিয়াছেন, নানকও সেইরূপ অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরে মনঃসংযোগ করিতে সকলকে উত্তেজিত করিয়াছেন। কবীর অন্তঃশুদ্ধির প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন :—

"মন্‌কা ফেরৎ জনম গয়ো, গয়ো ন মন্‌কা ফের।
করকা মন্‌কা ছোড় কর মন্‌কা মনকা ফের॥"

"জপমালার গুটিকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে জীবন গত হইল; কিন্তু হৃদয়ের ঘোর বিগত হইল না। অতএব হাতের গুটিকা পরিত্যাগ করিয়া মনের গুটিকা ঘূর্ণন কর।"

স্থলান্তরে :—

"গঙ্গা ফেরা হরিদ্বারকা, গুদ্ধড়ি লিয়া মন চারকা, ভট্‌কা ফেরা তৌ ক্যা হুয়া জিন এস্ক মে সের না দিয়া। কাবা গয়া, হাজি হুয়া, মনকা কপট মিটা নাহি। মনকা কপট টুটা নাহি, কাবা গয়া তৌ ক্যা হুবা, হাজি হুয়া তৌ ক্যা হুবা; জিন এস্ক মে সের না দিয়া। বোস্তাং গোলেস্তাং পদ্ গয়া মৎলব না সমঝা। শেখকা আলিন হুবা তৌ ক্যা হুবা, ফাজেল হুবা তৌ ক্যা হুবা, জিন এস্ক মে সের না দিয়া॥"

"যে ব্যক্তি হরিদ্বারবাহিনী জাহ্নবী পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছে, দুই চারি মন কন্থাভার বহন করিয়াছে, এবং বিভ্রান্ত হইয়া নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়াছে, কিন্তু ভগবৎপ্রেমে শিরসমর্পণ করে নাই, তাহাতে তাহার কি হইল? যে ব্যক্তি কাবা গিয়াছে, হাজি হইয়াছে, অথচ যাহার মনের কপটতা ক্ষীণ হয় নাই, মনের কপটতা দূরীভূত হয় নাই ও ভগবৎপ্রেমে শিরসমর্পিত হয় নাই, তাহার কাবাগমনই বা কি হইল? এবং হাজিপদে অধিরোহণেই বা কি হইল? যে ব্যক্তি বোস্তা গোলেস্তা সমস্ত অধ্যয়ন করিয়াছে, কিন্তু সেখ সাদির তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে নাই ও ভগবৎপ্রেমে শিরসমর্পণ করে নাই, তাহার পণ্ডিত ও পারদর্শী হওয়াতেই বা কি হইল?"

নানকের ধর্ম্মপদ্ধতি এই সকল মতেরই ছায়া মাত্র। প্রভেদ এই নানক সাক্ষাৎসম্বন্ধে কেবল একমাত্র অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরে চিত্তসংযোগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কবীর রাম ও হরিতে সেই সর্ব্বশক্তিময় ঈশ্বরত্ব আরোপিত করিয়া তাঁহাদের উপাসনাবিধি প্রচারিত করিয়াছেন। যাহা হউক, নানক যেরূপ পবিত্র ও উদার মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার উপাসনাপদ্ধতি যেরূপ সকল স্থলে, সকল সময়েরই অপরিবর্ত্তনীয় হইয়া রহিয়াছে, তজ্জন্য তিনি কখনও স্পর্দ্ধা বা অহঙ্কার প্রকাশ করেন নাই। তিনি আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের একজন দাস ও বিনয়ী আদেশবাহক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। নিজের লিখিত ধর্ম্মানুশাসন জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ হইলেও তিনি কখন তাহার উল্লেখ করিয়া আত্মগরিমার বিস্তারে উন্মুখ হয়েন নাই, এবং নিজের ধর্ম্মপ্রচারে অসাধারণ ভাবের বিকাশ থাকিলেও কখনও তাহা অমানুষী ঘটনায় কলঙ্কিত করেন নাই। তিনি কহিতেন,

"ঈশ্বরের কথা ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রে যুদ্ধ করিও না। আপনাদের মতের পবিত্রতা ব্যতীত সাধু ধর্ম্মপ্রচারকগণের অন্য কোনও অবলম্বন নাই।"*

গুরুনানক এইরূপে কালান্তরাগত ভ্রান্তির উচ্ছেদ করিয়া আপনার শিষ্য-দিগকে উদার ও পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এইরূপে শিষ্যগণ তাঁহার নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্মপদ্ধতির উপর স্থাপিত হইয়া ধীরে ধীরে একটী নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্মপরায়ণ বৃহৎ সম্প্রদায় হইয়া উঠিল। "শিষ্য" শব্দের অপভ্রংশে "শিখ" শব্দের উৎপত্তি হইল। এজন্য নানকের শিষ্যগণ অতঃপর সাধারণের নিকট এই 'শিখ' নামে পরিচিত হইতে লাগিল। †

* বাবা নানকের গ্রন্থ শিখদিগের মধ্যে মহা পূজ্য। অমৃতসহরে এক চমৎকার স্বর্ণমন্দিরে এই গ্রন্থ রক্ষিত হইয়াছে। স্বর্ণমন্দিরে কোন দেবমূর্ত্তি বা অন্য কিছুই নাই কেবল এই আদি গ্রন্থ অতি যত্নে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভক্তেরা অনবরত চামর ব্যাজন করিতেছে।

† অনেকে বলেন যে শিখা হইতে "শিখ" নাম হইয়াছে। যে সকল পাঞ্জাবির মস্তকে শিখা আছে অনেকের মতে কেবল তাহারাই "শিখ"।

গঙ্গাধর শর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা

একাদশ পরিচ্ছেদ

কাদম্বিনী-মেঘমালা

আজ ভাবিয়া দেখিলাম, কর্তৃপক্ষদের অজ্ঞাতে তিনটি কার্য্যে নিপুণ হইযাছি। অশ্বারোহণ, শিকারনৈপুণ্য ও সন্তরণপটুতা। আমাদের দেশীয় সভ্যেরা শিকারখেলা নৃশংস কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু আমার পক্ষে শিকারভূমি প্রত্যুৎপন্নমতি ও প্রমোদবর্দ্ধনের কারণ এবং অঙ্গচালনা ও বুদ্ধিচালনার রঙ্গভূমি হইয়াছিল; তাহার সঙ্গে বনভ্রমণে পশুপক্ষীর ক্রীড়া ও বনশোভা অবলোকন পল্লীমধ্যে অস্থিরকর লোক বিবাদ হইতে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া অনুভব হইত। কখন দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ভাবিতাম, বনের এ শোভা কিরূপে কেমন করে নিষ্পন্ন হইল।

আশুতোষ বাবুর অশ্বশালার সহিস সকলেই জটাধারীর অনুগত ছিল। বারুণী, রথে, পূজাপার্ব্বণে খেলানা খরিদের নিমিত্তে যাহা কিছু সংগ্রহ হইত, যে মিঠাই সন্দেশ জটাধারীর হাতে আসিত, তাহার অর্দ্ধেক সহিষদের সহিত ভাগাভাগি ছিল। গ্রামের ঈশান কোণে বিসর্জ্জনের ঘাটের উপর যে বিস্তৃত ময়দান ছিল, তথায় প্রায় প্রতি সন্ধ্যাকালে ঘোটকদল "রোলে" যাইত, জটাধারী সেই সময় অশ্বারোহী হইতেন ও একটি ভুটিয়া টাট্টু সতেজে দৌড় করাইতেন।

দারগা সাহেব যে দিবস রঘুবীরকে বেতাব অবস্থায় চালান দিলেন, তাহার কয়েক দিবস পরে আমি ঐ ভুটিয়া টাট্টুতে আরোহণ করিয়াছি। অশ্ব চলিতে চলিতে ঘামিল, ঘামিয়া দৌড়িল, দৌড়িতে দৌড়িতে পতঙ্গসম উত্তরমুখে ছুটিল। ঝড়ুয়া সহিষ চীৎকার করিতে লাগিল, "বাবুজী সাবধান, দেখিবেন যেন পড়েন না!" সহিষ যাহাতে সঙ্গী না হইতে পারে তাহাই আমার উদ্দেশ্য হইল, ঘোড়া আরও তেজে চালাইলাম, সন্ধ্যার প্রাক্কালে

শান্তিপুরে সিংহদের বাটীর নিকট মাঠে উপস্থিত হইলাম। এখানে দেখিলাম, একটি ঘোর যুদ্ধ বাঁধিয়াছে—পশ্চাৎভাগে কয়েকটি বৃক্ষ রাখিয়া দেওয়ান গজানন একটি জড়সহিত বাঁশ উৎপাটন করিয়া মল্লবেশে দণ্ডায়মান। তাঁহার ঘোটকটি পশ্চাতে সহিষের হস্তে ধৃত। দেওয়ানজী বাঁশটি হাতে করিয়া "রে—ওরে—আয়—কে আছ—আগে আয়" কহিতেছেন। তাঁহার দীর্ঘ, গৌর, স্থূল দেহ যেন ক্রোধে ফাটিতেছে। বিপরীত পক্ষ হইতে থেকে থেকে দুই একটি শড়কি ক্ষেপণ হইতেছে। দেওয়ানজীর অশ্বকে বধ করাই শড়কিধারীদের প্রথম উদ্দেশ্য। যেমন উভয় দলে চীৎকার স্বরে কথোপকথন হইতেছে সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি গ্রাম্য মৃগ "ব্বাও ব্বাও" রবে গণ্ডগোলে আরও গোল মিশাইতেছে। সিংহ বাবুর নিজগ্রাম, তাঁহার দল বল প্রবল। এদিকে দেওয়ানজীর সহিত থানার দুই একটি দুর্ব্বল সিংহ বরকন্দাজ মাত্র আছে। তাহাদের মধ্যে একটী পদাতিক বায়ুব্যাধিপীড়িত; সে যত বাক্য-প্রয়োগে ব্যস্ত হয় ততই তাহার কথা জড়াইয়া যায়, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকে; উভয় হাতের অঙ্গুলিগুলি যেন চঞ্চল বায়ুতে খর্জ্জুর পত্রের অগ্রভাগের ন্যায় কাঁপিতে থাকে। দুর্ব্বল সিংহের সহিত কম্প সিংহ যোগ দিলে লড়াই কবে ফতে হয়? আবার দেওয়ানজী যদিও সাহসী ও বলবান্ তথাপি একাকী, অপর দিকে সিংহদের গ্রাম হইতে পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় পিলপিল করিয়া লোক বাহির হইতে দেখিয়া ভাবিতেছেন। এমন সময়ে দূর হইতে একটী গগনভেদী স্বর শুনা গেল "ক্যাড়র? হাম জাতা হুঁ" তার সঙ্গে সঙ্গে এক হুঙ্কার প্রয়োগ হইল, এক মুহূর্ত্তের জন্য সেই প্রান্তরে শরতের গগন যেন কাঁপিয়া উঠিল, যেন মাঠের জল খালের জল কম্পিত হইল। সকলে চমকিয়া কহিল এ রঘুবীরের হুঙ্কার।

রঘুবীর ডাক্তার সাহেবের সার্টিফিকেট হস্তগত করিয়া, মোকদ্দমার দিন পরিবর্ত্তন করাইয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছিল, এখন দাঙ্গার গন্ধ পাইয়া সেই দিকে ফিরিয়াছে—যুদ্ধাভিমুখে চলিতেছে; আবার জয়ী হইব, দেওয়ানজীর আরো প্রিয় হইব ভাবিয়া উৎসাহিত হইতেছে। রঘুবীর নিকটস্থ হইয়া আবার একটি হুঙ্কার ছাড়িল। সেই হুঙ্কারে যেন সব যোদ্ধার মত্ততা বৃদ্ধি হইল। সকলেই উত্তেজিত, সকলের হস্ত হইতে তীর শড়কি অনর্গল ছুটিল। মুহূর্ত্তে গজাননের ঘোটক কর পাতিয়া ভীষ্মদেবের ন্যায় শরশয্যাশায়ী হইল, চক্ষু হইতে লাঙ্গুল পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ ফলকে বিদ্ধ ও রক্তপ্লাবিত হইল। দুর্ব্বল সিংহ ও কম্প সিংহ কোথায় গেল কেহ দেখিতে পাইল না। কিন্তু গজানন? তাঁহার হাতের বাঁশ ঘুরিতেছে, পাকা খেলোয়াড়ের ন্যায় শড়কির গতিরোধ করিতেছে। এ কম

দক্ষতা নয়! সুশিক্ষিত পুস্তকপ্রিয় লেখনী অস্ত্রধারী সভয় সভ্যগণ যাঁহারা লাঠিয়ালের নামে কাঁপেন ও পথের শাঁকোর তলে হামা দিয়া প্রবেশ করেন বা জঙ্গলের জন্তুমুখে পড়েন তাঁহাদের অপেক্ষা দেওয়ানজীর দক্ষতা নিন্দনীয় নহে! দেওয়ানজী ভদ্রসন্তান হইয়াও দুই এক হাত খেলিতে জানিতেন, তজ্জন্যই এত সাহস, কিন্তু সে সাহস এখন অকর্ম্মণ্য, বিপক্ষ দলের লোকসংখ্যা প্রবল, গজাননকে ঘেরিয়া ধৃত করিতে প্রস্তুত। এই ঘেরিল! চারি দিকে দলবল গোল হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইতেছে—ক্রমে অগ্রসর! কেহ কহিতেছে "শড়কিতে ভুঁড়ি ভসকে দে" তখন তাহার কয়েদের ও জীবনান্তকাল উপস্থিত। দর্শকদল খালের তীরে জাঙ্গালের উপর দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। ইতিমধ্যে একটি ভয়ানক হুঙ্কার শুনিলাম ও তাহার পরক্ষণেই দেখিলাম রঘুবীরের স্কন্ধে দেওয়ানজী আরোহিত, দুই চারি লম্ফে খালের তটে, আর এক "বারো হাতি" লাফে খালের অপরপারগত। সকলে মনে করিল যেন একটি সিংহ আসিয়া শৃগালমুখ হইতে শিকার হরণ করিয়া লইল, পশ্চাতে অনেক লোক ধাবিত হইল কিন্তু কোথায় ব্যাঘ্র, কোথায় শৃগাল? মুহূর্ত্তে রঘুবীর ভারসহ প্রশস্ত ময়দান অতিক্রম করিয়া দৃষ্টির অগোচর হইল।

এই সময় সিংহদের ছাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটি বৃদ্ধ পুরুষ কহিলেন "ঐ সর্ব্বনাশীর জন্যই এই সমস্ত বিপদ। ও না স্নানে যায় যদি"— আমিও সেই দিকে দেখিলাম, যেরূপ সীতা রাক্ষস কুলের সর্ব্বনাশিনী, দ্রৌপদী কুরুকুলের সর্ব্বনাশিনী, হেলেনা ট্রয় নগরের নাশের কারণ, সেইরূপ একটি সর্ব্বনাশিনী রাজপুতানী লাবণ্যশীলা কুলকামিনী ছাদে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সাধের নামটি কাদম্বিনী, সর্ব্বাঙ্গে নবমেঘসদৃশ নীলাম্বর আবৃত, কেবল কমলমুখীর সুকুমার মুখখানি ও হীরকখচিত বালাসুশোভিত হস্তদ্বয় দৃশ্যমান। এখন সূর্য্যদেব অস্তমিত, "কনে দেখানী" বেলা উপস্থিত, সকল দ্রব্যই এখন সোণার জলে রঞ্জিত দেখাইতেছে। কিন্তু কাদম্বিনী? তাহার লাবণ্যেই যেন প্রাসাদ আলো করিয়াছে, ঊষাকালের অর্দ্ধস্ফুট কুসুমকলিকার ন্যায় কিশোর বয়স প্রায় অতিক্রম করিয়া গৌরাঙ্গী উজ্জ্বল যৌবন সীমায় উপনীতোন্মুখ। একবার দেখেই, দেখি, দেখি, আবার এই প্রতিমা দেখি, এই ইচ্ছাই প্রবল হইতে লাগিল। প্রতিমা দেখিতে দেখিতে হিংস্র অন্ধকারের ছায়া আসিয়া গগন ঘেরিল। মনে হইল আলো আরও একটু থাকিলে ভাল হইত কিন্তু দিবালোক থাকুক না থাকুক, কাদম্বিনীর মুখলাবণ্যে প্রাসাদগগন আলো হইয়াছিল, সেই আলো আমি দেখিতেছিলাম যেন কালো গগনে বহুদূরস্থিত অদৃশ্য তারাপুঞ্জের শ্বেত আভা! এমন সময় গঙ্গারাম সহিষ কহিল "কি দেখেন বাবুজী, কণে?" আমি একটি "দূর" বাক্য মাত্র প্রয়োগ করিয়া গৃহাভিমুখে টাট্টু চালাইলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধি

আমরা অতি সন্ধিপ্রিয়, সুযোগ পাইলে আত্মীয় প্রতিবাসীর ভূমির উপর যৎকিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া প্রাচীরের ভিত্তি পত্তন করি; দুই একটি বৃক্ষশাখা ফলভরে আমাদের গৃহের দিকে নত হইয়া আসিলে সেই ফলের মিষ্টতা পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত হই; পরক্ষেত্রের বেড়া পাতলা হইলে পথ চালাইবার চেষ্টা করি, এক একবার বলি "ও চিরকেলে পথ"; দুর্ব্বল লোকের লাখরাজের অনুগত প্রজা ভাঙ্গাইয়া আমাদের মালের সামিল করিতে ত্রুটি করি না, লুকিয়ে লুকিয়ে ছুরি চালাইয়া থাকি, তবু আমরা পরস্পর আত্মীয়, চারচোখে দেখাদেখি হইলে হাসি খুসি, খেলার ধুমে সন্ধিপ্রিয়তার পরিচয় দিয়া থাকি। অপরিচিত লোক আমাদের বৈঠকে বসিলে মনে করেন এ গ্রামের সমাজ সৌহার্দ্দ্যবদ্ধ, বড় সুখী!

আমি এখনও বুঝিতে পারি না যে স্থানান্তরে এইমাত্র যাহার সর্ব্বনাশের পরামর্শ করিতেছিলাম তাহার সহিত সাক্ষাতে আবার সঙ্গে সঙ্গে কিসের বন্ধুত্ব, কিসের সম্প্রীতি? যদিও দুই নৃপতির বন্ধুত্ব অপেক্ষা দুই দরিদ্রের বন্ধুত্ব নিষ্কপট, যদিও দুই বিষয়ীর আত্মীয়তা অপেক্ষা দুই ভিক্ষুকের আত্মীয়তা সরলভাব, তথাপি গরিবের কে গুণগ্রাহী? কিন্তু যখন বড়লোকে বড়লোকে কোলাকোলি করেন যখন ব্যাঘ্র ভল্লুক করস্পর্শ করেন, এক দেশের সিংহরাজ অন্য দেশের ঋক্ষনৃপতিকে "আমার প্রিয়তম বন্ধু" বলিয়া সম্ভাষণ করেন তখন বন্ধুত্বশব্দের কেমন সার্থকতা সম্পাদন হয়? রোজনামচা হইতে সেই নিষ্কপট গৌরবের আজ একটি পরিচয় দিতেছি।

দেওয়ান গজানন আজ বিগ্রহবেশ পরিত্যাগ করিয়া সন্ধিসজ্জায় সজ্জিত। তাঁহার প্রশস্ত স্থূল কলেবর সর্ব্বদাই সুনির্ম্মল, লোমহীন, গৌরবর্ণ, ব্রাহ্মণের সুচিহ্ন শুভ্র সরল মার্জ্জিত যজ্ঞোপবীত বামস্কন্ধ হইতে, বক্ষদেশ হইয়া সেই লম্বোদরের দক্ষিণপার্শ্বে লম্বমান, লম্বা লংকলাথের ধুতি মাত্র পরিধেয়, তাঁহার উভয় কাছা ও কোঁচা উদরের এক অন্ত হইতে আর এক ধার পর্য্যন্ত পরিসর—এই গজাননের পোশাকী বেশ! তিনি যখন নিজগৃহে বসিয়া থাকিতেন অতি খর্ব্ব কম চৌড়া ধুতি মাত্র তাঁহার পরিধানে থাকিত, কাছা প্রায় থাকিত না, কাছা বাঁচাইয়া গামছা করিতেন এবং দুইখানি ঐরূপ কাছা বাঁচাইয়া আর একখানি আবার ঐরূপ ক্ষুদ্র ধুতি করিতেন, সে জন্য শ্রীনগরে ছেলের মুখে

একটি নামতা শুনা যাইত, জটাধারীই তাহা বচনা করিয়াছে বলিয়া আমার অনর্থক কেহ কেহ অপবাদ দিত, নামতাটি এই :—

কাছাকে কাছা,
কাছা দুগুণে গামছা,
দুই গামছা যোড় ভাই,
গজাননের ধুতি তাই।

এই বচন গজানন কখন কখন স্বকর্ণে শুনিতেন, কিন্তু কাহারও কথায় তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, ববং ভাবিতেন এই বচনেব সাব সংগ্রহ করিলে, অনেকের সঞ্চয়শীলতা বৃদ্ধি হইতে পাবে। যাহা হউক আজ সঞ্চয়শীলতা পবিত্যাগ কবিয়া, অনাবশ্যক খরচ করিয়াও দেওয়ানজী পোশাকী বস্ত্র পবিধান কবিযাছেন; তাঁহাব চরণ আজ "ফুলপুখুরীয়" ফুলদাব জবির ফুল তোলা পাদুকাদ্বয়ে শোভমান। জুতা যোড়াটী দ্বাদশ বৎসব হইল খবিদ হইয়াছিল কিন্তু তাহার রঙ্গ টস্‌কে নাই। বিশেষ বিশেষ মঙ্গলের দিন, পুণ্যাহ, পূজা দশমী ইত্যাদি বৎসরে দুই চারি দিবস বাহির হয়, নচেৎ ভৈরব খানসামাব জিম্মায় একটী পশ্চিমে বাক্‌তার বস্তানিতে বান্ধা থাকে, ভাদ্রমাসে দুই এক দিবস মাত্র সূর্য্যদেব দেখিতে পান, বার বৎসরের মধ্যে বুড় ভৈরব একবাব তামাকের অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া ঐ পাদুকার একটি শ্বেত ফুলে দাগ লাগাইয়া আপনার বামগণ্ডে গজাননেব এক চাপড়ের কালিশিরা রূপ চিহ্ন ধারণ করিয়াছে। দেওয়ানজীর সুসজ্জা দেখিয়া আমি ভাবিতেছি আজ শুভদিন, কারণ যে দিন দেওয়ানজী সুসজ্জিত হন একটি পর্ব্ব উপস্থিত হয়, মিষ্টান্ন সন্দেশের প্রায় আমদানি হইয়া থাকে। কিন্তু গজাননের দুই একটি কথা শুনিয়া আমার সে ভ্রম দূর হইল। একটি প্রিয় অনুচরকে লক্ষ্য করিয়া গজানন কহিলেন "এস, আজ ভোরেই কর্ত্তা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, আশুতোষ ত আশুতোষ! যেমন নাম তেমনি গুণ, আমার ঘোড়াটী হত হইয়াছে শুনিয়াই কহিলেন নূতন একটি অশ্ব ক্রয় করিয়া লও, সিংহদের নিকট আর দাবী করিও না"—গজানন আবার নিম্ন স্বরে কহিলেন "ঘোড়াটি ত সরকারী খরচেই খরিদ হইবে, কিন্তু সিংহদের নিকটেও মূল্য আদায় করা চাই, চাই বৈ কি?—চাই গো—চাই!" এই কথা কহিয়া দেউড়ির সম্মুখে যথায় শিবিকা প্রস্তুত ছিল দেওয়ানজী আসিয়া দাঁড়াইলেন। আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন এমন সময় আমি কহিলাম "দাদা মহাশয় আমি যাইব।"

গজা। কে রে ভাই—জটু! কোথায় যাইবে?

"তোমার সঙ্গে" কহিয়াই আমি গজানন দাদার শিবিকার এক কোণে বসিলাম। অধিকক্ষণ মুখ বন্ধ রাখা আমার পক্ষে কষ্টকর, বাহকগণ কয়েকটি পদ না চলিতেই কহিলাম "গজু দাদা আজ আবার দাঙ্গা হবে?"

গজা। রাম কহ, রাম কহ! রঘুবীর রঘুবীর! সন্ধি মানসে যাইতেছি যাত্রার সময় এ কুকথা কেন শুনালি?

আমি বলিলাম "কি কুকথা দাদা দাঙ্গা? দাঙ্গা দেখায় আমোদ আছে।"

গজা। রাম কহ, গঙ্গা কহ, আবার ঐ অকথা।

আমি কহিলাম "কি অকথা দাঙ্গা"!

গজা। তুমি আজ বিপদ ঘটাইবে দেখিতেছি! আবার ঐ কথা বল ত, নামিয়ে দিয়ে যাব।

"আর কহিব না—কিন্তু দাদা আমি সেদিন দেখেছিলাম—আপনার কৌশল চমৎকার।"

গজা। ভাই এ সকল শিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক, বেটা ছেলে হয়ে কেবল পুথি পড়া নয়—বল্ চাই, বুক্ চাই, দম্ভ চাই, তবে অদৃষ্ট যোগ দেয় বড়লোক হয়—হয় রে—ভাই—হয়।

এদিকে রঘুবীর সর্দ্দার আজ রুদ্রাক্ষের মালা গলায়, রাঙ্গা পাগড়ি মাথায় দিয়া কুম্ভীরচর্ম্মনির্ম্মিত ঢাল পৃষ্ঠে বান্ধিয়া, কোমরের বামপার্শ্বে মহিষের চর্ম্মকৃত কোষ সংযুক্ত তরবাল ঝুলাইয়া, লাঠি হাতে পাল্‌কির এক বাড় ধরিয়া চঞ্চল পদ-চালনায় বাহকদলের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। আমাদের কথা শুনিয়া কহিয়া উঠিল, "বেটা ছেলে হলেই কি ভাগ্য হয় হজুর? আমরাও ত বেটা ছেলে, বেটা ছেলে হওয়া বড় সুখ! বরং মেয়েরা কাটনা কাটিয়া, মাছ ধরিয়া ভাল থাকে, আমাদের—"

সর্দ্দার বেহারা কহিয়া উঠিল, "এই বোঝা কান্ধে করিয়া কাদা কাঁটা ভাঙ্গিতে বড় সুখ!" রঘুবীর কহিয়া উঠিল "আর মধ্যে মধ্যে দারগা সাহেবের পয়জারে বড় সুখ!"

কথা কহিতে কহিতে বিস্তৃত হরিত ক্ষেত্র, শেষে নিবিড় বৃক্ষশির ভেদ করিয়া সিংহ বাবুদের প্রাসাদের শ্বেত উর্ম্মিপৃষ্ঠবৎ আলিসা ও কারনিস দৃষ্ট হইল। বেহারাগণ সজোরে হাকিতে লাগিল, রঘুবীর দ্রুতপদ হইল, সর্দ্দারের লালকুক্কুর যেন ভারি বিষয় কার্য্যে তৎপর হইয়া সবার অগ্রে দৌড়িল—জমাদারের টাট্টু ঘোড়া দৌড়িল, কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সিংহ বাবুদের গৃহদ্বারে পাল্কী থামিল।

শ্রীযুত বাবু শিবসহায় সিংহ দেউড়ির সম্মুখে শিবিকা দেখিয়াই নিজ আসন একটি নিয়ারের খাট হইতে অবতীর্ণ হইয়া খড়ম পায়ে দিয়া দাঁড়াইলেন। উপরে সুপক্ক ভ্রূ-যুগল, নিম্নে কদম্বকেশরের ন্যায় প্রচুর শ্বেত গোঁফের দলমধ্যে বৃহৎ চক্ষুর্দ্বয়, বয়োগুণে তারাদ্বয় আর তাদৃশ ভ্রমরকালো নাই; ওষ্ঠদ্বয় কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া যখন গজাননের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন তখন রাজবাটীর সিংহদরজার সেই বুড় সিংহের মূর্ত্তিটি মনে পড়িল—মনে হইল গজাননের গজস্কন্ধ চিরিয়া রক্তশোষণ করিবেন। বাবু শিবসহায় সিংহ চৌহান বংশীয়—তাঁহার পিতামহ সুবাদারী করিয়া শেষ মারহাট্টা ও পিণ্ডারী যুদ্ধে বিশেষ যশোলাভ করিয়া জঙ্গল স্থানে বিস্তৃত জায়গির মহল লাভ করিয়াছিলেন। অদ্য তিন পুরুষ বঙ্গ-প্রদেশের পশ্চিমবিভাগে বাস করিয়াও চৌহান জাতির কুল-নীতি ভুলেন নাই, পশ্চিম অযোধ্যাবাসী স্বজাতি সদ্বংশের সহিত কুটুম্বিতা রক্ষা করিতেছেন। কাদম্বিনী একমাত্র কন্যা, অধিষ্ঠাত্রী করালবদনী কালীকাপ্রসাদে এই কাদম্বিনী পাইয়াছেন। সেই কন্যার কল্যাণবিধান জন্য প্রতি অমাবস্যায় সিংহমহাশয় ঘোররূপ কালীর ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া থাকেন, আবার কালোচিত সুনীতিতে সেই কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছেন। যেমন কাদম্বিনী পুস্তকপাঠে নিপুণা, সুকাব্যের রসগ্রাহিণী, তেমনি গৃহধর্ম্মে শিল্পকার্য্যে অবশেষে প্রসিদ্ধ পাচিকা রাঙ্গা ঠাকুরুণের শিক্ষায় রন্ধন-কার্য্যে সমীচীন ব্যুৎপন্না—মাতৃহীন হওয়ায় কন্যার পরিণয়কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়াছে—বাল্যবয়স অতিক্রম করিয়া যৌবনোন্মুখী হইয়াছেন। সম্প্রতি সুলতানপুর নিবাসী কোন ছত্রিয় বংশ হইতে কোন যুবা রাজপুত্র আনাইয়া আপন জামাতৃপদে বরণ করিবার শিবসহায় বাবুর ইচ্ছা ছিল, ভবিষ্যৎ অযোধ্যাকুসুম আপাতত বঙ্গ-কাননে সিংহদের গৃহপ্রাঙ্গণই উজ্জ্বল করিয়াছিল কিন্তু সেই সোহাগের ধন অচিরাৎ বিশহাত জলে মগ্ন। এই কুসুম হইতে পীযুষ পরিবর্ত্তে গরল উৎপন্ন হইয়া সিংহ-কুলকে একেবারে বিষবারিসিক্ত করিতে উদ্যত। বাবু শিবসহায় সিংহ যে সময়ে গজাননের প্রতি ক্রোধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন সেই সময়ে কাদম্বিনীর রূপলাবণ্য ও কুলগৌরব তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। তিনি শুনিয়াছিলেন সেই রূপে সেই গৌরবে গজাননের ষড়যন্ত্রে কলঙ্কক্ষেপণের চেষ্টা হইতেছে। সেই সুরূপা প্রাসাদ হইতে দাঙ্গা দেখিয়াছিলেন, তাহাঁকেও অভিযুক্ত ব্যক্তির শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। দেওয়ানজী কহিয়াছিলেন তাঁহার আদেশেই দাঙ্গা আরম্ভ হয়; তিনিই কহেন "বাবা ওদের মারতে হুকুম দিয়াছেন" ও তাঁহার ইঙ্গিতে কয়েকটি দাসী ছাদ হইতে ইট নিক্ষেপ করে, তিনিই ত প্রধান আসামী। দেশবিভাগের তেজীয়ান্ বিচারপতি মৌলভি সাহেব কাদম্বিনীর নামেও শমন জারি করিয়াছেন।

গজানন মিষ্টমুখ, সতত নম্র, বিনয়ী, বাবু শিবসহায়কে দেখিবামাত্র ত্বরিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দুটি হাত বিনয়ে ধরিলেন। এবং কথা কহিতে কহিতে গজানন বাবু শিবসহায় সিংহকে খাটিয়ায় বসাইলেন। খাটিয়ার নিম্নভাগে একটী শতরঞ্চিতে নিজে বসিয়া নিম্ন স্বরে কি কথা কহিলেন। শিবসহায় সিংহ জল হইয়া গেলেন। দেওয়ানজী প্রকাশ্যে বলিতে লাগিলেন "রাগ চণ্ডাল, চণ্ডাল মশাই চণ্ডাল! রাগে মানুষ বুদ্ধিহীন হয়, আপনি যে জন্য ক্রুদ্ধ আমি বুঝিয়াছি, কেহ আপনাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়া থাকিবে, আপনার যাহাতে অসম্ভ্রম হয়— দোহাই রঘুবীর! সে চেষ্টা গজাননের সততই কষ্টকর জানিবেন। যাহা হইয়াছে, হইয়া গিয়াছে, নির্ব্বোধ সেই ছেঁড়া মুক্তারটা এক বুঝিতে আর বুঝেছে, এক্ষণে ক্ষমা করুন, রাম বলুন, শান্তি শান্তি শান্তি বলুন—না বলবেনই বা কেন? যাহাতে ইজ্জত রক্ষা হয় তার অনিচ্ছা বা কেন? তা করাই বা কি কঠিন কাজ? উভয় পক্ষ সম্মত হইলে হাকিম কি করতে পারেন? দায়ী মুদ্দয় রাজী ত কি করবে কাজী?" দেওয়ানজীর মন্ত্র সর্ব্বশক্তিমান, মিথ্যাবাদ কপটতা কি এতই মিষ্ট? সরল সিংহ বাবু এক্ষণে মন্ত্রে বশীভূত দেওয়ানজীর কথা যথার্থই হিতৈষী সুহৃদের পরামর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী লোক সমস্তের প্রতি গজানন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন "ওহে তোমবা একবার অন্তরে যাও, যাও হে যাও" পরক্ষণেই কহিলেন "মহাশয় এখন এখানে কেহ নাই—এই শ্বেত চূণের ঘরে বসিয়া কহিতেছি—স্বরূপ কহিতেছি কোন বিষয়ে চিন্তা করিবেন না, যদিও সমন হইয়াছে তাহার উপায় আছে। আপনার মান, বুকে হাত দিয়া বলিতেছি, এই আমার মান, আমার মান, মশাই, আমার মান! কুলকন্যাকে কাছাবিতে উপস্থিত করা— রাম কহ, রাম কহ—সে কথা মনে করিবেন না—না হয় দুহাজার টাকা গেলই। নিতান্ত সমনজারি নিষেধ না হয় অল্পবয়স্ক দাসী একজনকে সাজাইয়া দিব—মৌত নাম লিখাইয়া দিব—একটি চিতা সাজাইয়া শবদাহ দেখাইব—কথাটা কি এতই ভারি? সহজ কথা মশাই সহজ কথা! আজ চৌকিদারকে দিয়া থানায় একটা এত্তেলা দিয়া রাখুন যে গ্রামে বিসূচিকার পীড়ার বড় প্রাদুর্ভাব, যেই পীড়ার উদয় সেই মৃত্যু—মৃত্যুরেব ন সংশয়! ব্যাম•হল কি মল—আর শুনুন—গ্রামে চাঁদা করিয়া একটি রক্ষাকালীর পূজা আরম্ভ করে দিন, লোকে জানুক যে মহামারী যথার্থই উপস্থিত হইয়াছে—হয়েছে ত—কোন্ না হয়েছে।"

সরল শিবসহায় সিংহ ঘোর শাক্ত, কালীভক্ত, রক্ষাকালী পূজার নাম শুনিয়াই সব বিপদ ভুলিলেন, দেওয়ানজীর কথায় মত্ত হইয়া তাহার পরামর্শ একান্ত মনে গ্রহণ করিলেন, পরক্ষণেই দেওয়ানজী চাঁদার ফর্দ্দ লইয়া বসিলেন। কালীপূজার খরচের সহিত আপন মৃত ঘোড়ার মূল্য উঠাইতে লাগিলেন।

বন্দবস্ত সমাপ্ত হইলে আমাদের শিবিকা কিঞ্চিৎ কাল পরেই গৃহাভিমুখ হইল। যখন আমরা শান্তিপুরের বহির্দ্দেশে আসিলাম ঢাকের শব্দ উঠিল। রঘুবীর কহিল প্রতিমার মাটী তুলিতে যাইতেছে।

আজিকালি সমাজসংস্কারের বড় ধূম পড়িয়া গিয়াছে। সমাজ সংস্কার কর, বলিয়া কত লোক যে উচ্চৈঃস্বরে গলাবাজী করতঃ ছাপায় নাম তুলিয়া লইল তাহার ঠিকানা নাই। কেহ বিবাহসংস্কার, কেহ ধর্ম্মসংস্কার, কেহ সমাজ-সংস্কার, কেহ ভারতসংস্কার, কেহ লেখনসংস্কার লইয়া দিন কত গোলযোগ করতঃ শেষ, বড় লোক,—গট হইয়া ঘরে বসিয়া গল্প মারিতে লাগিলেন। অনেকেই আপন কাজ, অর্থাৎ কিছু পয়শা, মারিয়া লইলেন। বিবাহ, ধর্ম্ম, সমাজ, ভারত, লেখন যেমন তেমনি রহিল, তাহাদের আর সংস্কার হইল না। লোকে প্রথম গোলযোগ, নামসই, দরখাস্ত, লেখালেখি, বকাবকি তুমুলকাণ্ড দেখিয়া ভাবে, এইবার বুঝি কিছু হবে, শেষ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করে কি হলো!!! বহুকাল ধরিয়া লোকে বলিয়া আসিতেছে কি হলো!!! অথচ কিছুই হয় না। কেন? কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। কারণ খুঁজিতে গেলে প্রথম কারণ কেহই বলিয়া উঠিতে পারে না। আমরা বলি সংস্কার জিনিসটা কি একবার তত্ত্ব লওয়া যাউক না কেন? সংস্কারের লক্ষণ কি? প্রকৃতি কিরূপ? কোথায় সংস্কার দরকার হয়? সংস্কার ভিন্ন আর কোন সমাজপরিবর্ত্তন আছে কি না? যদি থাকে ত সে কিরূপ? অদ্য আমরা তাহাই দেখিতে বসিব। আমাদের অদ্যকার প্রস্তাব সংস্কার ও বিপ্লব।

সংস্কার ও বিপ্লব, দুইটি কথার অর্থ কি? সংস্কার শব্দে মেরামত, কোন জায়গা ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা সারিয়া লওয়ার নাম সংস্কার। যেমন আমরা বাটীর সংস্কার বা মেরামত করিয়া থাকি। বিপ্লব শব্দে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেওয়া; কেহ কেহ বলেন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়ার নাম বিপ্লব; আমরা এ প্রস্তাবে সেরূপ অর্থ গ্রহণ করিব না। কেন? পরে জানা যাইবে। এই দুই প্রকার উপায়ই সময়ে সময়ে দরকারী হয়। যখন কোন নূতন সমাজ কোন কারণ বশতঃ বিপথগামী হয়, তাহার পরিবর্ত্ত আবশ্যক হয়, সেই পরিবর্ত্তের নাম সংস্কার। যেমন আথেন্সে ও রোমে

ঋণসংক্রান্ত আইনের পরিবর্ত্ত। যাহারা ঋণ দিত তাহারা খাতকদিগকে দাস করিত, প্রহার করিত, চূণের গাবোদে পুরিয়া রাখিত, তাহাদের সর্ব্বস্ব বাজেয়াপ্ত করিয়া লইত ইত্যাদি, এ অবস্থায় দেশের সমস্ত লোক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহাতে যে বন্দোবস্ত দ্বারা ঋণসংক্রান্ত আইনের পরিবর্ত্ত হইল সে আইন দ্বারা সমাজ সংস্কার হইল। ইংলণ্ডের বন্দোবস্ত দেশের লোকে দেশ শাসন করিবে। ১৮৩২ সালে দুঃখী প্রজারা ক্ষেপিয়া উঠিল যে যদি দেশের লোকেই দেশ শাসন করিবে তবে আমাদের লোক কেন মহাসভায় না যায়। তখন রিফরম বিল Reform bill পাস হইল। রিফরম বিল সমাজসংস্কার করিল। আবার যখন ফ্রান্সের রাজা ওমরাহবর্গ ও ধর্ম্মযাজকগণ সকলেই অত্যাচার করিতে লাগিলেন, যখন রাজার বাবুগিরির খরচে, রাজার বেশ্যাদিগের পেন্‌শন দিতে রাজকোষ শূন্য হইয়া উঠিতে লাগিল, যখন প্যাক্‌টিডি ফেমিন (দুর্ভিক্ষ সমাজ) দেশের সমস্ত শস্য ক্রয় করিয়া গোলাজাৎ করতঃ দেশে রোজ রোজ দুর্ভিক্ষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন এবং পূর্ব্বসঞ্চিত শস্য দ্বিগুণ ত্রিগুণ মূল্যে বিক্রয় করিয়া বড় মানুষ হইতে লাগিলেন, তখন যে কয়েকজন সামান্য লোকের সর্ব্বশক্তিমতী লেখনী প্রভাবে ফ্রান্সের লোকের চক্ষু উন্মীলিত হইল—যে উন্মীলনে রাজা, ওমরাহ, ধর্ম্মযাজক, বাষ্টাইল, অত্যাচার কোথায় উড়িয়া গেল, তাহারই নাম বিপ্লব। ঐ যে আবার ইতালি ও জার্ম্মানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা যথেষ্টাচার শাসনপ্রণালী ও নানাবিধ অত্যাচার কাটাইয়া একত্র হইতেছে ইহাও বিপ্লব। ১৬৪৪ খৃঃ অব্দে ইংরেজেরা যে জেমস্‌কে তাড়াইয়া উইলিয়মকে রাজা করিয়া বিপ্লব বিপ্লব বলেন, সে বাস্তবিক বিপ্লব নহে, সে রাজপরিবর্ত্ত মাত্র। সে সংস্কারও নহে, সে বিপ্লবও নহে। আর ইতিহাসের শ্রাদ্ধ না করিয়া মোটা কথায় একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিই। একটা নূতন বাটীর যদি কোথায় একটু চিড় যায় তাহার মেরামতের নাম সংস্কার। মনে কর, বাড়ীর দুইখান কড়ি বদলাইতে হইল, ছাদে দাগরাজি করিতে হইল সে সকলই সংস্কার; কিন্তু যদি বাড়ীটি চৌচাপটে বসিয়া যায়, কিম্বা এক দিক্ বসিয়া গিয়া মাঝখানে ফাক হইয়া পড়ে, কি অতি প্রাচীন লোণাধরা জরাজীর্ণ হয়, তবে তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়, সেই ভাঙ্গিয়া ফেলার নাম বিপ্লব। ফল কথা এই, খানিক বদলাইতে হইলেই সংস্কার, আর বুনিয়াদ শুদ্ধ বদলাইতে হইলেই বিপ্লব।

সমাজসংস্কার বলিলে বুঝায় যে, সমাজটী যেমন আছে আদত তেমনটিই থাকিবে। আসলে যেন কোন বিঘ্ন না হয়। বিপ্লবে বুঝায় আসলই বদলাইতে হইবে সমাজ যেমনটী ছিল তেমনটী আর না থাকে। সংস্কার করিতে গেলে দেখায় যে কোন্ টুকুতে অনিষ্ট হইতেছে কোন্ টুকু বদলাইতে হইবে। বিপ্লবে

সে টুকু ঠিক করিবার যো নাই। বিপ্লবে ভাল মন্দ এই দুই অনিষ্ট হইতেছে বোধ হয়। কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ ঠিক করিবার উপায় থাকে না। সংস্কারে উদ্দেশ্য ঠিক করিতে পারা যায়, যখন জানা যায় যে, এইটুকু মন্দ, তখন এইটুকু এই উপায়ে বদলাইলেই ভাল হয় তাহাও জানা যায়। কিন্তু বিপ্লবে উদ্দেশ্য ঠিক হয় না, কতটুকু বদলাইতে হইবে, তাহার নিশানা হয় না। এই জন্যই দেখা যায়, সংস্কার স্থলে লোকে বলে আমরা এই চাহি। বিপ্লবস্থলে বলে আমরা এ সব আর চাহি না। রিফরম বিল লইয়া গোলযোগের সময় লোকে বলিল, আমাদের রেপ্রেজেন্টেটিব দিতে হইবে। ফ্রেঞ্চ বিপ্লবে লোকে বলিল আমরা রাজা চাহি না ওমরাহ চাহি না। এইরূপ উদ্দেশ্য স্থির থাকে বলিয়াই দেখা যায়, যে সংস্কারস্থলে রফা রফিয়াৎ চলে। অর্থাৎ প্রথম অনেক চাহিয়া বসিলেও শেষ কতক দিয়া ঠাণ্ডা করা যায়। যেমন রিফরম বিলের সময় লোকে সমস্ত লোকের মত লইয়া মেম্বার পাঠাইতে হইবে চাহিয়া বসিল, শেষ রফা হইল, যাহারা বৎসর ১০ পাউণ্ড খাজানা দেয় তাহারাই পারিবে আর কেহ পারিবে না, কিন্তু বিপ্লবস্থলে প্রথম অল্প পরিবর্ত্তের জন্য আরম্ভ হয়, শেষ সব না বদলাইয়া তৃপ্তি হয় না। ফরাসিরা শাসনপ্রণালী বদলাইবার জন্য আরম্ভ করিয়া শেষ না বদলাইয়াছে এমন জিনিসই নাই। তাপমান যন্ত্রের মাপ করিবার পারা পর্য্যন্ত বদলাইয়াছে। যত রকম ওজন, মাপ ছিল, সব দশমিক অঙ্কে আনিয়া ফেলিয়াছে। এই জন্যই বলিয়াছিলাম—বিপ্লবে উদ্দেশ্য ঠিক করা যায় না বলিয়াই বলিয়াছিলাম যে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়ার নাম বিপ্লব নহে, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলার নাম বিপ্লব। গড়িতে গেলে উদ্দেশ্যটা ভাঙ্গার আগে হইতেই ঠিক থাকা চাহি; বিপ্লবে তাহা একেবারে থাকে না। বিপ্লবে যদি কোন উদ্দেশ্য গোড়া গোড়ি স্থির থাকে তবে সে এই :—

বর্ত্তমান সমাজের দ্বারা আমাদের কাজ চলিতেছে না, ইহাকে ভাঙ্গিয়া মনুষ্যকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন কর, তাহার পর দেখা যাইবে, যদি মনুষ্যসমাজ ভিন্ন থাকিতে না পারে, তখন উপস্থিত মত বিচার করা যাইবে। গড়ার কথা পরে হবে, 'আগে ভাঙ্গ, আগে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হও।

উপরে সংস্কার ও বিপ্লবের যেরূপ বিবরণ দেওয়া হইল, তাহাতে আর একটি মতও দূষিত হইল। অনেকে যে বলেন, "ভাঙ্‌বি ত আগে গড়তে শেখ্‌" আমরা বলি গড়িতে শেখার দরকার নাই। ভাঙ্গিতে পারিলেই হইল। তবে এক কথা এই, সংস্কার সকলে বুঝিতে পারেন এইটুকু মন্দ আছে, বাপু ভাল করিয়া লও। বুদ্ধি যতই মোটা হউক না এটা সবাই বুঝিতে পারে।

কিন্তু বিপ্লব বুঝা কিছু কঠিন। বর্ত্তমান যা আছে সব বদলাইব, কি হইবে জানিতে পারিব না, ইহা বুঝিয়া, এরূপ কার্য্যে সাহসী হইয়া হস্তক্ষেপ করা, সকল মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। আগে ত কেহই বুঝিত না; অষ্টাদশ শতাব্দীর ফিলজফারদিগের কল্যাণে এখন তবু কেহ কেহ বুঝিতেছে। পৃথিবীর সমাজসকল যেরূপে গঠিত তাহাতে লোকের "যা আছে বেশ, এর আর বদল কাজ নাই" এই ভাবই জন্মে। বদলাইতে ত ইচ্ছা করেই না, তবে একটু আধটু বদলাইলে যদি ভাল হয় ক্ষতি নাই। "একেবারে সব বদল, বাপুবে, সে যে বড় ভয়ানক, যা আছে এর কিছু থাক্‌বে না; না তা ত পার্‌ব না," এই ভাবই বেশী, সুতরাং বিপ্লব কেমন করিয়া হইবে। তবে যে দুই একটি বিপ্লব মাঝে মাঝে হইয়া গিয়াছে, মধ্যে মধ্যে সমূল পরিবর্ত্তও হইয়া গিয়াছে তাহার কারণ এই:—তখন লোকে মনে করিয়াছে যে বর্ত্তমান পাপের ভরা, বর্ত্তমান অত্যাচাররাশি আর সহিতে পারি না, এর চেয়ে মরণ ভাল। এ অবস্থা বদলাইলে সুখ হউক আর নাই হউক অত্যাচার কমিবে, অন্ততঃ উহার রূপান্তরও হইবে। এই বলিয়া জীবনাশায় বিসর্জ্জন দিয়া উন্মত্ত হইয়া লাগিয়াছে, একটা প্রলয় হইয়া গিয়াছে। যে সকল বিপ্লব হইয়া গিয়াছে অধিকাংশ পূর্ব্বোক্তরূপ নৈরাশ্যভাব হইতেই হইয়াছে। আর যত বিপ্লব হইয়াছে অধিকাংশ রাজপরিবর্ত্ত, রাষ্ট্রবিপ্লব, অথবা শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্ত! সমাজ পরিবর্ত্ত এক ফ্রান্সে হইয়াছে আর কোথায় হইবে? আমরা যে বিপ্লবের কথা কহি এও সমাজবিপ্লব। সমাজের আত্মন্ত পরীক্ষা করিয়া সমাজসংস্কার আবশ্যক বা বিপ্লব আবশ্যক এরূপ বিচার কোথায় হইয়াছে বলিতে পারি না। সমাজের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বহুদিন আগে এ সমাজ এ ভাবে চলিবে কি না বলিয়া দেওয়া সামান্য সমাজ-তত্ত্ববিদের কার্য্য নহে; কিন্তু ইউরোপে অনেকে ৪০।৫০ বৎসর আগে যে সকল ভবিষ্যৎবাণী করিয়া গিয়াছেন তাহা অনেক সিদ্ধ হইয়াছে এবং বোধ হয় চেষ্টা করিলে আরও স্পষ্টরূপে বলা যাইতে পারে। যাহারা বহুদিন পদ্মায় মাঝিগিরি করিতেছে তাহারা মেঘের আকার, বায়ুর গতি দেখিয়া ৪।৫ ঘণ্টা আগে ঝড় হইবে টের পায়, যদি উদ্ধারের উপায় থাকে করে, আর যদি না থাকে সেই ৪।৫ ঘণ্টা আগেই বলিয়া দেয় "যে যার চেষ্টা কর, রক্ষা হবার নয়।" বিপ্লবের পূর্ব্বেও ঠিক সেইরূপ বলা চাহি। তবে সমাজতত্ত্বশাস্ত্রের প্রকৃত উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে, সমাজনৌকা সময়-স্রোতে বেশ চলিয়া আসিতেছে, ঐ পাহাড়ে, ঐ চড়ায় তাহার বাণচাল হইবে, এই উপায়ে অন্য পথে চালাইতে পারিলে উদ্ধার নচেৎ সর্ব্বনাশ। অথবা "এ সমাজগৃহ অত্যন্ত জরাজীর্ণ, সামান্য বাতাসেই ভূমিসাৎ হইবে, বাতাসে পড়িলে অনেক লোক মারা পড়িবে, কাজ নাই এই বেলা বাতাস না উঠিতে ইহার বিনাশ

সম্পাদন কর।" এই সকল কথা যখন বলিতে পারিবে তখন সমাজতত্ত্বশাস্ত্রের দ্বারা জগতের উপকার হইল বলিয়া স্বীকার করিব।

সমাজের সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার কোথায় কি দোষ আছে এবং সেই দোষের জন্য সংস্কার প্রয়োজন বা বিপ্লব প্রয়োজন বলা সহজ নহে এবং সংস্কার যেখানে প্রয়োজন সেখানে বিপ্লব হইল এবং বিপ্লবস্থলে সংস্কার হইলে জগতে ভয়ানক অনিষ্ট হয়। এবং এ পর্য্যন্ত কত দেশ যে এই দোষে উৎসন্ন গিয়াছে তাহা বলা যায় না। ফরাসীদেশে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে যে ভয়ঙ্কর প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হয় তাহাতে সে একপ্রকার নূতন সমাজের নূতন জগতের সৃষ্টি হইয়াছে বলিতে হইবে। সে নূতন সমাজে বিপ্লব আর প্রয়োজন করে না বোধ হয় কোন বিষয়েই বদল দরকার হয় না, কিন্তু এই ৮৯ বৎসরের মধ্যে সেখানে ৪।৫টী বিপ্লব হইয়া গেল, নূতন সমাজে বিপ্লব হইলে সমাজের শক্তি হ্রাস হয়, তাহা গত প্রুসিয়ার যুদ্ধে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে। যেখানে সংস্কার স্থানে বিপ্লব করা হয়, সেখানে ত এইরূপ, আবার যেখানে বিপ্লবস্থানে সংস্কার হয় সম্পূর্ণ বদল না করিয়া কিছু পরিবর্ত্তে শান্ত থাকা যায়, সেখানে দুর্গতির পরিসীমা থাকে না। সাক্ষী রোম, রোমের ইতিহাস আদ্যন্ত এই মহৎ সত্যের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। রোমের সমাজ একটি নগরের সমাজ, একনগরের শাসন, স্বাচ্ছন্দ্য, সুখসমৃদ্ধির জন্য যা কিছু দরকার রোমে তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। ক্রমে সেই এক নগরীর অদৃষ্টে সমস্ত জগতের আধিপত্য ঘটিল। তখন আর পুরান নগর শাসন প্রণালীতে চলিবে কেন? তখন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত স্বতই প্রয়োজন হইয়া পড়িল। কিন্তু সেটি কেহ বুঝিতে পারিল না। যে সেনেট খ্রীষ্টাব্দের (৪০০) বৎসর পূর্ব্বে সুচারুরূপে রোম শাসন করিয়াছে, সেই সেনেট খৃঃ পূঃ ১৫০ ইউফ্রেটীস হইতে আটলাণ্টিক পর্য্যন্ত শাসন করিতে পারিবে কেন? রোমের পক্ষে ভয়ঙ্কর দিন সুতরাং উপস্থিত হইল। একশত বৎসর ধরিয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, পৃথিবী রক্তস্রোতে প্লাবিত, খুন মারামারি কাটাকাটি অত্যাচার লোমহর্ষণ উৎপীড়ন, নগরদাহ প্রভৃতি পাঠ করিলে শরীর কণ্টকিত হয়। পৃথিবীর অমন দিন যেন আর না হয়। এই সময় একজন লোক কেবল সম্পূর্ণ বিপ্লব করিতে চেষ্টা করেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছিলেন এভাবে আর চলিবে না। সেই লোক কয়াস্ গ্রেকাস্। তাঁহার কথা কেহ শুনিল না। কিন্তু তাঁহার এমনি আশ্চর্য্য গণনা, একশত বৎসরের রক্তস্রোতের পর শেষ তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই দাঁড়াইল। অগষ্টস্ যাহা করিলেন গ্রেকাসও ঠিক তাহাই করিতে চাহিয়াছিলেন। রোমের স্বাধীনতা বিলোপ ও যথেষ্টাচার নামক শাসনপ্রণালী প্রচলন, এই বিপ্লবের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বিপ্লব হইল বটে বিপ্লবে

উপকারও হইল্লা তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রায় তিন বৎসর বিশাল রোমাণ সাম্রাজ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল, অন্ততঃ ভয়ানক অন্তর্বিদ্রোহ হয় নাই। কিন্তু স্বেচ্ছাচারে সমস্ত লোকের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বন্ধ হইয়া গেল, শেষ সেই বিশাল সভ্যসাম্রাজ্য অসভ্য লোকের উৎপীড়নে লণ্ডভণ্ড হইয়া আবার কতশত বৎসর ধরিয়া পৃথিবীশুদ্ধ রক্তস্রোতে আর্দ্র করিতে লাগিল। পরিণামে যাহাই হউক যখন অগষ্টসের সময় বিপ্লব সমাধা হয় তখন সকলেই বলিয়াছিল "আঃ বাঁচিলাম একশত বৎসরের অরাজক ত শেষ হইল, এখন নিশ্বাস ফেলিবার সময় হইল।" ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তে বুঝিতে একটু দেরী হয়, আবার সেই ভাঙ্গা বাড়ীর দৃষ্টান্তে দেখাই, যদি যখন বাড়ীটির একটু দাগরাজি হইলেই চলে, সে সময় তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেল তাহাতে গৃহস্থের অনিষ্ট বই ইষ্ট নাই। আবার যখন বাড়ীটী সম্পূর্ণরূপে জরাজীর্ণ হইয়াছে, যখন একটু বাতাস হইলেই বুনিয়াদ শুদ্ধ নড়ে, যখন লোণা লাগিয়া সব ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, অশ্বত্থগাছের শিকড় যখন তেতালা হইতে নামিয়া মাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সে বাড়ীটি ভাঙ্গিয়া ফেলাই ভাল নয় কি? তাহার যতই মেরামত কর, নিশ্চিন্ত হইয়া সে বাড়ীতে কাহারও বাস করিবার যো নাই। বরং যে গৃহস্থ ভাঙ্গা মন্দিরে নিত্য খোয়া দিতে থাকে, তাহার টাকার বাড় বাঁধে না, হাজার সারাও কখন পড়িবে কখন্ পড়িবে ভয় সর্ব্বদাই করিবে। শেষ একদিন হয় ত পড়িয়া গিয়া সহস্র সহস্র লোকের গোর হইয়া চিরকাল প্রতিবেশীদিগকে ভূতের ভয়ে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। এরূপ বাড়ীর সংস্কার করিলে হয় ত দুপাঁচটি ঘর বাসযোগ্য হইতে পারে, অথবা এখনি পড়িত, না হয় দুবৎসরের জন্য তাহা রক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই দুবৎসরও সর্ব্বদা সশঙ্কিত। আমার মতে তেমন বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলাই ভাল। এই ভাঙ্গা বাড়ীর দৃষ্টান্তটি আমাদের হিন্দুসমাজে বেশ খাটে, হিন্দুসমাজ কতকেলে সমাজ যে তাহার ঠিকানা হয় না। ইহার বুনিয়াদ অতি সঙ্কীর্ণ। মনুর-সংহিতায় দেখিতে পাই ভারতবর্ষ যখন অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তখন তাহারই কোথাও কোথাও প্রকৃত হিন্দু-সমাজ ছিল। যখন এলাহাবাদের এদিকে আর্য্যদিগের নাম ছিল না, যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বই জাতি ছিল না, তখন এই সমাজ ছিল। তাহার পর কত ধর্ম্ম কত বিপ্লব গিয়াছে কত নূতন শাসনপ্রণালী হইয়া গিয়াছে এখন ২০০০ জাতি হইয়াছে। ভারতের অর্দ্ধেক মুসলমান হইয়াছে। ইংরাজেরা সর্ব্বোপরি সর্ব্বশক্তিময়ী ডানা বিস্তার করিয়া সকলকে চাপা দিয়া রাখিয়াছে, হিন্দুসমাজের ঝাঁকটুকু ছাড়া আর কি আছে? এখন কি না আমরা হিন্দুসমাজকে ভারতসমাজের (Indian Nation) সঙ্গে এক

করিয়া ধরি। কি ভুল! এমন হিন্দুসমাজের যত শীঘ্র অস্তিত্ব বিলোপ হয় ততই ভাল।

সমাজ মনুষ্যের জন্য, মানুষ সমাজের জন্য নহে। মানুষ আপনাদের সুখ সমৃদ্ধি স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য সমাজ বলিয়া একটী নূতন সৃষ্টি করে। উচিত যে যেমন মানুষের মনের, শরীরের ও সংসারের অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের ও পরিবর্ত্তন হয়। তাহা হইলেই সমাজের উদ্দেশ্য স্থির থাকে। আরনোল্ড বলেন সমাজেরও বাল্য, শৈশব ও যৌবন আছে, বৃদ্ধাবস্থাও আছে, মৃত্যুও আছে। সমাজেব ক্রমে পরিবর্ত্তন স্বতই হয়; সেই পরিবর্ত্তনটী সমাজস্থ লোকের আয়ত্তমত করিয়া লওয়া বড় দরকার। আপনি পরিবর্ত্তন হইলে এইমত হইবে, এইমত হইলে এই দোষ হইবে, অতএব একে এই দিকে ফিরাও, ওরূপ দোষ ঘটিলে দেশের অনিষ্ট হইবে। এই সকল বিবেচনায় সমাজ চালান পাকা ড্রাইবরের কাজ। কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে মনুষ্য সমাজের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। সমাজ বজায় রাখাই মানুষের কাজ, যে অসুরের অবতার সেই সমাজের পরিবর্ত্তন চাহে। এরূপ ভাবিলে ও তদনুসারে কার্য্য করিলে সমাজেব প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। বরং বিস্তর অপকার হয়। এই কথা কয়েকটী উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে হইবে। প্রথম উদাহরণ রোমাণ জগৎ। রোমসমাজ এক সময়ে সমস্ত জগৎ জয় করিয়া সমস্ত জগৎকে রোমাণ করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু উত্তরদেশীয় অসভ্যদিগের দৌরাত্ম্যে সেই রোমাণ সমাজ লণ্ড ভণ্ড হইয়া গেল। ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে রোমের নাম লোপ হইল। যথেষ্টাচার শাসনপ্রণালীর প্রভাবে ও উৎপীড়নে রোমের যেরূপ নির্জ্জীবাবস্থা হইয়াছিল তাহাতে রোমসমাজবিনাশ জগতের ভাবী উন্নতির সূত্রপাত মাত্র। রোমসাম্রাজ্য ধ্বংস হইল রোমনগব ভস্মসাৎ হইল। রোম সাম্রাজ্য মধ্যে ১০।১২টি প্রবলপরাক্রম স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হইল। নূতন আইন কানুন চলিতে লাগিল কিন্তু লোকে তখন বলিত আমরা রোমাণ সাম্রাজ্যের লোক। ভস্মাবশিষ্ট রোমপুরী তখন তাহাদের মনে মনে রাজধানী রহিল। শেষ রোমক সাম্রাজ্য পুনরুদ্দীপন করা রাজাদিগের একটা উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। কত কাটাকাটি মারামারির পর ৩ বৎসর পরে সারলমেন আবার হোলি রোমান এম্পারার উপাধি লইলেন। নামে রোম হইল, কাজে যে অসভ্য শাসন তাই রহিল, সারলমেন মরিলে আবার Emperor এই উপাধির জন্য ২০০ বৎসর লড়াই ঝগড়া চলিতে লাগিল। শেষ দশম শতাব্দীতে ওথো আপন দেশে Emperor নাম বদ্ধমূল করিয়া গেলেন। ওথোর পরও এই Emperor হবার জন্য কত লোকে কত মারামারি করিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে ফ্রান্সে ও

জার্ম্মনিতে যে সকল যুদ্ধ হয় তাহারও কারণ এই উপাধি। শেষ উপাধি পড়িল ডিউক অব আষ্ট্রীয়ার ঘাড়ে। আষ্ট্রীয়ার রাজ্য ছোট নাম বড়। ডিউক এমপেরর তৃতীয় ফর্দ্দিনান্দের দারিদ্র্য ইউরোপে আজিও হাসির জিনিস্ হইয়া রহিয়াছে। শুদ্ধ নাম লইয়া হইলে না হয় হাসির জিনিস্, একটু হাসিয়াই ছাড়িয়া দিতাম। এই মৃত সাম্রাজ্যের জ্বালায় জার্ম্মনি ও ইটালি কখন একত্রিত হইতে পারে নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া অমন সুখভূমি ইটালি শত শত বৎসর ধরিয়া শ্মশানভূমি হইয়া পড়িয়াছিল। শেষ নেপোলিয়ান ১৮০৬ সালে রোমসাম্রাজ্যের নাম তুলিয়া দিলেন। তাহার ফল দেখ, ইটালি বাঁচিল, জার্ম্মনি বাঁচিল, এই দুইটী দেশ এই ৫০ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর প্রধান দেশ মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

যদি রোম নামের মায়ায় মুগ্ধ না হইয়া ইটালি ও জর্ম্মনি যখন উহাদের সুদিন ছিল, তখন হইতে আপন আপন নামে রাজ্য করিত, যদি একাদশ শতাব্দী হইতে মিলান প্রভৃতি নগবগুলি ও জার্ম্মনি রহান্ধাবা নগরসমবায় সকল স্বাধীনভাবে উন্নতি লাভ করিত তবে কি আর জার্ম্মনি ইটালির দুর্দ্দিন হইত। না ফ্রান্স এত দৌরাত্ম্য করিতে পারিত। সত্য বটে, ভাল জিনিস্ যত্ন করে বেশী দিন রাখিতে চেষ্টা কবা উচিত। রোম সাম্রাজ্যও একটি ভাল জিনিস্। কিন্তু যখন সেই বোম ভাল জিনিস্, যখন রোমধ্বংস হইবে নিশ্চয়, জন কত Antiquarian লাগাইয়া দাও রোমের যা কিছু ভাল ছিল, তাহার একটা রেজিষ্টর হইয়া থাকুক, ভবিষ্যতে লোকে পড়িয়া শিখিতে পারিবে। তাহা না করিয়া যখন সেই ভাল জিনিস্ রক্ষা হইবাব নহে তখন তাহা রক্ষার জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়া অগণ্য প্রাণিসংহার, যখন ধ্বংস হইয়া গেল তখন আবার সেই মৃত বস্তুর ভূত উদ্ধারের বৃথা চেষ্টায় পৃথিবী শোণিতাক্ত করা, ভূত উদ্ধার হইলে সেই ভূত আশ্রিত করিয়া লক্ষ লক্ষ লোককে ১১ শত বৎসর ধরিয়া নানারূপ কষ্ট দেওয়া কি উচিত, না বিবেচনার কাজ? ভাল জিনিস্ ভাল, ভাল জিনিসের স্মৃতি ভাল। ভাল জিনিস্ মন্দ হইলে ভাল নয়। ভাল জিনিস্ কচলাইয়া তিত করিলে ভাল নয়, ভাল জিনিস্ পচাইয়া দুর্গন্ধ করিলেও ভাল নয়। রোম ভাল ছিল কিন্তু রোমের যে ছায়া, ৮০৬ সাল পর্য্যন্ত ইয়ুরোপের মস্তক আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা ভাল ছিল না।

বঙ্গীয় পাঠক ইউরোপীয়দিগের আহম্মকি দেখিয়া হাসিও না। তোমাদের সমাজও ঐরূপ ছায়াবৃত ঐরূপ ভূতাবেশ বই আর কিছু নয়। তোমাদের যে হিন্দুসমাজ, বল দেখি তার কি আছে? হিন্দুসমাজ ছিল যখন বুদ্ধদেব জন্মান নাই। বুদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইল হিন্দুর আর কি রহিল? কিন্তু তোমরা এই ২৫০০

বৎসর কেবল ভূতের বোঝা টানিয়া বেড়াইতেছ বই নয়। বৌদ্ধদের সঙ্গে যত দিন সমান জোরে লড়িয়াছ, ততদিন তোমাদের জীবন ছিল সন্দেহ নাই। তাহার পর যেদিন হইতে মগধসাম্রাজ্য স্থাপন হইল সেই দিন হইতে কি তোমাদের পাততাড়ি গুড়ান উচিত ছিল না? তাহা না করিয়া বলবানের সঙ্গে দুর্ব্বলের বিবাদ হইলে দুর্ব্বলের যত দোষ ঘটে সব তোমাদের ঘটিল, তোমরা ভীরুতা দুষ্টামি ফেরারি শিখিতে লাগিলে। বৌদ্ধেরা ক্রমে ক্ষীণতেজঃ হইয়া আসিলে তোমরা আবার প্রবল হইলে। তখন তোমাদের ঘটে যে বিষয়বুদ্ধি ছিল সেটুকুর লোপ হইয়া গিয়াছে। তোমরা নূতন সমাজ সৃষ্টি না করিয়া সেই সেকেলে বেদ উদ্ধার করিতে গেলে, পৌত্তলিক ও বৈদিকে বিবাদ আরম্ভ হইল। এই বিবাদে তোমাদের সমাজ ক্রমে অন্তঃসারবিহীন হইয়া পড়িল; যেখানে ঐক্যের দরকার সেইখানে ঘরে ঘরে অনৈক্য হইল। শেষ বেদ, স্মৃতি, বুদ্ধ, জৈন, পুতুল, ব্রহ্ম, সব দুরন্ত মুসলমানের হাতে পড়িল। তাহাতেই তোমাদের লজ্জা হইল কই? চৈতন্য হইল কই? সমাজ পরিবর্ত্তনের কটা চেষ্টা করিয়াছ? বলিলে কি না অদৃষ্টের ফল। রোমানেরাও সেকালে বলিয়াছিল অদৃষ্টের ফল। বড় সুবিধা। দুবার বলিলে অদৃষ্টের ফল, দুটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলে—সব—সব দুঃখ ঘুচিয়া গেল, আপনাদের দোষ যে তাহা একবারও ত ভাবিলে না।

যাহা হউক, আমাদের সমাজে সংস্কার কি বিপ্লব আবশ্যক সে কথা তুলিয়া কাজ নাই। আমাদের অদ্যকার প্রস্তাব এই যে, সমাজের কতপ্রকার পরিবর্ত্তন হয়। দেখা গেল যে, সে দুই প্রকার, সংস্কার ও বিপ্লব। দুইএরই সময় আছে কিন্তু সংস্কারের সময় বিপ্লব বা বিপ্লবের সময় সংস্কার হইলে হিতে বিপরীত হয়। তাহার ফল অতি ভয়ানক।

সকল মতেই শ্রীরাগ প্রথম। ইহা সম্পূর্ণ রাগ। ইহার লক্ষণ এই যে—

"শ্রীরাগঃ স চ বিজ্ঞেয়ঃ স ত্রয়েণ বিভূষিতঃ।
পূর্ণঃ সর্ব্বগুণোপেতো মূর্চ্ছনা প্রথমা মতা।
কেচিত্ত কথয়েন্ত্যেনং ঋষভত্রয় সংযুতম্॥"

সত্রয়ে বিভূষিত প্রথম (ষড়্জ) গ্রামের মূর্চ্ছনা। কেহ বলেন ইহা রিত্রয়-যুক্ত।

উদাহরণ—স রি গ ম প ধ নি স।

রাগগুলির উদাহরণস্থলে এক একটি মূর্ত্তি কল্পনা আছে, তাহা এ প্রস্তাবে উল্লেখ করিব না। কাল্পনিক ভাব উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তথাপি পরিদর্শনের নিমিত্ত একটী মাত্র উল্লেখ করিতেছি।

"লীলাবিহারেণ বনান্তরালে
চিন্বন্ প্রসূনানি বধূসহায়ঃ।
বিলাসবেশো ধৃতদিব্যমূর্ত্তিঃ
শ্রীরাগ এষঃ কথিতঃ কবীন্দ্রৈঃ॥"

উদ্যানের মধ্যে, হাব ভাব বিলাসের সহিত, বধূসমভিব্যাহারে, পুষ্পচয়ন করিতেছেন। কবিরা বলেন, এই শ্রীরাগের মূর্ত্তি স্বর্গীয় ও বিলাসোপযোগী বেশ ভূষায় পরিচ্ছন্ন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এক্ষণে রাগ রাগিণীর এরূপ বৃথা বেশ-ভূষার বর্ণনা না করিয়া, যাহা যথার্থ স্বরূপ অর্থাৎ যে যে রাগে বা যে যে রাগিণীতে যে যে সুর আছে, কোনটী ওড়ব কোনটী খাড়ব কোনটাই বা সম্পূর্ণ, তাহাই সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি।

মালব শ্রী—"মালব শ্রীশ্চ রাগস্যাপূর্ণা স ত্রয় ভূষিতা।
মূর্চ্ছেনোত্তর মন্দ্রাস্যা রুদ্রার রসমণ্ডিতা॥"

উদাহরণ—স রি গ ম প ধ নি স।

ত্রিবণী—রি ও প বর্জ্জিত। ওড়ব রাগ।

উদাহরণ—ধ নি স গ ম ধ।

ধৈবতে আরম্ভ ধৈবতে সমাপ্তি। যথা—

"ত্রিবেণী সাচ বিজ্ঞেয়া গ্রহাংশ ন্যাস ধৈবতা।
ঔড়বা সাচ বিজ্ঞেয়া রিপহীনা প্রকীর্ত্তিতা॥"

গৌরী—ওড়ব, রি প বর্জ্জিত, আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর ষড়জে।

উদাহরণ—স গ ম ধ নি স।

যথা—

ষড়্জগ্রহাংশক ন্যাসা রিপহীনা তু ঔড়বা।
মূর্চ্ছনা প্রথমা জ্ঞেয়া গৌরী সা কথিতা বুধৈঃ॥

কেদারী—ওড়ব, রি ধ বর্জ্জিত, তিন নি যুক্ত, মার্গী মূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর স, উদাহরণ—(স গ ম প নি স)।

প্রমাণ—কেদারী রিধহীনান্যাদৌড়বা পরিকীর্ত্তিতা।
নিত্রয়ামূর্চ্ছনামার্গী কাকলী স্বরমণ্ডিতা॥

মধুমাধবী—ওড়ব, গ ধ হীন, প্রথম মূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর স।

উদাহরণ—(স রি ম প নি স)

প্রমাণ—ষড়্জাংশক গ্রহন্যাসা গধহীনাতু মাধবী।
প্রথমা মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া ঔড়বা পরিকীর্ত্তিতা॥

পাহাড়ী—ওড়ব, রাগ রি প বর্জ্জিত, (তৈলঙ্গ দেশের) আরম্ভ ও সমাপ্ত স্বর স।

উদাহরণ—(স গ ম ধ নি স)

প্রমাণ—ষড়্জত্রয়া পাহাড়ী স্যাৎ রিপহীনা চ কীর্ত্তিতা।
ছায়া তৈলঙ্গদেশীয়া আলাপে ঔড়বা মতা॥

বসন্ত—ষড়্জ ও মধ্যম হইতেই ইহার উত্থান সুতরাং ষড়্জ স্বরই ইহার গ্রহ, ন্যাস ও অংশ। এই সম্পূর্ণ রাগটি বসন্তকালে গেয়।

প্রমাণ—ষড়্জামধ্যমিকাজ্জাতঃ ষড়্জ ন্যাস গ্রহাংশকঃ।
গেয়ো বসন্তরাগোহয়ং বসন্তসময়ে বুধৈঃ॥

তোড়ী—সম্পূর্ণ রাগ, মধ্যমে আরম্ভ মধ্যমেই সমাপ্তি, মতান্তরে আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর স। সৌবীরী মূর্চ্ছনা।

উদাহরণ—(ম প ধ নি স রি গ ম। কিম্বা স রি গ ম প ধ নি স)

প্রমাণ—মধ্যমাংশ গ্রহন্যাসা সৌবেরী মূর্চ্ছনা মতা।
সম্পূর্ণা কথিতা তজ্জ্ঞৈস্তোড়ী শ্রীকৌশিকে মতা।
গ্রহাংশন্যাস ষড়্‌জা চ কৈশ্চিদত্র প্রচক্ষতে।

ললিতা—ওড়ব, কোনমতে সম্পূর্ণ রাগ। রি প বর্জ্জিত, শুদ্ধমধ্য মূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর স।

উদাহরণ—(স গ ম ধ নি স)

প্রমাণ—রিপহীনাচ ললিতা ঔডবা সত্রয়া মতা।
মূর্চ্ছনা শুদ্ধমধ্যা স্যাৎ সম্পূর্ণা" কেচিদূচিরে॥

হিন্দোলী—ওড়ব, রি ধ বর্জ্জিত, ৩ স, যুক্ত, শুদ্ধমধ্য মূর্চ্ছনা, আরম্ভ সমা-স্বর স। (স গ ম প নি স স)

প্রমাণ—হিন্দোলিকা রিধত্যক্তা স ত্রয়া গদিতা বুধৈঃ।
মূর্চ্ছনা শুদ্ধমধ্যাচ ঔড়বা কাকলিযুতা।

ভৈরব—ওড়ব, রি প বর্জ্জিত, ধৈবতাদি মূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর ধ, অন্তে ম, বিকৃত ধ।

উদাহরণ—(ধ নি স গ ম ধ)

প্রমাণ—ধৈবতাংশ গ্রহন্যাসো রিপহীনোহধমাস্তগঃ।
ঔড়বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ধৈবতাদিক মূর্চ্ছনা।
ধৈবতো বিকৃতো যত্র ভৈরবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

ইহার উদাহরণস্থলে এইরূপ মূর্ত্তি লিখিত আছে, যথা—

"গঙ্গাধরঃ শশিকলাতিলক স্ত্রিনেত্রঃ সর্পৈর্বিভূষিততনুর্গজকৃত্তিবাসাঃ।"
ভাস্বত্রিশূলকর এষ নৃমুণ্ডধারী শুভ্রাম্বরো জয়তি ভৈরব রাগরাজঃ॥

হনুমন্মতেও ইহা ওড়ব রাগ। যথা—

ধৈবতাংশগ্রহ ন্যাসো রিপহীনস্তমাগতঃ।
ভৈরবঃ সতু বিজ্ঞেয়ো ধৈবতাদিক মূর্চ্ছনা।
ধৈবতো বিকৃতো যত্র ঔড়বঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥*

*ভৈরব রাগ সম্পূর্ণ বলিয়া প্রচলিত, ইহার কল সম্পূর্ণ, তদনুসারে গীত হইয়া থাকে সত্য কিন্তু উপরের লিখিত বচনে ইহাকে স্পষ্টতঃ ওড়ব বলা হইয়াছে।

ভৈরবী—সম্পূর্ণ, সৌবীরী মূর্চ্ছনা, মধ্যম গ্রাম ইহার গতি, আরম্ভ ও শেষ ম।

উদাহরণ—(স রি গ ম প ধ নি)

প্রমাণ—সম্পূর্ণা ভৈরবীজ্ঞেয়া গ্রহাংশ ন্যাস মধ্যমা।
সৌবীরি মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া মধ্যম গ্রামচারিণী।

দেশী—ইহাতে পঞ্চম বর্জ্জিত, রি ত্রয় যুক্ত, বিকৃত রি, কপোল লতিকা নামক মূর্চ্ছনা। এটী ষাড়ব রাগ।

উদাহরণ—(রি গ ম ধ নি স রি রি)

প্রমাণ—দেশী পঞ্চমনামা স্যাৎ ঋষভ ত্রয় সংযুতা।
কপোললতিকা জ্ঞেয়া মূর্চ্ছনা বিকৃতর্ষভা॥

বাঙ্গালী—ওড়ব, মতান্তরে পূর্ণা। রি ধ বর্জ্জিত, গ্রহাংশ ন্যাস স্বর স, প্রথম মূর্চ্ছনা।

উদাহরণ—(স গ ম প নি স)

প্রমাণ—বাঙ্গালী ঔড়বা জ্ঞেয়া গ্রহাংশ ন্যাস ষড়্জভাক্।
রিধহীনাচ বিজ্ঞেয়া মূর্চ্ছনা প্রথমা মতা।
পূর্ণা বা মন্দ্রয়োপেতা কল্লিনাথেন ভাষিত॥

কল্লিনাথ মতে ইহা সম্পূর্ণ, ৩ ম যুক্ত। আরম্ভ ও শেষ ম।

উদাহরণ—(ম ধ নি স রি গ ম)

দেবগিরি—ইহাতে সারঙ্গীর তুল্য স্বর। যথা—

"দেবগির্য্যাঃ স্বরাঃ প্রোক্তাঃ সারঙ্গী সদৃশা মতাঃ।

সৈন্ধবী—পূর্ণ, কোন মতে খাড়ব, রি বর্জ্জিত, স রি গ ম প ধ নি স।

মতান্তরে—স গ ম প ধ নি স।

প্রমাণ—ষড়্জগ্রহাংশ ন্যাসা পূর্ণা সৈন্ধবিকা মতা।
মূর্চ্ছনোত্তরমন্দ্রাঢ্যা কৈশ্চিৎ ষাড়বিকা মতা॥

রামকিরী—সম্পূর্ণ, ১ প্রহর মধ্যে গেয়, আরম্ভ ও সমাপ্ত স্বর স, প্রথম মূর্চ্ছনা।

উদাহরণ—(স রি গ ম প ধ নি স)

প্রমাণ—প্রহরাভ্যন্তরে গেয়া ষড়্জন্যাস গ্রহাংশকা।
প্রথমা মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া তজ্জ্ঞৈ রামকিরী মতা।

গুর্জ্জরী—সম্পূর্ণা, আরম্ভাদি রি, সপ্তম মূর্চ্ছনা, বহুলীর সহিত মিশ্রিত।

উদাহরণ—রি গ ম প ধ নি স রি।

প্রমাণ—গ্রহাংশন্যাস ঋষভা সম্পূর্ণ গুর্জ্জরী মতা।
সপ্তমী মূর্চ্ছনা তস্যাং বহুল্যাসহ মিশ্রিতা॥

গুণকিরী—ওড়ব, রি ধ বর্জ্জিত, আরম্ভাদি নি, কোন মতে স, ইহা ভৈরবের আশ্রিত।

উদাহরণ—নি প গ ম প নি, মতান্তরে স গ ম প নি স।

প্রমাণ—রিধহীনা গুণকিরী ঔড়বা পরিকীর্ত্তিতা।
নি গ্রহাংশা তু নি ন্যাসা কৈশ্চিৎষড়্জত্রয়া মতা।

পঞ্চম—ইহা খাড়ব, প বর্জ্জিত, প্রথম মূর্চ্ছনা, আরম্ভাদি স, মতান্তরে পূর্ণ। ইহা শৃঙ্গার রসের উত্তেজক।

উদাহরণ—স রি গ ম প ধ নি স। মতান্তরে স রি গ ম প ধ নি স।

প্রমাণ—রাগপঞ্চমকো জ্ঞেয়ঃ প-হীনঃ খাড়বো মতঃ।
প্রথম মূর্চ্ছনা যত্র স-ত্রয়েণ বিভূষিতঃ।
কোচিদ্বদন্তি সম্পূর্ণং শৃঙ্গার রস পূরকম্॥

বিভাষ—ইহা ললিতার ন্যায়, স গ ম ধ নি স।

প্রমাণ—ললিতাবদ্বিভাষা তু রেবা গুর্জ্জরিবৎ সদা।

ভূপালী—সম্পূর্ণ, মতান্তরে ওড়ব, রি প বর্জ্জিত, শান্তি রসের উত্তেজক, প্রথম মূর্চ্ছনা, আরম্ভ শেষ স্বর স।

উদাহরণ—স রি গ ম প ধ নি স। মতান্তরে স গ ম ধ নি স।

প্রমাণ—গ্রহাংশন্যাস ষড়্জা সা ভূপালী কথিতা বুধৈঃ।
প্রথমা মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া সম্পূর্ণা রসশান্তিকে।
রিপ হিনৌড়বা কৈশ্চি দিয়মেব প্রকীর্ত্তিতা।

কর্ণাটী—সম্পূর্ণ, ইহাতে বিকৃত নি, মার্গ নামক মূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও শেষ স্বর নি।

উদাহরণ—নি স রি গ ম প ধ নি নি।

প্রমাণ—নিষাদত্রয়সংযুক্তা বিকৃতোঽস্যা নিষাদকঃ।
মার্গাখ্যা মূর্চ্ছনা প্রোক্তা কর্ণাটী চ সুখপ্রদা॥

বড়হংসিকা—ইহাতে কর্ণাটীকার ন্যায় স্বর, কেবল মূর্চ্ছনা ভিন্ন।

উদাহরণ—নি স রি গ ম প ধ নি নি।

প্রমাণ—কর্ণাটীকাস্বরা জ্ঞেয়া বড়হংসা স্বরা বুধৈঃ।

মালবী—ওড়ব, নিষাদে আরম্ভ ও শেষ, রঞ্জনী মূর্চ্ছনা, রি প বর্জ্জিত।

উদাহরণ—নি স গ ম ধ নি নি।

প্রমাণ—ঔড়বা মালবী প্রোক্তা নিষাদত্রয়সংযুতা।
রঞ্জনী মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া রি প হীনা চ সর্ব্বদা।

পটমঞ্জরী—সম্পূর্ণ, গ্রহ অংশ ও ন্যাস স্বর পঞ্চম, হৃষ্টকা নামক মূর্চ্ছনা, ইহা রসিকদিগের প্রিয়।

উদাহরণ—প ধ নি স রি গ ম প।

প্রমাণ—পঞ্চমাংশ গ্রহন্যাসা সম্পূর্ণা পটমঞ্জরী।
মূর্চ্ছনা হৃষ্টকা জ্ঞেয়া রসিকৈঃ প্রার্থিতা সদা।

ইত্যাদি ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন মেঘ, মল্লারী, সৌরাটী, সাবেরী, বা সৌবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী, হরশৃঙ্গাব, এই কয়েকটি রাগ পব পর লিখিত আছে।

তৎপরে নট্টনারায়ণ, কামোদী, কাল্যাণী আভিবী নাটিকা, সারঙ্গ, হাম্বীরা, এই কয়টি নির্দ্দিষ্ট আছে। এ সমস্তই প্রাচীন রাগ বাগিণী।

শ্রীরামদাস সেন।

পুরুষোত্তম—সন্ধ্যা—সমুদ্রতীর

১

এ জীবন ফিরিবে না আর !
কালের তরঙ্গে সখে,
যে রত্ন ভাসিয়া গেল,
গেল চির দিন তরে, ফিরিবে না আর !
হায় রে জীবন নদী, এক স্রোত প্রবাহিনী,
চলিয়াছে এক স্রোতে উজান বহে না আর !

২

যা যায় তা যায় সখে, বড়ই মধুর ।
কৈশোরে শৈশব যেন,
নবীন স্বরগ শোভা ;
যৌবনে কৈশোর শোভা,
মরি কিবা মনোলোভা ।
সেই খেলা সেই হাসি,
বিমল আনন্দরাশি,
সে পবিত্র জগতের,—মরি কি সুন্দর !
সে বিশ্বাস, ভালবাসা, তরল অন্তর ।

৩

যৌবন সঞ্চারে সেই পবিত্র জগতে,
কত রূপান্তর !
বিশ্বাসে সন্দেহ আসে,
ভালবাসা স্বার্থে গ্রাসে,
তরল অন্তর হয় কঠিন প্রস্তর ।
কৈশোরের সরলতা,
নিরমল জ্যোৎস্নায়,
কুটিল করাল ছায়া ক্রমশঃ মিশিয়া যায় ।

৪

যদি না মিশিল,
তুমি অভাগা মানব, তোমার জীবন,
সংসার সাগর বক্ষে,
কর্ণধার হীন তরী,
প্রত্যেক তরঙ্গ ক্রীড়া
পরিণাম নিমগন ।

৫

বন্ধুত্বে বিপদ তব, প্রণয়ে নিরাশ,
ভীষ্মশরশয্যা তব সংসার নিবাস ।
সকলি মায়ার খেলা,—
আজি যথা হাসি রাশি,
কালি তথা দাবানল,
আজি যাহা সুধাময়,
কালি তাহা হলাহল ।
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে কর পর উপকার,
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত পাবে প্রতিদান তার ।

৬

এ সিন্ধু সৈকতে, সান্ধ্য গগন ছায়ায়,
বসি তব পাশে সখে উচ্ছ্বসিত প্রাণে ;
খুলিয়া হৃদয় দ্বার,
দেখায়েছি কত বার,
কত শত তীক্ষ্ণ অসি, কৃতঘ্নতা করে,
সহিয়াছি অকাতরে কোমল অন্তরে ।

৭

একদা প্রভাতে সখে, মেলিয়া নয়ন,
সিন্ধু প্রান্তে সুসজ্জিত জলদমালায়,
দেখিলাম জন্মভূমি প্রতিমূর্ত্তি প্রায়।
তেমনি শ্যামল শোভা মণ্ডিত শেখর,
স্থানে স্থানে সমুন্নত, অতীব সুন্দর,
রহিয়াছে স্থির ভাবে প্রবাহ খেলিয়া,
ঊর্ম্মির উপরে যেন ঊর্ম্মি সাজাইয়া।
নিম্নস্তরে সাগরোর্ম্মি সুনীল বরণ,
ঊর্দ্ধ স্তরে শেখরোর্ম্মি শ্যাম সুদর্শন।
ভরিল হৃদয়, ধীরে ভিজিল নয়ন,
জননীপ্রতিম মূর্ত্তি করি দরশন।
দূর হতে প্রণমিয়া কহিলাম ধীরে,
"জন্মভূমি! কেন মাতা দেখা দিলে ফিরে?
হৃদয়ের রক্তে অঙ্গ আসিয়ু মাখিয়া,
বালার্ক রক্তিম করে তাহা অভিনিয়া
আসিলে কি দেখাইতে? পরীক্ষিতে আর
এখনো বহিছে কি না শোণিতের ধার,
হৃদয় হইতে বেগে? বহিছে, বহিবে,
যত দিন শেষ বিন্দু হৃদয়ে রহিবে।
রক্ষিতে পরের প্রাণ, আপনার প্রাণ
এখনো অর্পিতে পারি তৃণের সমান।
যারা গৌরাঙ্গের কৃপা কটাক্ষের তরে,
বিশ্বাস, বন্ধুতা, সব বিনিময় করে,
বলিও তাদেরে, মাতা, বলিও নিশ্চয়,
এখনো বিপদে তুচ্ছ, নির্ভয় হৃদয়।
উচ্চতর রক্তস্রোত ধমনীতে ধরি,
নীচত্বের মস্তকেতে পদাঘাত করি।"

৮

জানি তুমি বলিতেছ, ভাবিতেছ মনে—
"নাহিক সংসার জ্ঞান, উন্মত্ত যুবক।"
　　না চাহি সংসার জ্ঞান,
　　সেই বিজ্ঞতার ভাণ,
আমাদের সুশিক্ষায় সেই বিষফল,
বদন মাধুরীপূর্ণ, অন্তর গরল।

৯

দাসত্ব চক্রের দীর্ঘ দৃঢ় নিষ্পেষণে
উচ্চ আশা আমাদের হৃদয় হইতে
　　হইয়াছে তিরোধান;
　　হীনতম স্বার্থ জ্ঞান,
জন্মিয়াছে সেই স্থলে—স্বজাতি, স্বদেশ,
আমাদের উপকথা প্রলাপ বিশেষ।

১০

বর্ত্তমান সভ্যতার স্বার্থই ঈশ্বর,
স্বার্থবাদী আমরা সে দেবতার দাস,
　　প্রাচীনের সরলতা,
　　তরল সহৃদয়তা,
পাশ্চাত্য সভ্যতা স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া।
　　কাঁদি, হাসি, যাহা করি,
　　দয়া, ধর্ম্ম, দান, —হরি!—
সকলই আমাদের স্বার্থে সপক্কিল,
যবনিকা অন্তরালে করিলে দর্শন
হরি! হরি! সকলই স্বার্থের সৃজন।

১১

এমন সংসার জ্ঞানে নাহি প্রয়োজন,
সমাজের চরণেতে সহস্র প্রণাম।
　　একাকী এ সিন্ধু তীরে,
　　নিরখি কালিন্দীনীরে
সলিলের মহাক্রীড়া,—নিরাশ জীবন
নীরবে নির্জ্জনে যেন হয় নির্ব্বাপণ।

১২

কি সুখ!—দুজনে বসি প্রদোষ সময়ে
গলায় গলায় এই সমুদ্র বেলায়।
　　সকলি তরঙ্গময়,
　　সর্ব্বত্র প্রবাহ বহে,
সমুদ্র,—সমীর,—এই যুগল হৃদয়।
　　তরঙ্গে তরঙ্গে আসি,
　　শ্বেত পুষ্পমালারাশি,
ঢালিছে সৈকতে সিন্ধু; সান্ধ্য সমীরণ
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ করিছে ব্যজন।

১৩

তরঙ্গে তরঙ্গে দুই উন্মত্ত হৃদয়,
আলিঙ্গিছে পরস্পরে তরঙ্গের মত ;
কখনো তরঙ্গ মত,
হইতেছে পরিণত,
একত্রে একই ভাবে হতেছে বিলীন,
সে আনন্দ—মহানন্দ !—অনন্ত অসীম !

১৪

সর্ব্বরী যেমতি সখে একে, একে, একে,
দেখাইত তারারাজি আকাশের পটে,
তেমতি হৃদয় খুলি,
স্মৃতির তরঙ্গ তুলি,
দেখাতেম কক্ষ কক্ষ, সুখ দুঃখাধারে ,
ফুরাইল, এ জীবন ফিরিবে না আর !

১৫

তুমি ত চলিলে ভাই, কালি সন্ধ্যা যবে
আসিবে ঢাকিতে সিন্ধু সৈকত সুন্দর,
একটি হৃদয় পড়ি
যাইতেছে গড়াগড়ি,
দেখিবে সৈকত ভূমে, শত ক্ষতে তার
বহিছে শোণিত ধার নির্ঝর আকার।

১৬

তুমি ত চলিলে,
যে তরঙ্গে নিক্ষেপিল সৈকতে দুজনে,
নাহি জানি সে তরঙ্গে মিলিবে কি আর ?
আবার দুজনে বসি গলায় গলায়
গাঁথিব সরল প্রাণে বন্ধুতার হার ?
হৃদয়ে রাখিব আশা,
রাখিব এ ভালবাসা,
মিশিয়াছে উভয়ের তরল হৃদয়,
উভয়ে উভয় অংশ রহিবে নিশ্চয়।

১৭

মিলি কি না মিলি, থাক যে ভাবে যথায়
সুখ শান্তি হক তব ছায়ার মতন,
ওই ঊর্দ্ধে সুদর্শন,
পবিত্রতা নিদর্শন,
প্রসারুন পুণ্য ছায়া , হউক তোমার
স্নেহের পুতুলে পূর্ণ সুখের আগার !
এ দিঃক ক্ষীরোদ বর,
তুলিয়া অসংখ্য কর,
করিছেন আশীর্ব্বাদ—করুন বিহার।
ক্ষীরোদবাসিনী নিত্য গৃহেতে তোমার
করিব এ অভিলাষ,
করি প্রণয়ের দাস,
তাঁর প্রেমে চিত্ত তব হউক অচল,
অহো !
সংসার মরুতে প্রেম নির্ঝরিণী জল।

শ্রীনঃ।
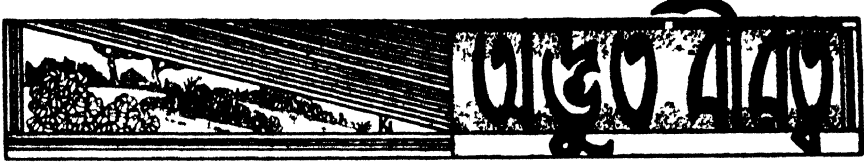
এখন লোকের দেশহিতৈষিতা বড় প্রবল হইয়াছে। পুরাণ পুঁথি, খোদা পাথর, তাম্রশাসন পড়িয়া আমাদেব পুরাণ গৌরবের কথা অনেকেই আন্দোলন করিয়া থাকেন। সেকালে আমাদের সোণার অট্টালিকা ছিল বলিয়া গুজব করিয়া বেড়ান কাপুরুষের কাজ, এ কথাটী কেহ বুঝেন না। আবার অনেকে গুমর করেন যে, সেকেলে বাঙ্গালিরা বড় লড়াই-মজবুত ছিল। রাজা নবকৃষ্ণ লড়াই করিতে করিতে উড়িষ্যা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এ কথা প্রমাণ করাইবার জন্য দিনকত অনেক চেষ্টা হয়। কিন্তু বাঙ্গালির লড়াইয়ে বিদ্যা কেমন ছিল, একবার দেখান উচিত। দেখাইতে হইলে উদাহরণ চাহি, উদাহরণ রায় দুর্লভরাম।

রাজা দুর্লভরাম বাজা জানকীরামেব পুত্র। রাজা জানকীরাম সুবে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ান। তখন আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালার সুবেদার, দুর্লভরাম উড়িষ্যায় নায়েব দেওয়ান হইলেন। যে আফগান সেনাপতির হস্তে উড়িষ্যার নবাবী ছিল, সে রাজবিদ্রোহী হওয়ায়, এবং অন্য লোক উপস্থিত না থাকায় উড়িষ্যার নবাবী দুর্লভরামের হাতেই পড়িল। যুদ্ধ শেষ হইলে আলিবর্দ্দি রাজা জানকীরামের অনুরোধে তদীয় পুত্র দুর্লভবামকে উড়িষ্যার কায়েমী নবাব করিয়া দিলেন। আতাউল্লা খাঁ তাঁহার অধীন প্রধান সেনাপতি হইলেন। এই সময়ে মহারাট্টাদিগের বড়ই উপদ্রব। কিন্তু উহারা বড় চতুর, উড়িষ্যা উহাদিগের পথ। উড়িষ্যায় কোনরূপ গোলযোগ না ঘটিলে স্বচ্ছন্দে হুগলি চন্দননগর কাটোয়া এমন কি মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত লুঠ করা যায়। দুর্লভরামকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য উহারা সন্ন্যাসী পাঠাইতে লাগিল। সন্ন্যাসীরা বলে মহারাট্টারা আর আসিতেছে না, আমরা এই নাগপুর হইয়া আসিতেছি। আর নানারকম পূজা অর্চ্চা যোগ ধ্যান ইত্যাদিতে উহাকে অন্যমনস্ক করিয়া রাখে। এদিকে বর্ষাকাল কাটিয়া গেল। আতাউল্লা খাঁ নিত্য সংবাদ আনিতে লাগিল যে, মহারাট্টারা সসৈন্যে

অগ্রসর হইতেছে। যত নিকট আসে, তিনি ততই দুর্লভরামকে উহাদিগকে তাড়াইবার উপায় করিতে বলেন। দুর্লভরাম সন্ন্যাসীদের কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া বলেন যে, তাহারা আজিও নাগপুর ছাড়ে নাই।

শেষ একদিন সকালে কটকের এক পাশে মহাগোলযোগ উঠিল, চারিদিকে লুঠপাট খুন হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে, বর্গী আসিয়া পড়িয়াছে, আতাউল্লা সংবাদ পাইয়াই শশব্যস্তে দুর্লভরামের দ্বারদেশে উপস্থিত। নবাবের হুকুম ব্যতীত সেনানী কাজ করে কেমন করিয়া? বেলা নয়টা, তখনও নবাবের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। আতাউল্লা যত বেলা হইতে লাগিল ক্রমেই ব্যাকুল হইতে লাগিল, প্রায় ঘণ্টাখানেকের পর, মহাবাট্রা যে দিকে পড়িয়াছিল, সেইদিকে ঘর সব জ্বালাইয়া দিতে লাগিল। তখন প্রজাবৃন্দের দারুণ আর্ত্তনাদে দুর্লভরামের নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগিয়াই শুনিলেন বর্গী কটকের উপব পড়িয়াছে। দুর্লভ-রামের আর কাপড় পরা নাই। সেই রাত্রিবাসের পাঁচহাতি ধুতিতে বিশাল উদর কিঞ্চিৎ আবৃত করতঃ দৌড়। একে সুখীলোক, দারুণ মোটা, তাহাতে প্রাণ ভয়ে দৌড়। দৌড়িয়া যাবেন কোথায়? কটকের কেল্লায়। সেখান হইতে আধ ক্রোশ দূরে। বাড়ী হইতে গজেন্দ্র লম্বোদর দুলাইতে দুলাইতে ছুটিতেছেন; পা উঠে উঠে উঠিতেছে না, বাহির হন এমন সময় আতাউল্লা খাঁ তাঁহাকে ধরিল। নবাব ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন ভাবিলেন বুঝি বর্গীতে ধরিল। অনেকক্ষণের পর আতাউল্লার গভীব অথচ ধীব স্বরে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি শুনিলেন সেনাপতি বলিতেছেন আমায় শীঘ্র হুকুমনামা দিন, আমি সসৈন্যে উহাদিগকে সহরের বাহির করিয়া দিয়া আসি। দুর্লভরাম দাঁড়াইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। বলিলেন সে সব কেল্লায় গিয়া দেওয়া যাইবে। আতউল্লা বেশী জোর করায় নবাব ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন সেনাপতি আর চেষ্টা বৃথা বুঝিয়া বলিলেন, "আচ্ছা একটু দাঁড়ান না হয় পাল্কী আনাইয়া দিই।" নবাব বলিলেন, "আর পাল্কীতে কাজ নাই দেরি হবে।" বলিয়াই দ্রুতপদে কেল্লার দিকে ছুটিলেন। একে নবাব তাতে রাজা জানকীরামের পুত্র, আতাউল্লা শীঘ্র পাল্কী আনাইয়া খানিক দূর গিয়া উঁহাকে ধরিলেন, ধরিয়া পাল্কীতে পুরিয়া কেল্লায় পাঠাইয়া দিলেন।

কেল্লায় গিয়াই নবাবের রোখ। যত সৈন্য ছিল শীঘ্র সজ্জিত হইতে হুকুম দেওয়া হইল। আতাউল্লাকে উপর কটক হইতে বর্গী তাড়াইয়া দিবার হুকুম জারি করা হইল। কেল্লার কোথায় ভাঙ্গা আছে সারাইবার একটু একটু চেষ্টা করা হইল। কিন্তু তখন কটকের অর্দ্ধেক বর্গীর দখল হইয়া গিয়াছে। আতাউল্লাখাঁ অনেক চেষ্টা করিয়া সমস্ত দিনের পরিশ্রম, যুদ্ধ, রক্তারক্তির পর সসৈন্যে পিছু

হঠিয়া দুর্গের দিকে পড়িলেন। রাত্রিতে দুর্গের চারিদিকে মহারাট্টা সেনা স্থাপিত হইল, নবাবের যে সাহসটুকু হইয়াছিল রাত্রে সেটুকু তিরোহিত হইল; ৮।১০ ক্রোশ দূরে আলিবর্দ্দি এক দল সেনা বর্গীর হ্যাঙ্গামের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। আতাউল্লা বলিলেন, সেই সৈন্যদিগকে খবর দিয়া আনয়ন করা হউক; উহারা আসিলে দুর্গ রক্ষার উপায় হইবে। নবাব বলিলেন যদি এই দণ্ডে মহারাট্টা জোর করিয়া গড় দখল করে, তখন তোমার খবর দেওয়া কোথায় থাকিবে? আমার হুকুম—এই দণ্ডে মহারাট্টাদিগকে কেল্লা ছাড়িয়া দাও, এই মাত্র নিয়ম কর যে আমরা নিষ্কণ্টকে দেশে যাইতে পারি। ধূর্ত্ত বর্গী সেই কথায় দুর্গ দখল পাইল, পাইয়াই সর্ব্ব প্রথমে দুর্ল্লভরামকে বন্দী করিল। কিন্তু বীর আতাউল্লা দুর্গের যে ভাগে ছিলেন, সেই ভাগ দুই তিন মাস পর্য্যন্ত বর্গীদের সকল আক্রমণ সহ্য করিয়াছিল। শুনিয়াছি দুর্ল্লভরামকে উদ্ধার করিবার জন্য আলিবর্দ্দি খাঁর তিনটী লক্ষ টাকা দিতে হইয়াছিল।

এই এক বাঙ্গালির বীরত্ব। বাঙ্গালার অর্দ্ধ স্বাধীন অবস্থায় দুই জন হিন্দু নবাব হইয়াছিল—এক রামনারায়ণ আব এক দুর্ল্লভবাম। তাহার মধ্যে দুর্ল্লভরাম অপূর্ব্বকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সেবাব দুর্ল্লভরামেব অনবধানতা বশতঃ বর্গীদিগের দূর করিতে আলিবর্দ্দিকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। উহাবা কাটোয়া পর্য্যন্ত লুঠ করিয়াছিল।

আমাদেব কত পুরুষ যে দুর্ল্লভরাম আছেন তাহাব ঠিকানা নাই। আমাদের বীরত্ব পুরুষানুক্রমিক।

নিশীথ-চিন্তা। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত। অতি ঘোর অন্ধকার নিশীথ বর্ণনা লইয়া গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে :—

"গভীর নিশীথ ;—বিশ্ব অন্ধকার ময় !
যতদূর চলে দৃষ্টি, তমসে সকল
গাঢ়রূপে আবরিত, দৃষ্টি নাহি হয়
ছিহস্তে দূরের বস্তু ;—তমস কেবল।
দিবসে যে প্রতি অঙ্গে লোমকূপ যত
গণনা করেছি, এবে বিশেষ যতনে
গণিবারে প্রাণপণে—যত্ন করি কত,
তবুও না পারি—ধাঁধা লাগিছে নয়নে।"

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া আমরা বুঝিয়া লইলাম যে, যখন "তমসে সকল গাঢ়রূপে আবরিত" হয়, তখন লোমকূপ গণা যায় না ; প্রাণপণে বিশেষ যত্ন করিলেও গণা যায় না। আর, অন্ধকার অতি গাঢ় কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত লোকে লোমকূপ তল্লাস করে, যদি দেখে লোমকূপ গণা গেল না, তাহা হইলেই তাহারা বুঝে যে অন্ধকার বড় গাঢ়, বড় ঘোর। অতএব যদি কেহ কবি হইয়া ঘোর অন্ধকার বর্ণন করিতে চাহেন, তাহা হইলে যেন লোমকূপ গণনার কথা ভুলিবেন না। এই কাব্যের প্রথমাংশ যেরূপ অপাঠ্য পরে তত নহে। স্থানে স্থানে কবিত্ব আছে। রাজকৃষ্ণ বাবুর অনেক কবিতা আমরা পাঠ করিয়াছি, বঙ্গদর্শনে তাঁহার প্রশংসাও করিয়াছি।

মানস-কুসুম। পদ্যগ্রন্থ। শ্রীকেশব চন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত মূল্য আট আনা মাত্র।

গ্রন্থারম্ভে কল্পনাকে উদ্দেশ করিয়া কবি বলিতেছেন :—

"যা'র বলে কত শত কবি চিরতরে
অমরতা লভিয়াছে এ ভবমণ্ডলে ;—
ভারতীয় বরপুত্র, যাহে, কালিদাস
কবি-কুল-পিকবলি বিখ্যাত ভুবনে।
যাহার সহায়ে মধু, মধুর গুঞ্জনে,
রচেছিলা মধুচক্র • •
আজি আমি সেই কৃপাবলে নাহি ডরি,
কারে ত্রিভুবনে।"

ইহা পাঠ করিয়া আর সমালোচনা করিতে আমাদের সাহস হয় না। কেশব বাবুর উপর কল্পনা দেবীর কৃপা হইয়াছে। যাহার বলে কালিদাস কবিকুল-পিকবলি বিখ্যাত, যাহার বলে অন্য কবিরা অমরতা লাভ করিয়াছেন, আজ সেই বলে কেশব বাবু মানস কুসুম লিখিয়াছেন, কেন তিনি আর ত্রিভুবনে কাহাকে ডর করিবেন।

উদ্ধৃত অংশের পর কবি লিখিতেছেন :—

"——— সময়ে সময়ে মাতঃ!
ভ্রমি কাব্যোদ্যানে, তুলিব কুসুম বাঞ্ছা
গাঁথিব মনের সাধে (কভু সাজাইয়া
অনুপ্রাসে আমি) সরস কুসুম হার,"

তাহার পর কল্পনার নিকট কেশব বাবু প্রার্থনা করিতেছেন :—

"কিন্তু, যাচে তব কাছে অয়ি দয়াময়ী!
সদা যেন রয় দাস নয়নের কোণে।"

শেষ ভাষা অতি চমৎকার সন্দেহ নাই ভাবটিও ভাল। তবে কিনা, আমরা প্রথমে ভাব বুঝিতে একটু গোলে পড়িয়াছিলাম; দাস কিরূপে নয়নের কোণে রয়, ইহা আমাদের ভাবিতে হইয়াছিল। এই সময় একজন বৃদ্ধ কবি আমাদের নিকটে ছিলেন, তিনি সত্যনারায়ণ পয়ারে লিখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের বড় ভক্তি। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বুঝাইয়া দিলেন যে, পূর্ব্বে রেওয়াজ ছিল যে, দাস স্বীকার করিলে স্থান চরণের প্রান্তে চাহিতে হইত; এক্ষণে সেই রেওয়াজ উঠিয়া গিয়াছে, দাসের পক্ষে এক্ষণে নয়নের কোণে স্থান হইয়াছে। আমরাও ভাবিলাম ইহা স্বাধীনতার সুফল; দাস হউক আর যাহাই হউক ঊনবিংশ শতাব্দীতে চরণপ্রান্তে স্থান চাওয়া সৎশিক্ষার বিরুদ্ধ; অতএব আহ্লাদে আমরা আবার পাঠ করিলাম। কিন্তু এবার বুঝিলাম যে, আমাদের বুঝিবার ভুল হইয়াছে। "সদা যেন রয় দাস নয়নের কোণে" ইহার অর্থ সদা

যেন দাসের প্রতি ঈষৎ দৃষ্টি থাকে, কেশব বাবু তাহার পরিবারকে বলিয়াছেন "রয় যেন নয়নের কোণে" এই পরিবর্ত্ত অবশ্য কল্পনা দেবীর বিশেষ অনুগ্রহের ফল। গ্রন্থখানি অবশ্য ভাল হইয়াছে কিন্তু আমরা অধিক পড়িতে পারি নাই।

পরিচারিকা। মাসিক পত্র।—কলিকাতা জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫।

এক্ষণে অনেক বাঙ্গালির কন্যা লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছেন বা শিখিতেছেন। উপযুক্ত শিক্ষক এবং অবসরের অভাবে, তাঁহাদিগের ইংরেজিতে শিক্ষা হয় না, যে দুই একজনের হয়, তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। অধিকাংশ বাঙ্গালি কন্যা বাঙ্গালাতেই লিখিতে পড়িতে শিখে কিন্তু পড়িতে বা লিখিতে শিখাই বিদ্যাশিক্ষা নহে। জ্ঞানোপার্জ্জন এবং মানসিক বৃত্তি সকলেব উপযুক্ত পরিমার্জ্জনই শিক্ষা। তাহা সৎপুস্তক ভিন্ন সম্ভব নহে। বাঙ্গালা ভাষায় সৎপুস্তকেব সংখ্যা অল্প। এবং যাহা আছে, তাহাও সচরাচব, স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী নহে। ভাল বহি হইলেই যে স্ত্রীলোকেব পাঠেব যোগ্য হইবে এমত নহে। এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা পুরুষে পড়িলে ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহা স্ত্রীলোকে পড়ায় ক্ষতি আছে। সংসারেব পবিত্রতা স্ত্রীলোকের হস্তে, চিত্তশুদ্ধি ও পবিত্রতাই স্ত্রীলোকের জীবন। অতএব যে গ্রন্থ অতিশয় বিশুদ্ধ তাহাই স্ত্রীলোকেব পাঠোপযোগী। আব সংসারে পুরুষেব কার্য্য এবং স্ত্রীলোকের কার্য্য স্বতন্ত্র। স্ত্রীলোকেব ধর্ম্ম ও পুরুষেব ধর্ম্ম স্বতন্ত্র। যাহা পুরুষেব শোভা পায়, তাহা স্ত্রীলোকের শোভা পায় না; যাহা পুরুষে করিতে পারে, স্ত্রীলোকে তাহা করিতে পারে না। যেখানে পুরুষেব ধর্ম্ম—ক্রোধ, সেখানে স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম—ক্ষমা। এজন্য স্ত্রীলোকেব ও পুরুষের শিক্ষা কিয়দংশে স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। জ্ঞান, উভয়েরই অর্জ্জনীয়; কিন্তু চিত্তবৃত্তি সকলের অনুশীলনে কিছু পার্থক্যের আবশ্যকতা আছে। এই সকল কারণে স্ত্রীলোকের পাঠ্য কতকগুলি স্বতন্ত্র পুস্তক হওয়া উচিত। বাঙ্গালা ভাষায় তাহা না থাকায় বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেরা আধুনিক নাটক নবেল পড়িয়া দিনপাত করেন। বাঙ্গালা ভাষায় একে ভাল নাটক নবেল অতি অল্প; তাহাতে যাহা আছে, তাহা আবার স্ত্রীলোকের পাঠযোগ্য বড় নহে।

এজন্য স্ত্রীলোকের পড়িবার যোগ্য সাহিত্য সৃজনের প্রয়োজন হইয়াছে। অনেক মহাত্মা এই ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। দুই খানি সাময়িক পত্র কেবল এই কাজে নিয়োজিত। পরিচারিকা নাম্নী আর এক খানি পত্রিকা সেই জন্য সম্প্রতি সৃষ্ট হইয়াছে। এখানি অতি মহৎ আশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অনেক সুশিক্ষিতা বাঙ্গালি স্ত্রী, এই পত্রের লেখক। পত্রের ভাষা অতি সরল ও সুমধুর, রুচি বিশুদ্ধ, এবং কথাগুলি সারগর্ভ; লিপিচাতুর্য্যেরও অভাব নাই। আমরা

এই পত্রিকা পাঠে সুখী হইয়াছি। এবং যাঁহারা এই মহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদের অনেক ধন্যবাদ করি। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি প্রথম সংখ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মুখ বন্ধ।
টেলিফোন যন্ত্র।
স্বয়ম্বরণ।
শাক্যসিংহ এবং তাঁহার মাতা।
কৃত্রিম বেশভূষা।
কোথা সে শৈশব।
ফাতিমার স্বপ্ন!
The While Hill of Jabbalpore (ইংরেজি)।
পরিণয় ও পরিচয়।
স্বর্ণবেণু।
সম্বাদ।

হঠাৎ বাবু। প্রহসন মূল্য ／১০ আনা মাত্র। গ্রন্থকার বোধ হয় বালক তাহাই লিখিতে সাধ।

প্রাইমারী গ্রামার। মথুরানাথ বর্ম্মা কর্তৃক সংগৃহীত। মূল্য চারি আনা।

যে সকল বালক কিছুমাত্র ইংরেজি বুঝিতে পারে না তাহাদের দুরুহ ইংরেজিতে গ্রামার শিখিতে হয়। সেই কষ্ট অপনয়ন করিবার নিমিত্ত সংগ্রহকার বাঙ্গালায় এই গ্রামার লিখিয়াছেন। ইহা দ্বারা বালকদিগের বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। তবে গ্রামার খানি আরও একটু সংক্ষিপ্ত হইলে আরও ভাল হইত। প্রথম শিক্ষার স্থলে এরূপ বিস্তারে জানিবার প্রয়োজন না হইতে পারে।

কবিতা। শ্রীযাদবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। গুপ্ত প্রেস কলিকাতা।

কবিতাগুলি কোকিল, হিমালয় পর্ব্বত, সিংহ, বটবৃক্ষ, কুবের প্রভৃতি নানা বিষয়িণী। গ্রন্থখানি ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, তাহা আমরা বড় বলিতে পারি না; কেন না, আমরা গ্রন্থের অধিকাংশ বুঝিতে পারি নাই। বোধ হয় ভাষা বাঙ্গালা—কিন্তু আমাদের জ্ঞানগম্যের অতীত, নমুনার স্বরূপ দুই এক পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল।

কোকিল সম্বন্ধে ১ম পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত :—

"সহকার আলিঙ্গিত ব্রততীবিতানে,
প্রস্তীম সতত যথা অলি-গুঞ্জ রবে।"

পদ্মিনী সম্বন্ধে ২৫ পৃষ্ঠা হইলে উদ্ধৃত :—

বর্করাট করজাল, চকাসিত শৈল-শাল,
মলম্বা প্রতিম রুচি উচ্চতরুদলে।"

যদি কখন কেহ অনবধানতা প্রযুক্ত বা দুরদৃষ্ট বশতঃ এই গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন, তবে তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার কবিবাব নিমিত্ত পবম কারুণিক কবি প্রতি পত্রে কতকগুলি কথার অর্থ লিখিয়া দিয়াছেন। তাহাতেও যে বড় সুবিধা হইয়াছে, এমত বোধ হয় না। গ্রন্থকাব যদি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতেন তাহা হইলে যে কি ক্ষতি হইত, বা কোন্ ভাবটি প্রকাশ হইত না, তাহা আমরা বুঝিতে পাবিলাম না। আমাদের বোধ হয় লেখক অতি বালক, সম্প্রতি অভিধান হাতে পাইয়াছেন, তাহাই কাগজ কালিব এরূপে শ্রাদ্ধ করিয়াছেন।

শূরবালা সুরবালা। স্বর্ণলতাবিরচিত। হরিনাভি সাহিত্য-উৎসাহিনী সভা হইতে প্রকাশিত।

গ্রন্থখানি মোট ৩৬ পৃষ্ঠা, তাহাব মধ্যে ২০ পৃষ্ঠা গ্রন্থকর্ত্রীর পরিচয়, আর ১৬ পৃষ্ঠা সুরবালা নাটক বা গল্প। গল্পটি এই :—

এক রাজবাটীর কানাচে যুদ্ধ উপস্থিত। রাজকুমার বিজয়সিংহ মুখ চুণ করিয়া অন্দরে আসিলেন। তাঁহার স্ত্রী সুরবালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কেন বিরস বদন?" রাজকুমার বলিলেন, "পিতৃ আজ্ঞায় অদ্য রণ করিতে যাইতে হইবে।" সুরবালা জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় রণ?" বিজয়সিংহ বলিলেন কানাচে। সুরবালা বলিলেন, তবে "দেখি রণ, বসি গবাক্ষেতে।" পরে রাজকুমার রণস্থলে গেলেন, কিন্তু শীঘ্র তথা হইতে পলাইলেন; তখন তাঁহার স্ত্রী সুরবালা আর কি করেন গবাক্ষ হইতে নামিয়া রণ করিতে গেলেন, গিয়া দুইজন শত্রুকে মারিলেন। তাহাতেই বীররসের চূড়ান্ত হইয়া গেল। হরিনাভি সাহিত্যসমাজ অমনি মাতিয়া উঠিলেন। সাহিত্যের সাহায্যার্থ এই গ্রন্থ পয়সা খরচ করিয়া ছাপাইলেন। হরিনাভির সমাজ বড় দয়ালু, আমাদের সাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট দয়া। কিন্তু এই ব্যাপারে সাহিত্য ব্যতীত তাঁহাদের যদি আর কেহ সাহায্যের পাত্র থাকে, তবে গ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কন না করিয়া অন্যরূপে সাহায্য করিলেই ভাল হইত।

কুসুম কলিকা। শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই পুস্তকখানি আমরা অনেক দিবস হইল পাইয়াছি, কিন্তু অনবধানতা প্রযুক্ত ইহার সমালোচনা করিতে পারি নাই। ইহাতে অনেকগুলি কবিতা আছে। তাহার মধ্যে অধিকাংশই একেবারে অপাঠ্য না হউক বিশেষ কবিত্ব নাই। কেবল "দময়ন্তীর কাল নিদ্রা" নামে কবিতাটিরই স্থানে স্থানে আমাদের কতক ভাল বোধ হইল; তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"আম্‌রি রমণী ঘুমে অচেতন!
ক্ষণে ক্ষণে তার নড়িছে চরণ!—
কভু করখানি, বিশ্ব-বিমোহন!
অলঙ্কাররাশি ঝমিছে তায়!
পত্নী-প্রেমোত্তাপে গলিত অন্তর
প্রহরী, অমনি ধীরে নিজ কর
নাড়িছে বামার দেহের উপর,
পাছে দংশে কীট রমণী কায়!

* * *

নেত্র, ওষ্ঠাধর, কপোল, বামার—
শিরীষ-কুসুম জিনি সুকুমার
সহিতে না পারি কেশের প্রহার,
বিবিধ প্রকারে ব্যঞ্জিছে ক্লেশ;—
নয়ন কপোল হতেছে কুঞ্চিত;
ওষ্ঠাধর চারু হইতেছে স্ফীত;
মমতায় নাসা করিছে বাহিত
অতিরিক্ত শ্বাস, তাড়াতে কেশ;
অমনি তখনি পতি অনুকূল,
দয়িতার ক্লেশে হইয়া আকুল,
ধীরে ধীরে যত কেশ প্রতিকূল
ধরি, যথাস্থানে সরায়ে দিল!
ললাট উপরে নাসিকার গায়,
অধরের নিম্নে, ওষ্ঠের সীমায়,
গলে, নেত্রকোণে, মুক্তামালাপ্রায়,
স্বেদ বিন্দু ছিল মুছায়ে দিল।

কুমারী কার্পেণ্টারের সংক্ষিপ্ত জীবনী। রায় যন্ত্র। মূল্য ৴৹ আনা মাত্র। ১৮৭৭ সালের ১০ই জুলাই কুমারী কার্পেণ্টারের স্মৃতি-চিহ্ন সংস্থাপনার্থ বঙ্গমহিলাগণের যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে এই গ্রন্থলিখিত বিষয়টি পঠিত হয়। একবৎসর অতীত হইয়াছে এক্ষণে ইহার উল্লেখ অনর্থক হইবে না, মনে করিয়া এ স্থলে গ্রন্থের নাম উত্থাপন করা গেল। ২৪ পাতার পুস্তক পড়িতে আমাদের বিদ্যাবতীদের অধিক সময় লাগিবে না, এবং জীবনী ক্রয় করিতেও অধিক ব্যয় হইবে না অতএব সকলের ইহা পড়া উচিত।

ইণ্ডিয়ান পিলগ্রিম। ইংরেজি পদ্য। যোগেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত।

ইংরেজি রচনা সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমাদের অনধিকার চর্চ্চা। তবে আমাদের মধ্যে যদি কেহ ইংরেজিতে গ্রন্থ লিখেন, তাহা হইলে আমরা দুইটা ভাল কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। উৎসাহ দিবার নিমিত্ত নহে, গ্রন্থ প্রণয়ন সম্বন্ধে আমরা কাহাকেও উৎসাহ দিই না। তাঁহার লেখা বাস্তবিক অনেক স্থানে আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

ষষ্ঠ বর্ষ ঃ চতুর্থ সংখ্যা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৃহৎ অজগর সর্পের ন্যায় ফিরিতে ফিরিতে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই অশ্বারোহী সেনা পার্ব্বত্য পথে চলিল। যে রন্ধ্র পথের পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া মাণিকলাল রাজসিংহের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছিল, বিবরে প্রবিশ্যমান মহোরগের ন্যায় সেই অশ্বারোহিশ্রেণী সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল। অশ্ব সকলের অসংখ্য পদবিক্ষেপধ্বনি পর্ব্বতের গায়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—এমন কি, সেই স্থির শব্দহীন বিজন প্রদেশে আরোহীদিগের অস্ত্রের মৃদু শব্দ একত্রে সমুত্থিত হইয়া রোমহর্ষণ প্রতিধ্বনির উৎপত্তির কারণ হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে অশ্বগণের হ্রেষারব—আর সৈনিকের ডাক হাঁক! পর্ব্বততলে যে সকল লতা গুল্ম ছিল—শব্দাঘাতে তাহার পাতা সকল কাঁপিতে লাগিল। ক্ষুদ্র বন্য পশু পক্ষী কীট যাহারা সে বিজন প্রদেশে নির্ভয়ে বাস করিত, তাহারা সকলে দ্রুত পলায়ন করিল। এইরূপে সমুদায় অশ্বারোহীর সারি সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল। তখন হঠাৎ গুম করিয়া একটা বিকট শব্দ হইল। যেখানে শব্দ হইল, সে প্রদেশের অশ্বারোহীরা ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। দেখিল, পর্ব্বত-শিখরদেশ হইতে বৃহৎ শিলাখণ্ড পর্ব্বতচ্যুত হইয়া সৈন্যমধ্যে পড়িয়াছে। চাপে একজন অশ্বারোহী মরিয়াছে আর এক জন আহত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে, ব্যাপার কি তাহা কেহ বুঝিতে না বুঝিতে আবার সৈন্যমধ্যে শিলাখণ্ড পড়িল—এক, দুই, তিন, চারি, ক্রমে দশ পঁচিশ—তখনই একেবারে শত শত ছোট বড় শিলা বৃষ্টি হইতে লাগিল—বহুসংখ্যক অশ্ব ও অশ্বারোহী কেহ হত কেহ আহত হইয়া, পথের উপর পড়িয়া সঙ্কীর্ণ পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। অশ্বসকল আরোহী লইয়া পলায়নের জন্য বেগবান্ হইল—কিন্তু অগ্রে পশ্চাতে পথ সৈনিকের ঠেলাঠেলিতে অবরুদ্ধ—অশ্বের উপর অশ্ব, আরোহীর উপর আরোহী চাপিয়া পড়িতে লাগিল—সৈনিকেরা পরস্পর অস্ত্রাঘাত

করিয়া পথ করিতে লাগিল—শৃঙ্খলা একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল, সৈন্যমধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল।

"কাহার লোক হুঁসিয়ার! বাঁয়ে রাস্তা!" মাণিকলাল হাঁকিল। যেখানে রাজকুমারী শিবিকায়, এবং পশ্চাতে মাণিকলাল, তাহার সম্মুখেই এই গোলযোগ উপস্থিত। বাহকেরা আপনাদিগের প্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত—অশ্ব সকল পাছু হঠিয়া তাহাদের উপর চাপিয়া পড়িতেছে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, এই পার্ব্বত্য পথের বামদিক্ দিয়া একটী অতি সঙ্কীর্ণ রন্ধ্র পথ বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহাতে একবারে একটি মাত্র অশ্বারোহী প্রবেশ করিতে পারে। তাহারই কাছে যখন সেনামধ্যস্থিত শিবিকা পৌছিয়াছিল, তখনই এই হুলস্থুল উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাই রাজসিংহের বন্দোবস্ত। সুশিক্ষিত মাণিকলাল প্রাণভয়ে ভীত বাহকদিগকে ঐ পথ দেখাইয়া দিল। মাণিকলালের কথা শুনিবামাত্র বাহকেরা আপনাদিগের ও রাজকুমারীর প্রাণরক্ষার্থ ঝটিতি শিবিকা সেই পথে প্রবেশ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব লইয়া মাণিকলালও তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। নিকটস্থ সৈনিকেরা দেখিল যে প্রাণ বাচাইবার এই এক পথ, তখন আর একজন অশ্বারোহী মাণিকলালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই পথে প্রবেশ করিতে গেল। সেই সময়ে উপর হইতে একটা অতি বৃহৎ শিলাখণ্ড গড়াইতে গড়াইতে শব্দে পার্ব্বত্য প্রদেশ কাঁপাইতে কাঁপাইতে আসিয়া সেই রন্ধ্র মুখে পড়িয়া স্থিতিলাভ করিল। তাহার চাপে দ্বিতীয় অশ্বারোহী অশ্বসমেত চূর্ণ হইয়া গেল। রন্ধ্র মুখ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। আর কেহ সে পথে প্রবেশ করিতে পারিল না। একা মাণিকলাল শিবিকাসঙ্গে যথেপ্সিত পথে চলিল।

সেনাপতি হাসেন আলি খাঁ মনসবদার, তখন সৈন্যের সর্ব্বপশ্চাতে ছিলেন। প্রবেশপথমুখে স্বয়ং দাঁড়াইয়া সংকীর্ণ দ্বারে সেনার প্রবেশের তত্ত্বাবধারণ করিতেছিলেন। পরে সমুদায় সেনা প্রবিষ্ট হইলে স্বয়ং ধীরে ধীরে সর্ব্বপশ্চাতে আসিতেছিলেন। দেখিলেন, সহসা সৈনিকশ্রেণী মহাগোলযোগ করিয়া পাছু হঠিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কিছু ভাল বুঝাইয়া বলিতে পারে না। তখন সৈনিকগণকে ভৎসনা করিয়া ফিরাইতে লাগিলেন—এবং স্বয়ং সর্ব্বাগ্রগামী হইয়া ব্যাপার কি দেখিতে চলিলেন।

কিন্তু ততক্ষণ সেনা থাকে না। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে এই পর্ব্বতের দক্ষিণপার্শ্বস্থ পর্ব্বত অতি উচ্চ এবং দুরারোহণীয়—তাহার শিখরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া পথ অন্ধকার করিয়াছে। রাজপুতেরা তাহার প্রদেশান্তরে অনুসন্ধান করিয়া পথ বাহির করিয়া, পঞ্চাশজন তাহার উপর উঠিয়া অলক্ষ্যভাবে

অবস্থান করিতেছিল এক একজন অপরের চাল্লিশ পঞ্চাশ হাত দূরে স্থান গ্রহণ করিয়া, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া আপন আপন সম্মুখে একটী একটী ঢিপি সাজাইয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে পলকে পলকে পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ খণ্ড শিলা নিম্নস্থ অশ্বারোহীদিগের উপর বৃষ্টি করিতেছিল। এক একবারে পঞ্চাশটি অশ্ব বা আরোহী আহত বা নিহত হইতেছিল। কে মারিতেছিল, তাহা তাহারা দেখিতে পায় না। দেখিতে পাইলে, দুরারোহণীয় পর্ব্বত শিখরস্থ শত্রুগণের প্রতি কোনরূপেই আঘাত সম্ভব নহে—অতএত তাহারা পলায়ন ভিন্ন অন্য কোন চেষ্টাই করিতেছিল না। যে সহস্রসংখ্যক অশ্বারোহী শিবিকার অগ্রভাগে ছিল, তাহার মধ্যে হত ও আহতের অবশিষ্ট পলায়ন পূর্ব্বক রন্ধ্রমুখে নির্গত হইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

পঞ্চাশজন রাজপুত দক্ষিণপার্শ্বের উচ্চ পর্ব্বত হইতে শিলাবৃষ্টি করিতেছিল—আর পঞ্চাশজন স্বয়ং রাজসিংহের সহিত বামদিকের অনুচ্চ পর্ব্বতশিরে লুক্কায়িত ছিল, তাহারা এতক্ষণ কিছুই করিতেছিল না। কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত হইল। যেখানে শিলাবৃষ্টি নিবন্ধন ঘোরতর বিপত্তি সেখানে মিরজা মবারকআলিনামা একজন যুবা মোগল—অর্থাৎ আহেলে বিলায়ত তুর্কস্থানী এবং দুইশতী মনসবদার, অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে সৈন্যগণকে সুশৃঙ্খলের সহিত পার্ব্বত্য পথ হইতে বহিষ্কৃত করিবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন ক্ষুদ্রতর রন্ধ্রপথে রাজকুমারীর শিবিকা চলিয়া গেল, একজন মাত্র অশ্বারোহী তাহার সঙ্গে গেল অমনি অর্গলের ন্যায় বৃহৎ শিলাখণ্ড সে পথ বন্ধ করিল—তখন তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে এ ব্যাপার আর কিছুই নহে—কোন দুরাত্মা রাজকুমারীকে অপহরণ করিবার মানসে এই উদ্যম করিয়াছে। তখন তিনি ডাকিয়া নিকটস্থ সৈনিকদিগকে বলিলেন—"প্রাণ যায় সেও স্বীকার! শত শিপাহী দোলার পিছু পিছু যাও। ঘোড়া ছাড়িয়া পাঁও দলে, এই পাথর টপকাইয়া যাও—চল আমি যাইতেছি।" মবারক অগ্রে ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পথরোধক শিলাখণ্ডের উপর উঠিলেন। এবং তাহার উপর হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া শত শিপাহী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল।

রাজসিংহ পর্ব্বতশিখর হইতে এ সকল দেখিতে লাগিলেন। যতক্ষণ মোগলেরা ক্ষুদ্র পথে একে একে প্রবেশ করিতেছিল ততক্ষণ কাহাকেও কিছু বলিলেন না। পরে রন্ধ্র পথমধ্যে নিবদ্ধ হইলে, পঞ্চাশৎ অশ্বারোহী রাজপুত লইয়া বজ্রের ন্যায় ঊর্দ্ধ হইতে তাহাদের উপর পড়িয়া, তাহাদের নিহত করিতে

লাগিলেন। সহসা উপর হইতে আক্রান্ত হইয়া মোগলেরা বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ এই ভয়ঙ্কর রণে প্রাণত্যাগ করিল! উপর হইতে ছুটিয়া আসিয়া ঘোড়া ঘোড়ার উপব, শিপাহী শিপাহীর উপর পড়িল—নীচে যাহারা ছিল তাহারা চাপেই মরিল। পাঁচ সাত দশজন মাত্র এড়াইল। মবারক তাহাদের লইয়া ফিরিলেন। রাজপুতেরা তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল না।

মবারকের সঙ্গে মোগল শিপাহীর বেশধারী মাণিকলালও বাহির হইয়া আসিল। আসিয়াই একজন মৃত সোওয়ারের অশ্বে আরোহণ করিয়া সেই শৃঙ্খলাশূন্য মোগলসেনার মধ্যে কোথায় লুকাইল মবারক তাহা দেখিতে পাইলেন না।

মাণিকলাল, যে মুখে মোগলেরা সেই পার্ব্বত্য পথে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই পথে নির্গত হইল। যাহারা তাহাকে দেখিল, তাহারা ভাবিল সে পলাইতেছে। মাণিকলাল গলি হইতে বাহির হইয়া তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া রূপনগরেব গড়েব দিকে চলিল।

মবারক প্রস্তরখণ্ড পুনরুল্লঙ্ঘন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া, আজ্ঞা দিলেন, "এই পাহাড়ে চড়িতে কষ্ট নাই; সকলেই ঘোড়া লইয়া এই পাহাড়ের উপরে উঠ! দস্যু অল্পসংখ্যক। তাহাদের সমূলে নিপাত করিব।" তখন পাঁচশত মোগল সেনা, "দীন! দীন!" শব্দ করিয়া অশ্ব সহিত বামদিকের সেই পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ কবিতে লাগিল। মবারক অধিনায়ক। মোগলদিগের সঙ্গে দুইটা তোপ ছিল। একটা ঠেলিয়া তুলিয়া পাহাড়ে উঠাইতে লাগিল। আর একটা লইয়া মোগলেরা টানিয়া, যে বৃহৎ শিলাখণ্ডের দ্বারা পার্ব্বত্য রন্ধ্র বন্ধ হইয়াছিল, তাহার উপর উঠাইয়া স্থাপিত করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

তখন দীন দীন শব্দে পঞ্চাশত অশ্বারোহী কালান্তক যমের ন্যায় পর্ব্বতে আরোহণ করিল। পর্ব্বত অনুচ্চ ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে—শিখরদেশে উঠিতে তাহাদের অনেক কালবিলম্ব হইল না। কিন্তু পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া দেখিল যে, কেহ ত পর্ব্বতোপরে নাই। যে রন্ধ্রপথমধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি নিজে পরাভূত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এখন মবারক বুঝিলেন যে, সমুদয় দস্যু—মবারকের বিবেচনায় তাহারা রাজপুত দস্যু ভিন্ন আর কিছুই নহে—সমুদায় দস্যু সেই রন্ধ্রপথে আছে। তাহার দ্বিতীয় মুখ রোধ করিয়া তাহাদিগের বিনাশসাধন করিবেন, মবারক এইরূপ মনে মনে স্থির করিলেন! হাসান আলি

আর মুখে কামান পাতিয়া বসিয়া আছেন। এই ভাবিয়া, তিনি সেই রন্ধ্রের ধারে ধারে সৈন্য লইয়া চলিলেন। ক্রমে পথ প্রশস্ত হইয়া আসিল; তখন মবারক পাহাড়ের ধারে আসিয়া দেখিলেন—চাল্লিশ জনের অনধিক রাজপুত, শিবিকাসঙ্গে রুধিরাক্ত কলেবরে সেই পথে চলিতেছে। মবারক বুঝিলেন যে অবশ্য ইহারা নির্গমপথ জানে; ইহাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিলে, রন্ধ্রদ্বারে উপস্থিত হইব। তাহা হইলে যেরূপ পথে রাজপুতেরা পর্ব্বত হইতে নামিয়াছিল সেইরূপ অন্য পথ দেখিতে পাইব। রাজপুতেরা যে আগে উপরে ছিল পরে নামিয়াছে তাহার সহস্র চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। মবারক সেইরূপ করিতে লাগিলেন। কিছু পরে দেখিলেন, পাহাড় ঢালু হইয়া আসিতেছে, সম্মুখে নির্গমের পথ। মবারক অশ্ব সকল তীববেগে চালাইয়া পর্ব্বততলে নামিয়া রন্ধ্রমুখ বন্ধ কবিলেন। রাজপুতেরা, রন্ধ্রের বাঁক ফিরিয়া যাইতেছিল —সুতরাং তাহারা আগে রন্ধ্রমুখে পৌছিতে পারিল না। মোগলেরা পথরোধ করিয়া রন্ধ্রমুখে কামান বসাইল: এবং আগতপ্রায় রাজপুতগণকে উপহাস কবিবার জন্য তাহার বজ্রনাদ একবার শুনাইল—দীন! দীন! শব্দের সঙ্গে পর্ব্বতে পর্ব্বতে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল। শুনিয়া উত্তর স্বরূপ রন্ধ্রের অপর মুখে হাসান আলিও কামানের আওয়াজ করিলেন; আবার পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি বিকট ডাক ডাকিল। রাজপুতগণ শিহরিল—তাহাদিগের কামান ছিল না।

রাজসিংহ দেখিলেন, আর কোনমতেই রক্ষা নাই। তাঁহার সৈন্যের বিশগুণ সেনা, পথের দুই মুখ বন্ধ করিয়াছে—পথান্তর নাই—কেবল যমমন্দিরের পথ খোলা। রাজসিংহ স্থির করিলেন সেই পথেই যাইবেন। তখন সৈনিকগণকে একত্রিত করিয়া বলিতে লাগিলেন।

"ভাই বন্ধু, যে কেহ সঙ্গে থাক, আজি সরলান্তঃকরণে আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। আমারই দোষে এ বিপদ ঘটিয়াছে—পর্ব্বত হইতে নামিয়াই এ দোষ করিয়াছি। এখন এ গলির দুই মুখ বন্ধ—দুই মুখেই কামান শুনিতেছ? দুই মুখে আমাদের বিশগুণ মোগল দাঁড়াইয়া আছে—সন্দেহ নাই। অতএব আমাদিগের বাঁচিবার ভরসা নাই। নাই—তাহাতেই বা ক্ষতি কি? রাজপুত হইয়া কে মরিতে কাতর? সকলেই মরিব—একজনও বাঁচিব না—কিন্তু মারিয়া মরিব। যে মরিবার আগে দুইজন মোগল না মারিয়া মরিবে—সে রাজপুত নহে—বিজাতক। রাজপুতেরা শুন। এ পথে ঘোড়া ছুটে না—সবাই ঘোড়া ছাড়িয়া দাও। এসো আমরা তরবাল হাতে লাফাইয়া গিয়া তোপের উপর পড়ি। তোপ ত আমাদেরই হইবে—তার পর দেখা যাইবে কত মোগল মারিয়া মরিতে পারি।"

তখন রাজপুতগণ, অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একত্রে অসি নিষ্কোষিত করিয়া "রাণা জি কি জয়!" বলিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখকান্তি দেখিয়া রাজসিংহ বুঝিলেন যে, প্রাণ রক্ষা না হউক—একটী রাজপুতও হটিবে না। সন্তুষ্ট চিত্তে রাণা আজ্ঞা দিলেন, "দুই দুই করিয়া সারি দাও।" অশ্বপৃষ্ঠে সবে একে একে যাইতেছিল—পদব্রজে দুইয়ে দুইয়ে রাজপুত চলিল—রাণা সর্ব্বাগ্রে চলিলেন। আজ আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্ত।

এমত সময়ে সহসা পর্ব্বতরন্ধ্র কম্পিত করিয়া, পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি তুলিয়া, রাজপুত সেনা শব্দ করিল "মাতা জি কি জয়! কালীমায়ি কি জয়।"

অত্যন্ত হর্ষসূচক ঘোর রব শুনিয়া রাজসিংহ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন ব্যাপার কি? দেখিলেন, দুইপার্শ্বে রাজপুতসেনা সারি দিয়াছে—মধ্যে বিশাল-লোচনা, সহাস্যবদনা, কোন্ দেবী আসিতেছে। হয় কোন দেবী মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—নয় কোন মানবীকে বিধাতা দেবীব মূর্ত্তিতে গঠিয়াছেন। রাজপুতেরা মনে করিল, চিতোরাধিষ্ঠাত্রী রাজপুতকুলরূপিণী ভগবতী এ শঙ্কটে রাজপুতকে রক্ষা করিতে স্বয়ং রণে অবতীর্ণা হইয়াছেন। তাই তাহারা জয়ধ্বনি করিতেছিল।

রাজসিংহ দেখিলেন—এ ত মানবী, কিন্তু সামান্যা মানবী নহে। ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, দোলা কোথায়?"

একজন পিছু হইতে বলিল, "দোলা এই দিকে আছে?"

রাণা বলিলেন, "দেখ, দোলা খালি কি না?"

সৈনিক বলিল "দোলা খালি কুমারী জী মহারাজের সাম্‌নে।"

চঞ্চলকুমারী তখন রাজসিংহকে প্রণাম করিলেন। রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমারি—আপনি এখানে কেন?"

চঞ্চল বলিলেন, "মহারাজ। আপনাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি। প্রণাম করিয়াছি—এখন একটি ভিক্ষা চাহি। আমি মুখরা—স্ত্রীলোকের শোভা যে লজ্জা তাহা আমাতে নাই, ক্ষমা করিবেন। ভিক্ষা যাহা চাহি—তাহাতে নৈরাশ করিবেন না।" চঞ্চলকুমারী হাস্য ত্যাগ করিয়া, যোড় হাত করিয়া কাতর স্বরে এই কথা বলিলেন।

রাজসিংহ বলিলেন, "তোমারই জন্য এতদূর আসিয়াছি—তোমাকে অদেয় কিছুই নাই—কি চাও, রূপনগরের কন্যে?"

চঞ্চলকুমারী আবার যোড় হাত করিয়া বলিল, "আমি চঞ্চলমতি বালিকা বলিয়া আপনাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম; কিন্তু আপনার মন আপনি বুঝিতে পারি নাই। আমি এখন মোগলসম্রাটের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া, বড় মুগ্ধ হইয়াছি। আপনি অনুমতি করুন—আমি দিল্লী যাইব।"

রাজসিংহ বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "তোমার দিল্লী যাইতে হয় যাও—আমার আপত্তি নাই—স্ত্রীলোক চিরকাল অস্থিরচিত্ত। কিন্তু আপাততঃ তুমি যাইতে পাইবে না। যদি এখন তোমাকে ছাড়িয়া দিই মোগল মনে করিবে যে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। আগে যুদ্ধ শেষ হউক—তার পর তুমি যাইও। যওয়ান্ সব—আগে চল।"

তখন চঞ্চলকুমারী মৃদু হাসিয়া, মর্ম্মভেদী মৃদুল কটাক্ষ করিয়া, দক্ষিণ হস্তের কণিষ্ঠাঙ্গুলিস্থিত হীরকাঙ্গুরীয় বামহস্তের অঙ্গুলিদ্বয়ের দ্বারা ফিরাইয়া রাজসিংহকে দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন, "মহারাজ! এই আঙ্গটিতে বিষ আছে। দিল্লীতে না যাইতে দিলে, আমি বিষ খাইব।"

রাজসিংহ তখন হাসিলেন—বলিলেন "বুঝিয়াছি রাজকুমারি—রমণীকুলে তুমি ধন্যা। কিন্তু তুমি যাহা ভাবিতেছ তাহা হইবে না। আজ রাজপুতের বাঁচা হইবে না; আজ রাজপুতকে মরিতেই হইবে—নহিলে রাজপুত নামে বড় কলঙ্ক হইবে।—আমরা যতক্ষণ না মরি—ততক্ষণ তুমি বন্দী। আমরা মরিলে তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইও।"

চঞ্চলকুমারী হাসিল—অতিশয় প্রণয়প্রফুল্ল ভক্তিপ্রমোদিত, সাক্ষাৎ মহাদেবের অনিবার্য্য এক কটাক্ষবাণ রাজসিংহের উপর ত্যাগ করিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, "বীরচূড়ামণি! আজি হইতে আমি তোমার মহিষী হইলাম! যদি তোমার মহিষী না হই—তবে চঞ্চল কখনই প্রাণ রাখিবে না।" প্রকাশ্যে বলিল, "মহারাজ দিল্লীশ্বর যাহাকে মহিষী করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, সে কাহারও বন্দী নহে। এই আমি মোগল সৈন্য সম্মুখে চলিলাম—কাহার সাধ্য রাখে দেখি?"

এই বলিয়া চঞ্চলকুমারী—জীবন্ত দেবীমূর্ত্তি, রাজসিংহকে পাশ করিয়া রন্ধ্র মুখে চলিল। তাঁহাকে স্পর্শ করে কাহার সাধ্য? এজন্য কেহ তাঁহার গতি রোধ করিতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে, হেলিতে দুলিতে, সেই স্বর্ণমুক্তাময়ী প্রতিমা রন্ধ্রমুখে চলিয়া গেল।

একাকিনী, চঞ্চলকুমারী সেই প্রজ্জ্বলিত বহ্নিতুল্য রুষ্ট, সশস্ত্র পঞ্চশত মোগল অশ্বারোহীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। যেখানে সেই পথরোধকারী কামান—মনুষ্যনির্ম্মিত বজ্র, অগ্নি উদগীর্ণ করিবার জন্য হাঁ করিয়া আছে—গোলন্দাজের হাতে অগ্নি জ্বলিতেছে—সেইখানে, সেই কামানের সম্মুখে রত্নমণ্ডিতা লোকাতীত সুন্দরী দাঁড়াইল। দেখিয়া বিস্মিত মোগলসেনা মনে করিল—পর্ব্বতনিবাসিনী পরি আসিয়াছে।

মনুষ্যভাষার কথা কহিয়া চঞ্চলকুমারী সে ভ্রম ভাঙ্গিল।—বলিল "এ সেনার সেনাপতি কে ?"

মবারক স্বয়ং রন্ধ্রমুখে রাজপুতগণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—তিনি বলিলেন, "ইহারা এখন অধমের অধীন। আপনি কে ?"

চঞ্চলকুমারী" বলিলেন, আমি সামান্যা স্ত্রী। আপনার কাছে কিছু ভিক্ষা আছে—যদি অন্তরালে শুনেন, তবেই বলিতে পারি।"

মবারক বলিলেন, "তবে রন্ধ্রমধ্যে আগু হউন।" চঞ্চলকুমারী রন্ধ্রমধ্যে অগ্রসর হইলেন—মবারক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

যেখানে কথা অন্যে শুনিতে পায় না এমত স্থানে আসিয়া চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, "আমি রূপনগরের রাজকন্যা। বাদশাহ আমাকে বিবাহ করিবার অভিলাষে আমাকে লইতে এই সেনা পাঠাইয়াছেন—এ কথা বিশ্বাস করেন কি ?"

মবারক। আপনাকে দেখিয়াই সে বিশ্বাস হয়।

চঞ্চল। আমি মোগলকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক—ধর্ম্মে পতিত হইব মনে করি। কিন্তু পিতা ক্ষীণবল—তিনি আমাকে আপনাদিগের সঙ্গে পাঠাইয়াছেন। —তাঁহা হইতে কোন ভরসা নাই বলিয়া আমি রাজসিংহের কাছে দূত প্রেরণ করিয়াছিলাম—আমার কপালক্রমে তিনি পঞ্চাশজন মাত্র শিপাহী লইয়া আসিয়াছেন—তাঁহাদের বলবীর্য্য ত দেখিলেন ?

মবারক চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সে কি---পঞ্চাশ জন শিপাহী এক সহস্র মোগল মারিল ?"

চঞ্চল। বিচিত্র নহে--হলদীঘাটে ঐ রকম কি একটা হইয়াছিল শুনিয়াছি। কিন্তু সে যাই হউক—রাজসিংহ এক্ষণে আপনার নিকট পরাস্ত। তাঁহাকে পরাস্ত দেখিয়াই আমি আসিয়া ধরা দিতেছি। আমাকে দিল্লী লইয়া চলুন—যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই।

মবারক বলিল, "বুঝিয়াছি নিজের সুখ বলি দিয়া, আপনি রাজপুতের প্রাণরক্ষা করিতে চাহেন। তাঁহাদেরও কি সেই ইচ্ছা ?"

চ। সেও কি সম্ভবে ? আমাকে আপনারা লইয়া চলিলেও তাহারা যুদ্ধ ছাড়িবে না। আমার অনুরোধ, আমার সঙ্গে একমত হইয়া আপনি তাহাদের প্রাণরক্ষা করুন।

ম। তাহা পারি কিন্তু দস্যুর দণ্ড অবশ্য দিতে হইবে। আমি তাঁহাদের বন্দী করিব।

চ। সব পারিবেন—সেইটী পারিবেন না। তাঁহাদিগকে প্রাণে মারিতে পারিবেন কিন্তু বাঁধিতে পারিবেন না। তাঁহারা সকলেই মরিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন—মরিবেন।

মবা। তাহা বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনি দিল্লী যাইবেন ইহা স্থির?

চ। আপনাদিগের সঙ্গে আপাতত যাওয়াই স্থির। দিল্লী পর্য্যন্ত পৌছিব কি না সন্দেহ।

মবা। সে কি?

চ। আপনারা যুদ্ধ করিয়া মরিতে জানেন, আমরা স্ত্রীলোক, আমরা কি শুধু শুধু মরিতে জানি না?

মবা। আমাদের শত্রু আছে, তাই মরি। ভুবনে কি আপনার শত্রু আছে?

চ। আমি নিজে।—

ম। আমাদের শত্রুর অনেক প্রকার অস্ত্র আছে—আপনার?

চ। বিষ।

ম। কোথায় আছে বলিয়া মবারক চঞ্চলকুমারীর মুখপানে চাহিলেন। বুঝি অন্য কেহ হইলে তাহার মনে মনে হইত "নয়ন ছাড়া আর কোথায় বিষ আছে কি?" কিন্তু মবারক সে ইতর প্রকৃতির মনুষ্য ছিলেন না। তিনি রাজসিংহের ন্যায় যথার্থ বীরপুরুষ। তিনি বলিলেন, "মা আত্মঘাতিনী কেন হইবেন? আপনি যদি যাইতে না চাহেন তবে আমাদের সাধ্য কি আপনাকে লইয়া যাই? স্বয়ং দিল্লীশ্বর উপস্থিত থাকিলেও আপনার উপর বল প্রকাশ করিতে পারিতেন না—আমরা কোন ছার? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—কিন্তু এ রাজপুতেরা বাদশাহের সেনা আক্রমণ করিয়াছে—আমি মোগল সেনাপতি হইয়া কি প্রকারে উহাদের ক্ষমা করি?"

চ। ক্ষমা করিয়া কাজ নাই—যুদ্ধ করুন।

এই সময়ে রাজপুতগণ লইয়া রাজসিংহ সেইখানে উপস্থিত হইলেন—তখন চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, "যুদ্ধ করুন—রাজপুতের মেয়েরাও মরিতে জানে।"

মোগলসেনাপতির সঙ্গে লজ্জাহীনা চঞ্চল কি কথা কহিতেছে শুনিবার জন্য রাজসিংহ এই সময়ে চঞ্চলের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চঞ্চল তখন তাঁহার কাছে হাত পাতিয়া, হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ! আপনার

কোমরে যে তরবারি দুলিতেছে, রাজপ্রসাদ স্বরূপ দাসীকে উহা দিতে আজ্ঞা হউক।

রাজসিংহ হাসিয়া বলিলেন "বুঝিয়াছি তুমি সত্য সত্যই ভৈরবী।" এই বলিয়া রাজসিংহ কটি হইতে অসি নির্ম্মুক্ত করিয়া চঞ্চলকুমারীর হাতে দিলেন। চঞ্চল অসি ঘুরাইয়া, মবারকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "তবে যুদ্ধ করুন। রাজপুতেরা যুদ্ধ করিতে জানে। আর রাজপুতানার স্ত্রীলোকেরাও যুদ্ধ করিতে জানে। খাঁসাহেব! আগে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন। স্ত্রীহত্যা হইলে, আপনার বাদসাহের গৌরব বাড়িতে পারে।"

শুনিয়া, মোগল ঈষৎ হাসিল। চঞ্চলকুমারীর কথায় কোন উত্তর করিল না। কেবল রাজসিংহের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "উদয়পুরের বীরেরা কতদিন হইতে স্ত্রীলোকের বাহুবলে রক্ষিত?"

রাজসিংহের দীপ্ত চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, "যতদিন হইতে মোগল বাদশাহ অবলাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, ততদিন হইতে রাজপুত কন্যাদের বাহুতে বল হইয়াছে।" তখন রাজসিংহ সিংহের ন্যায় গ্রীবাভঙ্গের সহিত, স্বজনবর্গের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "রাজপুতেরা বাগ্‌যুদ্ধে অপটু। বৃথা কাল হরণে প্রয়োজন নাই—পিপীলিকার মত এই মোগলদিগকে মারিয়া ফেল।

এতক্ষণ বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় উভয় সৈন্য স্তম্ভিত হইয়াছিল—প্রভুর আজ্ঞা ব্যতীত কেহই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছিল না। এক্ষণে রাণার আজ্ঞা পাইয়া "হর! হর! বম্! বম্!" শব্দে, রাজপুতেরা জলপ্রবাহবৎ মোগলসেনার উপরে পড়িল। এদিকে মবারকের আজ্ঞা পাইয়া, মোগলেরা "আল্লা—হো—আকবর!" শব্দ করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সহসা উভয় সেনাই নিষ্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল! সেই রণক্ষেত্রে উভয় সেনার মধ্যে অসি উত্তোলন করিয়া—স্থিরমূর্ত্তি চঞ্চলকুমারী দাঁড়াইয়া—সরিতেছে না।

চঞ্চলকুমারী উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "যতক্ষণ না একপক্ষ নিবৃত্ত হয়—ততক্ষণ আমি এখান হইতে নড়িব না। অগ্রে আমাকে না মারিয়া কেহ অস্ত্র চালনা করিতে পারিবে না।"

রাজসিংহ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমার এ অকর্ত্তব্য। স্বহস্তে তুমি রাজপুতকুলে এই কলঙ্ক লেপিতেছ কেন? লোকে বলিবে, আজ স্ত্রীলোকের সাহায্যে রাজসিংহ প্রাণরক্ষা করিলেন।"

চ। মহারাজ! আপনাকে মরিতে কে নিষেধ করিতেছে? আমি কেবল আগে মরিতে চাহিতেছি। যে অনর্থের মূল—তাহার আগে মরিবার অধিকার আছে।

চঞ্চল নড়িল না—মোগলেরা বন্দুক উঠাইয়াছিল—নামাইল! মবারক চঞ্চলকুমারীর কার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তখন উভয় সেনাসমক্ষে মবারক ডাকিয়া বলিলেন, "মোগলবাদশাহ স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করেন না—অতএব বন্দি আমরা এই সুন্দরীর নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া যাই। রাণা রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে জয় পরাজয়ের মীমাংসা ভরসা করি, ক্ষেত্রান্তরে হইবে। আমি রাণাকে অনুরোধ করিয়া যাইতেছি যে, সেবার যেন স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া না আইসেন।

চঞ্চলকুমারী মবারকের জন্য চিন্তিত হইলেন। মবারক তখন তাঁহার নিকটে—অশ্বে আরোহণ করিতেছে মাত্র। চঞ্চলকুমারী তাঁহাকে বলিলেন, "সাহেব! আমাকে ফেলিয়া যাইতেছ কেন? আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আপনাদের দিল্লীশ্বর পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমাকে যদি না লইয়া যান, তবে বাদশাহ কি বলিবেন?"

মবারক বলিল, "বাদশাহের বড় আর একজন আছেন। উত্তর তাঁহার কাছে দিব।"

চঞ্চল। সে ত পরলোকে, কিন্তু ইহলোকে?

মবারক। মবারক আলি ইহলোকে কাহাকেও ভয় করে না। ঈশ্বর আপনাকে কুশলে রাখুন—আমি বিদায় হইলাম।

এই বলিয়া মবারক অশ্বে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সৈন্যকে ফিরিতে আদেশ করিতেছিলেন, এমত সময়ে পশ্চাতে একবারে সহস্র বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলেন। একেবারে শত মোগল যোদ্ধা ধরাশায়ী হইল। মবারক দেখিলেন, ঘোর বিপদ—কোথা হইতে সহস্রাধিক অশ্বারোহী আসিয়া তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিতেছে। দৃষ্টিমাত্র মোগলেরা পলায়ন করিল। যে যে দিকে পারিল সেই সেই দিকে পলাইল—মবারক রাখিতে পারিল না। তখন শত্রুগণ হর হর বম্ বম্ শব্দ করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।
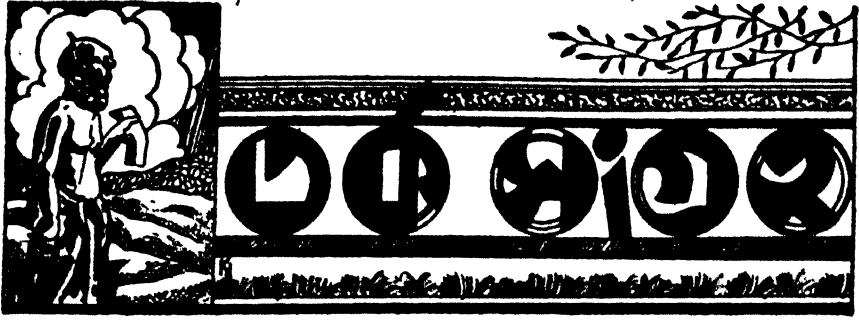
কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ

এই জগতের কার্য্যকলাপের মধ্যে যত প্রকার সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় তাহাদিগের মধ্যে এই দুইটি সম্বন্ধই প্রধান ; প্রথম সমকালবৃত্তিত্ব দ্বিতীয় অনন্তরবৃত্তিত্ব। যে সকল কার্য্য পরস্পর এরূপ সম্বন্ধ রক্ষা করে যে একটী আরম্ভ করিলে তাহার সহিতই আর একটী সিদ্ধ হইতে থাকে তাহাদিগের নাম সমকালবৃত্তি কার্য্য, উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধের নাম সমকালবৃত্তিত্ব সম্বন্ধ। এই সমকালবৃত্তি কার্য্য সকল, সকল অবস্থায়ই এক রূপ ধারণ করে। ইহার প্রধান উদাহরণস্থল অঙ্কশাস্ত্র। দেখ দুই আর দুই একত্র করিলেই চারি হয়, এই চারি যতকাল দুটী দুই একত্র থাকে ততকালই থাকে তাহার পর আর থাকে না, এবং দিন, বৎসর, ফুট, ইঞ্চি ইত্যাদি যে কোন বস্তুরই হৌক দুটী দুই একত্র করিলে চারি হইবে।

রেখাগণিত ক্ষেত্রব্যবহার প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রতিপদে এই সমকালবৃত্তিত্ব সম্বন্ধ এবং তজ্জন্য একরূপতা সর্ব্বপ্রকারে লক্ষিত হয়। উহাদের নির্ণয়ের নিমিত্ত সময় বা ভূয়োদর্শনের কিছুমাত্র আবশ্যকতা হয় নাই। ইহারা প্রথম হইতেই স্বতঃসিদ্ধ এবং সত্য। যথা—যাহার পরিমাণ আছে তাহার মূর্ত্তি অর্থাৎ আকার আছে• এবং যাহাদের আকার আছে তাহারা ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, ও বৃত্ত প্রভৃতি নানারূপ হয়। যদি একটী বর্ত্তুল পদার্থ একটি নলের সহিত সমোচ্চ ও সমব্যাসবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ দুইটী বস্তু যে ধাতু বা পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত হৌক না কেন প্রথমটি দ্বিতীয়টীর ঠিক দুই তৃতীয়াংশ হইবে।

এইরূপ গণিত এবং ক্ষেত্রতত্ত্বাদি শাস্ত্রের নিয়ম সকল, সকল সময়েই এক রূপ এবং একরূপ কার্য্য করে, আমরা কখন কোন অংশে এই নিয়মের অন্যথা

• নৈয়ায়িকেরা আকাশাদির পরিমাণ স্বীকার করিয়াছেন অথচ মূর্ত্তি স্বীকার করেন নাই সুতরাং তাঁহাদেরই মতে পরিমাণ থাকিলে আকার থাকে না কিন্তু যাহাদের অপকৃষ্ট পরিমাণ (limited extension) তাহাদেরই আকার আছে (মূর্ত্তত্বং অপকৃষ্ট পরিমাণ বত্বম্)

দেখিতে পাই না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই সকল নিয়ম দ্বারা অপর কোন বিষয়ের সত্যতা স্থির করিতে পারা যায় না, কেবল অঙ্ক ও ক্ষেত্রাদি বিষয়ের সত্যতাই স্থির হয়। অপরসাধারণ ঘটনার সত্যতা নিরূপণার্থ আমাদিগকে অনন্তর বা ক্রমবৃত্তিত্ব সম্বন্ধে আশ্রয় লইতে হয়।

জগতের কার্য্যমাত্রেই অনন্তর বা ক্রমবৃত্তি অর্থাৎ একটির পর আর একটি তারপর আর একটি উৎপন্ন হয়। এবং প্রত্যেকই স্বপূর্ব্ববৃত্তি বস্তুর সহিত একটি অপরিবর্ত্তী সম্বন্ধ রক্ষা করে, বস্তু বিশেষ পূর্ব্বে হইলে বস্তু বিশেষের উৎপত্তি হয়ই হয় কদাচ অন্যথা হয় না। যেমন কৃষ্ণবর্ণ নবীন মেঘ আকাশে উদয় হইলেই পৃথিবীতে বর্ষণ অবশ্যই হইবে, কুম্ভকার দণ্ড দিয়া চক্র ঘুরাইলে ঘট অবশ্যই হইবে। ইত্যাদি।

এই অপরিবর্ত্তী নিয়ম বা সম্বন্ধকে "কার্য্য কারণ সম্বন্ধ" বলা যায়। নৈয়ায়িকগণ ইহাকে "কার্য্য কাবণ ভাব" বা "হেতু হেতুমদ্‌ভাব" ও বলিয়া থাকেন। বোধ হয় পাঠকগণ কার্য্যের সহিত কাবণের যে কি সম্বন্ধ তাহা একপ্রকার বুঝিতে পারিলেন। যাহা কারণ তাহা অবশ্যই কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে থাকিবে এবং কারণ অব্যবহিত পূর্ব্বে থাকিলে কার্য্য অবশ্যই সংঘটিত ও হইবে ইহার অন্যথা হইবে না। ইহার অপলাপ করিবার কাহারও শক্তি নাই।

বৈশেষিক দর্শনকার কনাদ মুনি বলিয়াছেন,

"কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ।"

১ অ ২ আ ১ সূ।

যদি কারণ না থাকে তাহা হইলে কখনই কার্য্য হইতে পারে না। ঘটের প্রতি যে পূর্ব্বে দণ্ড, চক্র, জল, মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একটীরও অভাব হইলে কখন ঘট হয় না অতএব যাহা কার্য্য অর্থাৎ যাহা উৎপন্ন হয় তাহার যে কারণ আছে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে এবং কারণ স্বীকার করিলেই কার্য্যকারণ সম্বন্ধেরও স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুবিশেষের সহিত স্থিরুরূপে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ না মানিলে ঘটের কারণ থাকিলেই বস্ত্র হইতে পারিত এবং বস্ত্রের কারণের অবস্থিতিতে ঘট হইতে পারিত, কিন্তু এরূপ ঘটনা যখন হয় না, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বস্তু বিশেষের এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ একবারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধই অনুমানখণ্ডের মূল সূত্র ; যদি আমরা জানিতে পারি অমুক বস্তুর সহিত অমুক বস্তুর কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ অমুক বস্তু পূর্ব্বে থাকিলে অমুক বস্তুই সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা কোন সময়

উহাদিগের মধ্যে একটাকে দেখিলেই অপরটির অনুমান করিতে পারি। যদি আমাদের জ্ঞান থাকে কোন বস্তুতে অগ্নিসংযোগ হইলে ধূম হয়। তাহা হইলে আমরা ধূম দেখিয়াই বুঝিতে পারি যে অমুক স্থানে অগ্নি সংযোগ হইয়াছে। যদি আমরা পূর্ব্বে জানিতে পারি যে মেঘ হইলে বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টি হইয়া নদীর জল বর্দ্ধিত হয় তাহা হইলে কোন সময় আমরা ইহাদিগের মধ্যে একটাকে দেখিয়া অপরের অনুমান করিতে পারি। আমরা অনেক সময় কেবল মেঘ দেখিয়া অনুমান করিতে পারি আজ খুব বৃষ্টি হইবে, গ্রামের সকল পুষ্করিণী উচ্ছলিত হইবে এবং সেই সঙ্গে নিজের পুষ্করিণীর মৎস্য সকল যাহাতে না পলাইতে পারে সেজন্য যত্ন করিয়া থাকি। বর্ষাকালে প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উত্থান করিয়া যখন গৃহের চতুষ্পার্শ্বস্থিত পরিখাদি পরিপূর্ণ দেখিতে পাই তখনই অনুমান করিতে পারি যে গত রাত্রিতে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এইরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ জানা থাকিলে আমাদের এক প্রকার ভবিষ্যৎ জ্ঞানলাভ হয়। অনেক সময় আমরা কেবল কার্য্যকারণ জ্ঞানের প্রভাবে ভাবিবিপদের অনুমান করিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহার প্রতিকারের চেষ্টা পাইতে পারি।

বৈদ্যশাস্ত্রে কথিত আছে যে যিনি রোগের নিদান (প্রকৃত কারণ) বুঝিয়া চিকিৎসা করেন, তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক, এবং তাঁহার প্রযুক্ত ঔষধ ফলোপধায়ক হয় ; আমরাও বলি সংসারের মধ্যে যিনি কার্য্যকারণ সম্বন্ধটাকে প্রকৃতরূপে অবগত হইতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সংসারী। এই সংসাররূপ মহাসাগরের তিনিই প্রকৃত কর্ণধার, তাঁহার চেষ্টা বা যত্ন প্রায়ই বিফল হয় না।

যতদিন অবধি পৃথিবীতে এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধের জ্ঞান হয় নাই ততদিন অবধি পৃথিবী মূর্খতারূপ নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তাহার পর যেই একটু একটু কার্য্যকারণ জ্ঞানের উদয় হইতে লাগিল, অমনি পৃথিবীতে আদিম পুস্তক ঋগ্বেদের উদয় হইল। যখন প্রাচীন ঋষিরা মনে মনে বিবেচনা করিলেন চেতন ভিন্ন কাহারই কার্য্যকারিতা শক্তি নাই, অগ্নি যখন অনেক আবশ্যক কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তখন তাঁহার অবশ্য চেতন আছে, এই সময়েই ঋগ্বেদের প্রারম্ভ হইল। অমনি তাঁহারা তারস্বরে সেই অশেষ হিতকর কার্য্যের সম্পাদক অগ্নিকে "অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্" এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

আবার যখন তাঁহারা দেখিলেন, বৃক্ষাদি জড়পদার্থ তাহাদের নিজের ত চলিবার শক্তি নাই, অতএব অত্যুচ্চ মহাবৃক্ষ সকল যাহাদ্বারা পরিচালিত হইতেছে সেই বায়ু কেবল সচেতন নহে তাঁহার শক্তিও অসাধারণ। অমনি তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া "বায়বায়াহি" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা বায়ুর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে কার্য্যকারণ জ্ঞানের যখন উন্নতি হইল, তখন বৈদিক সময়ের নানা দেবদেবী অন্তর্হিত হইয়া তাহাদিগের সকলের স্থানে একমাত্র ঈশ্বর বিরাজ করিতে লাগিলেন। এই সময়ের পুস্তকের নাম দর্শন। পূর্ব্বে যে কার্য্যকারণ জ্ঞানে অগ্নি সচেতন বলিয়া স্তুত হইয়াছিলেন দার্শনিক সময়ের কার্য্যকারণ জ্ঞান তাহা অপেক্ষা অনেক উন্নত। উদাহরণ স্বরূপ আমরা নৈয়ায়িকদিগের ঈশ্বর নিরূপক বাক্যটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। তাঁহারা বলেন ঘট পট প্রভৃতি যতগুলি কার্য্য আমরা দেখিতে পাই তাহাদের সকলেরই কারণ আছে। এই জগৎও কার্য্য, ইহারও একটী কারণ অবশ্য থাকিবে, কারণ ভিন্ন কখনই কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না।

তাহার পর ক্রমে কার্য্যকারণ জ্ঞান আরও উন্নতিপ্রাপ্ত হইলে কপিলাচার্য্য বিবেচনা করিলেন,জগৎসৃষ্টির প্রতি পৃথিবীস্থ বস্তু সমূহের শক্তি বিশেষকেই (প্রকৃতি) কারণ বলিলে চলে, এতদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র একটা কারণ স্বীকার করিবার আবশ্যক কি এই চিন্তা করিয়া তিনি যাই "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই কথাটী বলিলেন অমনি আস্তিকদর্শনের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তাহার পরই হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমুদয় ভারতভূমি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত। এতদিন অবধি যে পরমেশ্বরের প্রতি দৃঢ় ভক্তি চলিয়া আসিতেছিল তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইল। কেবল ভারতবর্ষে কেন ইউরোপে যখন কোমৎ প্রভৃতি নব্য দার্শনিকেরা বলিলেন "কার্য্যের মূল বা উৎপাদক কারণ জানিবার আমাদের তত আবশ্যক নাই আমাদের এই মাত্র জানিলেই হয় যে অমুক বস্তু পূর্ব্বে থাকিলে অমুক কার্য্য সংঘটিত হয়।" অমনি যেন ঈশ্বরের শিষ্যবর্গের মধ্যে নাস্তিকতার সূত্রপাত হইল। এতদিন খৃষ্টানেরা যে প্রগাঢ় ভক্তির সহিত পরমেশ্বর উপাসনা করিয়া আসিতেছিলেন সেই দিন অবধি যেন সেই ভক্তি বিচলিত হইতে লাগিল। যেন সেই পথ অবলম্বন করিয়া 'মিল' বলিয়া উঠিলেন জগতের কারণ এক হইতে পারে না।

কেবল দর্শনশাস্ত্র কেন জগতে যে কিছু শাস্ত্র বা তত্ত্ব আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে আর পরেও যদি কিছু হয় এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধই তাহাদের মূলভিত্তি-স্বরূপ থাকিবে। নিউটন্ একদিন বাগানে বসিয়া দেখিলেন বৃক্ষ হইতে একটী সেউফল মৃত্তিকায় নিপতিত হইল, তিনি পূর্ব্বেই জানিতেন যে যতগুলি কার্য্য হয় তাহাদের সকলেরই কারণ আছে, এক্ষণে সেউফলকে ভূমিতে নিপতিত হইতে দেখিয়া তাঁহার মনে তৎক্ষণাৎ উদয় হইল যে এই সেউফল উর্দ্ধে না উঠিয়া নীচে পড়িল তাহার কারণ কি? সেই কারণের অনুসন্ধান করিতে করিতে একবারে জগতের হিতকর এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রধান অঙ্গ মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার হইল। গালবিনি একদিবস তাঁহার স্ত্রীর সহিত বসিয়া নানা কথা

কহিতে একটা মৃত মণ্ডুকের চরণের একপার্শ্বে একটা তাম্রখণ্ড এবং অপর পার্শ্বে একটা জিঙ্ক নামক ধাতুখণ্ড লাগাইবামাত্র ব্যাঙের পাখানা ধড়ফড় করিয়া উঠিল। অমনি তিনি সেই কার্য্যের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সেই অনুসন্ধানের ফল বৈদ্যুত তত্ত্বের আবিষ্কার। পরে যাহা বেন্‌জামিনের আবিষ্কৃত কারণের সহিত মিলিত হইয়া এক্ষণে বৈদ্যুত বার্ত্তাবহরূপে জগতের মধ্যে স্বর্গীয় দূতের কার্য্য করিতেছে। এইরূপ তত্ত্বাবিষ্কারীদিগের জীবনী পাঠে ইহাই প্রতীত হয় যে জগতে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মূল কারণানুসন্ধান। কেহ আশঙ্কা করিয়াছিলেন ভাল, জগতের যদি কার্য্য থাকে তবে ত কারণ থাকিবে, তাহার পরে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের বিচার। কিন্তু জগতে কার্য্য কিছুই নাই। বেদ বলিয়াছেন "স দেব সৌম্যেদমত্র আসীৎ।" জগতে যাহা কিছু আছে তাহা বরাববই আছে তাহাদেব উৎপত্তিও নাই নাশও নাই। যদি বল কোন সময় কোন বস্তু দেখা যায় এবং কোন সময় কোন বস্তু দেখা যায় না কেন? ইহার উত্তব আবির্ভাব আর তিরোভাব অর্থাৎ কোন বস্তু কোন সময় লীন হইয়া থাকে কোন সময় আবার প্রকাশ পায়। ইহার উত্তরে আমরা এই কথা বলি যদি তাই হয় তবে বস্ত্র বয়ন করিবার তাঁতে ঘটের আবির্ভাব হয় না কেন? কুম্ভকারের চাকা ঘুরাইলে বস্ত্রের আবির্ভাব হয় না কেন? আমাদের এই কথার উত্তরে অবশ্য ইহাই বলিতে হইবে যে বস্তুবিশেষে বস্তুবিশেষের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলেই হইল, তা হইলে কোন বস্তুর উৎপত্তির পূর্ব্বে যে বস্তুর থাকা আবশ্যক করে সেই বস্তুকে কারণ না বলিয়া কোন বস্তুর প্রকাশের পূর্ব্বে যে বস্তুর থাকা আবশ্যক করে তাহাকেই কারণ বলিব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সন্তানের সহিত জনক জননীর কিছু না কিছু বৈসাদৃশ্য থাকে। আমরা এ পর্য্যন্ত বলিয়া আসিয়াছি যে সন্তান জনক জননীর মত হয়; অর্থাৎ অপর ব্যক্তি অপেক্ষা জনক জননীর সহিত সন্তানের সাদৃশ্য বিশেষ থাকে। কখন কখন সাদৃশ্য এমত হয় যে, তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু সাদৃশ্য যতই সূক্ষ্ম হউক, কোন অংশে না কোন অংশে বৈসাদৃশ্য থাকে। জনক জননীর ন্যায় সন্তান হয় ইহা নৈসর্গিক নিয়ম, আবার জনক জননী হইতে সন্তানের যে কিঞ্চিৎ বৈসাদৃশ্য থাকে ইহাও আর একটী নৈসর্গিক নিয়ম। উভয় নিয়ম পরস্পর অসংলগ্ন নহে। সাধারণতঃ আকৃতি বা প্রকৃতি সম্বন্ধে পিতা পুত্র, একইরূপ হয়, কিন্তু অনেক সূক্ষ্ম অংশে অন্যরূপ হয়। পৃথিবীর কোন দুইটী পশু বা পক্ষী একরূপ নহে, কোন অংশে না কোন অংশে তাহাদের বৈসাদৃশ্য থাকে। আবার সেই বৈসাদৃশ্যের তারতম্য আছে। কোন অংশের প্রভেদ হয় ত এত স্পষ্ট যে প্রথমেই তাহাব প্রতি দৃষ্টি পড়ে। কোথাও বৈসাদৃশ্য এত সামান্য বা এত সূক্ষ্ম যে তাহা বিশেষ অনুসন্ধান না করিলে লক্ষ্য হয় না। আমাদের দৃষ্টি অসম্পূর্ণ, সূক্ষ্ম প্রভেদ থাকিলে আমরা হয় ত তাহা একেবারে দেখিতে পাই না। পিপীলিকার মধ্যে পরস্পব কোন প্রভেদই আমরা দেখিতে পাই না, অথচ তাহাদের মধ্যে বিলক্ষণ প্রভেদ আছে; প্রভেদ না থাকিলে তাহারা পরস্পরকে চিনিতে পারিত না মনুষ্য মধ্যে সূক্ষ্ম বৈসাদৃশ্য আমরা অনেক বুঝিতে পারি, সত্য, কিন্তু সকলগুলি পারি না জন্মভূমিগত একরূপ বৈসাদৃশ্য হয় আমরা তাহা একেবারে দেখিতে পাই না। কিন্তু একরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট আছে তাহারা এই বৈসাদৃশ্য বুঝিতে পারে। উষ্ণপ্রদেশজাত ব্যক্তিকে তাহারা দংশন করে না, কিন্তু শীত প্রদেশজাত ব্যক্তির অনাবৃত দেহ পাইলে একেবারে অস্থির করিয়া দেয়। পিতা যদি শীতপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন

আর পুত্রের জন্ম যদি উষ্ণদেশে হয়, তাহা হইলে পিতা পুত্রে এই এক প্রকার বৈসাদৃশ্য জন্মে। এইরূপ বৈসাদৃশ্য কতই আছে।

গুরুতর বৈসাদৃশ্যও বহুতর ঘটে। জনক জননীর অঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া পর্ব্ব ছিল, সন্তানের অঙ্গুলিতে দুইটি করিয়া পর্ব্ব হইল। কপোত কপোতীর পুচ্ছে বারটী করিয়া পাখা ছিল, তাহাদের শাবকের পুচ্ছে হয় ত তেরটি করিয়া পাখা হইল। বৃষ ও গাভী উভয়ের শৃঙ্গ ছিল, তাহাদের বৎস হয় ত একেবারে শৃঙ্গহীন হইল। এইরূপ বৈসাদৃশ্য বহুতর ঘটে; একবার ঘটিলে হয় ত পুরুষানুক্রমে থাকিয়া যায়। কিন্তু কেন ঘটে, সে বিষয় মীমাংসা করা কঠিন। তথাপি বিজ্ঞানবিদেরা স্থূল স্থূল বিষয়ে কতকগুলি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; আমরা তাহার সংক্ষেপে পরিচয় দিতেছি। ব্যক্তিবিশেষের কথা না বলিয়া কেবল কতকগুলি সাধারণ নিয়ম বলা যাইতেছে। এই সাধারণ নিয়মগুলি জাতি উৎপত্তির মূল। ঈশ্বর নূতন নূতন জাতি সৃষ্টি করেন না, তাঁহার এই নিয়ম হইতে জাতি উৎপত্তি হইতেছে। কিরূপে হয় তাহা এই পরিচয়গুলি দ্বারা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে।

দেখা যায়, যে আরণ্য পশুপক্ষী বা বৃক্ষ লতার মধ্যে বৈসাদৃশ্য অতি অল্প একবারে থাকে না বলিলেই হয়। তাহারা পুরুষানুক্রমে একই অবস্থার অধীন, কাজেই তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি পুরুষানুক্রমে একই প্রকার হইয়া থাকে। সেই পূর্ব্বাপর প্রচলিত অবস্থার অন্যথা হইলে দেখা যায়, যে চারি পাঁচ পুরুষের মধ্যে তাহাদের বৈসাদৃশ্য আরম্ভ হয়। বন্য আম্র মাত্রেই ক্ষুদ্র ও অম্লময়, কখন বড় আকারের হয় না, কখন সুস্বাদু হয় না। চিরকালই এইরূপ হইয়া আসিতেছে। বনের মৃত্তিকা প্রায়ই কর্ষণ অভাবে কঠিন, অথবা তাহা স্বাভাবিকই কঠিন। যতই বৃক্ষপরম্পরা তথায় জন্মিয়াছে বা জন্মিতেছে, সকলেরই পক্ষে মৃত্তিকা সমভাবে কঠিন; অতএব সকলের অবস্থা একইরূপ, ফলও কাজেই একই রূপ। ইহার অবস্থান্তর কর, সেই জাতি আম্র কোন সিক্ত ও কর্ষিত ভূমিতে রোপণ কর, দুই চারি পুরুষের মধ্যে বৈসাদৃশ্য আরম্ভ হইবে। কোন গাছের আম্র বড় হইবে, কোন গাছের আম্র ছোট থাকিবে, কোন গাছের আম্র লম্বা হইবে, কোন গাছের আম্র টক থাকিবে, কোন গাছের আম্র সুমিষ্ট হইবে।

অবস্থান্তরই বৈসাদৃশ্যের সাধারণ হেতু। নানাকারণে সেই অবস্থান্তর ঘটে। তন্মধ্যে ভোগজনিত অবস্থান্তর এবং ক্রিয়াজনিত অবস্থান্তর এই দুই প্রধান বলিয়া বোধ হয়। আম্র সম্বন্ধে বৈসাদৃশ্যের কথা যাহা উল্লেখ করা গেল তাহা ভোগজনিত; বনের শুষ্ক ও কঠিন মৃত্তিকায় যে অল্প রস থাকে বহুবৃক্ষ তাহার আকাঙ্ক্ষী। কিন্তু কর্ষিত ভূমিতে রস অধিক, অথচ তাহার রসভোগী বৃক্ষ অল্প। এইজন্য বন্য বৃক্ষ

এবং গ্রাম্য বৃক্ষের বৈসাদৃশ্য জন্মে। যে জাতীয় পশু বা পক্ষী পুরুষানুক্রমে বহুকষ্টে আহার উপার্জ্জন করিয়া কোন প্রকারে প্রাণধারণ করে, সেই জাতীয় পশু পক্ষী পরিশ্রম হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মনুষ্যালয়ে যদি নিত্য যথেষ্ট আহার পায়, তাহা হইলে তাহাদের বৈজাত্য আরম্ভ হয়, এই বৈজাত্য কতকটা ভোগজনিত এবং আবার কতকটা ক্রিয়া জনিত। যে হংস বন্য অবস্থায় আকাশে উড়িত, তাহার শাবকদিগকে আর উড়িতে না দিয়া গৃহে আবদ্ধ রাখিলে তাহাদের পাখার ক্রিয়া হইতে পায় না। ক্রিয়া অভাবে তাহাদের ডানা পুষ্টিলাভ করে না। পুরুষানুক্রমে আবদ্ধ থাকিলে পুরুষানুক্রমে ডানা অপুষ্ট থাকে। শেষ অপুষ্ট বা দুর্ব্বল পাখা তাহাদের স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। গৃহপালিত হইলে কেবল পদ দ্বারা গতিবিধি করে কাজেই কেবল পদদ্বয় পরিপুষ্ট হইতে থাকে। তদ্ভিন্ন যথেষ্ট আহারে শরীর পুষ্ট ও ভারি হইয়া উঠে, ও সেই ভারি শরীর বহন করিতে হয় বলিয়া পদদ্বয় আরও বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হয়। ক্রমে কিছু পূরুষ পরে বন্য হংস ও গৃহপালিত হংসের মধ্যে এত গুরুতব বৈসাদৃশ্য জন্মে যে, পৃথক্‌জাতি বলিয়া পরিচিত হয়; উভয় একত্র করিলে দেখা যায় যে পালিত হংসের শরীর বিলক্ষণ স্থূল ও গুরু, বন্য হংসের শরীর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও লঘু। বন্য হংসের পক্ষ সবল হেতু তাহারা উড়িতে সমর্থ, পালিত হংসের পক্ষ দুর্ব্বল হেতু উড়িতে অসমর্থ। একের পা ক্ষুদ্র এবং লঘু অপরের পদদ্বয় বলিষ্ঠ এবং গুরু। বালিহাঁস ও পাতিহাঁস তুলনা করিলেই এই পার্থক্য বুঝা যাইবে। আর এই পার্থক্য কিরূপে জন্মিল, বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে জাতির উৎপত্তি বোধ হইবে।

ক্রিয়াজনিত বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে যে উদাহরণ দেওয়া হইল তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয়, তথাপি আর দুই একটী দেওয়া যাইতেছে। মেমথ নামে গভীর গুহায় যত প্রকার জন্তু বাস করে, সকলেই অন্ধ। গুহায় কোনরূপে আলোক প্রবেশ করে না, সর্ব্বত্রই অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না; কাজেই চক্ষের ক্রিয়া হয় না। ক্রিয়া অভাবে চক্ষের কোন অংশই পুষ্টিলাভ করে না। ক্রমে প্রত্যেক পুরুষের এইরূপ অক্রিয়া হেতুতে চক্ষু দুর্ব্বল হইতে থাকে। আবার প্রত্যেক পুরুষের সেই দৌর্ব্বল্য সন্তানে যায়। ক্রমে পুরুষ পরম্পরা এইরূপ হইয়া আসিলে শেষ তাহারা একেবারে চক্ষুহীন হইয়া পড়ে। এইরূপে মেমথ ও অন্যান্য গুহার জন্তুদিগের চক্ষু এক প্রকার লোপ পাইয়াছে; কেবল মূষিকের ন্যায় চক্ষুর গঠন আছে মাত্র, কিন্তু দৃষ্টি নাই। এই সকল জন্তুর পূর্ব্ব পুরুষেরা যখন আলোকে থাকিত, তাহাদের চক্ষু ছিল। এক্ষণে ক্রিয়াজনিত রূপান্তর ঘটিয়াছে।

বন্যগাভীর দুগ্ধস্থলী বা পালান এত ক্ষুদ্র ও সামান্য যে তাহার প্রতি প্রায় দৃষ্টি পড়ে না ; কিন্তু গৃহপালিত গাভীর পালন কিরূপ স্থূল ও পরিপুষ্ট, তাহা সকলেই জানেন। এইরূপ প্রভেদের হেতু যে ক্রিয়াজনিত তাহার সন্দেহ নাই। দোহন কালে গৃহপালিত গাভীর দুগ্ধস্থলী যেরূপ প্রত্যহ টানা হয়, তাহা দেখিলেই প্রভেদের কারণ বুঝা যায়।

অনেকে বলেন যে, চতুষ্পদদিগের বন্য অবস্থায় কর্ণের অগ্রভাগ ঊর্দ্ধমুখে থাকে, অর্থাৎ তাহাদের কাণ খাড়া থাকে, তাহাদের কর্ণের গঠনই ঐরূপ। কিন্তু গৃহপালিত হইলে কিছু পুরুষ মধ্যেই তাহাদের কাণ ঝুলিয়া পড়ে। ডারউইন সাহেব বলেন যে, শব্দ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, বিশেষতঃ কোন্ দিক হইতে শব্দ আসিতেছে তা স্থির করিবার নিমিত্ত, চতুষ্পাদদিগকে সর্ব্বদাই কর্ণ উত্তোলন করিতে হয় ; কিন্তু গৃহপালিত অবস্থায় তাহার প্রায় প্রয়োজন হয় না। ক্রমে সঞ্চালন ও ক্রিয়া অভাবে কর্ণের শিরা ও বলমাংস দুর্ব্বল হইয়া যায়, কর্ণ ঝুলিয়া পড়ে।

র‍্যাঙ্ক সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, যে অঙ্গ সঞ্চালিত হয়, সঞ্চালনের সময় সে অঙ্গে অধিক রক্ত প্রধাবিত হয়, সঞ্চালন ক্ষান্ত হইলে রক্তস্রোতও হ্রাস পায়। কাজেই যে অঙ্গ সচরাচর সঞ্চালিত হয় সে অঙ্গের রক্তপ্রণালী বা শিরা পরিসর হইয়া উঠে, পথ পরিসর হইলে রক্ত অধিক পরিমাণে প্রধাবিত হয়, যে অঙ্গ অধিক রক্ত পায় সে অঙ্গ অবশ্য অধিক পরিপুষ্টতা লাভ করে। আমরা বাম হস্ত অপেক্ষা দক্ষিণ হস্ত সচরাচর অধিক সঞ্চালন করি, এই জন্য আমাদের দক্ষিণহস্ত বামহস্ত অপেক্ষা মোটা এমন কি বাম হস্তের অঙ্গুরী দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলীতে প্রবেশ করে না। ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসীরা বাম হস্ত ঊর্দ্ধ করিয়া রাখে, কখন নামায় না, তাহাদের সে হস্তের আর কোন ক্রিয়া হয় না। কাজেই সে হস্তে রক্তের গতি কমিয়া যায়, ক্রমে হস্তটি শুকাইয়া উঠে। অতএব অঙ্গ সঞ্চালন করিলে যেমন অঙ্গের পুষ্টিলাভ হয়, ক্রিয়ারোধ করিলেও অঙ্গের তদনুরূপ ক্ষীণতা জন্মে। পালিত হংসের পক্ষ সম্বন্ধে দৌর্ব্বলতা বা পালিত চতুষ্পদের কর্ণ সম্বন্ধে দৌর্ব্বলতা এইজন্য।

অনেকেই জানেন, মনুষ্যমধ্যে বন্যজাতিরা পুরুষানুক্রমে বিশেষ বলিষ্ঠ। কেন বলিষ্ঠ ? অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে তাহাদিগকে সর্ব্বদাই বলের আলোচনা করিতে হয়। তাহাদের মধ্যে রাজশাসন নাই, কাজেই কথায় কথায় মল্লযুদ্ধ দ্বারা বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া লইতে হয়। আগ্নেয় অস্ত্র বা যুদ্ধ কৌশল নাই, কাজেই তাহাদের জয়পরাজয় কেবল শারীরিক বলের উপর নির্ভর করিতে হয়। যে বলিষ্ঠ তাহারই জয়, যে দুর্ব্বল, সে হয় শিকারকালীন পশুহস্তে, নতুবা বিরোধকালীন শত্রু হস্তে প্রাণত্যাগ করে। কাজেই কেবল বলিষ্ঠেরা

রক্ষা পায় এবং বলিষ্ঠেরাই বংশ রাখিয়া যায়। বলিষ্ঠদের বংশ বলিষ্ঠ হয়, ইহা বৈজিক নিয়ম। আর এক কথা, বলিষ্ঠদের বলপরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতার পরিচালনা হইতে থাকে। ক্রোধ হইলে মুখের যে সকল অংশ কুঞ্চিত বা বিস্ফারিত হয়, ক্রোধের পৌনঃপুন্যে সেই সকল অংশ পুষ্টতালাভ করে। বন্যদিগকে দেখিলে যে অতি রুষ্ট বা নৃশংস বলিয়া বোধ হয়, এই তাহার কারণ। আর আমাদের বাঙ্গালিকে দেখিলে যে শান্তপ্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়, তাহার কারণ ঠিক ইহার বিপরীত। বাঙ্গালার রাজশাসন যেরূপ এক্ষণে সুপ্রণালী-বদ্ধ তাহাতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত বড় বল আবশ্যক হয় না, রাজদণ্ডের ভয়ে হউক, আর শাস্ত্রের শাসনেই হউক, বাঙ্গালায় বহুকালাবধি বড় বলপ্রয়োগ নাই; যুদ্ধ বিক্রম নাই। কাজেই পরিচালনা অভাবে বলেরও বৃদ্ধি নাই। বরং হ্রাস পাইতেছে।

ক্রিয়াগত বৈসাদৃশ্যের কথা অনেক বলা গেল, এক্ষণে খাদ্যগত বৈসাদৃশ্যের কথা কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। পূর্ব্বে ভোগজনিত বৈসাদৃশ্যেব বিষয় যাহা বলা হইয়াছে তাহা কেবল পরিমাণসম্বন্ধে, খাদ্যের প্রকারভেদে কিরূপ বৈসাদৃশ্য জন্মে তাহা বলা হয় নাই, এক্ষণে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, কোন কোন গোলাপ গাছে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাকড়সা থাকে। গোলাপের বর্ণের ন্যায় তাহাদের বর্ণ হয়; দেখিলে বোধ হয়, যেন গোলাপের পাপড়ি দ্বারা তাহাদের শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে। গোলাপের পাপড়ি ভক্ষণ করিয়া মাকড়সার এই বর্ণ হয়। অনেকে বলেন, গাঁজার বিচি* খাইলে কোন কোন ক্ষুদ্র পক্ষীব বর্ণ কাল হইয়া যায়। গুটিপোকার বর্ণ আহার অনুসারে হয়। ভারজিনিয়া দেশে এক প্রকার মূল (Lachnanthes tinctoria) আছে, তাহা আহার করিলে শূকরের অস্থি রক্তবর্ণ হইয়া যায়।

গর্ভের অবস্থা বৈসাদৃশ্যের আর একটী কারণ। প্রতিবারই গর্ব্ভের অবস্থা একরূপ থাকে না, এই জন্য প্রতিবারই প্রসবিত সন্তান একরূপ হয় না। কোন জনকজননীর অনেক সন্তান হইলে দেখা যায় সন্তানদের মধ্যে বিলক্ষণ বৈসাদৃশ্য থাকে। তাহাদের একত্রে দেখিলে বোধ হইবে একবংশজ অথবা এক গর্ব্ভজ, অথচ পরস্পরের বৈসাদৃশ্য স্পষ্ট থাকে। আবার সেই জনকজননীর যদি কোন যমজ সন্তান থাকে, তাহা হইলে দেখা যায় সেই যমজ সন্তানের মধ্যে আর তাদৃশ বৈসাদৃশ্য নাই। যমজ সন্তান একত্রে জন্মে, একত্রে গর্ব্ভে পরিবর্দ্ধিত হয়; কাজেই তাহাদের উভয়েরই পক্ষে গর্ব্ভের অবস্থা একইরূপ থাকে, উভয় সন্তান কাজেই একইরূপ হয়। একবার দুইটি যমজকন্যা জন্মিয়া-ছিল তাহাদের উভয়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি বাঁকা হইয়াছিল, উভয়েরই এক দিকে

* Hemp seed.

একই প্রকার গজদন্ত উঠিয়াছিল। এই সাদৃশ্য হঠাৎ বা অকারণ হয় নাই, সেই গর্ব্বে শত সন্তান জন্মিলে সকলেরই কনিষ্ঠ অঙ্গুলি বাঁকা হইত, সকলেরই গজদন্ত হইত। কি কারণে সন্তানের অঙ্গুলি বাঁকিয়া যায় অথবা গজদন্ত উঠে আমরা তাহা জানি না, কিন্তু তাহা যে কারণেই হউক গর্ব্ভ অবস্থায় সে কারণ ঘটিয়াছিল, তাহাই উভয় সন্তানের শরীরে তাহার কার্য্য দেখা দিয়াছিল।

অন্য সন্তান অপেক্ষা যমজ সন্তানের বৈসাদৃশ্য বড় থাকে না; কারণ তাহাদের এক অবস্থাধীনে জন্ম। অনেক যমজ এক সময়ে এক গর্ব্তে জন্মে বটে, কিন্তু হয় ত পৃথক্ পৃথক্ থলী বা পোরোর ভিতরে থাকিয়া বাড়িতে থাকে, সে স্থলে সন্তানদের মধ্যে পরস্পর অবস্থার কিঞ্চিৎ ভিন্নতা থাকে, কাজেই আকৃতি প্রকৃতিরও কিঞ্চিৎ ভিন্নতা জন্মে। কিন্তু যেস্থলে উভয় সন্তান এক "পোরোর" মধ্যে জন্মে, সে স্থলে যমজের মধ্যে একেবারেই বৈসাদৃশ্য থাকে না বলিলেই হয়। অনেক দিন হইল একবার এইরূপ দুইটি যমজের সহিত আমাদের বাস করিতে হইয়াছিল, আমরা সর্ব্বদা তাহাদের দেখিতাম অথচ সর্ব্বদাই এক-জনকে মনে করিয়া আর একজনের সহিত কথা কহিতাম। এই যমজসম্বন্ধে এরূপ ভ্রম সকলেরই হইত। তাহাদের শারীরিক ও অভ্যন্তরিক সাদৃশ্য এতই চমৎকার ছিল যে, উভয়ের পীড়া পর্য্যন্ত একই রূপ হইত। একজনের শিরঃপীড়া হইয়াছে নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ অপরটিরও শিরঃপীড়া হইবে। তাহাদের মৃত্যুও একই পীড়ায় হইয়াছিল। একজন মেদিনীপুরে ওলাউঠা রোগে মরিয়াছিল, অপরটি তৎকালে প্রায় পনের ক্রোশ দূরে ছিল; তাহারও ওলাউঠায় মৃত্যু হইল। কিন্তু প্রায় তিন চারি দিবস পরে হয়। যমজ মাত্রেরই মৃত্যুবিষয়ে এই নিয়ম নহে, আমরা আরও দুই চারিটি যমজ দেখিয়াছি একটির অনেক বৎসর পর অপটি মরিয়াছে।

অবস্থা যতই একরূপ হইবে সাদৃশ্য ততই সম্পূর্ণ হইবে। যমজদের অবস্থা অনেকবিষয়ে একরূপ, এইজন্য তাহাদের সাদৃশ্যও অতি অসাধারণ হয়। অপর সহোদরদের মধ্যে অবস্থা ততটা একই রূপ ঘটে না, এই জন্য সাদৃশ্যও তত প্রবল হইতে পায় না। সমাবস্থা সাদৃশ্যের কারণ। অসমাবস্থা বৈসাদৃশ্যের কারণ। একেবারে সম্পূর্ণ সমাবস্থা ঘটে না এইজন্য সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায় না, কাজেই বৈসাদৃশ্য সকল ব্যক্তিতে কিছু না কিছু থাকে।

এই বৈসাদৃশ্যের জন্য কতই নূতন নূতন জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, হইতেছে, ও হইবে। জাতিবৃদ্ধির ফল কি, তাহা ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু এই বৈসাদৃশ্যের নিয়ম অবলম্বন করিয়া এক্ষণে মনুষ্যেরা আপনাদের ইচ্ছানুরূপ পশু পক্ষীর আকৃতি প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া লইতেছে। তাহার আনুপূর্ব্বিক পরিচয় এস্থলে নিতান্ত অনাবশ্যক নহে, তথাপি দুই একটি কথা অতি সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

জনক জননীর সহিত সন্তানের যে বৈসাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তাহা বৃদ্ধি পাইলে ভবিষ্যতে কি দাঁড়াইবে ইহা অনুভব করিয়া কার্য্য করিতে পারিলে গঠন সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন করান যাইতে পারে। সচরাচর পায়রার পুচ্ছে বারটি করিয়া পালক থাকে; মনে করুন এক সময়ে একটি শাবকের তেরটি পালক হইয়াছিল, একব্যক্তি সেই শাবকটিকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিল, শাবকের যখন শাবক হইতে লাগিল, তখন তাহাদের মধ্যে কোনটির পূর্ব্বমত বারটি পালক হইল, কোনটির তেরটি পালক হইল। দুই সম্ভব, কেন না কোন সন্তান পূর্ব্ব-পুরুষের মত হয়, কোন সন্তান বা জনক জননীর মত হয়। যে পায়রা গুলির তেরটি করিয়া পালক হইল, তাহাদের আবার শাবক হইলে পূর্ব্বমত কোনটির বারটি পালক, কোনটির তেরটি পালক, আবাব কোনটির চৌদ্দটি পালক হইল। চৌদ্দটি পালক হওয়া অসম্ভব নহে, কেন না যে বৈসাদৃশ্যের নিয়মে বারটি পালকের স্থলে তেরটি পালক হইয়াছিল, সেই নিয়মে তেরটি পালকের স্থলে চৌদ্দটি হইল। এইরূপে কতকগুলি পায়বার পুচ্ছে পুরুষপরম্পরা পালক বাড়িয়া এক্ষণে বাইশটি পালক হইয়াছে। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র স্থানে সেই বাইশটি পালকের কেবল অগ্রভাগ আবদ্ধ থাকায় তাহার অপর ভাগ ছাড়িয়া পড়িয়া ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় হইয়াছে। এই পায়রা গুলিকে এক্ষণে লক্কা নাম দিয়া স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, বাস্তবিকও ইহারা স্বতন্ত্র জাতি দাঁড়াইয়াছে।

যে ধান্য বাঙ্গালায় ঘরে ঘরে ব্যবহার হইতেছে, তাহার আদি কি ছিল অনুসন্ধান করিলে বৈসাদৃশ্যের ফল বুঝা যাইবে। ধান্য গাছের আদি একপ্রকার ক্ষুদ্র ঘাস মাত্র। সেই ক্ষুদ্র ঘাস প্রথমতঃ কর্ষিত ভূমিতে বোপণ করা হয়। কর্ষিত ভূমিতে ঘাস পুরুষপরম্পরা রোপিত হইলে তাহাদের বৈসাদৃশ্য আরম্ভ হইল, কোন ঘাসটি পূর্ব্বতম ক্ষুদ্র রহিল, কোন ঘাসটি বড় হইল। যে গুলি বড় হইল বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের বীজ লইয়া পুনরায় আবার একস্থানে রোপণ করা হইল; আবার সেই স্থানের বড় বড় ঘাস হইতে ভাল বিচি বাছিয়া রোপণ করা হইল। এইরূপ করিতে করিতে শেষ এই ধান্য দাঁড়াইল। নির্ব্বাচন এই উন্নতির মূল। এখনও যদি বীজ বাছনি করিয়া রোপণ করা হয়, এখনও ধান্যের আরও উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের কৃষকেরা এবিষয়ে আর বড় মনোযোগ করে না। তাহারা এক্ষণে কেবল পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি করে। কিন্তু সে দোষ তাহাদের নহে। বাণিজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিমাণের বৃদ্ধি আবশ্যক হইয়াছে। কৃষকেরা সেই আবশ্যকোপযোগী ধান্যের উৎপাদন করিবার উপায় করিতে পারিলেই আবার এবিষয়ে মনোযোগী হইতে পারিবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গোয়েন্দা

শান্তিপুবে শান্তিব শেষ হইযাছে। আমরা সে দিন সিংহবাবুদের বাটী হইতে বিদায় হইবার পরক্ষণে যে বাদ্য শুনিতেছিলাম সেই বাদ্যশেষই উৎসবের শেষ—সেই বাদ্যই সিংহদেব শেষ গর্জ্জন। বক্ষাকালীর পূজা হইয়া গিয়াছে। থানায় সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে গ্রামে বিসূচিকার পীড়ায় হুলস্থুল পড়িয়াছে। বাবু শিবসহায় সিংহের কন্যা কাদম্বিনী নাই, এমতও একটী জনরব ব্যাপ্ত হইয়াছে। একটী সজ্জিত চিতাতে নিশীথ শেষে তাহাকে দাহ করিতেও দেখিয়াছেন, কেহ কেহ কহিযা থাকেন। গবাক্ষে, ছাদে, স্নানাগারে, দেবমন্দিরে কেহ তাহাকে কোথায় দেখিতে পায় না, নাপিতবধূ তাহাকে আলতাভরণ দিতে যাইয়া নৈরাশে ফিরিয়া আসিয়াছে। সকলে বিমর্ষ, রক্ষাকালীর বিসর্জ্জনের সহিত সিংহবংশের আমোদের বিসর্জ্জন হইয়াছে, কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, বিপদ খণ্ডন হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইয়াও হইল না, আমাদের দেশে গোয়েন্দার অভাব নাই—আসল কথা ব্যক্ত হইয়াছে। ছিদ্রানুসন্ধায়ী মহাত্মা গোয়েন্দা! তোমার অগম্য স্থান ভারতে কোথায় আছে? যে রাজনিকেতনে দণ্ডধারী ভীষণ প্রহরীর পাহারা সেখানেও তুমি! সভাপতি, অধ্যাপক, মোসাহেব, সম্পাদক সাজিয়া দেশের খবর দিয়া থাক। যে স্নানাগারে রাজমহিলা পিপীলিকার প্রবেশদ্বার পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিয়া স্নিগ্ধ হইবার আশা করেন সেখানেও তুমি। সেকেন্দরের জয়পতাকা তুমিই ভারতে উত্তোলন কর, যবন পতনের পথ তুমিই না দেখাইয়া দাও? তোমার কথায় ব্রাহ্মণবৃত্তির লোপ, সংস্কৃতশাস্ত্রের লয়প্রাপ্তি, তোমার প্রভাবেই আজ সিংহবংশের ঘোর বিপত্তি।

* আমাদের নূতন রাজ্য-বিভাগ স্থাপন হইয়াছে, সরকার বাহাদুর বাছিয়া বাছিয়া একটী সুযোগ্য কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছেন, তিনি ছালা ছালা ইংরেজি পুস্তক

পাঠ করিয়া কত শত আলমারী খালি করিয়াছেন, কয়েক বৎসর কালেজের অধ্যাপক থাকিয়া শিক্ষকশ্রেণীতে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, বিষয় বুদ্ধিতে মন উথলে পড়িতেছে, নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শিষ্টপালন করিবেন, দুষ্ট দমন করিবেন বলিয়া উৎসাহে মন পরিপূর্ণ, তাঁহাকে ঠকাইতে পারে এমন কে আছে? দরখাস্ত পড়িলেই তিনি বাদীর মনের ভাব জানিতে পারেন। কাগজ পাঠ হইতে হইতেই মৌলবী সাহেব কহিয়া উঠিলেন, "দারগা একটা মিথ্যা রিপোর্ট লিখিয়াছে যে, কাদম্বিনীর বিসূচিকা পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে। এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিতেছি যে অমূলক ইজ্জতের ভয়ে সিংহ বাবুরা একটি ফেরেব বানাইয়াছেন, ইহার বিহিত উপায় করা যাইবে।"

পরদিন প্রভাত, সিংহবাবুর কুপ্রভাত হইল; বৈঠকখানার পার্শ্বে একটি কুঠরী বাবু শিবসহায় সিংহের শয়নগৃহ, তাহার গবাক্ষদ্বার সিংহবাবু উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন, কাল কাল পাগড়ী ও বড় বড় লাঠি হস্তে কতকগুলি যমদূত তাঁহার গৃহ বেষ্টন করিয়াছে। নাজির ঘোটকারোহণে বাটীর চতুষ্পার্শ্বে পরিভ্রমণ করিতেছেন, সকলকে সতর্ক করিতেছেন ও কহিতেছেন, "খান বাহাদুরের ঘোড়া আগত প্রায়।" বাবু শিবসহায় এখন বিপদ সম্মুখে দেখিয়া কালী তারা ডাকিতে লাগিলেন, ও ভাবিলেন ইহার অর্থ কি? কি অপবাধ করিয়াছেন তাহাও স্থির কবিতে অক্ষম, ভাবিতে ভাবিতে অস্থির হইতেছেন এমত সময় তাঁহার বিশ্বাসী ভৃত্য রামা পবামাণিক গৃহেব দ্বার ধীরে ধীরে খুলিল। বৃদ্ধবাবু চমকিত হইলেন, মনে করিলেন এই ধরিল, রামা অতি মৃদু স্বরে কহিল "আমি।"

শিব। আবে আমি কে?

রামা। আজ্ঞা, আমি।

শিব। ফের আমি, নাম কি?

রামা। আমি রামপ্রসাদ।

শিবসহায় বাবু নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন রক্ষা হউক, সংবাদ কি বলিতে পারিস্?

রাম। পারি, মহাশয়—আমি—

শিব। তুই "আমি" ছাড়িবি না?

রাম। আমিই ভগবান্ মহাশয়—তা—

শিব। আ! আবে খবর বল।

রাম। আমি যেই জাগ্রত ছিলাম তাই রক্ষা। রাত্রি দুই প্রহরের সময় শঙ্কর সর্দ্দার কহিল যে, কাদুদিদিকে হাজির করিবার জন্য স্বয়ং হুজুর আসিবেন, আমি তখনি তার উপায় করিয়াছি।" রামার এই কথা শেষ না হইতেই দ্বারে

একটি আঘাত হইল, ও সঙ্গে সঙ্গে নাজির সাহেব কহিলেন "ও বাবু শিবসহায় সিংহ! আপনাকে হাজির করিবার জন্য হাকিম সাহেবের হুকুম পাইয়াছি।"

বাবু শিবসহায় সিংহ ক্ষণমাত্র কালী স্মরণ করিলেন, চক্ষু মুদিলেন, কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, ভাবিলেন, যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ রক্তবিসর্জ্জন ও প্রাণদানে রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন, এখন আইনের গৌরবে সেই রাজ্যে উচিত প্রতিফললাভ সম্ভাবনা। আবার ভাবিলেন ঈশ্বরের বিড়ম্বনা, পিতৃলোক যে যবনরাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন এখন সেই যবনের হস্তে তাঁহার বংশের অনিষ্ট হওয়া চাই—আবার ভাবিলেন, "আমার বল কোথায়? গ্রামে যে সহস্র যুবাপুরুষকে ব্যায়াম শিক্ষা দিয়া যুদ্ধপটু করিয়াছিলাম, যাহাদের মধ্যে এক ষোড়শ বৎসরের ছোকরাব সাহায্যে সহস্র সহস্র সড়্‌কি ক্ষেপণে সেই অত্যাচারী নীলকর বিডেল সাহেবকে সম্মুখযুদ্ধে পরাভব করিয়া দেশচ্যুত করিয়াছিলাম সে বল কোথায়? কেহ প্লীহাগ্রস্ত, কেহ মেলেরিয়া জ্বরাক্রান্ত, অনেকেই জীর্ণ হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে—হউক তবু ইজ্জত রক্ষা চাই।" রামাখানসামা এই সময় কাণে কাণে কহিল বাবুমহাশয় কাদম্বিনী দিদিকে হরণ করিতে দিব না—গোপাল চৌকিদারকে বলে সেই ভোবরাত্রেই জলছেঁচা মবায়ের ঘরে লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি।"

এই সময়ে গোপাল চৌকিদাব উপস্থিত হইল, সে শিবু বাবুকেই প্রভু বলিয়া জানে, অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁহার অন্নদাস, নাজির সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল, "আপনারা যাঁহাকে তল্লাস করেন তিনি কি আছেন?" কর্ণে যেমন এই বাক্য প্রবেশ, অমনি নাজির সাহেবেব হস্ত হইতে গোপালের পৃষ্ঠে জোড়া চাবুকের আঘাত বর্ষণ!

গোপা। ওগো আছেন—আছেন,—আছেন।

নাজির সাহেব বলিলেন "পথে আয়, কোথায় বল—বল কোথায়?"

গোপা। যথায় থাকুন বাবুদের বাটীশূন্য।

নাজি। তবে কোথায় বল্—নাজির সাহেব কিঞ্চিৎ শান্তমূর্ত্তি হইয়া মনে করিলেন সন্ধান পাইব।

নাজির। কোথায় আছে বল।

গোপাল করযোড় করিয়া কিঞ্চিৎকাল করঘর্ষণ করিয়া কহিল "বৈকুণ্ঠে।" আবার বেত বর্ষণ হইল। গোপালের চীৎকারে বাবু শিবসহায় অন্যমনস্ক হইয়া গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন ও তৎক্ষণাৎ নাজির সাহেবের ইঙ্গিতে আসামী মধ্যে গণ্য হইলেন।

শিব। আপনি মহকুমার নাজির সাহেব, আমার কন্যা জীবিত আছেন কি না তাহাই সন্ধান করিতে আসিয়াছেন।

নাজির সাহেব কহিলেন "আর তাঁহাকে লইয়া কাছারীতে হাজির করিতে আদেশ পাইয়াছি। তিনি কোথায়?" গোপাল চৌকিদার কহিল "জলমগ্ন।" নাজির সাহেব আবার বেত উঠাইয়াছেন এমন সময় একজন অশ্বারোহী পুলিস কর্ম্মচারী আসিয়া তাঁহার কাণে কাণে কহিলেন "মহাশয় একটা সন্ধান পাওয়া গেল, একটী কুলকন্যা এই গোপাল চৌকিদারের গৃহ হইতে উহার স্ত্রীর সহিত বহিষ্কৃত হইয়া শ্রীনগরের দিকে যাইতেছে, সেই লাবণ্যময়ী যুবতী মলিনবসনা কিন্তু মেঘাচ্ছাদিত চন্দ্রিমার ন্যায় আরো সুন্দরী দেখাইতেছে। শুনিতেছি যাঁহার সন্ধানে আসিয়াছি সে কন্যা আর আমরা পাইব না।

নাজির। শ্রীনগর? দ্রুত যাও, ও স্ত্রীদ্বয় যে হউক পথিমধ্যে ধৃত কর।

আদেশমাত্র দুইটী সজ্জিত অশ্বারোহী পুরুষ তীরবেগে ধাবিত হইল। শিবসহায়, কালীর নাম অন্তরে জপিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

জলমগ্ন

দেওয়ান গজানন হঠাৎ সিংহবাবুদের দরজায় নাজির সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত। "বলি মিথ্যা এখন ত আর মিথ্যা রহিল না, মিথ্যাই সত্য হল, কাদম্বিনি কন্যা অদ্য পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন না ছিলেন ভগবান্ই জানেন, রঘুবীরই জানেন—কিন্তু যদি আজ যা দেখিলাম, যদি মহাশয়! আঁখিদ্বয়কে বিশ্বাস করিতে হয়, তবে সব সন্দেহই ভঞ্জন হইল, কাদম্বিনী জলমগ্না। আমি ব্রাহ্মণী নদী পার হইয়া একশত বিঘামাত্র আসিয়াছি, দেখিলাম, জনাব নাজির সাহেব! শুনুন মহাশয় শুনুন, আপনারই অনুচর হইবেক, দুই অশ্বারোহী পুরুষ ধাবমান, বামপার্শ্বে রাস্তা ছাড়িয়া দুটি অনাথিনী অবলা নদীর ঘাটে ত্বরিত উপস্থিত ও নৌকায় আরোহিত; ঐ স্ত্রীদ্বয় মধ্যে, একজন একটি নিজ অঙ্গ হইতে কি একটী সামগ্রী পাটনির হস্তে অর্পণ করিবামাত্র খিলা নৌকা ঘাট হইতে ত্বরিত চালিত হইল। এদিকে অশ্বারোহী উভয়ে 'নৌকা রাখ রাখ' বলিয়া গম্ভীরস্বরে পাটনিকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু আজকাল বন্যার জলে উভয় কূল টইটম্বুর; এক টানা, নৌকা রেলের বেগে চলিল ও বাদশাহী ভগ্ন সাঁকোর নিকট যাইয়া সেই পাকা নেড়া থামের উপর যেমন পড়িল একটি পতঙ্গের ন্যায় জলস্রোতে ভাসিয়া নৌকাটি নয়নপথের বহির হইল, একটি গোল উপস্থিত হইয়া থামিল, বোধ হইল নৌকা চুরমার হইয়া তর্কালঙ্কারের আশ্রমের ঘাটের নিকট জলমগ্ন হইল, ছারখার হায় রে! ছারখার!"

এই কথাগুলি শেষ না হইতেই অশ্বারোহী উভয় পুরুষ আসিয়া উপস্থিত। একজন কহিয়া উঠিল "মহাশয় সব চেষ্টা বিফল, স্ত্রীলোকের এমন বুদ্ধি ? আমরা প্রায় ধরে ছিলাম একটি স্বর্ণালঙ্কার পাটনির হস্তে দিয়া পার হইতে যাইয়া নৌকা সহিত জলশায়ী হইয়াছে, নিরুপায় হইয়া মহাশয়ের নিকট প্রত্যাগত হইয়াছি।' নাজির সাহেব ভাবিয়া বসিয়া পড়িলেন। সমুদয় নারাসাই, দেখিতে দেখিতে আসামী হস্তান্তর ! কি কৈফিয়াৎ দিব ! নাজির সাহেব মনে মনে ভাবিতেছিলেন— গজানন তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেছেন ও এক কথায় মোকদ্দমা ফাঁস করিবার বুদ্ধি রচনা করিতেছেন। কিঞ্চিৎকাল সকলে নিস্তব্ধ, এমন সময় সম্বাদ আসিল যে খাঁ বাহাদুর অদ্য স্বয়ং আসিতে অক্ষম, সাহেব ঘোড়া চড়িতে হঠাৎ অপারগ হইয়াছেন। সংবাদদাতা হরকরা কহিল "মহাশয় সব প্রস্তুত, সাহেব পোষাক পরিয়া টুপি লাগাইয়া ঘোড়ার নিকট উপস্থিত হইয়া চসমা বাহির করিয়া দেখিলেন একটি পরকলা ফাটিয়া গিয়াছে, আব ঘোড়া চড়া হইল না—" অশ্বারোহণের সহিত চসমার সম্বন্ধ বিচাব করিতে অনেকেই অক্ষম, কিন্তু খাঁ বাহাদুর আণ্ডা আহার করিতে প্রবৃত্ত হউন, বিচাবাসনে রায় লিখিতে প্রবৃত্ত হউন, আল্‌বালার লম্বা নল ধারণে প্রবৃত্ত হউন, বেগম সাহেবের মহলেই যান, বা ঘোড়া চড়ুন, বা যাহাই করুন সকল কার্য্যেই তিনি চসমা ব্যবহার করিতেন কিন্তু তাহা যে কেবল শোভা বর্দ্ধনের নিমিত্ত এমত নহে, তিনি আদৌ দেখিতে পাইতেন না শুনা যায় যে চসমা ভিন্ন তাঁহার শয্যায় সুনিদ্রা আসিত না—চসমা ভিন্ন তাঁহার স্বপ্ন দেখিতেও কষ্ট হইত। যাহা হউক সামান্য কারণ হইতে বৃহৎ ফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে—আজ চসমা ভাঙ্গাতে অনেক অবসর ও গজাননের বুদ্ধিচালনার সুসময় হইল। গজানন নাজিরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন "মহাশয়ের কি অভিপ্রায় ? যখন আমি আসিয়াছি যা চাহিবেন তাহাই সিদ্ধ হইবে। আমার নাম "গজানন চৌধুরি, হাকিমদের খিদমতেই আমি চিরকাল কাটাইলাম।" যেমন ফ্রি মেসনারী দলভুক্ত ব্যক্তি আপন ধর্ম্মাক্রান্ত লোককে ইঙ্গিতে চিনিতে পারে দেওয়ানজীর অঙ্গুলিবিক্ষেপণে ও নাক চোকের ভঙ্গিতে নাজির সাহেব তাঁহাকে নিতান্ত আত্মীয়মধ্যে গণ্য করিয়া একটী সেলাম করিয়া কহিলেন "মেহের বান হুজুরের, আপনিই বাবু সাহেবের দেওয়ান ?" গজানন শুধ সমেত সঙ্গে সঙ্গে সেলাম প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন "কার্য্য পরে, এখন খানার উদ্যোগ করা যায় ?" খানার নাম মাত্র "দুধ" আর "বক্রি" "রুহিমাছ" আর "তরকারী" ও গণ্ডা আষ্টেক "আণ্ডার" বরাত হইল, চারিদিকে লোক ছুটিল, কাছারি যেরূপ গরম হইতেছিল অনেক ঠাণ্ডা পড়িল। গজানন আবার কহিলেন, "মহাশয়, এখানে বড় চমৎকার রেসমের চারখানা হয়—আপনার যে ইজের দেখিতেছি ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্ত্র,

জানানার বেগম সাহেব সে কাপড় বড় ভালবাসিবেন। এই যে বাবুদের ঘরে আপনি আসিয়াছেন, লক্ষ্ণৌ, সাসিরাম, বাণারসের মহাজনদের সঙ্গে এদের কারবার বরাবর প্রচলিত রহিয়াছে—এরা লক্ষ্ণৌয়ের টুপি ও বেনারসী মুবেটার ব্যবসা করেন, পছন্দ হয় তো খরিদ করুন।" আবার নিম্নস্বরে কহিলেন "বন্দাও আপনার ঘরের লোক, মর্জ্জি হয় তো তুই চারিটা দ্রব্যের নজর দিবার অধিকার!" পরক্ষণেই প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকের কামরাতে নাজির সাহেব গজাননের সহিত একটি গালিচার উপর তাকিয়া ঠেশ দিয়া, সযত্নে হাটুদ্বয় অগ্রসর করিয়া ও তাহার তলে পদযুগল গজকাটির ন্যায় মুড়িয়া, আবার ছুটি হাত উল্টাইয়া ফরাসের উপর ভর দিয়া, একটী সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির লোকের ন্যায় বসিলেন—একজন ভৃত্য একটি বড় তালবৃন্ত লইয়া হেলাইতে লাগিল, বায়ু সঞ্চালন হইলে নাজির সাহেব একবার টুপিটি উঠাইলেন, দেখিলাম তাঁহার মস্তকের চতুষ্পার্শ্বে যেরূপ প্রচুর কেশ, মধ্যে সেরূপ নহে—চাঁদিটিতে তীক্ষ্ণ ক্ষুর পরিভ্রমণে গোল শাদা জমি বাহির করিয়া দিয়াছে, বোধ হয় সেইটী দেখাইতে লজ্জিত হইয়া পাগড়ি ঈষৎ ঊর্দ্ধ করিয়াই আবার তৎক্ষণাৎ পরিলেন, কিন্তু জটাধারী তাঁহার ফাঁকা মাথা দেখিয়া লইলেন। আবার দেখি, আমাদেব চাপকাণের যে দিকে বোতাম তার বিপরীত ভাগে নাজির সাহেবের চাপকাণ আবদ্ধ। কেবল নাজির সাহেবের ও দেওয়ানজীর সহিত একটী বিষয়ে সাদৃশ্য—চসমার ডাটি উল্ট পরান নহে। নাজির সাহেবের খানসামা তাঁহার একখানি ধুতী আনিল। দেখিলাম তাহাও কাছা বিহীন। মনে করিলাম উভয়েরই কাছা নাই বলিয়া অল্প কালের মধ্যে এত সম্প্রীতির উদয় হইল, যাহা হউক এখন উভয়ে বসিয়া কাজের কথায় প্রবৃত্ত। একটী পরওয়ানা পাঠের উপক্রম করিতেছেন এমন সময় রাজকার্য্যনিষ্পাদক আর এক অবতারের আবির্ভাব হইল—ইনি বড় লোক, রাণীর বাজারের ডাকমুন্সি পূর্ণচন্দ্র গাঙ্গুলী। ইনি বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টকে মানেন না, তদধীনের কর্ম্মচারীদের ভ্রূক্ষেপ করেন না। বলেন আমরা ওদের গ্রাণ্ড ফাদার, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট গবর্ণব জেনারেলের কার্য্যকারক। ইনিই সেই গাঙ্গুলী মহাশয় যিনি বাতার বাখারীর কলমের একপাশে ইংরেজি লিখিতেন ও অন্যদিকে ডাকঘরের থামের চূণ খসাইয়া বদনে অর্পণ করিয়া পানের ঝাল নিবারণ করিতেন। ইনিই আবার সেই প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জন্য ডাক্তার ইটওয়াল সাহেবের নিকট চূণ খরিদের নিমিত্ত মাসিক এক মুদ্রা বেতন বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন। ইহার প্রভুত্ব প্রতিপত্তি এক্ষণেও এ অঞ্চলে বিখ্যাত। আজ অনেকে হাকিমের কথা শুনিতেছিলেন কিন্তু নাজির সাহেবের উপরেও হাকিম আছে এই কথাটি জারি করিবার জন্য ইহার আগমন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিধানে একটি সামান্য ধুতী, তাহাতেই উদয়ের তৃতীয় অংশ বক্ষঃস্থলের কিঞ্চিৎ

নিম্ন পর্য্যন্ত আবৃত ; তদুপর একটি মারকিনের হাত খাট বেনিয়ান—খাট খাট চুল, প্রায় বারো আনা পাকা অবশিষ্ট মাত্র কাঁচা, কপাল উন্নত—ওষ্ঠদ্বয় পরিষ্কার ও দন্তপাটি আরও উজ্জ্বল, চক্ষুর্দ্বয় বৃহৎ। নাজির সাহেবের সহিত চার চক্ষে—বরং আট চক্ষে—কারণ উভয়েরই চসমা ছিল—একত্র হইল। নাজিরের চসমা চিক্কণ—গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের চসমা চৌড়া পিতলের হাসিয়াদার কলঙ্কময়। পিছনে সূত্র দিয়া টিকির নীচে আবদ্ধ। নাজির সাহেবকে দেখিবামাত্র আপনার চসমাদ্বয় মাথার চুলের উপর উঠাইলেন। তাহাতে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে একটী চতুর্লোচন মানুষ বোধ হইল—ও একবার গর্জ্জন করিয়া কহিলেন "আপনিই বুঝি নাজির ? এ আপনার কোন দেশী নাজিরী ? আমরা কি কখন নাজির দেখি নাই, নাজির ! নাজির ! নাজির ! কাল ডাক্তার ইটুয়াল আসিবেন, আপনি আজ আমার ডাকঘরের হাতা হতে বেহারা ধরিতে পাঠাইয়াছেন, বক্রি, মুরগি, আণ্ডা এসব বুঝি আপনাব জন্য গণ্ডায় গণ্ডায় সংগ্রহ হতেছে ? ঐ এক বিবাহের বরযাত্রীসহ দশখানি পাল্কির বেহারা আটক করিয়া দিলাম। আর আপনাকে কহিয়া যাইতেছি আমার একটি কাহার, একটি কুলি, আধখানি বাঙ্গিদার পাইবেন না। এখন, কাহারও পাল্কি চড়া হউক না হউক ঘরে যাওয়া হউক আর না হউক, আমি বলে রাখলাম।" দেওয়ান গজাননের প্রতি এতক্ষণে ডাকমুন্সি মহাশয়ের চক্ষু পড়িল। গজানন কহিয়া উঠিলেন "ও মহাশয়, ঘরের কথা, আমি এখানে আছি ; আপনিও হাকিম, উনিও হাকিম।" গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন "হাকিম হলেই হয় না, হকিয়তের বিচার করা চাই, ন্যায় অন্যায় প্রভেদ করা চাই কি না ?"

দে। সে শক্তি কি সকলের আছে একবাব অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গাঙ্গুলী "বলিবার কি অবসর আছে !" বলিয়া বেনিয়ানের জেব হইতে একটি চূণের ডিবার মত ঘড়ি খুলিয়া কহিলেন "মেল ব্যাগ প্রস্তুত করিতে হইবে আর টাইম (সময়) নাই।" আমি তত বড় ঘড়ি কখন দেখি নাই—কহিলাম ওটা ঘড়ি না তাল আঁটি ?—আম পাড়া ঘড়ি ?

গাঙ্গুলী "এ ছোকরা কে হে, পাক্কা ছেলে !" এই কথাগুলি কহিতে কহিতে প্রস্থান করিলেন।

এখন শিবসহায় সিংহের অজ্ঞাতে এই স্থির হইল কাদম্বিনীকে বিচারালয়ে উপস্থিত করাই উচিত। কিন্তু কাদম্বিনী কোথায় ? সাজাইতে হইবে ! দেওয়ানজী নাজির সাহেবের কাণে কাণে কি কথা কহিলেন নাজির সাহেব মস্তক হেলাইয়া সম্মতি প্রদান করিলেন। একটী শত মুদ্রাপূর্ণ বগলি কক্ষ হইতে বাহির করিয়া চারিদিকে চাহিয়া নাজির সাহেবের প্রতি অভয় ও সদ্ভাবপ্রকাশক দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিয়া থলিটি ত্বরিত নাজির সাহেবের তাকিয়ার নীচে রাখিলেন। বাহিরে জানালার নিকট হইতে রঘুবীর তাহা দেখিল, সুখাদ্য মাংসখণ্ড দৃষ্টে লোভী কুক্কুর যেরূপ লোভদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহার নয়নে সেইরূপ লোলুপ্য দেখা গেল! ইতিমধ্যে আবার সংবাদ আসিল যে আগামী কল্য প্রাতেই খাঁ বাহাত্বর সারে জমিনে পৌঁছছিবেন ও মোকদ্দমা এই খানেই তদন্ত ও নিষ্পত্তি করিবেন। পরদিন প্রাতে নাজির সাহেব গাত্রোত্থান করিয়া পোষাক পরিয়া তাকিয়ার তল হইতে থলিটি লইতে যান, দেখেন তাহা অপহৃত হইয়াছে—পশ্চাদ্ভাগে জানালার রেল ভাঙ্গিয়া সিঁদ দিয়াছে—কথা প্রকাশ করিবার যো নাই চোরের টাকা বাট পাড়ে লইয়াছে হুজুরের ঘরে চুরি এক শত মুদ্রাই বা কোথা হইতে আসিয়াছিল? গজানন জানেন কে লইয়াছে, রঘু বন্ধকী জাইগির উদ্ধারের উপায় করিয়াছে—ভরিক্কে ভরি উঠাইয়াছে।
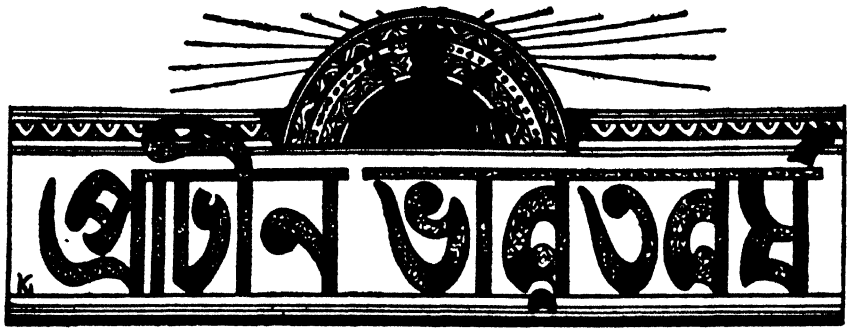
বৈদেশিক চিত্র

অনেকে বিবেচনা করেন যে প্রাচীন ভারতবর্ষের * ইতিহাস চিরকাল অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে। সচরাচর ইতিহাস বলিতে লোকে যেরূপ বুঝে, তাহাতে একপ্রকার বিবেচনা কবা নিতান্ত অন্যায় নহে। কোন স্থানে পর্য্যায়ক্রমে কে কে রাজা ছিলেন; প্রত্যেক রাজা কোন্ সময়ে কত বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কতকাল রাজত্ব করেন; তাঁহার কয়টী ভ্রাতা, ভগিনী, মহিষী, পুত্র, কন্যা,—কত দাস, দাসী, অশ্ব, হস্তী, পদাতিক, ধন ছিল; তিনি কোন সময়ে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন, দিবারাত্রি মধ্যে কতবার নিদ্রা যাইতেন, এবং জাগরণ সময়ে কখন্ কি কার্য্য করিতেন; তিনি আহার বিহার বিষয়ে পরিমিতাচারী কি অমিতাচারী ছিলেন; কে কে তাঁহার প্রিয়পাত্র, সেনানী বা মন্ত্রী ছিল; কি পরিমাণে তিনি রাজ্যশাসন কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন; কতদূর তিনি আপনার, কতদূর বা পরের বুদ্ধি অনুসারে চলিতেন; কি কারণে কতবার তিনি সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া কোন্ কোন্ নগর নগরী ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন, কোন্ কোন্ দেশ নররুধিরে প্লাবিত করিয়াছিলেন, স্বপক্ষ বিপক্ষ কতলোক শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কোথায় কোথায় জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, এবং কোথা হইতে বা ভগ্নমনোরথ হইয়া ম্লানমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন; ইতিহাস নামধারী অধিকাংশ গ্রন্থই এইরূপ বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ইহা বলা বাহুল্য যে প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজবংশাবলীর এ প্রকার বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। ভারতবর্ষ প্রকাণ্ড দেশ আয়তনে রুসিয়া নরওয়ে ও সুইডেন বাদে ইউরোপখণ্ডের তুল্য, এবং অতি পূর্ব্বকাল হইতে

---

* Ancient India as described by Megasthenes and Arrian by J. W. McCrindle M. A., Principal of the Government College, Patna.

অনেক রাজ্যে বিভক্ত। প্রত্যেক রাজবংশের প্রত্যেক রাজার কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ করিতে পারি, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা এরূপ উপকরণ রাখিয়া যান নাই। হয়ত, তাঁহারা নশ্বর মানবজীবনের ঈদৃশ ঘটনাবলী বর্ণনা করা বিশেষ প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিতেন না। যাহা হউক, কোন কোন রাজবংশের নামাবলী, এবং কোন কোন রাজার দুই একটী মহৎকার্য্যের উল্লেখ ব্যতিরেকে, এ সম্বন্ধে আমাদিগের বাসনা চরিতার্থ করিবার কোনরূপ সম্বল নাই।

কিন্তু এক্ষণে ক্রমে ক্রমে উন্নতবুদ্ধি জ্ঞানিগণের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে রাজা বা সেনানীর জীবনবৃত্তান্ত ইতিহাস নহে। ব্যক্তিবিশেষের কার্য্যাবলী ইতিহাসের পটে অল্পস্থান মাত্র অধিকার করিতে পারে; সমাজের পরিবর্ত্তন প্রদর্শনই ইতিহাসের প্রকৃত বিষয়। সুতরাং ঐতিহাসিক চিত্রে রাজা অপেক্ষা সর্ব্বসাধারণ প্রজাগণের প্রাধান্য। লোকের রীতি, নীতি, জ্ঞান, ধর্ম্ম, শিল্প, শাস্ত্র, কৃষি, বাণিজ্য, ধন, বল প্রভৃতি কালে কালে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা লিপিবদ্ধ করাই ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাচীন ভারতবর্ষের এরূপ ইতিহাস লিখিবার উপকরণ নাই আমরা মনে করি না। প্রথমতঃ আমাদিগের মন্ত্রময় ঋগ্বেদ আছে, ইহা হইতে তাৎকালিক সমাজের অবস্থা জানিতে পারা যায়। সে অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। তৎকালে আর্য্য দস্যু দুইবর্ণের সংগ্রাম চলিতেছিল। আর্য্যেরা শুক্লবর্ণ, দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ। আর্য্যেরা সপ্তসিন্ধু প্রদেশ (পঞ্জাব) অধিকার কবিয়া গঙ্গা যমুনা ও সরযূ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহাবা দলবদ্ধ হইয়া গ্রাম এবং পুর বা নগরে বাস করিতেন। কোন কোন পুর শতভুজী, প্রস্তরনির্ম্মিত বা লৌহময় বলিয়া বর্ণিত। সমাজে কার্য্যবিভাগ দাঁড়াইয়াছিল। অধিকাংশ লোকে কৃষিকার্য্য করিত; অনেকে বাণিজ্য ব্যবসায় করিত, কতকগুলি যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত ছিল; কতকগুলি দেবপূজাদি করিত। কিন্তু ইহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলিয়া গণ্য হইত না। রাজা সমাজপতি ছিলেন। রাজাদিগের বেশভূষার ও আবাসস্থানের বিলক্ষণ জাঁকজমক ছিল। সহস্রস্তম্ভ-বিশিষ্ট ও সহস্রতোরণশোভিত রাজপ্রাসাদ ও বহুচরপরিবেষ্টিত স্বর্ণবর্ম্মধারী রাজার উল্লেখ দৃষ্ট হয়; ইহার মধ্যে কবিকল্পনা থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার মূলস্বরূপ অনেকটা সত্য আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের শাসন কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন পুরে ও গ্রামে পুরপতি ও গ্রামণী নিযুক্ত ছিল। দেবপূজক পুরোহিতদিগের বিশেষ সম্মান দেখা যায়। কোন কোন রাজা তাহাদিগকে বহুসংখ্যক গো, অশ্ব, রথ ও স্বর্ণ দান করিতেন। বাণিজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছিল, এমন কি সমুদ্রপথে যাতায়াতের বর্ণনা পাওয়া যায়, এবং জানা যায় যে এই কার্য্যে শতদাঁড়বিশিষ্ট নৌকা (শতারিত্রাম্ নাবম্) নিযুক্ত হইত।

সূত্রধর, ভিষক্, পুরোহিত, কর্ম্মকার, কবি, নর্ত্তকী, তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যবসায়ের উল্লেখ লক্ষিত হয়। যব ও ধান্যের চাষ হইত, এবং কৃষিকার্য্যের উপকারিতা এতদূর অনুভূত হইয়াছিল যে বৃষ্টিদাতা ইন্দ্র দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শস্যক্ষেত্রে জলসেচন করিবার নিমিত্ত কুল্যা অর্থাৎ খালও খনিত হইত। পালিত পশুমধ্যে অশ্ব, হস্তী, গো, মহিষ, মেষ, উষ্ট্র, কুক্কুর প্রভৃতি ছিল। আর্য্যগণ চিত্তোন্মাদক সোমরস বা সুরা পান করিতেন, গোমেধ অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিতেন, এবং বিলক্ষণ মাংসাশী ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল; পতির পরলোকান্তে বিধবা দেবরকে বিবাহ করিতে পারিতেন; এবং সুন্দরী মহিলামণ্ডলী স্বয়ংবরা হইতে পারিতেন। দাম্পত্যবিধির উল্লংঘনের কথাও মাঝে মাঝে শুনা যায়। স্ত্রীলোকের বেশবিন্যাস ও হিরণ্ময় আভরণে আনুরক্তি ছিল। পুরুষেরা দ্যূতক্রীড়া ভাল বাসিতেন। নৃত্যগীতেও তাঁহাদের আমোদ ছিল, এবং যুদ্ধ করিতেও তাঁহারা পরাঙ্মুখ হইতেন না। তাঁহারা ধ্বজা উড়াইয়া সেনানীর অধীনে যুদ্ধে যাইতেন। যোদ্ধাদিগের মধ্যে রথীরাই প্রধান ছিলেন। ইহারা অশ্বযোজিত রথে চড়িয়া, দেহ বর্ম্মে ঢাকিয়া, ধনুর্ব্বান্ হস্তে অগ্রসর হইতেন, এবং বাঁশী (ভল্ল), অসি, পরশু প্রভৃতি অস্ত্রও ব্যবহার করিতেন। আর্য্যেরা ইন্দ্র বা বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, উষা, বরুণ প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করিতেন, এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন কোন কোন ঋষি বুঝিয়াছিলেন যে সকল দেবতাই এক। তাঁহারা কৌশলময়ী ও ভাবপূর্ণ কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, এবং তাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রেও কিছু উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঋক্ষ প্রভৃতি নক্ষত্রপুঞ্জ জানিতেন, এবং মল মাস দ্বারা সৌর ও চান্দ্র বৎসরের সামঞ্জস্য করিতে শিখিয়াছিলেন। যে দস্যুদিগের সহিত তাঁহাদিগের সংগ্রাম চলিতেছিল, তাহারাও নিতান্ত অসভ্য ছিল না। যদিও তাহারা অনিন্দ্র, অব্রত, কৃষ্ণবর্ণ ও লিঙ্গোপাসক বলিয়া তাহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ আছে, তথাপি তাহাদিগের পরাক্রম ও উন্নতাবস্থার আভাস পাওয়া যায়। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রস্তরনির্ম্মিত বহু পুরের অধিপতি ছিল, এবং আর্য্যগণকে বিলক্ষণ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

কোন্ দেবতাকে তুষ্ট করিতে কি উদ্দেশ্যে কোন্ যজ্ঞ করিতে হইবে এবং কোন্ সময়ে কি প্রকারে ঋগ্বেদের কোন্ মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে, এইরূপ কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাপার ব্রাহ্মণগ্রন্থে দৃষ্ট হয়। এই সময়ে চতুর্ব্বর্ণভেদ ও ব্রাহ্মণ-দিগের প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়; এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের অতি সূক্ষ্ম নিয়ম হওয়াতে কিছু উপকার হয়। শুভক্ষণ বাছিয়া যজ্ঞ করিতে গিয়া জ্যোতির্বিদ্যার কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন আকারে বেদী

নির্দ্ধারিত হওয়াতে নিশ্চিত ফল প্রত্যাশায় জ্যামিতি ও গণিতের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। স্বরসংযোগে বেগদান করিতে গিয়া সঙ্গীতের আলোচনা বৃদ্ধি হয়। অর্থ বুঝিয়া বেদপাঠ করিতে গিয়া ব্যাকরণ শাস্ত্রের মূলপত্তন হয়। এ দিকে কর্ম্ম-কাণ্ডের বাড়াবাড়ী হওয়াতে গভীর চিন্তাশীল উপনিষৎকারগণ জ্ঞানপথে মোক্ষ-লাভের উপায় দেখিতে আরম্ভ করেন।

কল্পসূত্র ও স্মৃতিতে কর্ম্মকাণ্ডের এবং দর্শনে জ্ঞানকাণ্ডের বিস্তার; আর ক্ষত্রিয় শূরগণের অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপ যে সকল গাথায় গীত হইয়া বহুকাল হইতে জনসমাজের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া আসিতেছিল, সেই সকল গাথা হইতে রামায়ণ ও মহাভারতের উৎপত্তি। এই সকল গ্রন্থ হইতে দেশের অবস্থা অনেক দূর জানা যায়। তৎকালে প্রায় সমুদয় আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যদিগের অধিকৃত হইয়াছে, দক্ষিণাপথের কোন কোন স্থানে তাঁহাদিগের রাজ্য বিস্তার ঘটিয়াছে এবং অন্যান্য স্থানের বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান জন্মিয়াছে। অনার্য্যজাতীয় অনেক লোক অনার্য্যসমাজের নিম্নদেশে স্থান পাইয়াছে; এবং. দস্যুদিগের লিঙ্গোপাসনা আর্য্যধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে। যে বিষ্ণু, বেদে সূর্য্যের নামান্তর বলিয়া মধ্যে মধ্যে উপাসনার বিষয় ছিলেন, তিনি এখন একটী প্রধান উপাস্য দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যে রুদ্র বায়ু বা অগ্নির প্রচণ্ড মূর্ত্তিরূপে কখন কখন পূজিত হইতেন, তিনি লিঙ্গরূপী বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া অতি উচ্চপদে আরোহণ করিয়াছেন। সমাজের শ্রেণীবন্ধন পাকাপাকী হইয়াছে, এবং জ্ঞানীরা তাহা ছেদন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ সময়ে বুদ্ধদেবের উৎপত্তি। তিনি যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহাতে বাহ্য কার্য্য অপেক্ষা চরিত্রের উন্নতির দিকে দৃষ্টি পড়ে; এবং তাঁহার অহিংসাবাদ প্রভাবে রক্তস্রাবী বৈদিক যজ্ঞকাণ্ডের স্রোত অনেক দূর কমিয়া যায়।

বৌদ্ধদিগের সংখ্যা ক্রমে বাড়িতে থাকে; কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত মগধে যৎকালে রাজত্ব করিতেছিলেন, তৎকাল পর্য্যন্তও বৌদ্ধেরা প্রবল হইতে পারে নাই। চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে সুবিখ্যাত দিগ্বিজয়ী গ্রীক্ বীর আলেকজাণ্ডর পঞ্জাবপ্রদেশ আক্রমণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। অনন্তর আলেকজাণ্ডরের মৃত্যু হইলে পর তদীয় সেনানী সেলুকস আসিয়ার পশ্চিম বিভাগের অধিপতি হইয়া ভারতবর্ষ পুনরাক্রমণ করেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া প্রস্থান করেন। সেলুকস চন্দ্রগুপ্তকে একটি কন্যাদান করেন, এবং তাঁহার সভায় মেগাস্থিনিস্ নামক একজন দূত পাঠান। মেগাস্থিনিস্ অনেক দিন পাটলীপুত্রনগরে ছিলেন, এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখেন। এই গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই, কিন্তু আরিয়ান

(Arrian) এবং দিওদোরুস (Diodorus) ইহার যে চুম্বক লিখিয়াছেন, তাহা পাওয়া যায় ; এবং স্ত্রাবো (Strabo), প্লিনী (Pliny) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রোমক গ্রন্থকারদিগের লেখাতেও স্থানে স্থানে মেগাস্থিনিসের বর্ণনা উদ্ধৃত আছে। ডাক্তার শ্বান্‌বেক্‌ নামক একজন জর্ম্মন গ্রন্থকার এই সকল একত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং পাটনা কালেজের অধ্যক্ষ ম্যাক্রিণ্ডেল সাহেব তাহাদিগের ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদ অবলম্বন করিয়া আমরা চন্দ্রগুপ্তের সময়ের ভারতবর্ষের একটী চিত্র প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। মেগাস্থিনিস খ্রীষ্ট জন্মিবার আন্দাজ ৩০২ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে ছিলেন।

মেগাস্থিনিস বলেন ভারতবর্ষবাসীরা কখনও অন্যদেশ আক্রমণ করেন নাই, এবং আলেক্‌জাণ্ডরের পূর্ব্বে আর কেহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় করে নাই। পারসীকেরা ভারতবর্ষের কিয়দংশ হস্তগত করিয়াছিল, এরূপ কথা আছে। সিন্ধুনদের পশ্চিমস্থিত প্রদেশেব অনেকাংশ পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইত। আবিয়ানেব ভাবতবিবরণ* হইতে জানা যায় যে এই প্রদেশে হিন্দুজাতীয় লোকের বসতি ছিল, এবং তাহারা পারসীকদিগের অধীন হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে কর দিত। কিন্তু তাঁহার মতে সিন্ধুনদই ভারতবর্ষের প্রকৃত পশ্চিম সীমা। হিন্দুদিগের সিন্ধুনদ পার হইতে নাই, এই প্রাচীন প্রবাদ দ্বারাও এই মতের সমর্থন হইতেছে। মহাভারতের সময়ে গান্ধার অর্থাৎ বর্ত্তমান কাণ্ডাহার ভারতবর্ষের অংশ বলিয়া গৃহীত হইত, কিন্তু গ্রীকগ্রন্থকারদিগের লেখা দেখিয়া জানা যাইতেছে যে, চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বেই হিন্দুরা সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী প্রদেশকে বিদেশ বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষকে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত দেখেন। এইরূপ চিরকালই দেখা যায়, এবং ইহাতেই কস্মিন্‌কালে সমগ্র ভারতবর্ষের একতাবন্ধন হয় নাই। যদি কোন ভূপতি কখনও প্রবল হইতেন, তিনি মহারাজাধিরাজ, রাজচক্রবর্ত্তী বা সম্রাট্‌ বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু তিনি বিজিত রাজাদিগের নিকটে কর পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন, আভ্যন্তরিক শাসনকার্য্যে বড় একটা হস্তক্ষেপ করিতেন না। সুতরাং যদি পরাক্রান্ত উত্তরাধিকারী রাখিয়া না যাইতে পারিতেন, তাঁহার পরলোকান্তে সাম্রাজ্য ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া পড়িত। মেগাস্থিনিসের সময়ে চন্দ্রগুপ্ত আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্‌ ছিলেন ; তৎপৌত্র অশোকবর্দ্ধন তদপেক্ষা বৃহত্তর সাম্রাজ্য উপভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানদিগের ভারতাক্রমণের পূর্ব্বে এদেশীয় কোন রাজবংশেই বিস্তৃত সাম্রাজ্য বহুকাল স্থায়ী হয় নাই।

* The Indica of Arrian Section I.

ভারতবর্ষের নগর অসংখ্য বলিয়া বর্ণিত। যে সকল নগর নদীতীরে বা সাগরোপকূলে অবস্থিত, সে সকল প্রায় কাষ্ঠনির্ম্মিত; যে সকল পাহাড় বা উচ্চ-স্থলে অবস্থিত, সে সকল ইষ্টক ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত। মেগাস্থিনিসের সময়ে ভারত-বর্ষের সর্ব্বপ্রধান নগর পাটলীপুত্র প্রাচ্যরাজ্যে গঙ্গা ও হিরণ্যবাহ (অর্থাৎ শোণ) এই দুইয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। ইহার বসতি দৈর্ঘ্যে আট মাইল ও প্রস্থে দেড় মাইল ছিল। সমুদয় নগর বেড়িয়া একটী গড় খাত ছিল, চারিশত হাত পরিসর ও ত্রিশ হাত গভীর। ইহার পরে চৌষট্টি তোরণবিশিষ্ট এবং পাঁচ শত সত্তর বুরুজ (Tower) সজ্জিত প্রাচীর।

মেগাস্থিনিসের মতে ভারতবর্ষবাসীরা সাত শ্রেণীতে বিভক্ত; তন্মধ্যে পদ-মর্য্যাদায় সর্ব্বপ্রধান তত্ত্ববিদ্গণ (Philosophers)। তাঁহারা যাগযজ্ঞে লোকের সাহায্য করেন, এবং প্রতি বৎসরের প্রারম্ভে রাজাদিগের কর্ত্তৃক মহাসভায় আহূত হন। তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কেহ কোন হিতকর প্রস্তাব লিখিয়া থাকেন, অথবা শস্য, পশুপালন বা সাধারণের উপকার সাধন সম্বন্ধে কোন উপায় আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাহা তিনি এই সভায় সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করেন। যদি কেহ তিনবার মিথ্যা বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া সাব্যস্ত হন, তাঁহাকে যাবজ্জীবন মৌনী হইয়া থাকিতে হইবে, এইরূপ দণ্ড দেওয়া হয়; আর যিনি প্রামাণিক কথা বলেন, তিনি করভার হইতে অব্যাহতি পান।

মেগাস্থিনিস্ বলেন যে তত্ত্ববিদ্গণ দুইদলে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ। ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্বাপেক্ষা মান্য, কারণ তাহাদিগের মতের অধিকতর সঙ্গতি আছে। গর্ভ হইতেই তাহাদিগের প্রতি বিদ্বজ্জনের যত্ন আরম্ভ হয়; এবং বয়োবৃদ্ধি-সহকারে তাহারা উত্তরোত্তর সদ্গুণসম্পন্ন শিক্ষকের হস্তে পড়ে। তাহারা নগরের বাহিরে পরিমিত আয়তনের উপবনে বাস করে। তাহারা কুশাসনে বা মৃগচর্ম্মে শয়ন করে। তাহারা মাংসাহার ও ইন্দ্রিয়সুখ হইতে বিরত থাকে এবং সারগর্ভ উপদেশ শুনিয়া ও জ্ঞান দান দিয়া সময় অতিবাহিত করে। এইরূপে সাঁইত্রিশ বৎসর বয়স্ কাটাইয়া, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে ও জীবনের অবশিষ্টাংশ সুখস্বচ্ছন্দে যাপন করে। তখন তাহারা চিক্কণ কার্পাসবস্ত্র পরিধান করে এবং অঙ্গুলে ও কর্ণেও স্বর্ণাভরণ ধারণ করে; মাংস খায়, কিন্তু সমসহায় জীবের নহে; এবং অধিকসংখ্যক সন্তানের আশায় যত ইচ্ছা তত বিবাহ করে।

পাঠকগণ দেখিবেন যে মেগাস্থিনিস্ হিন্দু বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের লোকই দেখিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণদিগকেই অধিকতর শ্রদ্ধাস্পদ বলিয়া জানিতেন। ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধেও তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্য ও বান-প্রস্থ এই দুই আশ্রমের ভেদ বুঝিতে পারেন নাই। যে ব্যক্তি সাঁইত্রিশ বৎসর

বয়সে গার্হস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিল, সে যে পুনরায় গৃহত্যাগ করিয়া নগরবহিঃস্থ উপবন আশ্রয় করিবে, তিনি এতদূর অনুসন্ধান রাখিতেন না। আর সকলেই যে সাঁইত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী থাকিত এরূপ বোধ হয় না। মনুর ব্যবস্থানুসারে ছত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যের শেষ সীমা। ইহাকে মেগাস্থিনিস সাধারণ নিয়ম ভাবিয়াছিলেন।

মেগাস্থিনিস বলেন যে ব্রাহ্মণেরা এই ভাবিয়া স্ত্রীলোকদিগকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করিত না যে পাছে তাহারা গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করে, বা জ্ঞান লাভ করিয়া পরাধীন থাকিতে না চায়। মৃত্যুসম্বন্ধে তাহাবা সর্ব্বদা কথোপকথন করিত। তাহাদিগের মতে এ জীবন গর্ভাবস্থাতুল্য এবং মৃত্যু তত্ত্ববিদ্‌দিগের পক্ষে প্রকৃত ও সুখময় জীবনপ্রাপ্তিরূপ জন্ম। তাহাদিগেব বিবেচনায় যাহা কিছু মানুষের ঘটে ভাল বা মন্দ নহে, অন্যরূপ ভাবা স্বপ্নবৎ মায়া, কারণ একই পদার্থ হইতে কাহারও সুখ, কাহারও দুঃখ উৎপন্ন হয়, এবং একব্যক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাব উদ্ভুত হয়। নৈসর্গিক ঘটনা সম্বন্ধে তাহাদিগের গ্রীক্‌দিগের ন্যায় মত দেখা যায়। তাহারা বলে যে জগতের উৎপত্তি ও ধ্বংস আছে, ইহার আকার গোল, এবং যে ঈশ্বর ইহার স্রষ্টা ও পাতা তিনি ইহার সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন। তাহাদিগের মতে বিশ্বমণ্ডলে অনেক ভূতের কার্য্য লক্ষিত হয়, এবং জলদ্বারা জগতেব সৃষ্টি হইয়াছিল। চারিভূতে তাহারা আর একটি ভূত (অর্থাৎ আকাশ) যোগ করে, উহা হইতেই স্বর্গ ও তারকারাজী নির্ম্মিত। আত্মার উৎপত্তি ও প্রকৃতি এবং অন্যান্য অনেক বিষয় সম্বন্ধে, তাহাদিগের মত গ্রীক্‌দিগের সদৃশ। আত্মার অমরতা, ভাবিষ্যৎ বিচার, এবং ঈদৃশ বিষয়ে, তাহারা প্লেটোর ন্যায় আপনাদিগের মত গল্পচ্ছটায় নিবদ্ধ রাখে।

শ্রমণদিগকে মেগাস্থিনিস দুই দলে বিভক্ত করিয়াছেন। একদল বনে বাস করিত, পত্র ও ফল আহার করিত, গাছের বাকল পরিত, মদ্য ও ইন্দ্রিয়সুখ হইতে বিরত থাকিত। কোন বিষয়ের কারণ জানিতে ইচ্ছা হইলে রাজারা তাহাদিগের নিকটে দূত পাঠাইত। অন্যদল ভিষক। তাহারা যদিও বনবাসী নহে, তথাপি মিতাচারী। তাহাদিগের খাদ্য ভাত বা যবের মণ্ড, উহা যেখানে চায় অথবা যেখানে অতিথি হয়, সেইখানেই পায়। তাহাদিগের ঔষধের গুণে লোকের সন্তান হয়; এমন কি, পুত্র কি কন্যা হইবে, তাহাও স্থির হয়। তাহারা ঔষধ প্রয়োগ অপেক্ষা পথ্যের নিয়ম করিয়া রোগ আরাম করে। তাহারা তৈল ও প্রলেপকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ জ্ঞান করে।

প্রথম দলের শ্রমণদিগের আচরণ বানপ্রস্থ হিন্দুদিগের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে, ইহাতে বোধ হইতে পারে যে হিন্দু ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে

আচারগত কোনরূপ বিশেষ বৈলক্ষণ্য ছিল না, অথবা মেগাস্থিনিস উভয়ের বিভেদ ভাল করিয়া জানিতেন না। শ্রমণ ভিষক্‌গণ যে প্রণালীতে চিকিৎসা করিতেন, অদ্যাপি ভারতবর্ষে সেই প্রণালীই চলিতেছে। ইহাতে অনুমান হয় যে প্রচলিত চিকিৎসাপ্রণালী চন্দ্রগুপ্তেরও পূর্ব্বে এতদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মেগাস্থিনিস যাদৃশ দার্শনিক মতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বেদান্তের আভাস স্পষ্ট প্রতীত হয়।

মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষবাসীদিগকে যে সাতশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে কৃষকেরা দ্বিতীয়শ্রেণী। দেশের অধিকাংশ লোক এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা ধীর ও নম্রস্বভাব। ইহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হয় না। যুদ্ধকালেও ইহাদিগের চাসের ব্যাঘাত হয় না। যেখানে দুইদলে তুমুল যুদ্ধ হইতেছে, তাহার নিকটেই কৃষকদিগকে নিরাপদে ভূমি কর্ষণ করিতে দেখা যায়। রাজাই ভূস্বামী, কৃষকেরা উৎপন্নের এক চতুর্থাংশ পায়।

তৃতীয় শ্রেণী গোপাল ও শিকারী। ইহারা শিকার করে, পশুপালন করে, পশু বিক্রয় করে, ইত্যাদি। ইহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। চতুর্থশ্রেণী কারুকর ও বাণিজ্যব্যবসায়ী। ইহাদিগের রাজকর দিতে হয়। কিন্তু যাহারা যুদ্ধাস্ত্র ও জাহাজ নির্ম্মাণ করে, তাহারা রাজার নিকট হইতে বেতন পায়। পঞ্চম শ্রেণী যোদ্ধা। ইহারা সংখ্যায় কেবল কৃষকদিগের অপেক্ষা কম। রাজকোষ হইতে ইহাদিগের ভরণপোষণ হয়, এবং যুদ্ধের উপকরণ ইহারা রাজ-সংসার হইতে পায়। এজন্য যখন আবশ্যক হয়, তখনই ইহারা সমরাঙ্গণে নামিতে প্রস্তুত। শান্তির সময়ে তাহারা সুরাপানাদি করিয়া আমোদ প্রমোদে কালযাপন করে। ষষ্ঠ শ্রেণী চর, ইহারা সকল বিষয়ে রাজাকে গোপনে সংবাদ দেয়। সপ্তমশ্রেণী মন্ত্রিবর্গ। বিচারাসন, রাজকীয় উচ্চ উচ্চ পদ, এবং সাধারণ শাসনকার্য্য ইহাদিগের হস্তে; এবং ইহাদিগের দ্বারাই শাসনকর্ত্তা, কোষাধ্যক্ষ, সেনানী প্রভৃতি নির্ব্বাচিত হয়। একশ্রেণীর লোকের সহিত অন্যশ্রেণীর লোকের বিবাহ হয় না। একশ্রেণীর লোক অন্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না, বা অন্যশ্রেণীর ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে না। কেবল যে সে শ্রেণীর লোক তত্ত্ববিৎ হইতে পারে।

এই শ্রেণীবিভাগ দেখিয়া বোধ হয় যে ব্যবসায়ের সহিত জাতির প্রকৃত সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া মেগাস্থিনিস কয়েকটি ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণদিগকে ও জাতিভেদরহিত শ্রমণদিগকে এক তত্ত্ববিৎ-শ্রেণীতে স্থান দিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বজাতীয় লোক শ্রমণ হইতে পারিত বলিয়া যে সে শ্রেণীর লোক তত্ত্ববিৎ হইতে পারিত লিখিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে চর ও মন্ত্রিবর্গ ব্রাহ্মণশ্রেণীর অন্তর্গত। জ্ঞানচর্চ্চা তাহা-

দিগের ব্যবসা নহে দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে ব্রাহ্মণদলের লোক বলিয়া জানিতে পারেন নাই। এই কয়েকটী ভ্রম সংশোধন করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে মনু হিন্দুসমাজের যেরূপ শ্রেণীবন্ধনের বর্ণনা করিয়াছেন, মেগাস্থিনিসের সময়ে প্রায় সেইরূপই ছিল। কৃষকেরা শূদ্র; কারুকর ও ব্যবসায়ীরা বৈশ্য; যোদ্ধারা ক্ষত্রিয়; চর, মন্ত্রীবর্গ ও তত্ত্ববিৎ ব্রাহ্মণ, শিকারীরা চণ্ডালাদি নীচজাতি। মেগাস্থিনিস চমৎকৃত হইয়া লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষবাসীরা সকলেই স্বাধীন, কেহই দাস নহে।* ইহাতে বোধ হয় যে মনুর সময়ে শূদ্রদিগেব যে প্রকার অবস্থা ছিল, মেগাস্থিনিসের সময়ে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। অন্ত্যজাতির দাসত্ব করা আর তাহাদিগের জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। আমাদিগের বিবেচনায় তাহারাই কৃষকশ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিল।

মেগাস্থিনিস এতদ্দেশীয় লোকদিগকে কার্পাস বস্ত্র ব্যবহার করিতে দেখিয়াছিলেন। তাঁহাবা একখানি নিম্নবাস পরিতেন, উহা হাঁটুর নীচে কিছুদূর পর্য্যন্ত পড়িত; এবং আর একখানি উত্তবীয় কতক কাঁধে ফেলিতেন, কতক মাথায় জড়াইতেন। আমাদের বর্ত্তমান ধূতিচাদর এই পোষাক বলিলেই হয়; তবে কি না আমবা চাদর হইতে মাথাটা ছাড়াইয়া লইয়াছি, এবং প্রয়োজনমত অন্যরূপ শিরস্ত্রাণ এবং কাটা কাপড় পরিতে শিখিয়াছি।

কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সময়েও যাহাদিগের অবস্থা ভাল ছিল, তাহাদিগের পোষাকের জাঁকজমক ছিল। লিখিত আছে, তাহারা বেশভূষা ভালবাসে। তাহাদিগের পোষাক স্বর্ণজড়িত ও মণিমাণিক্যখচিত, এবং তাহারা সুচিক্কণ ফুলকাটা বস্ত্র পরিধান করে। অনুগমনকারী অনুচরবর্গ তাহাদিগের মস্তকের উপর ছত্র-ধারণ করে; কারণ তাহারা সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত আদর করে, এবং সর্ব্ববিধ উপায়ে আপনাদিগের শ্রীবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পায়।

রুচিভেদে তাহারা দাড়ির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রং করিত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রেই আতপত্র ব্যবহার করিত। তাহারা শ্বেতচর্ম্মের পাদুকা পায়ে দিত; পাদুকাগুলি চিত্র বিচিত্র ও উচ্চখুরবিশিষ্ট ছিল।†

সাধারণ লোকে উষ্ট্রে, অশ্বে ও গর্দ্দভে চড়িত; রাজা এবং ঐশ্বর্য্যশালী লোকে হস্তীতে আরোহণ করিত। বাহনের মধ্যে গজই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইত; তাহার নীচে চতুরশ্বযুক্ত রথ; তৎপরে উষ্ট্র; এবং একাশ্বযানে চড়া কোনরূপ সম্ভ্রম বলিয়াই পরিগণিত হইত না।‡ বর্ত্তমানে এক্কা বোধ হয় এই একাশ্বযানের প্রতিনিধি।

---

* Arrian's Indica Sec. X.
† Arrian's Indica Sec. XVI.
‡ Arrian's Indica Sec. XVI.

মেগাস্থিনিসের সময়ে ভারতবর্ষীয় পদাতিগণ সাধারণতঃ ধনুর্ব্বাণ ব্যবহার করিত। ধনুক মানুষ সমান এবং বাণ প্রায় তিন গজ লম্বা। মাটীতে ধনুক স্থাপন করিয়া বামপদদ্বারা চাপিয়া ধরিয়া তাহারা বাণত্যাগ করিত,—এবং এমন কোনরূপ ঢাল বা কবজ ছিল না যাহা সে বাণে ভিন্ন হইত না। পদাতিক-দিগের বামহস্তে গোচর্ম্মের ঢাল থাকিত। কেহ কেহ ধনুকের পরিবর্ত্তে বর্ষা ব্যবহার করিত, কিন্তু সকলেই অসি ধারণ করিত। অসি তিনহাতের অধিক লম্বা হইত না, এবং অত্যন্ত কাছাকাছি যুদ্ধ করিতে হইলে উহা দ্বিহস্তদ্বারা সঞ্চালিত হইত। অশ্বারোহী যোদ্ধাগণ চর্ম্ম ও দুইগাছা বর্ষা ব্যবহার করিত। তাহাদিগের জিন ছিল না, লৌহ বা পিত্তলের কাঁটাবিশিষ্ট চর্ম্মের লাগামদ্বারা অশ্বসঞ্চালনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত।* রথে সারথী ছাড়া দুইজন রথী থাকিত, এবং মাতঙ্গে মাহুত ছাড়া তিনজন যোদ্ধা থাকিত।

মেগাস্থিনিস ভারতবাসীদিগকে মিতাচারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদিগের খাদ্য সাধারণতঃ ভাত, যজ্ঞভিন্ন তাহারা মদ্য ব্যবহার করিত না। চৌর্য্য তাহাদিগের মধ্যেই অল্পই হইত। চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে চারিলক্ষ লোক ছিল, কিন্তু প্রতিদিন তথায় দেড় শত টাকার অধিক চুরি হইত না। লোকে মামলা মোকর্দ্দামা কদাচ করিত। দলিল বা সাক্ষী না রাখিয়া কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া অন্যের নিকটে কিছু বন্ধক বা গচ্ছিত রাখিতে সঙ্কুচিত হইত না। তাহারা সচরাচর গৃহ ও সম্পত্তি অরক্ষিত অবস্থায়ই রাখিত। তাহারা সত্য ও ধর্ম্মের আদর করিত। এজন্য বৃদ্ধলোক জ্ঞানী না হইলে কোন বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইত না। তাহারা অনেক স্ত্রী ক্রয় করিয়া বিবাহ করিত, কাহাকে ধর্ম্মপত্নী এবং কাহাকে বা কামপত্নী করিত। কোন পণ না দিয়া বা না লইয়াও অনেকে বিবাহ করিত; এরূপস্থলে পিতা কন্যাকে সাধারণসমক্ষে উপস্থিত করিতেন, এবং যে ব্যক্তি মল্লযুদ্ধে বা অন্য কোনরূপ শক্তিপ্রকাশ কার্য্যে বিজয়ী হইতেন, তিনিই কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন।† ইহা আমাদিগের দেশের পুরাতন স্বয়ংবরা। মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে এদেশে লিখিত আইন ছিল না। বোধ হয় এতদ্দেশীয় ব্যবস্থা গ্রন্থের নাম স্মৃতি শুনিয়া তাঁহার এইরূপ ভ্রম জন্মিয়াছিল।

রাজা যুদ্ধের সময়ে এবং বিচারকালে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইতেন; এবং বিচার করিতে গিয়া তিনি সারাদিন বিচারালয়ে থাকিতেন। এতদ্ভিন্ন যজ্ঞ ও মৃগয়া করিতেও তিনি বাহির হইতেন। রাজার শরীররক্ষিণী রমণীদল

---

* Arrian's Indica Sec. XVI.

† Arrian's Indica Sec. XVII.

ছিল ; মৃগয়াকালে তাহারা তাঁহাকে ঘেরিয়া যাইত। শরীররক্ষিণীরা কেহ রথে, কেহ অশ্বে, কেহ গজে, সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উঠিত ; এবং রাজা হস্তীতে চড়িয়া যাইতেন।

দুইটী দেবতার উপাসনার বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়, সমতল প্রদেশে বিশেষতঃ মথুরার নিকটে হিরাক্লিসের, এবং পার্ব্বত্যপ্রদেশে দিওনিস্সুসের। হিরাক্লিস বোধ হয় আমাদিগের অদ্ভুত কীর্ত্তিশালী কৃষ্ণ, এবং দিওনিস্সুস প্রমত্ত মহাদেব।

বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব

মহাশয়! আপনাকে পত্র লিখিব কি—লিখিবার অনেক শত্রু। আমি এখন যে কুঁড়ে ঘরে বাস করি, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার পাশে গোটা দুই তিন ফুল গাছ পুঁতিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম কমলাকান্তের কেহ নাই—এই ফুলগুলি আমার সখা সখী হইবে। খোষামোদ করিয়া ইহাদের ফুটাইতে হইবে না—টাকা ছড়াইতে হইবে না, গহনা দিতে হইবে না, মন যোগান গোছ কথা বলিতে হইবে না, আপনার সুখে উহারা আপনি ফুটিবে। উহাদের হাসি আছে—কান্না নাই; আমোদ আছে—রাগ নাই। মনে করিলাম যদি প্রসন্ন গোয়ালিনী গিয়াছে তবে এই ফুলের সঙ্গে প্রণয় করিব।

তা, ফুল ফুটিল—তারা হাসিল। মনে করিলাম—মহাশয় গো! কিছু মনে করিতে না করিতে, ফুটন্ত ফুল দেখিয়া ভোমরার দল,—লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে, ভোমরা বোলতা মৌমাছি—বহুবিধ রসক্ষেপা রসিকের দল, আসিয়া আমার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন গুণ্ গুণ ভন্ ভন্ ঝন্ ঝন্ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া হাড় জ্বালাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া বলিলাম যে, হে মহাশয়গণ! এ সভা নহে, সমাজ নহে, এসোসিয়েশান, লীগ, সোসাইটী, ক্লব প্রভৃতি কিছুই নহে—কমলাকান্তের পর্ণকুটীর মাত্র, আপনাদিগের ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে হয় অন্যত্র গমন করুন—আমি কোন রিজলিউশ্যনই দ্বিতীয়িত করিতে প্রস্তুত নহি; আপনারা স্থানান্তরে প্রস্থান করুন। গুণ গুণের দল, তাহাতে কোনমতে সম্মত নহে—বরং ফুলগাছ ছাড়িয়া আমার কুটীরের ভিতর হল্লা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই মাত্র আপনাকে এক পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছিলাম—(আফিঙ্গ ফুরাইয়াছে)—এমত সময়ে এক ভ্রমর কুচকুচে কালো আসল বৃন্দাবনী কালাচাঁদ, ভোঁ করিয়া ঘরের ভিতর উড়িয়া আসিয়া কাণের কাছে ঘ্যান্ ঘ্যান্ আরম্ভ করিলেন—লিখিব কি মহাশয়?

ভ্রমর বাবাজি নিশ্চিত মনে করেন তিনি বড় সুরসিক—বড় সুবক্তা—তাঁহার ঘ্যান্ ঘ্যানানিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া যাইবে। আমারই ফুল গাছের ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া আসিয়া আমারই কাণের কাছে ঘ্যান্ ঘ্যান্? আমার রাগ অসহ্য হইয়া উঠিল; আমি তালবৃন্ত হস্তে ভ্রমরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন আমি ঘূর্ণন, বিঘূর্ণন, সংঘূর্ণন প্রভৃতি বহুবিধ বক্র-গতিতে তালবৃন্তাস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিলাম; ভ্রমরও ডীন, উড্ডীন, প্রডীন, সমাডীন প্রভৃতি বহুবিধ কৌশল দেখাইতে লাগিল। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—দপ্তর মুক্তাবলীর প্রণেতা, আমি কখনই ক্ষুদ্রবীর্য্য নহি। কিন্তু হায় মনুষ্যবীর্য্য! তুমি অতি অসার! তুমি চিরদিন মনুষ্যকে প্রতারিত করিয়া শেষ আপন অসারতা প্রমাণীকৃত কর! তুমি জামার ক্ষেত্রে হানিবলকে, পলটোবার ক্ষেত্রে চার্লসকে, ওয়াটর্লু'র ক্ষেত্রে নেপোলিয়ানকে, এবং আজি এই ভ্রমর-সমরে কমলাকান্তকে বঞ্চিত করিলে। আমি যত পাখা ঘুরাইয়া বায়ু সৃষ্টি করিয়া ভ্রমরকে উড়াইতে লাগিলাম ততই সে দুরাত্মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার মাথামুণ্ড বেড়িয়া বেড়িয়া চোঁ বোঁ করিতে লাগিল। কখনও সে আমার বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া, মেঘের আড়াল হইতে ইন্দ্রজিতের ন্যায় রণ করিতে লাগিল, কখনও কুম্ভকর্ণ নিপাতী রামসৈন্যের ন্যায় আমার বগলের নীচে দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল; কখনও স্যাম্পসনের ন্যায় শিরোরুহমধ্যে আমার বীর্য্য সংন্যস্ত মনে করিয়া, আমাব নীরদ-নিন্দিত কুঞ্চিতকেশদাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভেরী বাজাইতে লাগিল। তখন দংশনভয়ে অস্থির হইয়া আমি রণে ভঙ্গ দিলাম। ভ্রমর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। আমি সেই সময়ে চৌকাট পায়ে বাঁধিয়া—পপাত ধরণীতলে !!! এই সংসারসমরে মহারথী শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—যিনি দারিদ্র্য, চিরকৌমার এবং অহিফেণ প্রভৃতির দ্বারাও কখন পরাজিত হয়েন নাই—হায়! তিনি এই ক্ষুদ্র পতঙ্গ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন।

তখন ধূল্যবলুণ্ঠিত শরীরে দ্বিরেফরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। যুক্ত করে বলিলাম "হে দ্বিরেফসত্তম! কোন্ অপরাধে দুঃখী ব্রাহ্মণ তোমার নিকট অপরাধী যে তুমি তাহার লেখা পড়ার ব্যাঘাত করিতে আসিয়াছ? দেখ, আমি এই বঙ্গদর্শনে পত্র লিখিতে বসিয়াছি—পত্র লিখিলে আফিঙ্গ আসিবে—তুমি কেন ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া তাহার বিঘ্ন কর?" আমি প্রাতে একখানি বাঙ্গালা নাটক পড়িতেছিলাম—তখন অকস্মাৎ সেই নাটকীয় রাগগ্রস্ত হইয়া বলিতে লাগিলাম—"হে ভৃঙ্গ! হে অনঙ্গরঙ্গ তরঙ্গবিক্ষেপকারিন্ হে দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডভণ্ডচিত্তলণ্ডভণ্ডকারিন্! হে উদ্যান্ বিহারিন্—কেন তুমি ঘ্যান্

ঘ্যান্ করিতেছে ? হে ভৃঙ্গ ! হে দ্বিরেফ ! হে ষট্‌পদ ! হে অলে ! হে ভ্রমর ! হে ভোমরা ! হে ভোঁ ভোঁ !—”

ভ্রমর ঝুপ করিয়া আসিয়া সামনে বসিল। তখন গুণ গুণ করিয়া গলা দুরস্ত করিয়া বলিতে লাগিল—আমি অহিফেণ প্রসাদে সকলেরই কথা বুঝিতে পারি—আমি স্থিরচিত্তে শুনিতে লাগিলাম।

ভৃঙ্গরাজ বলিতে লাগিলেন, “হে বিপ্র ! আমার উপর এত চোট কেন ? আমি কি একাই ঘ্যান্ ঘেনে ! তোমার এ বঙ্গভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিব না ত কি করিব ? বাঙ্গালি হইয়া কে ঘ্যান ঘ্যানানি ছাড়া ? কোন্ বাঙ্গালির ঘ্যান্ ঘ্যানানি ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে ? তোমাদের মধ্যে যিনি রাজা মহারাজা কি এমনি একটা কিছু মাথায় পাগড়ি ও হইলেন, তিনি গিয়া বেলভিডিয়রে ঘ্যান্ ঘ্যান্ আরম্ভ করিলেন। যিনি হইবেন ওম্মেদ রাখেন, তিনি গিয়া রাত্রিদিবা রাজদ্বারে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করেন। যিনি কেবল একটি চাকরির উমেদওয়ার—তাঁর ঘ্যান্ ঘ্যানানির ত আর অন্ত নাই। বাঙ্গালি বাবু যিনিই দুই চারিটা ইংরেজি বোল শিখিয়াছেন তিনি অমনি উমেদাররূপে পরিণত হইয়া, দরখাস্ত বা টিকিট হাতে দ্বারে দ্বারে ঘ্যান্ ঘ্যান—ডাঁশমাছির মত খাবার সময়ে, শোবার সময়ে, বস্‌বার সময়ে, দাঁড়াবার সময়ে, দিনে, রাত্রে, প্রাহ্ণে, অপরাহ্ণে, মধ্যাহ্ণে, সায়াহ্ণে—ঘ্যান্ ঘ্যান্ ঘ্যান্! যিনি উমেদওয়ারি ছাড়িয়া স্বাধীন হইয়া উকীল হইলেন, তিনি আবার সনদী ঘ্যান্ ঘ্যানে ! সত্য মিথ্যার সাগরসঙ্গমে প্রাতঃস্নান করিয়া উঠিয়া, যেখানে দেখেন কাঠগড়ার ভিতর বিঁড়ে মাথায় সরকারি জুজু বসিয়া আছে—বড় জজ, ছোট জজ, সবজজ, ডিপুটি, মুন্সেফ—সেইখানে গিয়া সেই পেশাদার ঘ্যান্ ঘেনে, ঘ্যান্ ঘ্যানানির মোহনা খুলিয়া দেন। কেহ বা মনে করেন ঘ্যান্ ঘ্যানানির চোটে দেশোদ্ধার করিবেন—সভাতলে ছেলে বুড়া জমা করিয়া ঘ্যান ঘ্যান করিতে থাকেন। কোন দেশে বৃষ্টি হয় নাই—এসো বাপু ঘ্যান ঘ্যান করি ; বড় চাকরি নাই না—এসো বাপু ঘ্যান ঘ্যান করি—রাম শর্ম্মার মা মরিয়াছে—এসো বাপু স্মরণার্থ ঘ্যান ঘ্যান করি। কাহারও বা তাতেও মন উঠে না—তাঁরা কাগজ কলম লইয়া, হপ্তায় হপ্তায়, মাসে মাসে দিন দিন ঘ্যান ঘ্যান করেন। ' আর তুমি যে বাপু আমার ঘ্যান ঘ্যানানিতে এত রাগ করিতেছ তুমিও কি করিতে বসিয়াছ ? বঙ্গদর্শন সম্পাদকের কাছে কিছু আফিঙ্গের যোগাড় করিবে বলিয়া ঘ্যান ঘ্যান করিতে বসিয়াছ। আমার চোঁ বোঁই কি এত কটু ?

তোমায় সত্য বলিতেছি কমলাকান্ত! তোমাদের জাতির ঘ্যান ঘ্যানানি আর ভাল লাগে না। দেখ আমি যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ আমিও শুধু ঘ্যান ঘ্যান করি

না—মধু সংগ্রহ করি আর হুল ফুটাই। তোমরা না জান মধু সংগ্রহ করিতে, না জান হুল ফুটাইতে—কেবল ঘ্যান ঘ্যান পার। একটা কাজের সঙ্গে খোঁজ নাই—কেবল কাঁদুনে মেয়ের মত দিবারাত্রি ঘ্যানঘ্যান। একটু বকাবকি লেখা-লেখি কম করিয়া কিছু কাজে মন দাও—তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। মধু করিতে শেখ—হুল ফুটাইতে শেখ। তোমাদের রসনা অপেক্ষা আমাদের হুল শ্রেষ্ঠ—বাক্যবানে মানুষ মরে না; আমাদের হুলের ভয়ে জীবলোক সদা সশঙ্কিত! স্বর্গে ইন্দ্রের বজ্র, মর্ত্যে ইংরেজের কামান, আর আকাশমার্গে আমাদের হুল! সে যাক, মধু কর; কাজে মন দাও। নিতান্ত যদি দেখ, রসনাকণ্ডুয়ন রোগ জন্য কাজে মন যায় না—জীবে কাষ্টকি দিয়া ঘা কর—অগত্যা কাজে মন যাইতে পারে। আর শুধু ঘ্যান ঘ্যান ভাল লাগে না।”

এই বলিয়া ভ্রমররাজ ভোঁ করিয়া উড়িয়া গেল।

আমি ভাবিলাম যে, এই ভ্রমর অবশ্য বিশেষ বিজ্ঞ পতঙ্গ। শুনা আছে মনুষ্যের পদবৃদ্ধি হইলেই সে বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য হয়। এই জন্য দ্বিপদ মনুষ্য হইতে চতুষ্পদ পশু—পক্ষান্তরে যে সকল মনুষ্যেব পদবৃদ্ধি হইয়াছে—তাহারা অধিক বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য। এই ষট্‌পদের—একখানি না, দুখানি না—ছয় ছয় খানি পা! অবশ্য এ ব্যক্তি বিশেষ বিজ্ঞ হইবে—ইহার অসামান্য পদবৃদ্ধি দেখা যায়। এই বিজ্ঞ পতঙ্গের পরামর্শ অবহেলন করি কি প্রকারে? অতএব আপাতত ঘ্যান ঘ্যানানি বন্ধ করিলাম—কিন্তু মধু সংগ্রহের আশাটা রহিল। বঙ্গদর্শন পুষ্প হইতে অহিফেণ মধু সংগ্রহ হইবে এই ভরসায় প্রাণ ধারণ করে—

আপনার আজ্ঞাবহ

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

সার সংগ্রহ। প্রথম খণ্ড। অর্থাৎ নানা গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ স্থানের অনুকরণ অনুবাদ ও ভাব। শ্রীআবদুল হানিদ খাঁ কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ময়মনসিংহ, ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য /১০ আনা মাত্র।

গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র ; ২০ পৃষ্ঠা। ইহার অধিকাংশ ধর্ম্মবিষয়ক বাক্যাবলী। আর ৫ পৃষ্ঠা নীতি কথা। ধর্ম্মবিষয়ক সকল কথাগুলি আমরা বুঝিতে পারি নাই, তাহা সংগ্রহকারের দোষ কি আমাদের দোষ তাহা ঠিক বলিতে পারি না। ভরসা করিয়া বলা যায় না কিন্তু বোধ হয় কতকটা বিষয়ের দোষও আছে। এক স্থলে লিখিত হইয়াছে "হে পথিক! যদি তুমি ঈশ্বরের দ্বারে যাইতে চাও, তবে হীনতার অসি হাতে লইয়া, মান সম্ভ্রমের মস্তক ছেদন কর।" এ ধর্ম্ম-উপদেশ সংগ্রহকাব কোথা হইতে পাইলেন আমরা তাহা জানি না, মানসম্ভ্রম বিসর্জ্জন করিয়া হীনতা অবলম্বন কবিলে যে কিরূপে লোকে ধার্ম্মিক হয় তাহা আমরা বুঝি না। চোর ডাকাতেরা মান সম্ভ্রম ত্যাগ করিয়াছে অথচ তাহারা ঈশ্বরের দ্বারে যায় নাই ধার্ম্মিকও হয় নাই। আমরা জানিতাম যে মানসম্ভ্রম বরং ধর্ম্মের সহায়তা করে। মানী ও সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে অনেকে একান্ত ধর্ম্ম ভয়ে না হউক, আপনাদের মান ও সম্ভ্রমের ভয়েও, নীচ বা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারেন না। তাহা পারেন না বলিয়া কি তাঁহাদের মান সম্ভ্রম ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে? যে ধর্ম্মাত্মা হইবে সে ধর্ম্মের নিমিত্তই ধর্ম্মাচরণ করিবে ; পাছে কেহ মান সম্ভ্রমের নিমিত্ত ধর্ম্মাচরণ করে এই ভয়ে কি মান সম্ভ্রমের মস্তকচ্ছেদ করিতে বলা হইয়াছে? নীতি কথাগুলি ভাল, বালকদের জানা উচিত।

ভগিনীবিলাপ। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাঁ কর্ত্তৃক বিরচিত। গ্রন্থখানির মর্ম্ম এই যে, এক গৃহস্থ আপন কন্যাকে এক অপাত্রে সম্প্রদান করেন, সম্প্রদানের পূর্ব্বে গৃহস্থ পাত্রের দোষ গুণ সম্বন্ধে বিশেষ তদন্ত করেন নাই, পাত্রকে একবার চক্ষেও দেখেন নাই। কাজেই সম্প্রদানান্তে গৃহস্থ কাঁদিলেন :—

"না দেখি আপন চক্ষে
বিশ্বাসি পরের বাক্যে
পিতা হয়ে কন্যাটিরে
স'পিলাম দুঃখ নীরে
হায় মোর কেন হেন দুর্ম্মতি ঘটিল।"

কিন্তু আর কি হইবে, বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কন্যা পতির আলয়ে, সুখেই হউক দুঃখেই হউক, কালযাপন করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে এক দিবস প্রাতে কন্যাটির দেহ এক পুষ্করিণীর জলে ভাসিয়া উঠিল। ভগিনীর মৃত্যু হওয়ায়, বিশেষতঃ অপঘাত মৃত্যু হওয়ায় ভ্রাতা এই গ্রন্থে বিলাপ করিতেছেন। যদি এই গ্রন্থে বিলাপ প্রকৃত ঘটনামূলক হয় তবে ইহা মুদ্রাঙ্কন না করিলেই ভাল হইত। ইহা রুচিবিরুদ্ধ। বিশেষতঃ শোক পবিত্র, তাহা যত্নে গোপনে রাখাই ভাল। আপনার শোকের কথা মুদ্রিত করিয়া সকলের হাতে হাতে দিলে প্রথমেই বুঝায় যে তোমরা সকলে দেখ আমি কেমন শোক করিয়াছি। এস্থলে শোক অপেক্ষা বাহাদুরি অধিক দেখান হয়। গ্রন্থকার বলিতে পারেন বিলাপ দেখাইবার নিমিত্ত ভগিনীবিলাপ লিখিত হয় নাই, অন্য উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য বোধ হয় বাল্যবিবাহ প্রথাকে তিরস্কার করা। এবং সেই জন্য সমীরণ, বিহঙ্গ, স্রোতস্বতী, সুধাংশু, সুন্দরী, নিশাদেবী প্রভৃতি সকলকে ডাকিয়া কবি বলিতেছেন ;—

৩৭

"সন্ধ্যা সমীরণ! এই যে পরশ দানে,
তুষি'ছ তাপিত মন, সঞ্চালি' পল্লবগণ,
রাখ এক কথা, বলি ধরিয়া চরণে,
কুসুম সম্পদ হরি, সৌরভে আমোদ করি'
পশিবে জগতে যবে, সবার শ্রবণে
কৌমার' বিবাহ গুণ কহিও যতনে।

৩৮

ওহে বিহঙ্গমকুল, এই যে বসিয়া,
ধরি'ছ মধুর তান, কাড়িয়া লই'ছ প্রাণ,
কল্লোলিনী কল কল সাথে মিলাইয়া,
মোর এক কথা মান, যখন করিয়া গান,
জাগাবে জগত জনে, করিয়া যতন,
কহিও সকলে, বাল্যবিবাহ কেমন

৩৯

স্রোতস্বতি! ভুবনবাহিনি! তুমি যবে
অনি' দিবে ঘরে ঘরে, রত্ন রাজি ভারে ভারে
বঙ্গবাসী জনে সবে যতনে কহিবে—
"তোদের দুর্দ্দশা যত, নিশ্চয় হইবে গত,
কৌমার বিবাহ প্রথা যদি দূর হয়;
নতুবা মজিবে দেশ, নাহিক সংশয়।"

৪১

নিশা দেবি! অবশেষে নিবেদি তোমায়
অসিত বরণে ঘন, করি' সব আবরণ,
পশিবে জগতে যবে করি, তমোময়;
বঙ্গকাল কুলাঙ্গারে, কহিও যতন করে,'
কৌমার বিবাহে হয়, বঙ্গ অন্ধকার;
প্রচার করিও সবে, এই সমাচার।"

যত দোষ কৌমার বিবাহের। পিতা অপাত্রে কন্যাদান করিলেন সে দোষ বাল্যবিবাহের। পিতা বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র একবারে দেখিলেন না সে দোষ কৌমার বিবাহের। এ দোষরোপে একটি পুরাতন গল্প মনে পড়িল। একজন বৃদ্ধ মুন্‌সেফের একটি পুষ্করিণী ছিল, বাটির অতি নিকটে বলিয়া তথায় তাঁহার সন্তানেরা স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে সর্ব্বদাই যাইত। ঘাটের নিকটে একটি চালিতা গাছ ছিল তথায় বসিয়া স্ত্রীলোকেরা কখন কখন বিশ্রাম করিত, চারিপার্শ্বে বালকেরা খেলিয়া বেড়াইত, একদিন খেলাইতে খেলাইতে একটি শিশু জলে পড়িয়া গেল। তাহার শোকে মুন্‌সেফ বড় অধীর হইলেন। কিছুকাল পরে আর একটি সন্তান সেইস্থানে আবার জলমগ্ন হয়। এই সম্বাদ মুন্‌সেফ লোকে মুখে শুনিলেন। ক্ষণেক পরে ভৃত্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পুষ্করিণীর কোনদিকে সন্তান ডুবিয়াছে? ভৃত্য বলিল, চালিতা তলার ঘাটে। বৃদ্ধ মুন্‌সেফ বাগতভাবে বলিলেন "সেই চালিতা তলায়! সেই চালিতা গাছ আমায় দুইবার দাগা দিল, এবার বাটী যাইব, চালিতা গাছ কাটিব, ঢেঁকি বনাইব, দুই পায়ে দলিব, তবে. ছাড়িব।" চালিতা গাছের অপরাধ যেরূপ, বাল্যবিবাহের অপরাধ সেইরূপ!

তত্ত্বদর্শন। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মিত্র প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

প্রথমে গ্রন্থেব নাম দেখিয়া আমাদের ভয় হইয়াছিল। কিন্তু পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া আর সে ভয় রহিল না, বরং অনেকটা আমোদ হইল। প্রথম ৩৫ পৃষ্ঠার রহস্য কিঞ্চিৎ বিবৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে তত্ত্বদশনের মর্ম্ম বুঝা যাইবে।

গ্রন্থকার প্রথমেই লিখিতেছেন, "সন ১২৭১ অব্দে ৯ ভাদ্রে আমি একবার ঘোরতর ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলাম, তাহাতে প্রায় আট দিবস পর্য্যন্ত আমার কলেবর দারুণ দুঃসহ যন্ত্রনায় দগ্ধ ও অস্থির হইয়াছিল, তদবস্থায় একজন সুচিকিৎসক বহুযত্নসহকারে নানা ঔষধ প্রয়োগে ঐ দুঃসহযন্ত্রণা নিবৃত্তি করিলে পর নবম দিবসের প্রত্যূষে আমি নীরোগ মানুষের ন্যায় শয়নাগারে শয্যোপরি শয়ন করিয়া রহিয়াছি, এমত সময় * * * সহসা দিব্যাকৃতি কোন যোষিৎদেহনিঃসৃত তেজঃপুঞ্জে আমার অঙ্গ মুকুলিত, নেত্রযুগল প্রতিহত করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। আমি চকিত হইয়া নয়ন উন্মীলন করিলাম, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না, তিনি কোথা যাইলেন তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না, কিন্তু যেরূপ পূর্ণশশধর উদয়াচলশিখরে উদিত হইলে তমস্বিনীর গাঢ় তমিস্রা অপসারিত হয় সেইরূপ সেই ত্রিভুবনবিমোহিনী কামিনীর ক্ষণপ্রভাসদৃশ প্রভাজালে আমার হৃদয়াকাশের সমুদয় মোহান্ধকার বিনষ্ট হইয়া যাইল, সহসা মোহাপগমে

সুবিশদ চিত্তে জগতের সমুদয় কার্য্যকারণতা পরিস্ফুরিত হইতে লাগিল। তখন অদ্বৈতবাদ আমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল, জগৎ ব্রহ্মের ভেদ জ্ঞান অপনীত হওয়াতে আমি ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া পড়িলাম।”

কিঞ্চিৎ পরে গ্রন্থকার লিখিতেছেন “আমার বোধ হইল, আমি যেন পর-ব্রহ্মানন্দে লীন হইতেছি ও আমিই ব্রহ্ম নিশ্চয় জানিয়া, ব্রহ্ম কথা বলিতে বলিতে আমি নিস্তব্ধ মূর্চ্ছাগত হইলাম, সেই সময়ে আমার এইরূপ বোধ হইল যেন আমি একটী পাক ঘুরিয়া সূর্য্যরূপে অবস্থিত হইয়াছি, সমুদয় জগৎ আমার নয়ন গোচর হইতে লাগিল। আমি যেন সর্ব্বভূতের বহিরন্তরব্যাপী হইয়া রহিয়াছি, পদার্থ সকল অতি বিমল ও লোচনানন্দদায়ক, স্থানে স্থানে বিবিধ মধুর স্বরে আনন্দধ্বনি হইতেছে, পশু পক্ষী জলচর প্রভৃতি যে সমস্ত প্রাণী এই জগতে আছে সে সকল আমি, ভেদাভেদ কিছুই নাই। আমি ব্রহ্মানন্দময়, আমা ভিন্ন এই অনন্ত মহাবিশ্বে আর কিছুই নাই, এই বিশ্ব আমারই স্বভাব, আমি কালেতে পুনঃ পুনঃ বিশ্বরূপে প্রকাশিত হইতেছি সকলই আমি। আমার এই প্রকার নিশ্চয় বোধ হইবামাত্র এই সংসারের আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও পুত্র কলত্র, প্রভৃতির প্রতি যে মায়া তাহা একেবারে নিমেষমধ্যে তিরোহিত হইয়া যাইল সুতরাং দ্বৈত বস্তু না থাকায় আমিই অদ্বৈতরূপে অবস্থিত রহিলাম।”

দুই এক পৃষ্ঠা পরে গ্রন্থকার তাঁহার আর এক ঘটনার কথা বলিতেছেন। “পৃথিবী ছাড়িয়া পৃথ্বী হইতে অতি দূরবর্ত্তী মরুৎ পথে উঠিতে উঠিতে শূন্যমধ্যে একটি বৃহৎ অট্টালিকা আমার দর্শনপথের অতিথি হইল।” গ্রন্থকার দেখিলেন যে, যে সকল মনুষ্য বিগতাসু হইতেছে তাহারা এই অট্টালিকার পৃথক পৃথক কক্ষায় রক্ষিত হইতেছে কাহার সহিত কাহার সাক্ষাৎ হয় না। প্রলয় পর্য্যন্ত তাহারা ঐরূপে থাকিবে ও প্রলয়ের পর নূতন সৃষ্টি হইলে ঈশ্বর-ইচ্ছায় ঐ সকল আপন আপন কর্ম্মফলে নরকে বা সুরধামে গমন করিবে। গ্রন্থকারও ঐ অট্টালিকার এক কক্ষ পাইয়াছিলেন। তাহার পর অকস্মাৎ কোথা হইতে তিনটী ঈষৎ নীল ও রক্তাদি বর্ণ অতি তেজোময় জ্যোতিঃপ্রবাহ রজ্জুবৎ তাঁহার গাত্র বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে কক্ষ হইতে লইয়া চলিল। গ্রন্থকার বলিতেছেন “শেষ এক তরল সুবিস্তীর্ণ অনিবার অতিভীষণ প্রবাহে তরঙ্গিত জলন্ত পাবকময় মহাসিন্ধু মধ্যে নিক্ষেপ করিল, আমি সেই অগ্নিময় সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া, অতিশয় যন্ত্রণায় কাতর হইতে লাগিলাম, সেই স্থানটি অতি ভয়াবহ, অস্বচ্ছ, আলোকিত অথচ কিছুই দৃষ্টি-গোচর হয় না, সকলই বহ্নিবর্ণ ও তরলস্পর্শ। সেই নিদারুণ অনলে আমার দেহ যত দগ্ধ হইতে লাগিল আমি ততই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার ভূতাবাস ভস্মসাৎ না হইয়া পূর্ব্ববৎ অবিকৃত রহিল, আমি সেই কঠোর

অবস্থায় নিপতিত হইয়া এই চিন্তা করিলাম, বোধ হয় পরমেশ্বর এই অনন্ত নরক পাপিলোকদিগের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন।”

তাহার পর সেই তিনটী জ্যোতিঃপ্রবাহ গ্রন্থকারকে নরক হইতে তুলিয়া আর একস্থানে ফেলিয়া গেল। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন “তথায় এক সুরম্য হর্ম্ম্যে উপস্থিত হইলাম। গৃহটী সন্তানক কুসমমালাসনাথ অরবিন্দপরিমলবাহী মৃদু-মন্দ গন্ধবহের নিয়ত সঞ্চারে অতি সুখসেব্য, নয়নপ্রীতিকর সুস্নিগ্ধ মসৃণ মরকত প্রস্তরে নির্ম্মিত কুট্টিম, তাহার অভ্যন্তরে দুগ্ধফেণসন্নিভ পুষ্পপ্রকরাবকীর্ণ কোমল পর্য্যঙ্কোপরি উত্তান শয়নে এক দিব্যাকৃতি পুরুষ শয়ান রহিয়াছেন। ব্রহ্মা, রুদ্র, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র, সপ্তর্ষিমণ্ডল তাঁহার চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। আমি উপস্থিত হইলে তিনি মুখব্যাদান করিলেন; আমি তৎক্ষণাৎ তাহাতে প্রবেশ করিলাম; প্রবেশ মাত্র আমার দিব্য জ্ঞান জন্মিল।”

যাহা উপরে উদ্ধৃত করা গেল বোধ হয় তাহাই যথেষ্ট, পরে ৩৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যাহা আছে তাহার সর্ব্বত্র এইরূপ। এই সকল অংশ পাঠ করিয়া যিনিই যাহা বলুন, আসল এই সকল ঘটনাই গ্রন্থের মূল। গ্রন্থকার ৪০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন “সমুদয় ধর্ম্মের প্রতি আমার সংশয় হওয়াতে, আমি কে, কোথা হইতে আগত হইলাম, ও পরিণামে কোথায় গমন করিব, এই প্রপঞ্চ সংসার কোথা হইতে আগত হইল, তাহাও পরিণামে কোথায় যাইবে, অতএব, এই বিশ্ব কিরূপে কোথা হইতে আসিল? এই চিন্তা আমার মনোমধ্যে নিরবধি থাকিত, তদনন্তর আমি আমার গত পীড়িত অবস্থায় ঐ বিস্ময়জনক ব্যাপার দর্শনাবধি এ পর্য্যন্ত কোন বিতর্ক না দেখিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঐ প্রকারে হইতেছে, তাহা নিশ্চয় বোধ হওয়ায়, স্বভাব নামে মহা পুস্তকের সহিত আমি ঐক্য করত, আমার সামান্য বুদ্ধির কৌশলে যাহা স্থির করিয়াছি তাহা আমি সর্ব্ব-সাধারণকে জ্ঞাতকরণ জন্য প্রকাশ করিতেছি।”

গ্রন্থসূচনা এই। এক্ষণে গ্রন্থ কিরূপ তাহা না পড়িয়া অনেকে অনুভব করিতে পারেন। গ্রন্থকার পীড়ার পরিচয় দিয়া ভাল করেন নাই; প্রশংসা কবিরাজ একা লইল, তাঁহার ঔষধ অতি আশ্চর্য্য!

ষষ্ঠ বর্ষ ঃ পঞ্চম সংখ্যা

গঙ্গাধর শর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

"রাম না হতে রামায়ণ"

অনধিকারচর্চ্চা করিতে আমরা কখন ত্রুটি করি না। যদি কণ্টকাকীর্ণ বন্য তরু ও বন্য লতাজালে আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণ বেষ্টন করে, যদি সর্প ভেকে আমাদিগের গৃহে ভাগাভাগী করিয়া বাস করে, যদি জলবদ্ধ হইয়া সেৎসেঁতে সেওলার বিছানা হইতে দুর্গন্ধ বিস্তার হয়, যদি দিনে দুই প্রহরে, হেতে জোঁক ও শিলেটি হাঁড়ির মত মশা রক্ত শোষণ করে, তথাপি হস্ত বাহু পরিচালনা করিয়া কৃষ্ণের জীবকে বিনষ্ট করিতে বড় মায়া হয় ও সবে বসিতেও ক্লেশ বোধ হয়। সসর্প গৃহে বাস, দুর্গন্ধ ভোগ ও জ্বরের জ্বালা সহ্য হয়, তবু আলস্য পরিত্যাগ করিতে কাতর, আবাস ভূমি পরিষ্কার করিতে কাতর, সকল কার্য্যেই কাতর; কিন্তু বাকব্যয়ে, অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারি, আমাদের তুল্য অকাতর কে আছে? মিথ্যা বাক্যে যে আমাদের নিজ কার্য্য বিশৃঙ্খল হয়, ন্যায়বিচার ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতার হ্রাস হয়, গুরুতর পরিশ্রমলব্ধ কার্য্যসম্পন্নশক্তি শিথিল হয়, সমাজের অনিষ্ট হয়, হলই বা, অম্বুরি তামাক মিশাইয়া বৃথা গল্প করার তুল্য মধুর আর কি আছে? বৃথা গল্প বড় ভাল লাগে, তাহাতে, নিজ উপকার হউক না হউক, যাহারে ভাল না বাসি তাহারও কখন কখন অনিষ্ট হয়, না হয়, তাহার নিন্দাবাদও তো প্রচার হয়? সে বড় কম কর্ণসুখ নহে!

আমাদের খণ্ডভীম স্কুলমাষ্টার ও বিখ্যাত হকিম ডাকমুন্সি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া ডাকঘরের মেজেতে পাটি পাড়িয়া গল্প আরম্ভ করিয়াছেন। মাষ্টার বাবু গজাননের বিরুদ্ধ। গজানন ইংরেজি শিক্ষার শত্রু, গজানন নিঃসন্তান, চক্ষু মুদিলে তাঁহার ধন কে ভোগ করে? কাহাকে ধন দান করিবার ইচ্ছা নাই কিন্তু তিনি মহান্ হিন্দু। পরলোকে পিণ্ডি পাইয়া নরক হইতে উদ্ধারের আশা রাখেন। এই জন্য বহু যত্নে একটি দূরদেশস্থ জাতির

সন্তান লইয়া পালিতেছেন, তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন—ও পোষ্যপুত্র করিয়া পিণ্ডাধিকারী ও ধনাধিকারী করিবার বিশেষ প্রয়াস রাখেন, আশুতোষ বাবুর অনুরোধে এই নীলমণিকে তিনি খঞ্জভীমের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন ; সুশিক্ষার জন্য মাষ্টার বাবুও অনেক যত্ন করিতেছেন। কিন্তু যাহাকে প্রকৃতি দেবী প্রতিকূল, মানব চেষ্টায় তাহার কি হইতে পারে! নীলমণি আজ যাহা বহু কষ্টে শিখিয়া গৃহে যান, কাল প্রাতে ক্ষীর, ননি, সন্দেশের সহিত বেমালুম "জলপান" করিয়া আসেন। তিনি "লোককে" "নোক" রসিককে "অহিক" রাঙ্গাকে "নাঙ্গা" ভিন্ন কহিতে পারেন না—এ দিকে বাঙ্গকে "লাঙ্গ"—অভয়কে "রভয়" বলিয়া থাকেন। "লোকোমোটীব" কে "নৌকো মাটী" কহিতেন ও একদিন "কামসকাটকা" উচ্চারণ করিতে উদ্যম করায় দন্তপাটীতে খিল লাগাইয়া মাষ্টার বাবুকে বিশেষ তিরস্কৃত করিয়াছিলেন। এদিকে তিনি পরীক্ষাব সময়ে (প্রাইজ) পারিতোষিক পান না বলিয়া গজানন মাষ্টার বাবুর উপব অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। সময়ে সময়ে গজানন মাষ্টার বাবুব কাছে প্রস্তাব করিয়া থাকেন, "বাপু! পরীক্ষককে কিছু বেশবত দিলে আমাব নীলমণি প্রাইজ্ পেতে পাবে না? না হয় আশুতেষ বাবু দ্বারা পবীক্ষককে একখানি অনুরোধপত্র লিখাইলে ছাত্রবৃত্তির পাশ আসিতে পাবে না?" আবাব কখন কখন বলেন, "বাবা, আমি উহার তত লেখাপড়া চাই না—যাহাতে মতভ্রষ্ট না হয়, পিণ্ডটী বজায় থাকে তাহাই করুন।" মাষ্টার বাবু একদিকে এই সকল মতেব অনুমোদন কবিতে অন্যদিকে নীলমণির শিক্ষার কিছু মাত্র উন্নতি দেখাইতেও পারিতেন না। তাঁহাকে অপদস্থ করিয়া নূতন মাষ্টার আনাইবার জন্য গজানন দুই একবার আশুতোষ বাবুর নিকট অনুরোধ করেন। মাষ্টাব সেই সব কথা শুনিয়া দেওয়ান্‌জির বিশেষ বিদ্বেষী হন। আজ মাষ্টার বাবু সুসময় পাইয়াছেন। দেওয়ান্‌জি যে নাজির সাহেবের যোগে মিথ্যা করিয়া সুরসিকা ললনা সুন্দরী গোপিনীকে কাদম্বিনী সাজাইয়া বিচারস্থলে আনয়ন করিবেন, তাহা মাষ্টার বাবুর কর্ণগোচর হইয়াছে। সুন্দরীর সঙ্গে তাঁহার অনেক কথা হইত—ও সেই সকল কথা ব্যক্ত করিবার জন্য পূর্ণবাবুর বৈঠকে আসিয়াছেন।

এ দিকে পূর্ণ বাবু নাজিরের ছিদ্র অনুসন্ধাম করিতেছেন, গ্রামে একজনই হাকিম থাকিতে পারে—এক কম্বলে চার জন দরবেস্ বসিতে পারে, কিন্তু এক রাজ্যে দুইজন রাজার স্থান হইতে পারে না—নাজির আবার কোথাকার হাকিম, দুই দিবস পর্য্যন্ত গ্রামে প্রভুত্ব করিতেছে অথচ ডাকমুন্সী মহাশয়কে একটি কথা, একটী পরামর্শও জিজ্ঞাসা করে না। ভাল, কেমন তার হাকিমী, কেমন তার পরামর্শ দেখা যাইবে।

ডাকঘরের কার্য্য পরিদর্শনাভিপ্রায়ে অদ্য ডাক্তার ইট্ওয়াল্ সাহেব আগতপ্রায়; তাঁহার কর্ণগোচর হইলে, জজ লুম্‌লুম্ সাহেব সকল কথা শুনিবেন। একজনের মনোবাদ সোণা, আর একজানের বিদ্বেষ সোহাগা—মাষ্টার বাবু ও ডাকমুন্সী মহাশয়ের গল্প শেষ হইল—পরস্পর হস্তস্পর্শ করিয়া বিদায় হইলেন—পরক্ষণেই একজন হরকরা আসিয়া কহিল, সাহেব বাহাদুরের ঘোড়া নদীর বাঁধের উপর দেখা গেল।

সাহেবের নাম শুনিবামাত্র ডাকমুন্সী মহাশয় পার্শ্বস্থিত ডাকবাঙ্গালায় উপস্থিত হইলেন। আজ ডাকবাঙ্গালা পোষাকী বেশ পরিয়াছে, সকল দ্রব্য মার্জ্জিত; দেয়ালে খানসামা সাহেব পান চিবাইতে চিবাইতে শ্লেষ্মা বর্জ্জনে যে চিত্র বিচিত্র অঙ্কপাত করিয়াছিলেন, বাঁখারির কলমের আঘাতে ডাকমুন্সী মহাশয় যে থামের চূণ খসাইয়া পানের ঝালের লাঘবতা সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা সকল সংস্কার হইয়াছে, সকল শ্বেত খড়িতে মার্জ্জিত হইয়াছে, বড় মেজের উপর শুভ্র চন্দ্রজ্যোতির ন্যায় চাদর বিছান হইয়াছে, বেলাওয়ারি বাসন, চীনের প্লেট গিল্টির জলে আজ খানার কামরা ঝক্ ঝক্ করিতেছে, দ্বারে দুইটি পূর্ণ কলসী ও কলার গাছ রোপণ করা হইয়াছে, টেবিলের উপর গরম ডবল ডিসে বড় হাজরির জাতিবিনাশিনী পিরিলিকুলকলঙ্কিনী ভ্যাপ্সা গন্ধ বিস্তার করিতেছে। খানসামার বয়স প্রায় অশীতি বৎসর, গৌরবর্ণ, গোলাম আলি, দন্তগুলি পরিষ্কার ফাঁক ফাঁক, পরিধানে অতি শুভ্র চাপকান, তাহার বামপার্শ্বে শ্বেতলোমবিকীর্ণ বক্ষঃস্থলের কিঞ্চিদংশ দেখাইয়া ও উপর হইতে প্রচুর শুভ্রশ্মশ্রুকেশরাশি দোলাইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন, মাথার পাগড়ি বন্ধনে ৩০ গজ মলমল পর্য্যবসিত হইয়াছে—হাতে একখানি মান্দ্রাজি রুমাল ও বগলে একটা সার্টফিকেটের তাড়া লইয়া আছেন; আবশ্যক হইলে আপন কার্য্য দক্ষতার পরিচয় দিতে প্রস্তুত। এই তাড়ায় ভারতবর্ষের নব পুরাবৃত্ত পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় মারহাট্টা যুদ্ধ হইতে পঞ্জাব অধিকারের সময়তালিকা এই তাড়া হইতে নির্দ্ধার্য্য হইতে পারে—উহা পাঠ করিলে ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের পুরাবৃত্ত, বা বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস সংগ্রহের পরিশ্রম লাঘব হইতে পারে—লর্ড নেপিয়রে দুটীমাত্র আধপোড়া চিকিণ ভক্ষণ করিয়া এই পথে সিন্ধুযাত্রা কোন্ কালে করেন, প্রথম নেটিব ইঞ্জিনিয়ার বৈকুণ্ঠবাসী বেচারাম হালদার মহাশয় স্বাধীন বিভাগের ভার কোন্ সময় প্রাপ্ত হন, ও কোন্ দিনে সার কলিন কেম্বেল মিউটিনি নিবারণ জন্য মরিচমিশ্রিত অলোণা কাঁচা আণ্ডা ৫ গণ্ডা আহারান্তে এই পথে প্রয়াগদুর্গে গমন করেন, সকল তারিখ এই তাড়া হইতে স্থির হইতে পারে। কোন্ সাহেব কি খাইতে ভাল বাসেন ও কোন বাবু প্রথমতঃ হিন্দুধর্ম্মনিষিদ্ধ দ্রব্য ঐ হাতের গুণে নিজগ্রাসে গ্রহণ করিয়া আনন্দলাভ

করেন—সকল কথা গোলাম আলি বলিতে পারেন। কিন্তু আপাততঃ গম্ভীর-প্রকৃতি ধীর লোকের ন্যায় সম্পূর্ণ ভক্তিসহকারে ডাক্তার সাহেবকে একটি সেলাম করিবার আশয়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

ইতিমধ্যে অশ্বপদের দড়বড়ি শব্দ শুনা গেল, ও পরক্ষণেই ঘোড়া বারাসতের মধ্যে দেখা দিল, একজন বেহারা কহিয়া উঠিল "ও! তীর আস্‌ছে!" সাহেবকে দেখা যায় না কেবল অশ্বপৃষ্ঠে একটী ক বর্গের পঞ্চম অক্ষর ঙ ঠাকুরের ন্যায় মস্তকে বৃহৎ টুপিধারী পাদদ্বয় সম্মুখ ভাগে হেলান দেখা যাইতেছে, চতুষ্পদের ঘর্ষণে ধূলা রজ্জুপাকের ন্যায় ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছে। কথা কহিতে কহিতে গাড়ির বারান্দায় ঘোটক উপস্থিত, সাহেব বাহাদুর চকিতে অবরোহণ করিলেন, সেলামের উপর সেলাম চতুষ্পার্শ হইতে বর্ষণ হইল। সাহেব বাহাদুর কেবল টুপিটি চকিত মাত্র উঠাইয়া বৃহৎ মস্তকের টাক সকলে দেখিতে না দেখিতেই আবার টুপি মাথায় রাখিলেন, কারণ সরদির ভয়ে সাহেব টুপি খুলিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। বারেণ্ডা হইতে সোপানের দিকে দেখিলেন ও পূর্ণ বাবুকে ইঙ্গিত করিয়া "ওয়েল" "Well" মাত্র কহিয়া দ্রুতপদে কামরায প্রধান চৌকিতে উপবিষ্ট হইলেন—পাখা অমনি শন্ শন্ করিয়া চলিতে লাগিল।

ডা, সা। "All right with you, Purna ?" (সব ভাল ত ?)

পূ। Sir, master, your blessing (হুজুর খামিন্দি। আপনার আশীর্ব্বাদ।)

ডা, সা। My blessing !

পূ You master ! you are my most obedient servant। এখন পূর্ণ বাবু বিহ্বল হইয়াছেন, কি বলিতে কি বলিলেন। ও কহিয়া উঠিলেন forgote, forgote sir—!

ডা। Am I your most obedient servant ?

পূ। No sir.

ডা, সা। No sir.

পূ। তবে yes sir.

ডা, সা। I am your most obedient servant, either you or I must be fool.

পূর্ণ। Both, my Lord.

সরলচিত্ত ডাক্তার সাহেব হাসিয়া উঠিলেন। তিনি পূর্ণবাবুর ইংরেজি বিদ্যায় যতদূর ব্যুৎপত্তি তাহা বিলক্ষণ জানিতেন, কিন্তু খুঁট আখরের প্রতি তাহার স্নেহ ছিল, তাহার কার্য্যবিভাগ ঐরূপ খুঁট আখরেতেই পরিপূর্ণ ছিল, ও যখন বিশুদ্ধ

ইংরেজি ভাষায় পত্র পাইতেন, নিশ্চয় জানিতেন, তাহা অপর হাতে লিখিত। পূর্ণ বাবুর প্রতি দৃষ্টি করিয়া আবার কহিলেন, "What's the news", খবর কি ?

পূ। খবর—Sir Ghost's father's verb done ! (ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া হইতেছে।)

ডা: What do you mean ?

পূ। The cake of Udo on the neck of Budho (উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে) Horse's evil on monkey's head (ঘোড়ার বালাই বানরের ঘাড়ে।) পূর্ণ বাবু এই কথা গুলি উচ্চারণ করিয়া দেখিলেন সাহেব তাহার অর্থ সংগ্রহে অক্ষম ; তখন খানসামাকে ইঙ্গিত করিলেন, সে বাহিরে গেলে কিঞ্চিৎ নিম্নস্বরে গাঙ্গুলি মহাশয় ডাক্তার সাহেবের নিকট নাজিরের অত্যাচার ও গজাননের ফেরিপি বৃদ্ধি ও জালকন্যা সাজাইবার অভিসন্ধি সমস্ত ব্যক্ত করিয়া দিলেন, ও যাহাতে তাহা জজ সাহেব বাহাদুরের কর্ণগোচর হয় তাহাই যাচ্ঞা করিলেন। ডাক্তার সাহেব কেবল মাত্র কহিলেন "এ সকল অনধিকারচর্চ্চা, তোমাদের সমাজে এ সকল মিথ্যা রচনা অভ্যাসের কর্ম্ম, বিশেষ এ বিষয়ের বিচার পরে জজ সাহেবের নিকট হইতে পারে, তাঁহাকে পূর্ব্বাহ্নে কোন কথা জ্ঞাত করান সঙ্গত হইতে পারে না"—এই সময় পকেট হইতে ঘড়ি লইয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিলেন, "Hang them !" আমাকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত—নগরে আপন কুটীতে পৌঁছিতে হইবেক। জজ সাহেবের মেমের সহিত খানা খাইতে হইবেক "বহি লাও" "বহি লাও।" তিলেক সময়মধ্যে আপিসের পুস্তক সকল আসিল ; ও কোন রেজিষ্টারির উপরিভাগে, কাহার তলদেশে, কাহার মধ্যদেশে, যেখানে প্রথমে হাত পড়িল প্রায় দুই মিনিট মধ্যে শত স্বাক্ষর ছড়াইয়া পরিদর্শন কার্য্য সমাপ্ত করিলেন ও থাম মেরামত দেখিয়া এবং পূর্ণ বাবুর দন্ত ও ওষ্ঠাধর খদিররাগবিবর্জ্জিত দেখিয়া "I am satisfied" (বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি) কহিলেন। পরক্ষণেই কাঁটা ছুরী অস্ত্রধারী হইয়া খানসামার প্রতি ইঙ্গিত করিবামাত্র ডিসের ঢাকুনি খোলা হইল, ও কাটাকাটি ছেঁড়াছিঁড়ি আরম্ভ হইল। প্লেট হইতে ধূঁয়া উঠিতে আরম্ভ হইল, পূর্ণ বাবু দুই নাকে দুটী অঙ্গুলির অগ্রভাগ প্রবিষ্ট করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। "You eat nothing ? your stomach very small sir !" (মহাশয় কিছুই খান না, এতটুকু পেট।)

ডা। Can you eat more of this meal ?

পূ। Ram Ram, sir, my caste go, I worship stone every day. (রাম রাম ! জাত যাবে, আমি প্রতি দিন শালগ্রাম পূজা করিয়া থাকি) —but say "rice"—two seers every time, mind sir, I am old.

ডাক্তার সাহেব চা ও জল ভিন্ন অপর কোন দ্রব্য পান করিতেন না—কহিলেন, "এই গ্রীষ্মপ্রধানদেশে স্নিগ্ধ বরফবারির তুল্য আর উপাদেয় কি আছে ?"

পূ। তপশি মাছ আর আম বড় মন্দ নহে। মদ্যপান ডাক্তার সাহেব নিষেধ করিতেন। অতএব কহিলেন, "মদেই তোমার দেশ ডুবিবে।" পরে আহার সাঙ্গ করিয়া সাহেব বড় প্রফুল্ল হইলেন, অশ্ব সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন ও কহিলেন, "আমরা আহার করিয়া নিদ্রা যাই না। Well Gangooly what do you want ?"

পূ। I want, thank sir, nothing sir, but pension next October and—

ডা। And what ? (এবং কি ?)

পূ। My son well learned English, missionary School Daff sahib scholar, Inspectori wants.

ডা, সা। I shall see what I can do for him, Purna, I give you no promise.

তখন সাহেবরা অনুগত লোক প্রতিপালনে সর্ব্বদা সুখী হইতেন।

পূর্ণ বাবু সেলাম কবিলেন। সাহেব ছুটি মাত্র আধপোড়া পক্ষী রুমালে বাঁধিয়া পকেটে ফেলিলেন। পথে টিফিনের উদ্যোগ রহিল, পরক্ষণে বারান্দায় আসিলেন। খানসামার হস্তে ঝনাৎ করিয়া মুদ্রা দিবামাত্র অশ্বারোহী হইলেন, আবার ক্ষণমধ্যে অশ্ব ধাবিত হইল।

দ্বিতীয় আড্ডায় ঘোড়া প্রস্তুত আছে কিনা পূর্ণ বাবু তাহাই চিন্তা করিতে করিতে সাহেবের ঘোড়ার গতি সর্ব্বাগ্রে দেখিতে লাগিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বেসবারী

গজানন ব্যয়কুণ্ঠ। পয়সাটি যার ব্রহ্ম, সুখদ পদার্থ তাহার চক্ষের শূল। যাহাতে প্রকৃত সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি, যাহাতে শিল্পের শ্রীসাধন, যাহাতে বিজ্ঞানের উন্নতি, যাহাতে মানবের শক্তি বৃদ্ধি তাহা কৃপণের অসাধ্য ও অসহ্য। নৃত্য গীতে যাহারা আসক্ত তাহারা গজাননের পরম শত্রু। সাধারণ প্রমোদের চিহ্নমাত্র তাঁহার ক্রোধের কারণ। কেথাও তাস যোড়া দেখিলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেন, শতরঞ্চ বা পাশা খেলার আয়োজন দেখিলে বলের থলিটী পর্য্যন্ত

তাঁহাকে জলে নিক্ষিপ্ত করিতে দেখা গিয়াছে। কাহারও তানপুরা দেখিলে তারটি খুলিয়া রাখিতেন ও আবশ্যকমতে আপনার জীর্ণ দন্ত বান্ধাইতেন। তাঁহার ভয়ে গান বাজনা অতি সংগোপনে করিতে হইত; কেবল ঢোল ভাঙ্গিয়া দিতেন না, তবলার ছাওনিটি ছুরি লইয়া কাটিয়া দিতেন না, তাহার চর্ম্মতন্ত্রী খুলিয়া লাঙ্গলের যুয়ালে লাগাইতেন ও যার ঘরে বৈঠকি গীত হইয়াছে শুনিতেন, তাহার সঙ্গিন জরিমানা লাগাইতেন ও স্ত্রীলোক হইলে গোপনে উত্তম মধ্যম দেওয়াইয়া গ্রামত্যাগিনী করাইতেন। কোন ব্রাহ্মণযুবার স্কন্ধে অনেকগুলি যজ্ঞসূত্র দেখিলে লাম্পট্য চিহ্ন জ্ঞান করিতেন ও ক্রোধভরে কাঁচি দিয়া অর্দ্ধেক কাটিয়া ফেলিতেন।

এই সকল কারণে সুন্দরী গোপিনী গজাননের বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন না, কিন্তু প্রজাবৎসল আশুতোষ বাবুর আশ্রয়ে সুন্দরীর বাস। আশু বাবু গুণরাশী হইলেও তাঁহার দুই একটি বিলক্ষণ মনভ্রান্তি ছিল। তিনি সৌন্দর্য্যপ্রিয়। প্রকৃতি মধ্যে হউক, উষার গগনে বা হরিত পল্লবক্ষেত্রে বা নীলিময় জলস্রোতমিশ্রিত চন্দ্রকিরণে বা চন্দ্রমুখীদের চন্দ্রবদনে বা বিচিত্র চিত্র পটে, বা প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তিতে বা কবিতাকলাপে যেখানে হউক কমনীয় সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলেই তাহাতেই তাঁহার পক্ষপাত দৃষ্টি হইত, যাহাকে ভালবাসিতেন তাহার শত দোষ থাকিলেও অন্ধ, এই তাঁহার লোকানুরাগের এক কারণ। তিনি গুণই দেখিতেন এবং এই গুণগ্রাহিতা জন্য তিনি অভাগিনী সুন্দরী গোপিনীর নিকট যোগী ঋষি হইতে ভক্তিভাজন ছিলেন। তাঁহার নামের দোহাইয়েই গজানন সকল কার্য্যে সুসিদ্ধ হইতেন, অদ্য সন্ধ্যার পর সেই নাম উচ্চারণ করিয়া গজানন সুন্দরী গোপিনীর দেখা পাইয়াছেন।

রাত্রি ঘোর অন্ধকার, গবাক্ষ দিয়া দৃষ্টি করিলে নিকটের বৃক্ষকায়াগুলি ঘনীভূত অন্ধকারে চাপ মাত্র বোধ হইতেছে। আকাশের উপর একটি ঘন মেঘখণ্ড মন্দ মন্দ গতিতে উড়ে যাইতেছে। আলোকের পরিচয় দিতে কেবল খদ্যোতিকার দীপ্তি, শব্দের পরিচয় দিতে শত শত ভেককণ্ঠনিঃসৃত সপ্ত গ্রাম, মধ্যে মধ্যে একটী কট্ কট্ শব্দ হইতেছে, যেন ভূত দলে বর্ষায় বাতের আশঙ্কায় অঙ্গ চালনা করিতেছে আর হাড় মটকাইতেছে। এমন রাত্রে কি অবলা স্ত্রীলোক ঘরের বাহির হয়? তবু আশু বাবুর নামে ও দেওয়ানজীর ভয়ে একটি ভৃত্যসহ সুন্দরী গোপিনী দোতালার উপর একটি ক্ষুদ্র কামরায় গজাননের নিকট আসিয়া উপস্থিত। গৃহের এক কোণে একটি বাঁশের ছেঁচা নির্ম্মিত ঘেরার মধ্যে এক তাল গোময়ের উপর এক নির্ব্বাণপ্রায় ক্ষীণপ্রভা মিহি পলিতা দীপ্তিমান্। দীপটি মিটমিট করিতেছে। গজানন

একটা ক্লিষ্ট তাকিয়া ঠেশ দিয়া বসিয়া আছেন ও মধ্যে মধ্যে দংশন জ্বালায় বজ্জাত ছারপোকাকুলের উপর তম্বি করিতেছেন। পার্শ্বে নীলমণি—তাঁহার প্রাণাধিক নীলমণি—শয়ন করিয়া একটি একটি কথা কহিতেছে। গজানন কহিতেছেন, "ও বাপু, রাত্রি হল, বাড়ী চল, ঘুমাও, ব্যাম হবে।"

নী। কি বাবা? জ্বর?

গ। বালাই। অমন কথা বল্‌তে নাই। তুমি না ঘুমাও, চুপ করে থাক।

নী। কেন বাবা চুপ কর্‌লে জ্বর হয় না।

সুন্দরী নিকটে বসিয়াছিল। কহিল, ক্ষেপাছেলে!

নী। হুঁ, তুই ক্ষেপি—

সু। অমন কথা বল্‌তে আছে? আমি—তোমার—

নী। কে, খুড়ি?

সুন্দরী কহিল—খুড়ি হলে কি তোমার জ্যেঠার কাছে আসি।

নী। তবে কি পিসি?

গ। তা নয় ক্ষেপা, ও দিদি হয়।

নী। ঠাকরুণ দিদি? এই কথা কহিতে কহিতে প্রদীপ নির্ব্বাণ-প্রায় হইল। গজানন কহিল, "ওরে উসকাইয়া দে।" নীলমণি কহিল, "নিবে যায় ত বেশ হয়, সকলের ঘুম হবে—"

সুন্দরী কহিল, তোমার জ্যেঠার যে প্রদীপ, নির্ব্বাণ, দীপ্তিমান্ উভয় সমান—

নী। আমি বড় লোক হই—পিডিম ভেঙ্গে বাটি লণ্ঠন জ্বালাব।

গজানন অমনি সজলনয়নে কহিলেন, "কে বলে এর বুদ্ধি নাই। রঘুবীর করুন তুমি বড় লোক হবে।" কথা কহিতে কহিতে নীলমণির তন্দ্রা আসিল। সুন্দরী কহিল "আমাকে কেন স্মরণ করিয়াছেন।"

গজানন কহিলেন, "পারবি?"

সু। আমি কি না পারি? কারও যোগ ভঙ্গ করিতে হইবে?

গ। তা নয়, ভ্রম দর্শাইতে হইবে। সেই যে কথা সে দিন বলিয়াছি, কাদম্বিনী সাজিতে হইবে।

সু। কি মেঘমালা? কারও গলায় কি জড়াইতে হইবেক?

আজ গজানন রসিক হইয়াছেন, তাঁহার কেবল কেটো রস কার্য্যসিদ্ধির পন্থা—কহিলেন, "জড়াও ত হাকিমের গলায়।"

সু। ও মা জাত যাবে! সে যে গোখাদক! ও হরি!

গ। এখন যে কথাগুলি বল্‌ছি বুঝেছ কি না? বুঝ ত বল, না বুঝ তাও বল—বল গো বল।

সু। সব বুঝেছি, কাপড় আর অলঙ্কার চাই।

আমাকে নীলমণি "জটা ডাডা" বলিয়া বড় ভক্তি করে। আমি তার পাশে শুইয়া এতক্ষণ কপটনিদ্রায় ছিলাম। এখন কহিয়া উঠিলাম, "সুন্দরীর কাপড় আর গয়না আর সোনা।" আমার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল ও কহিল, "গঙ্গা দাদা! ঘুমাও নাই? যে আমায় সোনা দেয়, গহনা দেয়, আমি তার; তুমি দিবে?" আমি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সুবুদ্ধিমান্ নীলমণি ভবিষ্যৎবাণীর স্বরূপ কহিল, "ছিছি! আমি দিব।" গজানন কহিয়া উঠিলেন, "ক্ষেপাছেলে।"—নীলমণি আবার কহিল, "আমার যে দু টাকার ডুয়ানি আছে—টোনা খরিদ কর্‌ব।" আমি কহিলাম, "ভাই নীলমণি, দুই টাকায় কটা দুয়ানি হয়?"

নী। সাড়ে নয়টা—জটা ডাডা।

গ। ভীমে মাষ্টারটা অতি বেল্লিক, শিখাইবার প্রণালী আদৌ জানে না।

সু। একটা বন্দবস্ত করুন—আমার কাপড় অলঙ্কার?

গ। সব প্রস্তুত।

সম্মুখে একটী হাতবাক্স ছিল। দুইটি গিল্টির বাগ্‌মুখো চক্‌চকে বালা দেওয়ান্‌জী সুন্দরীকে দিলেন। সেও সঙ্গে সঙ্গে পবিল ও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। আবার একটি পার্শ্বস্থিত বস্তা হইতে একখানি সাড়ি ও উড়ানি ও পাদ-ভূষণ পশ্চিমে পাঁইজর সুন্দরীকে দেওয়া হইল। সুন্দরী বারেণ্ডার দিকে গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে বেশ পরিবর্ত্তন কবিয়া রাজ-পুতানী কাদম্বিনী হইয়া প্রবেশ করিল। বাস্তবিক তাহাকে তাদৃশ রাজপুতানীর মত দেখাইত না, সে তাদৃশ গৌরাঙ্গী স্থূল উন্নতকায় নহে। তাহার আঁখির ও ভ্রূযুগলের ভাবভঙ্গি সেরূপ প্রশস্ত পরিমাণের নহে; সে উজ্জ্বল-শ্যাম, কৃষাঙ্গী, কোমলাঙ্গী, পঞ্চদশবর্ষীয়া বঙ্গ গোপকন্যা মাত্র; তথাপি যে দিন হইতে সে রাজ-পুতানী সাজিল, সেই দিন হইতেই তাহাকে ঠিক রাজপুতানী বলিয়াই অনেকে দেখিতে লাগিল, ও গ্রামে দুই একটি বৃদ্ধ লোক ভ্রূ উত্তোলন করিয়া কহিতে লাগিল, "না হবে কেন, এ কে জান?" আর এক বৃদ্ধ কহিল, "এ বাবুর বাটীর জমাদার ভবানী সুকুলের ঔরসজাত কন্যা, সেই জন্য ও কেমন লোচ হিন্দিতে কথাবার্ত্তা কহে শুনেছ?" এখন সজ্জা পরিবর্ত্তন করিয়া গজাননের সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র গজানন কহিলেন, "বেশ সেজেছ—সুন্দরি!"

সুন্দরী কহিলেন, "এ আপনার ভ্রম—আমি কাদম্বিনী।"

নীলমণি কহিয়া উঠিল—

"দিদি! তুমি জান কত রঙ্গ,
ধানভান, চিঁড়ে কোট—বাজাও মৃদঙ্গ।"

১

বর্ষে বর্ষে এসো যাও এ বাঙ্গালা ধামে
কে তুমি ষোড়শী কন্যা, মৃগেন্দ্রবাহিনি ?
চিনিয়াছি তোরে দুর্গে, তুমি নাকি ভব দুর্গে,
দুর্গতির একমাত্র সংহারকারিণী ॥ *
মাটি দিয়ে গড়িয়াছি কত গেল খড় কাছি,
সৃজিবারে জগতের সৃজনকারিণী।
গড়ে পিটে হলো খাড়া, বাজা ভাই ঢোলকাড়া,
কুমারের হাতে গড়া ঐ দীনতারিণী !
বাজা—ঠমকি, ঠমকি ঠিকি, খিনিকি ঝিনিকি ঠিনি ॥

২

কি সাজ সেজেছ মাতা রাঙ্গতার সাজে !
এদেশে যে রাঙ্গই সাজ কে তোরে শিখালে ?
সন্তানে রাঙ্গতা দিলে, আপনি তাই পরিলে,
কেন মা রাঙ্গের সাজে এ বঙ্গ ভুলালে ?
ভারত রতন খনি, রজত কাঞ্চন মণি,
সেকালে এদেশে মাতা, কত না ছড়ালে।
বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা, আজি তুমি রাঙ্গতা পরা,
ছেঁড়া ধুতি রিপু করা, ছেলের কপালে !
তবে—বাজা ভাই ঢোল কাঁশি মধুর খেমটা তালে ॥

---

* এই কাব্যে ছন্দের নিয়ম পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘিত হইয়াছে—ব্যাকরণের ত কথাই নাই।—লেখক।

৩

কারে মা এনেছ সঙ্গে, অনন্ত রঙ্গিণি!
কি শোভা হয়েছে আজি, দেখরে সবাই।
আমি বেটা লক্ষ্মীছাড়া, আমার ঘরে লক্ষ্মী খাড়া,
ঘরে হতে খাই তাড়া, ঘর খরচ নাই।
হয়েছিল হাতে খড়ি, ছাপার কাগজ পড়ি,
সরস্বতী তাড়াতাড়ি, এলে বুঝি তাই?
করো না মা বাড়াবাড়ি, তোমায় আমায় ছাড়াছাড়ি,
চড়ে না ভাতের হাঁড়ি, বিদ্যায় কাজ নাই।
তাক্ তাক্ ধিনাক্ ধিনাক্ বাজনা বাজারে ভাই।

৪

দশভুজে দশায়ুধ কেন মাতা ধর?
কেন মাতা চাপিয়াছ সিংহটার ঘাড়ে?
ছুরি দেখে ভয় পাই, ঢাল খাঁড়া কাজ নাই,
ও সব রাখুক গিয়ে রামদীন পাঁড়ে।
সিংহ চড়া ভাল নয়, দাঁত দেখে পাই ভয়,
প্রাণ যেন খাবি খায়, পাছে লাফ ছাড়ে।
আছে ঘরে বাঁধা গাই, চড়তে হয়ত চড় তাই,
তাও কিছু ভয় পাই, পাছে সিঙ্ নাড়ে।
সিংহ পৃষ্ঠে মেয়ের পা! দেখে কাঁপি হাড়ে হাড়ে।

৫

তোমার বাপের কাঁধে—নগেন্দ্রের ঘাড়ে
তুঙ্গ শৃঙ্গোপরে সিংহ—দেখ গিরিবালে!
শিমলা পাহাড়ে ধ্বজা, উড়ায় করিয়া মজা,
পিতৃসহ বন্দী আছ, হর্য্যক্ষের জালে।
তুমি যারে কৃপা কর, সেই হয় ভাগ্যধর—
সিংহেরে চরণ দিয়ে কতই বাড়ালে!
জনমি ব্রাহ্মণ কুলে, শতদল পদ্ম তুলে
আমি পূজে পাদপদ্মে, পড়িনু আড়ালে!
রুটি মাখন খাব মাগো! আলোচাল ছাড়ালে!

এই শুন পুনঃ বাজে মজাইয়া মন,
সিংহের গভীর কণ্ঠ, ইংরেজ কামান !
হুড়ুম হুড়ুম হুম, প্রভাতে ভাঙ্গায় ঘুম,
দুপুরে প্রদোষে ডাকে, শিহরয় প্রাণ !
ছেড়ে ফেলে ছেড়াধুতি জলে ফেলে খুঙ্গী পুঁথি,
সাহেব সাজিব আজ ব্রাহ্মণ সন্তান।
লুচি মণ্ডার মুখে ছাই, মেজে বসে মটন খাই।
দেখি মা পাই না পাই তোমার সন্ধান।
সোলা-টুপি মাথায় দিয়ে পাব জগতে সম্মান॥

৭

এনেছ মা বিম্ব-হরে কিসের কারণে ?
বিম্বময় এ বাঙ্গালা, তাকি আছে মনে ?
এনেছ মা শক্তিধরে, দেখি কত শক্তি ধরে ?
মেরেছ মা বারে বারে দুষ্টাসুরগণে॥
মোরেছে তারকাসুর, আজি বঙ্গ ক্ষুধাতুর,
মার দেখি ক্ষুধাসুর, সমাজের রণে ?
অসুরে করিয়া ফের, মায়েপোয়ে মার্‌লে ঢের।
মার দেখি এ অসুরে, ধরি ও চরণে।
তখন—"কত-নাচ গো রণে !" বাজাব প্রফুল্ল মনে॥

৮

তোমার মহিমা মাতা বুঝিতে নারিনু,
কিসের লাগিয়া আন কাল বিষধরে ?
ঘরে পরে বিষধর, বিষে বঙ্গ জর জর,
আবার এ অজগর দেখাও কিহরে ?
হই মা পরের দাস, বাঁধি আঁটি কেটে ঘাস,
নাহিক ছাড়ি নিঃশ্বাস, কালসাপ ডরে।
নিতি নিতি অপমান, বিষে জর জর প্রাণ,
কত বিষ, কণ্ঠ মাঝে, নীলকণ্ঠ ধরে ?
নিরন্তর বিষের জ্বালায় প্রাণ ছট ফট করে !

৯

দুর্গা দুর্গা বল ভাই দুর্গা পূজা এলো
পুঁতিয়া কলার তেড় সাজাও তোরণ।
বেছে বেছে তোল ফুল, সাজাব ও পদমূল,
এবার হৃদয় খুলে পূজিব চরণ॥
বাজা ভাই ঢাক ঢোল, কাড়ানাগরা গণ্ডগোল,
দেব ভাই পাটার ঝোল সোনার বরণ॥
ন্যায়রত্ন এসো সাজি, প্রতিপদ হলো আজি,
জাগাও দেখি চণ্ডীরে বসায়ে বোধন?

১০

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু—ছায়া রূপ ধরে!
কি পুঁথি পড়িলে বিপ্র! কাঁদিল হৃদয়!
সর্ব্বভূতে সেই ছায়া, পবিত্র হইল কায়া,
ঘুচিবে সংসার মায়া, যদি তাই হয়॥
আবার কি শুনি কথা! শক্তি নাকি যথা তথা?
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু, শক্তিরূপে রয়?
বাঙ্গালী ভূতের দেহ— শক্তি ত না দেখে কেহ;
ছিলে যদি শক্তিরূপে, কেন হলে লয়?
আদ্যাশক্তি শক্তি দেহ! জয় মা চণ্ডীর জয়!

১১

পরিল এ বঙ্গবাসী, নূতন বসন,
জীবন্ত কুসুম সজ্জা, যেন বা ধরায়
কেহ বা আপনি পরে, কেহ বা পরায় পরে,
যে যাহারে ভালবাসে, সে তারে সাজায়।
বাজারেতে হুড়াহুড়ি, আপিসেতে তাড়াতাড়ি
মিঠাই মণ্ডার ছড়াছড়ি, ভাত কেবা খায়?
সুখের বড় বাড়াবাড়ি, টাকার বেলা ভাঁড়াভাঁড়ি
এই দশা ত সকল বাড়ী, দোষিব বা কায়?
বর্ষে বর্ষে তুমি, মাগো বড়ই টাকার দায়!

১২

হাহাকার বঙ্গদেশে, টাকার জ্বালায়।
তুমি এলে শুভঙ্করি! বাড়ে আরও দায়।
কেন এসো কেন যাও, কেন চাল্ কলা খাও
তোমার প্রসাদে যদি টাকা না কুলায়।
তুমি ধর্ম্ম তুমি অর্থ, তার বুঝি এই অর্থ,
তুমি মা টাকা-রূপিণী, ধরম-টাকায়।
টাকা কাম, টাকা মোক্ষ, রক্ষ মাতঃ, রক্ষ রক্ষ,
টাকা দাও লক্ষ লক্ষ, নৈলে প্রাণ যায়।
টাকা ভক্তি টাকা নতি, টাকা মুক্তি টাকা গতি,
না জানি ভকতিস্তুতি, নমামি টাকায়!
হা টাকা যো টাকা দেবি, মরি যেন টাকা সেবি,
অন্তিমকালে পাই যেন রূপার চাকায়!

১৩

তুমিই বিষ্ণুর হস্তে সুদর্শন চক্র,
হে টাকে! ইহ জগতে তুমিই সুদর্শন।
শুন প্রভু রূপচাঁদ, তুমি ভানু তুমি চাঁদ,
ঘরে এসো সোনার চাঁদ, দাও দরশন॥
আ মরি কি হেরি শোভা, ছেলে বুড়ার মনোলোভা,
হৃদে ধর বিবির মুণ্ড, লতায় বেষ্টন।
তব ঝন্ ঝন্ নাদে, হারিয়া বেহালা কাঁদে,
তম্বুরা মৃদঙ্গ বীণ কি ছার বাদন!
পসিয়া মরম-মাঝে,. নারীকণ্ঠ মৃদু বাজে,
তাও ছার তুমি যদি কর ঝন্ ঝন্।
টাকা টাকা টাকা টাকা! বাক্সতে এসোরে ধন!

১৪

তোর লাগি সর্ব্বত্যাগী, ওরে টাকা ধন!
জনমি বাঙ্গালী-কুলে, ভুলিনু ও রূপে!
তেয়াগিনু পিতা মাতা, শত্রু যে ভগিনী ভ্রাতা,
দেখি মারি জ্ঞাতি গোষ্ঠী, তোরে প্রাণ সঁপে!
বুঝিয়া টাকার মর্ম্ম, ত্যজেছি যে ধর্ম্ম কর্ম্ম,
করেছি নরকে ঠাঁই, ঘোর কৃমিকূপে॥
দুর্গে দুর্গে ডাকি আজ, এ লোভে পড়ুক বাজ!
অসুরনাশিনি চণ্ডি, আয় চণ্ডীরূপে!
এ অসুরে নাশ, মাত! শুম্ভে নাশিলে যেরূপে!

১৫

এসো এসো জগন্মাতা, জগদ্ধাত্রী উমে!
হিসাব নিকাশ আজি, করি তব সঙ্গে।
আজি পূর্ণ বারমাস পূর্ণ হলো কোন্ আশ?
আবার পূজিব তোমা কিসের প্রসঙ্গে?
সেই ত কঠিন মাটি, দিবা রাত্রি দুখে হাঁটি,
সেই রৌদ্র সেই বৃষ্টি, পীড়িতেছে অঙ্গে।
কি জন্য গেল বা বর্ষ? বাড়িয়াছে কোন হর্ষ?
মিছামিছি আয়ুঃক্ষয়, কালের ভ্রূভঙ্গে।
বর্ষ কেন গণি তবে, কেন তুমি এসো ভবে,
পিঞ্জর যন্ত্রণা সবে, বনের বিহঙ্গে?
ভাঙ্গ মা দেহ-পিঞ্জর! উড়িব মনের রঙ্গে।

১৬

ওই শুন বাজিতেছে গুম্ গাম্ গুম্
ঢাক ঢোল কাড়া কাঁশি, নৌবত নাগরা।
প্রভাত সপ্তমী নিশী, নেয়েছে শঙ্করী পিশী,
রাঁধিবে ভোগের রান্না, হাঁড়ি মাল্‌শা ভরা।
কাঁদি কাঁদি কেটে কলা, ভিজাইয়াছি ডাল ছোলা,
মোচা কুমড়া আলু বেগুন, আছে কাঁড়ি করা।
আর মা চাও বা কি? মট্‌কি ভরা আছে ঘি,
মিহিদানা সীতাভোগ, লুচি মনোহরা!
আজ এ পাহাড়ে মেয়ের, ভাল করো পেট ভরা।

১৭

আর কি খাইবে মাতা? ছাগলের মুণ্ড?
রুধিরে প্রবৃত্তি কেন হে শান্তিরূপিণি!
তুমি গো মা জগন্মাতা, তুমি খাবে কার মাথা?
তুমি দেহ, তুমি আত্মা, সংসারব্যাপিনি!
তুমি কার কে তোমার, তোর কেন মাংসাহার?
ছাগলে এ তৃপ্তি কেন, সর্ব্বসংহারিণি?
করি তোমায় কৃতাঞ্জলি, তুমি যদি চাও বলি,
বলি দিব সুখ দুঃখ, চিত্তবৃত্তি জিনি;
ছ্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাং! নাচ গো রণরঙ্গিণি।

১৮

ছয় রিপু বলি দিব, শক্তির চরণে
ঐশিকী মানসী শক্তি! তীব্র জ্যোতির্ম্ময়ি!
বলি ত দিয়াছি সুখ,　　　এখন বলি দিব দুখ
শক্তিতে ইন্দ্রিয় জিনি হইব বিজয়ী।
এ শক্তি দিতে কি পার?　　　ঠসে তবে পাঁটা মার,
প্রণমামি মহামায়ে তুমি ব্রহ্মময়ী।
নৈলে তুমি মাটির ঢিপি,　　　দশমীতে গলা টিপি,
তোমায় ভাস্‌বে গাঁজা টিপি, সিদ্ধি বস্তু কই।
ঐটুকু মা লাভ দেখি, পূজি তোমায়, মৃণ্ময়ী!

১৯

মন্ বোতলে ভক্তি-ধেনো রাখিয়াছি তারা,
এঁটেছি সন্দেহ-ছিপি বিদ্যার গালাতে।
শিখিয়াছি লেখা পড়া,　　　ঠাকুর দেবতার মেজাজ কড়া,
হইয়াছি আধ পোড়া, সংসার জ্বালাতে।
সাহেবের হুকুম চড়া,　　　গৃহিণীর নথনাড়া,
ঋণে কব্‌লে দেশ ছাড়া, পারি না পালাতে।
তাতে আবার তুমি এলে,　　　টাকার হিসাব না করিলে,
এতে কি মা ভক্তি মেলে সংসার লীলাতে?
বোতলে এঁটেছি ছিপি! পার কি তুমি খোলাতে?

২০

কাজ নাই সে কথায়; পূজা কর সবে।
দেশের উৎসব এ যে ঠেলিতে কে পারে?
কর সবে গণ্ডগোল,　　　দাও গোলে হরিবোল,
সাপুটি পাটার ঝোল ফিরি দ্বারে দ্বারে—
যাত্রার লেগেছে ধুম,　　　ছেলে বুড়ার নাহি ঘুম,
দেখ না জ্বলিছে আলো বঙ্গের সংসারে।
দেখ না বাজনা বাজে,　　　দেখ না রমণী সাজে,
কুসুমিত তরু যেন কাতারে কাতারে।
তবু ত এনেছ সুখ মাতা বঙ্গ-কারাগারে।

২১

বর্ষে বর্ষে এসো মাগো, খাও লুচি পাটা
ছোলা কলা কচু ঘেঁচু যা যোটে কপালে,
যে হলো দেশের দশা, নাই বড় সে ভরসা,
আস্‌বে যাবে খাবে নেবে, সম্বৎসর কালে।
তুমি খাও কলা মূলো, তোমার সন্তানগুলো,
মারিতেছে ব্রাণ্ডি পাণি, মুর্গী পালে পালে।
দীন কবি আমি মাতা, পাতিয়া আঙট পাতা,
তোমার প্রসাদ খাই, ঘৃত আলো চালে।
প্রসীদ প্রসীদ দুর্গে, প্রসীদ নগেন্দ্র বালে!

অহং কমলাকান্তস্য ছাত্র
ভীষ্মদেবস্য খোষনবীশ জুনিয়ার M.A. B.L.

আষাঢ়ের বঙ্গদর্শনে একজন বাঙ্গালি গবর্ণরের অদ্ভুত বীরত্বের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সুবিজ্ঞ লেখক সয়ের মতাক্‌খরীণ হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।* কিন্তু তিনি হাস্যরসের অনুচিত অবতারণা করিতে যাইয়া দুর্লভরামের চিত্র অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন। মূল ইতিহাসের সহিত তাঁহার কোন কোন কথার ঐক্য নাই। দুর্লভরামের সেনাপতির নাম আতাউল্লা খাঁ নহে, মির আবদুল আজিজ। মারহাট্টারা আসিয়া উপস্থিত হইলে, মির আবদুল আজিজ দুর্লভরামের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই আপনার লোকদিগকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলেই দুর্লভরাম দৌড় মারেন নাই। তিনি বাহিরে আসিয়া দুর্গে যাইবার জন্য পাল্কিতে আরোহণ করেন। মির আবদুল আপনার লোক লইয়া সেই পাল্কির সঙ্গে যাইতে থাকেন। কিছু দূর গেলে মারহাট্টা সৈন্য আসিয়া পড়াতে দুর্লভরাম পাল্কি ছাড়িয়া কোন ভগ্নগৃহে পলাইতেছিলেন, এমন সময় সেনাপতি আবদুল তাহাকে ধরিয়া ফেলেন, এবং অশ্বে আরোহণ করিতে কহেন। দুর্লভরাম অশ্বারোহণে আবদুল আজিজও তাঁহার সৈন্যদলের সহিত দুর্গে উপনীত হয়েন। তিনি দুর্গমধ্যে বন্দী হয়েন নাই। দুর্লভরাম সন্ন্যাসীদের কথায়, আত্মসমর্পণ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন। সৈন্যসংক্রান্ত অনেক কর্ম্মচারী দুর্লভরামের প্রস্তাবে সম্মত হয়েন। কিন্তু মির আবদুল ইহাতে নিতান্ত অসম্মতি প্রকাশ করেন। সন্ন্যাসীদের কুপরামর্শে দুর্লভরামের বুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল, সুতরাং তিনি সন্ধি করিতেই উদ্যত হয়েন। কয়েক দিন কথাবার্ত্তার পর, দুর্লভরাম গড় হইতে বাহিরে আসিয়া মারহাট্টাপতি রঘুজী ভোঁসলার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের পর তিনি বাসস্থানে ফিরিয়া আসিতে চাহেন, কিন্তু মারহাট্টাপতি তাঁহাকে প্রচণ্ড সূর্য্য তাপের সময় বাসায় যাইতে বারণ করিয়া, সেইখানে কিছুকাল বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করেন। দুর্লভরাম ও

* Seir Mutaqherin. II. 511—514.

তাঁহার সমভিব্যাহারিগণ এইরূপ অনুরুদ্ধ হইয়া অস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক রঘুজীর শিবিরে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। এই অবসরে মারহাট্টাগণ তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া ফেলে। আবদুল আজিজের ভ্রাতা, দুর্লভরামের সঙ্গে গিয়াছিলেন, সুতরাং তিনিও বন্দী হয়েন। কেবল মির আবদুল আজিজ দুর্গে আসিয়া, আপনাদের স্বাধীনতা ও নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সম্মান রক্ষা করেন।

দুর্লভরামের এই পরিচয়ে, বাঙ্গালার ইতিহাসানভিজ্ঞ পাঠক, উদ্দেশে সমস্ত বাঙ্গালীর প্রতি তর্জ্জনী সঞ্চালন করিতে পারেন; সেই জন্য এই স্থলে বাঙ্গালীর বীরত্ব সম্বন্ধে দুই একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতে ইচ্ছা হইতেছে। বাঙ্গালার সকলেই দুর্লভরামের ন্যায় ছিলেন না অদৃষ্টদোষে বাঙ্গালার সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইতিহাস নাই; বাঙ্গালার ইতিহাসের আলোচনা করিতেও অনেক বাঙ্গালীর প্রবৃত্তি নাই। এক দুর্লভরামের বিবরণ বঙ্গদর্শনের স্তম্ভে দেখিয়া, অনভিজ্ঞ পাঠক উচ্চ করতালিধ্বনির সহিত বলিয়া উঠিতে পারেন "হো! হো! বাঙ্গালী কবে মানুষ ছিল?"

বাঙ্গালার পূর্ব্বে গৌরব অনেক ছিল, বাঙ্গালীর পূর্ব্ববীরত্বও অনেক ছিল, আপনাদের পূর্ব্ব গৌরবকাহিনী শুনিলে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই, এবং উপকার ভিন্ন অপকার নাই। যাঁহাদের মনোবৃত্তি বিকারগ্রস্ত হইয়াছে, তাঁহারা ইহাতে উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের জন্য আমাদের এই প্রয়াস নয়।

রঘুবংশে কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় বাঙ্গালীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ ॥(১)

ইহাতে বোধ হইতেছে, কালিদাস যখন রঘুবংশ লিখেন, তখন বাঙ্গালী নৌযুদ্ধে পটু ছিল। এবং তখন বাঙ্গালী স্বাধীন ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, বালী ও যবদ্বীপেও বাঙ্গালীর জয়পতাকা উড়িয়াছিল। সমুদ্রযাত্রা ও সামুদ্রিক রাজ্য জয়ে বাঙ্গালী যেমন যোগ্যতা দেখাইয়াছে, এমন ভারতবর্ষের আর কোন জাতি দেখাইতে পারে নাই।

পাল ও সেনবংশের বীরত্বের বিবরণ আজও বাঙ্গালা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। মুঙ্গেরে যে একখানি তাম্রশাসন-পত্র পাওয়া যায়, তাহাতে লিখিত আছে, গৌড়ের অধিপতি দেবপাল দেব মুদগ গিরিতে (মুঙ্গেরে) শিবির সন্নিবেশ

---

(১) সেনানায়ক সেই রঘু, রণতরী আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উপস্থিত বঙ্গবাসীদিগকে পরাজয় করিয়া গঙ্গার মধ্যস্থ দ্বীপে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিলেন।

করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহার যুদ্ধাশ্ব কাম্বোজ দেশে (২) উপনীত হইয়াছিল। (৩) রাজসাহীর অনুশাসন-পত্রেও মহারাজ লক্ষ্মণসেনের এইরূপ দিগ্বিজয় বর্ণনা দেখা যায়।* ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন, উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজারা অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন; এই গঙ্গাবংশীয়দিগের আদিপুরুষ বাঙ্গালী। তমোলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশে ইহাদের আবাস ছিল (৪) হণ্টর সাহেব লিখিয়াছেন, বিষ্ণুপুরের রাজাগণ মুসলমান হইতে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন, (৫) অতএব বাঙ্গালী পূর্ব্বে নিতান্ত ক্ষুদ্র জাতি ছিল না।

আবার আমাদের একজন সুপণ্ডিত ঐতিহাসিক বাঙ্গালায় ইতিহাস লিখিতে যাইয়া, বাঙ্গালীর সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, পাঠক তাহাও শুনুন। বাঙ্গালার ইতিহাসে ইঁহার সরস লেখনী হইতে এই বাক্য নির্গত হইয়াছে:—

"পাঠানেরাই এতদ্দেশে মুসলমান জয়পতাকা উড্ডীন করেন। ৩৭২ বৎসর পরে তাঁহাদিগের রাজত্বের শেষ সময়ে, এ দেশেব কতদূর তাঁহাদিগের অধিকৃত ছিল, একবার বিবেচনা করিয়া দেখা মন্দ নহে। পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটে তাঁহাদিগের ক্ষমতা প্রবিষ্ট হয় নাই; দক্ষিণে সুন্দরবনসন্নিহিত প্রদেশে স্বাধীন হিন্দু রাজা ছিল। পূর্ব্বে চট্টগ্রাম নোয়াখালী এবং ত্রিপুরা, আরাকানরাজ ও ত্রিপুরাধিপতির হস্তে ছিল; এবং উত্তরে কুচবিহার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিল। সুতরাং যে সময়ে পাঠানেরা উড়িষ্যা জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যে সময়ে তাঁহারা ১,৪০,০০০ পদাতিক ৪০,০০০ অশ্বারোহী এবং ২০,০০০ কামান দেখাইতে পারিতেন, সে সময়েও এ দেশের অনেকাংশ তাঁহাদিগের হস্তগত হয় নাই।"(৬)

এগুলি প্রকৃত ইতিহাসের কথা। বাঙ্গালার সুবিজ্ঞ সমালোচক ও সুপ্রসিদ্ধ লেখক এই কথা উদ্ধৃত করিয়া অভিমানের সহিত বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালার

---

(২) কাম্বোজ দেশ সিন্ধু নদের উত্তরপশ্চিমদিক্‌বর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। ইহা অশ্বের জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। রামায়ণ, পদ্মপুরাণ ও রঘুবংশাদিতে এই দেশের উল্লেখ আছে।

(৩) As. Res. vol. I. 125.

* Journ. As. Soc. Beng. 1865. Part I.

(৪) Wilson's Preface to Mackenzie Collection. CXXVIII.

(৫) Hunter's Annals of Rural Bengal. ১২৮১ সালের ভাদ্র মাসের বঙ্গদর্শনের ঐতিহাসিকভ্রম শীর্ষক প্রবন্ধে এই সকল বিষয়ের সবিস্তার বিবরণ আছে। কুতূহলপর পাঠক ঐ প্রবন্ধটী পড়িয়া দেখিবেন। যাঁহারা উহা পড়েন নাই আমরা এ স্থলে কেবল তাঁহাদের জন্য কয়েকটি মোটামুটি কথা ঐ প্রবন্ধ হইতে গ্রহণ করিলাম।

(৬) শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস। ৩৬।৩৭ পৃষ্ঠা।

অধঃপতন একদিনে ঘটে নাই।" (৭) চারি বৎসর পূর্ব্বে স্বদেশবৎসল বাঙ্গালি, স্বদেশের পূর্ব্বতন গৌরবে উন্নত হইয়া বঙ্গদর্শনে যে সরলভাবে সে সরল বাক্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন, চারিবৎসর পরেও আজ আমরা সেই বঙ্গদর্শনে সেই সরল ভাবে সেই সরল বাক্যের পুনরুল্লেখ করিতেছি ঃ—"বাঙ্গালার অধঃপতন একদিনে ঘটে নাই।"

পাঠানেরা যে কেবল সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র লইয়া বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছে, এ কথা মিথ্যা। বাঙ্গালায় পাঠানের উদয়, স্থিতি ও বিলয় হইয়াছে, তথাপি অনেকস্থানে অনেক বাঙ্গালী আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছে। ইহার পর মোগলের আধিপত্য সময়েও বাঙ্গালীর বীর্য্যবহ্নি নিবিয়া যায় নাই, যশোহরের প্রতাপাদিত্যের নাম আমাদেব দেশেব সকলেই জানেন। প্রতাপাদিত্য কখনও কাপুরুষের ন্যায় আপনাব স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দেন নাই, এবং কখনও কাপুরুষের ন্যায় দিল্লীর সেনাপতিব সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। আমাদের দেশে যে সকল পরাক্রান্ত বার ভুঁইয়ার বিবরণ শুনা যায়, প্রতাপাদিত্য তাঁহাদের অন্যতম। প্রতাপাদিত্য ব্যতীত আরও অনেক পরাক্রমশালী ভুঁইয়ার নাম করা যাইতে পারে, ইহাদের দুর্গ ছিল, সৈন্য ছিল, যুদ্ধপোত ছিল। ইহারা যুদ্ধস্থলে বীরত্ব দেখাইতেন, সাহস দেখাইতেন। ইহারা সৈন্য দিয়া, অস্ত্র দিয়া, যুদ্ধপোত দিয়া বাদসাহের সাহায্য করিতেন।* ইহারা গৌড়ের অধিপতির অধীনে থাকিয়া, শেষে আপনাদের ক্ষমতাবলে স্বাধীন হয়েন। ইহারা কাহাকেও কর দিতেন না, বা কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতেন না। ইহারা আপনা আপনি স্বাধীন রাজা হইয়া, যুদ্ধের জন্য এবং পর্ত্তুগীজ ও মগ দস্যুদের আক্রমণ নিবারণ জন্য সৈন্য ও সামরিক পোত রাখিতেন।† অতএব বাঙ্গালী পূর্ব্বে বীরত্বশূন্য ছিল না।

---

(৭) বঙ্গদর্শন। তৃতীয় খণ্ড, (১২৮১)।

* আইন আক্‌বরীতে লিখিত আছে বাঙ্গালার জমীদারেরা ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী ৮,০১,১৫৮ পদাতিক, ১,১৭০ গজ, ৪,২৬০ কামান ৪,৪০০ নৌকা যোগাইতেন। Gladwin's Aini Akbari vol. II. ও রাজকৃষ্ণ বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস দেখ।

† The Bhuyas ** had been dependants of the king of Gour, but had acquired independence by force of arms. They refused to pay tribute, or to acknowledge allegiance to any one. From being prefects appointed by the king, they had become kings, with armies and fleet at their command, ever ready to wage war against each other or to oppose the invasion of Portuguese pirates and Mog freebooters."—Journ. As. Soc. Beng. XLV. 182—183.

আমরা এস্থলে এই বলবীর্য্যশালী বাঙ্গালী ভূস্বামীদিগের আরও দুই এক জনের নাম করিব। খিজিরপুরের (৮) ঈশাখাঁর বীরত্বের বিবরণ আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর লিখিত কোন বাঙ্গালা ইতিহাসে উঠে নাই। ঈশাখাঁ নাম শুনিয়াই অনেকে মনে করিতে পারেন, এ ব্যক্তি পাঠান ছিল; সুতরাং ইহার কথা তুলিয়া বাঙ্গালার বীরত্বের গৌরব করা অসঙ্গত। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে বলিতেছি ঈশাখাঁর পিতা হিন্দু ছিলেন। তাঁহার নাম কালিদাস। হুসেন সার রাজত্ব সময়ে (খ্রীঅব্দে ১৪৯৩—১৫২০) কালিদাস মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং ঈশাখাঁ পাঠান নহেন, মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুর সন্তান, বিশেষ বাঙ্গালী।

ঈশাখাঁ সুবর্ণগ্রামে আধিপত্য করিতেন, সমস্ত পূর্ব্ব বাঙ্গালা তাঁহার অধীনে ছিল। তিনি আসামের অন্তর্গত রাঙ্গামাটীতে, বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জের অপর পারস্থ ত্রিবেণীতে, এবং যেস্থানে লাক্ষ্যানদী ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়াছে সেইস্থানের নিকটবর্ত্তী এগারসিন্ধুতে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৫৮৩ খ্রীঅব্দে রালফ ফিচ নামে একজন ভ্রমণকারী সুবর্ণগ্রামে উপস্থিত হয়েন। তিনি লিখিয়াছেন, "এই সমস্ত দেশের প্রধান রাজার নাম ঈশাখাঁ। তিনি অন্যান্য অধিপতিদিগের মধ্যে প্রধান, এবং খ্রীষ্টান্‌দিগের পরমবন্ধু (৯)। ১৫৮৫খ্রীঅব্দে দিল্লীশ্বরের সেনানী সাহাবাজ খাঁ অনেক সৈন্য সামন্তের সহিত পূর্ব্ব বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন, কিন্তু ঈশাখাঁর পরাক্রমে তাঁহার এই দেশ জয়ের চেষ্টা বিফল হয়। সাহাবাজ খাঁ পরাভূত হইয়া প্রস্থান করেন। ঈশাখাঁর স্বাধীনতা অটল থাকে। এই সময়ে ঈশাখাঁর জয়পতাকা গোরাঘাট হইতে সমুদ্র তট পর্য্যন্ত উড়িয়াছিল।

১৫৯৫ খ্রীঅব্দে সম্রাট্ আকবরের আদেশে ক্ষত্রিয়বীরশ্রেষ্ঠ রাজা মানসিংহ আবার বাঙ্গালা জয় করিতে উপস্থিত হয়েন। তিনি বাঙ্গালায় আসিয়া ঈশাখাঁর এগারসিন্ধুর দুর্গ অবরোধ করেন। ঈশাখাঁ, তখন উপস্থিত ছিলেন না, দুর্গের অবরোধ সংবাদ শুনিয়া, অবিলম্বে সৈন্যগণের সহিত এগারসিন্ধুতে আসিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ কোন কারণ বশতঃ অসন্তুষ্ট হইয়া, যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইল। ঈশাখাঁ কাপুরুষ ছিলেন না। তিনি রাজা মানসিংহকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করিয়া কহিলেন, এই যুদ্ধে যে জীবিত থাকিবে, সেই বাঙ্গালা একা ভোগ করিবে। মানসিংহ ঈশাখাঁর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু ঈশাখাঁ অশ্বারোহণে যুদ্ধস্থলে

---

(৮) খিজিরপুর বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জের প্রায় এক মাইল উত্তরে অবস্থিত।

(৯) "In 1586, Ralph Fitch visited Sunargon and remarked that the chief king of all these countries was called Isacan, and he was the chief of all the other kings, and was a great friend to the Christians," Ibid XLIII, 210,

উপনীত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী একজন তরুণবয়স্ক যুবক, রাজা মানসিংহ নহেন। মানসিংহের জামাতা। ইহার সহিতই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মানসিংহের জামাতা নিহত হইলেন। ঈশার্খা মানসিংহকে ভীরু বলিয়া ভৎর্সনা করিয়া, শিবিরে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু শিবিরে আসিতে না আসিতেই সংবাদ আসিল, রাজা মানসিংহ "সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ" হইয়াছেন। সম্বাদ পাওয়া মাত্র ঈশার্খা অশ্বারোহণে তড়িৎ গতিতে সমর ভূমিতে উপস্থিত হইয়া, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, যাবৎ তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে রাজা মানসিংহ বলিয়া ভালরূপ চিনিতে না পারিবেন, তাবৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। শেষে ঈশার্খা ভাল করিয়া চিনিলেন যে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী যথার্থই রাজা মানসিংহ, সুতরাং যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথম আক্রমণেই মানসিংহের তরবারি বিনষ্ট হইয়া গেল। ঈশার্খা আপন তরবারি রাজাকে দিলেন, কিন্তু রাজা তাহা গ্রহণ না করিয়া অশ্ব হইতে নামিলেন। তাঁহার প্রতিপক্ষ ঈশার্খাও অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া, নিরস্ত্র রাজার সহিত মল্ল যুদ্ধে উদ্যত হইলেন। মানসিংহ আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না। প্রতিদ্বন্দ্বীর উদারতা সাহস ও বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ক্ষত্রিয় বীর, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অবমাননা করিলেন না। ঈশার্খাকে আপ্যায়িত করিয়া অনেক উপহার দিয়া বিদায় দিলেন (১০)।

---

(১০) "When Man Sing invaded Bengal about 1595, he advanced to Igarasindhu and besieged the garrison of the fort. Isakhan hastened to its relief, but his troops were disaffected and refused to fight. He, however, challenged Man Sigh to single combat, stipulating that the survivor should recieve peaceable possession of Bengal. Man Singh accepted the challenge and its conditions but when Isakhan rode into the lists, he recognized in his opponent a young man, the son-in-law of the Raja. They fought and the latter was slain. Upbraiding Man Singh for his cowardice, Isakhan returned to his camp. Scarcely had he done so, when word was brought to him that Man Singh himself was in the field. He again mounted and galloped to the ground but refused to engage with his opponent until satisfied of his identity. Being assured that Man Singh was opposed to him, the combat began. In the first encounter Man Singh lost his sword. Isakhan offered his, but without accepting it Man Singh dismounted. His adversary did the same, and desired him to have a wrestling bout. Instead of acceding to his wish, Man Singh, struck by the generosity and chivalry of the man, embraced him as a friend. After entertaining Isakhan he loaded him with presents on his taking leave."—J. A. S. Bengal XLIII. 213—214.

ঈশার্খা ইহার পর রাজা মানসিংহের সহিত আগ্রাতে সম্রাট্ আক্‌বরের নিকট উপনীত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে এই স্থানে কারাগারে অবরুদ্ধ করা হইল। শেষে সম্রাট্ যখন এগারসিন্ধুর দ্বন্দ্বযুদ্ধের বিবরণ শুনিলেন, তখন কালবিলম্ব না করিয়া ঈশার্খাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে "দেওয়ান" ও "মসনদ্‌ই আলি" উপাধি দিয়া বাঙ্গালার অনেক পরগণা দিলেন (১১) ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে একজন বাঙ্গালীর এইরূপ বীরত্ব ও সাহসের বিবরণ পাওয়া যায়। এক্ষণে ঈশার্খার বংশধরেরা পূর্ব্ব বাঙ্গালার সম্ভ্রান্ত জমীদার বলিয়া গণ্য। কিন্তু তাঁহাদের বংশের সে সাহস সে বীর্য্য এক্ষণে অনন্ত কালের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

ঈশার্খাকে ছাড়িয়া দিলেও বলবীর্য্যশালী খাটি হিন্দু বাঙ্গালীর অভাব হইবে না। বিক্রমপুরের কায়স্থবংশীয় চাঁদরায় ও কেদাররায় পরাক্রান্ত ভূস্বামী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। যে ঈশার্খার বীরত্বে মোগল সেনানী বিস্মিত হয়েন সেই ঈশার্খার সহিত এই দুই ভ্রাতার সর্ব্বদাই যুদ্ধ হইত। ঈশার্খার সহিত যুদ্ধে চাঁদরায় ও কেদার রায় দীর্ঘকাল আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করেন। বাক্লা চন্দ্রদ্বীপের (বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ জেলা) কন্দর্পনারায়ণ রায়, ও সুন্দরবনের সন্নিহিত প্রদেশের মুকুন্দরামও বীরত্বে বিখ্যাত ছিলেন। ১৫৮৬ খ্রীঅব্দে রালফ ফিচ বাক্লাচন্দ্রদ্বীপ দর্শন করেন, তাঁহার লিখিত বিবরণে স্পষ্ট বোধ হয়, বাক্লা-চন্দ্রদ্বীপ বর্ত্তমান স্বাধীন রাজাদিগের শাসিত রাজ্য অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিল না। কন্দর্পনারায়ণের অনেক সমরপোত ছিল। অদ্যাপি তাঁহার একটী পিত্তলের কামান চন্দ্রদ্বীপে আছে। ফরিদপুরের নিকটবর্ত্তী "চরমুকুন্দিয়া" নামক স্থানে মুকুন্দরায়ের অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম দিল্লীশ্বরের একজন সেনানীকে যুদ্ধে নিহত করেন। তাঁহার পুত্র শত্রুজিৎও দিল্লীশ্বর জাহঙ্গীরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় বাঙ্গালীদিগের এইরূপ প্রতাপ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা যশোহরের রাজা সীতারামকে দেখিতে পাই। কেহ কেহ সীতারামকে একজন ডাকাইত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা ইহাতে সায় দিই না। সীতারাম একজন পরাক্রান্ত হিন্দু জমীদার। সে সময়ে বাঙ্গালায় আর কেহই সাহসে ও বীরত্বে তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। সীতারামের

(১১) "On their arrival at Agrah, Isakhan was thrown into prison but when the story of the combat at Igarasindhu was told the Emperor ordered his immediate release, conferred on him the titles of Diwan and Masnad i Ali, and gave him a grant of numerous parganas in Bengal."—Ibid 214.

সেনাপতি মেনাহাতীর নামে অদ্যাপি যশোহরের লোকের হৃৎকম্প হইয়া থাকে। সীতারামের পরাক্রম যখন বাড়িয়া উঠে, তখন বাহাদুরসা ও ফিরোখ সাহা যথাক্রমে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্টিত ছিলেন। এই সময়ে যশোহর জেলা দ্বাদশ চাক্‌লায় বিভক্ত ছিল। এই সকল চাক্‌লার অধিস্বামিগণ বাদশাহকে কর দিতেন না। বাদশাহ সীতারামের পরাক্রমের কথা শুনিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকেই এই অবাধ্য জমীদারদিগকে বশীভূত করিতে অনুরোধ করেন। সীতারাম বাদশাহের আদেশ লিপি পাইয়া, অবিলম্বে অবাধ্য জমীদারদিগকে দমন করিয়া দ্বাদশ চাক্‌লার অধিকারী হয়েন এবং বাদশাহ হইতে এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ রাজা উপাধি লাভ করেন। ইহার পর সীতারাম বাঙ্গালার নবাবের অধীনতা উচ্ছেদ করিলে, নবাব তাঁহার শাসন জন্য অনেকবার সৈন্য পাঠান, কিন্তু সীতারামের বীরত্বে নবাবের সৈন্য বারম্বার পরাভূত হয়। নবাব অবশেষে অনেক সৈন্যের সহিত স্বীয় জামাতা আবুতরাবকে প্রেরণ করেন, মহাপরাক্রম মেনাহাতী সীতারামেব অনুপস্থিতিতেই, এই সৈন্যদল পরাজয় করেন, এবং নবাব জামাতা আবুতারাবের ছিন্ন মস্তক আনিয়া সীতারামকে দেখান। পূর্ব্বে বাঙ্গালি শক্রব আক্রমণে দৌড় মারিত না।

যে সময়ে দুর্লভরাম বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সময়ে রাজা কীর্ত্তিচাঁদ ও রাজা বামনারায়ণ শক্রর সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। মস্তাফার্খা যখন বিদ্রোহী হইয়া আলিবর্দ্দিখাঁব সৈন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আজিমাবাদ আক্রমণ করেন, তখন তথাকার দেওয়ান জৈনউদ্দীন, কীর্ত্তিচাঁদ ও রামনাবায়ণের হস্তে সৈন্যাধ্যক্ষতা সমর্পন করেন *। ইহারা অন্যান্য মুসলমান সেনাপতির ন্যায় মস্তাফার্খাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিকের মতে সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি দেওয়ান মাণিকচাঁদ ও মোহনলাল বাঙ্গালি। সিরাজউদ্দৌল্লা যখন কলিকাতায় ইংরেজদের দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন মানিকচাঁদ, আক্রমণকারী সৈন্যদলের অধ্যক্ষ ছিলেন।†

*"The command of the army was divided into several brigades, and every one of them put under the orders of a commander that could be depended upon, the first was Abdool-allyqhan, * * the second Ahmedqhan Coreishy, the third Raja Kirtichand * * the fourth Raja Ramnarayan, the fifth Ahadan Husenkhan, and the sixth Nasar Alykhan. Seir Mutaqherin. II. 487.

† "* * * Manikchand, the governor of Hugli, who commanded a considerable body of troops in the army before the fort * * *"— Orm's Hindustan. II. 72.

পলাসির যুদ্ধক্ষেত্রে মোহনলালের কিরূপ বীরত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই; এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মিরজাফর বিশ্বাসঘাতক হইয়া সিরাজউদ্দৌল্লাকে কুপরামর্শ না দিলে, পলাসির যুদ্ধে জয়ী হওয়া ক্লাইভের ভার হইত। বাঙ্গালি এক সময়ে ব্রিটিশ তেজের নিকটেও অবনত হয় নাই।

আমরা আর অধিক উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধের কলেবর বাড়াইতে চাহি না। যাহা কিছু বলা হইল, তাহাতে বাঙ্গালি ব্রিটিশ অধিকারের পূর্ব্বে কিরূপ ক্ষমতাপন্ন ছিল, বুঝা যাইবে। আমরা এস্থলে বাঙ্গালির সাহসের একটি উদাহরণ দিব। ইতিহাস নির্দ্দেশ করে যে, সুরবংশীয় ফরিদ স্বহস্তে একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র হত্যা করিয়া 'সেরশাহ' নাম ধারণ করেন। একাকী একটা বাঘকে মারিয়া ফেলাতে ইতিহাসে সেরআফগানের সাহসের কতই প্রশংসা করে। ফরিদ যে সাহস দেখাইয়া ইতিহাসে নাম রাখিয়াছেন, হতভাগ্য বাঙ্গালার একজন হিন্দু যুবকও এক সময়ে সেই সাহস দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাসের পত্রে আজ পর্য্যন্তও তাঁহার নাম পাওয়া যায় না। এই বাঙ্গালী যুবকের নাম উদয়নারায়ণ, বাসস্থান ঢাকার অন্তঃপাতী উলাইল পরগণা। উদয়নারায়ণের মজুমদাব উপাধি, মিত্রবংশীয়। বাক্লাচন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণের বংশের সহিত ইহাব নিকট সম্পর্ক ছিল। কালক্রমে কন্দর্পনারায়ণের বংশ লোপ হইলে, তাহাদের সমস্ত ভূসম্পত্তি উদয়নারায়ণের হস্তগত হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে মুর্সিদাবাদের নবাব বংশের এক ব্যক্তি উদয়নারায়ণকে এই সম্পত্তির অধিকার হইতে বিচ্যুত করেন, উদয়নারায়ণ মুর্সিদাবাদে যাইয়া নবাবের দববারে ইহা জানাইলে, নবাব কহেন, যদি উদয়নারায়ণ স্বহস্তে একটি ব্যাঘ্র বধ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সমস্ত সম্পত্তি দেওয়া যাইবে। উদয়নারায়ণ বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ও সাহসী ছিলেন, নবাবের প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন না। অবিলম্বে একটি ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এবং অস্ত্রসঞ্চালনকৌশলে তাহাকে হত্যা করিয়া আপন সম্পত্তির অধিকারী হইলেন (১১)। বাঙ্গালী পূর্ব্বে বেশ বলশালী ছিল, সাহসী বলিয়াও বিখ্যাত ছিল।

(১১) "With the grandson of this Basideb Rai the line of the Bose Rajas of Chandradip became extinct. He was succeeded by a cousin Udayanarayan of the Mitter Mazumder family of Ulail, in the neighbourhood of Dhaka, whose descendants still represent the Raja's of Chandradip. Shortly after his accession, Udayanarayan was expelled from his estates by a relative of the Nawab of Murshida

এক্ষণে যাঁহারা আপনাদের বাসগ্রামে বানরের পাল আসিলে, মহাভীত হইয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্তির আশায় সংবাদপত্রে আর্ত্তস্বরে চীৎকার আরম্ভ করেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহাদের ন্যায় অপদার্থ ছিলেন না; আর যাঁহারা ছুল্ল'ভরামের অদ্ভুত বীরত্বে উচ্চ হাস্যের সহিত করতালি দেন, তাঁহাদিগকে বলি, বাঙ্গালি পূর্ব্বে সাহস শূন্য ও বীরত্বশূন্য ছিল না, এবং বাঙ্গালা এক দিনেই অধঃপাতে যায় নাই।

---

bad. Udaya proceeded to the court, but the Nawab refused to reinstate him, unless he fought and overcame a tiger. Udaya young and fearless, accepted the terms, and being skilled in the use of weapons he encountered the brute and killed it. In this way he regained his ancestral property."—J. A. S. B. XLIII. 209.

নারদ সংহিতায় নিম্নলিখিত রাগ রাগিণীর নাম পাওয়া যায় যথা—

"মালবশ্চৈব মল্লারঃ শ্রীরাগশ্চ বসন্তকঃ।
হিন্দোলশ্চার্থ কর্ণাট এতে রাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

মালব, মল্লার, শ্রীরাগ, বসন্ত, হিন্দোল, কর্ণাট এই ছয় রাগ। ইহাদের ভার্য্যা যথা—ধমনী, মালসী, রামকিরী, সিন্ধুড়া, আশাবরী, ভৈরবী। (মালব ভার্য্যা) বেলাবলী, পুরুবী, কনড়া, মাধবী, গোড়া, কেদারিকা, (মল্লারের স্ত্রী) গান্ধারী, সুভগা, গৌরী, কৌমারী, বল্লরী, বৈরাগী, (শ্রীরাগের ভার্য্যা) তুড়া, পঞ্চমী, ললিতা, পটমঞ্জরী, গুর্জ্জরী, বিভাষা, (বসন্ত রাগের প্রিয়া) ইত্যাদি। মালবী, দীপিকা, দেশকারী, পাহাড়ী, বরাড়ী, মারহাটী, (হিন্দোলের ভার্য্যা) নাটিকা, ভূপালী, রামকেলী, গড়া, কামোদী, কল্যাণী, (কর্ণাটের ভার্য্যা)।

হনুমন্মতে রাগ রাগিণীর অনেক প্রভেদ দেখা যায় যথা—ভৈরব, কৌশিরন, হিন্দোল, দীপক, শ্রীরাগ, মেঘরাগ, এই ছয় পুরুষ রাগ যথা—

"ভৈরবঃ কৌশিক শ্চৈব হিন্দোলো দীপকস্তথা।
শ্রীরাগো মেঘরাগশ্চ ষড়েতে পুরুষাহ্বয়াঃ॥"

ইহাদের স্ত্রীগণ—

মধ্যনাদী, ভৈরবী, বাঙ্গালী, বরাটিকা, সৈন্ধবী, (ভৈরবের স্ত্রী) তোড়ী, খাম্বতী, গৌরী, গুণক্রী, ককুড়া, (কৌশিকের ভার্য্যা) বেলবলী, রামকিরী, দেশা, পটমঞ্জরী, ললিতা, (হিন্দোলের ভার্য্যা) কেদারা, কানড়া, দেশী, কামোদী, নাটিকা, (দীপকের ভার্য্যা) বাসন্তী, মালবী, মালস্ত্রী, ধনাসী, আশাবরী, (শ্রীরাগের স্ত্রী) মল্লারী, দেশকারী, ভূপালী;, গুর্জ্জরী, টঙ্ক, পঞ্চমী, (মেঘরাগের পত্নী।)

এই সকল মতভেদ থাকায় বুঝা যায় না যে, কোন ছয় রাগ এবং কোন ছয় রাগিণী প্রথমে প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু কুরাগটি সকল মতেই আছে। বস্তুতঃ—

"ন তালানাং ন রাগাণাং অন্তঃ কুত্রাপি বিদ্যতে।"

হনুমান্ বলিয়াছেন যে, রাগরাগিণীর ও তালের অন্ত নাই। তাহার পরেই বলিয়াছেন,

"ইদানীং রাগ রাগিণ্যোরুদাহরণমুচ্যতে।"

তথাপি সম্প্রতি রাগ রাগিণীর উদাহরণ ব্যক্ত করিতেছি। হনুমান্ এইরূপ ভূমিকা করিয়া বহুতর রাগ রাগিণীর লক্ষণ, স্বর, অলঙ্কার, মূর্চ্ছনা প্রভৃতি বলিয়াছেন। এই মতে রাগ রাগিণীর স্বরঘটিত অবয়বের পূর্ব্বাপেক্ষা তারতম্য আছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে সকল সুরগুলি যে পরিপাটিক্রমে বিন্যাস করা হইয়াছে, এ মতে তাহার কোন কোনটিতে ব্যতিক্রম আছে। তাহা দেখান উচিত, কিন্তু এ ক্ষুদ্র প্রস্তাবে তাহা সম্ভবে না। হনুমান্ ভৈরবকেই আদি রাগ বলিয়াছেন যথা—

"শুভ্রাম্বরো জয়তি ভৈরব আদি রাগঃ।"

হনুমন্মতে এই ভৈবব রাগ ওড়ব। এতদ্ভিন্ন আর এক ভৈরব আছে, রাগার্ণব মতে তাহাকে "শুদ্ধ ভৈরব" বলে। এই শুদ্ধ ভৈরব সম্পূর্ণ। যথা—

"ধৈবতাংশগ্রহন্যাসযুক্তঃ স্যাৎ শুদ্ধ ভৈরবঃ।
সকম্প মন্দ্র গান্ধারো গেয়ো মধ্যাহ্নতঃ পুরা।"

ইহার অংশ, গ্রহ ও ন্যাস স্বর ধৈবত, সকম্প সুগভীর গান্ধার প্রধান, মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে গেয়। যদি ওড়ব জাতীয় ভৈরব রাগ একটা না থাকিত, তাহা হইলে হনুমানোক্ত নিম্নলিখিত ভৈরবীর লক্ষণে সঙ্গতি হইত না। যথা—

"সম্পূর্ণা ভৈরবী জ্ঞেয়া গ্রহাংশ ন্যাস মধ্যমা।
সৌবেরী মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া মধ্যম গ্রামচারিণী।
কশ্চিদেষা ভৈরববৎ স্বরা জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ।"

* ভৈরববৎ বলিয়া ধ নি স গ ম ইতি ভৈরব স্বর।

এতদ্ভিন্ন রাগার্ণব নামক গ্রন্থেও অনেক মতভেদ এবং অধিক রাগ রাগিণীর কথা আছে।

এখন আর কোন একটা নির্দ্দিষ্ট মতে গান দেখা যায় না। সকল ব্যক্তিই নানা মত মিশ্র করিয়া গান করেন, এখন যেমন যে সে রাগ, যে সে রসে

গীত হয় পূর্ব্বে তাহা হইত না। এক এক প্রকার রাগের এক একটি অনুগত রস আছে। পূর্ব্বকালে যে যে রাগ যে যে রসে গীত হইত, এবং এক্ষণেও হওয়া উচিত তাহা বলা যাইতেছে। সঙ্গীত নারায়ণে ব্যক্ত আছে যে নট্টরাগ সাংগ্রামিকা। বের—গুপ্তরাগ বীররসে গেয়।

বসন্তরাগ বসন্ত সময়ে যথা—

"ন গেয়ো বসন্তরাগোঽয়ং বসন্তসময়ে বুধৈঃ।"

ভৈরবরাগ প্রচণ্ডরসে, বঙ্গালরাগ করুণ ও হাস্যরসে গেয় যথা—

"প্রচণ্ডরূপঃ কিল ভৈরবোঽয়ম্।"
"গেয়ঃ করুণ হাস্যয়োঃ" ইত্যাদি।

সোমরাগ বীররসে এবং মেঘোদয় সময়ে গেয় যথা—

"রসে বীরে প্রযুজ্যতে।
মেঘচ্ছায়াগমে গেয়ঃ সোমরাগো মতঃ সতাম্॥"

কামোদ করুণ ও হাস্যরসে গেয় এবং ইহার কাল প্রথম প্রহরার্দ্ধে যথা—

"কামোদঃ করুণে হাস্যে।
যামার্দ্ধে গীয়তে সতা॥"

মেঘের সময়ে এবং বীররসে মেঘরাগ গেয় যথা—

"ধারে ধাংশগ্রহন্যাসঃ—
গেয়ো ঘনাগমে মেঘরাগোঽয়ং মন্দ্রহীনকঃ।"

গৌড় অনেক প্রকার। তুরস্ক গৌড় ও দ্রাবিড় গৌড় প্রভৃতি। তন্মধ্যে দ্রাবিড় গৌড় রাত্রে এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয় যথা—

"গেয়ো দ্রাবিড় গৌড়োঽয়ং বীরশৃঙ্গারয়োর্নিশি।"

তুরস্ক গৌড় ওড়ব রাগ।

গুর্জ্জরী রাত্রে এবং শৃঙ্গাররসে গেয় যথা—

"গুর্জ্জরী—
—রাত্রৌ গেয়া শৃঙ্গারবর্দ্ধিনী।"

তোড়িকা বা তোড়ী মধ্যাহ্ন সময়ে এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয় যথা—

"—তোড়িকা শুদ্ধ ষাড়বা—
জাতা মধ্যাহ্ন সময়ে গেয়া শৃঙ্গারবীরয়োঃ।"

মালবশ্রী শরৎকালের রাগ (ইহাকেই মালসী বলিয়া থাকে) শরৎকালেই ইহা গেয়। যথা—

"মালব স্ত্রী শরদ্গেয়া—"

সৈন্ধবী বা সিন্ধুড়া, মধ্যাহ্নের পর ও শৃঙ্গার এবং করুণরসে গেয় যথা—

"সৈন্ধবী—মধ্যাহ্নাদূর্দ্ধতো গেয়া শৃঙ্গারে করুণেঽপিচ।"

দেবকৃতি রাগ সকল ঋতুতে বীররসে গেয়। কৃষ্ণদত্ত বলেন এইটি শুদ্ধ বসন্তের জাতি যথা—

"দেবকৃতির্মতা।
অসাবৃতুষু সর্ব্বেষু গাতব্যা সময়েষু চ।"

রামকিরী ১ প্রহরের মধ্যে গেয়। যথা—

"প্রহরাভ্যন্তরে গেয়া।
—তজ্জ্ঞৈ রামকিরী মতা।"

প্রথম মঞ্জরী বা পটমঞ্জরী প্রাতঃকালে এবং শৃঙ্গাররসে ও উৎসবকালে গেয় যথা—

"শৃঙ্গারে চোৎসবে গেয়া প্রাতঃ প্রথম মঞ্জরী।"

নট্টরাগ রাত্রে, মঙ্গল কার্য্যে, শৃঙ্গার, হাস্য, ও অদ্ভুত, ৩ রসে গেয় যথা—

"নট্টা নট্টবদাখ্যাতা—হাস্যেঽদ্ভুতে চ শৃঙ্গারে গাতব্যা নিশি মঙ্গলে।"

বেলাবলী শৃঙ্গার ও করুণরসে গেয়। নারদ সংহিতায় ইহা ওড়ব রাগ বলিয়া উক্ত আছে। যথা—

"শৃঙ্গারে করুণে চৈব গেয়া বেলাবলী বুধৈঃ।"

গৌড়ী বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—

"—গৌড়ী মালবকৌশিকা।
বীরশৃঙ্গারয়োর্গেয়া সকম্পান্দোলিত স্বরা।"

নাট রাগ রাত্রে এবং শৃঙ্গার ও বীররসে গেয় যথা—

"নাটো নিশি শুচৌ বীরে।"

নট্ট নারায়ণ দিবাতে গেয় যথা—

"ধৈবতাংশগ্রহন্তাসো নট্টনারায়ণো দিবা।"

শঙ্করাভরণ বীররসে এবং রাত্রে গেয়। যথা—

"বীরে নিশি নিশাদাংশঃ শঙ্করাভরণঃ সদা।"

ষট্ স্বরের কতকগুলি রাগ হরি নায়কের সম্মত ছিল তাহা এই—

গৌড়, কর্ণাট, দেশী, ধন্বাশিকা, কোলাহলা, বল্লারী, দেশাখ্যা, শৌবীরী, সুস্থাবতী, হর্ষপুরী, মল্লারী, হুঞ্জিকা,

"ইত্যাষ্টাঃ ষট্ স্বরা রাগাঃ হরিনায়ক সম্মতাঃ।"

গৌড়বীর ও শৃঙ্গাররসও দিনান্ত সময়ে গেয়। যথা—

"গৌড়ঃ স্যাৎপঞ্চমোজ্ঝিতঃ।
বীরশৃঙ্গারয়ো র্গেয়ো নিদান্তে বিরলর্ষভঃ॥"

দেশী ১ প্রহরের মধ্যে এবং শান্ত ও করুণরসে গেয় যথা—

"বেরগুপ্তোদ্ভবা দেশী।
প্রহরাভ্যন্তরে গেয়া শান্তে চ করুণে রসে॥"

ধন্নাসিকা, বীর ও শৃঙ্গাররস এবং সকল সময়ে গেয় যথা—

"এষা ধন্নাসিকা জ্ঞেয়া।
রসে বীরে চ শৃঙ্গারে গাতব্যা সর্ব্বদা বুধৈঃ॥"

বল্লারী ১ প্রহরের পর শৃঙ্গাররসে গেয় যথা—

"বরাট্যুপাঙ্গা বল্লারী—শৃঙ্গারাখ্যে রসে গেয়া হরিনায়ক সম্মতা।"

গৌড় আরও আছে। কর্ণাট গৌড় ও মালব গৌড়। মালব গৌড় বীররসে গেয় যথা—

"বীরে মালবগৌড়কঃ।"

সঙ্গীতসারের মতে মল্লাররাগ মেঘাগমে এবং শৃঙ্গাররসে গেয় যথা—

"মল্লারঃ স-প-হীনোহয়ং—।
শৃঙ্গারে চ রসে গেয়ঃ পয়োদাগমনে বুধৈঃ।"

কেদারা সায়ংকালে এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয় যথা—

"রসে বীরে চ শৃঙ্গারে গেয়া সায়মিয়ং বুধৈঃ।"

ইহাকে কোন কোন গ্রন্থে দেশকারী ও দেশপালী বলা হইয়াছে।

মালব অপরাহ্নে, রাত্রে ও বীর, এবং শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—

"——মালবোঽপিরি-পোজ্‌ঝি তঃ—।
বীর শৃঙ্গারয়োর্গেয়ো দিনান্তে নিশি বা বুধৈঃ।"

হিন্দোল—সকল কালে এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—

"——হিন্দোলো রি-প-বর্জ্জিতঃ।
——বীরশৃঙ্গারয়োঃ সদা।"

ভৈরব—মঙ্গল কার্য্যে গেয় ও মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে গেয়। প্রমাণ পূর্ব্বে বলা গিয়াছে।

ললিতা—রাত্রিশেষে, দিনের প্রথম ভাগে ও বীর, শৃঙ্গাররসে গেয়।

"——ললিতা ললিতস্বরা।
শৃঙ্গারবীরয়োর্গেয়া নিশান্তে চ দিনাদিকে।"

ছায়াতোড়ী—দিবাতে (তোড়ীর স্থায়)

গান্ধার—সকল কালে ও করুণরসে গেয়।

"করুণে সদৈব"

বিহঙ্গড়া—মঙ্গল বিষয়ে ও অর্দ্ধরাত্রে গেয়। যথা—

"গেয়া বিহঙ্গড়া চৈষা নিশীথে মঙ্গলাথিভিঃ।"

গৌড় সারঙ্গী—মধ্যাহ্নের পরে বীর ও শান্তিরসে গেয়। যথা—

"——বীরশান্তিরসাশ্রিতা।
সম্পূর্ণা গৌড়সারঙ্গী গেয়া মধ্যাহ্নতঃ পরম্।"

শ্যাম—প্রদোষকালে গেয়। যথা—

"সম্পূর্ণঃ শ্যামরাগঃ স্যাৎ—
প্রদোষো গানকালোঽস্য নির্ণীতো গান কোবিদৈঃ।"

শঙ্করা—অর্দ্ধরাত্রের পর হাস্যরসে গেয় যথা—

"——শঙ্করাভিধা।
নিশীথাচ্চ পরং গেয়া রসে হাস্যে প্রযুজ্যতে।"

জয়তশ্রী—রাত্রিতে শৃঙ্গার ও করুণরসে। যথা—

"জয়তশ্রীশ্চ সম্পূর্ণা———।
তমস্বিন্যাং প্রগাতব্যা শৃঙ্গারে করুণে রসে।"

সংগীতদর্পণের মতানুসারে যে যে রাগ যে সময়ে গেয় তাহা বলা যাইতেছে।

মধুমাধবী, দেশী, ভূপালী, ভৈরবী, বেলাবলী, মল্লারী, বল্লারী, সামগুজ্জরী, ধনাশ্রী, মালবশ্রী, মেঘরাগ, পঞ্চম, দেশকারী, ভৈরব, ললিতা, বসন্ত এই সকল রাগ নিত্য প্রাতঃকালে গেয়। যথা

"মধুমাধবী চ দেশাখ্যা ভূপালী ভৈরবী তথা।
বেলাবলীচ মল্লারী বল্লারী সামগুজ্জরী।
ধনাশ্রীর্মালবশ্রীশ্চ মেঘরাগশ্চ পঞ্চমঃ।
দেশকারী ভৈরবশ্চ ললিতা চ বসন্তকঃ।
এতে রাগা প্রগীয়ন্তে প্রাতরারভ্য নিত্যশঃ॥"

গুজ্জরী, কৌশিক, সাবেরী, পটমঞ্জরী, রেবা, গুণকিরী, ভৈরবী, রামকিরী, সৌরাটী, এইগুলি ১ প্রহরের পর গেয়। যথা

"গুজ্জরী কৌশিকশ্চৈব সাবেরী পটমঞ্জরী।
রেবা গুণকিরী চৈব ভৈরবী রামকির্য্যপি।
সৌরাটী চ তথা গেয়া প্রথম প্রহরোত্তরম্॥"

বৈরাটী, তোড়ী, কামোদী, কুড়ারিকা, গান্ধারী, নাগশব্দী, দেশী, শঙ্করাভরণ, ইহা ২ প্রহরে গেয়। যথা

"বৈরাটী তোড়িকা চৈব কামোদী চ কুড়ারিকা।
গান্ধারী নাগশব্দী চ তথা দেশী বিশেষতঃ।
শঙ্করাভরণো গেয়ো দ্বিতীয় প্রহরাৎ পরম্॥"

শ্রীরাগ, মালব, গৌড়ী, ত্রিবণী, নট্টকল্যাণ, সারঙ্গ, নট্ট, সকল নাট, কেদারী, কর্ণাটী, আভারী, বড়হংসী পাহাড়ী, এই সকল ৩ প্রহরের পর এবং অর্দ্ধ রাত্র পর্য্যন্ত গেয়। যথা

"শ্রীরাগো মালবাখ্যশ্চ গৌড়া ত্রিবণসজ্ঞিকা।
নট্টকল্যাণসজ্ঞশ্চ সারঙ্গ নট্টকো তথা।
সর্ব্বে নাটাশ্চ কেদারা কর্ণাট্যাভীরিকা তথা।
বড়হংসী পাহাড়ীচ তৃতীয় প্রহরাৎ পরম্॥"

যথা নির্দ্দিষ্ট কালেই গান করিবেক, রাজাজ্ঞাস্থলে কালবিচার করিবে না, সকল সময়েই গাইবেক। যথা

"যথোক্ত কাল এবৈতে গেয়াঃ পূর্ব্ববিধানতঃ।
রাজাজ্ঞয়া সদা গেয়া ন তু কালং বিচারয়েৎ॥"

(পঞ্চম-সার-সংহিতা নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত)

বিভাষা, ললিতা, কামোদী, পটমঞ্জরী, রামকেলী রামকিরা (এই ২টা পরস্পর ভিন্ন, কেহ কেহ ভ্রমবশতঃ রামকিরাকেই রামকেলী বলিয়া থাকেন) বড়ারী, গুজ্জরী, দেশকারী, সুভাগা, ভাবী, পঞ্চমী, গড়া, ভৈরবী, কৌমারী, এই পঞ্চদশ রাগিণী পূর্ব্বাহ্নকালেই গান করিবেক। যথা

"বিভাষা ললিতাচৈব কামোদী পটমঞ্জরী।
রামকেলী রামকিরা বড়ারী গুজ্জরী তথা।
দেশকারী চ স্থভগাভীরীচ পঞ্চমী গড়া।
ভৈরবী চাপি কৌমারী রাগিণ্যো দশ পঞ্চচ।
এতাঃপূর্ব্বাহ্নকালে তু গেয়া গুণগানকোবিদৈঃ।"

বরাটী, মালবী, রৌদ্রা, রেবতী, ধামসী, বেলাবলী, মারহাট্টা, এই ৭ স্ত্রীরাগ বা রাগভার্য্যা মধ্যাহ্নকালে গান করিবে। যথা—

"বরাটী মালবী কোদ্রা রেবতী চাপি ধানসী।
বেলাবলী মারহাট্টা সপ্তৈতা রাগ যোষিতঃ।
গেয়া মধ্যাহ্নকালে চ যথা ভাবজ্ঞ ভাষিতম্।"

গান্ধারী, দীপিকা, কল্যাণী, প্রবরাবরী, আশাবরী, কান্দুলা, গৌরী, কেদারী, পাহাড়ী, এই সকল রাগিণী পণ্ডিতেরা সায়াহ্নে গান করিয়া থাকেন। যথা—

"গান্ধারী, দীপিকাচৈব কল্যাণী প্রবরাবরী।
আশাবী কান্দুলাচ গৌরী কেদার পাহিড়া।
সায়াহ্নে রাগিণী রেতাঃ প্রগায়ন্তি মনীষিণঃ।"

মেঘরাগ ও মল্লার কিম্বা মেঘমল্লার বর্ষাকালের সকল সময়েই গেয়। রাত্রে ১০ দণ্ডের পর অন্য সকল রাগের গান হইতে পারে। যথা—

"মেঘ মল্লার রাগস্য গানং বর্ষাসু সর্ব্বদা।
দশ দণ্ডাং পরং রাত্রৌ সর্ব্বেষাং গানমীরিতম্।"

এস্থলে দাক্ষিণাত্য অর্থাৎ কর্ণাট প্রভৃতি দেশীয় পণ্ডিতেরা বা গায়কেরা বলেন—দেশাখ্যা, ভৈরবী, দোরক্তদংশী মাহুলা, এই কয়েকটি রাত্রে মনোরঞ্জন হয় না, সায়ংকালে বিশেষ নিন্দিত। যথা—

"দেশাখ্যা ভৈরবী দেচ রক্তদংশী চ মাহুলা।
ন নক্তরঞ্জিকা এতা সায়ংকালে চ নিন্দিতা।
প্রভাতে যেন গীয়ন্তে স নরঃ সুখমেধতে।"

যে ব্যক্তি প্রভাতে গান করে সে গান করিয়া সুখী হয়।

শুদ্ধ নট্ট, সারঙ্গী, নট্ট বরাটিকা, ছায়া গৌড়ী, অন্যান্য গৌড়ী, ললিতা, মালবগৌড়, মল্লারিকা, ছায়া গৌরী, তোড়ী, গৌড়ী, রামকিরী, ছায়া রামকিরী, সকল প্রকার ছায়া বড়ারিকা, কর্ণাট, বঙ্গালী এই সকল রাগ প্রাতঃকালে বিশেষ নিন্দিত।

এই সকল সায়ংকালে গাইলে লক্ষ্মী ভাগ্য হয়। যথা—

শুদ্ধ নট্টাচ সারঙ্গী তথা নট্ট বরাটিকা।
ছায়া গৌড়ী তথা চান্যা ললিতাচ তথা মতা।
মল্লারিকা তথা ছায়া গৌরীতু তোড়িকাহ্বয়া।
গৌডী মালব গৌড়ীচ রামকিরী তথৈবচ।
ছায়া রামকিরী চৈব ছায়া সর্ব্ব বরাড়িকা।
এতে রাগাঃ বিশেষেণ প্রাতঃকালে চ নিন্দিতাঃ।
সায় মেষান্তু গানেন মহতীং শ্রিয় মাপ্নুযাৎ।"

গীতগোবিন্দ টীকাতে লক্ষণ ভট্ট বলিয়াছেন—

গৌণ্ডকিরী, মহামলহরা, দেশী, গুজ্জরী, প্রাতঃকালে। মধ্যাহ্নে রামকিরী (দুই প্রকার) কর্ণাট, নাগ বা নট্ট, সন্ধ্যাকালে। মালব ও সারঙ্গ শেষ সন্ধ্যায়। গৌড় ও ভৈরবী প্রত্যুষে। যথা—

"প্রাতঃ গৌণ্ডকিরী মহামলহরী দেশাখ্যিকা গুজ্জরী।
মধ্যাহ্নেপি রামকৃচ্ছ্বয়মথো কর্ণাট নাটাদয়ঃ।
সায়ং মালবিকাকুতেতি সুধিয়ো গায়ন্তি সায়ন্তনে।
সারঙ্গং পুনরেব গৌড়মপরং প্রত্যুষতো ভৈরবী"॥

কৌমুদী নামক সংগীত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।

শ্রীপঞ্চমীতে আরম্ভ করিয়া দুর্গোৎসব কাল পর্য্যন্ত বসন্তরাগ গীত হইতে পারে। ভৈরব প্রভাতে বরাটি প্রভৃতি মধ্যাহ্নে, কর্ণাট ও নাট সায়ংকালে, শ্রীরাগ ও মালব প্রভৃতির গান করিলে দোষ নাই। যথা—

"শ্রীপঞ্চমীং সমারভ্য যাবদ্দুর্গা মহোৎসবম্।
তাবদ্বসন্তোগীয়েত প্রভাতে ভৈরবাদিকঃ।
মধ্যাহ্নেতু বরাট্যাদেঃ সায়ং কর্ণাট নাটয়োঃ।
শ্রীরাগ মালবাদেস্তু গানে দোষো ন বিদ্যতে।"

ইন্দ্রপূজার কাল হইতে (শ্রাবণ মাস) দিক্‌পতিপূজার সময় পর্য্যন্ত মালবরাগ গেয়। যথা—

"ইন্দ্রপূজাং সমাসাদ্য যাবদ্দিগেবতার্চ্চনম্।
তাবদেব সমুদ্দিষ্টং গানং বৈ মালবাশ্রয়ম্॥"

সংগীতাচার্য্যেরা এইরূপ বহু প্রকার উপদেশ করিয়াছেন, নানা গান কালের নিয়ম বলিয়াছেন, পরন্তু যে দেশে যে সময়ে প্রধান সংগীতাচার্য্যেরা যাহা গান করিয়া গিয়াছেন, বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই দেশে সেই সময়ে তাহাই গান করিবেন। যথা—

"এবন্তু বহুধাচার্য্যৈ গানকালঃ সমীরিতঃ।
যস্মিন্ দেশে যথা শিষ্টৈ গীতং বিজ্ঞস্তথা চরেৎ।"

অকাল বা অসময়ে গাইলে দোষ হয় যথা—

"সময়োল্লঙ্ঘনং গানে সর্ব্বনাশকরং ধ্রুবম্।
শ্রেণীবন্ধে নৃপাজ্ঞায়াং রঙ্গভূমৌ ন দোষদম্।"

গানের সময় মর্য্যাদা অতিক্রম কবিলে সর্ব্বনাশ হয়। কিন্তু শ্রেণীবন্ধ, রাজাজ্ঞা ও রঙ্গভূমিতে দোষ হয় না।

কোহলীয় গ্রন্থে ইহার প্রায়শ্চিত্ত আছে। যথা—

লোভাৎ মোহাচ্চ যে কেচিৎ গায়ন্তি চ বিরাগতঃ।
সুরসা গুজ্জরী তস্য দোষং হন্তীতি কথ্যতে॥

লোভ বা মোহ বশতঃ যদি বিরাগে গান করে তবে সুরস গুজ্জরী গাইলেই তজ্জন্য দোষ নষ্ট হয়।

রত্নমালাগ্রন্থে উক্ত আছে, বসন্ত, রামকিরী, সুরসা, গুজ্জরী, এই কয়েকটী সকল সময়ে গাইতে পারে, কিছু দোষ হয় না। যথা—

বসন্তো রামকিরী চ গুজ্জরী সুরসাপি চ।
সর্ব্বস্মিন্ গীয়তে কালে নৈব দোষোভিজায়তে॥

নারদের একটী বিশেষ উক্তি আছে। যথা—

"দশদণ্ডাৎ পরং রাত্রৌ সর্ব্বেষাং গানমীরিতম্॥"

১০ দণ্ড রাত্রের পর সকল গানই করিতে পারে।

অবশেষে রাগ সকলের ঋতু বিভাগ বর্ণনা করা যাইতেছে।

"শ্রীরাগো রাগিণীযুক্তঃ শিশিরে গীয়তে বুধৈঃ।"

ভার্য্যাসহ শ্রীরাগ শিশির ঋতুতে গীত হইয়া থাকে।

"বসন্তঃ সসহায়স্তু বসন্তর্ত্তৌ প্রগীয়তে॥"

সসহায় বসন্তরাগ বসন্তকালে গীত হয়।

ভৈরবঃ সসহায়স্তু ঋতৌ গ্রীষ্মে প্রগীয়তে।
পঞ্চমস্তু তথা গেয়ো রাগিণ্য সহ শারদে॥

সসহায় ভৈরব গ্রীষ্ম ঋতুতে গীত হয়। ভার্য্যাসহ পঞ্চমরাগ শরৎকালে গেয়।

মেঘরাগো রাগিণীভির্যুক্তো বর্ষাসু গীয়তে।

রাগিণীর সহিত মেঘরাগ বর্ষাকালে গান হইয়া থাকে।

নট্টনারায়ণো রাগো রাগিণ্যাসহ হৈমকে।

রাগিণীসহ নট্টনারায়ণ রাগ হিম ঋতুতে গেয়।

যথেচ্ছয়া বা গীতব্যা সর্ব্বর্ত্তুষু সুখপ্রদাঃ।

সুখপ্রদ রাগ সকল যথেচ্ছা অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে সকল ঋতুতে গাইতে পারে।

সঙ্গীতবিদ্যা এত বিস্তীর্ণ যে এমন বহুকাল লিখিলেও সকল ব্যাপার পাঠকগণকে গোচর করান যায় কি না সন্দেহ। সুতরাং স্থূল বিষয়গুলি লিখিলাম।

সঙ্গীতবিদ্যার গ্রন্থ সকলের আর দুইটী অংশ আছে, তাহা প্রকীর্ণক এবং অপর একটি অংশ তাহা প্রবন্ধ নামে অভিধেয়। প্রত্যেক গ্রন্থের প্রকীর্ণক অংশে গীতের উপযোগী, আলপ্তি, গমক, প্রভৃতির নিরূপণ আছে। প্রবন্ধ নামক অংশে স্বর এবং গীতের যে কিছু উপকরণ (বস্তু, রূপম প্রভৃতি) সমস্তই নির্ণীত আছে।

শ্রীরামদাস সেন।

এক সময়ে কাজির বিচার এ দেশে যেরূপ উপহাস্য হইয়াছিল, এক্ষণে জুরীর বিচার সেইরূপ হইয়াছে। যাহাদিগের উপকার হইবে বলিয়া এই বিলাতী বিচার বাঙ্গালায় আনীত হইয়াছে, তাহারা সে উপকাব স্বীকার করে না, বরং মধ্যে মধ্যে সেই বিচার লইয়া উপহাস কবে। কেন জুরীর বিচারে লোকের শ্রদ্ধা নাই তাহা একবার আলোচনা করা যাউক।

বহুকাল হইল এক সময়ে জুরীর বিচার ইংলণ্ডদেশে লোকের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। তৎকালে ভূম্যধিকারী লার্ড ও সাধারণ কমনারদিগের মধ্যে পরস্পর বড় বিদ্বেষভাব ছিল। কাজেই একের বিচার অপরে করিলে সুবিচার হইত না। তৎকালে বিচাবকার্য্য কেবল লার্ডদিগের হস্তে ছিল, অতএব সাধারণের প্রতি সর্ব্বদাই অত্যাচাব হইত। এই অবস্থায় রাজাজ্ঞা হইল যে, আসামীরা স্বশ্রেণীস্থ লোকের দ্বারা বিচারিত হইবে, অর্থাৎ কোন জমিদার লার্ড সাহেব অপরাধ করিলে অন্য লার্ড সাহেবেরা তাঁহার বিচার করিবেন এবং কোন সাধারণ লোক অপরাধী হইলে সাধারণ লোকে তাহার বিচার করিবে। এই রাজাজ্ঞায় সাধারণ লোকের বড় সন্তোষ হইল; তাহারা বিদ্বেষী বিচারকগণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল। এক্ষণে তাহাদের বিচার তাহারা আপনারা করিবে। জুরীর বিচারে কাজেই সাধারণের মনোরঞ্জন হইল। মনোবঞ্জন হউক, কিন্তু তাহাতে অবিচার রহিত হইল না, পুরুষানুক্রমে যে ব্যক্তি আসামীর সহিত একত্রে অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিয়াছে সে ব্যক্তি বিচারক হইলে স্বগণের স্বপক্ষ হইবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? স্বপক্ষতা হেতু নূতন বিধি অনুসারে অপরাধীরা অব্যাহতি পাইতে লাগিল। পূর্ব্বে বিপক্ষবিচারক দ্বারা আসামীরা বিনা অপরাধে দণ্ড পাইত, এক্ষণে স্বপক্ষ-বিচারকদ্বারা অপরাধীরা নির্ব্বিঘ্নে খালাস পাইতে লাগিল। অবিচার রহিল, কিন্তু অত্যাচার গেল। অপরাধীরা খালাস পাইতে লাগিল, কিন্তু নিরপরাধীরা আর দণ্ড পাইল না। তাৎকালিক অবস্থায় এই যথেষ্ট হইয়াছিল। এই বিচার

পদ্ধতির উৎকর্ষতা সম্বন্ধে অপর সাধারণের সংস্কার জন্মিয়া গেল এবং সেই সংস্কার পুরুষপরম্পরা চলিয়া আসিতে লাগিল।

ক্রমে লর্ড ও অপর ব্যক্তিদিগের পরস্পর বৈরিতা অন্তর্হিত হইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি এই বিচারপদ্ধতি আর পরিবর্ত্তিত হইল না। যাহা পুরাতন তাহা অনেকের ভাল লাগে বলিয়াই হউক, আর যে কারণেই হউক, জুরীর বিচার চলিয়া আসিতে লাগিল।

যাহা ইংলণ্ডে এক সময় উপকার করিয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষে সকল সময়ে অবশ্য উপকার করিবে বিবেচনায়, হয় ত জুরীর বিচার ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছে, এইরূপ অনেকের সংস্কার। অতএব তাঁহারা আক্ষেপ করেন যে, দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার সারাংশ ইংলণ্ডে পড়িয়া আছে অদ্যাপি তাহার চালান পৌঁছে নাই। ইহার সারাংশ (Trial by peers or equals) স্বশ্রেণীস্থ লোকের দ্বারা আসামীর বিচার। আমাদের দেশে সেটী নাই। কেন নাই, তাহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। ইংরেজের দেশে লোকেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, লর্ড ও কমনার। আমাদের দেশেও সেইরূপ ছিল, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। ইংবেজের দেশে লোকবিভাগ এ পর্য্যন্ত বলবৎ বহিয়াছে; কিন্তু আমাদের দেশে তাহা উঠিয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভেদ আর বড় নাই। তাহার পরিবর্ত্তে আর একরূপ বিভাগ হইতেছে, সেটি শেষ কি দাঁড়াইবে তাহা এখনও নিশ্চয় হয় নাই। বিদেশীরা অনুভব করেন এক্ষণে আমাদের দেশে কোনরূপ লোকবিভাগ আর বিশেষ বলবৎ নাই সেইজন্য হয় ত জুবীর বিচাবের সারাংশটি বিলাতে পড়িয়া আছে। তাঁহারা বলেন আইনেব চক্ষে সকল বাঙ্গালী সমান, বাঙ্গালীর ছোট বড় নাই, বাঙ্গালীর লর্ড ও কমনার নাই, কাজেই ইংলণ্ডে জুরীর বিচারে যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছিল বাঙ্গালায় তাহার প্রয়োজন বোধ হয় নাই। এখানে জমীদার প্রজার বিচার করিতে পারে, প্রজা জমীদারের বিচার করিতে পারে, কিন্তু ইংলণ্ডে তাহা পারে না।

স্বশ্রেণী দ্বারা বিচার যে একান্ত বাঞ্ছনীয় এমত আমরা বলি না, বরং তাহার বিপরীত বলিতে সাহস করি। স্বশ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে সহৃদয়তা প্রবল থাকে; তাহাদের মধ্যে কেহ আসামী কেহ বিচারক হইলে নিরপেক্ষতার বিষয় সন্দেহ হইতে পারে। একজন ইংরেজ লিখিয়াছেন :—

"The principle that a tribunal ought to be composed of the prisoner's equals, strikes us as being *prima facie* unreasonable. If the sole object of administering justice were to provide every means of escape for a prisoner accused of even

the gravest offences, we could see a direct purpose in the provision which substantially enacts that his judges shall be of the class most likely to sympathize with him, and look with a lenient eye on his guilt."

এই কথার প্রমাণ ইংলণ্ডে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়, এই জন্য তথায় কেহ কেহ ইদানীং জুরীর বিচারের বিশেষ বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

স্বশ্রেণীস্থ লোকের দ্বারা বিচার বলিয়া জুরীর বিচার এক সময়ে ইংলণ্ডে যে আদর পাইয়াছিল এক্ষণে বোধ হয় সে আদর আর বড় থাকে না। সাধারণ লোকে যাহাই বলুক, বিবেচকগণ এ বিচারপদ্ধতির প্রতি সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহা হইলে আমাদের দেশে এ বিচারের সারাংশ আইসে নাই বলিয়া যে কাহার কাহার আক্ষেপ আছে, তাহা অনর্থক। যে ভাগকে তাঁহারা সারাংশ বলেন, এই বিচারের পদ্ধতির সেইটিই অপকৃষ্ট অংশ। তাহা ভারতবর্ষে আইসে নাই, ভালই হইয়াছে। বোধ হয় আমাদের রাজপুরুষেরা বিবেচনা করিয়াই এই অপকৃষ্ট ভাগটি চালান দেন নাই।

এদেশে জুরীর বিচার বলিয়া যাহা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা আমাদের পঞ্চায়েত বিচারের অনুকরণ মাত্র! তবে এই বিচারে কেন লোকে উপহাস করে, কেন কাজির বিচারের সহিত তুলনা করে, তাহা একবার আলোচনা করা উচিত।

পঞ্চায়েত আমরা আপনারা মনোনীত করিয়া থাকি, যাহার দ্বারা অবিচার সম্ভব কদাচ তাহাকে মনোনীত করি না। যাহারা বিজ্ঞ, বিবেচক ও অপক্ষপাতী, যাঁহাদের প্রতি আসামী ফরিয়াদি উভয়ের শ্রদ্ধা আছে, কেবল তাঁহারাই পঞ্চায়েত মনোনীত হইয়া থাকেন। কিন্তু মফঃস্বলে জুরীনির্ব্বাচন যেরূপে হইয়া থাকে তাহাতে বিজ্ঞ বা অপক্ষপাতী লোক ভিন্ন অন্য লোক মনোনীত হইবার কোন বাধা নাই। আইনে এমত নিষেধ নাই যে অধর্ম্মী, অবিশ্বাসী, কি পক্ষপাতী লোক জুরীর আসনে বসিয়া বিচার করিতে পারিবে না। আইনে এরূপ নিষেধ থাকিলেও কোন ফলদায়ক হইতে পারে না; যতদিন আদালতে এই সকল দোষ সপ্রমাণিত না হয় ততদিন অধর্ম্মী অবিশ্বাসী কি পক্ষপাতী বলিয়া কেহ আদালত হইতে দোষস্পৃষ্ট হইতে পারে না, আমরা গোপনে যাহাকে যাহা মনে করি না কেন, আইন অনুসারে সকলেই ধর্ম্মিষ্ঠ, সকলেই বিশ্বাসী, সকলেই অপক্ষপাতী; অতএব আইন অনুসারে আপামর সাধারণ সকলেই জুরীর আসনে বসিতে পারে, কাহার পক্ষে তাহার বাধা নাই, জুরীর আসন বারোইয়ারীর সভার ন্যায়। রাজা দুর্য্যোধন, উড়ে মালী, মুচি, ঢুলি সকলেই এক আসনে।

জুরীনির্ব্বাচনের ভার কালেক্‌টার সাহেবের প্রতি আছে। কিন্তু এ সকল বিষয়ে কালেক্‌টার সাহেবের প্রতিনিধি নাজির সাহেব, কখন কখন নাজিরের বক্সি সাহেবই কর্ত্তা দাঁড়ান। জুরীর আসনে কে কে বসিবে তাহা প্রায় তাঁহারাই স্থির করেন; কালেক্‌টার সাহেব ফর্দ্দে দস্তখত ভিন্ন আর কিছুই করেন না। কেবল একবার মাত্র আমরা শুনিয়াছি, সার উইলিয়ম হারসেল এ বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইয়া কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক দ্বারা জুরী-নির্ব্বাচন করাইয়াছিলেন। যেখানে নাজির সাহেব কর্ত্তা, সেখানে জুরী-নির্ব্বাচন কিরূপ হইয়া থাকে, তাহা এক প্রকার অনুমান কবা যাইতে পারে। প্রায় ভাল লোক ব্রতী থাকে না কাজেই জুরীর বিচারের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা থাকে না।

যাঁহারা জুরীর আসনে বসেন, তাঁহাদে্র মধ্যে দুই চারি জন বিশেষ ভদ্র লোক থাকিলে থাকিতে পারেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই অতি সামান্য। ক্ষুদ্র দোকানদার, আলু পটল বিক্রেতা, কৃষী, উমেদার, তন্তুবায়, কুম্ভকার বা তদ্রূপ লোকই জুরীর মধ্যে অধিক। সামান্য লোকের প্রতি আইন-কর্ত্তাদের কোন আপত্তি নাই। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, সামান্য লোকে সামান্য বুদ্ধিতে যাহাকে অপরাধী বলিয়া স্থিব কবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অপরাধী। এ কথা বাস্তবিক সত্য। কিন্তু আদালতে প্রমাণ প্রয়োগের এক্ষণে যে প্রণালী তাহাতে একথা বড় খাটে না। জোবানবন্দিব যুদ্ধ হইতে প্রকৃত কথা বুঝিয়া লওয়া সামান্য লোকের কার্য্য নহে। এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাব আবশ্যক, অন্ততঃ বুদ্ধির কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণতা আবশ্যক, কিন্তু সামান্য লোকদিগের ততটা থাকে না। উকীল কৌন্সিলেরা বিপক্ষেব সাক্ষীকে ভ্রান্ত কবিবার নিমিত্ত বিশেষ উদ্যোগী থাকেন, তাঁহাদের কৌশলে অধিকাংশ সাক্ষীরা বাস্তবিক হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, প্রকৃত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া থাকিলেও তাহা বলিতে পারে না; বলিতে গেলে হয় ত এরূপ বিপর্য্যয়ভাবে বলে যে, তাহার প্রত্যক্ষতার বিষয়ে সন্দেহ হয়। এরূপ স্থলে সাক্ষী বিশ্বাসযোগ্য কি না তাহা মীমাংসা করা বড় কঠিন; যে সকল বিচারকদের বহুদর্শন আছে, তাঁহারাও অনেক সময় ভ্রান্ত হয়, সামান্য লোকের ত কথাই নাই। যে সকল কামার কুমার জুরীর আসনে একবার কি দুইবার বসিয়াছে, তাহারা কিছুই স্থির করিতে পারে না। তাহাদের সঙ্গে কোন সুশিক্ষিত ভদ্রলোক থাকিলে প্রায় তাঁহার উপর নির্ভর করিতে তাহারা নিতান্ত বাধ্য হয়।

যাঁহারা আমাদের দেশে ইতরলোকের সহিত অধিক আলাপ করিয়াছেন, তাঁহারই জানেন যে বুঝিবার শক্তি ইতর লোকের অতি সামান্য। তাহারা চাসের কথা, দ্রব্যাদির মূল্যের কথা, পীড়ার কথা, বা যে বিষয় লইয়া তাহারা আপনাদের মধ্যে নিত্য আলাপ করিয়া থাকে সেই বিষয়ের কথা ভিন্ন অন্য কথা বড় বুঝিতে

পারে না, তাহারা জোবানবন্দির ফেরফার একেবারেই বুঝিতে পারে না ; বিশেষতঃ এক. একজন সাক্ষীর জোবানবন্দি শেষ হইতে দীর্ঘকাল লাগে, সেই দীর্ঘকাল মনঃসংযোগ করিয়া থাকা কামার কুমার প্রভৃতি অশিক্ষিত লোকের পক্ষে বড় কঠিন। কোন বিষয়ে দীর্ঘকাল মন নিবিষ্ট রাখা শিক্ষার কার্য্য, অশিক্ষিত লোকের নিকট তাহা একেবারে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না ; এ পর্য্যন্ত আমরা কখন শুনি নাই যে কোন সামান্য লোক জুরীর আসনে বসিয়া সাক্ষীর জোবানবন্দি আদ্যন্ত শুনিয়াছে বা তাহা বুঝিয়াছে। তাহারা যাত্রা শুনিতে বসিলে যে পর্য্যন্ত সং না আইসে ক্রমাগত ঢুলিতে থাকে, জোবানবন্দির মধ্যে রং তামাসা নাই, কাজেই জোবানবন্দি শুনিতে শুনিতে তাহাদের ঢুলিতে হয়। অধিকন্তু এজলাষে টানাপাখা আছে ; আহারান্তের নিয়মিত নিদ্রা কেনই বা উপেক্ষিত হইবে। যাহারা জোবানবন্দি বুঝিতে পারে না, যাহারা তৎপ্রতি দীর্ঘকাল মনোনিবেশ করিতে পারে না, তাহারা বিচাবক হইলে কাজিদের ন্যায় কাজেই হইবে।

কোন বিষয়েব প্রকৃত ঘটনা কি হইয়াছিল, জোবানবন্দি শুনিয়া স্থির করা অতি কঠিন। সকল কার্য্যেই কিছু কিছু শিক্ষা আবশ্যক, বিচারকার্য্যে বিশেষতঃ। কিন্তু জুরীর বন্দোবস্ত দেখিয়া বোধ হয় আইনকারদিগের ধারণা যে বিচারকার্য্য অতি সহজ। সকলেই এই কার্য্যে পটু, তাস খেলিতে শিখিতে হয়, তথাপি বিচাবকার্য্য শিখিতে হয় না। কলু ঘানি ছাড়িয়া এজলাষে বসিলেই বিচার করিতে পারে, তাঁতি কখন বিচার আলয়ে যায় নাই তথাপি এজলাষে বসিবামাত্রই বিচার করিতে পারে। বোধ হয় আইনকর্ত্তাদের মতে এজলাষ বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন। সিংহাসনের গুণে বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হয়। তথায় যে বসিবে সেই বিচারে অদ্বিতীয় দাঁড়াইবে। গোরুর রাখাল হউক না কেন, তাঁহার বিচারের প্রশংসা অবশ্য হইবে।

আর এক কথা। যে সকল সামান্য লোক জুরীর আসনে বসে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই সচ্ছল অবস্থার লোক নহে। হয় ত কেহ কষ্টে দিনপাত করে, হয় ত কেহ যে দিন পবিশ্রমদ্বারা কিছু উপার্জ্জন না করিতে পারে, সে দিন তাহাদের ঋণ করিতে হয়। এরূপ দরিদ্র লোককে আবদ্ধ রাখিলে অত্যাচার করা হয়। এক জনের পক্ষে সুবিচার কবাইতে গিয়া আর একজনের উপর পীড়ন করা হয়। একবার একজন দরিদ্র ব্যক্তি জুরীর ফর্দ্দ হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। আমরা কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিবার পরামর্শ দেওয়ায় সে ব্যক্তি যোড় হাত করিয়া বলিল, "নাজির বাবুকে একখানা পত্র দিলে ভাল হয়, তিনিই আমার এই বিপদের মূল।" জুরীর

আসনে বসা সামান্যজীবীর পক্ষে বাস্তবিক বিপদ। পূর্ব্বে নবাবী আমলে "বেগার" ধরা প্রথা ছিল, এক্ষণে জুরীধরা সেইরূপ হইয়াছে। ইংলণ্ডে জুরীরা পরিশ্রমের পারিতোষিক স্বরূপ কিছু কিছু পাইয়া থাকেন, এখানে সে প্রথা নাই। কেন নাই তাহা বুঝা যায় না। বোধ হয় বিচারকার্য্যের ব্যয় কমাইবার নিমিত্ত এইরূপ নিয়ম করা হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহাতে গবর্ণমেণ্টের লাভ অতি সামান্য, দরিদ্রের ক্ষতি অতি গুরুতর।

যেস্থলে সামান্য দীনদরিদ্র ব্যক্তি বিচারক, সেস্থলে উৎকোচের আশঙ্কা প্রবল। দরিদ্রের পক্ষে লোভ সম্বরণ করা বড় কঠিন। আসামীরা তাহা জানে প্রয়োজন হইলে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইতে পারে। দরিদ্র, কাজেই কেহ তাহাকে লোভ দেখাইতে ভয় পায় না, বা কুণ্ঠিত হয় না।

কে কে জুরীর আসনে বসিবে তাহা পূর্ব্বাহ্ণে আসামী জানিতে না পারিলেই উৎকোচের পথ বন্ধ হইতে পাবে এরূপ অনেকেব সংস্কার আছে। এই জন্য কোন কোন জজ সাহেব এক এক মোকর্দ্দমায় ৭০ কি ৮০ জন ব্যক্তিকে জুরীর নিমিত্ত আহ্বান করিয়া তাঁহাদেব মধ্যে আবশ্যকমত কয়েকজনকে বাছিয়া লইয়া অবশিষ্ট সকলকে বিদায় দেন। ইহা দ্বারা কিরূপে উৎকোচেব পথ রুদ্ধ হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কে কে জুরীর আসনে বসিবে আসামী পূর্ব্বে জানিত না কিন্তু পরে জানিল, উৎকোচ দিবার প্রয়োজন হইলে অনায়াসে পরে দিতে পারে, মোকর্দ্দমা সচরাচর একদিনে নিষ্পত্তি হয় না, জুরীরাও রাত্রে আদালতে তালা কুলুপ বন্ধ থাকে না, গৃহে যাইতে পায়, গৃহে যাহার সহিত ইচ্ছা আলাপ করিতে পায়; এ অবস্থায় প্রস্তাবনার প্রতিবন্ধক কিছুই থাকে না। আমরা এমনও মধ্যে মধ্যে শুনিয়াছি যে জুরীরা কে কি মত দিবেন, বাটীতে বসিয়া প্রতিবাসীর সহিত তাহার পরামর্শ আঁটিয়া কাছারী যান, নহিলে চলে না, নিজে কিছুই বুঝেন না, হয় ত লাভালাভের বিষয় যিনি পরামর্শী তিনি একাই ভোগ করেন। অনেক সময়ে জুরীর সহিত কোন বন্দোবস্ত না করিয়া তাহার পরামর্শীর সহিত বন্দোবস্ত করিলেই চলে।

অতএব জুরীর উৎকোচ অসম্ভব নহে। বিলাতেও তাহা আছে। কোথাও কোথাও শুনা যায় যে, জুরীর সহিত পূর্ব্বাহ্ণে কোন রফা করিতে হয় না, বিচারের পর জুরীর "বিদায়" মামুলি দস্তুর। জুরী তাহা ইচ্ছা করিলে নিশ্চয়ই পায়। কিন্তু না চাহিলে পায় না।

আমাদের দেশে "বিদায়" মন্দ কথা নহে। "বিদায়" "দক্ষিণা" প্রভৃতি অনেক প্রচলিত নিয়ম আছে, গুরু পুরোহিত, আত্মীয়, কুটুম্ব সকলেই "বিদায়" প্রত্যাশা করেন। গরীব জুরীর দুই এক জন কেনই বা তাহা প্রত্যাশা না করিবে।

অনেকে বলিতে পাবেন যে, যে সকল দোষের উল্লেখ করা হইল, অনায়াসে তাহা নিবারণ করা যাইতে পারে। যদি ইতরলোক বা অশিক্ষিত লোককে জুরীর আসনে বসিতে না দেওয়া যায়, যদি কেবল ভদ্র ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে নির্ব্বাচন করা হয়, তাহা হইলে এ সকল দোষ আর থাকে না। তদুত্তরে আমরা বলি তাহা হইতে পারে না। এত ভদ্রলোক কোথা পাওয়া যাইবে? প্রতি বৎসর যে পরিমাণে মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তাহার নিমিত্ত জেলায় জেলায় অন্ততঃ দুই তিন শত জুরি আবশ্যক।

অল্পলোক মনোনীত করিয়া রাখিলে প্রায় প্রতি মোকর্দ্দমাতেই তাহাদিগকে আসিতে হয়, কাজেই বহুসংখ্যক লোক আবশ্যক। কিন্তু প্রতি জজ-আদালতের নিকটবর্ত্তী স্থানে দুই চাবি শত বিশেষ সুশিক্ষিত ভদ্রব্যক্তি পাওয়া যায় না। না পাইলে কাজেই ইতব লোক মনোনীত করিতে হয়।

মনে করুন প্রতি জেলায় তিন চারি শত সুশিক্ষিত ভদ্র লোক পাওয়া গেল। প্রতি মোকর্দ্দমায় ভদ্রলোক ভিন্ন আর কেহ জুবীর আসন গ্রহণ করিতে পাইল না। তাহাতেই বা কি লাভ হইল। একজন বিজ্ঞ জজ একা যেরূপ বিচার করিবেন, পাঁচ জন অব্যবসায়ী একত্র হইয়া সেরূপ বিচার করিতে পাবিবাব কথা নহে। শত অব্যবসায়ী একত্রিত হইয়া একজন ব্যবসায়ীর কার্য্য করিতে পারে না।

লোকের সংখ্যা বাড়িলে বল বাড়ে, কিন্তু পারকতা বাড়ে না। তাঁতি একা কাপড় বুনিতে পারে কিন্তু অপর ব্যবসায়ী পাঁচজন একত্রিত হইলে, তাহারা একত্রিত হইয়াছে বলিয়া কাপড় বুনিতে পারিবে না। বস্ত্রবয়ন প্রথমতঃ তাহাদের শিখিতে হইবে অব্যবসায়ী পাঁচ সহস্র লোক একত্রিত হইলেও শিক্ষা ব্যতীত কাপড় বুনিতে পারিবে না।

জুরীর মধ্যে কেহ আপনাকে দায়ী বলিয়া মনে করে না। সকলেই পরস্পরে বিবেচনা করে পাঁচ জনের মধ্যে আমি একজন মাত্র। যদি অবিচার কি নিন্দা হয় পাঁচ জনেরই হইবে কেহ আমার একার নিন্দা করিবে না; ভালয় মন্দয় কেহ আমার নামও করিবে না। জজের এসকল কথা মনে হয় না, তিনি একা বিচার করেন কাজেই একাই দায়ী থাকেন। তাঁহার নিজের সম্ভ্রমও রক্ষা করিতে হয়।

জজের বিচারে সকলেই সন্তোষ ছিল। জুরীর বিচার আরম্ভ করাইয়া কি উৎকর্ষ সাধন হইল, তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না, গরিব বাঙ্গালীকে বিচারকার্য্য শিখাইবার নিমিত্ত যদি এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়া থাকে

তবে সে পরামর্শ ভাল হয় নাই। ইহাতে লোকের মাথা কাটিয়া ক্ষৌরকর্ম্ম শিখান হইতেছে মাত্র।

এই ষাটকোটী লোকের মধ্যে এ পর্য্যন্ত কয়জন জুরীর আসনে বসিয়াছে? কয়জন বিচারকার্য্য শিখিয়াছে? অনেক দিন জুরীর বিচার আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে অবিচার ও অত্যাচার ভিন্ন কি লাভ হইয়াছে? বিশেষ বিজ্ঞ জজ মাত্রেই এই পদ্ধতির মধ্যে মধ্যে রিপোর্ট করিয়া থাকেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে কেন মনোযোগ করেন না তাহা আমরা জানি না। অবশ্য কোন গুরুতর কারণ আছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এক্ষণে আমরা বলিব, অকস্মাৎ এই সৈন্য কোথা হইতে আসিয়া মোগল-দিগকে আক্রমণ করিল।

মাণিকলাল পার্ব্বত্যপথ হইতে নির্গত হইয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া একেবারে রূপনগরের গড়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রূপনগরের রাজার কিছু সিপাহী ছিল, তাহারা বেতনভোগী চাকর নহে; জমি কবিত; ডাক হাঁক করিলে ঢাল, খাঁড়া, লাঠি, সোঁটা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইত; এবং সকলেরই এক একটি ঘোড়া ছিল। মোগলসেনা আসিলে রূপনগরের রাজা তাহাদিগকে ডাক হাঁক করিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে তাহাদিগের ডাকিবার কারণ, মোগল সৈন্যের সম্মান ও খবরদারিতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা। গোপন অভিপ্রায়, যদি মোগলসেনা হঠাৎ কোন উপদ্রব উপস্থিত করে তবে তাহার নিবারণ। ডাকিবামাত্র রাজদূতেরা ঢাল খাঁড়া, ঘোড়া লইয়া গড়ে উপস্থিত হইল—রাজা তাহাদিগকে, অস্ত্রাগার হইতে অস্ত্র দিয়া সাজাইলেন। তাহারা কয়দিন নানাবিধ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া মোগল সৈনিকগণের সহিত হাস্য পরিহাস ও রঙ্গরসে কয়দিবস কাটাইল। তাহার পর ঐ দিবস প্রভাতে মোগলসেনা শিবির ভঙ্গ করিয়া রাজকুমারীকে লইয়া যাওয়াতে, রূপনগরের সৈনিকেরাও গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা পাইল। তখন তাহারা অশ্ব সজ্জিত করিল এবং অস্ত্র সকল রাজার অস্ত্রাগারে ফিরাইয়া দিবার জন্য লইয়া আসিল, রাজা স্বয়ং তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া স্নেহসূচকবাক্যে বিদায় দিতেছিলেন, এমত সময়ে আঙ্গুলকাটা মাণিকলাল ঘর্ম্মাক্ত কলেবর অশ্ব সহিত সেখানে উপস্থিত হইল।

মাণিকলালের সেই মোগল সৈনিকের বেশ। একজন মোগল সৈনিক অতি ব্যস্ত হইয়া গড়ে ফিরিয়া আসিয়াছে, দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সম্বাদ?"

মাণিকলাল অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহারাজ, বড় গণ্ডগোল বাঁধিয়াছে, পাঁচহাজার দস্যু আসিয়া রাজকুমারীকে ঘেরিয়াছে। জোনাব হাসান আলি খাঁ বাহাদুর, আমাকে আপনার নিকট পাঠাইলেন—তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু আর কিছু সৈন্য ব্যতীত রক্ষা পাইতে পারিবেন না। আপনার নিকট সৈন্য সাহায্য চাহিয়াছেন।"

রাজা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে আমার সৈন্য সজ্জিতই আছে।" সৈনিকগণকে বলিলেন, "তোমাদের ঘোড়া তৈয়ার, হাতিয়ার হাতে! তোমরা সওয়ার হইয়া এখনই যুদ্ধে চল। আমি স্বয়ং তোমাদিগকে লইয়া যাইতেছি।"

মাণিকলাল বলিল, "যদি এ দাসের অপরাধ মাপ হয়, তবে আমি নিবেদন করি যে, ইহাদিগকে লইয়া আমি অগ্রসর হই। মহারাজ আর কিছু সেনা সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসুন। দস্যুরা সংখ্যায় প্রায় পাঁচহাজার। আরও কিছু সেনাবল ব্যতীত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।"

স্থূলবুদ্ধি রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন। সহস্র সৈনিক লইয়া মাণিকলাল অগ্রসর হইল; রাজা আরও সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টায় গড়ে বহিলেন। মাণিক, সেই রূপনগরের সেনা লইয়া একেবারে মবারকের পশ্চাতে উপস্থিত হইল। মাণিকলাল দেখিয়া যায় নাই যে তৎপ্রদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু রন্ধ্রপথে রাজসিংহ প্রবেশ করিয়াছেন; হঠাৎ তাহার শঙ্কা হইয়াছিল যে মোগলেরা রন্ধ্রের এই মুখ বন্ধ করিয়া রাজসিংহকে বিনষ্ট করিবে। সেই জন্যই সে রূপনগরের সৈন্যসংগ্রহার্থে গিয়াছিল। এবং সেই জন্য সে প্রথমেই এইদিকে রূপনগরের সেনা লইয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই বুঝিল যে রাজপুতগণের নাভিশ্বাস উপস্থিত বলিলেই হয়—মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। তখন, মাণিকলাল মবারকের সেনার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, "ঐ সকল দস্যু! উহাদিগকে মারিয়া ফেল।"

সৈনিকেরা কেহ কেহ বলিল, "উহারা যে মুসলমান!"

মাণিকলাল বলিল, "মুসলমান কি লুঠেরা হয় না? হিন্দুই কি যত দুষ্ক্রিয়াকারী? মার।"

মাণিকলালের আজ্ঞায় একেবারে হাজার বন্দুকের শব্দ হইল। মবারকের সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পর্ব্বতারোহণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। রূপনগরের সেনা তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল।

এই অবসরে মাণিকলাল বিস্মিত রাজসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিল। রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এ কাণ্ড মাণিকলাল? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কিছু জান?"

মাণিকলাল হাসিয়া বলিল, "জানি। যখন আমি দেখিলাম যে মহারাজ রন্ধ্রপথে নামিয়াছেন, তখন বুঝিলাম যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে। প্রভুর রক্ষার্থ আমাকে আবার একটি নূতন জুয়াচুরি করিতে হইয়াছে।"

এই বলিয়া মাণিকলাল যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে রাণাকে শুনাইল। আপ্যায়িত হইয়া রাণা মাণিকলালকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "মাণিকলাল! তুমি যথার্থ প্রভুভক্ত! তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, যদি যখন উদয়পুব ফিরিয়া যাই, তবে তাহার পুরস্কার করিব। কিন্তু তুমি আমাকে বড় সাধে বঞ্চিত করিলে। আজ মুসলমানকে দেখাইতাম যে রাজপুত কেমন করিয়া মরে!"

মাণিকলাল বলিল, "মহারাজ! মোগলকে সে শিক্ষা দিবাব জন্য মহারাজের অনেক ভৃত্য আছে। সেটা রাজকার্য্যের মধ্যে গণনীয় নহে। এখন, উদয়পুরের পথ খোলসা। রাজধানী ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে রাজকুমাবীকে লইয়া স্বদেশে যাত্রা করুন।"

রাজসিংহ বলিলেন, "আমার কতকগুলি সঙ্গী এখন ওদিকের পাহাড়ের উপরে আছে—তাহাদের নামাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।"

মাণিকলাল বলিল, "আমি তাহাদিগকে লইয়া যাইব। আপনি অগ্রসর হউন। পথে আমাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।"

রাণা সম্মত হইয়া, চঞ্চলকুমারী সহিত উদয়পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রাণাকে বিদায় দিয়া, মাণিকলাল রূপনগরের সেনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পর্ব্বতারোহণ করিল। পলায়নপরায়ণ মোগলসেনা তৎকর্তৃক তাড়িত হইয়া যে যেখানে পাইল পলায়ন করিল। তখন মাণিকলাল রূপনগরের সৈনিকদিগকে বলিলেন, "শত্রু সকল পলায়ন করিয়াছে—আর কেন বৃথা পরিশ্রম করিতেছ? কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, রূপনগরে ফিরিয়া যাও।" সৈনিকেরাও দেখিল—তাও বটে সম্মুখ শত্রু আর কেহ নাই। তখন তাহারা মহারাজা বিক্রমসিংহের জয়ধ্বনি তুলিয়া রণজয় গর্ব্বে গৃহাভিমুখে ফিরিল। দণ্ডকাল মধ্যে পার্ব্বত্য-পথ জনশূন্য হইল—কেবল হত ও আহত মনুষ্য ও অশ্ব সকল পড়িয়া রহিল। দেখিয়া উচ্চ পর্ব্বতের উপরে, প্রস্তর-সঞ্চালনে যে সকল রাজপুত নিযুক্ত ছিল, তাহারা নামিল। এবং কোথাও

কাহাকে না দেখিয়া রাণা অবশিষ্ট সৈন্য সহিত অবশ্য উদয়পুর যাত্রা করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া তাহারাও তাঁহার অনুসন্ধানে সেই পথে চলিল। পথিমধ্যে রাজসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মাণিকলালও আসিয়া জুটিল। সকলে একত্রে উদয়পুরে চলিলেন।

এ দিকে মোগলসেনাপতি বিষম বিভ্রাটে পড়িলেন। রণে তিনি পরাজিত হইয়াছেন—বাদশাহের ভাবী মহিষী তাঁহার হস্ত হইতে রাজপুতে কাড়িয়া লইয়াছে! কি বলিয়া তিনি দিল্লীতে মুখ দেখাইবেন? বাদশাহকে কি উত্তর দিবেন? বাদশাহের নিকট লঘুদণ্ডের সম্ভাবনাই বা কি? সৈন্যের অধিকাংশই হত হইয়াছে—যাহা জীবিত আছে তাহারা কে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে তাহার কোন ঠিকানাই নাই। তিনি মবারককে ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন।

মবারকের পরামর্শে এক প্রান্তরমধ্যে নিশান পুঁতিয়া ভেরী বাজাইতে আজ্ঞা করিলেন। দুইজনে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মোগল সেনাগণ এ দিক ওদিক পলাইয়াছিল—যুদ্ধ ক্ষান্ত হইয়াছে বুঝিয়া তাহারা ক্রমে ক্রমে আসিয়া নিশানের কাছে জুটিল। তখন সেই ভগ্নসেনা লইয়া সেই প্রান্তরে শিবির সংস্থাপন করিয়া হাসানআলি রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পর একাকী তাম্বুমধ্যে বসিয়া হাসানআলিখাঁ গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন—কি উপায়ে বাদশাহের কাছে মান ও প্রাণ রক্ষা হইবে? শেষ তাহার উপায় স্থির করিয়া আপনার প্রিয়পাত্র হামিদখাঁকে ডাকিবা স্বীয় অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিলেন। হামিদ সেলাম করিয়া বিদায় হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

এখন আবদুলহামিদও ভাবিতে জানে। তাহারও একটী ছোট তাম্বু ছিল—সেখানে সে আসিয়া কুরশীর উপর বসিয়া হুকায় অম্বুরী তামাকু চড়াইল। চারি পাঁচ জন পারিষদ জুটিয়া গেল। সকলে মিলিয়া রাজপুতগণের ধূর্ত্ততা ও ভীরুতার বিশেষ নিন্দা, এবং আপনাদিগের অসাধারণ বীরত্বের বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দাড়ি চুমরাইয়া, ছেপ ফেলিতে ফেলিতে স্থির করিলেন যে, তাঁহারা একটা ভারি রণজয় করিয়াছেন, এবং রাজপুতেরা মূষিক তুল্য পলায়ন করিয়াছে—কোনক্রমে রাজকুমারীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে মাত্র। বিশেষ শিবির মধ্যে গোটাকত বড় বড় বকরি ও আরও বড় বড় চতুষ্পদ ও পক্ষবিশিষ্ট দ্বিপদের শুভাগমন হইয়াছে ও শুভ জবাইয়ের উদ্যোগ হইতেছে, ইতি সম্বাদ আসিয়া অদ্য রাত্রে সমাংস খিচুড়ী ভোজনের বিশেষ প্রত্যাশা সকলেরই চিত্তমধ্যে

উদিত হইল। সুতরাং তাঁহারা যে বিজয়ী বীর পুরুষ তদ্বিষয়ে আর কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে পলাণ্ডু লসুণ বিমিশ্র পক্ক মাংসের সুগন্ধে যাঁহার মনে বীররস উছলিয়া না উঠে, তাঁহার দাড়ি গোঁপ বৃথায় ধারণ। সে গিয়া শ্মশ্রু গুম্ফ ও মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া, আতপ তণ্ডুল ও মর্ত্তমান রম্ভার উপর ভরাভর করুন—তাঁহার আর কোন গতি দেখি না। তাঁহাদিগের দুঃখে আমি সর্ব্বদা কাতর।

এইরূপে আবদুল হামিদ এবং তস্য পারিষদেরা, মাংসাহার ভরসায় উচ্ছলিত বীররসে পরিপ্লুত হইয়া, শ্মশ্রুভার বহন সার্থক বিবেচনা করিলেন। আবদুল হামীদ তখন ছিলিমে একটু ফুৎকার দিয়া বলিলেন, "ভাই সব! বীরপনা ত দেখাইয়াছ—কিন্তু মেয়েটা যে রাজপুতেরা লইয়া গিয়াছে, সে কাজটা বড় ভাল হয় নাই।—বাদশাহ সে কথা শুনিলে মনে করিবেন, যে তোমাদের রণজয় সব বৃথা গল্প! বিশ্বাস করিবেন না।" এই বলিয়া আবদুল হামিদ, একটা ফারশী বয়েৎ আওড়াইলেন—আমরা শুনিয়াছি যে সে বয়েতের একটি শব্দও ফারশী নহে—তবে খাঁ সাহেবের রক্তবর্ণ চক্ষু, হাত নাড়ার জোর, এবং গম্ভীর উচ্চারণের ঘটায় পারিষদেরা সকলেই মনে করিল যে এ একটা ভারি বয়েৎ। তখন আবদুল হামিদ বিস্মিত শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে সেই অলৌকিক বয়েতের ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ফলেই কার্য্যের পরিচয়। ফলটা না দেখিলে বাদশাহ রণজয়ের কথায় বিশ্বাস করিবেন কেন? তাঁহাকে ফলটা দেখাইয়া দিতে হইবে। তবে আমাদের সেরোপা মিলিবে।

মাজ্জুমহোসেন নামে একজন স্থূলবুদ্ধি পারিষদ বলিল, "সে ফলটি কি?"

আবদুলহামিদ বলিলেন,

"বদ্‌বখ্‌ৎ! বুঝিলে না? সে ফলটি রাজকুমারী।"

মাজ্জুম। রাজকুমারী আর কোথায় পাওয়া যাইবে?

আবদুলহামিদ। কেন, রাজকুমারী কি কাহারও গায়ে লেখা থাকে? যে হয় একটা মেয়ে ধরিয়া দোলায় চড়াইয়া লইয়া গেলেই বাদশাহকে ভুলান যাইতে পারে।

শ্রোতৃগণ আবদুলহামিদের বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইল। তাঁহারা বিস্তর সাধুবাদ করিলেন। কিন্তু বোকা মাজ্জুম সহজে বুঝে না। সে বলিল, "হুঁ! যে-সে মেয়ে লইয়া গিয়া দিলে কি বাদশাহ ঠকিবে? মুলুকের বাদশাহ—সে কি ছোট-লোক বড়-লোক চিনিতে পারে না!"

আবদুল। আমরা বড় ঘরের মেয়েই লইয়া যাইব।

মাজ্জুম। কোথায় পাইবে?

আব। যেখানে বড় বাড়ী দেখিব, সেইখানে তরবাল হাতে প্রবেশ করিয়া, মেয়ে কাড়িয়া আনিয়া দোলায় বসাইব।

মাজ্জুম। দোলাই বা পাইবে কোথায়? তাও ত রাজপুত কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।

আবদুল। তাহাও যেখানে দেখিব সেইখান হইতে কাড়িয়া আনিব।

মা। বস্ত্রালঙ্কার?

আ। তাও লুঠ করিয়া আনিব। হাতিয়ার থাকলে অভাব কিসের? যার হাতিয়ার আছে, দুনিয়া তার।

পারিষদগণ আবদুলহামিদের বিজ্ঞতার বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু মূর্খ মাজ্জুম তবু বুঝে না—তথাপি আপত্তি করিতে লাগিল—বলিল, "তোমরা যেন রাজকন্যা সাজাইয়া বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলিলে এই রূপনগরের রাজকুমারী—কিন্তু কন্যা যদি বলে যে না—আমাকে মার কোল থেকে কাড়িয়া আনিয়া জাল রাজকুমারী সাজাইয়াছে?"

আবদুল বলিল, "ফুঃ তা আর বলিতে হয় না—দিল্লীর বাদশাহের বেগম হতে কার অসাধ?"

মাজ্জুম। হৌক—না হয় সেই যেন লোভে পড়িয়া চুপ করিল—কিন্তু এই ছাউনিতে এত শিপাহী—ইহাদের কাহারও না কাহার দ্বারা এ জাল প্রকাশ পাইবে—তখন আমাদিগের প্রাণ কে রাখিবে?

আবদুল হতাশ হইয়া বলিল—"আল্লা! এত বড় বে-অকুব বদ-হোস কমবখৎ বেচারা আমি ত কখন দেখি নাই! এই ছাউনির মধ্যে আমার এ কারসাজি জানিবে কে? আমি কি এ কথা আর কাহাকে বলিব না কি? কন্যা আনিয়া ছাউনিতে উপস্থিত করিয়া বলিব যে রাত্রে রাজপুতের ছাউনিতে পড়িয়া তাহাদের ফতে করিয়া রূপনগরের শাহজাদীকে কাড়িয়া আনিয়াছি। ভাবনা কি? সকলে সেরোপা পাইব।"

শুনিয়া পারিষদেরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। সুভান-এল্লা! এত আক্কেল ও হোস ও ফেকের ও হিম্মৎ ও যঁওয়া মরদী ও এলেম পোষত পোষতান্ বুজুর্গ মধ্যে কেহ কখন দেখে নাই। মাজ্জুমও পরাভূত হইয়া নীরব হইয়া রহিল।

তখন আবদুলহামিদ আপন পৌরুষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনার্থ বলিলেন, "হে ভাই সকল! কাল বিলম্বে প্রয়োজন নাই।—আজ রাত্রেই এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। এখানে কোথায় বড় লোকের বাড়ী আছে কেহ সন্ধান রাখ?

তখন মেহেরসেখ নামে একজন শিপাহী বলিল, "আমি একটি বড় মানুষের বাড়ী দেখিয়া আসিয়াছি। যুদ্ধকালে বড় পরিশ্রম হওয়ায় আমি দণ্ডক্ষণজন্য

বিশ্রামলাভের অভিপ্রায়ে এক উদ্যানমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলাম (অস্যার্থঃ প্রাণ লইয়া পলাইয়া বনের ভিতর সারাদিন লুকাইয়াছিলেন)—সেইখানে এক বড় ভারি বাড়ী দেখিয়াছি—বড় লোকের বাড়ী অনুমান হয়।”

আবছুলহিামদ খুসী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

“সে বাড়ীতে যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রীলোক আছে কি না কোন সন্ধান রাখ ?”

যে বাড়ীর কথা মেহেরসেখ বলিতেছিল সে মোহনলাল শেঠিয়া নামে একজন অতি ধনাঢ্য বণিকের বাড়ী। তাহারই পার্শ্বস্থ জঙ্গলে মেহের লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল! সেই বাড়ীতে যমুনা নামে একজন অর্দ্ধবয়সী পরিচারিকা ছিল—কৃষ্ণাঙ্গী, স্থূলোদরী,—পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়স্কা। দৈবাৎ উপরের জানেলা হইতে, বনমধ্যে লুক্কায়িত মেহেরের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। মেহেরেরও সেই সময়ে যমুনার উপর দৃষ্টি পড়িয়াছিল। এখন, এ পঞ্চাশৎ বৎসর মধ্যে কেহ কখন যমুনার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার পানে চাহে নাই। যমুনা মনে করিল আজ সে সুখের দিন উপস্থিত হইয়াছে—যখন এ ব্যক্তি বনের ভিতর লুকাইয়া থাকিয়া আমার পানে চাহিতেছে তখন নিশ্চিত এ আমার উপাসক; ইহাকে মদনানলে পীড়িত করাই আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া যমুনা মেহেরের প্রতি চক্ষুঃকোঠর হইতে একটি বিলোল কটাক্ষ ঝাড়িয়া গৃহকর্ম্মে গেল। আবার একটু ঘুরিয়া আসিয়া আবার একটা ধারাল রকম নয়নবান হানিয়া ফেলিল। মেহেরও মর্ম্ম বুঝিয়া চরিতার্থ হইলেন—এই পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে তাঁহার পাকা দাড়ি সার্থক বিবেচনা করিলেন—এবং বিমুগ্ধচিত্তে সন্ধ্যার পর সেই ত্রিতল গৃহমধ্যে দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পমাল্য সহিত যমুনাসুন্দরীর বাহুলতায় কণ্ঠ বেষ্টনের সুখকল্পনা করিতেছিলেন—ইত্যবসরে হাসানআলির ভেরী বাজিল। অগত্যা তাঁহাকে শিবিরে আসিতে হইয়াছিল কিন্তু অদর্শনে কল্পনাদেবীর কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ হয়—অতএব মেহের ক্রমে ভাবিতে লাগিলেন যে সেই বাতায়নবিহারিণী মেহের-প্রেমে অভিভূতার ন্যায় সুন্দরী আর ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে নাই। ইহাতে মেহেরের অপরাধ নাই—কেন না এই পঞ্চষষ্টি বৎসর পরিমিত জীবনমধ্যে তাহার অস্থিময় কৃষ্ণকান্তি কখনও স্ত্রীজাতির সরস কটাক্ষের বিষয়ীভূত হয় নাই। অতএব যখন আবছুল হামিদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে গৃহে যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রী আছে কি না, তখন মেহের বেচারা এককালীন কল্পনা ও অলঙ্কার শাস্ত্রাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবীর বশীভূত হইয়া বলিল, যে গোলাবের মত মোলায়েম, আফতাব ও সেতারের মত রৌশনাই করনেওয়ালী দুই এক জন ষোড়শী রমণী তিনি সেই গৃহে দেখিয়া আসিয়াছেন। আরও বলিলেন যে তাহারা (কল্পনায় বহু বচন)—তাহারা অত্যন্ত সুরসিকা,—তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন—এবং কেবল নিমকের অনু-

রোধেই তিনি সেই ত্রিতল গৃহস্থিত দুগ্ধফেণনিভশয্যা পরিত্যাগ করিয়া শিবিরের কঠিন মাটীতে শয়ন করিতে আসিয়াছেন।

আবদুলহামিদ মেহেরের সকল কথায় বিশ্বাস করিলেন কি না বলিতে পারি না—কিন্তু তিনি আহারান্তে সেই গৃহমধ্যে ইষ্টসাধনার্থ প্রবেশ করাই স্থির করিলেন। এবং অনুচরবর্গকে বলিলেন যে, তোমরা ভাই বেরাদারি মধ্যে পঞ্চাশজন জোয়ান সংগ্রহ কর। ঠুসিয়া খিচুড়ী ভোজন করিয়া সকলে হাতিয়ার বন্দ হইয়া এইখানে আসিও। মোল্লা মুফতির মাথায় বাজ পড়ুক—আমি কিছু উত্তম সরাব সংগ্রহ করিয়াছি—একত্রে পান করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে যাত্রা করিব।

কারণবাদ ও অদৃষ্টবাদ

একটি শৃঙ্খলের সঙ্গে আর একটি শৃঙ্খল, তাহার সঙ্গে আর একটি শৃঙ্খল এইরূপ অনেকগুলি শৃঙ্খল একত্র সংলগ্ন হইয়া যেরূপ এক সুদীর্ঘ শৃঙ্খল প্রস্তুত হয়, সেইরূপ এই জগৎকার্য্যে একটী ঘটনার পর আর একটী ঘটনা, তাহার পর আর একটী ঘটনা, এইরূপ ঘটনা পরম্পরা কার্য্যকারণ সম্বন্ধে নিবদ্ধ হইয়া সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বহমান করিতেছে। একটী ঘটনা, কারণ রূপে, আর একটী ঘটনারূপ কার্য্য উৎপাদন করিল। আবার শেষোক্ত ঘটনাটী কারণ হইয়া আর একটি ঘটনারূপ কার্য্য উৎপাদন কবিল। যাহা একবার কার্য্য তাহাই আবার কাবণ হইয়া অন্য কার্য্য উৎপাদন কবিতেছে। এইরূপ আবহমান কাল যাহা কারণ বিশেষের কার্য্য মাত্র, তাহাই আবাব কারণ হইয়া অন্য কার্য্য উৎপাদন করিতেছে। জল ও উত্তাপেব সংযোগ একটি ঘটনা, বাষ্প উহার কার্য্য। আবার বাষ্প হইতে মেঘ উৎপন্ন হইল। মেঘের সহিত শীতল বায়ুর সংযোগ হইয়া বৃষ্টি হইল। সমস্ত সৃষ্টিকার্য্যে এইরূপ ঘটনার পর ঘটনা চলিতেছে। একটী ঘটনা আর একটীর সহিত অখণ্ডনীয় যোগে বদ্ধ। বিংশতিটি গোলা একটী একটী করিয়া সরল রেখায় রাখিয়া দেও; প্রথমটিতে আঘাত কর, যদি পার্শ্বে সরিয়া যাইবার কোন কারণ না থাকে, তাহা হইলে প্রথমটী গিয়া দ্বিতীয়টিকে, দ্বিতীয়টী তৃতীয়টিকে এইরূপে শেষে উনবিংশ গোলাটী বিংশ গোলাটীকে আঘাত করিবে। প্রথম গোলাটীকে যে বলের সহিত আঘাত করা হইল, যদি সেই বলের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যায়, এবং প্রতিকূল অবস্থা সকলের শক্তি, (অর্থাৎ ভূমির বন্ধুরতা, বায়ুর প্রতিঘাত ইত্যাদি) নিশ্চয়রূপে অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলে প্রথম গোলাটি যখন চলিল, তখনই ঠিক করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বিংশ গোলাটী চলিবে কিনা। কেবল তাহাই নহে। কয় মুহূর্ত্ত পরে শেষ গোলাটিতে আঘাত লাগিবে ও উহা চলিবে তাহা নিঃসন্দেহে গণনা করা যাইতে পারে। প্রথম গোলাটীর গতির উৎপত্তি হইতে, শেষ গোলাটির গতি উৎপন্ন হওয়া পর্য্যন্ত

যে কয়েকটি ঘটনা হইল উহা কার্য্য কারণ শৃঙ্খল মাত্র। পূর্ব্ববর্ত্তী আঘাত পরবর্ত্তী আঘাতের কারণ, আর সেই পরবর্ত্তী আঘাত তৎপরবর্ত্তী আঘাতের কারণ, সুতরাং যেমন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যাহা একটি ঘটনা সম্বন্ধে কার্য্য তাহাই আবার আর একটী ঘটনা সম্বন্ধে কারণ হইতেছে। ঘটনা সকল পর্য্যায়ক্রমে কার্য্য ও কারণ হইতেছে।

সামান্য গোলার বিষয়ে যে কথা বলা হইল অসীম ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ঘটনা সম্বন্ধে সেই কথা খাটিবে। বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে নিয়ম বলেন তাহা আর কিছুই নহে, এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধীয় প্রণালী মাত্র। সমান কারণ সমান অবস্থায় সমান কার্য্য উৎপাদন করে, ইহা দেখিয়াই আমাদের প্রাকৃতিক নিয়মের জ্ঞান হইয়াছে। কোন একটি ঘটনা একপ্রকার অবস্থায় একপ্রকার কার্য্য উৎপাদন করিল। আবার সেইরূপ ঘটনা, অবিকল সেইরূপ অবস্থায় ঠিক সেইরূপ কার্য্য উৎপাদন করিল, এইপ্রকার পুনঃপুনঃ দেখিযাই আমরা বুঝিয়াছি যে, প্রকৃতি নিয়মানুসারে চলিতেছে। ইহাতে কিছুই বিশৃঙ্খলা নাই। কোন ঘটনাই আকস্মিক নহে।

সামান্য একটী দৃষ্টান্ত দেখ। শুষ্ক তৃণ অগ্নিতে নিক্ষেপ কর, তৃণ দগ্ধ হইয়া গেল। যখন যেখানে শুষ্ক তৃণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে, সেইখানেই তৃণ দগ্ধ হইবে। কিন্তু আর্দ্র তৃণ অগ্নিতে নিক্ষেপ কবিয়া দেখ. উহা যতক্ষণ আর্দ্র থাকিবে, কখনই দগ্ধ হইবে না। যখন যেখানে আর্দ্র তৃণ অগ্নিতে দিবে, আর্দ্রাবস্থায় উহা কখনই দগ্ধ হইবে না। এই প্রকার দেখিয়া দেখিয়াই লোকের প্রাকৃতিক নিয়মের জ্ঞান জন্মে। যদি এমন হইত যে, একসময় দেখিলাম শুষ্ক তৃণ অগ্নিতে দগ্ধ হইল, আর এক সময় হইল না; এক সময় দেখিলাম উত্তাপসংযোগে জল বাষ্পরূপে পরিণত হইল, আর এক সময় হইল না; এক সময় দেখিলাম বৃক্ষস্খলিত ফল পৃথিবীতলে পতিত হইল, আর এক সময় উহা ঊর্দ্ধগামী হইল, এক সময় দেখিলাম জল নিম্নগামী হইয়া চলিতেছে, আর এক সময় দেখিলাম উহা ঊর্দ্ধগামী হইতেছে; এক সময় দেখিলাম বিষ শরীরের রক্তকে দূষিত করিয়া দিতেছে, আর এক সময় দেখিলাম উহাকে বিশুদ্ধ করিতেছে; যদি জগতে সকল সময়ে ও সর্ব্বত্র এই প্রকার বিশৃঙ্খলা দেখিতাম, যদি দেখিতাম যে, সমান কারণ, সমান অবস্থায় সমান কার্য্য উৎপাদন করিতেছে না, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে নিয়মের জ্ঞান অসম্ভব হইত। বাস্তবিক প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে সমান ভাব (uniformity) দেখিয়াই আমাদের প্রাকৃতিক নিয়মের জ্ঞান জন্মিয়াছে।

যাহা আলোচনা করা হইল তাহাতে এই দুটি কথা বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ কার্য্যকারণশৃঙ্খলে সমগ্র জগৎ দৃঢ় নিবদ্ধ রহিয়াছে; দ্বিতীয়তঃ সমস্ত ঘটনা

পরস্পরের সহিত অখণ্ডনীয় কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই আমাদের প্রাকৃতিক নিয়মের জ্ঞান জন্মিয়াছে।

বহির্জগতে যেমন অন্তর্জগতেও সেইরূপ। বহির্জগতে যেমন গ্রহ নক্ষত্রের গতি হইতে সামান্য ধূলিকণার পতন পর্য্যন্ত কিছুই আকস্মিক নয়, কিছুই বিনা কারণে হয় না, সেইরূপ অন্তর্জগতেও কোন জ্ঞান, ভাব, বা ইচ্ছা বিনা কারণে উৎপন্ন হয় না।

আমি একটি কার্য্য করিলাম। কার্য্যের কারণ কি? ইচ্ছা (will)। ইচ্ছার কারণ কি? ইচ্ছা কখন কি বিনা কারণে উৎপন্ন হইতে পারে? ইচ্ছার অবশ্য কারণ আছে। ইচ্ছার কারণ বাসনা (desire)। বাসনা কোথা হইতে আসিল? বাহ্যপদার্থ বা ঘটনার সহযোগে প্রকৃতি বা চরিত্র হইতে। প্রকৃতি ও চরিত্রের কারণ কি? কতক বৈজিকতত্ত্বানুসারে পিতৃপুরুষ হইতে, এবং কতক অবস্থা ও শিক্ষা হইতে।

"স্বাধীন ইচ্ছা" এই বাক্যটির তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। কেহ কি এরূপ মনে করিতে পারেন যে, মনুষ্যের কোন একটি ইচ্ছা বিনা কারণে উৎপন্ন হইতে পারে? ইচ্ছা থাকিলেই তাহার উৎপত্তির কারণ আছে। ইচ্ছা মাত্রেই বাসনার কার্য্য। কার্য্য, কারণের অধীন, সুতরাং ইচ্ছা অবশ্য তাহার কারণ বাসনার অধীন।

বাহ্য প্রতিবন্ধক অনতিক্রমণীয় না হইলে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারি। ইহারই নাম যদি "স্বাধীন ইচ্ছা" হয়, তবে সে স্বাধীন ইচ্ছা ত মনুষ্য মাত্রেই অনুভব করিয়া থাকে। ইচ্ছা হইলে সেই ইচ্ছা অনুসারে মনুষ্য স্বাধীন-ভাবে কার্য্য করিতে পারে, এ কথা কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছামতের পক্ষপাতীরা কি এরূপ বলিতে পারেন যে, মনুষ্য যাহা ইচ্ছা তাহাই ইচ্ছা করিতে পারে? যাহা ইচ্ছা তাহাই ইচ্ছা করা, এ বাক্যের ত কোন অর্থই নাই। ইচ্ছার উৎপত্তির পূর্ব্বে কেমন করিয়া ইচ্ছা আসিবে? ইচ্ছার উৎপত্তির পূর্ব্বে অবশ্য আর কিছু আছে। সেই "আর কিছু" ইচ্ছার কারণ, ইচ্ছা তাহার কার্য্য; সুতরাং ইচ্ছা তাহার অধীন। ইচ্ছার স্বাধীনতা কোথায় রহিল?

আমরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারি, সেই জন্যই ইচ্ছার স্বাধীনতার মতটি উঠিয়াছে। স্বাধীনতা শব্দের অর্থই স্ব অধীনতা, আপনার অধীনতা অর্থাৎ আমাদের যাহা ইচ্ছা তদনুসারে কার্য্য করিতে পারি। কিন্তু ইচ্ছার সৃষ্টি করিতে পারি না। কেন না কোন্ ইচ্ছা দ্বারা ইচ্ছার সৃষ্টি করিব? ইচ্ছাসৃষ্টির পূর্ব্বে অবশ্য ইচ্ছা ছিল না।

"স্বাধীন ইচ্ছা" মতের পক্ষপাতীরা বলেন যে, প্রত্যেক মনুষ্য আপনাকে স্বাধীন বলিয়া অনুভব করেন ; স্বাধীনতার বিশ্বাস স্বাভাবিক। আমরা জিজ্ঞাসা করি প্রত্যেক মনুষ্য কি অনুভব করে? ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে যে, আমরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারি। যদি কাহারও পক্ষাঘাত হয় সে আপনাকে স্বাধীন মনে করে না কেন? এই জন্য যে, মনে ইচ্ছা থাকিলেও তদনুযায়ী কার্য্য করিবার শক্তি নাই। কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্য কি এরূপ অনুভব করে যে, সে ইচ্ছাব সৃষ্টি করিতে পারে? কোন প্রকার বিশেষ ইচ্ছা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা যদি জন্মিয়া থাকে, তবে ইহাই বলিতে হইবে যে, সে ইচ্ছাই জন্মিয়াছে। স্বাধীন-ইচ্ছামতের পক্ষপাতীরা বলেন যে, কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে মন বলিয়া দেয় যে, উহা করিতেও পারি, না করিতেও পারি। উক্ত কার্য্য করিলে পর মনই বলিয়া দেয় ইহা না করিলেও করিতে পারিতাম। সেই জন্যই দুষ্কর্ম্ম করিয়া অনুতাপ হয়। এটি অত্যন্ত অযুক্ত কথা। মনোবিজ্ঞানবিদ্ মাত্রেরই মতে সংজ্ঞা (consciousness) মনের বর্ত্তমান অবস্থা বলিয়া দেয়। ভূত ভবিষ্যতের সহিত উহাব সম্বন্ধ কি?

বিপরীত প্রকৃতির দুটী অভিসন্ধি বা বাসনার মধ্যে যখন বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন মনুষ্য আপনাকে বিশেষরূপে স্বাধীন বলিয়া প্রতীতি করে। বিরোধের অবস্থায় মনুষ্য বিচার করে, বিতর্ক করে, আলোচনা করে, একবার অগ্রসর হয়, আবার পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়, সুতরাং সে মনে করে যে সে নিজে স্বাধীন ভাবে এ প্রকার করিতেছে। এরূপ বিরোধের অবস্থায় স্বাধীনতায় বিশ্বাস উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে।

একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। মনে কর, দুটী চুম্বক পাথরের দুই পার্শ্বে ও মধ্যস্থলে এক খণ্ড লৌহ রহিয়াছে। যদি দুইখানি চুম্বকের আকর্ষণ সমান হয়, তাহা হইলে লৌহখণ্ড যেখানে আছে সেইখানেই থাকিবে। কোন দিকেই চালিত হইবে না। কিন্তু যদি দুইখানি চুম্বকের মধ্যে একখানির আকর্ষণ প্রবলতর হয়, তাহা হইলে লৌহ সেই দিকেই চালিত হইবে। আমাদের প্রবৃত্তি বা বাসনা সকল অবিকল এই প্রকার ভাবে কার্য্য করে। যদি দুটী বাসনা সমান প্রবল থাকে, তাহা হইলে মনুষ্য কোন দিকেই হেলিতে পারিবে না। কিন্তু যদি দুটির মধ্যে একটী অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে তাহা হইলে সেই প্রবলতর বাসনার দিকেই ধাবিত হইবে, এবং সেই বাসনার অনুযায়ী কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইবে। মনে কর একটি নির্জ্জন স্থানে কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা কুড়াইয়া পাইলাম, পাইবামাত্র উহা আত্মসাৎ করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু তৎপরক্ষণেই মনে হইল যে উহা অধর্ম্ম, যাহার ধন তাহাকে অন্বেষণ করিয়া প্রত্যর্পণ করাই বিধেয়। এই উভয়প্রকার

বাসনার মধ্যে ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হইল। একবার একটী আবার অপরটি পর্য্যায়ক্রমে প্রবল হইতে লাগিল। অবশেষে উভয়ের মধ্যে কোন একটির জয়-লাভ হইল।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, প্রবলতর বাসনা যে মনুষ্যকে স্বীয় অধীনে আনিল এমন নহে, মনুষ্য নিজেই সেই অভিসন্ধিকে প্রবল করিল; সে আপনিই স্বাধীন ভাবে উভয়প্রকার অভিসন্ধির মধ্যে কোন একটীকে জয় দান করিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি জয় দান করিল কেন? একটীর পরিবর্ত্তে আর একটিকে জয়দান করিবার যে ইচ্ছা তাহার কি কোন কারণ নাই? সেই মানসিক অবস্থার উৎপাদক কি কোন পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা নাই?

আমরা দেখিলাম যে জড় জগৎ কার্য্য কারণ শৃঙ্খলবদ্ধ একটী কল মাত্র। আবার ইহাও প্রতিপন্ন হইল যে, মনোজগৎও ঐ প্রকার আর একটি কল। আধুনিক উন্নত বিজ্ঞানের ইহাই উপদেশ যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সকল অংশের সহিত সকল অংশের যোগ রহিয়াছে। নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী ও নিয়ত পরবর্ত্তীরূপে ঘটনা সকল পরস্পরের সহিত সংবদ্ধ। এই প্রকাণ্ড যন্ত্রের নিগূঢ় কার্য্যপ্রণালীর অনুসন্ধান করাই মনুষ্যের সুমহৎ অধিকার। এই যন্ত্রসম্বন্ধীয় সত্য আহরণ করাই বৈজ্ঞানিকের কার্য্য। এই যন্ত্রের জ্ঞানই প্রকৃত বিজ্ঞান।

জড় ও মন উভয়ই যখন নিয়মে বদ্ধ তখন উভয় সম্বন্ধীয় ঘটনারই ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব। কেবল সম্ভব কেন? বহুকাল হইতে বৈজ্ঞানিকেরা ভাবী ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া আসিতেছেন, এবং উহা সফলও হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে গোলার বিষয়ে যেমন বলিয়াছি যে, সমস্ত অবস্থাসম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকিলে প্রথম গোলাটিতে আঘাত লাগিবে কি না, সেইরূপ সমস্ত অবস্থা নিয়ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকিলে জগতের যাবতীয় ঘটনাসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। কবে সূর্য্য চন্দ্রের গ্রহণ হইবে, কবে ধূমকেতুর উদয় হইবে, জ্যোতির্ব্বিদ্‌পণ্ডিতেরা বহু-কাল হইতে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া আসিতেছেন। গ্রহ উপগ্রহ বিষয়ক নিয়মাদির জ্ঞান কতকটা লাভ করা হইয়াছে বলিয়াই তাঁহারা অক্লেশে উক্ত ঘটনা সকল বহু-কাল পূর্ব্ব হইতে দেখিতে পান।

যে পরিমাণে বিজ্ঞান উন্নতিপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে, সে পরিমাণে মনুষ্য, জগতের ভাবী ঘটনার জ্ঞানলাভ করিতে থাকিবে। এই শতাব্দীতে বিজ্ঞান যতটুকু উন্নত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই আমরা আশ্চর্য্য হই। কিন্তু বাস্তবিক ইহা নিশ্চয় যে বিজ্ঞানের এখন শৈশবাবস্থা মাত্র। সেইজন্য বৈজ্ঞানিকেরা অতি অল্প বিষয়েরই ভবিষ্যৎ দেখিতে পান। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অধিকাংশ বিষয়েরই এখন ভাবী জ্ঞান অসম্ভব। কেন না, সে সকলের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় জ্ঞান এখনও মনুষ্য

উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন নাই। মনুষ্য যদি সকল বিষয়েরই কার্যকারণশৃঙ্খল সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে সকল বিষয়েরই ভাবী কার্য্য বলিয়া দিতে পারিত। জড়জগৎ সম্বন্ধে যেমন বলিয়া দিতে পারিত এবং এখনই কিয়ৎপরিমাণে পারে, মনোজগৎ সম্বন্ধেও অবশ্য সেইরূপ পারিত। জড় ও মন সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব হইলে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল ঘটনারই ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব হইবে। এখন যেমন বলা যায় যে, কবে ধূমকেতুর উদয় হইবে, কবে চন্দ্রগ্রহণ হইবে, সেই প্রকার আমাদের জ্ঞান অধিকতর উন্নত হইলে আমরা বলিতে পারিব যে কবে অমুক ব্যক্তি একটী মিথ্যা কথা বলিবে, কবে সে প্রবঞ্চনা করিয়া আপনার ভ্রাতার সম্পত্তি অপহরণ করিবে, কবে সে নরহত্যা করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। অথবা কবে সে অসাধারণ মহত্ব প্রকাশ করিয়া জনসমাজের হিতসাধন করিবে। সামাজিক বিষয়েও সেইরূপ নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলা যাইতে পারিবে যে, কতদিন পরে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম বিনাশদশা প্রাপ্ত হইবে, আর কতদিন ভাবতবর্ষ বিদেশীয় জাতির অধীন থাকিবে।

এ স্থলে একটী কথা সহজেই আসিতেছে। প্রসিদ্ধনামা জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার রচিত তর্কশাস্ত্রে আসিয়া (Asia) দেশের প্রচলিত অদৃষ্টবাদ ও ইউরোপ খণ্ডে প্রচলিত কারণবাদ মধ্যে বিভিন্নতা প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, আসিয়ার প্রচলিত অদৃষ্টবাদ মনুষ্যের অদৃষ্টকে কোন অজ্ঞাত বা দৈব শক্তির অধীন করে, কিন্তু ইউরোপে প্রচলিত কারণবাদ মনুষ্যের কার্য্যনিচয় ও কার্য্যকারণসম্বন্ধ দ্বারা ব্যাখ্যা করে।

Real fatalism is of two kinds. Pure Asiatic fatalism, the fatalism of Œdipus, holds that our actions do not depend upon our desires. Whatever our wishes may be, a superior power, or an abstract destiny, will over-rule them and compel us to act, not as we desire, but in the manner pre-destined. The other kind, modified fatalism I will call it, holds that our actions are determined by our will, our will by our desires, and our desires by the joint influence of the motives presented to us and of our individual character.

J. S. Mill.

মিল যে কথা বলিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই উভয় প্রকার মত মূলে বিভিন্ন হইলেও ফলে সম্পূর্ণ এক। আসিয়ার প্রচলিত অদৃষ্টবাদ যেমন নিশ্চয় করিয়া বলে যে, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই, কেহ তাহার অন্যথা

করিতে পারে না ; ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রচারিত কারণবাদ হইতেও সেই কথা নিষ্পন্ন হইতেছে যে, যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিবে। ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবন অখণ্ডনীয় কার্য্যকারণসূত্রে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ইউরোপ ও আসিয়ার মত বিভিন্ন পথ দিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু পরিশেষে একস্থানেই আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই উভয় মতের মধ্যে ফলে প্রভেদ কোথায় ?

আমরা এতক্ষণ আলোচনা কবিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, এক্ষণে তাহার ফলাফলের বিষয় বিচার কবিয়া দেখা যাউক। জড়জগৎ ও জনসমাজ কার্য্যকারণশৃঙ্খলে বদ্ধ ; এই মত হইতে অতি গুরুতর ফল উৎপন্ন হইতে পারে। আলোচিত মতে যদি সকল মনুষ্যেব সন্দেহশূন্য সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তাহা হইলে এখন জগতে যে প্রকার ভাবে নিন্দা প্রশংসা, ঘৃণা ও শ্রদ্ধার কার্য্য চলিতেছে ইহা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কেবল তাহাই নহে, অনুশোচনা ও উদ্যোগ বিনাশ-দশা প্রাপ্ত হয়।

মিথ্যাবাদী, প্রতাবক, ব্যভিচাবী, নবহন্তা, মনুষ্য যতই কেন দুষ্ক্রিয়াসক্ত হউক না, তাহাকে তুমি ঘৃণা করিতেছ কেন ? তাহার নিন্দা কবিবার তোমার কি ? তাহার যখন নিজের বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নাই ; কার্য্যকাবণশৃঙ্খলে তাহার দেহ মন দিবারজনী যখন দৃঢ়নিবদ্ধ, নিয়মচক্রে যখন সে প্রতিনিয়ত ভ্রাম্যমান তখন তাহাব অপরাধ কি ? আবার যে পবিত্রচেতা সাধু, লোকহিতব্রতে শরীর মন উৎসর্গ কবিয়াছেন, তাঁহারই বা এত প্রশংসা করিতেছ কেন ? তিনিও ত অখণ্ডনীয় নিয়মের দাস মাত্র ? তুমি উত্তর করিবে যে সুন্দর পদার্থ দেখিলে প্রীত হওয়া মানুষের স্বভাব। সুন্দর গোলাব, সুন্দর চন্দ্রমা দেখিয়া কে না আনন্দিত হয় ? ভাল জিনিস দেখিলেই লোকে তাহাকে স্বভাবতঃ ভালবাসে, কুৎসিত বস্তু দেখিলেই তাহাকে স্বভাবতঃ ঘৃণা করে। চন্দ্র স্বাধীন ইচ্ছায় সুন্দর হয় নাই, এবং পঙ্ক স্বাধীন ইচ্ছায় মলিন হয় নাই, অথচ আমাদের এমনি প্রকৃতি যে আমরা একটীকে ভাল না বাসিয়া এবং অপরটীকে ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারি না। মনুষ্য সম্বন্ধেও সেইরূপ। ভাল লোককে আমরা স্বভাবতঃ ভালবাসি, মন্দ লোককে আমরা স্বভাবতঃ ঘৃণা করি। স্বাধীন ইচ্ছা থাকুক না থাকুক তাহাতে কি আসিয়া গেল ?

এ সকল কথা মানিলাম। মন্দলোককে মন্দ অবশ্য বলিবে, কিন্তু তাহাকে অপরাধী বলিতে পারিবে না ; "বাহাদুরি" নাই এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ; কেননা তিনিও নিয়মের দাস। যে বসন্তরোগী রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করি-তেছে, যে গলিতকুষ্ঠ রোগপ্রপীড়িত দরিদ্র পথে বসিয়া চীৎকার করিতেছে, উহা-দিগকে তুমি ঘৃণা কর ? লোকের বাড়ী বাড়ী কি উহাদের রোগের জন্য, উহাদের

নিন্দা করিয়া বেড়াও ? তাহা যদি না কর, তবে তোমার যে প্রতিবাসী চৌর্য্যবৃত্তি-প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার কেন নিন্দা করিতেছ ? চৌর্যবৃত্তি দ্বারা সমাজের যত অনিষ্ট সংঘটিত হয়, সংক্রামক বসন্তরোগে কি তদপেক্ষা কিছু অল্প অনিষ্ট হয় ? আর বসন্ত ও কুষ্ঠরোগ যেমন নিয়মের ফল, চৌর্য্যবৃত্তিও কি সেইরূপ নহে ?

সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে অদৃষ্টবাদে বা কারণবাদে দৃঢ়বিশ্বাস হইলে যে ভাবে এখন জনসমাজে নিন্দা প্রশংসা চলিতেছে সে ভাবে কখনই চলিতে পারে না। চোর, প্রতারক, নরহন্তা প্রভৃতি লোকের কথা দূরে থাকুক, এখন জনসমাজের যে প্রকার অবস্থা তাহাতে যে অশেষ যন্ত্রণাপ্রপীড়িত জীর্ণদেহ অক্ষম দরিদ্র উদরের জ্বালায় অপরের অন্নমুষ্টি অপহরণ করে, তাহাকেও অন্নপানে পরিপুষ্ট পিতৃপুরুষার্জ্জিত ধনলাভে নিশ্চিন্ত, নীতিজ্ঞেরাও আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন না। যে যুবতী বিধবা, প্রকৃতির দুর্নিবার উত্তেজনা অতিক্রম করিতে অক্ষম হইয়া বিপথে পদার্পণ করে, তাহাকেও যে অশীতিপর বৃদ্ধ চতুর্থ পক্ষে বিবাহ কবিয়াছেন, তিনিও অসতী বলিয়া ঘৃণা করিতে সঙ্কুচিত হন না।

কারণবাদে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে সহানুভূতি ও ক্ষমা যে এখনকার অপেক্ষা সহস্র গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। লোকে যদি দেখে যে মানুষ অবস্থার দাসমাত্র, ব্রহ্মাণ্ড যন্ত্রের একটি অংশ মাত্র, সে নিজে স্বাধীনভাবে, কার্য্যকারণ সূত্র অতিক্রম করিয়া একটি ক্ষুদ্র কেশকেও বিচলিত করিতে পারে না, তাহা হইলে কেন আর কর্কশভাবে তাহাকে তিরস্কাব করিতে প্রবৃত্ত হইবে ? যে বংশখণ্ডেব আঘাতে তুমি মস্তকে বেদনা পাও তাহাকে কি তুমি তিরস্কার করিতে চাও ? বালক ভূমিতলে পতিত হইলে রাগ করিয়া ভূমিকে আঘাত করে, কেন না সে মনে করে যে ভূমি চৈতন্যবিশিষ্ট পদার্থ ও সে তাহাকে স্বাধীনভাবে আঘাত করিল। কিন্তু যখনই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারে যে ভূমি চৈতন্যবিশিষ্ট ও স্বাধীন নহে, তখন আর পতিত হইলে সে ভূমির উপর রাগ করিবে না। মনুষ্য সম্বন্ধেও সেইরূপ। যখন লোকে বুঝিতে পারিল যে প্রত্যেক মানুষের সহিত মন কার্য্যকারণ সূত্রে বদ্ধ, তখন আর কাহারও দোষের জন্য তাহাকে কেহ ঘৃণা বা তিরস্কার করিতে যাইবে না।

এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে তবে রাজনৈতিক ও সামাজিক শাসন একেবারে উঠিয়া যাইবে ? স্বাধীনতা নাই বলিয়া কি চোর ও নরহন্তাকে রাজা শাস্তি দিবেন না ? কেহ কোন দুষ্কার্য্য করিলে কি সমাজ তাহার শাসন করিবে না ? এবং তাহা হইলে সংসার হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা এককালীন কি তিরোহিত হইয়া যাইবে না ?

নিশ্চয়ই যাইবে। যাঁহারা কারণবাদের পক্ষপাতী তাঁহারা কখনই এমন বলেন না যে রাজনৈতিক ও সামাজিক শাসন উঠাইয়া দেও। যে সকল কারণে লোকের চরিত্র ও আচরণকে নিয়মিত ও পরিচালিত করে, রাজকীয় ও সামাজিক শাসন তন্মধ্যে প্রধান, সুতরাং রাজকীয় ও সামাজিক শাসন কারণবাদের বিরোধী নহে, বরং উহার সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গত। কারণবাদীরা ইহাই বলেন যে, মনুষ্য অভিসন্ধির অধীন হইয়া কার্য্য করে। দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির পক্ষে, অন্যান্য অভিসন্ধির মধ্যে শাসনের ভয় একটী অভিসন্ধি হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং সামাজিক ও রাজকীয় শাসনের সহিত কারণবাদের অসঙ্গতি কেন থাকিবে? কারণবাদ স্বীকার করিলে দোষী ব্যক্তিকে ঘৃণা অবশ্য করিতে পারি না কিন্তু ভবিষ্যতে সে আর দুষ্কর্ম্ম না করে সে জন্য তাহাকে শাসন করিতে পারি। এতদ্ভিন্ন অন্য লোকে দুষ্কর্ম্ম করিতে ভয় পাইবে বলিয়াও শাস্তিবিধান আবশ্যক।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যে ভাবে এখন সমাজে নিন্দা প্রশংসা চলিতেছে, কারণবাদে বিশ্বাস জন্মিলে তাহা আর কখনই চলিতে পারে না। ইহাও বলা হইয়াছে যে কারণবাদে সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে অনুশোচনা ও উদ্যোগ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

একথা যদি সত্য হয়, তবে ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, উহা কারণবাদের একটি নিতান্ত অনিষ্টকর ঘৃণিত ফল। এস্থলে কারণবাদীরা বিরক্ত হইয়া বলিবেন, কারণবাদ হইতে এপ্রকার জঘন্য ফল কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। আমরা এখনই পরিষ্কাররূপে দেখাইব যে, কারণবাদে নিশ্চয়ই এই বিষময় ফল প্রসব করে।

এস্থলে পাঠকগণ বলিতে পারেন যে, তুমি যে কারণবাদকে প্রতিপন্ন করিবার জন্য এতক্ষণ তর্কজাল বিস্তার করিলে, স্বাধীন ইচ্ছা মতের মূলে কুঠারাঘাত করিলে, এখন আবার সেই কারণবাদেরই বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে কেন? তাহারই অশুভ ফল প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইতেছ কেন?

এ কথার উত্তরে এইমাত্র বক্তব্য যে, আমরা মতের দাস হইতে চাই না, সত্যের অনুগত থাকিতে ইচ্ছা করি। যে বিশুদ্ধযুক্তি আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছে যে, স্বাধীন ইচ্ছা মতের কোন মূল নাই, সেই বিশুদ্ধযুক্তিই আমাদিগকে বলিতেছে যে, উক্ত মতের নৈতিক ফল নিতান্ত শোচনীয়।

সূর্য্য হইতে কি অন্ধকার আসিতে পারে? সত্য হইতে কি অমঙ্গল উৎপন্ন হইতে পারে? কারণবাদ যদি সত্য হয়, তবে তাহা হইতে অশুভ ফল প্রসূত হইবে কেন? এ প্রশ্নের এখন আমরা কোন উত্তর করিতে পারি না। দুটি সিদ্ধান্ত আপাততঃ পরস্পর বিরোধী বলিয়া বোধ হইতে পারে, অথচ

তাহাদিগের মধ্যে বাস্তবিক সঙ্গতি থাকাও অসম্ভব নহে। সামঞ্জস্য করিতে পারিতেছি না বলিয়া যে, দুটি আপত্তির বিরুদ্ধ মতের মধ্যে একটিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে ইহা আমরা স্বীকার করি না।

কিন্তু কারণবাদীরা বলিবেন যে, বাস্তবিক এ স্থলে সে প্রকার অসামঞ্জস্যের বিষয় কিছুই নাই। কারণবাদ হইতে মানবচরিত্র সম্বন্ধে কোন অশুভ ফল উৎপন্ন হয় না।

আমরা বলি হয়। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। একজন কারণবাদী দেখিলেন যে, তাঁহার তরুণবয়স্ক পুত্র বিদ্যাশিক্ষায় অনাবিষ্ট হইয়া দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়া পুত্রকে তিরস্কার ও উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পুত্র পিতাকে বলিল আপনি কেন আমাকে তিরস্কার করিতেছেন? আপনি ত জানেন যে সকলই কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে বদ্ধ। আমি নিজে স্বাধীনভাবে কিছুই করিতে পারি না। আমার প্রত্যেক চিন্তা, ইচ্ছা, ও কার্য্য এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড যন্ত্রের অংশ মাত্র। জগতের সকল ঘটনাই অখণ্ডনীয়। উপযুক্ত ভাবী দৃষ্টি থাকিলে, আমি যে মন্দ হইয়া যাইব ইহা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কেহ বলিয়া দিতে পারিত। পিতা বলিলেন, কারণবাদ সত্য বলিয়াই আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, উপদেশে তোমার মন পরিবর্ত্তিত হইবে। পুত্র বলিল, আপনি উপদেশ দিন, কিন্তু হয়ত ইহাই অনাদিকাল হইতে স্থির হইয়া রহিয়াছে যে, আপনি কলের ন্যায় আমাকে তিরস্কার করিবেন, এবং আমিও আপনার তিরস্কার কলের ন্যায় অগ্রাহ্য করিয়া মন্দ হইয়া যাইব। কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে যখন ভূত ভবিষ্যৎ বদ্ধ, তখন ভাল হইবার হয় ত ভাল হইব, মন্দ হইবার হয় ত মন্দ হইব।

আর একটী দৃষ্টান্ত। ঐ যে সম্মুখে ঘড়িটা টিক্ টিক্ করিতেছে মনে কর উহার জ্ঞান আছে। ঘড়িতে তিনটায় একটা বাজিল। তুমি বিরক্ত হইয়া ঘড়িকে বলিলে, "ঘড়ি, তোমার ইহা বড় অন্যায়, মিথ্যা কথা বল কেন?" ঘড়ি বলিল, "আমার দোষ কি? আমি কল মাত্র। আমার স্বাধীনতা নাই; সুতরাং অপরাধ নাই, অনুতাপও নাই।" বাস্তবিক ঘড়ি তিনটার সময় একটা বাজার জন্য আপনাকে অপরাধী মনে করিতে পারে না; এবং অনুতপ্ত হইয়া আক্ষেপ করিতেও পারে না "হায়! হায়! আমি কি করিলাম! আমি মহা পাপী।"

মনুষ্যেরও যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে সে জ্ঞানবিশিষ্ট কল মাত্র তবে সে কখনই অনুতাপ করিতে পারে না। করা অসম্ভব। কেহ বলিতে পারেন যে, অনেক লোক ত কারণবাদী আছেন কিন্তু তথাচ তাঁহারা অন্যায় কর্ম্ম করিয়া

অনুতাপ করেন কেন ? এই জন্য যে কারণবাদের মতে তাঁহাদের সুদৃঢ় ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই।

যেমন অনুশোচনা অসম্ভব সেইরূপ চেষ্টা ও যত্নও অসম্ভব। ঘড়ির দৃষ্টান্ত পুনর্ব্বার গ্রহণ কর। যে ঘড়িতে তিনটার সময় একটা বাজিল তাহাকে তুমি যদি বল "ঘড়ি তুমি ভবিষ্যতে আর এমন কর্ম্ম করিও না। ঠিক তিনটার সময় যাহাতে তিনটা বাজে তাহাই করিবে।" ঘড়ি উত্তর করিল "আমি কল, চেষ্টা করিবার আমার সাধ্য কি ?"

মানুষ্যঘড়িও সেই প্রকার বলিবে, আমি কি করিব ? নিয়তিব অবিনশ্বর পুস্তকে যাহা লিখিত রহিয়াছে তাহাই হইবে।

এখন দেখা যাইতেছে যে, কারণবাদে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে উৎকর্ষ লাভ বা সংশোধনের চেষ্টা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে, আলস্য সম্পূর্ণ প্রশ্রয় পাইবে। সুতরাং সংসারের যারপরনাই অমঙ্গল সংঘটিত হইবে। দায়িত্ব বোধও চলিয়া যাইবে, কেন না যে কল, তাহার আবার দায়িত্ব কি ?

এ স্থলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বলিতে পারেন যে, হয় কারণবাদের মত মিথ্যা, নতুবা তাহার যে ফলের কথা বলা হইল তাহা মিথ্যা। আমরা বলি তাহা হইতে পারে। কিন্তু যদি তাহা কেহ প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে ভাল হয়। আমরা জানি বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা যাহা লিখিলাম তাহা অনেকেরই মতের সহিত মিলিবে না। সেই জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি যে, যদি কেহ এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ লিখিয়া ইহার ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট একান্ত অনুগৃহীত হই।

ন, না।

গঙ্গাধর শর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

প্রেম-বিকার

শ্রীনগর ও শান্তিপুরের প্রান্তরের মধ্যে বেগবতী ক্ষুদ্র নদীর কূলদ্বয় শরদাগমে আজকাল রমণীয় শ্রীধারণ করিয়াছে। উভয়পার্শ্বে বিস্তৃত হরিতময় শস্যক্ষেত্রে শিখা পরিপূর্ণ শস্যদল নিরন্তর উর্ম্মিবৎ হেলিতেছে দুলিতেছে, চকিত মাত্র আলোকচ্ছায়া শন শন করিয়া হরিতপল্লবের শয্যোপরি বেগবান্ হইতেছে। মধ্যে মধ্যে প্রগাঢ়পীতবর্ণ শণকুসুম শস্যক্ষেত্রের উপর শিরোত্তোলন করিয়া শরৎ-বায়ুতে আন্দোলিত হইতেছে, আবার কোথাও দুই একটী ক্ষেত্রে উচ্চ উচ্চ পাট-বৃক্ষশিরে তীক্ষ্ণ শণপত্র সমূহ বায়ুশ্বাসে উল্টাইয়া পড়িতেছে। এই ক্ষেত্রের প্রান্তরে বহুদূরবিস্তৃত নীল জলাশয়, শ্বেত রক্ত শতদলে পরিপূর্ণ, নীলবসনা মহীর স্বচ্ছ উরসে আঙ্গিয়া সদৃশ দৃশ্যমান। এই সরসীর পার্শ্বে আশুতোষ বাবুর বিস্তৃত "রমণা" কাননের পাকা প্রাচীরপরিধি দেখা যাইতেছে। রমণার কোন অংশে ফলের উদ্যান কোন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বদেশী বা বিদেশজাত বহুল পুষ্প-তরুতে শোভমান। আবার কোন স্থল শত শত ক্ষুদ্র ফুলের বীজভূমি; শরৎজলে ধৌত হইয়া সকল বৃক্ষের সকল পত্রের সকল পুষ্পেরই রং নবভাব প্রাপ্ত, শরদালোকে সকলই কমনীয়। উদ্যানের নৈঋত কোণে একটী পুষ্করিণীর তটে একটী শ্বেত অট্টালিকা শোভমান। তাহার ছায়া স্বচ্ছ সরোবরবক্ষে নতশিরে কাঁপিতেছে, আজ বর্ষাজলসিক্ত শারদ মেঘদল আকাশের মধ্যভাগ ত্যাগ করিয়া বহুদূরে, প্রান্তরে, বৃক্ষশিরে শয়ন করিয়া যেন সূর্য্যকিরণে অঙ্গ বিশুষ্ক করিতেছে। আকাশের মধ্যদেশ নির্ম্মল নীলিম স্বচ্ছ স্ফাটিকের কটাহের মত উদ্যানের উপরিভাগে চাপিয়া বসিয়াছে। অট্টালিকার যেদিকে পুষ্করিণী তাহার অপরদিকে সোপানশ্রেণীর পাদদেশ হইতে একটি কঙ্কর-

নির্ম্মিত বিস্তৃত পথ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে ও বহুদূরে একটি সুরম্য ঝিলের উপর কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতুর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। সূর্য্যদেব আজ প্রাতেই কোমল রশ্মিতে নির্ম্মল আকাশ, উচ্চ বৃক্ষের পল্লবদল, অট্টালিকার কাচদ্বার, শ্বেত শতদল, রাঙ্গা পদ্ম, রাঙ্গা জবা, শেফালিকা, কৃষ্ণচূড়া, হাস্যমুখী স্বামিসোহাগিনী সূর্য্যমণি, নানাজাতীয় গোলাব, নবদূর্ব্বাদল, জলজপুষ্প উজ্জ্বল করিয়াছেন। বর্ষা শেষ হইল, এমনি বোধ হইতেছে, কারণ, বায়ুতে হীমানুভব হইতেছে ও দূর্ব্বাদলে শিশিরবিন্দু দেখা যাইতেছে। প্রিয় ভৃত্য ভৈরব আশুতোষবাবুর মাথার উপর রাঙ্গা সাটিনের ছাতাটি হেলাইয়া ধরিয়াছে, ঝালর ঝলমল করিতেছে, আশুতোষ বাবু একটি ক্ষুদ্র কাঁচি হস্তে ইতস্তত: বৃক্ষপরিদর্শনে যথার্থ প্রভুশ্রী ধারণ করিয়া পাদচালনা করিতেছেন ও কর্ত্তব্যবিমূঢ় মালিগণ আসিলে যে কয়েকটি কথা কহিবেন তাহা ভাবিতেছেন। ইত্যবসরে খঞ্জভীমকে বাগানের লম্বমান পথে আসিতে দেখা গেল। আমি বৈঠকখানার একটী গবাক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছি। শনৈঃ শনৈঃ তালে তালে খঞ্জপদ চালাইয়া বাবুমহাশয়ের সম্মুখে আসিলেন ও নমস্কার করিলেন।

"কি হে ভীমচন্দ্র" বলিয়া আশুতোষবাবু সম্ভাষণ করিয়া তাহার দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া আবার কহিলেন "এত চঞ্চলচিত্ত, মলিন মুখ কেন ?"

খঞ্জভীম কহিলেন, মনের কথা কখন আপনাকে কহিতে ভীত নহি। আমার ধর্ম্মনীতি সমুদয় মহাশয় পরিজ্ঞাত। "ব্রাহ্মধর্ম্ম" অবলম্বন করিয়া আমার জাতিভেদের প্রতি যে বড় ভক্তি নাই, তাহাও মহাশয় জানেন, আমি যে সুন্দরী গোপিনীতে অনুরক্ত তাহাও মহাশয় শুনিয়া থাকিবেন। তাহার সুনীতি ও সতীত্ব রক্ষা হেতু আমি তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত। তাহার জন্মদাতা কনৌজিয়া শুদ্ধ ব্রাহ্মণ। তাহার নিজের প্রকৃতি বিশুদ্ধ। এখন কিশোরী সুন্দরী গোপিনী সদ্যোজাত বনকুসুমের স্বরূপা পবিত্র নির্ম্মলা। কি কহিব ! দেওয়ানজী মহাশয়ের ষড়যন্ত্রে সেই সুন্দরী গৃহত্যাগিনী হইয়া যবনধর্ম্মানুসারী নাজির সাহেবের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। অবশেষে লোভপরায়ণা হইয়া ভ্রষ্টা হইবার সম্ভাবনা, অতএব আমার পরিণয়ের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত দেখিতেছি। শেষোক্ত কথাগুলি কহিতে কহিতে খঞ্জভীমের চক্ষে জল আসিল।

আশুতোষবাবু ভাবিলেন এ একপ্রকার বায়ুগ্রস্ত লোক। এবং ঝিয়ে পাগলা শীতু ক্ষেপাকে স্মরণ করিয়া কহিলেন এ বিবাহের ফল কি ?

খঞ্জ ভীমচাঁদ উত্তর দিলেন, আমার অতি আনন্দের শুভদিন যে, মহাশয়ের মত মহদভিপ্রায় মহাজন এ কথার জিজ্ঞাসু হইলেন ? কিন্তু এই আক্ষেপই ত নিতান্ত শোচনীয় যে, আপনারা একবার দেখেন না যে, জাতিভেদে কি অনিষ্টপাত

হইতেছে, পরিশুদ্ধ প্রীতির পথে কি কণ্টক রোপিত হইয়াছে—আমাদের ইংরেজি পুস্তকে একটি কথা রহিয়াছে "সুশিক্ষা হইতে সুদৃষ্টান্ত ভাল।" আমি বলি কুলীন কন্যাপেক্ষা বিধবা কন্যাবিবাহ করা ভাল, তাহা করিলে কত উন্নতি লাভ হইতে পারে।—আমায় বাঙ্গাল বলুন আর যাহাই বলুন তবু আমারা সভ্য—ব্রাহ্মসমাজ করেছি, বিধবা ভাত্রবধুর বিবাহ দিয়াছি, আমরা দেশের ভদ্র স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া সাহেবদের সঙ্গে খানা খাইয়াছি, কতবার সভ্যতার পরিচয় দিয়াছি, এখন আবার আর একটি শ্রেয়স্কর দৃষ্টান্ত সকলকে দেখাইব। জাতিভেদ যে মন্দ তাহা কেবল মুখে না কহিয়া এক্ষণে কার্য্যে তাহার অসারতা দেখাইব এবং আশা করি আমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অপরে উৎসাহিত হইবে। কেবল রিফরমার কথায় হয় না!

আশুতোষবাবু কহিলেন, শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও দেশাচারবিরুদ্ধ কার্য্য হঠাৎ করা কি ভাল? চরম ফল কি হইবে?

"মহাশয় এ কার্য্য প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়, তাহা হইলে শাস্ত্রবিরুদ্ধও নয়। শাস্ত্র, শাস্ত্র কি? আপনি যা চালাইবেন তাই চলিবে, আপনার বাক্যই শাস্ত্র—আপনি কি বৈষ্ণবীর সহিত গরিব ব্রাহ্মণের বিবাহ দেন নাই? আবার তাহাকে জাতিতে তুলেন নাই? আপনি চালাইলে সকলই চলিতে পারে, মহাশয় পতিতপাবন।"

আশুতোষবাবু কহিলেন, এ কথা বিবেচনাধীন, সুন্দরীর কি বিপদ?

খণ্ডভীম নিম্নস্বরে আশুতোষবাবুকে কি কথা কহিলেন, শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু বাক্য সমাপ্ত হইবামাত্র মুন্সির নিকট কি এক আদেশ লইয়া এক হরকরা দ্রুতপদে চলিল। এদিকে তর্কালঙ্কার মহাশয় ও রঘুবীর আসিয়া উপস্থিত হইল। তর্কালঙ্কার মহাশয় কাশীর নস্য প্রচুর রূপে প্রশস্ত নাসারন্ধ্রে যেন জোড়া নলী বন্দুকে বারুদ ঠাশিতেছেন, মধ্যতর্জ্জনীর অর্দ্ধেক প্রবেশ করিতেছে অথচ নস্য তেজোহীন হইয়াছে, বর্ষায় জলসিক্ত হইয়াছে কহিতেছেন।

রঘুবীর একটি শুভ্র রেকাবিতে শুভ্র রুমাল ঝাপিয়া কি দ্রব্য হস্তে বাবুজি মহাশয়ের পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া সসম্মান মূর্ত্তি স্থিরভাবে দাঁড়াইল। দ্রব্যগুলি কি আমি জানিতাম, আমি স্বস্থান হইতে আরও অন্ধকার স্থানে লুক্কায়িত হইলাম।

আশুতোষবাবু প্রথমতঃ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বর্ণশঙ্করের বিবাহ কতদূর শুদ্ধ বা অশুদ্ধ তাহারই বিধান জিজ্ঞাসা করিলেন। তর্কালঙ্কার তদুত্তরে বিশুদ্ধ জাতির সহিত বিশুদ্ধ জাতির বিবাহ ভিন্ন অপর সমস্ত বিবাহ পশুবৎ বা পৈশাচিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। আশুতোষ বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন শাস্ত্র সকল অনুসন্ধান করিলে কোন্ বিষয়ের বিধান প্রাপ্তি না হয়? রঘুবীর কহিয়া উঠিল হুজুর, বড় দেওয়ানি আদালতের সেরেস্তা

আর এ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুঁথি কামধেনু, আমার মোকদ্দমায় বড় উকীল সাহেব রকম বেরকম আইন বাহির করে আমায় খালাস দিলেন, সুগন্ধি বাবুও ষ্টম্বর কাগজে খুব মোসাবেদা করেছিলেন। সাহেব শুনিলেন আর কহিলেন রঘু নির্দ্দোষী খালাস। বাবাঠাকুর মাষ্টার বাবুকে উদ্ধার করিবেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় কহিলেন "হতে পারে—অনেক বিষয়ই যুক্তির উপর নির্ভর।"

রঘু কহিল, "আর দক্ষিণার উপর।" তর্কালঙ্কার মহাশয় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন ও চর্ম্মপাদুকা গ্রহণ করিতেছিলেন কিন্তু নাসের শম্বুক ভূমে পতিত হওয়ায় নস্য ছড়াছড়িতে বস্ত্র তাম্রবর্ণ হইল।

আশুবাবু তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বিধানানুসন্ধান করিতে আদেশ দিলেন ও রঘুর দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ভূমে একটি থালি রাখিয়া রঘুবীর নজর দান করিল।

আশু। এ কি?

রঘু। মোকর্দ্দমা জিতে ঘরে আসিয়াছি। প্রভুর জন্য যৎকিঞ্চিৎ নজর আনিয়াছি। ফল মাত্র—

ভৈরব রুমাল উঠাইল ও কহিল এই তোমার এলাইচ দানা—আর বেদানা! এদিকে ঢাকুনী উঠাইতেই রেকাবের একাংশ হইতে ফর ফর করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত শত কাচপোকা থালা হইতে উড়িয়া গেল আর এক পাশে বিলাতী ঘেটু বৃক্ষের নব নব রাঙ্গা কুসুমগুলি মাত্র রহিল।

আ। এ কি?

রঘু। এ ঘেটু ফুল আর কাচপোকা অনেক যত্নে জমা করিয়াছিলাম, প্রভু, পোকা গুলি মারিয়া আনিয়াছিলাম বাতাসে বাঁচিয়া উঠিল।

আ। এ কি তামাসা?

রঘু। আজ্ঞা না, উভয় দ্রব্যই ত হুজুরের প্রিয়। এই বিলাতী ঘেটু ফুল যাহাকে হুজুর বেদানা কহেন। এ ক্ষুদ্র কাচপোকা যাহাকে বড় লোকে এলাইচ দানা বলেন।

আ। এ শিক্ষা তোরে কে দিলে?

র। জটাধারী। এখন হুজুরের মর্জ্জি হয় ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের টোলে পাঠাইয়া দিই। এত পক্কায় নয় ইহার কোন দোষ নাই।" বাবু মহাশয় ঈষৎ হাস্য করিলেন, এই সময় একজন অশ্বারোহী পুরুষ দড় বড় করিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীযুত মহাশয় একখানি পত্র পাইয়া পুনরায় তাহার হস্তে অর্পণ করিবা মাত্র অশ্বারোহী আবার বেগে উদ্যানের বৃহৎদ্বার হইয়া বহির্দ্দেশে ত্বরিত গমন করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বিয়ে পাগলা শীতু।

রমণা কাননের বৈঠকখানার হল কামরায় আশুবাবু বসিলেন। পাখা শন শন শব্দে দুলিতে লাগিল, সেই শব্দ বাহিরে ঝাউগাছের উচ্চ উচ্চ পত্রশীর্ষে সাঁও সাঁও শব্দের সহিত সংমিলিত, এক একবার বাতাসের ঢেউ কামরায় প্রবেশ করিয়া বেলওয়ারি লণ্ঠন ঝাড়, দেওয়ালগিরি আর গিল্ড লেম্পের স্ফাটিক ঝালরে সংস্পর্শনে সুমিষ্ট বাদ্যের তরঙ্গ উঠাইয়াছে, এই সময় ইঙ্গিত মাত্র একটী ভৃত্য বিলাতী বাজার বক্সের কল ঘুরাইল, অমনি সুমিষ্ট বাদ্যতরঙ্গ ঝলকে ঝলকে কর্ণ-কুহর পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। পাখার শন শন, ঝাড় লণ্ঠনের ঠনঠন, ও আরগিনের সঙ্গীত মিলিয়া এক সুমিষ্ট রাগিণী উত্থিত হইল। সকলেই কিঞ্চিৎকাল নিস্তব্ধ, এমন সময় দূরে ঝিলের উপর কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতুর রেলে ঠেস দিয়া শীতু ক্ষেপা সুকণ্ঠ হইতে একটি গ্রাম্য গীত ছাড়িয়া দিল।

অতিসামান্য গীত—কিন্তু সময় গুণে মিষ্ট লাগিল,

> সদা, ববম্, ববম্, ববম্, বাজায় ভোলা গাল।
> ভাঙে ভোর নেশায় ঘোর
> আবার ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ বলে শিঙে,
> ডম্বুরেতে ধরে তাল॥
> আজ আমাদের কি আনন্দ, নৃত্য করে সদানন্দ,
> সদানন্দের সঙ্গে আবার নাচে তাল বেতাল।
> সুরধুনীর শুনে ধ্বনি
> আমাদের নৃত্য করে মহাকাল॥

গীতটি শিখ্‌তে হবে, কারণ জটাধারীর একটী গোপনীয় আখড়া ও সংগীতের দল ছিল। এই মনে করে ফেরতা গাইতে আরম্ভ কালে, পাশের একটি দ্বার দিয়া বৃক্ষ তল হইয়া এক দৌড়ে সেতুর নিকট উপস্থিত। শীতু ঠাকুর গানে মত্ত, আমি আশে পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, তাঁহার গানেই মন, দুইবার গীত গাওয়া হইল, আমি কহিলাম, "শিখেছি শীতু খুড়।" ক্ষেপা উত্তর করিলেন, "কি ভাই!" আমি কহিলাম, খুড়ীর ঠিকানা হইয়াছে, বাবুমহাশয় কহিতেছিলেন যে আগামী অগ্রহায়ণ মাসেই তোমার শুভবিবাহ নির্ব্বাহ হইবে—আজ আপনার গানে বড় সুখী হইয়াছেন। আমার শেষ কথা উচ্চারিত না হইতেই শীতুঠাকুর আবার গান

করিতে উদ্যত। আমি এমন সময় কহিয়া উঠিলাম, আপনি সকল গুণসমন্বিত— কেবল বর সাজতে হবে কি না,—এক পদের রসাবাতটী—আরাম করা আবশ্যক।

শীতু। আর বাবা চুলগুলি যে পাকিয়াছে, তার ঔষধ জানিস্? তোমরা যে ইংরেজী পড়ছ, ইংরেজীতে অনেক ঔষধ আছে যে শুনি ভাই। আমি কহিলাম ডাক্তারবাবু আমায় বড় ভাল বাসেন, তা সব আরাম করে দেওয়া যাইবে, কেশ কাল হইবে, পদদ্বয় স্বাভাবিক ভঙ্গী পাইবে—দাঁত? সব আছে না?

শীতু। বাবা সব আছে, কেবল কসের আটটী গিয়াছে আর সম্মুখের নিম্ন-পাটিতে একটিও নাই।

"এখন যে দাঁত তৈয়ার হতেছে।"

মনে মনে কহিলাম, বনপাশের কর্ম্মকার ভিন্ন ও কোদালিদন্ত সংস্কার হওয়া কঠিন।

শীতু আবার কহিলেন, তা বাবা ইংরেজ সব পারে, বিবাহের পণ উঠে যাবে না? বাবা চক্ষুদুটি ত আছে?

"পদ্ম চক্ষু" (প্রকৃতার্থে শুগলিগপ্তিত।) "আবার মহাশয়ের নাকটি যথার্থই বাঁশী বলিলেও হয়: ইংরেজী "হাওইট্জার" আখ্যাধারী ডবল তোপ বিনিন্দিত বলা যাইতে পারে।"

শীতু। দেখ্তে ভাল?

"ভাল বৈ কি। আয়নাতে মুখ দেখেন নাই? মহাশয়, পরকালে আপনি যথার্থই লক্ষ গোদান করিয়াছিলেন, বক্ষদেশ, পৃষ্ঠদেশ সমলোমাকীর্ণ ঐ সৎপুরুষের প্রকৃত লক্ষণ। কেশ কাল করা ও পায়ের ফুলটুকু আরাম করা আমার ভার, টাকার কি খুড় মহাশয়?"

শীতু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তারও কি ভাবনা ছিল, বাবা, গজানন অধঃপাতে যাক! বার বার বিঘা ব্রহ্মত্তর সেই কুচক্রী রাহু এক কলমে গ্রাস করিল, বাজাপ্ত করে নিলে, তা না হলে আর কিসের অভাব।" আমি কহিলাম, "সে গজানন তোমার অভিসম্পাতেই মরবে।"

শীতু কহিলেন, "তার মরণ আছে? মলে ব্রহ্মস্ব হরণ কে করবে—সে অন্ধ হয়ে পাপ ভোগ করবে।" আমি কহিলাম, "বৃথা কথার সময় নাই, উদ্যোগ কি আছে—"

"তোমার পিতৃপ্রসাদে আমি নিঃসম্বল নই, যখন মোকর্দ্দামা হয়, জেলায় গেছ্লাম, দুইরকমই গান অভ্যাস করেছিলাম, দুই দলেই গেয়েছি,—দুই দলেই টাকা লয়েছি, যার কাছে যেমন তার কাছে তেমন—এই দেখ কোমরে গেঁজে, এখন কিছু টাকা নগদ মজুত আছে, আর নাখেরাজ পুষ্করিণীর অর্দ্ধেক অংশ আছে তাহা

বন্ধক দিব, আবার বিবাহ করি, স্থিতি হই—আমার বগলে এই কাগজের তাড়া দেখ্‌ছ ? দলীল দস্তাবেজ সব প্রস্তুত, আমি কি ব্রহ্মত্তর বৃথা ত্যাগ কর্‌ব ! আবার মোকর্দ্দমা আরম্ভ কর্‌ব, ডিক্রি হাঁসিল কর্‌ব, বাঁশগাড়ী করে, খরচা আদায় করে তবে ছাড়্‌ব, ওটাকে তবে ছাড়্‌ব, তবে দেখ্‌বে শীতু শর্ম্মা ! ব্রাহ্মণ ঔরসজাত ! তবে দেখ্‌বে শীতুক্ষেপা ! হতভাগার এতই লোভ—" কহিতে স্বর কম্পিত হইল, শীতুঠাকুরের কোন হৃদয়গত গুপ্ত ক্রোধবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল ও বগল হইতে একটি বস্ত্র প্রলোপিত কাগজের নথী বাহির করিয়া কহিলেন, "এই দেখ, মোহর দস্তখত, মহারাজ রাজচন্দ্রের ছাড়, এই দেখ পরওয়ানা ফয়সালা কি নাই ? এই জজ সাহেবের মোহর দস্তখত—"। আমি কহিলাম, খুড়ো একবার যে কলিকাতা পর্য্যন্ত মোকর্দ্দামা করিলে, কোথাও জিত ত হল না।

শী। হবে কিসে, সব সত্য ত মিথ্যে করে দিলে, আইন আদালত কি জন্য বাবা ! ছেঁড়া কাপড়ের জন্য, মাটাপালামের জন্য, ভিক্ষুকেব রক্ষা জন্য, না সামলার পাগড়ি, রেসমের চাপকান, সোণার চেনেব শ্রীবৃদ্ধিজন্য স্থাপিত হয়েছে বাবা ? যা হোক্‌ এবার পাঁপর কব্‌ব। উকীল বাবু বলেছেন সীমানা ফেবফার করে দিলে আবাব মোকর্দ্দামা চলবে।

জ। খুড়ো, আগে মোকর্দ্দামা না আগে বিবাহ ?

শী। আগে সংসারটা বজায় করি, গৃহী হই।

আমি। আব কি কখন গৃহ হও নাই।

শীতু খুড়া হাসিয়া কহিলেন, "লোকে বলে আমার বাবার বিয়ে হয়েছিল কি না সন্দেহ। আহার আভরণেব যা সংস্থান ছিল, পোড়া দেওয়ানজি তা সকল নৈরাশ করিল, বিবাহের চিন্তা কি ছিল ?"

"ফলে এখন পিণ্ডের উপায় কবা উচিত হয়েছে ; চল ঔষধ দিইগে।" এই কথা কহিয়া শীতু ঠাকুবকে ঝিলের মধ্যস্থিত উপদ্বীপে একটি ক্ষুদ্র গৃহে আনিলাম, তথায় তাঁহাকে তৈল মাখাইয়া তাহার উপর এখানে সেখানে শিমুল তুলা বসাইয়া ঔষধ দিলাম।

একদিকে অর্থপ্রিয়, মোকর্দ্দামা ব্যবসায়ী আর এক দিকে লোভী বিষয়ীর প্রাদুর্ভাবে দেশ বিদেশে এমন কত ক্ষেপা ক্ষেপিয়াছে ! আমার শীতুঠাকুরের মূর্ত্তি দেখিয়া হাসি সম্বরণ করা দুষ্কর হইল। আমি কহিলাম, খুড় চল, গীত গাইতে গাইতে বাবুর নিকট চল।

শীতু রামপ্রসাদী সুরে গীত আরম্ভ করিলেন—

"ক্ষেপা ক্ষেপা বলে, সবে, কিসের ক্ষেপা কেবা জানে।
আমার উকীল চাঁদে মজালে ভাই, আকাশের চাঁদ হাতে এনে॥
সেটেমে ফুরাল টাকা, চিরকুটের দাম হাজার টাকা।
ফিরেতে ফকির, শেষে, ভিটে নিলে মহাজনে॥
বাকি জমী যে ক কাঠা, সব নিলে গজানন বেটা।
এখন সম্বলমাত্র এই দলিল কটা, সুবিচারের গুণ বাখানে॥"

গাইতে গাইতে শীতু বৈঠকখানার হল কামরায় উপস্থিত। ভৈরব খানসামা কহিয়া উঠিল, "কি বিটকেল।" শীতু যতদূর পাবিলেন উপরপাটির দংষ্ট্রা নির্গত করিয়া ভৈরবের মাথার উপর দুইবার, কি বিটকেল! কি বিটকেল! কহিলে, ভৈরব ভীত হইয়া কহিল, "মনিকারের ঘরে গিয়াছিলাম, ভাল মুকুটের ফরমাইস দিয়াছি।" যেন চকিতে মেঘাস্ত-শশীর উদয়। শীতু হাস্য করিলেন ও চর্ম্মের ক্ষুদ্র থলি হইতে এক গুলি গঞ্জিকা ভৈববকে হাসিতে হাসিতে অর্পণ করিলেন।

আশুতোষ বাবু· শীতুঠাকুরের উভয় পাদার্দ্ধ তৈল তুলায় রঞ্জিত দেখিয়া শীতুকে কহিলেন, কি হে শীতলচাঁদ, এ যে নায়কের বেশ।

শীতু কহিলেন, কন্যা স্থির করিয়াছি?

আশুবাবু কহিলেন, কোথায়?

শী। মহাশয়! সুন্দরী গোপিনীকে আমার মনোনীত, কাল সেই পথে আসিতেছিলাম, সে স্নান করিয়া কেশমুক্ত করিয়া একটী ক্ষুদ্র পূর্ণ কলসী কক্ষে লইয়া বক্ষঃ ঈষৎ বাঁকাইয়া, ঘবমুখে আসিতেছে আমি তার অনুসারী হলেম, তাদের ঘরে গেলাম—তার মা সাহেবিনী গোপিনীকে বলিলাম, আমায় জামাই করতে হবে, সে বল্‌লে কি দিবে? আমি কোন কথা না কয়ে গেঁজে খুলিলাম। ডবল টাকা দুই হাতে দিয়া বায়না করিয়া আসিলাম।

কথা শুনিয়া খঞ্জভীম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। মনে করিলেন, হাতে ধন আসিতে আসিতে পথেই মারা যায়। প্রকাশ্যে কহিলেন, "মহাশয় কেমন কথা! উনি যথার্থই কি পাগল—আপনি কর্ত্তা এর সৎবিচার আপনার নিকট; আমার অনেক কালের দাবি, বোধ করি সুন্দরীকে জিজ্ঞাসিলে সে আমারই প্রিয়া প্রকাশ পাইবে। আমার উদ্দেশ্য "রিফরমেসন" ইহাও মহাশয় জ্ঞাত আছেন।"

আশুতোষ বাবু কহিলেন ইহার সৎমীমাংসা সত্বরই হইবে। এমন সময় গজানন আসিয়া উপস্থিত। খঞ্জভীমের সাক্ষাৎ তেলে বেগুণে দেখা দেখির মত। খঞ্জভীম ঠিকুরে চলিয়া গেলেন। শীতুকে গজানন কহিলেন, কি খুড়!

শীতু। এ নাগর বেশ!

গ। মোকর্দ্দমা করবে?

শী। মোকর্দ্দমা করবে ! তুমি জমিগুলি ফাঁকি দিবে ?

গ। যেদিন কণের মায়ের নিকট জামাইয়ের আদর পাবে, সে দিন খুড়ো জমি লবার মর্ম্ম জানবে। শীতুর হাত ধরিয়া গজানন অন্য কামরায় লইয়া গেলেন। দুজনে একটি "নিরালা" মজলিস করিলেন।

গ। বলি বেশ কথা বাবা, এত বেশ কথা। সুন্দরীই স্থির ও ভীমাটাকে আমি ভাগাব, তোমার যে জমি লইয়াছি, তাহার মর্ম্ম আছে ; দোহাই ভগবান্। দোহাই রঘুবীর ! তুমি আশুতোষ বাবুকে কোন কথা বলো না, সেই জমি পাঁচ বৎসরের জন্য বন্ধ থেকে পণের আড়াইশ টাকা প্রস্তুত করেছি। বাবা আড়াই, আড়াই শ টাকা পণের টাকা, পণের ?

শীত। ভালারে মোব ভাইপো। গজু তোমার নিত্য শ্রীবৃদ্ধি হক। পরক্ষণেই আবার শীতু গীত গাইতে গাইতে চলিয়া গেল।

চলি চলি পা পা
ঘুরে গজুর চাকা,
সংসারটা চলে
গজাননের কলে,
মন জ্বলে দাবানলে
(গজুর) প্রাণ ঠাণ্ডা নগদ পেলে।
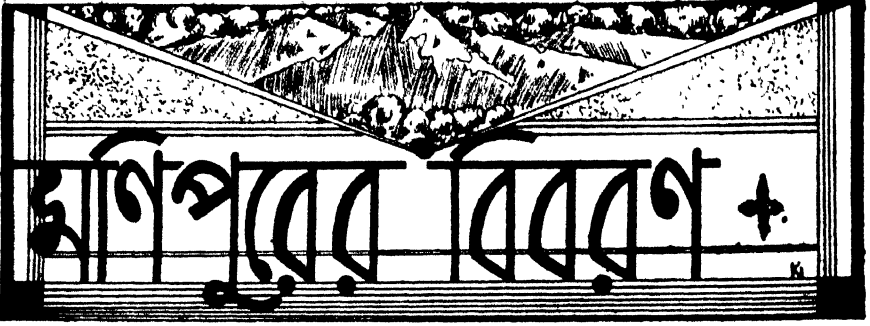
দ্বিতীয় প্রস্তাব

ইতিহাস

প্রাচীনকালে কামরূপেশ্বর পূর্ব্ব ভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশে সম্রাট্ নামে অভিহিত হইতেন। সে সময় মণিপুর নিতান্ত অপরিচিত ছিল। কালে প্রাগ্জ্যোতিষপুরের ভুজগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া আসিলে, ত্রিপুরেশ্বর মস্তকোত্তোলন করিলেন। আসামের তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে, আরাকান, ব্রহ্মপুত্র (মেঘনা) হইতে, ঐরাবতীতীর তাঁহার "ধবল ছত্রের" ছায়ায় আচ্ছাদিত হইল। তৎকালে মণিপুর উপত্যকা মৈরাং, খোমান, আঙম ও লোয়াং এই চারিটী স্বতন্ত্র জাতীয় রাজ্যে বিভক্ত ছিল আত্মকলহে ত্রিপুরার অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। করদনৃপ মণ্ডলী, সময় বুঝিয়া স্বাধীনতার স্বর্গীয় সুখ লাভে যত্নবান্ হইলেন। দীর্ঘকাল বিরোধের পর পূর্ব্বোক্ত চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সম্মিলিত হইয়া পৃথক্ এক রাজ্য সংস্থাপিত হইল।* তাহারই প্রকৃত নাম "মিতাই লেইপাক"।† "ধর্ম্ম-প্রচারক" অধিকারীদিগের কৃপায় অনতি প্রাচীন নাম মণিপুর হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র রাজ্য চতুষ্টয়ের সম্মিলনকাল, সার্দ্ধদ্বিশত বৎসরের অধিক হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

---

* বোধ হয় এই চারিটী রাজ্যের অধিবাসিগণ "কুকি" ও "নাগা" জাতীয় ছিল। কাছার প্রদেশে প্রচলিত প্রবাদ অবলম্বন করিয়া এণ্ডার্সন সাহেব লিখিয়াছেন—"There (*Maniporis*) origin is ascribed by tradition to the union of two powerful tribes, one *Naga* and the other *Kooki* which had for a long time contended for the fertile valley of Manipore—"History and Statistics of the Dacca Division. page 331.

† মিতাই অর্থ মিশ্রজাতি; লেইপাক অর্থ ভূমি। ইহার যৌগিক অর্থ "মিতাই ভূমি" বা "মিতাই দেশ।"

মণিপুরপতি ক্রমে সাংপো ১, কাপোই ২, কোরেং ৩, লুহুপ্পা ৪, চামকো ৫, খাইরো ৬ ও তাংখোল * ৭ প্রভৃতি উপত্যকার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বতীয় ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি জয় করিয়া মণিপুরের সীমা বিস্তার করিলেন। বিজিত রাজ্যের প্রজাদিগের সহিত উপত্যকাবাসীদিগের সকল বিষয়ে সংপূর্ণ প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। উপত্যকাবাসীগণ "মিতাই" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বিজিত পার্ব্বত্য মানবগণ "হাও" † নামে পরিচিত।

মণিপুরের পূর্ব্ব সীমা জামডুঙ্গ্ পর্ব্বত ‡ পশ্চিমে কাছার, উত্তর সীমা নাগাপর্ব্বত দক্ষিণসীমা লুসাই প্রদেশ। ইহার উত্তর দক্ষিণসীমা লুসাই প্রদেশ। ইহার উত্তর দক্ষিণ দৈর্ঘ্য ১২৫ মাইল, পূর্ব্ব পশ্চিমে পরিসর ৯০ মাইল। পরিমাণ ফল ৭৫৮৪ বর্গ মাইল। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ হইবে। §

মণিপুরীয়গণ মধ্যমাকার, সবলশরীর, সমরপ্রিয়, অহঙ্কারী ও পরজাতি-বিদ্বেষ্টা। কিন্তু বাহ্যাকৃতি দর্শনে ইহাদিগকে শান্তপ্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়। উপত্যকাবাসী মিতাইগণ বাঙ্গালিদিগের ন্যায় গো মহিষাদি দ্বারা হাল চাষ করে, পর্ব্বতবাসী হাওগণ অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতির ন্যায় "জুম" $ কৃষি। মণিপুরে ধান্য

* তাংখোল তিনভাগে বিভক্ত, যথা উত্তর দক্ষিণ ও মধ্য তাংখোল। ইহাদের পরস্পর ভাষার প্রভেদ আছে। (See Jorn B A. Society vol. VI page 1028).

† হাও অর্থ নাগা কুকি প্রভৃতি।

‡ নিংথি নদী মণিপুরের পূর্ব্বসীমা অবধারিত ছিল। কিন্তু "য়ান্দাবুর" সন্ধিতে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মরাজের মনস্তুষ্টি জন্য জামডুঙ্গ্ পর্ব্বত মণিপুরের পূর্ব্ব সীমা অবধারিত করিয়া দিয়াছেন এবং মণিপুরের এই ক্ষতিপূরণ স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট মণিপুরপতিকে বার্ষিক ছয় সহস্র টাকা দান করিয়া থাকেন। See Aitchison's Treaties vol. I. page 121.

§ মণিপুরের পরিমাণ কোন কোন স্থলে ১৯৬৪ বর্গ মাইল লিখিত আছে। এচিসন সাহেব মণিপুরের লোকসংখ্যা ৭৪৮৪০ লিখিয়াছেন। মণ্টগোমেরি মার্টিন সাহেব দুইটি মণিপুরের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি Munnipoor. ও অপরটী Monipoor লিখিয়াছেন। বোধ হয় একটি মিতাইভূমি বা মণিপুর উপত্যকা। অপরটী পার্ব্বত্যপ্রদেশ সম্মিলিত মণিপুর রাজ্য। মার্টিন সাহেব প্রথমোক্তটীর দৈর্ঘ্য ৪০ মাইল ও পরিসর ৩০ মাইল লিখিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে উপত্যকাটি এতাধিক বিস্তৃত হইবে না। See History, Antipuities, Topography and statistics of Eastern India by Montgomery Martin. Vol. III. page 640 and 664.

$ জুম কৃষিকার্য্যপ্রণালী (রাজমালবা) ত্রিপুরার ইতিবৃত্তে বিস্তারিত বিবৃত হইয়াছে। (ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত ৪৮, ৫০ পৃষ্ঠা) ১২৮১ বঙ্গাব্দের ৩য় সংখ্যক বঙ্গদর্শনে কবিবর বাবু নবীন চন্দ্র সেন "জুমিয়া জীবন" নামে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহার শীর্ষভাগে জুমকৃষীর কার্য্যপ্রণালী লিখিত আছে।

কলাই, মুগ, খেসারি, ইক্ষু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। সিখং ও নিয়েংল উপত্যকায় লবণ জন্মে। থারকোল ও লৈতাং নগরে রেসমের কারখানা আছে। মণিপুরীয়গণ প্রায়ই স্ব স্ব গৃহনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করে। মিতাই মহিলাগণ শিল্পকার্য্যে বিলক্ষণ পটু।*

মণিপুরীয় গো, মহিষ আমাদের দেশীয় গো মহিষাপেক্ষা বড়। অশ্বগুলি খর্ব্বকায় সুশ্রী ও শ্রমসহিষ্ণু। হস্তীগুলিও সুন্দর বটে। তত্রত্য গৃহপালিত পশুর মধ্যে গো, মহিষ, অশ্ব হস্তী ও গবয়ই † প্রধান। মিতাইগণ অশ্বারোহণ বিদ্যায় বিশেষ সুশিক্ষিত। ইহারা অশ্বের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত।‡

ইমফাল তুরেল।§ তিকি প্রভৃতি কতকগুলি নদী মণিপুরের উত্তর পূর্ব্ব দিকৃস্থ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, উপত্যকার মধ্য দিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। ইরং বড়াক বা বড়চক্র ঐ পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত হইয়া মণিপুরের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইতেছে।

রাজকীয় ঘটনা

মণিপুরীয়গণ বলে,—"গুরুসিদাবা" দেব মানবের অধিপতি। তিনি মৃত্যুঞ্জয়। তাঁহার পত্নী "লেইম্রেন সিদাবী।" তাঁহাদের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ "সানামাহি" কনিষ্ঠ "পাখংবা"। পাখংবা নাগকুলের ঈশ্বর। কনিষ্ঠ পুত্র পিতার পরম স্নেহ-

---

* আমাদের ঘরের লক্ষ্মীদের মত মিতাই মহিলাগণ পায় উপর পা তুলিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। তাহাদিগকে পতির সহিত ভাগাভাগিতে কাজ করিতে হয়। "আচার ব্যবহার" নামক প্রস্তাবে এই সকল বিষয় বিবৃত হইবে।

† গবয়, গো ও মহিষের সাদৃশ্য বিশিষ্ট জন্তু; চট্টগ্রাম ত্রিপুরা, কাছার, ও মণিপুর পার্ব্বত্যপ্রদেশে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। যুবরাজ "প্রিন্স অব ওয়েল্‌স"-কে ত্রিপুরার মহারাজ তাহাকে একটি গবয়বৎস উপহার দিয়াছিলেন। তাহা অদ্যাপি "জুলজিকেল গার্ডেনে" আছে।

‡ এডগার সাহেব লিখিয়াছেন যে মণিপুরীয়গণ অশ্বক্রয়ের জন্য সময়ে সময়ে প্রাণপ্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীকেও বিক্রয় করিয়া থাকে। See History and Statistics of Dacca Division page 331. অশ্বক্রয়ের জন্য স্ত্রী বিক্রয় সম্বন্ধে আমরা কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রী বিক্রয় বন্ধক ও দান করার প্রথা প্রচলিত আছে। "আচার ব্যবহার" প্রস্তাবে এই সকল বিশদরূপে লিখিত হইবে।

§ ইমফালতুরেলকে বৈদেশিকগণ "মণিপুর নদী" বলেন। ইহার তীরে রাজধানী মণিপুর নগর অবস্থিত। কোন কোন ইংরেজি লেখক এই নদীকে "Nankatha khyaung River" লিখিয়াছেন।

ভাজন ছিলেন। এই জন্য গুরুসিদাবা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অতিক্রম করিয়া তাহার হস্তে মিতাই ভূমির আধিপত্য সমর্পণ করেন।

পাখংবার উত্তর পুরুষ চেরাইরংবা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মণিপুর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তাঁহার রাজ্যশাসন সময়ে "সামজুক" * রাজমিতাই দেশ আক্রমণ করেন। চেরাইরংবা ও তাঁহার পুত্রের বাহুবলে আক্রমণকারী পরাভূত হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধবৃত্তান্ত মণিপুরীয়গণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সেই গ্রন্থের নাম "সানজুকঙাম্বা" † অর্থাৎ সামজুক বিজয়। এই হস্তলিখিত গ্রন্থ ৭২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

১৭১৪ খৃষ্টাব্দে চেরাইরংবা জীবলীলা সংবরণ করিলে তস্য পুত্র "পাযহেইবা" রাজ্যভার গ্রহণ করেন। মণিপুরীয়গণ সচরাচর পাযহেইবাকে "গরিম-নওয়াজ" বা "করি-করিম-নওয়াজ" বলিয়া থাকে। গরিম-নওয়াজ ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধর্ম্মমাণিকের‡ সমসাময়িক। ত্রিপুরার সীমান্তপ্রদেশ রক্ষার জন্য যে সকল সৈন্য ছিল, গরিম-নওয়াজ তাহাদিগের সহিত বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন।§ ঘোরতর সংগ্রামে ত্রিপুর সৈন্যজয় করিয়া, গরিম-নওয়াজ "তাখেল্ঙাম্বা" বা ত্রিপুরাজয়ী উপাধি ধারণ করিলেন। কতিপয় ত্রিপুরসৈন্য পরাজয় করিয়া মণিপুরীয়দিগের যে গর্ব্ব হইয়াছিল ১৬০ $ বৎসর অতীত হইল অদ্যাপি তাহাদিগের সেই অভিমান অন্তরিত হয় নাই। স্বজাতীয় বীরত্বের চিহ্ন প্রদর্শন করিতে হইলেই তাহারা "তাখেলঙাম্বার" নাম উল্লেখ করে। এই সামরিক ঘটনাগুলি একখণ্ড পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। তাখেল্ঙাম্বা গ্রন্থ ৯০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

তাংখোল প্রভৃতি ৭টী ক্ষুদ্র রাজ্যের নাম পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অধিকাংশই ত্রিপুরার অধীন ছিল। এই যুদ্ধ দ্বারা সে সকল মণিপুরের কুক্ষিগত হইয়াছে। গরিম-নওয়াজ ব্রহ্মরাজ্য আক্রমণ করিয়া কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ

---

* সামজুক রাজ্য মণিপুরের দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত। আধুনা ইহা ব্রহ্মরাজের অধীন।

† মণিপুরীয় শব্দগুলি বাঙ্গালা ভাষায় লেখা নিতান্ত কষ্টকর।

‡ ধর্ম্মমাণিক নিতান্ত দুর্ভাগ্য ছিলেন। যবনদিগের ক্রমাগত পাঁচ বৎসর চেষ্টার পর, তাঁহার রাজ্যশাসনসময়ে, মুসলমান সাম্রাজ্য ফেণি নদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

§ বোধ হয় এ সংগ্রামে কবিচন্দ্র ঘোষ ত্রিপুর সেনানায়ক ছিলেন।

$ কবিচন্দ্রের মণিপুর গমনকাল প্রথম প্রস্তাবে ১৬০ বৎসর নির্ণয় করা হইয়াছে। এস্থলে সেই সূত্রে ১৬০ বৎসর লেখা হয় নাই। ১৭১৪ হইতে ১৮৭৮ খৃঃঅব্দে গণনা দ্বারা ১৬০ বৎসর পাওয়া গিয়াছে।

করিয়াছিলেন ; কিন্তু বিজিত অংশে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই।*
গরিম নওয়াজের তিন পুত্র ছিল। সামসাই, উগত সাই, ও চিংতোমখোম্বা বা
ভাগ্যচন্দ্র। মধ্যম উগত পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করিয়া মণিপুর সর্পাসন
অধিকার করেন। ভগ্যচন্দ্র, দুর্দ্দান্ত অগ্রজের ভয়ে মণিপুর পরিত্যাগ করিয়া
"তুমু" † রাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। উগত অত্যন্ত প্রজাপীড়ক ছিলেন।
তাহার উৎপীড়নে প্রজাগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ভাগ্যচন্দ্র প্রজাবর্গের মানসিক
ভাব অবগত হইয়া তাহাদিগের সহিত যোগ দিলেন। সমবানল প্রজ্বলিত
হইয়া উঠিল। স্বীয় সৈনিকবর্গ দ্বারা অবাধ্য প্রজাবর্গকে দমন করিতে
না পাইয়া, অগত্যা উগতকে মণিপুর পরিত্যাগ করিয়া পালায়ন করিতে
হইল। ইত্যবসরে নাগবংশাবতংস যশস্বী ভাগ্যচন্দ্র নাগাসনে অধিরূঢ়
হইলেন।

ভাগ্যচন্দ্রের অমিত যত্নে মিতাইগণ এক্ষণে হিন্দুশ্রেণীতে আসন অধিকার
করিয়াছে। তাঁহারই অসাধারণ অধ্যবসায়ে মিতাইভাষা সজীব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।
মিতাইদিগের সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ তাঁহারই সময়ে লিখিত। ভাগ্যচন্দ্র শান্তিপ্রিয়
ছিলেন। তিনি প্রায় দেবারাধনায় জীবনযাপন করিয়াছেন। এই মহাত্মাই
মণিপুরে মনোহর রাসক্রীড়ার ‡ সৃষ্টি করেন। একমাত্র তাঁহার দ্বারাই মণিপুরের
আভ্যন্তরিক যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

ভাগ্যচন্দ্রের দুই পুত্র ছিল। গুরুশ্যাম ও জয়সিংহ। পিতার মৃত্যুর পর
জ্যেষ্ঠ গুরুশ্যাম রাজাসনে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি নামে রাজা ছিলেন
মাত্র। জয়সিংহই রাজ্যশাসন করিতেন। আবারাজ বারম্বার মণিপুর আক্রমণ
করিতেছিলেন। জয়সিংহ তাহাকে দমন করিতে অক্ষম হইয়া সাহায্যান্বেষণে
বহির্গত হইলেন। তিনি চট্টগ্রামস্থ পার্ব্বত্যনরাধিপদিগের নিকট সাহায্য
প্রার্থনা করিলেন; সরদারবর্গের অনুরোধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সহায়তা
করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর জয়সিংহের সহিত

---

* আবুল ফাজলের মতানুসরণ করিয়া মণ্টগোমেরি মার্টিন সাহেব কামরূপ সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা "মহা চীন" বা পিও সাম্রাজ্য অবধারিত করিয়াছেন। বোধ হয় এ সময়েও আবা প্রদেশ পিও সম্রাজ্যের অধীন ছিল। কারণ তখনও পিও রাজ বংশের ধ্বংসকারী বর্ত্তমান ব্রহ্মরাজ্যের স্থাপয়িতা প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীর আলমপ্রা রঙ্গভূমে আত্ম প্রকাশ করেন নাই।

† তুমুরাজ্য সামজুক রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

‡ রাসক্রীড়ার মনোহর চিত্রটি আমরা প্রস্তাবান্তরে পাঠকবর্গকে উপহার দিতে ইচ্ছা করি।

কোম্পানিবাহাদুরের সন্ধিবন্ধন হইল।* চট্টগ্রাম হইতে ভারলেষ্ট সাহেব ৩৭৫ জন পদাতিসৈন্যের সহিত পার্ব্বত্য ত্রিপুরার পশ্চিম প্রান্ত দিয়া কাছারের তদানীন্তন রাজধানী কশপুরে উপনীত হইলেন। সে সময় পার্ব্বত্যপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া মণিপুরে গমন করা নিতান্ত ক্লেশকর ছিল বলিয়া ইংরেজসৈন্য আপাততঃ কশপুরেই বিশ্রাম করিতে লাগিল। এমত সময় পশ্চিমবঙ্গে সমরানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। কালবশে আলিজা মিরকাসিমের সৌভাগ্যসূর্য্য ক্রমে অস্তগত হইতে চলিল। কলিকাতার কৌন্‌সেল ভারলেষ্টকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলে, তিনি অগত্যা জয়সিংহকে পরিত্যাগ করিয়া সসৈন্যে পশ্চিম বঙ্গে যাত্রা করিলেন।†

জয়সিংহ স্বদেশে উপনীত হইলে, গুরুশ্যাম ভ্রাতৃ-উপদেশানুসারে ইংরেজদিগের সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হইতে প্রতিশ্রুত হন। তিনি ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পূর্ব্বোক্ত সন্ধিপত্রে স্বীয় নাম স্বাক্ষর করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

ভ্রাতৃবিয়োগের পর জয়সিংহ প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর রাজ্যশাসন করেন। তাঁহার সাত পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রগণ মধ্যে মধুচন্দ্র, চৌরজিৎ, মারজিৎ ও গম্ভীরসিংহই বিখ্যাত। জয়সিংহ স্বীয় দুহিতাকে ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ রাজধর মাণিক্যের করে সমর্পণ করেন।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মধুচন্দ্র পৈতৃকাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি ভ্রাতৃবর্গের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত একপ্রকার নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অনুজদ্বয় চৌরজিৎ ও মারজিৎ তাঁহাকে সমরাঙ্গনে আহ্বান করিলেন। মারজিতের বাহুবলে মধুচন্দ্র সমরক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া পলায়নপর হইলেন। ভ্রাতৃবর্গমধ্যে মারজিৎই প্রকৃত যোদ্ধা ছিলেন। যুদ্ধান্তে ভক্ত ধার্ম্মিক চৌরজিৎ অনুজ মারজিতের সহিত এই মর্ম্মে বন্দোবস্ত করিলেন যে, তিনি দুই বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া, মারজিতের হস্তে সর্পাসন সমর্পণ করত, চিরকালের তরে তীর্থবাসী হইবেন।

মধুচন্দ্র, কাছাররাজ $ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কাছারপতি বিপদাপন্নের সাহায্যার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন। পঞ্চ শত যোদ্ধা সমরাভরণে সজ্জিত

---

* Aitchison's Treaties vol. 1 page 121.

† History and statistics of Dacca Division.

$ কাছারের রাজবংশ মণিপুরের রাজবংশের ন্যায় অভিনব নহে। ইহা অতি প্রাচীন। সাধারণের এরূপ সংস্কার যে দ্বিতীয় পাণ্ডব বৃকোদরের পত্নী রক্ষরাজ হিড়িম্বের সহোদরা হিড়িম্বা, কাছার রাজকুলের আদি মাতা। এই উক্তি সমর্থনোপযোগিনী

হইল। মধুচন্দ্র কাছাররাজের সৈন্য লইয়া ভ্রাতৃবর্গের প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন। রণকামুক মিতাই জাতি কাছার সৈন্যের যুদ্ধযাত্রা শ্রবণে, আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। মধুচন্দ্র মণিপুরের সীমান্তপ্রদেশে উপনীত হইলে, সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। দীর্ঘকালের পর এই প্রবল হুতাশন মধুচন্দ্রের রুধিরপ্রবাহে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

তিন বৎসর পর মারজিৎ অগ্রজকে আত্মপ্রতিশ্রুতি স্মরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। চতুর চূড়ামণি চৌবজিতের স্মৃতি বিস্মৃতি সাগরে ডুবিয়া গেল। অধিকন্তু মারজিতেব প্রাণবধের চক্রান্ত হইতে লাগিল। এই দারুণ সংবাদ অবগত

একটি বংশাবলীও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি, এই বংশাবলী ১৭৯০ খৃঃ অব্দে প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া তৎপ্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন। আমরা এতদুভয়ের কোন একটি মত পোষণ করিতে পারি না। প্রায় সার্দ্ধ চারি শতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ "রাজমালা" বলিয়া গিয়াছেন যে "ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ত্রিলোচনের জ্যেষ্ঠপুত্র দৌহিত্র স্বত্বে (কাছার) হেরম্বরাজের সিংহাসন অধিকার করেন। ত্রিলোচনের দ্বিতীয় পুত্র দক্ষিণ পৈতৃক রাজ্যের অধিকারী হন।" কাছারের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের হত্যাকাণ্ডের পর, যে মহাত্মার হস্তে সেই রাজ্যের শাসনভার (History and statistics of Dacca Division p. 335) সমর্পিত হয়, তিনি (কাপ্তান ফিসর লিখিয়া গিয়াছেন) প্রায় সহস্র বৎসর অতীত হইল আসাম, রঙ্গপুর, কাছার ও ত্রিপুরা প্রভৃতি দেশ সকল দীর্ঘকালাবধি শাসন করিতেছিলেন। তাঁহার রাজধানী কামরূপে অবস্থিত ছিল। কুচরাজগণ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরকে রাজ্যচ্যুত করেন। সিংহাসনচ্যুত নৃপতির জ্যেষ্ঠপুত্র কাছারে স্বতন্ত্র রাজ্যস্থাপন করিলে, সেই রাজার কনিষ্ঠ পুত্র অগ্রজের ন্যায় ত্রিপুরা রাজ্য স্থাপন করেন। গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুতে (১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে) কাছারের সেই প্রাচীন বংশের লোপ হইয়াছে। কনিষ্ঠের উত্তরপুরুষেরা অদ্যাপি ত্রিপুরার প্রসিদ্ধ ষোড়শ-সিংহধৃত আসনে বিরাজ করিতেছেন। এই উভয় মত দ্বারাই কাছার রাজ-বংশের প্রাচীনত্ব অবধারিত হইতেছে। কাছারের ভূতপূর্ব্ব ডিপুটি কমিসনর এডগার সাহেব এই সকল প্রাচীনতত্বের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, "যুদ্ধবীর নির্ভয় নারায়ণ কাছার রাজবংশের স্থাপয়িতা। তিনি খ্রীষ্টাব্দের সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জীবিত ছিলেন। তাঁহার উত্তরপুরুষ রাজা হরিশ্চন্দ্র ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। হরিশ্চন্দ্র জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র পিতার মৃত্যুর পর ৩৭ বৎসর রাজ্যশাসনের পর দেহ ত্যাগ করিলে, গোবিন্দচন্দ্র ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভ্রাতৃ-উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। এডগার সাহেব কোন প্রকার বিশেষ প্রমাণ দ্বারা স্বীয় উক্তি সমর্থন করেন নাই। তিনি স্বেচ্ছাচারিতা সহিত লেখনী সঞ্চালিত করিয়াছেন। এডগার সাহেবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার এ উপযুক্ত স্থান নহে। যদি দৈবদুর্ব্বিপাকে পতিত না হই, তবে সময়ান্তরে পাঠকবর্গকে কাছারের চিত্রপট উপহার দিয়া পরিতোষ লাভ করিব। কিন্তু চিররুগ্ন ব্যক্তির আশা দুরাশা।

হইয়া মারজিৎ একমাত্র অশ্বারোহণে কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত গোপনে কাছার যাত্রা করিলেন।*

কাছাররাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র মারজিতের মনোহর অশ্ব দর্শনে লোভাক্রান্ত হইলেন। ইচ্ছানুরূপ মূল্য লইয়া অশ্ব বিক্রয়ের জন্য মারজিৎকে অনুরোধ করা হইল। মিতাই রাজনন্দন প্রাণপ্রিয়তর অশ্বের জন্য সহস্র সহস্র সুবর্ণ তুচ্ছজ্ঞান করিলে, গোবিন্দচন্দ্র সেই অশ্ব বলক্রমে গ্রহণ করিলেন। হৃতসর্ব্বস্ব মারজিৎ আশ্রয়দাতা কর্ত্তৃক মর্ম্মপীড়িত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

বহুকষ্টে নগনদী প্রান্তর অতিক্রম করিয়া মারজিৎ আবা রাজধানীতে উপনীত হইলেন। তিনি ব্রহ্মরাজ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হন। শ্বেতগজাধীশ বিপন্নকে মণিপুর রাজাসনে অভিষিক্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মারজিৎও প্রতিশ্রুত হইলেন যে "ব্রহ্মের ভুজবলে মণিপুর নাগাসন তদধিকৃত হইলে, তিনি স্বয়ং আবায উপস্থিত হইয়া রাজন্যবর্গ পূজিত ব্রহ্মরাজের রাজাসন সমক্ষে মস্তক অবনত করিবেন।"

মারজিৎ বৃহৎ একদল ব্রহ্ম সৈন্য লইয়া ভ্রাতৃবিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। চৌরজিৎ ও গম্ভীরসিংহ স্বজাতীয় সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। তুমুল সংগ্রামের পর মিতাইদিগকে ব্রহ্ম সৈন্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। চৌরজিৎ ও গম্ভীরসিংহ কাছার ও ত্রিপুরায় পলায়ন করিলেন। মারজিৎ মিতাই রাজাসন অধিকার করিয়া ভ্রাতৃসুহৃদ্‌বর্গের প্রাণদণ্ড করেন। রাজ্যচ্যুত নৃপতি চৌরজিৎ ত্রিপুরার তদানীন্তন যুবরাজ কাশীচন্দ্রের হস্তে কন্যা (কুটিলাক্ষী) সমর্পণ করিয়া ত্রিপুরার সহিত প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হইলেন।

মারজিৎ পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া দেখিলেন, তাঁহার অশ্বাপহারী পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের রাজাসনে বিরাজ করিতেছেন। প্রতিহিংসাবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে প্রবল হইল। তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য হইয়া কাছার ধ্বংস করিতে চলিলেন।†

---

*মণিপুরীয়গণ বলে, চৌরজিৎ অসি যুদ্ধে সুশিক্ষিত ছিলেন। মারজিৎ অশ্বারোহণে সংগ্রামক্ষেত্রে অলোকসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার অশ্বের ন্যায় সুশ্রী ও সমরকুশল অশ্ব কস্মিনকালে মণিপুরে জন্মে নাই বলিয়া প্রবাদ আছে। সর্ব্বানুজ গম্ভীরসিংহ ভগদত্তের ন্যায় হস্ত্যারোহণে যুদ্ধ করিতেন।

†মণিপুরীয়গণ বলেন শিশু বৃদ্ধ ব্যতীত মণিপুরীয় পুরুষ মাত্রই মারজিতের মরণান্তে সহগমন করিয়াছিল।

মারজিৎ কাছাড়ে প্রবেশ করিয়া রাক্ষসবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। রাজধানী কশপুর ভস্মীভূত হইল। গোবিন্দচন্দ্র শ্রীহট্টে পলায়ন করিলেন। নররুধিরে কাছার প্লাবিত হইল। পথে, ঘাটে, মাঠে, মাংসজীবী পশুপক্ষী সকল শব লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল। গ্রাম, নগরে, আবাল বৃদ্ধের রোদনধ্বনিতে গগন প্রতিধ্বনিত হইল। কাছার ধ্বংস করিয়া মারজিৎ "মৈয়াঙাম্বা" বা কাছারবিজয়ী উপাধি গ্রহণ করিলেন।

রাক্ষসবৃত্তি মারজিতের প্রায়শ্চিত্তের সময় শীঘ্রই উপস্থিত হইল। ব্রহ্মরাজ তাঁহাকে আত্মপ্রতিশ্রুতি পালন জন্য আহ্বান করিলেন।

"কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরালে পাজি।" বোধ হয় এ সংসারে অধিকাংশ লোক এই জঘন্য প্রকৃতির। মারজিৎও তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তিনি আবারাজকে লিখিলেন "যদি ব্রহ্মরাজ উভয় রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী কোন একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া স্বয়ং তথায় উপস্থিত হন, তবে মণিপুরেশ্বরও সেখানে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত আছেন।" ব্রহ্মরাজ, মারজিতের পত্র পাইয়া ক্রোধে অধীর হইয়াছিলেন। কিন্তু পুনর্ব্বার শান্তভাব অবলম্বন করিয়া লিখিলেন, "রাজা মারজিৎ আত্মপ্রতি-শ্রুতি প্রতিপালনে প্রস্তুত হউন, নচেৎ মণিপুর উপত্যকা নররুধিরে রঞ্জিত হইবে।" অহঙ্কারী মণিপুরীয়দিগের অহঙ্কার খর্ব্ব হইল না। আবাদূত অপমানিত হইয়া ব্রহ্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, বসুন্ধরা নররুধির জন্য লালায়িত হইলেন।

আবাসৈন্য দলে দলে মিতাইদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল। মিতাইগণ শত্রুসৈন্যের গতিরোধ করিতে অগ্রগামী হইল। নিংথি নদীতীরে প্রথম সংগ্রাম হয়। সেই যুদ্ধে মিতাই অশ্বারোহিগণ অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। কিন্তু "বন্দুক" ও "কামান" দ্বারা ব্রহ্মগণ তাহাদিগকে পরাভূত করে। নিংথি তীরে মিতাইগণ পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইলে, আবা সৈন্য উপত্যকার মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রায় তিন মাস পর্য্যন্ত মিতাইগণ প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। পরে দেশ ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইল। রাজাও পলায়ন করিলেন।* আবা

---

*হাওগণ তখন মিতাইদিগকে বলিয়াছিল—

"চুয়া চন্দন পংতেই তেই,
অতুয়া না তালা পংচেন চেন।"

অর্থ। তোমরা চুয়া চন্দন দ্বারা শরীর ভূষিত করিয়া জাঁকজমক কর এবং আপনাকে আপনি অলোকসামান্য যোদ্ধা বলিয়া জ্ঞান কর। কিন্তু আবাদিগকে দর্শন করিলে তোমাদের আতঙ্ক হয়। আত্মরক্ষায় জন্য দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞান না করিয়াই দৌড়িতে থাক।

সৈন্যগণ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহী সিপাহিদিগের ন্যায় শিশু, বৃদ্ধ ও রমণীর প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিল। যুবতীদিগকে সানন্দচিত্তে বন্ধন করিয়া লইয়া চলিল। গ্রাম ও নগর সকল পুড়াইয়া ছারখার করিল। জীবসঙ্কুল শস্যশালিনী উপত্যকা মরুভূমিতে পরিণত হইল।

মারজিৎ কাছারে আসিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে আহ্বান করেন। চৌরজিৎ ও গম্ভীর সিংহ ভ্রাতৃসমক্ষে উপনীত হইলে মারজিৎ তাঁহাদিগকে বিজিত রাজ্যের (কাছার) এক একটি অংশ দান করিলেন, সুতরাং তাঁহারা পরস্পর বিপদে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

কাছাররাজ গোবিন্দচন্দ্র সিংহাসনচ্যুত হইয়া ইংরেজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিলেন, কিন্তু সে সময় কোম্পানি বাহাদুর অমিতপরাক্রম মহারাষ্ট্রীয় ও পিণ্ডারিদিগের সহিত বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার বাক্যে কেহ কর্ণপাত করিলেন না। উপায়হীন গোবিন্দচন্দ্র অবশেষে আবারাজসদনে সাহায্য-প্রার্থী হইলেন। আবাগণ সে সময় মণিপুর গ্রাস করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। পররাজ্য গ্রাসের আর একটী সুন্দর উপায়-দ্বার উদ্ঘাটিত দর্শনে তাহাদের আলস্য অন্তর্হিত হইল। আবাদিগের রাজ্যকামুকতায় অচিরাৎ—কাছার সমরানলে প্রজ্জলিত হইল। মারজিৎ ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে এই বিষমাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু কোনও ফল দর্শিল না। অবশেষে মণিপুরীয়দিগের রুধিরপ্রবাহে সমরানল নির্ব্বাপিত ও কাছার প্রদেশ আবারাজের কুক্ষিগত হইল। গোবিন্দচন্দ্র পুনর্ব্বার ইংরেজদিগের আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। তখন মিতাইরাজকেও গোবিন্দচন্দ্রের মতানুসরণ করিতে হইল।

ব্রিটীস গভর্ণমেণ্ট আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। আবাদিগের দমনার্থ ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ লর্ড আমহার্ষ্ট সাহেব যুদ্ধঘোষণা করিলেন।* প্রায় দুই বৎসরাবধি এই সংগ্রাম চলিয়াছিল। সেই লোমহর্ষণ ঘটনার রুধির-রঞ্জিত যবনিকা অর্দ্ধ উত্তোলন করা অসঙ্গত বোধে আমরা আবার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ক্রমশঃ

শ্রীকৈলাস চন্দ্র সিংহ।

এই সময় মণিপুরীয়গণ স্বদেশ ছাড়িয়া কাছার শ্রীহট্ট, ও ত্রিপুরায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। ঔপনিবেশিক মণিপুরীয় সংখ্যা, কাছার ১১০০০০, শ্রীহট্ট ৩০০০০ ত্রিপুরা ১৫০০০। অল্পকাল মধ্য ঢাকায়ও কতকগুলি মণিপুরীয় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

* রেভারেণ্ড স্লিগ বলেন,—১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই ইংরাজ সেনানী কর্ণেল ব্রাউন্‌ শ্রীহট্টের সীমান্তপ্রদেশে আবা সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে, গবর্ণর জেনারেল যুদ্ধঘোষণা করেন। (British Empire in India vol. iv page 112) কিন্তু মার্সমেন প্রভৃতি ঐতিহাসিকের মতে ঐ তারিখের পূর্ব্বেই যুদ্ধঘোষণা হইয়াছিল।

সাধারণতঃ ও প্রধানতঃ, আমাদের 'আদর্শ' বাঙ্গালি সমালোচক বাবু দ্বিবিধ সমালোচনা শিখিয়া রাখিয়াছেন। যে কোন গ্রন্থ হাতে পড়ুক না কেন, এই দুইয়েব অন্যতর অবলম্বিত হইয়া থাকে। এক প্রকার সমালোচনা এইরূপ, —"এই গ্রন্থ ভাল, খুব ভাল, অতি ভাল ; এমন গ্রন্থ হয় না, হইবার নয়।" আর এক প্রকারের সমালোচনা—"গ্রন্থ মন্দ, অতি মন্দ, যারপরনাই মন্দ ; ইহার ভিতরে কেবল মাথা আর মুণ্ড, ছাই আর ভস্ম।" ফল কথা, ইহা এক প্রকার স্থির যে, যাহাকে ভাল বলিতে হইবে, তাহাকে, আকাশে তুলিতে হইবে, যাহাকে মন্দ বলিতে হইবে, তাহাকে, দুই পায়ে দলিতে হইবে। নিয়ম এই, হয় স্তুতি কর নয় নিন্দা কর—সমালোচনা একেবারেই করিও না।

এ কথার সমর্থনার্থ দৃষ্টান্ত খুঁজিতে অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন নাই। এই "ভার্গববিজয়" কাব্যের কতকগুলি সমালোচনা মুদ্রিত হইয়া গ্রন্থের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত হইয়াছে ; তাহা পাঠ করিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়াছি। যে প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহা 'প্যারাডাইস লষ্ট' অথবা "ডিভাইনা কমেডিয়া" সম্বন্ধে করিতে গেলেও একটা কিন্তু রাখিয়া করিতে হয়। একজন লিখিয়াছেন,—"যে পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছি তাহাতেই বলিতে পারি যে, পুস্তকখানি অতি উৎকৃষ্ট ; ইহাতে রস-ভাব-রীতি-গুণ আদি যথাস্থানে যথাসময়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে।" যে পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন তাহাতেই এই, শেষ পর্য্যন্ত পড়িলে না জানি কি বলিতেন। আমরা নির্লজ্জ হইয়া জিজ্ঞাসা করি, যদি রস, ভাব, রীতি, গুণ আবার আদি, যথাস্থানে এবং যথাসময়ে সন্নিবেশিত হইল, তবে আর বাকীই থাকিল কি? বাল্মীকি অথবা

ভার্গববিজয় কাব্য। শ্রীগোপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, আলবার্ট প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১।০ মাত্র।

ব্যাসে, বর্জ্জিল অথবা মিল্টনে, গোটে অথবা শেক্ষপীয়রে, ইহার অধিক আর কিছু আছে কি ?

আবার কতকগুলি সংবাদপত্রে এই পুস্তকের যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে তাহা দেখিয়াও আমরা অবাক্ হইয়াছি। সে কেবল খাঁটি নির্জ্জলা নিন্দা। তার সার মর্ম্ম এই যে, গ্রন্থখানি কিছুই নহেরও অধম, এবং গ্রন্থকার বাতুল। লিউইস সাহেব তাঁহার 'দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসের' এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, কোমতকে নূতন নূতন মত সকল প্রচার করিতে দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে বাতুল স্থির করিয়াছিল, কিন্তু 'প্রামাণিক দর্শন' যদি বাতুলতার ফল হয়, তাহা হইলে আমাদের কামনা, বাতুলতার এপিডেমিক হউক। এতটা গৌরবের সঙ্গে না হউক, কিন্তু তবু আমরা বলিতে পারি যে, ভার্গববিজয় যদি বাতুলতার ফল হয়, তাহা হইলে আমরা কায়মনোবাক্যে কামনা করি—বাঙ্গালার কাব্য-লেখকদিগের পালের মধ্যে বাতুলতার এপিডেমিক হউক। অধিকাংশ বাঙ্গালা কাব্য অপেক্ষা ইহা ভাল।

কিন্তু এ কথায় কিছু প্রশংসা হইল না। জলধরের অপেক্ষা সুন্দর বলিলে কিছু সৌন্দর্য্যের প্রশংসা হয় না। বিদ্যাদিগ্‌গজ অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ বলিলে কিছু বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা হয় না। অধিকাংশ বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ এত জঘন্য যে, তাহার অপেক্ষা ভাল বলিলে কোনই প্রশংসা হয় না। সেই জন্য একটু বিস্তৃত সমালোচনার প্রয়োজন।

ভার্গববিজয় গ্রন্থের বিষয় সম্বন্ধে কোন পরিচয় দিবার আবশ্যক রাখে না। কীর্ত্তিবাস ও কাশীরামের প্রসাদে কথক ও গায়কের প্রসাদে, যাত্রাওয়ালা ও নাটকলেখকদিগের দৌরাত্ম্যে, মহাভারত ও রামায়ণের কথা কিছু কিছু না জানে এমন লোক বঙ্গদেশে বিরল। রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরশুরামের অভিভব, এ গ্রন্থের বিষয়। জিনিস্‌টা কি, সকলেই বুঝিয়াছেন।

ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে বিষয়টা গুরুতর বটে। এ মহদ্ব্যাপারে যাহারা লিপ্ত তাহারা সকলেই মহৎ—আকাশের ন্যায় উচ্চ, সাগরের ন্যায় গভীর, বাসুকীর ন্যায় ধীর, হিমালয়ের ন্যায় স্থির। নায়ক, সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম—দেবতার ভয় দূর করিতে, পৃথিবীর ভার লঘু করিতে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছেন। নায়িকা, অযোনিসম্ভবা সীতা—যিনি স্ত্রীবিহিত গুণে রমণীকুলের আদর্শ-স্থলাভিষিক্তা। প্রতিনায়ক, ভার্গব পরশুরাম—যিনি একবিংশতিবার পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করিয়া ক্ষত্রিয়শোণিতে "সমন্তপঞ্চকে পঞ্চ চকার রৌধিরান্ হ্রদান্।" লোকসমাবেশ অতি উচ্চ অঙ্গের বটে। বিষয় মনোনীত করা নিতান্ত মন্দ হয় নাই।

খুব ভালও হয় নাই। পরশুরাম বীর, রামচন্দ্র বীর, লক্ষ্মণ বীর, দশরথও বীর; বিশ্বামিত্র ঋষি, বশিষ্ঠ ঋষি, পরশুরামও ঋষি;—এইরূপ একপ্রকারের লোক একত্র কার্য্যক্ষেত্রে আনিয়া তাহাদের ব্যক্তিগত পার্থক্য রক্ষা করা অতি দুরূহ ব্যাপার—সকলে পারে না। আবার ঘটনা এত অল্প, কথা এমন সংক্ষেপ, যে ইহা লইয়া সার্দ্ধ তিনশত পৃষ্ঠারও অধিক একখানি গ্রন্থ লেখা হয় না—অন্ততঃ সকলে পারে না। তবে কি না, কবি আপন কল্পনাসম্ভূত অনেক নূতন চিত্র দিতে পারেন, অনেক নূতন সৃষ্টি সন্নিবেশিত করিতে পারেন—ইহাও সকলে পারে না। ভার্গববিজয়ের শেষে গোপাল বাবু পরিচয় দিয়াছেন যে, তিনি অতি অল্পবয়স্ক—অল্প বয়সে, প্রথম উদ্যমে, এই অগাধ, অপার-সাগরে ঝাঁপ দেওয়া ভাল হয় নাই।

এক্ষণে গ্রন্থের পরিচয়। প্রথম সর্গে বড় কিছু নাই—বাজে কথায় পরিপূর্ণ, কাজের কথা দেখিলাম না। তবে শেষকালে কবি বলিয়া দিয়াছেন, কোন্ কোন্ খনি হইতে তিনি রত্ন সংগ্রহ করিবেন,—

"হে বাল্মীকে, কালিদাস, কীর্ত্তিবাস, মধো,
তোমাদের কোষ হতে হে রাজেন্দ্রগণ;
লইবে——ইত্যাদি।"

কোষগুলি যে বহুরত্নপূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সকল কোষ হইতে রত্ন সংগ্রহ করিয়া অভিনব কাব্যভূষণ নির্ম্মাণ করিলে কতদূর মহামূল্য হয়, তাহাতে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে—হয় ত খাটে না—প্রায়ই মিলে না। ভার্গব বিজয় হইতেই ইহার প্রমাণ দেওয়া যায়।

দ্বিতীয় সর্গে ভার্গবের আশ্রম বর্ণনা। হিমাচলের এক নির্ঝরিণীতীরে ভার্গবের আশ্রম বিরাজিত। তথায় দেবদারুতরুব্রজ অম্বরস্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইঙ্গুদী, খদির, তীব্রগন্ধ তেজপত্র, লবঙ্গবল্লরী, এলালতাবীথি, দারুচিনি, চিত্রিত-বিগ্রহ ভূর্জ্জপত্র, শাল, তাল, তমাল, পিয়াল, যাহা হইতে,

মঞ্জুল-মঞ্জরী রজো-রাশি নভোমার্গ
অনিশ আবরি উড়ে চন্দ্রাতপনিভ।

পীযূষ-পূরিত দ্রাক্ষা, কম সোমলতা, অদূরে শ্যামাভ নীবার ধান্যভূমি,—অশোক, কিংশুক, বকুল, কর্ণিকার প্রভৃতি নানা বৃক্ষে, নানা ফলে, নানা লতায় নানা ফুলে এই স্থান পরিশোভিত। মলয়ানিল মৃদুল বহিতেছে, পরাগরাশি

উড়াইতেছে, লতাপাদপ আন্দোলিতেছে। তথায় কস্তুরী কুরঙ্গ আশ্রম-পাদপে গাত্র-কণ্ডু নাশ করিতেছে—মৃগমদগন্ধে তপোবনস্থলী আমোদিত করিতেছে। মৃগযূথ অভিনবতম শস্প-প্ররোহতল্পে বিশ্রাম করিতেছে; শাবকগণ মেষশিশুর সঙ্গে খেলা করিতেছে। দূরস্থ কন্দর-শায়ী সিংহগর্জ্জন শুনিয়া বৃষভ গবয় প্রভৃতি বসুধাতল ক্ষুরাগ্রে বিদীর্ণ করিয়া সদর্পে নাদিতেছে। অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষচ্ছায়ায় হস্তিযূথ আষাঢ়দিগন্তব্যাপী নবমেঘের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে, এবং

——— —করেণু নিবহ
কমল-পরাগ গন্ধি সলিল ছড়ায়ে
দিতেছে প্রণয়ে স্বীয় স্বীয় প্রিয়তমে।

মন্দ নহে; কিন্তু এ সুন্দর চিত্রটী কালিদাসের, গোপাল বাবুর নহে—কুমারসম্ভব হইতে অনুবাদিত।

এই তপোবনে ভগবান্ ভৃগুকুলপতি তপস্যা করিতেছেন—সারঙ্গকীর্ত্তি-আসনে আসীন, বল্কল-পিহিত, আশীর্ষ উন্নত দেহ, অর্দ্ধনিমীলিত স্থির লোচনযুগলে অপূর্ব্ব দ্যুতি, করযুগ নাভীর ঊর্দ্ধে বদ্ধ, গলে অক্ষমালা এবং যজ্ঞোপবীত, ললাট ফলকে ঊর্দ্ধ-পৌণ্ড্রকেয় লেখা, শরীর শ্বেত চন্দনচর্চ্চিত, মৌলী উপরে জটাজাল বিনিবদ্ধ, বদনমণ্ডল শ্মশ্রুরাজি-বিশোভিত—

দেবগৃহ-স্তম্ভ গাত্রে ঝুলিয়া বিরলে
যেমতি চামর-রাজ বিকাশে শুক্লিমা।

উপমাটি অতি সুন্দর এবং সম্পূর্ণরূপে বিষয়োপযোগী। আমরা পাঠকগণকে এই সর্গ পাঠ করিতে অনুরোধ করি—সময় বৃথা নষ্ট হইল বলিয়া বোধ হইবে না। যদিও ইহা কালিদাসের অনুকরণে রচিত, তবু গ্রন্থকার প্রশংসা পাইতে পারেন এমন অনেক জিনিষ ইহাতে আছে।

তৃতীয় সর্গেও প্রসঙ্গাধীন কথা কিছু নাই—আগা গোড়া কেবল প্রাতঃকালের বর্ণনা।

চতুর্থ সর্গে রাজা দশরথের পুত্র-স্বজনাদির সহিত অযোধ্যা-বর্ত্মে সোৎসব গমন। দশরথ মহা সমারোহে চলিয়াছেন, দেবগণ তাহা দেখিতে আসিয়াছেন। ইহার এক স্থলে লিখিত হইয়াছে—

————নীরদ নায়ক
সম্বর্ত্ত-আবর্ত্ত-দ্রোণ-পুষ্কর—এ চারি,
দামিনী কামিনী, আর দীপ্ত জলধনুঃ—

বিনা বর্ষণে জলধনুর উদয় সম্ভবে না;—মেঘ থাকিলেই যে তাহার সঙ্গে জলধনুকে থাকিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।

পঞ্চম সর্গে পরশুরামের আগমন। মহারাজ দশরথ দুর্নিমিত্ত ঘটিতে দেখিয়া বশিষ্ঠকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন, কোন চিন্তা নাই, যদি কোন অশিব ঘটনার সম্ভাবনা থাকে, তাহা আমি স্বস্ত্যয়নে নিবারণ করিব।

হেনকালে রুদ্রমূর্ত্তি পরশুরাম দেখা দিলেন। সকলে স্তম্ভিত হইল। সকলেই বুঝিল যে এ অশিব স্বস্ত্যয়নে সারিবার নহে। ক্ষত্রিয়ললাটে না জানি কি আছে বলিয়া সকলেই প্রমাদ গণিল। ষষ্ঠ সর্গে পরশুরাম গালিগালাজ আরম্ভ করিলেন—রাজা দশরথকে, রামচন্দ্রকে, সৈন্যগণকে, প্রাণ ভরিয়া গালি দিলেন। লক্ষ্মণকে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই, এ কি? লক্ষ্মণ বলিলেন, সীতার সঙ্গে উঁহার বিবাহের কথা ছিল, তাহাতে বঞ্চিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ চটিয়াছে।

সপ্তম সর্গে আবার পরশুরামের গালিগালাজ এবং আত্মশ্লাঘা। দশরথের স্তুতি, রামচন্দ্রের বিনতি—পরশুরামের কেবল কটূক্তি।

অষ্টম সর্গে লক্ষ্মণের ক্রোধ এবং ভার্গবকে ভৎ'সনা। ভার্গব অপমানিত হইয়া মহাক্রোধে লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া ধনুতে শর যোজনা করিলেন। এমন সময়ে বিশ্বামিত্র আসিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিলেন। তবু সম্পূর্ণ শান্ত হইলেন না। আর সকলকে রেয়াৎ করিলেন, কিন্তু রামের সম্বন্ধে বলিলেন যে আমার এই ধনুঃ ভঙ্গ করুক, নতুবা উঁহার রক্ষা নাই।

তারপর নবম সর্গে আরও কিছু কটু কাটব্যের পর পরশুরাম স্বহস্তস্থিত দুর্জ্জয় ধনুঃ বীরদর্পে রামের হাতে দিলেন। এদিকে সীতার বড় ভয় উপস্থিত হইল– একবার ভার্গব একখানা ধনু আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ভাঙ্গিয়া তাঁহার সঙ্গে রামের বিবাহ হইয়াছে; আবার আজ ভার্গব সেইরূপ শরাসন আনিয়াছেন, বুঝি রামের আবার বিবাহ হয় অতএব– কতই সপত্নী মম আছে পোড়া ভালে!

সীতার এই আশঙ্কাটুকু মন্দ নহে। সঙ্গত হউক, অসঙ্গত হউক, ইহাতে রস আছে।

দশম সর্গে ভার্গব-রাঘব-দ্বন্দ্ব অবলোকন করিতে ত্রিদিব-তলে ত্রিদশসমূহ সভা করিয়া বসিয়াছেন। পার্ব্বতী শঙ্করকে বলিলেন, রাম এবং ভার্গব উভয়েই আমার প্রিয়, অতএব এ দ্বন্দ্ব যাহাতে নিবারিত হয় তাহা কর। মহাদেব ভার্গবের নিকট পদ্মাকে পাঠাইলেন। বলিয়া পাঠাইলেন,

পরাজয় অঙ্গীকারী দাশরথি কাছে
সপ্রণয়ে প্রার্থী নহ স্বর্গমার্গরোধ।

ইতিপূর্ব্বেই রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে ধনুগ্র্হণ করিয়াছিলেন। তারপর একটী শর চাহিয়া লইয়া ধনুতে যোজনা করিয়া বলিলেন—এই শরে আপনাকে বধ

করিতে পারিতাম, কিন্তু ব্রাহ্মণ অবধ্য ; অতএব ইহার লক্ষ্য দেখাইয়া দিন। এদিকে পদ্মা আসিয়া ভার্গবের উপর শিবের হুকুম জারি করিয়া গেল। পরশুরাম রামচন্দ্রকে বলিলেন, আমার স্বর্গমার্গ রোধ কর। তাহাই হইল।

একাদশ সর্গে উভয় রামে প্রীতিসংস্থাপন হইল। তারপর ভার্গব সাধারণ সমক্ষে ক্ষত্রবধ বাসনা পরিত্যাগ করিলেন, রাঘবকে আলিঙ্গন করিলেন, ক্ষত্রবধ-তেজঃ সমর্পণ করিলেন, আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং শেষে প্রস্থান করিলেন। দশরথ আনন্দিত হইলেন ; সীতা প্রফুল্লিতা হইলেন—সকলেই উল্লাসিত হইল।

দ্বাদশ সর্গে সকলের আনন্দ, বাদ্য, নৃত্য, গীত, বন্দিবৃন্দের বন্দনাসঙ্গীতিকা, দেবগণের স্বস্থানে প্রস্থান, আকাশ-বাণী, এবং গ্রন্থকারের মামুলি আত্মপরিচয় ;—কাজের কথা প্রসঙ্গাধীন কথা, নাই বলিলেই হয়।

ত্রয়োদশ সর্গে সকলের অযোধ্যা প্রবেশ। এই সর্গে পথিপার্শ্বস্থ সৌধরাজিতে পুরস্ত্রীবর্গের বিবিধ বিভ্রমবিচেষ্টা পাঠ করিয়া সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকের কালিদাসকে মনে পড়িবে। বাস্তবিক এই স্থলটি কালিদাসের অনুকরণ ; স্থানে স্থানে অবিকল অনুবাদ।

এইখানেই কাব্য শেষ হওয়া উচিত ছিল। ইহার পর তিন সর্গ কেবল প্রকৃতিবর্ণনা এবং অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক কথা। এ তিন সর্গ একেবারে ছাঁটিয়া ফেলিলেও মূল কথার কোনই ক্ষতি হয় না।

আমরা সমালোচ্য গ্রন্থের যতটুকু পরিচয় দিয়াছি তাহাতেই পাঠকবর্গ অবশ্য বুঝিয়াছেন যে গ্রন্থখানি এত বড় হইবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। শেষ তিন সর্গ, দ্বাদশ সর্গ, তৃতীয় সর্গ, এবং প্রথম সর্গ একেবারে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। অন্যান্য সর্গেরও অনেক অংশ ত্যাগ করা যায় ; এবং প্রত্যেক সর্গেরই শেষ ভাগ—আত্মপরিচয় এবং অনুগ্রহভিক্ষা—পরিবর্জ্জনীয়। যে সকল উপায়ে গ্রন্থকলেবর স্ফীত হইয়াছে, তদবলম্বনের অর্থ আমরা খুঁজিয়া পাই না। নিসর্গ বর্ণনাতেই গ্রন্থের প্রায় চতুর্থাংশ নিয়োজিত। নিসর্গ বর্ণনা মন্দ নহে, কিন্তু কেবল প্রাতঃকাল বর্ণনা করা একটা সম্পূর্ণ সর্গ গ্রন্থকারের কুরুচির পরিচায়ক, পাঠকের পক্ষে বিরক্তি-জনক এবং সমালোচকের পক্ষে—মাবাত্মক। তবু নিসর্গবর্ণনা কাব্যের একটা অঙ্গ বটে, কিন্তু কাব্যসূচনা, বাগ্দেবতার আরাধনা, ভারতীপ্রার্থনা, কল্পনার উপাসনা, বাল্মীকির কবিজ্যেষ্ঠত্ব, কলিদাসের মহাকবিত্ব, মাইকেলের পরলোক, অকালমৃত্যু-জন্য শোক, ভর্ত্তৃহরির স্তব, জয়দেবের মহিমাকীর্ত্তন, ভবভূতির বন্দনা—এ সকলের দ্বারা কাব্যের যে কি উপাদেয়তা বৃদ্ধি হইতে পারে, আমরা সর্গমর্ত্ত্যরসাতল খুঁজিয়া পাই না।

প্রতি সর্গের শেষেই একবার পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে "সগল-বসনে মুদি যোড় কর" করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা এই বলিতে চাই যে, যিনি এত বড় একখানি কাব্য লিখিতে বসিয়াছেন, যিনি বাগ্দেবীর কাছে "কবিত্ব বিমল নভে মাধ্যন্দিন ভানুমান্" হইবার প্রর্থনা করিয়াছেন, তাঁহার একটু আত্মাদর, একটু অহঙ্কার থাকা উচিত। নম্রতা, বিনয়, এ সকল মন্দ নহে, কিন্তু কথায় কথায় কাকুতি মিনতি করা ভাল দেখায় না। যার তার হাতে পায়ে ধরিতে গেলে সম্ভ্রম থাকে না।

গ্রন্থকার আপনি স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি মাইকেলের চেলা; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি জয়দেবের চেলা; জয়দেবের সেই ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরের ন্যায় মধুর কোমল কান্ত পদাবলী, আর গোপাল বাবুর এই দাঁত ভাঙ্গা শব্দবিন্যাস তুলনা করিলে আপাততঃ এ কথায় অনাস্থা হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু একটু বুঝিয়া দেখিলেই ইহার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম হইবে। জয়দেবের ন্যায়, গোপাল বাবু বিলক্ষণ কল্পনাশালী ব্যক্তি; এবং জয়-দেবের ন্যায় গোপাল বাবুর কল্পনা মার্গেকপ্রোহিত—যত কারিগরি বাহ্যজগৎ লইয়া; অন্তর্জগতের উপর বড় একটা দৃষ্টি নাই। সূর্য্যরশ্মির প্রফুল্লতা, বসন্তপবনের মধুরতা, সায়াহ্নগগনের সৌন্দর্য্য, নবকুসুমিতা লতার সৌকুমার্য্য, এ সকল চিত্রিত করিতে গোপাল বাবু বিলক্ষণ পারগ—জয়দেব অভ্রান্ত। কিন্তু প্রণয়ের উন্মত্ততা, নৈরাশ্যের কাতরতা, শৌর্য্যের মহত্ব, অনুরাগের চাঞ্চল্য, এ সকল চিত্রিত করিতে গুরুশিষ্য কাহারও তুলি চলে না। জড়জগতের ভীম ভঙ্গী সকল চিত্রিত করিতে জয়দেব চেষ্টা করেন নাই; গোপাল বাবু চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই। জয়দেব আত্মশক্তি বুঝিতেন, গোপাল বাবু হয় ত বুঝেন না;—জয়দেব গুরু, গোপাল বাবু চেলা। অন্তর্জগতের উপর দৃষ্টি না থাকিলেও বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে লেখকের বিল-ক্ষণ সহানুভূতি আছে এবং নিসর্গ সৌন্দর্য্য তিনি প্রেমিকের চক্ষে দেখেন—যে চক্ষে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ দেখিতেন সেই চক্ষে গোপাল বাবু দেখেন—অনেক ভঙ্গী, যাহা অপ্রেমিকের চক্ষে পড়ে না গোপাল বাবুর চক্ষে পড়ে, এবং তিনি তাহাতে মুগ্ধ হইয়া যায়েন—শতমুখে, সহস্রমুখে তাহা ব্যক্ত করেন। সামান্য কথা লইয়া কেন এত আড়ম্বর, তাহা প্রেমিক যে সে বুঝিবে—সকলে বুঝিবে না।

অন্তর্জগতের উপর দৃষ্টি না থাকিলে যে দোষ ঘটে, তাহা এই গ্রন্থেও ঘটিয়াছে—একটা চরিত্রও উত্তমরূপে সংরক্ষিত হয় নাই। দশরথকে দেখ। যখন ভার্গব সেই দুর্জ্জয় কার্ম্মুক রামচন্দ্রের হস্তে দিলেন, তখন রাজা দশরথ পুত্রবিয়োগাশঙ্কায় অত্যন্ত কাতর হইলেন—অনেক বিলাপ করিলেন—শেষে মূর্চ্ছা গেলেন। রাজা দশরথ স্বয়ং বীরপুরুষ, তাঁহার মূর্চ্ছা যাওয়া ভাল হয় নাই। একটু ভয়, একটু আশঙ্কা, হয়

হউক, তাহাতে আমাদের বিশেষ আপত্তি নাই; কিন্তু মূর্চ্ছাটা বড় অসঙ্গত। রামায়ণের দশরথ মূর্চ্ছিত হয়েন নাই।

আবার পরশুরামকে দেখ। ভার্গব-বিজয়ের পরশুরামকে দেখিয়া আমাদের সেই চিরপরিচিত পরশুরাম বলিয়া চিনিতে পারিলাম না। রামায়ণের পরশু-রাম,—মহাবীর, মহাতপস্বী, উন্নতচিত্ত, প্রশস্তহৃদয়। তিনি যখন ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া সিংহনাদ করেন, তখন সুরাসুর কম্পিত হয়, বায়ু স্তম্ভিত হয়, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ পথহারা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আর গোপাল বাবুর পরশুরাম—যদি বিশেষণ পদ দ্বারা তাঁহার চিত্র আঁকিতে হয়, তবে এইরূপ লিখিতে হয়—কুভাষী, অভদ্র, মুখসর্ব্বস্ব, দাম্ভিক, নির্লজ্জ, অসার, দুর্বিনীত এবং অব্যবস্থিতচিত্ত। তিনি যখন আত্মবীর্য্য খ্যাপন করেন, আমাদের হাসি পায় যখন দুর্ব্বাক্য ব্যবহার করেন, পড়িতে লজ্জা হয়। বীরের মুখে, ঋষির মুখে তেমন কথা আসে না। রামচন্দ্রের প্রতি যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা ভদ্র লোকের অব্যবহার্য্য।

কোথা সেই নরাধম, দে শীঘ্র দেখায়ে,—
ধূরত জম্বুক সম ভয়ে দূরে গেল লাঙ্গুল গুটায়ে, পাপ!

রামায়ণের পরশুরামে এরূপ ইতরতা নাই। তিনি রামচন্দ্রের সঙ্গে যেরূপ সম্ভাষণ করিয়ছেন, তাহা বীরের ন্যায়, মহতের ন্যায়, পরশুরামের ন্যায়—দূরশ্রুত জলদনিনাদের ন্যায় ধীর, গম্ভীর এবং ভয়ঙ্কর—

রাম! দাশরথে! বীর! বীর্য্যং তে শ্রূয়তেঽদ্ভুতং।

* * * *

তদিদং ঘোরসঙ্কাশং জামদগ্ন্যং মহদ্ধনুঃ।
পূরয়স্ব শরেণৈব স্ববলং দর্শয়স্ব চ॥
তদহং তে বলং দৃষ্ট্বা ধনুষোঽপ্যস্য পূরণে।
দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদাস্যামি বীর্য্যশ্লাঘ্যমহং তব॥

রসাবতারণায় আমাদের কবি সকল স্থানে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার রসে সজীবতা নাই। পরশুরাম আসিয়া বীররসের কত কথাই বলিলেন, তিন সর্গ ব্যাপিয়া বীরদর্পে বীরবাক্য কতই উচ্চারিত করিলেন, কিন্তু এত বীররসের মধ্যে আমাদের একবিন্দুও শোণিত উষ্ণতর হইল না—পড়িতে পড়িতে একবারও আমাদের রোমাঞ্চ হইল না, একবারও একটু উৎসাহ অনুভব করিলাম না। আবার সীতা যখন পীরিতের ফাঁদ পাতিয়া বলিতে লাগিলেন,

জগতে তোমার সনে মিলে না তুলনা,
তোমার উপমা, দেব, তুমিই ভুবনে।
তোমার বিক্রম সাজে তোমার বিক্রমে;

তোমার বদন যেন তোমার বদন ;
তোমার নয়ন, নাথ, তোমার নয়ন ;
রামের সুতনু সম রামের সুতনু !

তখন আমরা কোনরূপ কোমলতা অনুভব করিলাম না। কেমন বোধ হইল, যেন একথাগুলি সীতা বাড়ী হইতে কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়াছিলেন, এতক্ষণ সময় প্রাপ্ত হয়েন নাই বলিয়া বলা হয় নাই— বোধ হইল যেন' 'তোমার তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে" এই গীতটি সীতা জানিতেন, সময় পাইয়া তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণ, সুতরাং হাল আইনানুসারে পরিশোধিত এবং পরিবর্দ্ধিত।

নিসর্গ বর্ণনার অবতারণাতেও স্থানে স্থানে রসভঙ্গ হইয়াছে। কোথাও উপমা সংযোজনে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে—তৃতীয় সর্গের প্রথম পাঁচছত্র ইহার প্রমাণ। আমাদের কবি একই নিঃশ্বাসে সূর্য্যদেবকে একবার "প্রাচীদিক্ অধীশ্বরীর সীমন্ত মুকুট হৈম শিখা মণি" বলিযাছেন, আবার "জগৎলোচন" বলিয়াছেন পুনরায় আবার তাঁহারই গলে "সমুজ্জ্বলমালা" দোলাইয়াছেন। তবে মালার সম্বন্ধে এই এক কথা আছে যে, উহা জগৎলোচনের গলে, কি দিক্ অধীশ্বরীর গলে, তাহা ঠিক বুঝা যায় না।

কোথাও বা অলঙ্কার দোষ ঘটিয়াছে—

————"বিমণ্ডিত কুসুম স্তবক ভারে"

যাহার দ্বারা বিমণ্ডিত হওয়া যায়, তাহাকে ভার বলা ভাল হয় নাই। এক আধ স্থলে অশ্লীলতা দোষও ঘটিয়াছে—দৃষ্টান্ত, ১৫৯—১৭০ ছত্রদ্বয় এবং ২৩৫—২৩৮ ছত্র চতুষ্টয়, তৃতীয় সর্গ। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে "শাবগণ সনে" থাকায় কিঞ্চিৎ হাস্যজনকও হইয়াছে।

স্থানে স্থানে উপযোগিতা রক্ষিত হয় নাই। তপোবন বর্ণনায় এক স্থলে লিখিত হইয়াছে,

বাজিছে বিবিধ বাদ্য সংগীত সংহতি
মুরজ মন্দিরা বীণা মুরলী রসাল ,

আবার, অন্য স্থলে, তপোবনস্থ লতা পাদপ মৃদু পবনে দুলিতেছে—কেমন ?—লাসিকা ললনা যথা লাস্য লীলা করে।

তপোবনে মুরজ মন্দিরা প্রভৃতির ধ্বনি, তপোবন বর্ণনায় উপরি উদ্ধৃত উপমার সমাবেশ বড় অসঙ্গত হইয়াছে—অশ্বমেধ যজ্ঞে যেন খেমটার নাচ হইয়াছে, দেবর্ষি নারদ যেন চাবির শিকল পরিয়াছেন! আমরা একবার যাত্রা শুনিতে গিয়াছিলাম, নকীব শ্যামা বিষয়ক গান গাইতে গাইতে 'স্বজনি লো' বলিয়া রাগিণী টানিয়াছিল তাহা আমাদের মনে পড়িল।

গ্রন্থের ভাষার আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না তাঁহাদের পক্ষে এ গ্রন্থ বুঝা সুকঠিন। যাঁহারা অল্প সংস্কৃত জানেন তাঁহাদিগকেও পাঠকালে বোধ হয় একখানি অভিধান কাছে করিয়া বসিতে হইবে। এরূপ দুরূহ, দুর্ব্বোধ্য ক্লেশোচ্চার্য্য শব্দ সন্নিবেশ করিলে গ্রন্থের সাধারণ্যে আদর হয় না। তরুণেরা কিছু শব্দাড়ম্বর প্রিয় হইয়া থাকেন, কিন্তু এ গ্রন্থে বড় বেজায় বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে, এবং তন্নিবন্ধন রচনার উপাদেয়তা অনেকটা নষ্ট হইয়াছে—"এনীশাবলেখাহীন হিমধামাননা" না বলিয়া যদি "অকলঙ্ক শশিমুখী" বলিতেন, আমরা পরম আপ্যায়িত হইতাম।

ভাষার এই জটিলতা কিয়ৎপরিমাণে অলঙ্কারপ্রিয়তার ফলও বটে—অনুপ্রাস এবং মালোপমার দায়ে অনেক স্থান দুরধিগম্য হইয়া পড়িয়াছে। স্থানে স্থানে অলঙ্কারাধিক্য নিবন্ধন ভাব স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে পায় নাই—সোণা রূপার ভারে সংকুচিত. জড়সড়, কাতর, অর্দ্ধ লুক্কায়িত, নির্জীবভাবে রহিয়াছে। গ্রন্থকারকে এই বলিতে চাই যে, পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত সোণা রূপায় ঢাকিয়া দেওয়া অপেক্ষা একখানা জড়াও গহনা ভাল—সুন্দব, সুরুচি-পরিচায়ক, মূল্যবান্ এবং সম্ভ্রান্ত। কিন্তু এ বয়সের দোষ বয়সে সারিয়া যাইবার সম্ভব।

গ্রন্থকার কল্পনাশালী ব্যক্তি বটেন। ভার্গববিজয়ের অনেক স্থলে তাহার পরিচয় আছে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা রাঘববৈবাহ লক্ষ্মীর বর্ণনার উল্লেখ করিতে পারি—ইহা নির্দ্দোষ না হইলেও সুন্দর বটে। গ্রন্থকারের কবিত্বও বিলক্ষণ আছে; তবে কিনা, যাহা বলিয়াছি তাই—এক তরফা; দৃষ্টি কেবল বাহ্য জগতের উপর, অন্তর্জগতের সঙ্গে ভাল পরিচিত নহেন। যাহাই হউক, গোপাল বাবু জয়দেবের শিষ্য বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য বটেন, সন্দেহ নাই।

অমিত্রাক্ষর পদ্য রচনায় গোপাল বাবুর বিলক্ষণ পারদর্শিতা আছে; তবে দুই এক স্থানে যে নিতান্ত গদ্যের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে তাহা মার্জ্জনীয়। গ্রন্থকার যে তরুণবয়স্ক এবং ভার্গববিজয় যে তাঁহার কবিত্বতরুর প্রথম ফল তাহা যে কেহ গ্রন্থখানি পড়িবেন তিনি বুঝিতে পারিবেন। গ্রন্থকারের নবীনত্ব বিবেচনা করিলে আমরা আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছি বলিতে হইবে। তাঁহার রচনার গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য, এবং অবিচলিত ধীরা গতির আমরা প্রশংসা করি এবং ভরসা করি গ্রন্থকার অনতিবিলম্বে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ সমালোচনার্থ আমাদের হাতে অর্পণ করিয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন।

প্রথম প্রস্তাব

ঢাকা শিক্ষাসভার মেম্বর শ্রীযুক্ত বাবু তারিণী প্রসাদ ঘোষ বি,এ, ইংরেজিতে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শিক্ষাবিভাগের একজন কর্ম্মচারী কয়েক মাস হইল প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, বিবাহিত ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে না দিলে বাল্যবিবাহ কতক নিবারণ হইতে পারে। এই প্রস্তাবনার মূল কয়েকজন বাঙ্গালি। তারিণী বাবু সেই সকল বাঙ্গালিদের বুঝাইবার নিমিত্ত গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিবেন কি না সে বিষয়ে আমাদের বড় সন্দেহ আছে। তাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের মতামত তাঁহাদের নিজের। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তাঁহারা অন্যের অনুগামী। বড়লোকের মত যত দিন না ফেরে তত দিন তাঁহাদের মত ফিরিবার আশা করা বৃথা।

তাঁহাদের স্থিরবিশ্বাস যে বাল্যবিবাহ আমাদের অনিষ্ট করিতেছে। হয় ত বাস্তবিক অনিষ্ট করিতেছে। কিন্তু তাঁহাদের এ বিশ্বাস ইংরেজ হইতে। ইংরেজদের মধ্যে বাল্যবিবাহ চলিত নাই, বাঙ্গালিরা মনে করেন যে বাল্যবিবাহ অনিষ্টকর বলিয়া ইংরেজদের মধ্যে তাহা চলিত নাই। ইংরেজরা বলেন যে বাল্য-বিবাহে সন্তান স্বল্পজীবী হয়, জনকজননীর দেহ রুগ্ন হয়। বাঙ্গালিরা মনে করেন তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি। কিন্তু স্পষ্ট দেখার কথা কতক সন্দেহের বিষয়। মনুর সময় অবধি পশ্চিমরাজ্যে বাল্যবিবাহ চলিয়া আসিতেছে কিন্তু কেহ কখন ইহার কুফল স্পষ্ট দেখেন নাই। তাঁহারা বলেন ইহার কুফল বাঙ্গালায় অতি স্পষ্ট, অধিবাসীরা দিন দিন দুর্ব্বল ও স্বল্পজীবী হইয়া যাইতেছে। দুর্ব্বল দিন দিন হইয়া যাইতেছে কি না তাহা আমরা জানি না কিন্তু বাঙ্গালিরা যে দুর্ব্বল তাহার আর সন্দেহ নাই। হিন্দু মুসলমান ফিরিঙ্গী যে জাতিই পুরুষানুক্রমে বহুকাল বাঙ্গালায় বাস করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ থাক আর নাই থাক, সেই জাতিই দুর্ব্বল হইয়াছে। বাঙ্গালার গরু, বাঙ্গালার ছাগ, বাঙ্গালার ঘোটক

সকলই খর্ব্বকায় ও দুর্ব্বল। চতুষ্পদদিগের এই দৌর্ব্বল্য কোথা হইতে আসিল? বাল্যবিবাহের দোষে নহে।

বাল্যবিবাহের মত সমর্থন করিবার নিমিত্ত আমরা এই সমালোচনা করিতে বসি নাই। লিখিতে গিয়া এ বিষয়ে ভ্রমরলেখকের মত স্মরণ হওয়ায় কয়েকটি কথা ভ্রমর হইতে উল্লেখ করিতেছিলাম। অপুষ্ট দেহে সন্তান উৎপাদিত হইলে সন্তান দুর্ব্বল হইবার যে সম্ভাবনা তাহা সত্য। অনেকেই জানেন বৃক্ষাদির বাল্য-বিবাহ আছে। অনেক স্থলে মধুমক্ষিকা তাহার ঘটক। মক্ষিকারা পুরুষ-বৃক্ষ হইতে রেণুরূপী বীজ অজ্ঞাতে বহন করিয়া স্ত্রী বৃক্ষের ফুলে মধু সংগ্রহ করিতে বসে; তাহাদের পক্ষ হইতে রেণু যদি মধু সংস্পর্শ করে তাহা হইলে বালিকাবৃক্ষের গর্ভ হয় অর্থাৎ কড়ায়া বা গুটি বাঁধে, যে সকল মালি বাল্যবিবাহের বিরোধী তাহারা ইহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত বালিকাবৃক্ষের মুকুল ভাঙ্গিয়া দেয়। কিন্তু বনে মালি নাই, তথায় বলপূর্ব্বক বৃক্ষের গর্ভস্রাব কেহ করায় না, কাজেই বালিকাবৃক্ষের ফল ধরে। ফলগুলি ক্ষুদ্র অবস্থায় অধিকাংশই ঝরিয়া যায় কিন্তু তাহাতে বনের কোন ক্ষতি হয় না। বৃক্ষেরও অভাব থাকে না ফলেরও অভাব হয় না। কিন্তু তথাপি মধুমক্ষিকাবা বড় গুরুতর অপরাধী; তাহাদের প্রবেশিকা পরীক্ষার বিষয় শীঘ্র বন্দোবস্ত হইবে অর্থাৎ তাহাদের পাখা ঝাড়া না লইয়া তাহাদের আর পুষ্পে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না!

নারিকেল সম্বন্ধে বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন যে বালিকাবৃক্ষের সুপক্ব নারিকেলের সারভাগ অতি সামান্য ও অপুষ্ট। যত্নে গৃহে রাখিলেও অন্য বৃক্ষের নারিকেলের ন্যায় তাহা দীর্ঘকাল থাকে না, শীঘ্র পচিয়া যায়। এই জন্য অনেকে বলেন বৃক্ষের প্রথম অবস্থায় নারিকেল না হইতে দেওয়াই ভাল। ভাল তাহার সন্দেহই নাই। স্বভাবের কুনিয়ম অনেক আছে, তাহা সমুদয় সংস্কার করা নিতান্ত আবশ্যক। যখন ইংরেজি অধ্যয়ন হইতেছে তখন পৃথিবীর নিয়মাবলী যে শীঘ্র সংশোধন করিতে পারা যাইবে এমত ভরসা অনেকে করিয়া থাকেন।

যাঁহারা এরূপ ভরসা করেন তাঁহারা প্রকৃত সাহসী ও অনেক সময় দেখা যায় বাস্তবিক কার্য্যপটু। সকল দেশেই এরূপ কৃতকর্ম্মা লোক আছে; তবে কোন দেশে অধিক, কোন দেশে অল্প। বোধ হয় ফ্রান্স ও মার্কিন দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সমাজ ভাঙ্গা গড়া ইহাদের প্রধান কার্য্য। কোন সমাজ প্রথাই ইহাদের মনে ধরে না। কি পরিবর্ত্তন করিবেন এই তাঁহাদের সতত চেষ্টা অনেক সময় সেই চেষ্টায় গুরুতর অনিষ্ট ঘটে। কারণ সমাজতত্ত্ব বুঝিতে অনেক বিলম্ব আছে।

হঙ্গেরী দেশের এই দলের লোকেরা একসময় বিবেচনা করিলেন লোকের যে দৈন্যদশা দেখা যায় তাহা কেবল বিবাহের দোষে। যাহাদের বিশেষ ধন সম্পত্তি নাই, তাহারা বিবাহ করিলে সন্তানসন্ততি কষ্ট পায়, সন্তান প্রতিপালন কবিবার নিমিত্ত তাহাবা চুরি পর্য্যন্ত কবে। অতএব দীনদুঃখীর বিবাহ বন্ধ করা নিতান্ত আবশ্যক। এই সম্বন্ধে মহা চীৎকার আরম্ভ হইল, আমাদের দেশে কয়েকজন বাঙ্গালি বাল্য বিবাহ লইয়া যেরূপ চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন হঙ্গেরীর যুবারা সেইরূপ কোলাহল কবিতে লাগিলেন। শেষ, আইন হইল যে লোকে ধনবান্ না হইলে বিবাহে অধিকারী হইবে না। যুবাদের আর আহ্লাদেব সীমা রহিল না। তাহারা মনে কবিতে লাগিলেন যে এই আইনের দ্বারা তাঁহাদের রাজ্যের সকলেই ধনবান হইবে। বাভেরিয়া রাজ্য এইবার সর্ব্বপ্রধান হইবে। এবং তাঁহাদের কীর্ত্তি জগৎব্যাপ্ত থাকিবে।

কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ এ সকল কিছুই হইল না অল্প দিনের মধে অতি বিপরীত ফল ফলিল। বাজাজ্ঞায় নির্দ্ধনের আর বিবাহ হইল না সত্য, কিন্তু তথাপি তাহাদের সন্তান হইতে লাগিল। সে সকল অবিবাহিত অবস্থার সন্তান। এক মিউনিচ নগরে যত সন্তান জন্মিল তাহার অর্দ্ধেক জারজ।

এইরূপ ঘটনা অনেক আছে। সংস্কার করিতে গিয়া অদূরদর্শী লোকেরা সমাজেব এইরূপ অনেক অনিষ্ট ঘটাইয়া থাকেন। তাহা বলিয়া তাঁহাদের নিন্দা করি না। কেহই এ জগতে অভ্রান্ত নহেন, বরং তাঁহারা আপনাদিগকে অভ্রান্ত বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন এই তাঁহাদের এক বিশেষ গুণ। আপনাকে ভ্রান্ত মনে কবিয়া কার্য্য করিতে গেলে একাগ্রতা জন্মে না।

এই শ্রেণীর লোক, ভালই হউন মন্দই হউন, বাঙ্গালায় বড় নাই। এখানে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, ইংরেজেরা তাঁহাদের সচরাচর ইয়াং বেঙ্গাল বলিয়া থাকেন। তাঁহারাই মনে করেন যে যখন ইংরেজি অধ্যয়ন আরম্ভ হইয়াছে তখন স্বভাবেব যত কুনিয়ম দেখা যায় সে সমুদয়ের উচ্ছেদ হইবে। তাঁহারাই মনে করেন প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রজাপতির দ্বারস্বরূপ ; তথায় পাহারা বসাইতে পারিলে বাল্যবিবাহ সাগরপারে পলাইবে। আসল কথা, তাঁহারা নিজে বিবেচনা করিয়া কোন কার্য্য উদ্ভাবন করিতে পারেন না। যাহা কিছু তাঁহারা করেন সকলই অন্যের অনুকরণ মাত্র, অনুকরণ মন্দ নহে, তদ্দ্বারা উন্নতিসাধন হয় কিন্তু তাঁহাদের চিন্তাশীলতা এতই অল্প যে কোন্ বিষয় অনুকরণীয় আর কোন্‌টি বর্জ্জনীয় তাহা তাঁহারা প্রায় একেবারে বুঝিতে পারেন না, এই জন্য সচরাচর তাঁহারা সাহেবদিগের নিকট ঘৃণিত।

বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে এই দলের প্রধান আপত্তি যে তদ্দ্বারা মনুষ্য অল্পায়ু হয়, দেহ রুগ্ন হয়। কিন্তু মদ্যপানেও ত তাহা হয়, অথচ তাঁহারা কেহ বলেন না যে, যে ছাত্র মদ্যপান করিয়াছে তাহাকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না। ইংরেজদের মধ্যে মদ্যপান আছে এইজন্য ইয়াং বাঙ্গালিরা মদ্যপান নিষেধ করেন না, বরং আপনারা তাহা পান করিয়া আরও উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। ইংরেজদের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই, কাজেই ইয়াং বাঙ্গালির নিকট বাল্যবিবাহ দোষের হইয়াছে। তাহাই বলিতেছিলাম যে ইয়াং বেঙ্গাল কেবল অনুকরণপ্রিয়, চিন্তাশীলতা তাঁহাদের কিছুমাত্র নাই।

আমাদের দেশে ইয়ং বাঙ্গালির সংখ্যা অল্প, এত অল্প যে তাঁহাদের কোন কার্য্য বঙ্গসমাজের অন্তর স্পর্শ করে না। তাহারা বঙ্গসমাজের কেহই নহে বলিলে চলে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা সাগর সম্বন্ধে যেরূপ, ইহাবা বঙ্গসমাজ সম্বন্ধে সেইরূপ। তরঙ্গ কেবল সাগরের উপরে ভাসে উপরে লম্প ঝম্প করে, ফেণা প্রক্ষেপ করে, ক্ষুদ্র কীটেরা সেই ফেণায় আশ্রয় লয়। তরঙ্গের কতই আস্ফালন, কতই গর্জ্জন, কতই গলাবাজি কিন্তু সাহস করিয়া নিকটে যাও পদে আছড়াইয়া পড়িবে। স্পর্শ কর দেখিবে অতি মসৃণ কোমল জল মাত্র।

ইংরেজেবা ইহাদিগকে ইয়াং বেঙ্গাল অর্থাৎ নূতন বাঙ্গালি বলেন কিন্তু বাস্তবিক ইহারা নূতন নহেন। সম্প্রতি ইংবেজ আসিয়াছেন বলিয়া ইংরেজি শিক্ষায় যে এই দল জন্মিয়াছে এমত নহে এই দল বাঙ্গালায় চিরকাল আছে। মুসলমানের সময় সাত শত বৎসব পর্য্যন্ত ইহাদিগকে অবিকল এইরূপ ক্রীড়া করিতে দেখা গিয়াছে। ইহারাই তখন সর্ব্বাগ্রে "মের্জ্জাই" পরিয়া মের্জ্জা সাজিয়াছিলেন, চুল বাউরি করিয়াছিলেন, হাতে মেন্দি মাখিয়াছিলেন "কুর্নিস" অভ্যাস করিয়াছিলেন। ইহারাই শকাব্দ ছাড়িয়া মহাম্মদাব্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারাই অগ্রে দীল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা বলিয়াছিলেন। ইহারাই "জানানা" মহলে অগ্রে চাবি দিয়াছিলেন। এক্ষণে ইংরেজ আমলে ইহারাই অগ্রে মের্জ্জাই ছাড়িয়া সর্ট পরিয়াছেন, চুল ছাঁটিয়াছেন, "জানানা মহলে" চাবি খুলিতেছেন, শক সন ত্যাগ করিয়া "এই উনবিংশ শতাব্দী" বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কুর্নিস ত্যাগ করিয়া মাথা নাড়িতেছেন, রাজা প্রজা সমান বলিতেছেন। .

যাঁহাদের বঙ্গসমাজের তরঙ্গস্বরূপ বলিয়া পরিচয় দিলাম আমরা তাঁহাদের সম্পূর্ণ নিন্দা করি না। তাঁহাদের দ্বারা অনেক সময় অন্যের কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। চৈতন্য তাঁহাদেরই দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই দলের লোক বাঙ্গালায় না থাকিলে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন তাহা বলা যায় না। কেবল অনুকরণপ্রিয়তা গুণের নিমিত্ত যে এই ব্যক্তিরা অন্যের হস্তগত হইয়া পড়েন

এমত নহে তাঁহারা নূতন ভালবাসেন, যাহা কিছু নূতন দেখেন বা শুনেন তাহাই ভাল বলিয়া গ্রহণ করেন। এইজন্য ইঁহারাই প্রথম বৈষ্ণব হন। ইঁহারাই আবার প্রথম খৃষ্টান হইতে আরম্ভ করেন। এতদিন সকলেই খ্রীষ্টান হইয়া পড়িতেন কেবল সময়মত ব্রাহ্মধর্ম্ম উপস্থিত হওয়ায় ইঁহারা সে পথ হইতে বিরত হইয়াছেন।

আপাততঃ কিছু নূতন নাই। ইংরেজি খানা, ইংরেজি পোষাক পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা হউক, নতুবা ইংরেজদের সকল বিষয়েই একপ্রকার অনুকরণ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আর দিন কাটে না। তাহাই আর ইয়াং বাঙ্গালিদের সম্বন্ধে কোন নূতন ব্যাপার শুনিতে পাওয়া যায় না। তবে কেহ কেহ অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় মধ্যে মধ্যে বাল্যবিবাহ! বিধবাবিবাহ! বলিয়া দুই এক শব্দ করিতেছেন মাত্র।

বাল্যবিবাহ যদি বাস্তবিক মন্দ হয়, আসুন, সকলেই তাহা ত্যাগ করি। কিন্তু প্রথমে বঙ্গসমাজকে প্রতীত করান যে বাল্যবিবাহ মন্দ, বাল্যবিবাহের কোন গুণ নাই সকলই দোষ। তাহা না করিয়া যদি কেবল ইংরেজদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন তাহা হইলে কিছুই হইবে না। তাহা হইলে বঙ্গসমাজ এই দলকে যেরূপ অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে সেইরূপ করিতে থাকিবে। কোন ফল হইবে না। গ্যারেট সাহেবের মত লোক ভিন্ন আর তাঁহাদের উপায় থাকিবে না।

বঙ্গদেশীয় অনেকেই "উড়িয়া" অথবা "উড়িষ্যা" নাম শুনিবামাত্র ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা উড়িয়াদিগের এবং উৎকল দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অবগত হইতে পারিলে তাঁহাদের কুসংস্কার অপনোদিত হইবার সম্ভাবনা। আমি উৎকল প্রদেশে অনেকদিন বসবাস করত উৎকল প্রদেশের পুরাকালিক এবং বর্ত্তমান সাময়িক আভ্যন্তরীণ অবস্থা যাহা অবগত হইয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

উৎকলদেশের ইতিহাসলেখকেরা উৎকলবাসীদিগের জাতিনির্ব্বাচন সম্বন্ধে অনেক স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তজ্জন্য প্রথমে উৎকলের পুরাকালিক বিষয় কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা আবশ্যক। হণ্টার সাহেব বলেন "বর্ণভেদ হইবার পূর্ব্বে আর্য্যজাতি উৎকল এবং বঙ্গদেশে বাস করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই মনুর নির্দ্দিষ্ট চতুর্ব্বর্ণ এ দুই দেশে নাই।" হণ্টার বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই বলিয়া জাতিনির্ব্বাচন সম্বন্ধে তাঁহার ঈদৃশ ভ্রম হইয়াছে। মনু লিখিত চতুর্ব্বর্ণ ই বহু প্রাচীনকাল হইতেই উৎকলে বসবাস করিতেছেন তৎপক্ষে প্রমাণের অপ্রতুল নাই; কিন্তু মনুর পূর্ব্বে আর্য্যজাতি যে উৎকলে আসিয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। আর্য্যজাতিগণ যৎকালে আর্য্যাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে অবস্থিতি করেন তৎকালে উৎকলপ্রদেশে "কন্দ" প্রভৃতি অসভ্যজাতিদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বসবাস করিবারই সম্ভাবনা। যে সকল আর্য্যসন্তানগণ গুরুতর অপরাধ করিতেন, তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিবার বিধি মনুতে প্রত্যক্ষ করা যায়। কদর্য্য স্থানই নির্ব্বাসনভূমি নির্দ্দিষ্ট হওয়াই চিরপ্রচলিত রাজনীতি; *

---

* ন জাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্ব্ব পাপেষ্বপিস্থিতং।
রাষ্ট্রাদেনং বহিঃ কুর্য্যাৎ সমগ্রধন মক্ষতং॥
মনু ৮অ, ৩৮০ শ্লো।
বিকর্ম্মস্থান্ শৌণ্ডিকাং শ্চ ক্ষিপ্রং নির্ব্বাসয়েৎ পুরাৎ।
মনু ৯অ, ২২৫ শ্লো।

বোধ হয় এই জন্যই তৎকালে উৎকল প্রদেশই নির্ব্বাসন ভূমি অবধারিত ছিল। সকল প্রবাদবাক্যের মধ্যে আংশিক সত্য থাকা যদ্যপি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে প্রাচীনকালে উৎকল প্রদেশ কেন "যমালয়" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা কতক বুঝা যায়; উৎকল প্রদেশ যমালয় নামে প্রসিদ্ধ ছিল। "বৈতরণী নদীই" তাহার প্রমাণ স্বরূপ। "বৈতরণী" প্রেত উদ্ধারের স্থান।†

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চতুর্ব্বর্ণের নিয়ম সকল মনু, বিধিবদ্ধ করত পশ্চাৎ যে পতিত ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, ‡ এক্ষণে দেখা যায়, ঐ সকল পতিত ক্ষত্রিয় বংশের মধ্যে তিন শ্রেণীর বংশ বহুকাল হইতে উৎকল প্রদেশে বসবাস করিতেছেন। "পাণ" এবং "অড়" উপাধিবিশিষ্ট যে দুটি নীচ জাতি আছে তাহাদের মধ্যে "পাণ" জাতিটি মনুর লিখিত "পৌণ্ড্রক" বংশীয়, এবং "ওড্র" হইতে "অড়" অথবা "ওড়" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণগণও গুরুতর অপরাধ করিলে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবার বিধি রহিয়াছে, বোধ হয় সেই সকল অপরাধী ব্রাহ্মণগণ, আর্য্যাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি স্থান হইতে বিতাড়িত হইলে উৎকল প্রদেশেই উপস্থিত হইয়া উপনিবাস সংস্থাপন করিতেন। উৎকল প্রদেশে "দাস" উপাধিকারী এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ আছেন; ব্রাহ্মণবংশে "দাস" উপাধি থাকা ভারতবর্ষের কোন স্থানেই শুনা যায় না, কেবল উড়িষ্যা প্রদেশেই ব্রাহ্মণজাতি মধ্যে "দাস" উপাধি শুনা যায়। "দাস" উপাধিটী নিতান্ত ঘৃণাসূচক। ব্রাহ্মণবংশে "দাস" উপাধি প্রচলিত থাকায় স্পষ্টই অনুভব হয় যে বহু প্রাচীনকাল হইতে যে সকল পতিত ব্রাহ্মণগণ আর্য্যাবর্ত্ত অথবা ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে বিতাড়িত হইয়া উৎকল প্রদেশে বসবাস করিতেন আর্য্যাবর্ত্তবাসী অথবা ব্রহ্মাবর্ত্তবাসী ব্রাহ্মণগণ ঐ সকল ব্রাহ্মণবংশীয়কে পতিত মনে করিয়া "দাস" উপাধি প্রদান করত ঘৃণা প্রকাশ করিতেন; অথবা এমনও হইতে পারে যে যৎকালে আর্য্যগণ উৎকলপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া উড়িষ্যার নানা স্থানে

---

† এই জন্যই কি এ দেশীয়দিগের চিরবিশ্বাস যে দক্ষিণ দিকে যমালয়? পল্লীগ্রাম অঞ্চলের অনেকে দেখা যায় দক্ষিণ দিকে যাও বলিলে যমালয় যাও বলা হইল বিবেচনা করেন তাহার কি এই কারণ? সম্পাদক।

‡ ঝল্লো মল্ল শ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবি রেবচ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এবচ॥

মনু ১০ অ, ২২ শ্লোক।

পৌণ্ড্রকা শ্চৌড্র দ্রবিড়াঃ, কাম্বোজা যবনাঃ, শকাঃ,
পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ, কিরাতা দরদাঃ, খশাঃ॥

মনু, ০১ অ ৪৪ শ্লো।

উপনিবাস সংস্থাপন করেন, তৎকালে যে সকল ব্রাহ্মণবংশীয়গণ আচারভ্রষ্ট, পতিত হইয়া বহু প্রাচীনকাল হইতে উড়িষ্যাপ্রদেশে নির্ব্বাসিত ছিলেন তাঁহাদিগকে "দাস" বলিয়া ঘৃণা করিতেন, তজ্জন্যই উড়িষ্যায় একটি শ্রেণীর ব্রাহ্মণবংশে "দাস" উপাধি এক্ষণপর্য্যন্ত গোচর রহিয়াছে।*

উৎকলদেশে এক্ষণে অন্যান্য যে সকল ব্রাহ্মণ বসবাস করিতেছেন। তাঁহাদিগের উপাধি শ্রবণ করিলে তাঁহারা যে অতি অল্পকাল উড়িষ্যাতে উপস্থিত হইয়া বসবাস করিতেছেন, তাহা স্পষ্টই অনুভব হয়। উড়িষ্যাতে "দোবাই" উপাধিধারী ব্রাহ্মণ আছে। সংস্কৃত "দ্বিবেদী" হইতে হিন্দি "দোবে" উৎপন্ন, "দোবে" হইতে উড়িয়া "দোবাই" হইয়াছে। উড়িয়া ব্রাহ্মণ বংশে "তেহাড়ি" উপাধি আছে। সংস্কৃত "ত্রিবেদী" হইতে হিন্দি "তেয়ারি উৎপন্ন, উক্ত তেয়ারির অপভ্রংশ উড়িয়া "তেহাড়ি" উপাধি হইয়াছে। সংস্কৃত পণ্ডিত হইতে হিন্দি "পাঁড়ে" এবং হিন্দি পাঁড়ে হইতে উড়িয়া "পাণ্ডা" উপাধি সমুৎপন্ন হইবারই সম্ভাবনা। উড়িষ্যায় "মিশর" উপাধি আছে। সংস্কৃত "মিশ্র" উপাধি উৎপন্ন স্পষ্টই জানা যায়। এই সকল ব্রাহ্মণবংশীয়গণ উৎকলে অল্পকাল উপস্থিত হওয়া অনুভব অসঙ্গত বোধ হয় না।

"মাহান্তি" অথবা "মাইতি" উপাধিবিশিষ্ট একটি জাতি উৎকলদেশে আছেন, তাঁহারা এক্ষণে আপনাদিগকে "করণ" বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। মনুর উল্লিখিত "করণ" শব্দ হইতে "মাহান্তি" অথবা "মাইতি" শব্দ কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, উৎকলের রাজাদিগের নিকটে তাঁহারা "মাহাতি" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু রাজ উপাধি বংশগত অথবা ব্যক্তিগতই প্রচলিত, জাতিগত কোন রাজ্যেই ত প্রত্যক্ষ হয় না। অমরকোষে "অম্বষ্ঠ করণাদয়" ইত্যাদি লিখিত আছে, তদ্দারা করণজাতি শঙ্কর জাতিমধ্যে পরিগণিত; কিন্তু উড়িষ্যার মাহিতি জাতির অশৌচ পালনের রীতি যাহা প্রচলিত আছে (অর্থাৎ ১০ দিবস অশৌচ গ্রহণ করা) তাহা মাহিতিদের মধ্যেও প্রচলিত, কিন্তু বৈদ্য প্রভৃতির ১৫ দিবস অশৌচ গ্রহণের ব্যবস্থা প্রচলিত; বৈদ্যদিগের স্বগোত্রে বিবাহ হয় না, কিন্তু মাহিতিদের মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ প্রচলিত আছে, তখন উড়িষ্যার মাহিতি জাতিটী

* এক্ষণে দেখা যায় যে যে সকল বাঙ্গালিরা ইদানীং তিন চারি পুরুষ অবাধে উড়িষ্যায় বাস করিতেছেন তাঁহারা "কেয়া" বাঙ্গালি বলিয়া উড়িষ্যায় পরিচিত। "কেয়া বাঙ্গালি" বড় সম্মানের উপাধি নহে। এই সকল ব্যক্তি বাঙ্গালায় আসিলে সমাজে বড় একটা গৃহীত হন না। পশ্চিম অঞ্চলে যাঁহারা বহু পুরুষ অবধি বাস করিতেছেন তাঁহারা গৃহীত হইয়া থাকেন। উড়িষ্যার পক্ষে এ পৃথক্ নিয়ম কেন? সম্পাদক।

মনুলিখিত করণ অথবা অমরসিংহের উল্লিখিত শঙ্করবর্ণ করণ, তাহা স্বীকার করিতে পারা যায় না। এই মাহিতিজাতি মেদিনীপুর অঞ্চলে বহুকাল হইতে বসবাস করিয়া দক্ষিণ রাঢ়ীয় কৈবর্ত্তের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন, তৎপক্ষে একটি প্রস্তাব আমা কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল।

উৎকলদেশে "খণ্ডাইত" নামধারী একটী জাতি আছে। তাহাদের বিবাহের সময়ে উপবীত হইবার রীতি প্রচলিত আছে। এই "খণ্ডাইত" শব্দ, "ক্ষত্রিয়" অথবা "খণ্ডধারী" "খড়্গধারী" ইত্যাদি পদের অপভ্রংশ বলা যাইতে পারে। এই জাতি বহু প্রাচীনকাল হইতে উৎকলদেশে অবস্থিতি করিতেছেন। এই জাতি উপবীতধারী হইয়াও শূদ্রজাতি মধ্যে পরিগণিত, ইহারা মাহিতি জাতিতে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন, এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ঐ জাতিও পতিত এবং আচারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

উৎকলদেশে ব্রাহ্মণ, মাহিতি, খণ্ডাইত এই তিনটিই শ্রেষ্ঠজাতি, এবং পাণ, ওড় প্রভৃতি নীচজাতি বহু প্রাচীনকাল হইতেই এই দেশে বসবাস করিতেছে; এই সকল জাতি মনুর উল্লিখিত বর্ণভেদ হইবার পরে যে উৎকলে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে, তবে হণ্টার সাহেব কি উপলক্ষ করিয়া বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বলা যায় না, মনুর পূর্ব্বে আর্য্যগণ উৎকলে বসবাস করিয়াছিলেন তাহার কোন যুক্তি বা প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

"উৎকল" শব্দ "ভারবহ" হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু "কল" শব্দে মধুরধ্বনি বুঝায় মনে করিয়া উৎকল দেশের নাম প্রতিপন্ন করা কেবল এণ্ডাবান্ দ্বীপবাসী ভিন্ন কোন সভ্য জাতির বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক বোধ হয় "ওড্র" অথবা "উড্র" জাতির বাসস্থল বলিয়া উড়িষ্যা নাম, এবং "ওড্র" অথবা "উড্র" শব্দ হইতে "ওড়িয়া" কিম্বা "উড়িয়া" নাম প্রচারিত হইয়া থাকিবে।

বহু শতাব্দী পরে যখন আর্য্যগণ উৎকল প্রদেশে উপনিবাস সংস্থাপন করেন, তৎকালে উৎকল দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করত বিমোহিত হইয়া আর্য্য ঋষিগণ উৎকল প্রদেশকে পুণ্যভূমি বলিয়া প্রচারিত করেন; এবং উৎকল প্রদেশে পুণ্য প্রবাহিণী নদী ও তপস্যার অনুকূল ফল পুষ্পাদি পরিপূর্ণ বলিয়া উৎকল ভূমির অনেক গৌরব প্রচার করেন; বোধ হয় উৎকল প্রদেশে উপনিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করাইবার জন্যই আর্য্য ঋষিগণ উৎকল প্রদেশের ঈদৃশ অত্যুক্তিপূর্ণ বর্ণনা সকল করিয়াছিলেন। যাহা হউক পৌরাণিক কালের মধ্যাবস্থায় উৎকল প্রদেশে আর্য্যগণ উপনিবাস সংস্থাপন করিতে আরম্ভ করেন, এইরূপ

অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। ঐ সময়েই উৎকল প্রদেশ পঞ্চ কলিঙ্গের অন্তর্গত "কলিঙ্গ" নামে বিখ্যাত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; ঐ সময় হইতেই উৎকল প্রদেশে রাজশাসন, সামাজিক শাসন, ধর্ম্মশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। উৎকল প্রদেশে পৌরাণিক কালের মধ্যে কোনরূপ সংস্কৃত কাব্যাদি প্রকটিত হইবার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বৌদ্ধদিগের সময়েই উড়িষ্যায় সৌভাগ্যলক্ষ্মী উদিত হন, এবং বৌদ্ধদিগের সময় হইতেই উড়িষ্যার প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়; বৌদ্ধদিগের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব সময়ে উৎকলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার অনুসন্ধান করিতে গিয়া কেবল মাত্র উপন্যাস ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না; অতএব যে অংশ গালগল্পের উপরে নির্ভর করে, সে অংশটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৌদ্ধদিগের সময় হইতে উৎকলের আভ্যন্তরীণ বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

মহর্ষি শাক্যসিংহেব শিষ্যগণ উৎকল প্রদেশে যখন উপস্থিত হন, তখন উৎকলের আদিমবাসী অর্থাৎ যাহারা আর্য্যাবর্ত্ত ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া বংশপরম্পরায় উৎকল প্রদেশে বাস করিতেছিলেন এবং উপনিবাসী আর্য্যসন্তানগণ কর্ত্তৃক ঘৃণিত নিষ্পীড়িত সমাজচ্যুত অপমানিত হইয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা সময় পাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নিষ্পীড়িত লোক একটুমাত্র অবলম্বনের উপায় প্রাপ্ত হইলেই শতগুণ উৎসাহের সহিত কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ; তাহাতে আবার বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণ অত্যন্ত বিনীতস্বভাব ছিলেন, কি ক্ষুদ্র কি নীচ কি ধনী মানী কি রাজা প্রজা সকলকে সমভাবে আলিঙ্গন করা, সকলের অন্ন গ্রহণ করা, সকল নর নারীকে মুক্তির পথে আকর্ষণ করা তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল, অথচ আর্য্যদিগের ব্রহ্মচর্য্যের রীত্যনুসারে যোগাদি সাধন করাও তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল; এই সকল অকপট ধর্ম্মভাব তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করত উৎকল-বাসী নিষ্পীড়িত নরনারী সকল আগ্রহের সহিত বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। উৎকলবাসী যাহারা পতিত বলিয়া চিরকাল ধর্ম্মের সুখলাভে চিরবঞ্চিত হইয়া পুরুষানুক্রমে হীন হইয়া আসিতেছিলেন বৌদ্ধধর্ম্ম. প্রচারকগণের এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের উদারতা দেখিয়া তাঁহারা যেমন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন, সেইরূপ জীবন্ত উৎসাহের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিসাধনে প্রাণপণে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। সেই সকল নিষ্পীড়িত লোকদিগের অন্তরে নূতন ধর্ম্মভাব বিকসিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মোন্মত্ততা উপস্থিত হয়, তজ্জন্য সত্বর উৎকল দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছিল। সেই সকল উৎকলবাসী ধর্ম্মোন্মত্ত বৌদ্ধদিগের যে সকল

প্রাচীন কীর্ত্তি উৎকল দেশের নানাস্থানে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে পৃথিবীর অপর কোন স্থানে একত্রে এতাধিক প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান থাকার পরিচয় বড় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রাচীন উড়িয়াগণ কিরূপ উৎসাহী এবং ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন তাঁহাদের প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভগুলিই তাহার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেছে।

ক্রমশঃ

শ্রীদীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ষষ্ঠ বর্ষ ঃ সপ্তম সংখ্যা

পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে জনসমাজের দুই প্রকার অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, অবাতকম্পিততড়াগের ন্যায় নিশ্চল। দ্বিতীয় আন্দোলনপূর্ণ ও পরিবর্ত্তনশীল। এই উভয় প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া মানবজাতির সামাজিক জীবন চলিয়া যায়। যখন লোকে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে শ্রদ্ধার সহিত চিরাগত ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হইয়া চলে, তখনই 'জনসমাজের নিশ্চল অবস্থা। আর যখন প্রচলিত আচার ও সংস্কারাদির প্রতি শ্রদ্ধার লাঘব হয়, যখন নূতনবিধ আচার ও বিশ্বাসের দিকে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে থাকে ;—পুরাতন পত্র স্খলিত হইয়া নূতন পত্র উদ্ভিন্ন হইতে থাকে ; তখনই জনসমাজের পরিবর্ত্তনের অবস্থা।

প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন সেন্টপল রোমনগরে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম-প্রচারার্থ গমন করেন, তখন তথাকার এই অবস্থা। প্রচলিত পৌত্তলিকতার প্রতি সাধারণ লোকের বিশ্বাস ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ চিরপূজ্য দেবদেবীগণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। একজন প্রসিদ্ধ লেখক বলেন যে, তৎকালীন রোমনগরে পুরোহিতদিগের মন হইতেও বিশ্বাস অন্তর্হিত হইতেছিল ; এমন কি, তাঁহারা কোন কুসংস্কারমূলক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক সময় পরস্পরের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না ; পাছে হাস্যসম্বরণে অক্ষম হইয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলেন ! এই পরিবর্ত্তনস্রোত ক্রমশঃ বহমান হইয়া, সেন্টপলের ধর্ম্মপ্রচারের পর কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই রোমরাজ্যে ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে প্রায় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিল। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার সময়েও এই প্রকার ঘটিয়াছিল। অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। ইতিহাস পাঠকমাত্রেই জানেন যে, সকল দেশেই সময়ে সময়ে উক্তরূপ পরিবর্ত্তনের অবস্থা উপস্থিত হয়।

এক্ষণে আমাদের দেশের ঐ প্রকার অবস্থা ; অতিশয় গুরুতর সামাজিক পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে। মুখ উন্মুক্ত করিয়া দিলে বহুকালের বদ্ধ নদী যেমন স্রোতস্বতী হয়, সেইরূপ পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এই প্রাচীন স্থির-ভাবাপন্ন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ বিচলিত হইয়াছে। লোকের চিন্তার গতি ভিন্ন দিকে চলিয়াছে ; সুতরাং কি সামাজিক, কি ধর্ম্মবিষয়ক, সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে।

এই গুরুতর সময়ে চিন্তাশীল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য কি? "যাহা হয় হউক, দেশের কি হইবে না হইবে ভাবিয়া আমাদের মাথা ধরাইবার প্রয়োজন নাই" এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না। পরিবর্ত্তন মাত্রেই যদি হিতকর হইত, তাহা হইলে ত কোন কথাই ছিল না। কিন্তু পরিবর্ত্তনে ভাল হয়, মন্দও হয়। পরিবর্ত্তনেই রোমসাম্রাজ্যের পতন, পরিবর্ত্তনেই ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিলোপ, পরিবর্ত্তনেই এখন মিতাচারী হিন্দুজাতির মধ্যে সুরাপানের স্রোত দিন দিন প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। পরিবর্ত্তনমাত্রেই যে ভাল হয় এরূপ নহে।

যে পরিবর্ত্তন এখন সংঘটিত হইতেছে কাহারও সাধ্য নাই যে, তাহার গতিরোধ করে ; এবং গতিরোধ করা প্রার্থনীয়ও নহে। কে না স্বীকার করিবে যে, সামাজিক কদাচার সকল বিদূরিত হইয়া তাহার স্থানে সদাচার সকল প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। পরিবর্ত্তন হইবেই, তবে যাহাতে সেই পরিবর্ত্তন মঙ্গলের দিকে যায়, প্রত্যেক সুশিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তির এ প্রকার যত্ন করা কর্ত্তব্য।

মঙ্গলের দিকে লইয়া যাইবার উপায় কি? যাহা সত্য বলিয়া, ভাল বলিয়া বুঝিয়াছি, যাহাতে তাহা অন্য লোকেও বুঝিতে পারে, এমন চেষ্টা করা। পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ, প্রকাশ্য বক্তৃতা, পরস্পর কথাবার্ত্তা ও তর্ক বিতর্ক প্রভৃতি উপায় দ্বারা সাধারণতঃ সত্য প্রচার হইয়া থাকে।

কিন্তু ঐ সকল করিলেই কি যথেষ্ট হইল? কখনই না। আমি লোককে যে সত্য শিখাইতে যাইব আমাকে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। মুখে বলিব, কাজে করিব না, লোকে তাহা শুনিবে কেন? যাঁহারা মানব-প্রকৃতি ভাল করিয়া বুঝেন তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, দৃষ্টান্ত না দেখিলে কেবল উপদেশে লোকে তাদৃশ আকৃষ্ট হয় না। অনেক সময়েই সে প্রকার উপদেশের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকে। একজন পরস্বাপহারী ব্যভিচারী পাষণ্ড ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলে কে তাহার কথা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করে?

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ অনেক লোক আছেন যাহারা বলেন যে, "যে সকল চিরপ্রচলিত সামাজিক প্রথার অনিষ্টকারিতার বিষয় বুঝিয়াছ, তাহার বিরুদ্ধে পুস্তক লেখ, বক্তৃতা কর, তাহাতে আপত্তি নাই ; কিয়ৎপরিমাণে তদনুযায়ী কার্য্য কর তাহাতেও আপত্তি নাই ; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে করিও না। যতদূর করিলে সমাজের লোক সহ্য করিতে পারে, ততদূর কর ; তাহার অধিক আর যাইও না।" "সমাজের লোক সহ্য করিতে পারে" অর্থাৎ সমাজচ্যুত করিয়া না দেয়।

যাঁহারা এ প্রকার বলেন তাঁহাদের যুক্তি আছে। যুক্তি এই যে, "তুমি যদি কোন উন্নত সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে থাক, কিন্তু যদি দেশের সাধারণ লোকের মনে চিরপ্রচলিত তদ্বিরোধী ভ্রমাত্মক সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া থাকে তবে তাহারা তোমার আচরণ কখনই সহ্য করিতে পারিবে না। তাহারা তোমাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে ; তোমার সহিত আহারাদি বা আদান প্রদান করিবে না। সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইলে সমাজের ভিতর আর তোমার কোন ক্ষমতা চলিবে না, সুতরাং তোমার দ্বারা সমাজের কোন উপকারের সম্ভাবনা থাকিবে না।"

সমাজের বাহিরে থাকিলে সমাজের ভিতরে কোন প্রভাব থাকে না, সমাজের কোন প্রকার উন্নতিসাধন করা যায় না, আমরা এ কথা স্বীকার করি না। যাঁহারা এমন কথা বলেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ কথা বলেন। এখন হিন্দু-সমাজে যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে তাহার মূল সমাজের ভিতরের লোক, না বাহিরের লোক? চক্ষুকর্ণবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার কবিতে হইবে যে, এ পরিবর্ত্তনের মূল কারণ ইউরোপীয়গণ। ইংলণ্ডের অধিকারে আসাতেই আমাদের দেশে এ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। সমাজের ভিতরের লোক পরিবর্ত্তনের কারণ নয়, সমাজের বাহিরের লোকই উহার মূল কারণ। এদেশে ইংরেজ অধিকার না হইলে এ পরিবর্ত্তনস্রোত কে প্রবাহিত করিত? লোকে যত ইউরোপীয়দিগের সংস্পর্শে আসিতেছে, যত পাশ্চাত্য জ্ঞান চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতেছে, সেই পরিমাণে হিন্দুসমাজের ভিত্তি মূল পর্য্যন্ত বিকম্পিত হইয়া উঠিতেছে। প্রস্তাব লেখকের জনৈক বন্ধু যথার্থই বলিলেন যে, আজকাল যে "আর্য্য" "আর্য্যবংশ" "আর্য্যগৌরব" বলিয়া চীৎকার উঠিয়াছে, হিন্দুসমাজভুক্ত কোন ব্যক্তি ইহার হেতু নহে। সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মান পণ্ডিত মোক্ষমূলর ইহার প্রধান কারণ। তবে কেমন করিয়া বলিব যে, সমাজের বাহিরে থাকিলে সমাজের ভিতর ক্ষমতা চলে না?

অতীত সাক্ষী ইতিহাস কি বলে একবার দেখা যাউক। প্রাচীন গ্রীস ও রোমবাসিগণ আমাদিগের ন্যায় পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম

কেমন করিয়া সেই পৌত্তলিকতার বিলোপসাধনপূর্ব্বক তাহার সিংহাসন অধিকার করিল? সেণ্টপল—একজন য়িহুদি তাহার মূল কারণ। তিব্বৎ সিংহল প্রভৃতি দেশে ভারতবর্ষীয় প্রচারকেরা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া উক্ত দেশ সকলের সমাজের আকার নূতন করিয়া দিয়াছিলেন। অধিক দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্মপ্রচারের পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, শত শত স্থলে সমাজের বাহিরের লোক আসিয়া সমাজের ভিতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইংলণ্ডবাসিগণ সর্ব্বপ্রথমে সভ্যতাসোপানে কেমন করিয়া আরোহণ করিলেন? বিদেশীয় রোমান জাতির সংস্পর্শে আসাই কি তাহার কারণ নহে? তবে কেমন করিয়া বলিব যে, সমাজের ভিতরে না থাকিলে সমাজের কোন উপকার করা যায় না, সমাজে কোন প্রকার ক্ষমতা চলে না?

সমাজে থাকা কাহাকে বলে? সমাজের লোকের সহিত একত্রে আহার ও পরস্পর আদান প্রদান থাকিলেই সমাজে থাকা হইল। যদি সমাজের লোকে তোমার সহিত আহার না করে এবং তোমার পুত্র কন্যার সহিত তাহাদের কন্যা পুত্রের বিবাহ না দেয়, তাহা হইলেই তুমি সমাজচ্যুত হইলে। সমাজে থাকার অর্থ এই। আমরা যাহাকে হিন্দুসমাজ বলি বাস্তবিক তাহা সম্পূর্ণ একটি সমাজ নহে। ব্রাহ্মণসমাজ, কায়স্থসমাজ, বৈদ্যসমাজ, এই প্রকার যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে, ততগুলি সমাজ। তাহাই কেন? সকল ব্রাহ্মণ বা সকল কায়স্থ বা অন্য যে কোন জাতি হউক না কেন, তাঁহাদের সকলের মধ্যে পরস্পর ভোজ্যান্নতা বা আদান প্রদান নাই। এক একজাতির মধ্যে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ; সেই বিভাগের মধ্যে ভোজ্যান্নতা ও আদান প্রদান বন্ধ। রাঢীয় কি বারেন্দ্র কি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগকে অথবা রাঢ়ীয়, বঙ্গজ, বা বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থদিগকে এক একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিলে অসঙ্গত হয় না। তাঁহাদিগের সমাজ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। হিন্দুসমাজ বলিলে একটি প্রকাণ্ড পদার্থ বুঝায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক প্রত্যেক হিন্দুর ভোজ্যান্নতা ও আদান প্রদান যত লোকের সঙ্গে চলিয়া থাকে তাহা ধরিলে প্রত্যেকের সমাজ অপেক্ষাকৃত অতি ক্ষুদ্র পদার্থ।

সে যাহা হউক এখন প্রকৃত কথার আলোচনা করা যাউক। আদান প্রদান ও ভোজ্যান্নতা থাকিলেই যদি সমাজে থাকা হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, আদান প্রদান ও ভোজ্যান্নতা থাকিলেই কি সমাজের ভিতরে ক্ষমতা চলে, নতুবা চলে না? সমাজের বাহিরে থাকিলেও যে সমাজের ভিতরে ক্ষমতা চলে, সমাজের উপকার করা যায় ইহার অকাট্য প্রমাণ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সে বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা বলা যাইতেছে। এমন শত শত লোক রহিয়াছে

তাহারা হিন্দুসমাজভুক্ত, অথচ সমাজের ভিতর তাহাদের কিছুমাত্র ক্ষমতা চলে না, কেহই তাহাদিগকে গ্রাহ্য করে না। আবার এমন লোকও দেখিয়াছি যাঁহারা প্রচলিত আচারবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া জাতিচ্যুত হইয়াছেন, তথাচ হিন্দুসমাজের অনেক লোকে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করে এবং তাঁহাদের প্রভাব অনুভব করে। সুতরাং সমাজের ভিতরে থাকিলেই যে, সমাজে ক্ষমতা চলে বা সমাজের উপকার করা যায়, এবং বাহিরে থাকিলে করা যায় না তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে না। সমাজে থাকিলে যে অনেক বিষয়ে সুবিধা আছে ;—কোন কোন হিতকর কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজে সম্পন্ন করা যায় তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা কখনই ইহা স্বীকার করিতে পারি না যে, সমাজে না থাকিলে সমাজসংস্কার করা যায় না। বরং আমরা তাহার বিপরীত কথাই সত্য বলিয়া মনে করি যে, এখন হিন্দুসমাজের যে প্রকার অবস্থা তাহাতে সমাজে থাকিয়া সমাজ সংস্কার কার্য্য সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন করা অসম্ভব। আমরা ক্রমে ক্রমে আমাদের কথা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

আর একটী কথা। সমাজসংস্কার সম্বন্ধে কোন গুরুতর বিষয়ের কথা উত্থাপন করিলে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি অমনি বলিয়া উঠেন "এখনও সময় আসে নাই।" তাঁহারা সুশিক্ষিত, সুতরাং পুরাবৃত্ত ও বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া তাঁহারা তাঁহাদের মত সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন যে, উপযুক্ত সময় না আসিলে কোনপ্রকার সংস্কারকার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে না। ক্রমোন্নতিই জগতের নিয়ম। জড়, উদ্ভিজ্জ, কি প্রাণীজগৎ সর্ব্বত্রই বিজ্ঞান ক্রমোন্নতির নিয়ম প্রতিপন্ন করিতেছে। আগষ্ট, কম্‌ট, হারবার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি আধুনাতন কালের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, জনসমাজ সেই নিয়মের ব্যতিরেকস্থল নহে। বিকাশের (evolution) নিয়ম ব্রহ্মাণ্ডের সকল কার্য্যেই পরিলক্ষিত হয়। সমাজসংস্কার এই বিকাশের নিয়মের উপর নির্ভর করে। সুতরাং উপযুক্ত সময় না আসিলে কোন প্রকার সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না।

ক্রমোন্নতির নিয়মে আমরা বিশ্বাস করি। উপযুক্ত সময় না আসিলে যে কোন সংস্কারকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না তাহাও সত্য বলিয়া স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহারা ইহা হইতে যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহা স্বীকার করিতে পারি না। অর্থাৎ আমরা স্বীকার করি না যে সেই জন্য আমাদিগকে হস্ত পদ সঙ্কুচিত করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। আমরা মনে করি যে, সময় আসুক আর নাই আসুক যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি, অকুতোভয়ে তাহা বলিব ও তদনুযায়ী কার্য্য করিব। তজ্জন্য কষ্ট যন্ত্রণা বহন করিতে হয়, অম্লানবদনে করিব। সমাজ হইতে

বহিষ্কৃত হইতে হয়, সত্যের গৌরব রক্ষার জন্য তাহাও শিরোধার্য্য করিব। ইহাই আমাদিগের অনতিক্রমণীয় পবিত্র কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যসাধনে চরিত্র উন্নত হয়; হৃদয় মনের উচ্চতর বৃত্তি সকল সতেজ ও বিকশিত হয়। আর আমরা যতই সত্যকে সত্য বলিয়া জানিয়াও তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিব, নিশ্চয়ই চরিত্র সেই পরিমাণে অবনতি প্রাপ্ত হইবে।

সময় আসার অর্থ কি? সময়ের কি হাত পা আছে যে, সে আপনা আপনি চলিয়া আসিবে। সময় আসার অর্থ সাধারণ লোকের মন সত্যগ্রহণে প্রস্তুত হওয়া। এখন জিজ্ঞাস্য এই, সাধারণ লোকের মন কেমন করিয়া প্রস্তুত হয়? উপদেশ ও দৃষ্টান্ত সত্যপ্রচারের এই দুই অমোঘ উপায়। উপদেশ ও দৃষ্টান্তের ফল শীঘ্র না ফলিতে পারে, কিন্তু কালে নিশ্চয়ই ফলিবে। নূতন সত্য প্রচার জন্য আপাততঃ হয় ত যারপরনাই অত্যাচার বহন করিতে হইবে, কিন্তু কাঁদিতে কাঁদিতে যে শস্য বপন করা হইবে, এমন সময় আসিবে যখন লোকে হাসিতে হাসিতে উহা কর্ত্তন করিবে।

সময় না আসিলে সমাজসংস্কার কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, মানিলাম, কিন্তু সময়কে আনিতে হইবে। আনার উপায় কি তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকি, সময় আসিলে কার্য্য আরম্ভ করিব, নদী শুষ্ক হইলে পার হইব, ইহা নির্ব্বোধের কথা।

যিনি কোন গুরুতর সমাজসংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তিনি যে সকল সময়ে জীবদ্দশাতেই তাঁহার চেষ্টার সম্পূর্ণ ফল দেখিতে পান এমন নহে। তিনি যে বীজ বপন করিয়া যান, বংশপরম্পরায় তাহা অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে উন্নত বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া অমৃত ফল প্রসব করে। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ফ্রান্সিস নিউম্যান বলেন যে, লুথর যদি জন্মগ্রহণ না করিতেন তথাচ ইউরোপে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মসংস্কার অবিলম্বে সুসিদ্ধ হইত। বহুকাল পূর্ব্ব হইতে শিক্ষাদ্বারা লোকের মন এরূপ প্রস্তুত হইয়াছিল যে লুথর উক্ত সংস্কার কার্য্যে কেবল একটি উপলক্ষ মাত্র।*

যে শিক্ষাদ্বারা লোকের মন প্রস্তুত হইয়াছিল, সে শিক্ষা কি প্রকার তাহা বিবেচনা করা উচিত। সে শিক্ষা কেবল বিদ্যালয়ের শিক্ষা নহে। লুথরের পূর্ব্বে আরও অনেক সংস্কারক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে প্রায় বিংশতি বার ধর্ম্মসংস্কারকগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। রোমীয় ধর্ম্মসমাজের কুসংস্কার ও কদাচার সকল বিনষ্ট করিবার জন্য তাঁহারা প্রাণগত যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাধারণ সংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে তাঁহাদিগকে

---

* Vide Pro. Newman's "Phases of Faith" Sixth Edition p. 97-98.

সমাজ হইতে বিদূরিত ও অশেষ যন্ত্রণাগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। যে সত্যের জন্য তাঁহারা জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, জীবন থাকিতে সেই সত্যের জয় তাঁহারা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা বলিয়াই কি তাঁহাদের সকল যত্ন ও চেষ্টা বৃথা হইয়াছিল? কখনই না। সত্যের জন্য একটি বিন্দু রক্তও কখন বৃথা পতিত হয় নাই। উইকলিফ প্রভৃতি সমাজসংস্কারকগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই লুথরের কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছিল। ললার্ড প্রভৃতি উন্নতমতাবলম্বী লোক সকল যৎপরোনাস্তি অত্যাচার ও কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের জীবদ্দশায় সাধারণের মধ্যে তাঁহাদিগের বিশ্বাস প্রচার করিতেও সক্ষম হন নাই বটে, কিন্তু তাঁহারাই ভবিষ্যতের পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন।* এই সকল ব্যক্তির যত্নেই সাধারণ লোকের চিন্তাস্রোত নূতন পথে ক্রমশঃ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। যে শিক্ষা দ্বারা আপামর সাধারণের মন প্রস্তুত হইয়াছিল, উইকলিফ প্রভৃতির চেষ্টা সেই শিক্ষার অন্তর্গত।

ইউরোপের পুরাবৃত্ত ত দূরের কথা। আমাদের দেশের বিষয় ভাবিয়া দেখা যাউক। যখন মধুসূদন গুপ্ত মেডিকেল কালেজে সর্ব্বপ্রথম শবচ্ছেদনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন, তখন কি সময় আসিয়াছিল? যখন বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ করিয়া মৃত কবিবর মদনমোহন তর্কালঙ্কার সমাজচ্যুত হন, ও কলিকাতার ধর্ম্মসভা ঘোষণা করেন যে, যে বালিকাবিদ্যালয়ে কন্যা পাঠাইবে তাহাকেই সমাজচ্যুত হইতে হইবে, তখন কি সময় আসিয়াছিল? যাঁহারা সময় আসে নাই বলিয়া সংস্কার কার্য্য বন্ধ করিতে বলেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি সময় আসা না আসার কি কোন বিশেষ চিহ্ন আছে? যদি থাকে তাহা কি?

অনেকে উক্ত প্রশ্নে এই উত্তর করেন যে, কোন সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যদি দেখ যে, তাহা করিলে তোমাকে সমাজ হইতে দূরীকৃত হইতে হইবে,

* উইক্লিফ ও তাঁহার পরবর্ত্তী সংস্কারকগণ যে ইংলণ্ডে ধর্ম্মসংস্কারের পথ সহজ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন ইহা এমন সুপরিচিত সত্য যে সামান্য বালকদিগের পাঠ্যপুস্তকেও এ কথা লিখিত থাকে।—Wycliff warmly attacked the corruptions of the church by exposing the evil lives and evil teachings of the priests. His followers were called Lollards: and though the Lollards were persecuted by many of the English kings, especially by Henry IV, they undoubtedly prepared the people of England for the reformation.

তাহা হইলেই জানিবে যে এখনও সময় আসে নাই। যে সংস্কার সমাজে থাকিয়া করা যায়, তাহারই সময় আসিয়াছে। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মধুসূদন গুপ্তের সময়ে শবচ্ছেদের সময় আসে নাই, এবং বেথুনস্কুল সংস্থাপন সময়েও বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার সময় আসে নাই। তবে ইহাও বলিতে হইবে যে, মধুসূদন গুপ্ত ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার অন্যায় ও অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? যখন দেখিতেছি যে লোকে তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতেছে, তখন কেমন করিয়া বলিব যে, তাহাদের সময়ে সময় আসে নাই। বাস্তবিক কথা এই যে তাঁহারা কষ্ট করিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞানের সাহায্যে সময়ের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক আনিয়াছিলেন বলিয়াই এখন সময় আসিয়াছে।

বিগত পঞ্চাশৎ বৎসরের আমাদিগের সামাজিক অবস্থার বিষয় আলোচনা করিলে অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়। যখন সুপ্রিমকোর্টে কোন এক মোকর্দ্দমায় সাক্ষ্য দিবার সময় বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক বলিলেন "আমি সাক্ষ্য দিবার জন্য গঙ্গাজল হস্তে লইব না, আমি গঙ্গা মানি না।" তখন সেই কথায় কলিকাতায় হুলস্থূল হইয়াছিল। এখন সে সময় কোথায়? দেখা যায় যে এক সময় যে কার্য্য করিয়া জাতিচ্যুত হইতে হইত এখন অবিকল সেই কার্য্য করিয়া জাতি রক্ষা করা যায়। মেডিকেল কালেজে শবচ্ছেদ ও বালিকাবিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণের দৃষ্টান্তে ইহা প্রমাণ হইতেছে। পলাণ্ডু ভোজন করিলে এক সময় জাতিচ্যুত হইতে হইত, এখন লোকে প্রকাশ্যরূপে পলাণ্ডু ভোজন করিতেছে অথচ জাতিচ্যুত হইতেছে না।* বঙ্গদেশের কোন কোনস্থানে পলাণ্ডু ভোজন করিলে অদ্যাপিও জাতিচ্যুত হইতে হয়।' প্রকাশ্যরূপে যবনান্ন ভোজনে সমাজচ্যুত হইতে হয় বটে, কিন্তু শত শত লোক গোপনে উহা করিতেছে অথচ তাহাদের জাতি যায় না; গোপনে, অর্থাৎ সকলেই জানে অথচ গোপন। প্রকৃত হিন্দুয়ানি এখন অন্য সকল স্থান হইতে তাড়িত হইয়া ক্রিয়াবাটীর সামিয়ানার নিম্নে ঘনীভূত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। সেইখানেই যত বিচার। যবনান্নভোজন এখন সমাজের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। শুনিয়াছি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে স্নানের পূর্ব্বে সকলে কাগজ পত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ করিত, স্নানের পর পূজা আহ্নিক করিয়া আর কেহ কাগজ স্পর্শ করিত না, করিলে ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য হইত। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! ব্রাহ্মদিগের মধ্যে

---

* চারি পাঁচ বৎসর হইল নবদ্বীপে এক ব্যক্তি পলাণ্ডু ভোজন করাতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল।

এখন যাঁহারা উপবীত পরিত্যাগ করিতেছেন, তাঁহাদিগের প্রায় সকলকেই জাতিচ্যুত হইতে হইতেছে। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন কেবল ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তিকে তাঁহার গ্রামের লোক সমাজভ্রষ্ট করিয়াছিল।

যে কার্য্য করিলে সমাজচ্যুত হইতে হয় তাহাই করিবার সময় আসে নাই এ কথা যে নিতান্ত অযুক্ত তাহা বোধ হয় আমরা সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়াছি।

বাস্তবিক সমাজে থাকিয়া সমাজসংস্কার করিবার মত সকল স্থলে মানিতে হইলে, কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য হইতে এখন নিবৃত্ত হইতে হয়। বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত করিবার জন্য পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হয়। কেন না, আজও সমাজের এমন অবস্থা হয় নাই যে, বিধবাবিবাহ করিয়া কেহ সমাজে থাকিতে পাবে। সমাজে থাকিয়া সমাজের উপকার কর, এ উপদেশ মানিতে হইলে কেবল সমাজসংস্কাব বন্ধ হয়, এমন নহে, আমাদিগের রাজনৈতিক উন্নতির মূলেও কুঠারাঘাত করা হয়। সিবিল সরভিস, মেডিকেল সরভিস, বা ইঞ্জিনিয়ারিং পবীক্ষা দিবার জন্য, শিল্পশিক্ষা ও বাণিজ্যের উন্নতি জন্য, কোন বিষয়ে এ দেশেব রাজনৈতিক উন্নতির উদ্দেশে আন্দোলন করিবার জন্য, অথবা কেবল ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা উপার্জ্জন করিবার জন্য বিলাত গমন করিতে পারা যায় না। কেন না এ পর্য্যন্ত যত লোক প্রকাশ্যভাবে বিলাত গিয়াছেন সকলকেই সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছে। আজ যদি পার্লামেণ্ট মহাসভা ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিধি গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করেন, আর যদি কতকগুলি হিন্দুসন্তান প্রতিনিধি হইয়া বিলাত যাইতে প্রস্তুত হয়েন, তাহা হইলে কি তাঁহাদিগকে এই বলিব "না, তোমরা এমন দুষ্কর্ম্ম করিও না। বিলাত গমন করিলে সমাজচ্যুত হইবে। সমাজে থাকিয়া সমাজের হিতসাধন কর?" সমাজে থাকিয়া সমাজের মঙ্গলসাধনের মত মানিতে হইলে ইহাই বলিতে হয়, বিধবাবিবাহ প্রচারের চেষ্টা বন্ধ করিয়া দেও, বিলাত যাওয়া বন্ধ করিয়া দেও, বিলাত যাওয়ার ষ্টেট্ স্কলাসিপ উঠিয়া গিয়া বড়ই ভাল হইয়াছে।

তবে বাস্তবিক কি এমন কোন স্থল নাই যেখানে উপযুক্ত সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করা উচিত? অবশ্য আছে। মনুষ্যের কর্ত্তব্যসকলকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম, এমন কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে যাহা সম্পূর্ণরূপ সামাজিক। দ্বিতীয় প্রকার কর্ত্তব্যগুলি ব্যক্তিগত। প্রথম প্রকার কর্ত্তব্যের

এই প্রকৃতি যে, সমাজের সমস্ত লোক বা অধিকাংশ লোক একত্র না হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বারা কখনই তাহা সম্পন্ন হইতে পারে না।

আর দ্বিতীয় প্রকার কর্ত্তব্য সকল, প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য বলিয়াই সামাজিক বা জাতীয় কর্ত্তব্য। কেন না, প্রত্যেক ব্যক্তিকে লইয়াই সমাজ বা জাতি। এই সকল কর্ত্তব্য সমাজের সর্ব্বসাধারণ লোকে করুক আর নাই করুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে উহা করিতেই হইবে।

আমরা এই উভয় প্রকার কর্ত্তব্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। প্রথম সামাজিক বা জাতীয় কর্ত্তব্য বিষয়ে দুই একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। মনে করুন কোন পবাধীন জাতির মধ্যে এক ব্যক্তির মনে হইল যে, জাতীয় স্বাধীনতা ব্যতীত কোন জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির সম্ভাবনা নাই। তাঁহার তখন কর্ত্তব্য কি? তিনি কি তখনই স্বয়ং অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রাজবিদ্রোহী হইবেন? তাহা হইলে ত বাতুলের কার্য্য হইবে। আর একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। মনে করুন আমার এইরূপ বিশ্বাস জন্মিল যে বাঙ্গালিজাতিব পক্ষে এখন দেশান্তরে গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করা উচিত। কিন্তু আমি একাকী বিদেশে গিয়া বাস করিলেই ত উপনিবেশ সংস্থাপন করা হয় না। সুতরাং দেশের লোকের মন যাহাতে তদ্বিষয়ে প্রস্তুত হয়, এমন যত্ন কবিতে হইবে; এবং উপযুক্ত সময় আসিলে বিশেষ কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এ প্রকাব প্রণালীতে কার্য্য করিলে চলিবে না। আমার সন্তানের জীবন রক্ষা করা, তাহাকে প্রতিপালন করা ও উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে আমি সমাজের বা সময়ের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারি না। সমাজ যদি আমাকে বলে তোমার শিশুকে হত্যা কর, (শিশুহত্যা প্রথা, বাস্তবিক কোন কোন জাতির মধ্যে অদ্যাপিও প্রচলিত আছে) আমি কি সে আজ্ঞা পালন করিতে পারি? আমার জাতি, কুল, মান, সম্ভ্রম যায় যাউক, প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার তথাচ আমি পারি না। কোন হৃদয়বান্ সদ্বিবেচক বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিতে পারেন না যে, "ওরূপ স্থলে সমাজের খাতিরে তোমার শিশুহত্যা করা কর্ত্তব্য।" শিশুহত্যা পাপ, ইহা কেবল মুখে উপদেশ দিয়া উপযুক্ত সময়ের জন্য কখন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। পঞ্চাশৎ বা একশত বৎসর পরে কবে সময় আসিবে আমি কি তাই বলিয়া আমার প্রাণের সন্তানকে দেশাচার রাক্ষসের মুখে নিক্ষেপ করিতে পারি?

আর একটি দৃষ্টান্ত। মনে করুন আমার একটি বিধবা কন্যা আছে। দুর্ব্বিষহ বৈধব্য যন্ত্রণায় দিবা রজনী সে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে। এস্থলে কি

আমার কর্ত্তব্য নহে যে, বিবাহ দিয়া তাহাকে সুখী করি? সমাজ কবে প্রস্তুত হইবে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে কি পিতার কর্ত্তব্য করা হয়? এ স্থলে কি রক্ষণশীল ভ্রাতারা বলিবেন যে, "তোমার কন্যার কষ্ট যতই অধিক হয় হউক," দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির উত্তেজনা অতিক্রম করিতে অক্ষম হইয়া সে বিপথগামিনী হয় হউক, ভ্রূণহত্যারূপ মহাপাতকে কলঙ্কিত হইতে হয়, তাহাও হউক, কিন্তু তুমি তাহার বিবাহ দিয়া সমাজের বাহিরে যাইও না।" আর এ কথা বলিলে কি আমার তাহা শুনা উচিত? কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য আমার ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য; সে বিষয়ে সমাজ বা সময়ের মুখাপেক্ষা করা আমার কোন ক্রমেই উচিত নহে। সে বিষয়ে আমার প্রতি বল করিবার, কি আমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার সমাজের নাই।

হিন্দুসমাজের শত শত লোক কি করিতেছেন? গোপনে ভ্রূণহত্যারূপ মহাপাতকের অনুষ্ঠান দেখিয়াও নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন, তথাচ বিধবাবিবাহে মত দিবেন না। সকলে মত দিউক তবে আমি মত দিব একথা বলিলে চলে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যাঁহারা কোন সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন অনেক সময়ে তাঁহারা তাঁহাদের চেষ্টার সফলতা দেখিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইতে পারেন না, লোকে ভাবে তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইলেন। কিন্তু বাস্তবিক ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তাঁহাদের চেষ্টার ফলভোগ করে। নূতন সংস্কারকদিগের অভ্যুদয় জন্য কখন কখন প্রচলিত কুসংস্কার পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়ীভূত হয়। কিন্তু যখন দ্বিতীয় বার সেই সংস্কারের চেষ্টা হয়, তখন পূর্ব্বে একবার অন্দোলন হইয়াছিল বলিয়া বিংশতি বৎসরের কাজ দশ বৎসরে সম্পন্ন হয়। যদিই বা এমন মনে করা যায় যে, কোন কার্য্যের ফল বর্ত্তমান বংশীয়েরা অথবা ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা কেহই লাভ করিতে পারিবে না—সমাজের উপর সে কার্য্যের কোন ফল হইবে না, তথাচ যদি তাহা ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য কার্য্য হয়, তবে উহা করিতেই হইবে। কবে সময় আসিবে বলিয়া আমার বিধবা দুহিতার প্রতি কর্ত্তব্যসাধন করিব না? সমাজের লোকের ক্রোধান্ধ নয়নের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, নির্ভীকচিত্তে সত্য ও বিবেকের গৌরব রক্ষা করিতে হইবে।

আমরা এই প্রবন্ধে যে মত সমর্থন করিতেছি, বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বপ্রধান চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সর তাহা অতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছ তাহা নির্ভয়ে বলিবে, ও তদনুযায়ী কার্য্য করিবে। সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিবে না। যে পরিবর্ত্তন সাধন করা

তোমার লক্ষ্য তাহাতে কৃতকার্য্য হও ভালই, না হও তথাচ ভাল, কেন না তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা করা হইল।*

নূতন সত্য নির্ভয়ে প্রচার করিতে হইবে বটে, কিন্তু প্রচারের প্রণালী কি প্রকার হওয়া উচিত? আমাদিগের বিবেচনায় সম্পূর্ণরূপ জাতীয় রুচির অনুবর্ত্তী হওয়া কর্ত্তব্য। লোকভয়ে বিন্দুমাত্র সত্যের অপলাপ করিব না, অথচ প্রচার প্রণালী সম্বন্ধে দেশের লোকের যাহা ভাল লাগে তাহাই করিতে হইবে। সংক্ষেপতঃ আমাদিগের ইহাই মত যে, যাহাতে শারীরিক মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোন প্রকার অমঙ্গল প্রসূত না হয়, এমন সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া চলা উচিত।

---

*Whoever hesitates to utter that which he thinks the highest truth lest it should be too much in advance of the time, may re assure himself by looking at his acts from an impersonal point of view. Let him duly realize the fact that opinion is the agency through which character adapts external arrangements to itself, that his opinion rightly forms part of that agency, is a unit of force, constituting, with other such units, the general power which works out social changes and he will perceive that he may properly give full utterance to his innermost conviction, leaving it to produce what effect it may. It is not for nothing that he has in him these sympathies with some principles and repugnance to others. He, with all his capacities, and aspirations and beliefs is not an accident, but a product of the time. He must remember that while he is a descendant of the past, he is a parent of the future; and that his thoughts are as children born to him, which he may not carelessly let die. He, like every other man, may properly consider himself as one of the myriad agencies through whom works the Unknown Cause, and when the Unknown Cause produces in him a certain belief he is thereby authorized to profess and act out that belief. For, to render in their highest sense the words of the poet :—

———Nature is made better by no mean,
But nature makes that mean : over that art
Which you say adds to nature, is an art
That nature makes.

Not adventitious. therefore, will the wise man regard the faith which is in him. The highest truth he sees he will fearlessly utter; knowing that, let what may come of it, he is thus playing his right part in the world—knowing that if he can effect the change he aims at—well : if not—well also ! though not so well. *First Principles, by Herbert Spencer, Third Edition p. 128.*

জাতীয় ভাব রক্ষা করিব, অথচ জাতীয় ভ্রম, কুসংস্কার, কদাচারের বিরুদ্ধে নিরন্তর খড়্গহস্ত থাকিব। পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া সমাজসংস্কার হয় না। সংসারে কখন তাহা হয় নাই। সমস্ত ইতিহাস এ কথায় সাক্ষ্যদান করিতেছে। যদি কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা দেখি, তবে করিব, নতুবা নয়, সমাজসংস্কার এ প্রকার ভীরু, সাবধান লোকের কাজ নয়।* জন ষ্টুয়ার্ট মিল যথার্থই বলিয়াছেন যে, যখন খ্রীষ্টের শিষ্য ষ্টিফিনকে, তাঁহার অবলম্বিত ধর্ম্মের জন্য লোকে হত্যা করিয়াছিল তখন কে মনে করিতে পারিত যে, সেই অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ ষ্টিফিনের মত সভ্য জগতে প্রচারিত হইবে, আর তাঁহার পরাক্রান্ত ধনশালী শত্রুদিগের দেশপ্রচলিত প্রবল ধর্ম্ম, চিরকালের জন্য সংসার হইতে তিরোহিত হইবে। থিওডোর পার্কার বলিয়াছেন যে পূর্ব্বতন সমাজসংস্কারক মহাপুরুষেরা আপনাদিগের শোণিত দিয়া যে পথ ধৌত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, আমরা এখন তাহাতেই ভ্রমণ করিতেছি। বায়ু দূষিত হইলে ঝঞ্ঝা ঝটিকা তাহা বিশুদ্ধ করে, শরীরে গভীর ক্ষত হইলে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রচিকিৎসা চাই, সেই প্রকার বহুকালস্থায়ী সামাজিক অমঙ্গল সকল বিদূরিত করিতে হইলে, অনেক স্বার্থত্যাগ, কষ্ট যন্ত্রণা বহন করা আবশ্যক। সত্যপালন করিতেই হইবে, তাহাতে সুখসাচ্ছন্দ্য, সমাজ, আত্মীয় স্বজন ও স্বদেশবাসীর প্রসন্নতা পাওয়া যায়, ভালই, নতুবা পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া, ফলাফলের বিচার ছাড়িয়া দিয়া "যে যায় যাক্ যে থাকে থাক্" বলিয়া সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা, সকল বিপদ শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে।

শ্রীনঃ না

*Those who will be so full of foresight and so prudent as not to act till they are secure against failure, will surely have no chance of success. Such persons ought to be called timid and weak, not prudent: they will never commence any noble enterprise; nor must we regret that, for they would probably embarrass it by a perpetual suggestion of difficulties. Danger and loss cannot always be avoided. They must often be met and borne. No great object has ever been won by those who make it essential to avoid them. The eleven disciples would not have founded Christianity, if they had first taken in hand to ensure against the danger of future quarrelling among themselves.—*Catholic Union, by Pro. F. W. Newman.*

কোমৎ বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকই দেবতা, স্ত্রীসেবাই ধর্ম্ম; আমরা বাঙ্গালি, প্রাণের সহিত বলিয়াছি—তথাস্তু। দুর্ভাগ্যবশতঃ কোমৎ পূজার পদ্ধতিটা ভাল করিয়া বিবৃত করেন নাই। আমরা বাঙ্গালি—চিরকাল পৌত্তলিক—পৌত্তলিকতা আমাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, আমাদের অস্থি মজ্জার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে—শুদ্ধ আধ্যাত্মিক উপাসনায় আমাদের তৃপ্তি হয় না। আমরা শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইব, ধূপ ধূনা জ্বালিব, দান ধ্যান করিব, স্তবস্তুতি করিব;—পুরোহিত মন্ত্র বলিবে, যজ্ঞের অনল জ্বলিয়া উঠিবে, আঙ্গিনায় ঢাক ঢোল বাজিবে, হাড়কাঠে ছাগ ব্যা ব্যা করিবে, নতুবা কেমন যেন অঙ্গহীন হইল বলিয়া বোধ হয়। কোমৎধর্ম্মের এই অভাব আমি আজই পূর্ণ করিব। অমিতশক্তি কোমৎ পৃথিবীর পাঁচটি সুসভ্য জাতির জন্য যে ধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন, ক্ষুদ্রশক্তি আমি পৃথীবীর একটা অর্দ্ধসভ্য জাতির জন্য সেই ধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড প্রকাশ করিব।

পূজার উপকরণ। অশ্রুজল এবং দীর্ঘশ্বাস এ পূজার পাদ্য অর্ঘ্য; সুবর্ণালঙ্কার এ পূজার পুষ্প; সৌন্দর্য্যতৃষ্ণা ইহাতে হাড়কাঠ; উপাসকের প্রাণ তাহাতে ছাগ; সোহাগ খর্পর; ভালবাসা কামার; ঢাকাই সাড়ী ইহাতে বিল্বপত্র; ফ্রেঞ্চ পারফিউমারি তাহাতে চন্দনের ছিটা। প্রতি শনিবারের রাত্রি এ পূজায় মহাষ্টমী। পুরোহিত যৌবন।

যজ্ঞ। যজ্ঞকালে পুরোহিত যৌবন মহাশয় উপাসকের প্রাণ-সমিধে মোহের আগুন লাগাইয়া দিয়া সর্ব্বনাশ তন্ত্র হইতে মন্ত্র পড়িয়া আহুতি দিবেন—"মান ভাঙ্গিতে নিদ্রা স্বাহা"—"কথা রাখিতে ভ্রাতৃবন্ধন স্বাহা"—"অলঙ্কার ও শাটী কিনিতে যথাসর্ব্বস্ব স্বাহা"—"পাঠের জন্য নাটক কিনিয়া দেশীয় সাহিত্য স্বাহা"—"মন রাখিতে ইহলোক পরলোক স্বাহা"—ইত্যাদি।

স্তুতি। সংসারগগনে তুমি ব্যোমযান—কথায় কথায় আকাশে তোল; আবার যখন ফেলিয়া দাও, তখন সমুদ্রগর্ভে অথবা পর্ব্বতশৃঙ্গে হাবুডুবু খাইতে

হয়, অথবা হাড় চূর্ণ হইয়া যায়। জীবনের পথে তুমি রেলের গাড়ি—যখন রসনারূপ এঞ্জিনে ফুল ফোর্স্ দাও তখন এক দণ্ডের মধ্যে চৌদ্দ ভুবন দেখাও। কার্য্যক্ষেত্রে তুমি ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফ—কথাটি পড়িলে নিমেষের মধ্যে তাহা দেশদেশান্তরে চালাইয়া দাও। ভবনদীর তুমি নৌকা—অধমকে পার কর।

তুমি ইন্দ্র—শ্বশুরকুলের দোষ দেখিতে তুমি সহস্রচক্ষু; স্বামীর শাসনে তুমি বজ্রপাণি; তোমার থাকিবার স্থান অমরাবতী—যেখানে তুমি সেই স্বর্গ।

তুমি চন্দ্র—তোমার হাসি কৌমুদী—তাহাতে মনের অন্ধকার দূর হয়। তোমার ভালবাসা অমৃত—যার অদৃষ্টে ঘটে তার সশরীরে স্বর্গভোগ। আর লোকে যে অনর্থক বলে তুমি পরাধীন, ঐটুকু তোমার কলঙ্ক।

তুমি বরুণ—কেন না, মনে করিলেই জলে মাটী ভিজাইতে পার। তোমার চক্ষের জল; দেখাদেখি আমরাও গলিয়া যাই।

তুমি সূর্য্য—উপরে আলোকের আবরণ, ভিতরে অন্ধকার বাষ্প। একদণ্ড চক্ষের বাহির হইলে দশদিক্ অন্ধকার দেখিতে হয়। আবার যখন মাথায় উঠ, তখন আক্কান করিয়া মরি—দেশ ছাড়িয়া পলাইতে ইচ্ছা করে।

তুমি বায়ু—জগতের প্রাণ। তোমা ছাড়া হইলে কতক্ষণ বাঁচি? একদণ্ড তোমার দেখা না পাইলে প্রাণ ছটফট করে, জলে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা করে; আবার যখন প্রখর বহ, কার বাপের সাধ্য তোমার সম্মুখে দাঁড়ায়?

তুমি যম—বেড়াইয়া আসিতে রাত হইলে। তোমার বক্তৃতা নরক—সে যন্ত্রণা যাহাকে সহ্য করিতে না হয়, সে পুণ্যবান্—তার অনেক তপস্যা।

তুমি অগ্নি—কেন না দিবানিশি আমাদিগকে হাড়ে হাড়ে পোড়াইতেছ।

তুমি বিষ্ণু—তোমার নাসিকার নথ তোমার সুদর্শন চক্র—উহারই ভয়ে পুরুষ অসুরগণ মাথা গুঁজিয়া তটস্থ হইয়া থাকে। একমন একচিত্তে তোমার সেবা করিলে সশরীরে গো-লোক প্রাপ্ত হয়।

তুমি ব্রহ্মা—তোমার মুখ দিয়া যাহা বাহির হয় তাহাই আমাদের বেদ—অন্য বেদ আমরা মানি না—ঋক্, যজু, সাম, অনেক দিন হইল বৈতরণী পার করিয়াছি।

তুমি নীলকণ্ঠ—কেন না তোমার কণ্ঠ ভরা বিষ—অন্ততঃ দরিদ্রের ভাগ্যে। পরনিন্দায় তুমি পঞ্চমুখ। স্ত্রীস্বাধীনতাবাদীরা তোমার দলবল, অতএব তুমি ভূতনাথ।

তুমি লক্ষ্মী—তুমি যার ঘরে নাই, সে লক্ষ্মীছাড়া। তুমি ধনের দেবতা—প্রধান আচার্য্য ম্যালথস্‌ আইন জারি করিয়াছেন, যার টাকা নাই সে যেন তোমার উপাসনা করিতে না আসে।

তুমি সরস্বতী—বোধোদয় এবং পশ্বাবলী পড়িয়াই। বহু আরাধনায় তোমায় লাভ করিতে হয়, বহু সেবায় রাখিতে হয়।

তুমি মহামায়া—কেন না অত মায়া আর কেহ জানে না। পরচ্ছিদ্রদর্শনে তুমি ত্রিনয়নী। শরীরসজ্জার উপকরণ গ্রহণে তুমি দশভুজা। শান্তিপুরের প্রসাদে তুমি দিগম্বরী।

তুমি শ্যামা—কেন না স্বামী তোমার পদতলে। তোমার সাধনায় অনেক ভূত প্রেতিনীর দৌরাত্ম সহ্য করিতে হয়—বাসর ঘরের প্রেতিনীদিগের দৌরাত্মের কথাটা মনে পড়িলে এ বৃদ্ধবয়সেও হৃৎকম্প শিরঃশূল নূতন করিয়া উপস্থিত হয়।

তুমি শ্রীকৃষ্ণ—কেন না এই সংসার গোষ্ঠে পুরুষ গোরুদিগকে চরাইয়া লইয়া বেড়াও। সারাদিন চরাইয়া সন্ধ্যাকালে দুইটি ঘাস জল দিয়া গোয়ালে বন্ধ কর।

তুমি জগন্নাথ—তোমার জুরিস্‌ডিক্‌সনের মধ্যে জাতিভেদ নাই; ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতি, জোলা, সব একগোত্র। জগন্নাথের হাত নাই; বঙ্গদেশে তোমারও কিছুতে হাত নাই।

তুমি গয়া—কত লোকের পিণ্ডই যে তোমাতে মর্দ্দিত হইয়াছে তার সীমা নাই। তুমি কাশী—পৃথিবীর ধর্ম্মের ষাঁড় তোমাদের চেলা।

তুমি বসন্ত—মিলনে; তখন হৃদয়োদ্যানে কত ফুল যে ফুটে, কত বায়ু যে বহে, কত ভ্রমর গুঞ্জরে, কত কোকিল কুহরে—সুখের স্পর্শে অনুক্ষণ পুলকপূর্ণ। তুমি গ্রীষ্ম—বিরহে; সদাই আঞ্চান, ছটফট, জ্বলে মরি, বাতাস দে, নির্জীব, নিরুৎসাহ, অলস, অবশ—প্রাণটা হুহু করে, পৃথিবীটা খাঁ খাঁ করে, যেন প্রলয় উপস্থিত। তুমি বর্ষা—রোগে; হৃদয়াকাশ সদা মেঘাচ্ছন্ন, নয়ন জলদ সদা জলভারাকীর্ণ এবং বর্ষণোন্মুখ—একবার বর্ষে, তখনই ধরে, আবার তখনই বর্ষে—সর্ব্বদা আশঙ্কা, কখন কি হয়। তুমি শীত—রাগে; জড়সড়, কম্পযুক্ত, পেটের ভিতর হাত পা ঢুকিয়া যায়, দাঁতে দাঁতে লাগে; শীতে কেবল আহারের সুখ, তুমি যে দিন রাগে থাক সে দিনও বটে—দুই জনের ভাগ একার হয়। তুমি শরৎ—প্রার্থনায়; যখনই তোমার দিকে চাহিয়া দেখি যে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ প্রকাশ, শশধর ষোল কলায় হাসিতেছে, খঞ্জনচকোর নাচিতেছে, তখনই বুঝিতে পারি, আজ বুঝি কিছু আবদার আছে, নহিলে এত রূপের ছড়াছড়ি, সোহাগের এত বাড়াবাড়ি!

তুমি বেদ—তোমার কথাই সকল ধর্ম্মের উপর ধর্ম্ম। তুমি ধর্ম্মশাস্ত্র—মনু-ত্রিবিষ্ণুহারীত প্রভৃতিকে তামাদি করিয়া তুলিয়াছি, এখন তোমার বিধানমতেই চলিব। তুমি তন্ত্র—উচ্ছন্নের মূলমন্ত্র। তুমি পুরাণ—অধিকাংশই বাজে কথা, অনেক মিথ্যা কথা, কাজের কথা খুঁজিয়া পাওয়া ভার। তুমি সাংখ্য—প্রকৃতিই মূল তত্ত্ব। তুমি বেদান্ত—সব মায়ার মোহ। তুমি ন্যায়—অন্ততঃ কলহপটুতায়। তুমি পাতঞ্জল—তোমা বৈ আবার যোগ কি? তুমি মীমাংসা—তা কেবল দর্শন বলিয়া কেন, দর্শনে স্পর্শনে, আস্বাদনে, তুমি যাই বল তাই নিষ্পত্তি, যে আপত্তি করে তার কদ্বক্তি।

তুমি ক্ষিতি—কেন না প্রকৃত পক্ষে তুমিই বসুন্ধরা—যে হাসি হাস, যে কথা কও, যে চাহনি চাও কুবেরের ভাণ্ডার বেচিয়া দিলেও তার মূল্য হয় না। তুমি অপ, কেন না তুমি তরলমতি। তুমি তেজঃ—বালিকাবিদ্যালয়ের প্রসাদাৎ। তুমি মরুৎ, কেন না শব্দ বহন করা তোমার ধর্ম্ম। তুমি ব্যোম—কত রঙ্গেই যে থাক তার ঠিকানা পাই না।

এ স্তবটা হিন্দুমতে হইল। ব্রাহ্মেরা হয়ত তজ্জন্য কিঞ্চিৎ মনক্ষুণ্ণ হইবেন। কিন্তু আমরা কাহাকেও বঞ্চিত করিব না; ব্রাহ্মমতেও একটা স্তোত্র দিতেছি। আমার ইচ্ছা সকলকেই অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাই; চক্ষুর দোষে যদি কাহারও আলো আঁধারি লাগে, আমি কি করিব? স্তোত্র যথা,—

হে সর্ব্বময়ি, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ নিরন্তর তোমার অপার মহিমা ঘোষণা করিতেছে। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমার মঙ্গলময় ইচ্ছা পরিপূর্ণ করিতেছে। বায়ুর সৃষ্টি তোমার গ্রীষ্ম দূরীকরণ করিবার জন্য; মৃত্যুর সঞ্চার তোমার মাথার উকুন মারিবার জন্য; সূর্য্যের উদয় তোমার ভিজা কাপড় শুকাইবার জন্য; চন্দ্রের বিকাশ তোমার শোবার ঘরের বারান্দায় বাঁধা রোশনাই করিবার জন্য; ফুল ফুটে, তুমি খোঁপায় পরিবে বলিয়া; ফল পাকে, তুমি শ্রীউদরে দিবে বলিয়া; হে পরম সৎ, আশীর্ব্বাদ কর, রাত্রে যেন সুনিদ্রা হয়।

তুমি অনন্ত, কেন না তোমার অন্ত পাওয়া ভার। তুমি সর্ব্বশক্তিমতী, কেন না তুমি না করিতে পার হেন কর্ম্ম নাই। তুমি একমেবাদ্বিতীয়াং কেন না তোমার যোড়া নাই—হে সশরীরে মুক্তি প্রদায়িনি, পাপীর অপরাধ লইওনা, আমি কথায় কথায় অনুতাপ করিব;—অনুতাপ আমি খুব করিতে পারি, এক প্রকার সিদ্ধবিদ্য বলিলেই হয়।

তুমি সত্যস্বরূপ, কেন না তোমা বৈ সব মিথ্যা। তুমি যে অমৃতস্বরূপ তাহা আর বলিতে হইবে কেন? তুমি অতি গুরু—নতুবা লোকে ভূতের

বোকা বলিবে কেন? তুমি অতি হাল্‌কা—প্রমাণ, পেটে কথা থাকে না। তুমি অপরিসীম—উদর সম্বন্ধে। তুমি মনুষ্যবুদ্ধির অতীত—হে সর্ব্বদুঃখবিনাশিনি, হে সর্ব্বসুখপ্রদায়িনি, অধমের অপরাধ হইলে রাগ করিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিও না—আমি খাটের পাশে দাঁড়াইয়া থতমত খাইব, মাথা চুলকাইব আর অ্যা অ্যা করিব। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

সনাতন ধর্ম্মপ্রচারের সেণ্ট পল

শ্রীচঃ।

"খণ্ডগিরি" প্রাচীন উড়িয়া বৌদ্ধদিগের প্রধান কীর্ত্তি। এই খণ্ডগিরি কটক সহরের ৮।৯ ক্রোশ দূরবর্ত্তী দক্ষিণ পশ্চিমাংশে ভুবনেশ্বর নামক শৈবক্ষেত্রের নিকটে জঙ্গলমধ্যে দুইটী পর্ব্বতমধ্যে সংস্থাপিত। ঐ দুইটী পর্ব্বতের গাত্র খোদিত করত দ্বিতল ত্রিতল বাটি সকল প্রস্তুত হইয়াছে। সেই বাটী সকলের নিম্নে প্রাঙ্গণ, উপরের ঘরে উঠিবার জন্য সোপানাবলী, দরদালানের একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত থাম সকল শ্রেণীবদ্ধ, দরদালানের পরে কুঠারী সকল শ্রেণীবদ্ধ। কুঠারীগুলি যে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ এমত নহে, কলিকাতার অনেক বাসাড়ের ঘর অপেক্ষা তাহা লম্বাচৌড়া; গৃহদ্বারের উপরে খোদিত নানারূপ পুত্তলিকা আছে। একটি পর্ব্বতে ঐরূপ বাটী দুইটি, অপরটীতে একটি আছে। উত্তরপার্শ্বের পর্ব্বতটী মধ্যস্থলে সর্পের আকৃতির ন্যায় বক্রভাবে খোদা গহ্বর, লম্বা প্রায় ৩০।৪০ ফুট; নিম্নে পর্ব্বত, উর্দ্ধে পর্ব্বতচূড়া, দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন পর্ব্বত মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। এইটীর নাম ইংরাজিতে "এস্‌নেক্ কেভ্" বলে! এই কেভটী পশ্চিমাংশে ব্যাঘ্রের মুখাকৃতির ন্যায় অপর এক গহ্বর আছে, সেটির নাম ইরেজিতে "টাইগার কেভ" বলে, সেইটির মধ্যে একটি কুঠারী, এবং দরদালান আছে। পশ্চিমাংশের পর্ব্বতে একটি হস্তীর মুখাকৃতি কৃত্রিম গুহা আছে, তাহার নাম "এলিফেণ্ট কেভ"; ঐ দুই পর্ব্বতে আরও অনেকগুলি কেভ অর্থাৎ কৃত্রিমগুহা আছে; দুইটি পর্ব্বতে প্রায় ৬০।৬২টী গুহা প্রত্যক্ষ হয়। পর্ব্বতের অন্য পার্শ্ব এক্ষণে জঙ্গলপূর্ণ, হিংস্রজন্তুর আবাসস্থল বলিয়া গমনাগমনের নিতান্ত অসুবিধা হইয়াছে। ঐ দুইটি পর্ব্বতের উপরে পাঁচটি চৌবাচ্ছা আছে; ঐ গুলি "গঙ্গা" নামে প্রসিদ্ধ। যে সকল বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকগণ অনেকদিন কার্য্য করিয়া বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহারাই ঐ সকল গুহাতে যোগসাধনা করত জীবনাতিবাহিত করিতেন; আর ঐ চৌবাচ্ছাতে স্নানাদি করিতেন। পশ্চিমাংশের পর্ব্বতের উপরে একটি মন্দির, এবং তাহার

সংলগ্ন দুইটি লাটমন্দির আছে; কিন্তু তাহা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। ঐ মন্দির প্রস্তরাদি দ্বারা নির্ম্মিত। তন্মধ্যে বেদী আছে, এবং বেদীতে বুদ্ধদেবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি কয়েকটি সংস্থাপিত আছে। কয়েকটি দ্বিতল গুহা অর্দ্ধখোদিত হইয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে, বোধ হয় ভুবনেশ্বরের কেশরীবংশীয় রাজাদিগের প্রাদুর্ভাব কালে যখন শৈবধর্ম্মের উৎসাহ-অগ্নি উৎকল দেশে প্রজ্জ্বলিত হয়, এবং শৈবগণ বৌদ্ধদিগকে উৎপীড়ন আরম্ভ করেন, তাহার প্রাক্‌কালেই ঐ কয়েকটি কেভ্ খোদিত হইতেছিল, তৎপরে শৈবদিগের উৎপীড়ন হেতু বৌদ্ধগণ ঐ খণ্ডগিরি পবিত্যাগ কবত প্রস্থান করেন; যাহা হউক, খণ্ডগিরি অশোক রাজার সময়ে একটি সমৃদ্ধিশালী স্থান এবং পুণ্যভূমিমধ্যে পরিগণিত ছিল। ইতিহাসলেখক হণ্টর প্রভৃতিব মতে ঐ সকল কেভ প্রায় বাইশশত বর্ষের অধিককাল হইবে নির্ম্মাণ হইয়াছে। তাহা যাহাই হউক এক্ষণে খণ্ডগিরির ব্যাপার দেখিলে প্রাচীন উৎকলবাসী বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মোৎসাহের চূড়ান্ত নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। উৎকলের ইতিহাসলেখকগণ বলেন, নানা স্থানীয় বৌদ্ধগণ সেই সময়ে উৎকলপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া এই আশ্চর্য্য কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন; যদিও তাহা স্বীকার করা যায় তাহা হইলেও বিদেশী বৌদ্ধগণ সংখ্যাতে কয়জনই বা আসিয়া থাকিবেন? ঐ সকল ব্যাপার সম্পন্ন করা দুই জন কি দশ জন লোকের কার্য্য নহে। এই কার্য্য উপলক্ষে বহুসংখ্যক লোক ভিন্নদেশ হইতে উৎকলপ্রদেশে যে আসিয়াছিলেন, তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ যখন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তখন প্রাচীন উৎকলবাসীদিগের দ্বারাই যে ঐ সকল কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যাইতে পারে।

পুরীর জগন্নাথের মন্দিরটিও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের একটি প্রধান কীর্ত্তি। হণ্টারের মতে খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে তৃতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা কর্ত্তৃক প্রসিদ্ধ মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছে।* এই মন্দিরের বেষ্টিত ভিত্তির মধ্য দিয়া একটী গুপ্ত সোপান

---

* হণ্টার তৃতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক দ্বাদশ শতাব্দীতে ঐ মন্দির নির্ম্মাণ হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাকে এ বিষয়ে ভ্রমশূন্য বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। হণ্টার সাহেব নিজকৃত ইতিহাসে লিখিয়াছেন—"খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীর কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতেই উৎকলবাসী বৌদ্ধগণ শৈবধর্ম্মাবলম্বী রাজগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ক্রমশঃ শৈবধর্ম্মাবলম্বন করেন, এবং অনেক বৌদ্ধ উড়িয়া দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন; ষষ্ঠ শতাব্দীতে শৈবধর্ম্মাবলম্বী যযাতিকেশরী রাজা কর্ত্তৃক ভুবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির নির্ম্মিত হয়।" যখন পঞ্চম শতাব্দী হইতে উৎকলের বৌদ্ধগণ উৎপীড়নের হস্তে পতিত হইয়া ক্রমশঃ দেশ পরিত্যাগ ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছিলেন, এমত অবস্থায় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী উৎকলদেশে থাকা, অনুমান করা যায় না। যে যুক্তিতে, যে কারণে মহম্মদের অত্যাচার এবং

আছে; তাহা ত্রিতল এবং তাহা সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে। ভিত্তির মধ্য দিয়া বরাবর উপরে উঠিবার সিঁড়ি প্রস্তুত করা বড় সাধারণ বুদ্ধির এবং ক্ষমতার কার্য্য নহে। এই মন্দিরটি প্রায় দেড়শত হস্ত অপেক্ষা উচ্চ হইবে। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তৎপার্শ্বে দেবালয় সকল সংস্থাপিত, বাটীর চারিদিকে চারিটী গেট।

উৎপীড়ন আরম্ভ হইবার ২।৩ শত বর্ষ পরে আরবরাজ্যে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী বেশী লোক থাকা অনুমান করা যাইতে পারে না, সেই যুক্তি অবলম্বন করিয়া দেখা যায় শৈবধর্ম্মাবলম্বী কেশরী-বংশীয় রাজাদিগের পীড়ন আরম্ভের দুই তিন শতাব্দীর পরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা উৎকলদেশ হইতে নির্ম্মূল হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমানও অসঙ্গত বোধ হয় না। এদিকে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পুরীর মন্দিরে বুদ্ধদেবের, এবং জগন্নাথদেবও বৌদ্ধদেবের আক্ষরিক মূর্ত্তি প্রমাণ করিতেছেন, তাহা হইলে তৃতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে, এমন কি ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে পুরীর মন্দির নির্ম্মিত হইবার সম্ভাবনা এবং তৃতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এরূপ স্বীকার করিতে হয়, নচেৎ তৃতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা বৌদ্ধদেবতার ঐ মন্দিরের কেবলমাত্র সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন করত, বৌদ্ধদেবতার আক্ষরিক মূর্ত্তিকে "জগন্নাথ" নাম প্রদান করিয়া বিষ্ণুধর্ম্মের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, এই মাত্র অনুমানসিদ্ধ হইতে পারে। পুরীর মন্দিরটি খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর বহুকাল পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইবার আরও একটি যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ হণ্টার সাহেবের মতেই প্রকাশ হইতেছে; হণ্টার সাহেব নিজকৃত ইতিহাসে লিখিয়াছেন "শাক্যসিংহের মৃত্যুর পরে বৌদ্ধগণ উৎকলে শাক্যসিংহের দুইটি দণ্ড আনিয়াছিলেন, এবং সেই দুইটি দণ্ডকে রথারোহণ করাইয়া টানা হইত, বর্ষে বর্ষে তদ্ধেতুক খুব জাঁকজমকের মেলা হইত। যখন শৈবধর্ম্মাবলম্বিগণ বৌদ্ধদিগকে উৎপীড়ন আরম্ভ করেন, তখন একজন বৌদ্ধ ঐ দুইটী দণ্ড লইয়া সিংহলদ্বীপে পলায়ন করেন।" হণ্টার সাহেবের এই কথাই প্রমাণ করিতেছে যে, শৈবধর্ম্মাবলম্বী কেশরী-বংশীয় রাজাদিগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর আরও পূর্ব্বে পুরীর মন্দির নির্ম্মিত, এবং দণ্ডোৎসব উপলক্ষে রথযাত্রার প্রথা প্রচলিত হওয়াই সম্ভব। যযাতি কেশরী রাজার সময়ে খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভুবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ শিবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, এরূপ স্থলে খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের উন্নতাবস্থার সময়ে পুরীর মন্দির নির্ম্মিত হওয়াই সম্ভব। উৎকলের "মাদলাপঞ্জিকা" প্রভৃতির দ্বারা যে সব প্রমাণ সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা তত ঠিক বোধ হয় না। তাহার প্রধান কারণ কেশরীবংশীয় রাজাদিগের সময়ে অথবা ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার সময়ে উড়িয়া ভাষাই অসম্পূর্ণাবস্থা ছিল, তৎকালে "মাদলাপঞ্জিকা" প্রভৃতি প্রস্তুত হওয়া কদাচই সঙ্গত বোধ হয় না; "মাদলা পঞ্জিকা" প্রভৃতি গজাপতি বংশীয়দিগের সময়ে প্রচলিত হওয়াই সম্ভব। তখন ঐ পঞ্জিকাদির দ্বারা বহু প্রাচীনকালের বিবরণ সংগ্রহ হওয়া ঠিক বলা যাইতে পারে না। বোধ হয় ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা পুরীর মন্দিরের নাট মন্দির সিংহদ্বার প্রভৃতি নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই ঐ মন্দিরও তাঁহার কীর্ত্তি বলিয়া প্রচারিত হইয়া থাকিবে।

জগন্নাথের বাটীর ফ্লোর উচ্চতায় প্রায় ৮।৯ হস্ত হইবে। মন্দিরের সম্মুখস্থ তিনটী লাটমন্দির সংস্থাপিত আছে, উক্ত তিনটী লাটমন্দিরের কার্ণিসের চতুষ্পার্শ্বে এবং গাত্রে ঈদৃশ জঘন্য অশ্লীলভাবব্যঞ্জক মূর্ত্তি সকল সংস্থাপিত আছে, তাহা দেখিলে ঐ মন্দির দেবমন্দির না বলিয়া "নরকধাম" বলিতে ইচ্ছা হয়।* উক্ত মন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে "অরুণস্তম্ভ" সংস্থাপিত আছে। স্তম্ভটী প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ; ব্যাস প্রায় গড়ে আড়াই ফুট; ঐ স্তম্ভটীর নিম্নদেশে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হংসমালা বেষ্টিত। ঐ হংসমালা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ঐ স্তম্ভটী কণারক নামক স্থানের সূর্য্যমন্দিরের সম্মুখে সংস্থাপিত থাকে, মহারাষ্ট্রীয় রাজাদিগের সময়ে ঐ স্তম্ভটীকে তিনখণ্ড করিয়া, পুরীতে আনা হয়; এবং জগন্নাথের বাটীর সম্মুখে

---

* হণ্টার প্রভৃতি উৎকলের ইতিহাস লেখকগণ, ঐ জঘন্য মূর্ত্তি সকল মন্দিরের সঙ্গে সংস্থাপিত হইয়াছে, কি অন্য কোন সময়ে সংস্থাপিত হইয়াছে তদনুসন্ধানে ঔদাসিন্য অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। আমি ইহার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, প্রথমে দেখিলাম প্রধান মন্দির এবং লাটমন্দির প্রস্তরনির্ম্মিত; শ্রেষ্ঠ মন্দিরটীর উত্তর পার্শ্বের গাত্রে একস্থানে একটি মাত্র ঐরূপ জঘন্যমূর্ত্তি আছে; কিন্তু সেটী কেবলমাত্র চুণ বালির জমাটে প্রস্তুত হইয়াছে; এইখানেই আমার সন্দেহ হয় যে মন্দির নির্ম্মাণের সময় ঐ মূর্ত্তিটী সংস্থাপিত হইলে, ঐ মূর্ত্তিটি প্রস্তর খোদিত হইত এবং গাঁথুনির সঙ্গে সংযুক্ত হইত; তৎপরে সম্মুখের প্রথম লাটমন্দিরের সম্মুখের গাত্রে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের যতগুলিন জঘন্য মূর্ত্তি সংস্থাপিত দেখিলাম, ঐ সকল মূর্ত্তি লাটমন্দিরের গাত্র সাবধানে খোদিত হইয়া তন্মধ্যে সংস্থাপিত হইয়াছে, বড় লাটমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে যে সকল জঘন্যমূর্ত্তি আছে, তাহাও চূর্ণ বালির জমাট করা প্রস্তুত, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইল ঐ সকল জঘন্য মূর্ত্তি মন্দির নির্ম্মাণের বহুকাল পরে সংস্থাপিত হইয়াছে। এমন কি ঐ সকল জঘন্যমূর্ত্তি মুসলমানদিগের রাজত্বের পরে সংস্থাপিত হইয়াছে এরূপ অনুমান অসঙ্গত বোধ হয় না। মুসলমানগণ পুরীর মন্দিরের গাত্রে যে সকল খোদিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমূর্ত্তি ছিল, তৎসমুদয়ের হস্তপদ নাসিকা, গ্রীবা প্রভৃতির কোন না কোন অংশ ভগ্ন করিতে ক্রটি করে নাই; যদ্যপি তৎকালে ঐ সকল মূর্ত্তি মন্দিরে সন্নিবেশিত থাকিত তাহা হইলে, ঐ সকল মূর্ত্তিরও অন্ততঃ কোন না কোন অঙ্গ ভাঙ্গিতে ক্রটি করিত না, ঐ সকল মূর্ত্তি কদাচই অক্ষত অঙ্গ থাকিত না; ইহার দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে ঐ সকল মূর্ত্তি মুসলমানদিগের শেষকালে যখন শৈব তান্ত্রিকদিগের হস্তে মন্দিরের কার্য্যভার পতিত হইয়াছিল, সেই সময়ে তান্ত্রিক পুরোহিতগণ "বটুক ভৈরব" নামক একটী শিবমূর্ত্তি জগন্নাথের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং বোধ হয় সেই সময়েই তাঁহারাই ঐ সকল জঘন্য-মূর্ত্তি লাটমন্দির প্রভৃতির গাত্রে সন্নিবেশিত করত আপনাদের পাপরুচির চিহ্ন সংস্থাপিত করেন। তৎপরে যখন তপ্ত মুদ্রাধারী বৈষ্ণবদিগের হস্তে মন্দিরের ভার পতিত হয় তখন তাঁহারা জগন্নাথের সম্মুখ হইতে বটুক ভৈরবের মূর্ত্তি উঠাইয়া সমুদ্রে বিসর্জ্জন করেন। এই ঘটনা বোধ হয় মহারাষ্ট্রীয়দিগের আমলদারিতে সম্পন্ন হয়।

সংস্থাপিত করা হয়। পুরীতে তিনটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে, "ইন্দ্রদ্যুম্ন" একটীর নাম, দ্বিতীয়টীর নাম "মার্কণ্ড" তৃতীয়টীর নাম "নরেন্দ্র„ এইটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

পুরীর প্রায় দেড় ক্রোশ দূরবর্ত্তী—"লোকনাথ" নামক একটি শিব আছেন। ঐ শিবের মস্তক হইতে জলস্রোত নির্গত হইতেছে।

ভুবনেশ্বর—এই মন্দিরেব নির্ম্মাণকার্য্য যজাতিকেশরী রাজার সময়ে সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রস্তুত হয়; প্রায় তেরশত বর্ষ অতীত হইল ঐ মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাধা হইয়াছে। নির্ম্মাণ করিতে একশত বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছিল। উড়িয়া শৈবধর্ম্মাবলম্বীদিগের ঐ কীর্ত্তি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মন্দিরটী যেমন বৃহৎ, সেইরূপ আবার প্রশস্ত। মন্দিরের গাত্রে নানা প্রকার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি সকল সন্নিবেশিত আছে। একটী মূর্ত্তির পায়ে একরূপ বুটজুতা আছে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয় তৎকালে বুটজুতার ব্যবহাব প্রচলিত ছিল।* মন্দিরের মধ্যস্থলে, চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীব এবং দেবালয় সকল সংস্থাপিত, সম্মুখে প্রকাণ্ড সিংহদ্বার, এবং অন্য তিনদিকে তিনটী বৃহৎ প্রবেশদ্বারও আছে; এই মন্দির প্রাচীন উৎকলীয় লোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কীর্ত্তি। এরূপ সুন্দর এবং সুগঠন মন্দির ভারতবর্ষের কুত্রাপিও নাই বলা অত্যুক্তি হয় না।

ভুবনেশ্বরে "মার্কণ্ডেশ্বর" নামক অপর একটি শিবালয় আছে। তাহার কার্য্যও অতি সুন্দর। ঐ দেবালয়টি মর্কটকেশরী রাজার সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া ইতিহাসলেখকগণ বলেন। উক্ত দেবালয়ের মধ্যে প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বে দুইখানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরফলকে উক্ত মন্দিরের বিবরণ লিখিত আছে; আমি তাহা পড়িতে চেষ্টা করিতে গিয়া দেখিলাম, তাহার অক্ষর অনেকগুলি দেবনাগর, কতকগুলি বাঙ্গালা, আর এক্ষণে যে সকল উড়িয়া বর্ণমালা প্রচলিত, সেরূপ অক্ষরও মধ্যে মধ্যে আছে; ঐ বিবরণ উল্লিখিত তিন প্রকার বর্ণমালাতে সম্পন্ন হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে বেশ অনুভব হইল, মর্কটকেশরী রাজার সময়েও উড়িয়া বর্ণমালা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই; এবং বাঙ্গালাভাষা অথবা বাঙ্গালা বর্ণমালা তাহার বহুকাল পূর্ব্বে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল; সংস্কৃত, এবং বাঙ্গালা এই দুই ভাষার বর্ণমালা হইতেই উড়িয়া বর্ণমালা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা উপরোক্ত প্রস্তরফলকের লিখন দৃষ্টিমাত্রেই অনুভব হইবে। খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে কেশরীবংশীয় রাজাদিগের সময়েও উড়িয়া বর্ণমালা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।

---

* ইতিহাস লেখকদিগের মতে গ্রীকগণ তৎকালে উৎকল দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পাদুকা ঐরূপ ছিল, তদ্দৃষ্টেই মন্দিরের গাত্রে প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিতে বুটজুতা খোদিত হইয়াছে।

ভুবনেশ্বরের নানা স্থানে প্রাচীন দেবমন্দির সকল সংস্থাপিত রহিয়াছে, ঐ সকল মন্দিরের গাঁথুনী কেবল মাত্র পাথরে পাথরে ঘর্ষণ করিয়া, পাথরের উপর পাথর সংস্থাপিত হইয়াছে ; চূণ বালি শুরকী অথবা অপর কোনরূপ মসলা দ্বারা ঐ সকল মন্দিরের গাঁথুনী হয় নাই ; শত শত বর্ষাতীত হইল, তথাপি ঐ সকল মন্দির অটলভাবে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভুবনেশ্বরেব পূর্ব্ব উত্তরাংশে জঙ্গলমধ্যে একটি অত্যাশ্চর্য্য প্রাচীন মন্দির আছে ; ঐ মন্দিরের গাত্রে নানারূপ মূর্ত্তি সকল খোদিত। মন্দিবমধ্যে যে মূর্ত্তি আছে, তাহার নিম্নদেশ হইতে জলস্রোত নির্গত হইয়া একটি কুণ্ডমধ্যে পতিত হইতেছে, পুনরায় সেই কুণ্ড হইতে জল নির্গত হইয়া মাঠে পতিত হইতেছে, ঐ মন্দিরের প্রায় দুই ক্রোশ দূরে পর্ব্বত আছে, বোধ হয় সেই পর্ব্বত হইতে জলস্রোত নিম্নদেশ দিয়া অলক্ষিতভাবে ঐ স্থানে আসিতেছে। ঐ স্থানটি অতিশয় রমণীয়। ভুবনেশ্বরের প্রাচীন মন্দির যতগুলি আছে, সকল গুলিই উড়িয়াদিগেব অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

কণারক—এই স্থান কটক নগরীর পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রায় ১৬।১৭ ক্রোশ দূববর্ত্তী সমুদ্র তীরবর্ত্তী। এই স্থানে একটি সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। মেঃ হন্টারের মতে এই মন্দির খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। যজাতিকেশরী রাজা যে দশ সহস্র ব্রাহ্মণ যাজপুব নামক স্থানে বসবাস করাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাবা সূর্য্যোপাসক ছিলেন, ঐ মন্দিব তাঁহাদেরই কীর্ত্তি। ঐ মন্দিরটী এক্ষণে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে : দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন একটী পর্ব্বত উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ মন্দিরের ১৪।১৫ ক্রোশ মধ্যে কোন পর্ব্বতাদি প্রত্যক্ষ হয় না ; কিন্তু ঐ মন্দির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ মন্দিরের সম্মুখদ্বারে একখানি বৃহৎ প্রস্তর সন্নিবেশিত ছিল, তাহাতে নবগ্রহের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে ; ঐখানি আনুমানিক দুই বিঘা জমি সরাইয়া আনিতে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, এমত স্থলে মন্দির নির্ম্মাণকালে ঐ প্রস্তর সকল বহু দূরদেশ হইতে কিরূপে কণারকে আনা হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিতে গিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। এখন এত বিজ্ঞানের উন্নতি, এত কল, এত সুগম্য পথ, তথাচ ঐ প্রস্তরখণ্ড স্থানান্তরিত করিয়া সমুদ্রতীরে আনা দুরূহ ব্যাপার হইয়াছে, কিন্তু সেই প্রাচীন কালে উড়িয়াগণ অন্ততঃ ১৭।১৮ ক্রোশ দূর হইতে ঐ প্রস্তরখণ্ডকে আনিয়া মন্দিরের উপরে উঠাইয়াছিলেন, ইহাও সাধারণ ক্ষমতা এবং অধ্যবসায়ের কার্য্য নহে। এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ কার্য্য সকল দেখিলে প্রাচীন উৎকলীয়দিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না।

কটক—কটকের এক পার্শ্ব দিয়া মহানদী, অপর পার্শ্ব দিয়া কাঠযোড়ী নদী প্রবাহিত হইতেছে। ঐ দুই নদীর স্রোতে কটক সহর ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, সেই

অপকার নিবারণ জন্য কাঠযোড়ী নদীর গর্ভ হইতে একটী প্রস্তরের পোস্তা গাঁথা হয়; ঐ পোস্তা প্রায় তিন মাইল পথ ব্যাপ্ত; কোন স্থানে ত্রিশ ফুট, কোন স্থলে ততোধিক উচ্চ; মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত ঘাট; এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভ সকল নদীগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটী স্তম্ভের গঠনকৌশল দেখিলে প্রাচীন উড়িয়াগণ কতদূর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাবিশারদ ছিলেন, তাহার চূড়ান্ত উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ষাকালে যখন অতিবেগে জলস্রোত প্রবাহিত হয়, তখন ঐ স্তম্ভ কটক রক্ষা করে। জলস্রোত বেগে আসিয়া শেষোক্ত স্তম্ভে আঘাত করে; করিবামাত্রই জলস্রোত হ্রস্বতেজা হইয়া এপার ছাড়িয়া অপরপারে প্রধাবিত হইতে থাকে;—আর কটকের পারে জলের আঘাত লাগিতে পারে না, এরূপ কৌশল অবলম্বন করা সাধারণ বুদ্ধির কার্য্য নহে। এই স্তম্ভ প্রায় আট শত বর্ষের অপেক্ষাও প্রাচীন হইবে; উৎকলের ইতিহাসলেখক ষ্টার্লিং সাহেব বলেন উড়িষ্যায় প্রাচীনকালে শবদাহের জন্য কর নির্দ্ধারিত ছিল, সেই শবদাহ হইতে যে কড়ি আদায় হইত তদ্দ্বারাই ঐ পোস্তা সকল নির্ম্মাণ হইয়াছে।

ধবলেশ্বর—মহানদীর মধ্যস্থলে একঠি ক্ষুদ্র, পর্ব্বত এবং অল্পাংশ উচ্চ ভূমি আছে; ঐ স্থানে একটি মন্দির আছে; সেই মন্দিরের সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের নানাপ্রকার মূর্ত্তি সকল পড়িয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে অনেক মূর্ত্তিই ভগ্নদেহ। ঐ সকল মূর্ত্তির গাত্রে যে সকল অলঙ্কার খোদিত দেখিয়াছি, তন্মধ্যে অনেকগুলি অলঙ্কার এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে ব্যবহার হইয়া থাকে। কটকের কাঠযোড়ি নদীর এবং মহানদীর পরপারের পর্ব্বতে বৌদ্ধদিগের খোদিত গুহা সকল আছে, কিন্তু শৈবগণ ঐ সকল গুহার উপরে চূড়া নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে শিব সংস্থাপন করিয়া "শিবমন্দির" "শিবাল" নাম প্রদান করিয়াছেন।

যাজপুর—এই স্থান বৈতরণী নদীর তীরবর্ত্তী; এখানে প্রাচীন কালের প্রতিষ্ঠিত দুটি প্রস্তরময় স্তম্ভ আছে; এইস্থান এক সময়ে কেশরীবংশীয় রাজাদিগের কালে সমৃদ্ধিশালী ছিল, এখন কেবল নাম মাত্র আছে। বালেশ্বর প্রদেশে প্রাচীন কীর্ত্তি প্রায় প্রত্যক্ষগোচর হয় না।

এই সকল প্রসিদ্ধ দেবালয় ভিন্ন অপরাপর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাচীন দেবালয় প্রভৃতি উড়িষ্যাতে বিদ্যমান আছে; সে সব বিষয়ের উল্লেখের তত আবশ্যক নাই, এক্ষণে উৎকলবাসীদিগের অন্যান্য বিষয়ের ক্ষমতা কতদূর তাহারও কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে।

সার্ব্বভৌমিক রাজা গৌড়াধিপতি দেবল দেবের সময়ে উৎকল প্রদেশ যদিও গৌড় দেশের অধীনস্থ ছিল, পালবংশীয় রাজাদিগের সময়েও উৎকল প্রদেশ যদিচ পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত ছিল, এবং বঙ্গদেশীয় গঙ্গাপতি বংশীয় রাজাগণ

যদিচ বহুকালাবধি উৎকল দেশে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু এক সময়ে উড়িয়ারাও বঙ্গভূমির ত্রিবেণী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া স্বজাতীয় বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিতে ত্রুটি করেন নাই। তবে এই মাত্র বলা সঙ্গত, বিদেশ আক্রমণ করিতে যে সকল কৌশল অবলম্বন করা আবশ্যক, গঙ্গাপতি বংশীয় রাজাদিগের নিকটই উড়িয়াগণ তাহা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কারণ গঙ্গাপতি রাজাদিগের পূর্ব্বে উড়িয়াগণ কোনকালে কখন ভিন্নদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

উৎকল রাজ্য যেটুকু বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে আছে, কেবলমাত্র সেই টুকু উৎকল প্রদেশ নহে, উৎকলের অনেকাংশ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির এবং মধ্য-ভারতবর্ষের অন্তর্গত হইয়া রহিয়াছে; এই বহুজনপূর্ণপ্রদেশকে উৎকলবাসীরাই সুশাসনে রাখিয়া স্বজাতীয় প্রভুত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের বীরত্বের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে উৎকলে ১৮টী গড়জাত মহল আছে, এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি, মধ্যভারতবর্ষের অন্তর্গত আরও কয়েকটি গড়জাত মহল আছে; ঐ সকল প্রদেশের রাজাগণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে সামান্য মাত্র কর প্রদান করেন,—তাঁহাদের রাজত্বের বিচারকার্য্য সকলেই তাঁহারা স্বয়ং সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের জেলখানা আছে, তিনবর্ষ মিয়াদের যোগ্য ফৌজদারি মোকর্দ্দমা তাঁহারাই করেন, ততোধিক অপরাধী যাহারা, তাহাদের বিচার উড়িষ্যার স্থানীয় কমিশ্যনর সাহেবকে সোপর্দ্দ করিতে হয়। এই নিয়ম অদ্যাপি প্রচলিত থাকাতে বঙ্গদেশ অপেক্ষা উড়িষ্যার অনেকটা স্বাধীনতা এ পর্য্যন্ত অক্ষত রহিয়াছে।

বহুকাল হইতে উড়িয়াগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ নির্ম্মাণকার্য্যে সুশিক্ষিত হইয়া আপনারা সমুদ্রপথে জাহাজ চালাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।* অদ্যাপি উড়িয়াগণ

---

* বঙ্গবাসীদিগের নিকটেই উড়িয়াগণ জাহাজনির্ম্মাণ শিক্ষা করিবারই সম্ভব। বঙ্গদেশের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ খৃষ্টের ৪৭৭ বর্ষ পূর্ব্বে সিংহল অধিকার করেন; তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে জাহাজ নির্ম্মাণ হইত, তিনি সমুদ্র পথেই পঞ্চশত পরিচারক সহিত সিংহলে গমন করেন। জাহাজ ভিন্ন সিংহলে গমন করা সম্ভব হইতে পারে না; গঙ্গাপুত্রবংশীয় রাজাগণ যখন তমলুকে রাজত্ব করেন, তৎকালে তমলুকে জাহাজ নির্ম্মাণ হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; উড়িষ্যায় তৎকালে জাহাজ নির্ম্মাণের কোনরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বোধ হয় যখন গঙ্গাবংশীয় রাজাগণ উৎকল অধিকার করত উৎকলে প্রভুত্ব সংস্থাপন করেন, সেই সময় হইতে উৎকলবাসীরা বঙ্গদেশীয়দিগের নিকট হইতে জাহাজ নির্ম্মাণ শিক্ষা করেন, এবং সমুদ্রপথে গমনাগমন দ্বারা বাণিজ্য ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া বঙ্গোপসাগর দিয়া বাণিজ্যকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। যদিচ চট্টগ্রামের কয়েকজন বাঙ্গালীর জাহাজ আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের প্রধান প্রধান জাহাজে কাপ্তেন ইয়ুরোপীয়, কিন্তু উৎকলবাসীদিগের জাহাজ, উড়িয়াগণ আপনারাই চালাইয়া থাকেন, উড়িষ্যার জাহাজে কাপ্তেন, মালিম, ইঞ্জিনিয়ার এবং অপরাপর সকল কার্য্যকারকই উড়িয়া। জাহাজ নির্ম্মাণ এবং সমুদ্রপথে জাহাজ পরিচালন সম্বন্ধে উড়িয়াগণ সমগ্র ভারতসন্তানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শ্রীদীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গঙ্গাধর শর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

গোষ্ঠযাত্রা

সন্ধ্যার প্রাক্‌কাল। কেহ কেহ কহিতেছেন আজ "শীত শীত" বোধ হইতেছে, দুই একটি বৃদ্ধ হিমের ভয়ে মস্তকে চাদরের উল্টা ফেটা লাগাইয়াছেন, শুভ্র শুভ্র চুলের দুই পার্শ্বে কর্ণদ্বয় বাহির হইয়া রহিয়াছে, কৃষকেরা গোপাল লইয়া চ-অ-ল অমুকের গোরু বলিয়া প্রভুর গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। কোন গোপাল কহিতেছে চল আজ ঠাণ্ডা হয়েছে এখনি ধূমও দিব, কোন রাখাল কহিতেছে আজ কেবল আলে কিছু হবে না ভাই, ঘরে খ্যাড় জ্বালাতে হবে, এমন সময় হুঁ হুঁ শব্দ শুনা গেল—দেখা গেল একটি তানযানে আশুতোষ বাবু উদ্যান হইতে বাটী প্রত্যাগমন করিতেছেন, লাল পাগড়ি মস্তকে, লম্বা লাঠি হস্তে দুইজন পদাতিক অগ্র পশ্চাতে দৌড়িতেছে ও একজন ভৃত্যমাত্র একটি বৃহৎ উজ্জ্বল রৌপ্যনির্ম্মিত ফুরসী হস্তে পশ্চাতে শশব্যস্ত। বেহারাদলের, দ্বারবানের, হুঁকা বরদার ভৃত্যের, সকলেরই এক চাল, তালে তালে পা পড়িতেছে। বাবুমহাশয় অবতরণ করিবামাত্র কালিন্দী সায়েরের ঘাটোপরি গঙ্গাধরের মন্দিরে একটি প্রণাম করিলেন, পরে অস্ফুট বচনে কোন স্তব উচ্চারণ করিতে করিতে বৈঠক-খানার দিকে গমন করিয়া প্রশস্ত বারেন্দায় পাদচালনা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর বাটীতে আরতীর বাজনা বাজিতেছে, নহবতে টিক্‌কুরা সংযুক্ত সানায়ে পুরবী গাইতেছে, সেই দিকেই মন দিয়া যেন বাবুমহাশয় মধ্যে মধ্যে মস্তক হেলন করিতেছেন। ইতিমধ্যে একটি কামরা আলোকময় হইল, দুগ্ধ-ফেণনিভ প্রশস্ত চাদরোপরি একটি ক্ষুদ্র গদি, এক বৃহৎ তাকিয়া ও কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিস সংযুক্ত হইল, পার্শ্বে একটি মোচার খোলের ন্যায় বৃহৎ স্বর্ণজ্যোতির্ম্ময় বাঁধা হুঁকা ও কদলীপত্রনির্ম্মিত হস্তদ্বয় প্রমাণ পুষ্পনল শোভমান হইল, রজত-নির্ম্মিত শুভ্র রেকাবীতে কয়েকটী চামেলী পুষ্প ও রজনীগন্ধা সংস্থাপিত হইল—

মুহূর্ত্তমধ্যে বাবুমহাশয়ের কাঞ্চননিভ সুগঠনশালী অঙ্গ শয্যোপরি শোভমান হইল। সকলেই জানিত যে বাবুমহাশয়ের একটী সোণার খল নুড়ি ছিল, প্রতিদিন প্রাতে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত মধু দিয়া ঘর্ষিত হইত ও ঐ মধুসংযুক্ত স্বর্ণ, বাবুমহাশয়ের দৈনিক ভোজ্য ছিল, তাহাতেই তাঁহার রঙ্গে সোণার আভা। বাবুমহাশয় গদির উপরে উপবেশন মাত্র ভৈরবকে তলব ও তালবৃন্তের পাখা হেলাইবার হুকুম হইল। আজ সবার শীতানুভব তবু বাবুমহাশয়ের এক একটী পাখা চাই, সকলে জানিত, তাহার গরম ধাত, কেহ কেহ কহিত সে কেবল টাকার গরমী।

ভৈরব তাকিয়ার পশ্চাদ্ভাগে কিঞ্চিৎ অন্তরে বসিল। এক হাতে পাখা হেলাইতেছে ও আর এক হস্ত হেলাইয়া মুখভঙ্গীর সহিত সকলকে কহিতেছে "যা, বলে দেব এখনি দেখ্‌বি।" আমি গৃহের দ্বারে এক উঁকি মারিলাম। বাবুমহাশয় কয়েকটী ফুল হস্তে আঘ্রাণ লইতেছেন, ভৈরব আমাকে দেখিয়া চক্রাকারে অঙ্গুলি ঘুরাইল ও ঠাকুরবাটীর দিকে যাইতে ইঙ্গিত করিল।

আমি ঠাকুরবাটীতে গেলাম, দেখিলাম রাধাবল্লভের সমস্ত দিনের বাহান্ন ভোগ বিতরণ হইতেছে, শীতল ভোগে তাদৃশ আস্থা ছিল না, লুচি মোণ্ডা, চাল ছোলা ভাজা কতকটি লইয়া বৈঠকখানার প্রতি আবার ধাবমান। আমার মন সেইখানেই রহিয়াছে, শুনিয়াছি দেওয়ানজী আগতপ্রায় অনেক পরামর্শ হইবে। এ দিকে রাঙ্গা ঠাকুরুণ আমাকেই রিপোর্টার বাহাল করিয়াছেন, তাঁহার এজলাশে এক একবার সব কাছারীর বিচারের আলোচনা ও সুখ্যাতির মীমাংসা হইত। আমি সত্বর ভৈরবের নিকট সমাগত, ক্ষণকাল মধ্যে গজানন গৃহমধ্যে বিছানার কাঠার্দ্ধ স্থান যুড়িয়া উপবিষ্ট।

বাবুমহাশয় কহিলেন, "শিবসহায়ের কি বিপদ শুনিতে পাই।" গজানন সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলেন, কেবল সুন্দরী গোয়ালিনীর পালাটি গোপন রাখিলেন।

বাবুমহাশয়। তবে শিবসহায়ের বড় বিপদ, আদালতে কি তলব হবে?

গ। হাকিমের একান্ত জেদ।

আ। এখন উপায়; তখন বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, কিন্তু সে কথা ত আমার এখন মনে রাখা আর উচিত নয়। সে সময়ও গত, সে শক্রতাও গত, এখন রক্ষা করা চাই, উদ্ধারের উপায়।

গ। উপায় মহাশয়, শিবসহায় ইহার যে কষ্ট দেয়—স্মরণ আছে—

আ। সে কথা স্মরণ করে লাভ, সে শক্র হউক, মিত্র হউক, এখন বিপদ্‌-গ্রস্ত, উদ্ধার করা চাই।

গ। এত উদারতা কেন? একটু পাকে পড়ুক, দুই এক ভেউ ঢেউ খাক, দুই একটা ঢেউ; বড় বড় নয়।

আ। বল কি! পরের বিপদ্ চিন্তা করিতে আছে; অনিষ্ট সকলেই ঘটাতে পারে, সংসার ত অনিষ্টপূর্ণ, মঙ্গলবর্দ্ধন করাই ধর্ম্ম।

গ। তবে হাকিমের সহিত দেখা করুন, তিনি এলেন, কি আগতপ্রায়।

আ। দেখা করিয়াই বা ফল কি দাঁড়াবে, বলি কি, আবার তিনি না বুঝেন যে, তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রতিরোধ করিতেছি, বড় কঠিন কার্য্য। তবে দয়া? বিচারকার্য্যে কি দয়া মিশান যায় না—ভদ্রের মান রক্ষা করিতে পারেন না? হাকিম পৌঁছিলেই যেন সংবাদ পাই। হাকিম হলেই কি দয়া বিসর্জ্জন দিতে হয়? পরের সম্মানে উপেক্ষা করিতে হয়?

এই কথার পর উভয়েই স্তব্ধ, উভয়েই গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন, পাখার স্বন্ স্বন্ ভিন্ন আর কোন শব্দ নাই, এমন সময় কি একটি কট্‌কট্ শব্দে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল, "কিসের শব্দ রে ভৈরব?" ভৈরব কি উত্তর দিবে, শেষ বলিল—

এই জটাধারী বাবু ঠাকুর বাটীর প্রসাদ খাইতেছেন। ভৈরব এবার মজালে! বাবু মহাশয় পশ্চাদ্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, জটাধারী শায়িত।

আমাকে উঠে বসিতে হইল, কিঞ্চিৎ তিরস্কৃত হইলাম, সন্ধ্যার পর নিদ্রা? পাঠাভ্যাস কখন হইবে—ভগবান্ বিপদের বন্ধু! আমার মনে পড়িল, হউক না হউক, বলিয়া দিলাম, আজ যে শনিবারের রাত্রি। সকলে নিরুত্তর।

আশু। এখন কেমন পড়া হইতেছে? কহিলাম—কিছুই নয়। মাষ্টার পাগল হইয়াছে। আশুবাবু জিজ্ঞাসিলেন, কিসের পাগল?

ভৈরব কহিল, শীতু ক্ষেপা সুন্দরী গোয়ালিনীর সহিত কথা কহিয়াছিল বলিয়া তুমুল যুদ্ধ করিয়াছে।

ইহা গজাননের কর্ণে অতি সুসম্বাদ। সময় পাইয়া কহিলেন, এখানে ইহাদের আর পড়ার আবশ্যক নাই, হেয়ার স্কুলে বা ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়াইলে ভাল হয়।

আশুতোষ বাবু কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন "সকলকে? যাহারা বার বৎসরের উপর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদিগকে পাঠান যাইবে। তোমার নীলমণিকেও পাঠাও, সেও ত প্রায় চতুর্দ্দশবর্ষীয় হইল।"

গজানন বিপদ মনে করিলেন, প্রকাশ্যে কহিলেন, সে নিতান্ত শৈশব—

ভৈরব কহিল, মহাশয় নীলমণি বাবুকে পাঠাইলেই ত লক্ষ্মী ঝিকে সঙ্গে দিতে হইবে?

গজানন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

ভৈরব আবার কহিল এবার নীলমণির গোষ্ঠযাত্রা।

বিংশ পরিচ্ছেদ

যে যার কর্ম্মে ব্যস্ত

এখন চিকিৎসালয়ে যেমন আড়ম্বর রোগও তেমনি উৎকট—যেমন বাঘা তেঁতুল তেমনি বন্য ওলেরও তেজবৃদ্ধি। যেমন কুইনাইন, তেমনি না ছোড় পিয়াদা জ্বর প্লীহা, যেমন বিষাক্ত হায়পর-ক্লোরোডাইন তেমনি জলদ পিয়াদা বিষুচিকার সংবৃদ্ধি। যেমন রিলিফের প্রশস্ত প্রণালী তেমনি বিস্তার প্রদেশে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষপীড়ন, যেমন শীত তাপের গণক "ওয়েদার প্রফেট" তেমনি রঙ্গশালী হঠাৎবাহী বাত্যা বা সাইক্লোন। যেমন কার্য্য-কৌশল-সম্পন্ন সুনির্ম্মিত সেতুশ্রেণী তেমনি বানের তোড়, যেমন ইরিগেসন সিস্‌টেমের বহুব্যয়সাধ্য খাল-প্রণালী তেমনি ঘন ঘন বিন্দুপাতবিহীন শুষ্ক ও শস্যাপচয়। একদিকে বাঁধ দিতে অন্য দিকে ভাঙ্গে—ইহাই কি বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতির পরিচয়? বা পাশ্চাত্য উচ্চতর সভ্যতার অনুকরণ ফল!

আজকাল কোন পীড়া হইলে শীঘ্র আরাম হউক না হউক দুই একদিনই গৃহ সাজে শোভমান হয়। যেমন প্রতিমা সাজে খুলে তেমনি রোগীর বিছানার পার্শ্বে রং বরঙ্গ দীর্ঘ খর্ব্ব গণ্ডা গণ্ডা কারফা, বোতল, অর্দ্ধ বোতল, দুয়ানি বোতল, ক্ষুদ্র সাণ্টর শিসাতে রুগ্নশয্যার শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠে। বরফের তলব ঘন ঘন, নাপিতের ক্ষুরের আঘাতেই মস্তকের গ্রীষ্ম তাপ ছুটিয়া যায়। মৃত্যুপরে মৃতদেহ পার করা সহজ, কিন্তু আনামত শিশি বোতলাদি স্থানান্তর করা ব্যয়সাধ্য কর্ম্ম হইয়া উঠে। গঙ্গাধর যে সময় জটাধারীর বেশে বাল্যক্রীড়া করিতেন তখন কোন কার্য্যেরই এত আড়ম্বর ছিল না, এক রামার মা, নাপিত বুড়ি নরুণ দিয়া ডাক্তার সার্জ্জন জান্দরেলের কর্ম্ম শেষ করিত—আমাদের শুভঙ্কর লাউসেন দত্ত মহাশয়ের ধাতুজ্ঞানে ও মুষ্টিযোগে অনেকের প্রাণরক্ষা হইত। যাঁহারা প্রবীণ বিজ্ঞ বৈদ্য ছিলেন তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ কেহ ডাকিত না, তাঁহারা বিকারকালে আসন্নাবস্থার বিষম বটীকা বা চালানে বড়ি দিতে নিমন্ত্রিত হইতেন।

অদ্য পূজার বন্ধের পর দত্তজ মহাশয়ের কার্য্যগৃহদ্বার সুবিস্তার হইয়া উদ্ঘাটিত হইয়াছে। পাঠশালার একদিকে অনেক ছাত্র একদিকে কতকগুলি রোগী বসিয়াছে। যাহার গাত্র কণ্ডু হইয়াছে তাহাকে তুলসী পাতার রস প্রয়োগ করিতে কহিলেন—বুড়ো জোনকে গঙ্গামৃত্তিকামর্দ্দনে দাদ ভাল করিতে পরামর্শ দিলেন, তাহাতে একান্ত ভাল না হয় ক্ষুদ্র কণ্টকাকীর্ণ শিউলিপল্লব ঘর্ষণ করিতে

কহিলেন, বৃদ্ধ হায়দর বক্স শিরঃপীড়ায় অস্থির, তাহাকে দাড়িম্বকুসুমরেণুর নস্ত লইতে ও আহারান্তে একটি বস্ত্র দিয়া শিরোবন্ধনের ব্যবস্থা কহিয়া দিলেন। মির্জ্জা বুড়ো অম্লশূলে কাতর, রাত্রে উষ্ণ জলে ঘটিম দিয়া পরদিন প্রাতে সেই জল পান করিতে কহিয়া দিলেন। যাহার শিশু সন্তান শ্লেষ্মাভিভূত তাহাকে রসাসিন্ধু নাম দিয়া রাঙ্গা মাটীর বটীকা দিয়া বিদায় করিলেন ও যাহার শিশু দুধ তুলিয়াছে তাহাকে দোতলবাসী প্রদীপের তৈল জল সেবন করিতে আদেশ করিলেন। সকলে চলিয়া গেলে কেবল সাহেবানী গোয়ালিনী একপার্শ্বে কোন চিন্তায় নিমগ্না হইয়া বসিয়া রহিল। চিকিৎসা বিভাগের কার্য্য শেষ হইল, এখন শিক্ষা বিভাগে মনোনিবেশ হইল।

দত্তজ মহাশয় আজ বেত্রপাণি না হইয়া ধুতুরা ফল হস্তে কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। সর্ব্বাঙ্গ গাত্র কণ্ডুতে পূর্ণ, তজ্জন্য একটি ধুতুরাফলের কণ্টকাগ্রগুলি ঘর্ষিত করিয়া আপন লম্বা হস্ত ও পদদ্বয় সেই ফলে বিঘটিত করিতেছেন। প্রথমে জটাধারীর প্রতিই তাঁহার সুদৃষ্টি। আজ আমার সুপ্রভাত, কেন না আজই একবার দত্তমহাশয়ের মুখে প্রিয়বাক্য শুনিলাম। আজ পাঠশালায় দণ্ডবিধির সব জ্বালা ভুলিয়া শীতল হইলাম—আজ দত্তজ এত মিষ্টভাষী কেন? তিনি শুনিয়াছেন আমরা সত্বর তাঁহার শাসনাধীনত্ব হইতে মুক্ত হইব—আমরা কালেজে যাইব।

দত্তজ আজ মিষ্টভাবে (যত মিষ্ট তিনি হইতে পারেন) মধুরভাবে কহিলেন "ওহে গঙ্গাধর ভায়া তুমি কালেজে যাবে শুনিতেছি। নগরে থাকিবে, মধ্যে মধ্যে যেন পত্র লিখিলে উত্তর পাই, আমার জন্য একজোড়া চটি জুতা ও নস্যের ডিপা একটি পাঠাইবে। আর কি বলিব?" আমি কহিলাম মহাশয় "বাজারে বলে বেশ ছাঁচি বেত পাওয়া যায়!! দেশী গুলা মহাশয়ের হস্তে অতি শীঘ্র শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়!" "ভায়া আমায় পরিহাস করিতেছ! এই বেতের গুণ—" বলিয়া বেত গ্রহণ করিয়া দুই একবার হেলাইলেন। আমি অভ্যাসগুণে চমকিয়া স্থানান্তরে বসিলাম। "ভায়া ভয় নাই—আমি আর তোমায় মারিব না এই বেতের গুণ সময়ান্তরে জানিবে। যদি জমিদার হও যেদিন গোমস্তার হিসাবে ভুল ধরিবে—যদি মহাজন হও যেদিন অধীনস্থ চৌধুরীর চুরি নিবারণে সক্ষম হইবে—যদি বিচারক হও যেদিন আমলা কি মামলাবাজের তঞ্চক বুঝিতে পারিবে সেই দিন লাউসেন দত্তের নামও স্মরণ হবে, বেতও স্মরণ হবে—ভায়া এমন যে সুমিষ্ট ইক্ষুদণ্ড তা ঘানিতে না ঘুরালে রসও দেয় না, গুড়ও হয় না—তেমনি বেত না খাইলে বুদ্ধি টস্‌টসে হয় না। এই যে 'সমানি শির শিরসানি ঘনানি বিরলানিচ' মুক্তার ন্যায় তোমার অক্ষর, এই যে কড়ানে, সটকে, বুড়কে, আনা মাসা কাঠাকালি, বিঘাকালি কসিতে তুমি এক শুভঙ্কর বিশেষ। এই যে রামায়ণ, মহা-

ভারত, গুরুদক্ষিণা, দাতাকর্ণ, শিব রামের যুদ্ধ পাঠে এত সুস্বর হয়েছ, এ কেবল জানবে এই বেতের ভয় এই বেতর গুণ।" বলিয়াই সম্মুখের পাটির উপর আবার দুই চারি বার সজোরে বেত্রাঘাত করিলেন ও কহিলেন "আমার নাশের কথা ভুল না।" দত্তজ মহাশয়ের কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎকাল নিস্তব্ধে ভাবিলাম, যেরূপ জন্ম হইলেই মৃত্যু, শীল পড়িলেই জল, সেইরূপ পাঠশালায় প্রবেশ করিলেই বেতের পটপটী লাভ সুনিশ্চয়।

দত্তজ মহাশয়ের দণ্ডবিধির অধীনে আসিয়া কোন ছাত্রই দণ্ড অতিক্রম করিতে পারে না, তথাপি কৃতজ্ঞতার বিষয় এই গঙ্গাধর অপরের মত দণ্ডনীয় হইতেন না, তাঁহার পক্ষে কিছু যেন ক্ষমা ছিল, সেই জন্য এই বক্তৃতার শেষ হওয়ায় আমি দত্তজ মহাশয়ের প্রতি একেবারে ভক্তিশূন্য না হইয়া তাঁহাকে এখনও স্মরণ করিয়া থাকি ও সময় পাইলে সাধ্যমত তাঁহার উপকার করিতে ব্রতী হইয়া থাকি। অহো! গুরুভক্তি!

আমার চিন্তা শেষ না হইতেই সাহেবানী গোয়ালিনী কহিয়া উঠিল—"বেলা হল, আমার কথা শুনিবার কি আজ সরকার মহাশয়ের অবসর হবে? আমি চলিলাম।" বলিয়া নিকটস্থিত দুগ্ধপাত্র উঠাইল। দত্তজ মহাশয় কহিলেন, শত কাজ পরে, তবু তোমার কার্য্য প্রথমে—সাহেবানী চক্ষু ঘুরাইয়া কহিল "হুঁ এত ভাব হে! তবে কেন এতক্ষণ নিরর্থক বসে আছি?"

দত্তজ। যা হবার হইয়া গিয়াছে, এখন কি হুকুম?

সাহেবানী দত্তজার নিকটে আসিয়া বসিল ও নিম্নস্বরে কহিল "শুনেছেন সুন্দরীকে সাহেবের কাছে লয়ে গেছে। তাই এলাম একবার—খড়ি পাত, গুণে বল, সব ভাল হবে ত?" দত্তজ মহাশয় গণক। একটি "হনুমান চরিতের" পুথি দপ্তর হইতে বাহির করিলেন—পাঠশালায় সব নিস্তব্ধ। খড়ি বাহির করিলেন—ভূমে একটি অঙ্কপাত করিলেন ও কহিলেন "ফল হাতে আছে?"

সা। তা ভুলি নাই।

গাঁট হইতে একটি হরিতকী বাহির করিল। লাউসেন কহিল, সুপারি নাই? আরও ভাল। একটি সুপারি সঙ্গে সঙ্গে স্থাপিত হইল। পুস্তক হইতে একটি বচন ব্যাখ্যা করিলেন ও দত্তজ মহাশয়ের রসিকতার পরিচয় আরম্ভ হইল। "সুন্দরীর পিতার নাম কি?" সাহেবানীর ত লজ্জা রাখিবার স্থানাভাব হইল। কহিল, "এত পরিচয় কেন?" আবার চক্ষু ঘুরাইয়া কহিল, "বাপের সংবাদে কাজ কি—সে আমার গর্ভজাত কন্যা কি না?"

দত্তজ কহিলেন "সেই প্রকারেরই গণনা করি, যদি ভুল হয় তো জবাবদিহি তোমার?"

সাহেবানী। তা গর্ভে ধারণ করে অবধি জানা আছে! দারোগাকে দাও, দেওয়ান্‌জীকে দাও, টাকা কি তোমরা দিয়েছিলে। এখন পুরাণ কথায় কাজ নাই যা বলি তা কর।

গণনা আরম্ভ হইল। "ভাল হবে কি মন্দ হবে? এই গণনা? এই প্রশ্ন?" বলিয়া আর একটি খড়ির দাগ দিলেন ও দত্তজ খড়ির তালটি লুফিতে লাগিলেন, কত কত বচন অস্ফুটস্বরে কহিতে লাগিলেন, "ভাল মন্দ" "মন্দের ভাল" "বড় মন্দ নয়" "মন্দও নয়" "ভালও নয়।"

"দেওতো আবার এক জায়গায় হাত দেও। এজে হনুমানের ঘরে হাত দিলে। দেখি হনুমান্ কি করেন।"

সাহেবানী কহিল "মশয় তুমি ভিন্ন—তুমি যা বলবে হনুমান্ তাই করবে—"

ইতিমধ্যে তর্কালঙ্কার মহাশয় পাঠশালার বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত। এক মুহূর্ত্ত জন্য সব কার্য্য বন্ধ হইল। একটি কম্বল আসন সত্বর বিস্তৃত হইল, তর্কালঙ্কার উপবেশন করিবামাত্র দত্তজ মহাশয় সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। তর্কালঙ্কার কহিয়া উঠিলেন, "লাউসেন তুমি প্রকৃত ভক্ত কিন্তু এটি তোমার অনধিকার চর্চ্চা। জ্যোতিষ চর্চ্চা করিয়া তুমি কেবল কলির শূদ্রের পরিচয় দেও।" দত্তজ কহিলেন "এখন সে কথা যাহা হউক মহাশয়ের আগমন সাহেবানীর শুভদায়ক হইবে সন্দেহ নাই। এখন আপনিই খড়ি গ্রহণ করুন—এই অঙ্ক গৃহও প্রস্তুত।"

তর্কা। লাউসেন, আবার তুমি ভুলিলে! তোমার অঙ্কে আমি গণনা করিব? একটা নূতন খড়ি নাই?

নূতন খড়ি সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইল, তর্কালঙ্কার মহাশয়ও সঙ্গে সঙ্গে অদৃষ্টদর্শনে ধীরভাবে নিযুক্ত—

"এই স্থানে কোন দ্রব্য রাখ।" সাহেবানী একটি হরিতকী বাহির করিল—তর্কালঙ্কার রুষ্ট হইয়া ফোকলা মুখে কহিলেন, "আমি ফল গ্রহণ করি না—ও গোপিনী, তুই আজ নূতন হলি, রজত মুদ্রা?" দত্তজ মহাশয় কহিলেন "ফলে হবে না; সিকি, আধুলি কিছু নাই?"

সাহেবানী একটি সিকি রাখিল—তর্কালঙ্কার মহাশয় কিঞ্চিৎ কাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন "অশ্বিন ব্যাপার এক কালেই মঙ্গল সূচক কদাচিৎ হয়। এক কলসি দুগ্ধে বিন্দুমাত্র লবণাক্তও অসুচীর কারণ। সাহেবানী তোকে রিষ্ট ভঙ্গ জন্য একটা কার্য্য করা চাই। সে পাঁচ আনা পাঁচ সিকার কাজ নয়। কন্যার মঙ্গল চাস ত শুদ্ধ গব্য ঘৃত সংগ্রহ কর। একটি ভাল করে যাগ করা চাই, তোদের পুরোহিতকে পাঠাইয়া দিস্।"

সা। কত খরচ হবে না হয় পাঁচ টাকা ?

সাহেবানীর এই কথা উচ্চারণ হওন সময়ে শীতু খেপা উপস্থিত। কহিল "অধ্যাপক মহাশয়, বলি পাঁচ টাকা, আর নয়—সুন্দরীর শুভসাধন জন্য আমিই পাঁচ টাকা দিব।" পাগলের যেমন কথা তেমনি কাজ। সঙ্গে সঙ্গে থলি হইতে মুদ্রা পঞ্চ বাহির করিয়া তর্কালঙ্কারের সম্মুখে রাখিয়া দিল কিন্তু তাহার বাক্য সাঙ্গ না হইতেই খণ্ডভীম গর্জ্জন করিতে করিতে রঙ্গভূমে উপস্থিত—"ডেম ক্ষেপা, তুই পাঁচ টাকা দিবি, আমার সুন্দরী।" ক্ষেপা কহিল "আমার সুন্দরী।" অমনি আমার "আমার" যুদ্ধ উত্তেজক বাণী উভয় পক্ষে উচ্চারিত হইতে লাগিল, ও পরক্ষণেই একটি ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্র উপস্থিত হইল। শীতু দংষ্ট্রা নির্ব্বাচন পূর্ব্বক ভীমের প্রতি ধাবমান, ভীম দণ্ডজার বেত্র হস্তে দণ্ডায়মান। যে যার আপন কার্য্যে ব্যস্ত। ইতিমধ্যে বেগতিক দেখিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় সাহেবানীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া ক্ষেপার দত্ত পঞ্চ মুদ্রা হস্তে লইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্দ্ধান।

ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। নিত্যই দেখিতে পাওয়া যায় নূতন নূতন নগর স্থাপিত হইতেছে, পুরাতন জঙ্গল আবাদ হইতেছে ও নগর নগরীর আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে। কৃষ্টভূমির আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে, নূতন নূতন খনি আবিষ্কার হইতেছে, রেলওয়ে লাইন বিস্তার হইতেছে, কিন্তু কোথাওই লোকের অভাব নাই। যখন এলফিনষ্টোন ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখেন, তখন ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা কমবেশ ১৪০০০০০০০ কোটী ছিল বলিয়া অনুভব হইয়াছিল, মহাত্মা এনফিলষ্টোন ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানা প্রকার চাকরী করিয়া শেষ বোম্বাইয়ের গবর্ণর হন। তিনি ভারতবর্ষের কোনস্থানে কতলোক আছে, এক প্রকার জানিতেন, তাঁহার অনুভব আমরা গ্রহণ করিতে পারি। মোটামুটি তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষে চৌদ্দকোটী লোকের বাস ছিল। এক্ষণে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ২৪০০০০০০০ কোটী। এই চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে দশ কোটী লোক বৃদ্ধি হইয়াছে। যদি বাস্তবিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই লোকবৃদ্ধি ভারতের মঙ্গল কি অমঙ্গল? এই সকল লোকের অবস্থা কিরূপ, ইহাদের দ্বারা ভারতের ভাবী উন্নতির আশা করা যাইতে পারে কি না চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনে এইরূপ প্রশ্ন উদিত হয়। কেহ বলেন ভারতের মঙ্গল হইতেছে, কেহ বলেন অমঙ্গল হইতেছে। আজি আমরা এ বিষয়ের কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

বাস্তবিক দেখিতে গেলে এইরূপ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতবর্ষের দুর্গতির এক মাত্র কারণ। যে পরিমাণে লোক বৃদ্ধি হইতেছে স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতভূমিও তাহাদের আহার যোগাইয়া উঠিতে পারেন না। ভারতবর্ষের উৎপন্ন হইতে যত লোকের সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে, লোকসংখ্যা তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সাক্ষী প্রতিবৎসর দুর্ভিক্ষ। প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণবিনাশ। আর যে সকল লোক আছে,

তাহারাও অন্নাভাবে জীর্ণকলেবর। তাহা নাই বা হইবে কেন? ভারতবর্ষের পরিমাণ ১৬০০০,০০ ষোল লক্ষ বর্গ ক্রোশ, এক এক বর্গ ক্রোশে ১৯৩৬ বিঘা জমী আছে। তবে সর্ব্বশুদ্ধ ভারতবর্ষের জমী মোটামুটি ৩০৯৭৬০০০০০ বিঘা। এই জমিতে পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, হ্রদ, মরুভূমি, জঙ্গল, লবণক্ষেত্র প্রভৃতিতে অর্দ্ধেকের উপর আচ্ছন্ন; অপর অর্দ্ধেকের উপর গ্রাম, নগর, বাগান বাগিচা, রেলওয়েঁ রাস্তা আছে, বেলে, জলা, উঁচু কাঙ্করিয়া মাটি আছে ইহাতেও আন্দাজ অর্দ্ধেকের এক তৃতীয়াংশ বাদ যায়, তাহা হইলে প্রায় ১০৩২৫০০০০০ বিঘা জমি আবাদের জন্য পাওয়া যায়, যদি এই সমস্ত জমী ২৪০০০০০০০ চব্বিশ কোটী লোকের মধ্যে সমান ভাগ করিয়া দেওয়া যায়; তাহা হইলে প্রত্যেকের অদৃষ্টে গড়ে ৪¼ স চারি বিঘা জমী পড়ে। স চারি বিঘার উৎপন্ন গড়ে প্রতি-বৎসর বিঘায় পাঁচ মণ ধরিলে ২১¼ স একুশ মন পড়ে। কিন্তু একজন জোয়ান মানুষের যদি সম্পূর্ণ পেট ভরিয়া আহার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার অন্ততঃ ২ সের আহার প্রত্যহ দরকার হয়, প্রত্যহ দুই সের আহার হইলে, বৎসরে ১৮ মণ হয়। ইহার উপর কাপড় চোপড় আছে, ঘর বাড়ী আছে, সে সকল বাকী ৩¼ মণে কোনরূপেই হয় না। যদিও হয়, তাহাতে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না। স্বাস্থ্যকর আহারের কথা দূরে থাকুক, মাদুরে শুইয়া পেট ভরিয়া আহারও হয় না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এক এক বিঘায় কোথাও ১৬ মণ ২০ মণ চাউল হইয়া থাকে। সে কথা সত্য, কিন্তু তাহাতে যে সার দিতে হয় ও যে খরচ করিতে হয় তাহা করা চাসাদিগের অনেকেরই সাধ্যাতীত। বাঙ্গালায় সারের ব্যবহার প্রায়ই নাই এই জন্য বাঙ্গালার চাসারা আজিও খাইতে পায়, কিন্তু অন্যত্র সার ভিন্ন শস্য একেবারেই হয় না। এই জন্য সেখানে লোক অনাহারে মারা যায় ও আধপেটা খাইয়া জীবনধারণ করে।

আবার কেহ বলিতে পারেন যে /২ সের নিত্য খোরাক অধিকতর হইয়াছে। তাহা নহে, বাঙ্গালার মৎস্য ঝোলজীবী ভদ্রলোকের পক্ষে ২ সের অধিক হইতে পারে, কিন্তু চাসাদের সেরূপ নহে। কাবুলের লোক ২ সের মাংসই প্রত্যহ খায়, ইহা ভিন্ন অন্য উপকরণ আছে। শুনা যায়, আকবর খাঁ এক একবারে /৫ সের মাংস /১ সের চাল ও /১ সের ঘৃত ভক্ষণ করিতেন। আমাদিগের /২ সের বলা বরং অল্প হইয়াছে ত অধিক হয় নাই।

আমরা যে ভাবে হিসাব করিয়া ভারতবাসীর লোকের অর্দ্ধাহার দেখাই-লাম, ইহাতে সমস্ত জমি সমানভাগে বিভাগ করিয়া লওয়া হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, অসমানভাগ হওয়ায় গড় ঐ ৪¼ স চারি বিঘাই দাঁড়াইয়াছে;

ইহার অপেক্ষা অনেক লোকের অধিক জমী, অনেকের আবার কমও আছে। বহুসংখ্যকের কিছুই নাই। যাহাদের কিছুই নাই, তাহারা চাকরী করে ভিক্ষা করে উঞ্ছবৃত্তি করে এবং অতি কষ্টে দস্তুরসমাত্র পান করিয়া কোনরূপে মনুষ্যজন্ম কাটাইয়া যায়। যখন দেখা যাইতেছে যাহাদের গড় মাফিক আছে, তাহাদেরই অর্দ্ধাহার তখন যাহাদের নাই, তাহাদের ত কথাই নাই।

এখনও হয় নাই; ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের ন্যায় বিদেশ হইতে শস্য সংগ্রহ করিতে পারে না, ইহার ঘরের শস্যের গুজরান করিতে হয়, এই শস্যের মধ্য হইতেও আবার অনেক শস্য প্রতিবৎসর দেশ বিদেশে নীয়মান হইতেছে ২১¼ স একুশ মণে অসম্পূর্ণাহার হয়, তাহার উপর হইতে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ মণ শস্য বিদেশে পাঠান হয়।

দুঃখের কাহিনী এখনও ফুরায় নাই, ইহার উপর হইতে এই ভারতবর্ষ হইতে এক ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ৫৫০০০০০০০ পঞ্চান্ন কোটী টাকা লইতেছেন। করদ ও মিত্ররাজ্যের আয় সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ২০ কোটী। আর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ও প্রজাগণের মধ্যবর্ত্তী জমিদার, তালুকদার যতদূর ইস্ক্রূপ চলিতেছে অণুমাত্র কসুব করিতেছেন না। মোট আয় ত ২১¼ একুশ মণ ক্রমে যে সব যায়, তোমার উদর চলুক না চলুক, তুমি খাও না খাও, তুমি সমাজে বাস কর, সমাজের জন্য যেটুকু চাহি তাহা তোমার দিতে হইবে। সেটুকু জোর।

পাঠক মনে করিও না হতভাগ্যদিগের ইতিহাস ইহার মধ্যেই শেষ হইয়াছে, তাহাদের সমস্ত আশা ভরসা আকাশের উপর নির্ভর করে; গ্রীষ্ম সময় পড়িতেই না পড়িতেই তাহারা হাঁ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে, একদিন দুইদিন তিনদিন—দিন যত যাইতে থাকে, তাহাদের বুক দুড়দুড় করিতে থাকে সমস্ত বৎসর অর্দ্ধাহারে গিয়াছে, আর আবার অর্দ্ধহারের পথও রুদ্ধ হয়। জ্যৈষ্ঠ পড়িল, এখনও একবিন্দু জল নাই, এইবার সর্ব্বনাশ, আকাল পড়িল, কতকগুলি নিঃস্বলোক সমাজের ঘাড়ে পড়িয়াই আছে, যাহাদের আছে তাহারা তাহাদের গুজরান করিয়া উঠিতে পারে না। আবার লক্ষ লক্ষ লোক ঘর বাড়ী বিক্রয় করিয়া লাঙ্গল গোরু জলে ভাসাইয়া জীবনে হতাশ হইয়া চলিল, যাহার জোর আছে কাড়িয়া খাইবে, যাহার জোর নাই সে যেখানে বসিবে সেইখানেই মারা যাইবে। কাড়িয়া খাইবে কি? পুলিশ আছে ধরিয়া প্রহার। এইরূপে গত বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশে মারা গিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট

রিলিফওয়ার্ক খুলিয়া কত লোকের প্রাণদান করিবেন! যখন দেশের অর্দ্ধেকের উপর লোক নিরুপায়, তখন কত রিলিফ করিবেন।

এইরূপে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত লোকই অর্দ্ধাহারে জীবনযাপন করে। যাহাদের লইয়া দেশ, যাহাদের লইয়া জাতি, যাহাদের লইয়া বল, যাহাদের লইয়া ভরসা, তাহারা নিরন্ন, তাহাদের দুঃখের পার নাই। যাহারা ইংলণ্ডে রাজার উপর হুকুম জারী করে, যাহারা ফ্রান্সদেশে সর্ব্বময় কর্ত্তা, যাহারা কটাক্ষে ইটালীর উদ্ধার সাধন করিল, যাহারা আমেরিকায় নূতন সমাজের সৃষ্টি করিতেছে ও সমস্ত জগৎ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িতে চাহিতেছে এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যে সেই সাধারণ লোক নিরন্ন, অর্দ্ধাহার, ঘোরঅজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন, কিরূপে আপনার অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে জানে না জানিতে পারে না, সে বিষয়ে ভাবে না ভাবিতে পারে না, ভাবিবার সময় নাই, ভাবিতে গেলে অপার-নৈরাশ্য সাগরে আপ্লুত হয়, কুল কিনারা না পাইয়া অদৃষ্টে যা হয় হবে, "জীব দিয়াছেন যিনি শিব দিবেন তিনি" বলিয়া কোনরূপে আপন আপন দুর্গতি ভুলিয়া আপন সমবস্থ লোকদিগের নিন্দা কুৎসা প্রভৃতি নির্দ্দোষ আমোদে কাল কাটায় কিন্তু দুর্গতিদহন নিরন্তর হৃদয় দগ্ধ করে। এই ত সাধারণ লোকের অবস্থা, আবার যাঁহারা ভদ্রলোক বলান যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা রাজকীয় কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, যাঁহারা শ্রেষ্ঠ জাতি তাঁহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। কি মুসলমান কি হিন্দু সকল ঘরেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, যে আয়ে গত শতাব্দীতে রাজার হালে চলিত এখন তাহাতে নিয়ত বৃদ্ধিশীল পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হয় না। পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ মানের ভয়ে স্বীয় অবস্থা প্রকাশ করার জো নাই; দুর্ভিক্ষ হইলে ছোটলোকে রিলিফ-ওয়ার্ক পায়, কিন্তু ইহাদিগকে গৃহমধ্যেই থাকিতে হয়; স্বচক্ষে অনশনে প্রাণসম শিশু সন্তানকে কাতর দেখিতে হয়, তাহার ক্ষুধাজনিত ছটফটানি দেখিয়া কাঁদিতে হয়, শেষ যখন অসহ্য হয় তখন সেই শ্মশান সমান আত্মগৃহে, হয় সন্তানের না হয় আপনার, প্রাণ বধ করিয়া দুঃখানলে আহুতি দিতে হয়।

এরূপ অবস্থায় ভারতবাসীদিগের দুইটি মূল মন্ত্র জপ ও সাধনা নিতান্ত আবশ্যক। প্রথম লোকসংখ্যা হ্রাস, দ্বিতীয় সাংসারিক উন্নতিসাধন। যে পরিমাণ লোক সংখ্যা, ইহা ভারতবর্ষের উৎপন্ন হইতে রক্ষিত হইতে পারে না; অতএব ইহার হ্রাস করা ও পরে আর যাহাতে বাড়িতে না পারে তাহার চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। লোকসংখ্যা হ্রাসের এক উপায় বিদেশে লোক পাঠান, সে চেষ্টা সফল হইতে অনেক দিনের কথা। গতবৎসর দুর্ভিক্ষে পশ্চিমাঞ্চলে ১৫০০০০ দেড় লক্ষ লোক মারা গেল তথাপি দশহাজারও বিদেশে যায় নাই।

লোকসংখ্যা হ্রাস করার তিন স্বাভাবিক উপায়; যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মারীভয়। আমাদের দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ নাই, যুদ্ধে অনেক লোক মারা যায় এবং অনেক দিন সেই ক্ষতি পূরণ করিতে লাগে, আছে দুর্ভিক্ষ, মারীভয়ও বিশেষ নাই। যে ম্যালেরিয়া আছে, তাহাতে লোক ত অধিক মরে না, কেবল কষ্ট পায়। অতএব যাহাতে সেই দুর্ভিক্ষ ইচ্ছামত কাজ করিতে পারে সে বিষয়ে অন্যের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। যুদ্ধ অপেক্ষা দুর্ভিক্ষে লোকনাশ অনেক পরিমাণে বাঞ্ছনীয়, কারণ যুদ্ধে যাহারা মরে তাহারা সবল সুস্থকায়, তাহাদের দ্বারা সংসারের উন্নতি হইতে পারে। দুর্ভিক্ষে মরে যাহারা দুর্ব্বল উপায়হীন—তাহাদের থাকায় তাহাদের নিজের ত যন্ত্রণার সীমা নাই আর অন্যেরও কষ্ট। যাহাই হউক ১৬০০০০০ বর্গ মাইলে ২৪০০০০০০০ লোক প্রতিপালন করা দুরূহ। ২১।৵ একুশ মণ হইতে টেক্স খাজনা দিয়া চলে না, অন্য অনেক দেশেও এইরূপ আছে কিন্তু তাহাদের বাণিজ্য আছে, শিল্প আছে, ক্রমে সে সব দেশে মূলধন সঞ্চিত হইতেছে সুতরাং অনেক লোক তাহাতে প্রতিপালন হয়। আমাদের দেশে বিদেশীয় মূলধনে বাণিজ্য, বিদেশীয় মূলধনে রেলওয়ে, বিদেশীয় মূলধনে শিল্প, মূলধনের সমস্ত মুনফা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, আমাদের বর্দ্ধনশীল লোক সমূহের আহার চলে কিসে? কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে এই পরিমাণে লোক বাড়িয়া আসিলে ও বিদেশীয় মূলধনের সাহায্য না পাইলে আমাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইত।

এরূপ বিদেশীয় মূলধনের প্রাদুর্ভাব ত চিরদিন থাকিবে না যদি না থাকে তবে কি উপায় হইবে।

আর এক উপায় সাংসারিক উন্নতিসাধন। চাসারা যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে তাহার যত্ন করা, তাহাদের যাহাতে বিবাহ ভিন্ন জগতে আরও সুখ আছে এরূপ প্রতীতি জন্মে, তাহার চেষ্টা করা। যাহারা নিজে কষ্ট না পায় তাহারা ছেলে কষ্ট পায় এটা চাহে না, সুতরাং তাহারা একটু পরিণাম দর্শন করিয়া চলে, ভাবিয়া বিবাহ করে এবং সতর্ক হইয়া জগতের ভার বৃদ্ধি করে। বাবুআনা করা অভিপ্রেত নহে, কিন্তু যাহাতে অভাব কমে, স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি হয়, সে বিষয়ে সকলেরই বিশিষ্টরূপে যত্নশীল হওয়া চাই। এই স্বাচ্ছন্দ্য যত বৃদ্ধি হইতে থাকিবে ততই লোকের সেই দিকে টান হইবে। যতক্ষণ সেই সকল সামগ্রী না পায় ততক্ষণ অন্য ব্যয় করিতে ইচ্ছা করিবে না। নিজের আরাম যাহারা চায় তাহারা শীঘ্র বিবাহ করে না, বিবাহ করিলেও সন্তানেরাও যাহাতে সেই সকল আরাম পায় সে বিষয়ে চেষ্টা করে। যাহার কিছু নাই তাহার বুদ্ধি বিবেচনাও নাই। সে ভাবে আমারও যেমন করিয়া চলিল পরে

ছেলেদেরও সেইরূপ করিয়া চলিবে। তাহারা নিজে জীবনে কষ্ট যন্ত্রণা বই ভোগ করিল না, তাহারা জানে জগৎ যন্ত্রণাময়, যা সুখ আছে তাহা বিবাহ-জনিত সাংসারিক। সুতরাং তাহারা প্রথম হইতেই বিবাহ করিবার জন্য ব্যগ্র হয় এবং ছেলেদের বিবাহ দেওয়া পর্য্যন্তই পিতার একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করে। বিবাহে তাহারা অনেকটা সহানুভূতি পায়। নিজ সুখ দুঃখের ভাগী পায় যন্ত্রণাময় জীবলোকে কতকটা আরাম পায়। সকল যন্ত্রণা গৃহলক্ষ্মীর মুখ দেখিয়া দূর করে। ছেলে হয় মরে সে কেবল স্বভাবের উপর নির্ভর। যত দিন ছেলেগুলি রহিল নিজের মুখের গ্রাস তাহাকে দিয়া বাঁচাইয়া রাখিল। বরাবর বাঁচিয়া রহিল ত পাঁচবৎসর বয়স হইতেই সে রোজগার করিতে শিখিল। সে একরকম আত্মোদর পূর্ত্তি করিতে শিখিল। কিন্তু তাহাতে কোন উপকার নাই, সে ভাল শিক্ষা পাইল না, ভাল কারিগর হইতে পারিল না। চিরদিন সকল অপেক্ষা অল্পদরের যে মজুরি তাহাই করিয়া তাহার দিনপাত করিতে হইবে। কখনও পূবা পেট ভাত খাইতে পাইবে না। এরূপ অবস্থা হইতে তাহাদের উদ্ধার করিতে হইলে, তাহাদের সাংসারিক উন্নতিসাধন যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা করা প্রয়োজন। যাহাতে তাহারা সঞ্চয় করিতে শিখে, সে বিষয়ে যত্ন করা, আর যাহাতে তাহারা বিবেচনা করিয়া বিবাহ করে ও সাবধানে জগতেব ভার বৃদ্ধি করে সেইটি তাহাদিগকে শিখাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

শুদ্ধ দুঃখীলোকদিগের সাংসারিক উন্নতি সাধন করিলেই হইবে না। জাতি-গত উন্নতিও সেই সঙ্গে চাহি। এলফিন্‌ষ্টোনের সময় ভারতবর্ষে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ লোক ছিল, তখন অন্নকষ্ট ছিল না। মিউটিনির সময়ও অন্নকষ্ট বিশেষ ছিল না। তাহার পর হইতেই অন্নকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। মিউটিনির সময় লোক আন্দাজ ১৭ কোটী, এখন শুদ্ধ বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অধীনেই তাহা আছে। মনে কর এই ১৭ কোটী লোকেই ভারতবর্ষের বর্ত্তমান উৎপন্নে গুজরান করিতে পারে। তাহা হইলে সত্তর লক্ষ লোক বাড়তি হইয়াছে ইহাদের কি উপায় ? মনে কর বৃটিশ বর্ম্মা প্রভৃতি নূতন দেশে এক কোটী লক্ষ লোক আছে। জঙ্গল আবাদ করিয়া আর এক কোটী লোকের চলিতেছে এবং রেলওয়ে ও পবলিক ওয়ার্ক কল ইত্যাদিতে আর দশ লক্ষ লোক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। এখনও চারি কোটী বাকি। ইহারাই দুর্ভিক্ষে মরিতেছে, প্রতি বৎসরই শুনা যায় এখানে দেড়লক্ষ ওখানে তিন লক্ষ মরিতেছে। এই চল্লিশ লক্ষ পূর্ব্বোক্ত বিংশতি কোটী লোকের কষ্টের কারণ হইয়াছে। বিশ কোটীর যাহাতে চলে তাহাতে চব্বিশ কোটীর চলিতে গেলে কাজেই সকলেরই অর্দ্ধাহার।

অতএব এই চারি কোটী লোকের জন্য বন্দোবস্ত চাই। এ জেলা হইতে ও জেলা এইরূপে চারাইয়া দিলে বোধ হয় এখনও পতিত জমী আবাদ করিয়া দুই লক্ষ লোকের চলিতে পারে, কিন্তু তাহা করে কে? প্রথম লোকে ত বাড়ী ঘর ছেড়ে যেতেই রাজী নয়, তৎপর যাওয়ার ও যাইয়া সংসার ফাঁদিয়া বসিবার খরচ চাই, কাহারই কিছু নাই, দেয় কে? দুঃখী ভদ্রলোকের এইরূপে এখান হইতে ওখান করিয়া অনেক সহস্রের উপায় হয় কিন্তু গরিব দুঃখীর হয় কই?

দ্বিতীয়, জাতীয় সাংসারিক উন্নতি অর্থাৎ দেশীয়শিল্প ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি। ব্যবসায়াদিতে মূলধনের প্রয়োগ, কৃষির উন্নতি অল্প ভূমিতে অধিক শস্যোৎপাদনের চেষ্টা ইত্যাদি। আমাদের দেশে বাণিজ্য ও শিল্পের এক কথা এই যে, ইংরেজদিগের সঙ্গে যেন আমাদের শিল্প ও বাণিজ্যের এরূপ শৈশাবাবস্থায় সংঘর্ষ (compitition) না হয়। হইলেই আমাদের লোকসান। বহির্ব্বাণিজ্য ইংরেজে করে, তোমরা তাহাতে এখন যাইও না। এর পর সে সব হবে। অন্তর্ব্বাণিজ্যের ভাল করিয়া শ্রীবৃদ্ধি কর দেখি, তাহাতে দশ লক্ষ লোকের এখনও চলিতে বেশ পারে। রেলওয়ে খাল ইত্যাদি লইয়া সে বিষয়ের ত খুব সুবিধা হইয়াছে? চার চাসে ইংরেজ আছে, তাহাতে তোমরা যাইও না, প্রথম উহাদের টাকা অধিক, তাহার উপর আবার তোমাদের লোকসান করিয়া দিবার উহাদের অনেক উপায় আছে। যাহাতে ইংরেজ আছে তাহাতে যাইও না লোকসান হইবে, দেশের বড় ক্ষতি হইবে। কয়লার খনিতে ইংরেজ আছে, কিন্তু এরূপ কাজে ইংরেজের সঙ্গে দেশীয় লোকেও কাজ চালাইতেছে। ছোট নাগপুরে অনেক কাজ আছে, তাহাতে ইংরেজ নাই। অনেক তামার খনি আছে, এই সকল কাজে দেশীয় লোকের উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত। বাঙ্গালায় এখন নীলের কাজে ইংরেজলোক ক্রমেই কম হইতেছে। সেদিকে অনেক লাভ ও লোকসানের সম্ভাবনা, তাহাতে অনেক লোক প্রতিপালন হইতে পারে। অন্তর্বাণিজ্যে বিস্তর টাকা খাটিতে পারে, যাহা খাটিতেছে তাহা ঠিক নয়। আরো অনেক খাটিতে পারে ও অনেক লোক প্রতিপালন হইতে পারে। জামালপুরের রেলওয়ে কেরাণীগণ অন্তর্বাণিজ্যের জন্য এক সম্ভূয় সমুত্থান (Joint Stock) কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা যেরূপ শীঘ্র শীঘ্র এবং বিনা আয়াসে ২০,০০০ বিশ হাজার টাকা তুলিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তাঁহাদের সেয়ার পাঁচ টাকা, সুতরাং তাঁহারা অল্প আয়াসেই অধিক সেয়ার বিক্রয় করিতে পারিতেছেন, তাঁহারা যেরূপ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের উপর আমাদের যথেষ্ট ভরসা হয়। এই দৃষ্টান্তানুযায়ী প্রতি গ্রামে গ্রামে সমবেত কারবার খুলিতে লাগিলে অনেক উপায় হইতে পারে। কিন্তু

এইরূপ সাংসারিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেন অকাতরে বিবাহ না হয়, আর যেন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি কোন মতেই না হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের দশাও আমাদের মত কতকটা ছিল, দুঃখী লোক খেতে পাইত না, তাহাদের সুবিধার জন্য স্বাধীন বাণিজ্য স্থাপিত হইল, জিনিস পত্রের দাম সস্তা হইল। কিন্তু এই কয়েক বৎসরের মধ্যে নানা উপনিবেশ স্থাপনা সত্বেও ইংলণ্ডে শতকরা ৫০ জন লোক বাড়িয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে এখন প্রতি ২৪ জন লোকে একজন ভিখারী আছে। এখনও ইংলণ্ডের চলিতেছে কিন্তু আমাদের আর চলে না। আমাদের উপস্থিত হিসাবে ৬ জনের মধ্যে একজন কাঙ্গাল, ইহাদের জন্য কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে যাহাতে আর সংখ্যা বৃদ্ধি না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত।

অনেকে মনে করেন ট্যাক্সই আমাদের দুর্গতির কারণ সেটী আমাদের ভুল। ট্যাক্সে গুরুতর কিছুই নাই। যদি চব্বিশ কোটী লোক ৫৫০০০০০০০ পঞ্চান্ন কোটী (ইংরেজদের ৫৫ ও স্বাধীন রাজাদের ২০ কোটী) টাকা দেয় তবে প্রতিজনের ৩৶০ তিন টাকা দুই আনা গড়ে, এখন যেরূপ উচ্চমূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে, তাহাতে ২১½ মণের মূল্য ৫০ পঞ্চাশ টাকা হইতে ৩৶০ তিন টাকা দুই আনা দিলে শত করা ৬ ছয় টাকা ট্যাক্স ন্যায্যমত। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে স একুশমণ হইতে স তিন টাকা লইয়া চাসা যে আর কোন কালে কিছু সঞ্চয় করিবে তাহার জো ত রহিলই না। বরং তাহার স্বাচ্ছন্দ্যের যা ছিল তাহাও রহিল না। কিন্তু সে দোষটি কার ? লোকসংখ্যা বৃদ্ধির। যদি এই বৃদ্ধি না হইত মনে কর ২০ কোটী লোকই যদি থাকিত তাহা হইলে ৩ তিন টাকা ৸০ আনা খাজনা দিতে হইত সন্দেহ নাই তাহা হইলে কিন্তু তাহাদের আয় হইত

$\frac{১০৩২৫০০০০০}{২০০০০০০০০}$ বিঘা × ৫ মণ=২৭। স সাতাইশ মণ হইত। অনায়াসে চলিত।

সাতাইশ মণ হইতে ১৮ মণ খাবার ও ৩৸০ তিন টাকা বার আনা রাজস্ব দিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিত। সঞ্চয় তখনও হইত কি না সন্দেহ। এখন ঘোর কষ্ট হইয়াছে। মোটে তাহা হইলে টেক্স কষ্ট নহে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ এই টেক্স কষ্টকর হইয়াছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের দোষ দেওয়া যায় না। তাই বলিয়া আমরা গভর্ণমেণ্টের ট্যাক্স সিষ্টেমের স্বাপক্ষে কিছু বলিতেছি না। আমরা কেবল এইমাত্র বলিতে চাহি যে দোষ যত আমাদের, তত গবর্ণমেণ্টের নয়। আমরা দেখিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট আমাদের রক্ষা করিতেছেন, আর বর্গীর হাঙ্গামা নাই, লুট তরাজ নাই, একমুঠা যেমন জোটে খাইতে পাইতেছি। আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এখন বংশ বৃদ্ধি করা। যাহাতে বংশলোপ না হয় যাহাতে

আমাদের বংশের কীর্ত্তি-ধ্বজা চিরদিন উড়িতে পারে। এই একমাত্র আমাদের কাজ হইয়া উঠিয়াছে। যদি বংশবৃদ্ধির কোনরূপ প্রতিবন্ধক না থাকিত, যদি দুর্ভিক্ষ বা মারী ভয় না থাকিত যদি বালকদিগের মৃত্যু সম্ভাবনা অধিক না হইত, যদি আমরা—আর কাজ নাই—তাহা হইলে এই চল্লিশ বৎসরে আমাদের বংশপঙ্গপালে ভারতভূমি ছাইয়া যাইত। সুবিধার মধ্যে এই, যখনই দেখি কষ্ট হইয়াছে বিদেশীয় রাজত্ব বলিয়া পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া খুন হই।

যদি এই সময় হইতে আমরা সতর্ক না হই, তবে ভবিষ্যতের গর্ভে কি যে নিহিত আছে তাহা বলা যায় না। আমাদের অবস্থা এখনই অতি ভয়ানক। ৪ কোটী লোকের অন্ন নাই। কেহই পূরা পেট আহার করিতে পায় না। এই সময় ঠেকিয়া যদি আমরা না শিখি তবে আমাদের দুঃখে শৃগাল কুকুর ও রোদন করিবে।
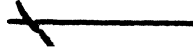
উপন্যাস

সূচনা

১

একদা সিংহশত গ্রামে একজন ধনবান্ রাজা বাস করিতেন। এক্ষণে সে গ্রাম নাই, সে রাজাও নাই, কেবল দুই একটি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাংশ পড়িয়া আছে। ধনবানের শেষ চিহ্ন এইরূপ—প্রস্তরখণ্ড, বা ইষ্টকস্তূপ। উপযুক্ত পরিণাম! বিক্রমাদিত্যের এক্ষণে সিংহদ্বারের এক ভগ্নাংশ মাত্র অছে। কিন্তু গরীব কালিদাসের শকুন্তলা অদ্যাপি নবপ্রস্ফুটিত কাননকুসুমের ন্যায় সগন্ধ; পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর ও দিগন্তব্যাপী। মূর্খের নিকট শকুন্তলা বৃথা। অন্ধের নিকট চন্দ্রও মিথ্যা। বিক্রমাদিত্য স্বর্ণ সিংহাসনে, আর কলিদাস নিম্নে, যোড় হস্ত। ভুল।

সিংহশত গ্রামের শেষ রাজা ইন্দ্রভূপ পরাক্রান্ত ছিলেন না, সামান্য লোকের ন্যায় সরল, শান্ত, ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। সেই ধর্ম্মপরায়ণতা তাঁহার অনর্থের মূল হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকাল অবধি বংশের এই নিয়ম ছিল যে, জ্যেষ্ঠ পুত্র বিষয় অধিকারী হইবেন, কনিষ্ঠেরা কেবল কিঞ্চিৎ মাসিক পাইবেন। এই নিয়ম সঙ্গত হউক, অসঙ্গত হউক, রাজবংশের মধ্যে দুইটি নূতন বৈষম্য ঘটাইয়াছিল; একটি প্রকৃতিগত; অপরটি আকৃতিগত। এক শাখা সদা সন্তুষ্ট, সরল, শান্ত ও উদার। অপর শাখা সদা ঈর্ষ্যাপরবশ ও কুটিল। এক শাখা রূপবান, অপর শাখা কুৎসিত। একবংশের মধ্যে পরস্পর এতাদৃশ প্রভেদ বিস্ময়জনক, কিন্তু ঘটিয়াছিল। যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবেন তাঁহার অসন্তোষের কোন কারণ ছিল না, সকলেই তাঁহার আশৈশব সন্তোষবিধান করিত। কিন্তু যিনি বিষয়বৈভব কিছুই পাইবেন না তিনি সদাই ভাবিতেন, "পিতার এত ঐশ্বর্য্য। কি অপরাধে তিনি তাহাতে বঞ্চিত? সামান্য প্রজার সন্তানেরা পিতৃবৈভবে

তুল্যাংশী, তিনি রাজপুত্র অথচ তাঁহার ভাগ্যে কিছুই নাই!" যাঁহার মনে সতত এই আলোচনা, সর্ব্বদা তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত, সর্ব্বদা তাঁহার তীর্য্যগ্দৃষ্টি, সর্ব্বদা তাঁহার দন্তলগ্ন, সর্ব্বদা তাঁহার মুখ বিকট। মুখের উপর মনের আধিপত্য অতি চমৎকার; মনোবৃত্তি মাত্রেই মুখে আসিয়া উদয় হয়। কোন মনোবৃত্তির স্থান ভ্রূযুগ, কোনটির বা ভ্রূযুগ ও নেত্র। কোন মনোবৃত্তির স্থান ওষ্ঠ, কোনটির বা ওষ্ঠপার্শ্ব ও নাসা। এইরূপ, রাগ, ঈর্ষ্যা, শোক, আহ্লাদ প্রভৃতি যে কোন মনোবৃত্তি হউক মুখের কোন অংশ না কোন অংশ অধিকার করিয়া থাকে। যে মনোবৃত্তি সর্ব্বদা উদয় হয়, তাহার অধিকারস্থল ক্রমে পুষ্টিলাভ করে। মুখের সেই অংশ ক্রমে এত স্পষ্ট হয় যে, প্রথমেই সেই অংশের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সে মনোবৃত্তি তৎকালে মনে উপস্থিত থাক বা না থাক, মুখে তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। এইজন্য দেখিবা মাত্র জানা যায় যে কাহার মুখে কোন বৃত্তির গতিবিধি অধিক। এই লোক স্বভাবতঃ উগ্র, এই লোক স্বভাবতঃ শান্ত, এই লোক স্বভাবতঃ দয়ালু যে অনুভব হয়, তাহার কারণ অপর কিছুই নাই।

কুপ্রবৃত্তি, কুৎসিত। মুখের যে অংশ কুপ্রবৃত্তির অধিকারস্থল, তাহা পুষ্ট হইলে, মুখ কুৎসিত হয়। এই জন্য সিংহশত রাজবংশের এক শাখা কুৎসিত ছিলেন। ঈর্ষ্যা, বৈরক্তি, অসন্তোষ প্রভৃতি বৃত্তি সর্ব্বদা তাঁহাদের মনে জাগিত।

সজ্জন ব্যক্তিরা সুশ্রী। সৎপ্রবৃত্তি মনে প্রবল থাকিলে মুখ সুশ্রী হয়। যাঁহারা অসজ্জনকে সুশ্রী দেখিয়াছেন, তাঁহাদের ভ্রম হইয়াছে। শ্রী মুখের অংশ নহে, অন্তরের।

অবস্থানুসারে প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে আকৃতি।

ইন্দ্রভূপ স্বয়ং সর্ব্বদা সন্তুষ্ট; সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন, কেবল জ্ঞাতিদের পারেন না। তিনি তাঁহাদের সর্ব্বস্ব লইয়াছেন, কেন তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন? জ্ঞাতিদের নিকট ইন্দ্রভূপ অধার্ম্মিক, অবিবেচক, অত্যাচারী, কেবল একজন জ্ঞাতি ইন্দ্রভূপের প্রশংসা করিতেন, সর্ব্বদা তাঁহার অনুগত থাকিতেন। তাঁহার নাম চূড়াধন বাবু। তিনি যৎপরোনাস্তি মিষ্টভাষী, নম্র, শান্ত এবং নির্ব্বিরোধী ছিলেন, তাঁহাকে ইন্দ্রভূপ বিশেষ ভালবাসিতেন। তিনি কাহাকেই বা ভাল না বাসিতেন?

চূড়াধন বাবু বড় সাবধানী ছিলেন। আপনি কখন রাজসম্মুখে কোন কথাই উত্থাপন করিতেন না। মহারাজ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সসম্মানে নতশিরে কেবল সেই কথারই উত্তর দিতেন, কখন নিজের মত জানাইতেন না। সাধারণের মত কি, অন্যের মত কি, দেওয়ান মহাশয়ের মত কি, কেবল তাহাই জানাইতেন। ইন্দ্রভূপ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন। ভাবিতেন চূড়াধন বড় বিজ্ঞ।

রাজা ইন্দ্রভূপ আহার করিবার সময় নিত্য বহুজনপরিবেষ্টিত হইয়া আহার করিতেন। অতি উপাদেয় সামগ্রী নানা দেশ হইতে সংগৃহীত হইত। কিন্তু পরিচারকগণ দেখিত, চূড়াধন বাবু সে সকল কিছুই স্পর্শ করিতেন না, বাছিয়া বাছিয়া কেবল অপকৃষ্ট সামগ্রী আহার করিতেন। আহারান্তে ইন্দ্রভূপ পাশক্রীড়া করিতে ভাল বাসিতেন। চূড়াধন বাবু ভিন্ন আর কাহার তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিবার অধিকার ছিল না। কিন্তু অমাত্যবর্গ সকলেই দেখিত যে, চূড়াধন বাবু নিত্য হারিতেন। ইন্দ্রভূপ হাসিয়া বলিতেন, "চূড়াধন অদ্যাপি খেলা শিখিতে পারিল না।"

একদিন ক্রীড়ার পরিচয় দেওয়ান মহাশয় শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইলেন। অনেক পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপনা আপনি বলিলেন—"চূড়াধন বাবু একদিন জিতিবেন।"

নিকটে একজন আত্মীয় বসিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে জিতিবেন?" দেওয়ানজি কোন উত্তর করিলেন না। ক্ষণেক পরে আপন পুত্রকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার অবর্ত্তমানে রাজাকে রক্ষা করিতে পারিবে?"

পুত্র। ভবিষ্যতে রাজার কি কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে?

দেও। সম্পূর্ণ।

পুত্র। কি বিপদ?

দেও। তাহা আমি এক্ষণে নিশ্চয় অনুভব করিতে পারি নাই। কিন্তু কে বিপদ ঘটাইবে, বুঝিতে পারিতেছি।

পু। কে?

দেও। চূড়াধন বাবু।

পুত্র। ইচ্ছা পূর্ব্বক?

দেও। ইচ্ছা পূর্ব্বক। রাজার অনিষ্ট ভিন্ন চূড়াধন বাবুর আর কোন ইচ্ছা এ জগতে নাই।

পুত্র। চূড়াধন বাবু বড় সজ্জন বলিয়া ত বোধ হয়, সকলেই তাঁহার প্রশংসা করে।

দেও। কিন্তু আমি তাহা করি না। যতদিন আমি জীবিত থাকিব, তত দিন চূড়াধন বাবু কোন বিশেষ উদ্যোগ না করিতে পারেন। কিন্তু আমি আর কত দিন? একে বৃদ্ধ, তাহাতে আবার নানা প্রকার পীড়াগ্রস্ত। তোমার নিমিত্ত কিছু সঞ্চয় করিতে পারি নাই, সঞ্চয়েরই বা প্রয়োজন কি? আমি যে রূপ কাটাইলাম

তুমিও সেইরূপ কাটাইবে। আমরা পুরুষানুক্রমে রাজদেওয়ান, আমার পর তুমি অবশ্য দেওয়ান হইবে, রাজা তোমাকে ভালবাসেন। চূড়াধন বাবু তোমার প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন না; তুমি অল্পবয়স্ক এই জন্য তুমি তাঁহার লক্ষ্য নহ। তাঁহার সম্মুখে বালকের মত ব্যবহার করিবে। আর এক কথা—রাজার যদি পুত্র না থাকে, বিষয় অধিকারী চূড়াধন বাবু হইবেন। রাজপুত্র বালক, এতএব রাজপুত্রকে বিশেষ সাবধানে রাখিবে। বোধ হয়, রাজপুত্রের উপর চূড়াধন বাবুর লক্ষ্য অধিক।

পুত্র। আমি দেখিয়াছি রাজপুত্রের প্রতি তাঁহার যত্ন অধিক। যখনই রাজপুত্রকে চূড়াধন বাবু দেখেন, কতই আদর করেন। প্রত্যহ দুই তিন বার করিয়া রাজপুত্রের তত্ত্ব করেন। রাজপুত্রও তাঁহাকে ভালবাসেন।

দেওয়ান আবার বিমর্ষ হইলেন। আর কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার পুত্র আপন বৈঠকখানায় গিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "পিতা অনর্থক চূড়াধন বাবুকে সন্দেহ করিয়াছেন। বৃদ্ধ হইলে অন্যের প্রতি সর্ব্বদাই সন্দেহ হয়, এই বয়সে যেমন প্রত্যেক পীড়ার প্রতি সন্দেহ হয় তেমনই আবার প্রত্যেক মনুষ্যের প্রতি সন্দেহ হয়। সন্দেহই এই বয়সের নিয়ম, সন্দেহের নাম বিজ্ঞতা।"

২

ক্রীড়ান্তে ইন্দ্রভূপ প্রত্যহ নিয়মিতরূপে কোন না কোন সংস্কৃত মূলগ্রন্থ শ্রবণ করিতেন, রাজসভায় কখন ভাগবদ্গীতা, কখন যোগবাশিষ্ঠ, কখন রামায়ণ, কখন মহাভারত পাঠ হইত। শ্রোতারা সকলেই সংস্কৃতজ্ঞ, ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন হইত না। এই সময় যে কথাবার্ত্তা আবশ্যক হইত, তাহা সমুদয় সংস্কৃত ভাষায় কহিতে হইত। ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে, ইচ্ছা হইলেও বড় কেহ কথা কহিতে পাইতেন না, কাজেই নির্ব্বিঘ্নে পাঠ হইত। কিন্তু রামায়ণ কি মহাভারত পাঠকালে এ নিয়ম বড় খাটিত না। রামের বিলাপ, বা অন্ধমুনির বিলাপ, সীতার বিলাপ বা দশরথের বিলাপ বা তদ্বৎ কোন অংশ পাঠ হইতে আরম্ভ হইলে, প্রথমে সকলেই নিস্পন্দ হইয়া শুনিতেন, ক্রমে সকলের হৃদয় যখন পূর্ণ হইয়া উঠিত, তখন হয়ত কোন শ্রোতা আর শোকসম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া কুণ্ঠিত ভাবে নিশ্বাস ফেলিতেন, অমনি নিকটেই সজোরে নস্য গ্রহণের দুই একটি শব্দ হইত, তাহার পরেই চারিদিকে উপর্য্যুপরি নস্যগ্রহণের তুমুল শব্দ হইয়া উঠিত। কেবল নাসার দীর্ঘ শব্দ। এই একরূপ ক্রন্দন। অধ্যাপকের ক্রন্দন শেষ হইলে ইন্দ্রভূপ স্বয়ং কম্পিতকণ্ঠে শোক প্রকাশ করিয়া

ফেলিতেন, তাহার পর কথা কহিবার আর বাধা থাকিত না, প্রথম দুই একটি সংস্কৃত, পরেই বাঙ্গালা চলিত। তখন সকলেই কথা কহিতেন, কেবল চূড়াধন বাবু নিস্তব্ধ থাকিতেন। রামায়ণ, মহাভারত তাঁহার ভাল লাগিত না; লোকের কেন ভাল লাগে, তাহাও তিনি অনুভব করিতে পারিতেন না। এক দিন তিনি দেওয়ান্ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কোন দিন রামায়ণ শুনিতে বসেন না কেন?" দেওয়ান্ উত্তর করিলেন, "রামায়ণ কর্ম্ম-নাশা, একদিন শুনিলে, দুইদিন কোন কর্ম্ম করিতে পারা যায় না।" চূড়াধন একটু হাসিলেন, তাঁহার বিকট দন্ত দেখা গেল। তাহা দেখিয়া দেওয়ান্ মহাশয়ের একজন পরিচারক ভাবিল, "দাঁত ছাড়ান যদি হাসি হয়, তাহা হইলে শৃগালেরও হাসি আছে।"

বাস্তব সকল হাসি, হাসি নহে। সকলে হাসিতে পারে না, অনেকে আবার হাসিবার অধিকারীও নহে। অথচ সকলেই হাসিতে যান, হাসিতে কাহার না সাধ? হাসি দেখিলে হাসি পায়, কিন্তু যে ব্যক্তি হাসিতে অনধিকারী, তাহার হাসি দেখিলে কেহ হাসে না, ভয় পায়! সুখীরা হাসিতে জানে, সরল ও উদার ব্যক্তিরা বিলক্ষণ হাসিতে পারে, প্রণয়ীরা চমৎকার হাসে, শোকাকুল ব্যক্তিরা ম্লান হাসি হাসে, অন্ধকার ঝড় বৃষ্টিতেও কখন কখন দীপ-আলোক পড়ে, কিন্তু কুটিল ব্যক্তিরা হাসিতে পারে না; তাহাতেই পরিচারক চূড়াধন বাবুর হাসিকে "দাঁত ছাড়ান" বিবেচনা করিয়াছিল।

চূড়াধন বাবু প্রায় রাজবাটীতেই সময় অতিবাহিত করিতেন। কোন কার্য্যের বিশেষ ভার ছিল না, তথাপি তিনি প্রত্যুষে আসিয়া রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, ইন্দ্রভূপ বহির্গত হইলে সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পোদ্যানে বেড়াইতেন, নিতান্ত নিকটে যাইতেন না, অথচ এমত দূরে থাকিতেন যে, অন্যের কথা যদিও একান্ত না শুনিতে পান, তথাপি রাজার উত্তর শুনিতে পাইবেন। যিনিই যত মৃদুস্বরে কথা বলুন, রাজা তাহার উচ্চৈঃস্বরে উত্তর দিতেন। ইন্দ্রভূপ কখন মৃদুস্বরে কথা কহিতে পারিতেন না। যিনি মৃদুস্বরে কথা কহিতে পারেন না, তিনি আবার প্রায় কোন কথা গোপন করিতেও পারেন না; কথা আপনারই হউক, পরের হউক, সকলের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে আলোচনা করা তাঁহার অভ্যাস হয়।

পুষ্পোদ্যান হইতে ইন্দ্রভূপ যখন বিষয় কার্য্য করিতে যাইতেন, চূড়াধন বাবু সেই অবকাশে রাজভৃত্য ও পরিচারকদিগের সহিত মিষ্টালাপ করিতেন; কখন বা অধ্যাপকদের সহিত শাস্ত্রীয় কথা লইয়া তর্ক করিতেন। নানাশাস্ত্রে

তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। পণ্ডিতেরা তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতেন, অপর সকলে তাঁহার সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশংসা করিতেন, কেবল এক দেওয়ান্ মহাশয় নিস্তব্ধ থাকিতেন।

রাজা সর্ব্বদাই চূড়াধনকে মিষ্ট সম্ভাষণ করিতেন, সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট রাখিতে যত্ন করিতেন। ইন্দ্রভূপ ভাবিতেন যে, চূড়াধন বাবুর পিতা রাজ্যাধিকারী হইলে চূড়াধন কতই সুখভোগ করিত; অতএব যাহাতে সে অভাব চূড়াধন অনুভব করিতে না পান, রাজা সতত সেই চেষ্টায় থাকিতেন, কিন্তু অর্থানুকূল্যের দ্বারা সে অভাব পূরণ করিতে পারিতেন না। দেওয়ান্ তাহাতে কোন গতিকে না কোন গতিকে ব্যাঘাত ঘটাইতেন। দেওয়ানের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, চূড়াধন বাবুর অর্থাভাব রাজার পক্ষে মঙ্গল।

দেওয়ানের বৈবিধ চূড়াধন বাবু জানিতেন, কিন্তু কখন সে জন্য দেওয়ানের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতেন না, বরং তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। সকলেই দেখিত, স্বয়ং ইন্দ্রভূপ দেখিতেন যে, চূড়াধন বাবু দেওয়ানের বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। এক দিন অকস্মাৎ দেওয়ানের গৃহদাহ হয়, চূড়াধন বাবু তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাগ্রে যাইয়া দেওয়ানকে উদ্ধার করেন; সকলেই চূড়াধন বাবুকে ধন্যবাদ দিয়াছিল, কিন্তু দেওয়ান দেন নাই; সেই জন্য সকলেই দেওয়ানের নিন্দা করিত, দেওয়ান্ তাহা শুনিয়া কোন উত্তর করিতেন না। কেবল একবার পুত্রকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "গৃহদাহ বিস্মরণ হইও না।"

পুত্র। কেন?

দেও। তাহা হইলে যে দাহ করিয়াছে তাহাকে ভুলিবে।

পুত্র। কে দাহ করিয়াছে?

দেও। চূড়াধন বাবু।

পুত্র। তিনি আপনাকে উদ্ধার করিয়াছেন।

দেও। উদ্ধার করিবেন বলিয়াই বিপদ ঘটাইয়াছিলেন।

পুত্র আর কোন উত্তর না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেওয়ান্ রাজবাটীতে গেলেন, তথায় যাইয়া দেখেন চূড়াধন বাবু কয়েকজন বৃদ্ধ অধ্যাপকপরিবেষ্টিত হইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। চূড়াধন বাবু স্বভাবতঃ অল্প কথা কহেন, তাহাও মৃদু-স্বরে; এক্ষণে তাহার অন্যথা দেখিয়া দেওয়ান্ মহাশয় সেই দিকে গেলেন। অন্য কর্ম্মচ্ছলে কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া শুনিতে লাগিলেন। দেওয়ানের সমাগমে চূড়াধন বাবুর স্বর ঈষৎ উচ্চ হইল, দেওয়ান্ তাহা বুঝিলেন। চূড়াধন বাবু

বলিতে লাগিলেন—"পুত্রের কুচরিত্র কেবল পিতার দোষে ঘটে, নির্ব্বোধ পিতারা সকল কথাই পুত্রকে বলে, পুত্রকে সাবধান করিতে গিয়া আপনারা অসাবধান হয়। বিজ্ঞতা শিখাইবে মনে করিয়া কুটিলতা শিখায়। উপকার করিলে যাহারা উপকৃত বোধ করে না তাহারা আপনারা অপকার করিতে না পারিয়া সন্তানের উপর ভার দিয়া যায়।"

দেওয়ান্ আর শুনিলেন না; কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে একবার একজন পদাতিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার শিবিকার সহিত কে আসিয়াছিল?"

পদা। আমি আসিয়াছিলাম।

দেও। আমার পাল্কির পূর্ব্বে আর কেহ রাজবাটির দিকে দৌড়িয়া আসিয়াছিল?

পদা। কই দেখি নাই।

দেও। আশ্চর্য্য।

দেওয়ান্ মহাশয় মুখে "আশ্চর্য্য" শব্দটি মাত্র উচ্চারণ করিলেন, কিন্তু অন্তরে অনেক কথা বলিলেন, অনেক বাদানুবাদ করিলেন। ক্রমে তাঁহার সন্দেহ ঘনীভূত হইতে লাগিল, তিনি আর দেওয়ান্খানায় বসিতে পারিলেন না, সত্বর গৃহে গেলেন। প্রথমেই পুত্রকে ডাকিয়া এক দৃষ্টে তাহার প্রতি অন্যমনস্কে চাহিয়া রহিলেন। পুত্র নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিল। অনেক পরে পুত্রকে বিদায় দিয়া আলবোলা নিকটে টানিয়া অস্ফুটস্বরে আপনা আপনি বলিলেন, "যার পুত্র পর, তার বিদায় লইবার আর বিলম্ব কেন?" তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হইয়া চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্ব্বমত মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন "গৃহে গোপন কথা যে কহিতে না পায় তার আর গৃহ কেন, সংসার কেন?"

এই দিন চূড়াধন বাবু অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রাজবাটিতে ছিলেন। অন্যদিন প্রায়ই সন্ধ্যার পর বাটি যাইতেন। যাইবার সময় কিঞ্চিৎ দ্রুত পদবিক্ষেপে যাইতেন; লোকে বলিত, "ঐ চূড়াধন বাবু প্রদীপ নিবাইতে যাইতেছেন। বাস্তবিক সে কথা কতকাংশে সত্য। গৃহে তাঁহার প্রতীক্ষায় অনর্থক প্রদীপ না জ্বলে, অনর্থক তৈল নষ্ট না হয় ইহা তাঁহার সাংসারিক বন্দবস্তের কথা বটে। তাঁহার যে নিতান্ত দৈন্যদশা ছিল এমত নহে। গৃহে দাস দাসী ছিল, দ্বারপালও ছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া অনর্থক তৈল নষ্ট কেন হইবে? এই জন্য গৃহে প্রদীপ বড় জ্বলিত না।

তাঁহার গৃহ দেখিলে কোন ধনবান্ বা রাজগোষ্ঠী কাহার বাসস্থান বলিয়া বোধ হইত না। গৃহটি ইষ্টকনির্ম্মিত বটে কিন্তু বড় ক্ষুদ্র ও ভগ্নোন্মুখ, অথচ জাঁকজমক আছে। চারি দিকে কার্ণিসের নিম্নে বিবিধ প্রকার পক্ষী চতুষ্পদ সেপাই শান্ত্রি চুণকামে অঙ্কিত রহিয়াছে—দেখিলে ঢাকাই শাটী মনে আইসে। গৃহাভ্যন্তরে বায়ুপ্রবেশের পথ বড় ছিল না; তৎকালে গবাক্ষের আকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ ঝরকা প্রচলিত হইয়াছিল, চূড়াধন বাবুর বাটিতে তাহার দুই তিনটি মাত্র ছিল। বাটিব মধ্যে বা পার্শ্বে কোথাও পুষ্পোদ্যান ছিল না; তৎকালে গৃহস্থের পক্ষে ইহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া নিন্দা হইত। একবার একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থে আসিয়া, "ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া দ্বারে দাঁড়াইল, পরে ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া দেখিল যে, গৃহে কোন পুষ্পবৃক্ষ নাই, অতএব তৎক্ষণাৎ ফিরিল। গৃহিণী স্বয়ং ভিক্ষা লইয়া আসিলেন, ভিক্ষুক তাহা গ্রহণ করিল না, বলিল, 'মাতঃ, তোমাব ভিক্ষা আমি লইব না। পুষ্পোদ্যান নাই দেখিয়া বুঝিয়াছি যে তোমাব গৃহে নারায়ণ নাই।"

ভিক্ষুক যদি আর কিঞ্চিৎ দাঁড়াইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিত, তাহা হইলে বলিত, "তোমার গৃহে কোন পালিত পক্ষী নাই, বোধ হয় তোমার কোন সন্তান সন্ততি নাই, আমি ভিক্ষা লইব না; নিঃসন্তানেব ভিক্ষা অশুচি।" চূড়াধন বাবু বাস্তবিক নিঃসন্তান; গৃহে আপনি আব গৃহিণী বাস করেন। পুত্রবতী হইলে স্ত্রীজাতির যে কোমলতা জন্মে, সর্ব্বলোকে যে স্নেহ যে দয়া জন্মে, তাহা তাঁহার গৃহিণীর একবাবে জন্মে নাই। চূড়াধন বাবু জানিতেন যে তাঁহার স্ত্রী অতিশয় দয়াময়ী, স্নেহময়ী, দাতা, এবং একেবারে স্বার্থপরতাশূন্যা। চূড়াধন বাবু এসকল বিশেষ দোষ জ্ঞান করিতেন, এবং এইজন্য মধ্যে মধ্যে গৃহিণীকে তিরস্কার করিতেন, তথাপি গৃহিণী রাত্রিকালে স্বামীর ভোজন-পাত্রের নিকট বসিয়া নিজের স্নেহ, দয়ার নানা পরিচয় দিতেন। কিন্তু তাহার একটি কথাও প্রকৃত নহে, চূড়াধন বাবু সকল গুলিই প্রকৃত মনে করিতেন। চূড়াধন বাবু অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন, সকলের অন্তরস্থ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেন, কিন্তু আপনার স্ত্রীর নিকট অন্ধ হইতেন, কিছুই বুঝিতে পারতেন না। গৃহিণী বিশেষ বুদ্ধিমতী ছিলেন না, প্রতিবাসীদিগের অভিসন্ধি কিছুই অনুভব করিতে পারিতেন না; কিন্তু চূড়াধন বাবুর অন্তস্থল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেন, বুঝিতে পারিতেন।

যে রাত্রে চূড়াধন বাবু দ্রুতপাদবিক্ষেপে বাটী আসিতেছিলেন, সেই রাত্রে তাঁহার বাটীতে দুইজন লোক বসিয়া তাঁহার নিমিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল। চূড়াধন

বাবু তাঁহাদের দেখিয়া মহা আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন, অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিলেন। তাহার পর একত্রে বসিয়া অতি নিম্নস্বরে পরস্পর অনেক কথাবার্ত্তা হইল। শেষ উঠিবার সময় চূড়াধন বলিলেন, "এইবার বুঝিব তোমরা কেমন জাল ফেলিতে পার।" তাহাদের মধ্যে একজন উত্তর করিল, "জেলে ত আপনি, আমরা মাত্র জেলের হাঁড়ি, আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব, দেখিব, আপনার জালে কেমন করে রাজমৎস্য ধরা পড়ে।"

ষষ্ঠ বর্ষ : অষ্টম সংখ্যা
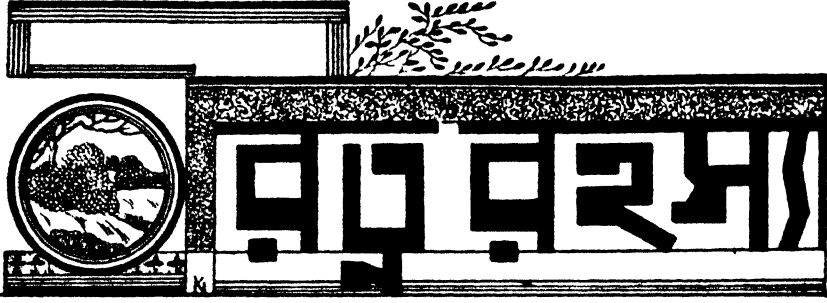
এদেশে যখন একমাত্র দেবভাষা সংস্কৃতের প্রাবল্য ছিল তখন হইতে "রত্ন" শব্দটি চলিয়া আসিতেছে।

সংস্কৃত শাস্ত্র আলোচনার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, পূর্ব্বাচার্য্যেরা দুই প্রকার অর্থে "রত্ন" শব্দের সঙ্কেত বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন। এক সামান্যতঃ উৎকৃষ্ট বস্তুর উপর, দ্বিতীয় উৎকৃষ্ট প্রস্তরের উপরই রত্নের প্রয়োগ দেখা যায়।

"জাতৌ জাতৌ যদুৎকৃষ্টং তদ্ধি রত্নং প্রচক্ষতে।"

প্রত্যেক জাতীয় বস্তুর মধ্যে যেটী উৎকৃষ্ট সেইটিই রত্ন। যথা স্ত্রীরত্ন, পুরুষরত্ন, অশ্বরত্ন, ধনরত্ন ইত্যাদি; "রত্নন্তু মণিভেদে স্যাৎ" মণিবিশেষের সহিত রত্নশব্দের সঙ্কেত বাঁধা আছে। রত্নশব্দের এই দ্বিতীয় অর্থের বিবরণ ব্যক্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য, এই জন্যই আমরা উপরে "রত্নরহস্য" মুকুট স্থাপন করিলাম। এক সময়ে ভারতবর্ষবাসীদিগের মনে যে কি পর্য্যন্ত প্রস্তরপরীক্ষা বিষয়ক অনুসন্ধিৎসা প্রবল হইয়াছিল এই প্রস্তাব পাঠ করিলে তাহা পাঠকবর্গ অবগত হইতে পারিবেন।

রত্নপদবাচ্য যত প্রকার মণি আছে তন্মধ্যে নয়টি প্রধান। এইজন্য আমরা "নবরত্ন" নামটি সর্ব্বদা শুনিতে পাই।

তদ্‌যথা।

"মুক্তা মাণিক্য বৈদূর্য্য গোমেদো বজ্রবিদ্রুমৌ
পদ্মরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি যথাক্রমম্।" (তন্ত্রসারঃ)

পাঠকগণ, বৈদূর্য্য কি? গোমেদ কি? বলিয়া ব্যস্ত হইবেন না, ক্রমে সমস্তই বলিব—অগ্রে মুক্তার বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মুক্তা বহুমূল্য রত্ন। ভারতবাসীগণের ন্যায় ইউরোপীয়গণও প্রাচীনকাল হইতে ইহার বিশেষ আদর করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বকালে রোমকগণ ইহা

বহুব্যয়ে ক্রয় করিতেন। একজন রোমক গ্রন্থকার তাঁহার সময় একছড়া মুক্তাহার অষ্ট লক্ষ টাকায় বিক্রয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ রূপবতী ক্লিওপেট্রা একটি ৮০৭২৯০ টাকা মূল্যের মুক্তা চূর্ণ করিয়া মদ্যের সহিত পান করিয়াছিলেন, এবং এতাদৃশ বহুমূল্য একটি মুক্তা দ্বিখণ্ড করিয়া রোমের প্রসিদ্ধ ভিনসের মূর্ত্তির কর্ণাভরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আধুনিক সময়েও রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজ্যকালেও তৎসমক্ষে স্যর টমাস গ্রেসাম একটী ১৫০০০০ টাকা মূল্যের মুক্তা চূর্ণ করিয়া মদ্যের সহিত পানকরত স্পেনদেশীয় রাজদূতকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। মুক্তা এইরূপ সকল সময় ও সকল রাজ্যেই আদৃত হইয়া আসিতেছে।

ভারতের জ্যোতিষশাস্ত্রে ইহার সমধিক গৌরব দৃষ্ট হয়। মুক্তা ধারণে মহা ফল, গৃহে থাকিলে মহা ফল, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, এইরূপে গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। বৈদ্যকশাস্ত্রকারেরাও ইহার গৌরব করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইহার গুণ, ঔষধে উপযোগ, উপকারিতা রাজনির্ঘণ্ট ও ভাব প্রকাশ প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে আছে।

মুক্তার ছায়া বা কান্তি, বিশেষ বিশেষ আকর বা উৎপত্তি স্থান, ও বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা প্রভৃতি গরুড় পুরাণে আছে। ইহা ভোজরাজকৃত "যুক্তিকল্পতরু" গ্রন্থে কিছু অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ৺স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সমূহ কল্পদ্রুমে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পাঠকবর্গের গোচরার্থ পুস্তকগুলির অগ্রে পরিচয় দিলাম। মুক্তার আকর বা উৎপত্তি স্থান যথা—

> মাতঙ্গোরগমীন পোত্রি শিরসন্তৃক্সার শঙ্খাম্বুভৃৎ।
> শুক্তীনামুদরাচ্চ মৌক্তিক মণিঃ স্পষ্টং ভবত্যষ্টধা॥ (যুক্তিকল্পতরু)

(১) মাতঙ্গ—হস্তী। (২) উরগ—সর্প। (৩) মীন—মৎস্য। (৪) পৌত্রী—শূকর। (৫) ত্বক্সার—বাঁশ। (৬) শঙ্খ—শাঁখ। (৭) অম্বুভৃৎ—মেঘ। (৮) শুক্তি—ঝিণুক।

ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—

> "শঙ্খো গজশ্চ ক্রোড়শ্চ ফণী মৎস্যশ্চ দর্দ্দুরঃ।
> বেণুরেতে সমাখ্যাতা তজ্‌জ্ঞৈ মৌক্তিক যোনয়ঃ।" (ভাবপ্রকাশ)

(১) শঙ্খ—শাঁখ। (২) গজ—হস্তী। (৩) ক্রোড়—ঝিণুক। (৪) ফণী—সর্প। (৫) মৎস্য—মাছ। (৬) দর্দ্দুর—ভেক। (৭) বেণু—বাঁশ।

মল্লিনাথ অন্য একটি বচনের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"দ্বিপেন্দ্র জীমূত বরাহ শঙ্খ মৎস্যাহি শুক্ত্যুদ্ভববেণুজানি।
মুক্তাফলানি প্রথিতানি লোকে তেষান্তু শুক্ত্যুদ্ভবনেব ভূরিব ॥

(১) দ্বিপেন্দ্র—জাত্যহস্তী। (২) জীমূত—মেঘ। (৩) বরাহ—শূকর। (৪) শঙ্খ—শাঁখ। (৫) মৎস—মাছ। (৬) অহি—সর্প। (৭) শুক্তি—ঝিণুক। (৮) বেণু—বাঁশ। এই সকল স্থান হইতে মুক্তা জন্মে এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে। পরন্তু শুক্ত্যুদ্ভব মুক্তা বহু উৎপন্ন হয়।

রাজা রাধাকান্তদেব অন্য আর একটী বচন উল্লেখ করিয়াছেন। যথা

"গজাহিকোলমৎস্যানাং শীর্ষে মুক্তাফলোদ্ভবঃ।
ত্বক্ সার শুক্তি শঙ্খানাং গর্ভে মুক্তা ফলোদ্ভবঃ।"

হস্তী, সর্প, শূকর, ও মৎস্যের মস্তকে মুক্তামণি জন্মে এবং বাঁশ, ঝিণুক ও শাঁখের উদরে জন্মে। এই সকল বচনের মধ্যে মল্লিনাথের ধৃত বচনটীতেই আমাদের শ্রদ্ধা হয়। কেন না ঐ বচনের একাংশে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, "শুক্তিজাত মুক্তাই আমরা অধিক পাই, অন্যান্য আকরের মুক্তা সকল লোকপ্রবাদে প্রসিদ্ধ।" এই কথাই সত্য।

মাতঙ্গ মুক্তা—গজমুক্তা

"মৌক্তিকং ন গজে গজে" (চাণক্য)—

সকল গজে মুক্তামণি পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সকল হস্তীর মস্তকাভ্যন্তরে পাথরী জন্মে না। কিরূপ হস্তীর মস্তকে জন্মে তাহা বলিতেছি—

মতঙ্গজা যেতু বিশুদ্ধবংশা স্তে মৌক্তিকানাং প্রভবাঃ প্রদিষ্টাঃ।
উৎপদ্যতে মৌক্তিক যেষু বৃত্তং আপীত বর্ণাং প্রভয়া বিহীনম্।"
(যুক্তিকল্পতরু)

যে সকল মাতঙ্গ বিশুদ্ধ বংশোৎপন্ন তাহাদেরই মস্তকে মুক্তা প্রস্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল জাত্যহস্তীর মধ্যে কোন কোন হস্তীতে যে মুক্তা জন্মে তাহা সুগোল, ঈষৎ পীতবর্ণ, এবং ছায়াবিহীন। মুক্তার ছায়া কি? তাহা পরে বলা যাইবে।

"বক্ষ্যে গজ পরীক্ষায়াং গজজাতিশ্চতুর্বিধা।
মৌক্তিকং তেষু জাতং হি চতুর্বিধ মুদীর্য্যতে ॥"

(যুক্তিকল্পতরু)

হস্তীজাতির মধ্যে বিবিধ শ্রেণীর হস্তী আছে তন্মধ্যে জাত্যহস্তী চারি প্রকার শ্রেণীভুক্ত। সে সকল বৃত্তান্ত গজপরীক্ষা প্রকরণে বলিব। ৪ শ্রেণীর জাত্য গজেই মুক্তা জন্মিয়া থাকে, সুতরাং তদুৎপন্ন মুক্তা ৪ জাতি বা ৪ শ্রেণী। সেই ৪ শ্রেণীর মুক্তার ৪ প্রকার আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

"ব্রাহ্মণং পীতশুক্লস্তু ক্ষত্রিয়ং পীতরক্তকম।
পীত শ্যামস্তু বৈশ্যং স্যাৎ শূদ্রং স্যাৎ পীতনীলকম্।" (ঐ)

ব্রাহ্মণ জাতীয় মুক্তা পীত শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয় মুক্তার বর্ণ পীতরক্ত, বৈশ্যজাতীয় মুক্তার বর্ণ পীতশ্যাম এবং শূদ্রজাতীয় গজমুক্তার বর্ণ পীতনীল। কাম্বোজদেশীয় মাতঙ্গ মুক্তাব কিছু বিশেষ আছে। যথা—

"কাম্বোজকুম্ভসম্ভূতং ধাত্রীফলনিভং গুরু।
অতিপিঞ্জরসচ্ছায়ং মৌক্তিকং মন্দদীধতি ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

কাম্বোজদেশীয হস্তিকুম্ভে যে মুক্তা জন্মে তাহার আকার ঠিক গোল নহে। তাহার গঠন আমলকী ফলসদৃশ, ওজনে ভারী, পিঞ্জরবর্ণ, ছায়া বা কান্তিহীন নহে অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পরিমাণে ছায়া আছে এবং অল্প কিরণও আছে।

সর্পমণি বা ফণিমুক্তা

সকল সর্পের মস্তকে মণি উৎপন্ন হয় না।

"ভুজঙ্গমা স্তে বিষবেগতৃপ্তাঃ শ্রীবাসুকেবংশভবাঃ পৃথিব্যাম।
কচিৎ কদাচিৎ খলু পুণ্যদেশে তিষ্ঠন্তি তে পশ্যতি তান্ মনুষ্যঃ ॥"

যে সকল সর্পের মস্তকে প্রস্তর হয় তাহারা আপনার বিষবেগে পরিতৃপ্ত থাকে। ইহারা বাসুকি নাগের বংশে উৎপন্ন। পৃথিবীর কোন কোন পুণ্য স্থানে কখন কখন এইরূপ সর্প মনুষ্যেরা দেখিতে পায়।

লক্ষণ

"ফণিজং বর্ত্তুলং রম্যং নীলচ্ছায়ং মহাদ্যুতিঃ।
পুণ্যহীনা ন পশ্যন্তি বাসুকেঃ কুলসম্ভবম্ ॥"

ফণিজাত মুক্তা দেখিতে অতি সুন্দর বর্ত্তুল অর্থাৎ গোল। নীলাভ এবং অত্যন্ত দীপ্তিমান্! অপুণ্যবান্ ব্যক্তিরা বাসুকিবংশীয় সর্প দেখিতে পায় না। সুতরাং ফণীজাতমুক্তা তাহাদের নিকট দুর্ল্লভ।

দ্বিতীয় লক্ষণ। যথা—

"শৃগালকোলামল কেলগুঞ্জাফল প্রমাণস্ত চতুর্বিধাস্তে।
স্যু ব্রহ্ম বাহুভব বৈশ্য শূদ্র সর্পেষু জাতাঃ প্রবরাস্ত সর্ব্বে॥"

শৃগালকোল=শ্যাকুল। প্রমাণে শ্যাকুল যত বড়, তত বড় হয়। আমলকী প্রমাণও হয়। গুঞ্জা অর্থাৎ কুঁচ পরিমিতও হয়। কুল ফলের মতনও হয়। এই চারি প্রকার মুক্তা চারি জাতি সর্পে জন্মে। ইহা সকলই প্রশস্ত।

ফলশ্রুতি

"প্রাপ্যাপি রত্নানি ধনং শ্রিয়ং বা। রাজশ্রিয়ং বা মহতীং দুরাপান্॥
তেজোঽন্বিতাঃ পুণ্যকৃতো ভবন্তি মুক্তা ফলস্তাস্ত বিধারণেন॥"
(কল্পদ্রুমধৃত)

ধন, রত্ন, মহতী রাজশ্রী প্রাপ্ত হইয়া এই ফণিমুক্তা ফল ধারণ করিলে ধারণকর্ত্তার পুণ্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় এবং তেজোবৃদ্ধি হয়।

তৃতীয় লক্ষণ

"ভৌজঙ্গমং নীল বিশুদ্ধ বর্ণং।
সর্ব্বং ভবেৎ প্রোজ্জ্বলবর্ণ শোভম্॥" (কল্পদ্রুমধৃত)

অথ মীনজ মুক্তা

মৎস্য বিশেষের মুখ প্রদেশে এক প্রকার পাথর জন্মে তাহাকেই শাস্ত্রকারেরা মীনমুক্তা বলিয়া থাকেন। ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত ক্রমে বর্ণন করা যাইতেছে।

পাঠিন পৃষ্ঠস্য সমানবর্ণম্। মীনাৎ সুবৃত্তং লঘুনাতিসূক্ষ্মম॥
উৎপদ্যতে বারিচরাননেষু মীনাশ্চতে মধ্যচরাঃ পয়োধেঃ॥

পাঠীন মৎস্য—রোহিত মৎস্য বাটা মৎস্য। মীন হইতে যে মুক্তা পাওয়া যায় তাহা পাঠীন মৎস্যের পৃষ্ঠের বর্ণের সদৃশ সুগোল, লঘু অর্থাৎ ওজনে হাল্কা, ও নিতান্ত সূক্ষ্ম নহে। মীনমুক্তা সকল বারিচর অর্থাৎ মৎস্যদিগের মুখে জন্মিয়া থাকে এবং এই সকল মৎস্য সমুদ্রের মধ্যপ্রদেশে বাস করে।

লক্ষণ

গুঞ্জাফল সমস্থৌল্যং। মৌক্তিকং তিমিজং লঘু॥
পাটলা পুষ্প সঙ্কাশং। অল্পকান্তি সুবর্ত্তুলম্॥ (কল্পদ্রুমধৃত)

মীনামুক্তার লক্ষণ এইরূপ। তিমিমৎস্যজাত মুক্তাসকল স্থূলতায় গুঞ্জা অর্থাৎ কুঁচের ন্যায়। লঘু অর্থাৎ হাল্‌কা। পাটলা পুষ্পের ন্যায় কান্তি কিন্তু তাহার দ্যুতি ছায়া অল্প। ইহার বর্ত্তুলতা অতি সুন্দর।

মীন মুক্তার সামান্য লক্ষণ এই বটে কিন্তু মৎস্যদিগের প্রকৃতিভেদ থাকায় তজ্জাৎপন্ন মুক্তার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদ হইয়া থাকে।

বাতপিত্ত কফদ্বন্দ্ব সন্নিপাত প্রভেদতঃ।
সপ্ত প্রকৃতয়ো মীনা সপ্তধা তেন মৌক্তিকম্॥ [গরুড় পুরাণ]

বায়ু, পিত্ত, কফ, এতত্রয়ের দুই দুই ও তিন তিন ক্রমে মৎস্য সকল ৭ প্রকার প্রকৃতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং তদুৎপন্ন মুক্তা ফলও ৭ প্রকারের প্রভেদ যুক্ত হয়, তাহা নির্ণীত হইয়াছে।

"লঘিষ্ঠ মরুণং বাতাৎ আপ্তাতং মৃদুপিত্ততঃ।
গুরুং শুক্র কফো শ্লেকাৎ বাতপিত্তান্ন দুর্লঘু॥
বাতশ্লেষ্ম ভবং স্থূলং পিত্তশ্লেষ্মভমর্দ্ধকম্।
সর্ব্বলিঙ্গ প্রয়েগেন সান্নিপাতিক মুচ্যতে॥
একজাঃ শুভদাঃ প্রোক্তা স্তথা বৈ সান্নিপাতিকাঃ।"

বাতাধিক্য বশতঃ লঘু ও অরুণাভ। পিত্তপ্রাধান্য মৃদু ও ঈষৎপীতাভ। কফের বাহুল্যে গুরু ও শ্বেতাভ। বাতপিত্ত উভয়ের প্রাবল্যে মৃদু অর্থাৎ কোমল ভাবাক্রান্ত এবং লঘু। বাতশ্লেষ্ম উভয়ের প্রাবল্যে স্থূলত গুণযুক্ত। পিত্তশ্লেষ্ম জাত হইলে স্বচ্ছতার আধিক্য। এক একটি ও দুই দুইটী প্রকৃতিতে যে সকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইল যদি সকল চিহ্ন কিছু কিছু প্রকাশ পায় তাহা হইলে তাহা সান্নিপাতিকজ বলা যায়। এই সকলের মধ্যে সান্নিপাতিকজ এবং একজ মুক্তাই প্রশস্ত ও শুভদায়ক।

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য]

শ্রীরামদাস সেন।

প্রাচীন উৎকলবাসীদিগের যাহা সংক্ষেপে পরিচয় প্রদান করা হইল, তদ্দ্বারা প্রাচীন কালের উড়িয়াদিগের ক্ষমতা, অধ্যবসায় ধর্ম্মোৎসাহ ধীসম্পন্নতা প্রভৃতির সমীপে, অনেক সভ্যজাতিরও গর্ব্বিত মস্তক অবনত হইয়া পড়ে, এবং "উড়িয়া" নাম শ্রবণ মাত্রেই যাঁহারা মুখবিকৃত করত ঘৃণাপ্রকাশ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা দোষ বিদূরিত হইয়া প্রাচীন উড়িয়াদিগের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব উদিত হইবার সম্ভাবনা।

গজপতিবংশীয় রাজাদিগের কাল হইতে উড়িয়া ভাষা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং এই সময়ে উড়িয়া ভাষাতে কাব্যাদি গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা। যাহা হউক, রাজা উপেন্দ্র ভঞ্জ আপনার রাজ্যভার মন্ত্রীর হস্তে প্রদান করত উড়িয়া ভাষায় প্রায় ৫২ খানি কাব্য লিখিয়াছিলেন, এবং দীনকৃষ্ণ-দাস নামক একজন উড়িয়া প্রাচীনকবি অনেকগুলি ভক্তি রসোদ্দীপক কাব্যগ্রন্থও রচনা করেন, তদ্ভিন্ন উড়িয়া ভাষাতে মহাভারত, রামায়ণ, জ্যোতিষ, অঙ্ক প্রভৃতি অনুবাদিত হইয়াছিল। কবিতা লিখন সম্বন্ধে শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ জয়দেব প্রভৃতি সংস্কৃতকাব্য লেখকদিগকে যদ্যপি পরিত্যাগ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে কাব্যলিখন সম্বন্ধে উড়িয়াগণ বঙ্গবাসী কবিদিগের অপেক্ষা উচ্চাসন প্রাপ্ত হইবার অধিকারী। যাহা হউক এক্ষণে উৎকলবাসিগণের বর্ত্তমান সামাজিক আচার ব্যবহার সংক্ষেপে প্রকাশ করতঃ প্রস্তাব উপসংহার করা যাইতেছে।

বর্ত্তমানকালে উড়িষ্যাপ্রদেশে ব্রাহ্মণ, মাইতি, খণ্ডাইত, এই তিনটি শ্রেষ্ঠজাতি মধ্যে পরিগণিত। উড়িষ্যার ব্রাহ্মণগণের এক্ষণে নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা; অধিকাংশ মূর্খ, এবং ভিক্ষাবৃত্তি অথবা কৃষিকার্য্যোপজীবী। ব্রাহ্মণপরিবারে শুঁটকী মৎস্য, পিঁয়াজ, রসুণ আহার নিন্দনীয় নহে, প্রত্যুত: তাঁহারা ঐ সকল দ্রব্য প্রকাশ্যরূপেই আহার করিয়া থাকেন। সন্ধ্যাহ্নিক তথৈবচ, ফোঁটাছিটার উপরেই নির্ভর, এবং জগন্নাথের নির্ম্মাল্য সেবনই শ্রেষ্ঠ কার্য্য। স্ত্রীপুরুষে চুরাটের ধূমপান করিয়া থাকেন। উড়িয়া ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া

থাকেন, তাঁহাদিগের উচ্চারণ বঙ্গদেশীয়দিগের অপেক্ষা বিশুদ্ধ। স্বহস্তে হলকর্ষণ, অথবা মস্তকে দ্রব্যাদি লইয়া ফিরিওয়ালার মত বিক্রয় করা উড়িয়া ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। পুত্র কন্যার বিবাহ অল্প বয়সে, অথবা বেশী বয়সে উভয়বিধ রূপেই প্রচলিত প্রত্যক্ষ হয়। স্ত্রীলোকদিগের গাত্রে উল্কীর ছয়লাপী এবং কাছা দিয়া বস্ত্র পরিধান, ললাটদেশে রাংতা প্রভৃতির অলকাতিলকা কাটা, তৈলহরিদ্রা মাখিয়া সুন্দরী সাজায় খুব ধূম দেখা যায়। স্ত্রীশিক্ষাও অল্পাংশে প্রচলিত হইয়াছে। বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু বঙ্গদেশীয়দিগের অপেক্ষায় কম। উড়িয়া বিধবার মধ্যে নির্জ্জলা একাদশীর প্রথা প্রায়ই নাই।

মাহিতি, জাতিটি বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের ন্যায় বুদ্ধিমান্, চতুর, এবং বিদ্যাব্যবসায়ী। মাহিতিদিগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত আছে, কন্যা বয়স্থা হইলে বিবাহ প্রদান করা নিয়মও আছে, অল্পবয়সেও বিবাহ সম্পন্ন হয়। মাহিতিদিগের বাটীতে জামাতাকে আনয়ন করা কঠিন ব্যাপার। জামাতাকে বাটীতে আনিলে জামাতা যে কয়েকদিন বাটিতে থাকিবেন, প্রতিদিন তাঁহাকে যে বাসনে আহার করিতে দিতে হইবে, শয়ন কবিতে যে শয্যাদি প্রদান করিতে হইবে হাত মুখ প্রক্ষালন জন্য যে ঘটি গাড়ু প্রদান কবিতে হইবে সকলই জামাতার নিজ সম্পত্তি হইবে। প্রত্যেকবারেই প্রত্যেকদিনেই নূতন দ্রব্যাদি দিতে হইবেই; এই ভয়ঙ্কর কুপ্রথা প্রচলিত থাকা জন্য, মাহিতিজাতির বাটীতে জামাতাকে আনা কঠিন হইয়া পড়ে। এমন কি এখন যে সকল উড়িয়া মাহিতিদিগের পুত্রগণ ইংরেজি শিক্ষা করিতেছেন, তাঁহারাও ঐরূপ প্রথার অন্যথাচরণ করিতে পারেন না। মাহিতিদিগের মধ্যে একটি পিশাচীয় কাণ্ড প্রচলিত আছে। দাসীতে সন্তান উৎপাদন করা, এবং সেই দাসীপুত্রগণকে "সাগরপেধ" উপাধি দিয়া ভৃত্যস্বরূপ বাটীতে রাখা হইয়া থাকে, মাহিতিদিগের কন্যাগণ পাঠশালায় লিখিতে যায়, তাহারা বয়স্থা হইলে তালপত্রে লৌহ লেখনীদ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক এবং পঞ্জিকা লিখিয়া থাকে, ঐ সকল পুস্তকের উপরে লৌহলেখনীর দ্বারা সুন্দর সুন্দর ছবি অঙ্কিত করে, এবং সেই সকল পুস্তিকা বাজারে বিক্রয় হয়। মাহিতিদিগের কন্যাগণ একপ্রকার লতার দ্বারা খেমী, চুবড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত করে, তাহা অতি পরিপাটি এবং দেখিতে বড়ই সুন্দর। মাহিতিদিগের গৃহলক্ষ্মীগণ গাত্রে উল্কী দাগাইয়া থাকেন। এমেরিকান সেলারদিগের গাত্র যদ্রূপ উল্কীতে ছয়লাপী, মাহিতিদিগের অঙ্গনাগণ তদ্রূপ উল্কীতে অঙ্গ শোভিত করিয়া থাকেন; মোটা বস্ত্র পরিধান প্রথাটী আছে, এবং কাছা প্রদানও করেন, কিন্তু সেই সকল বস্ত্রের বহর নিতান্ত অল্প, তজ্জন্য স্ত্রীজাতির সম্ভ্রমরক্ষা হওয়া কঠিন হয়। চুরাটের ধূমপান ঐ সকল

কুলকুমারীদিগের মধ্যে খুব প্রচলিত। কাংস্ত, পিত্তল, রূপা প্রভৃতি যে সকল অলঙ্কার ধারণ করেন, তদ্দৃষ্টে উড়িয়া অঙ্গনাদিগকে একরূপ লোহাঙ্গী বলাও অত্যুক্তি হয় না; যত্তপি গাঢ় নিদ্রাবশে দৈবাৎ সেই অলঙ্কারসজ্জিত হস্ত দুর্ব্বলশরীর স্বামীর কপোলদেশে পতিত হয় অথবা মানভরে যদি ঠোনাটা আস্‌টা কপোলে পড়ে তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের প্রয়োজন হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতির মধ্যে তাম্বুল ব্যবহারও বিলক্ষণ প্রচলিত। ব্রতনেমও খুব প্রচলিত। অধিকাংশ ব্রতে পিষ্টকভক্ষণ হইয়া থাকে; সুখের মধ্যে বিহারদেশীয় স্ত্রীজাতির ন্যায় উড়িয়া স্ত্রীজাতি নোংরা নহে। হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের প্রস্তুত রুটীকাদি ভক্ষণকালে অস্পৃশ্য পদার্থের ময়ান পতিত হওয়ার যে প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে উড়িয়া স্ত্রীলোকের হস্তের প্রস্তুত দ্রব্যাদি ভক্ষণকালে তদ্রূপ সন্দেহ অথবা ঘৃণার উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই কিন্তু উড়িয়া স্ত্রীলোকের প্রস্তুত দ্রব্যাদি অতি জঘন্য এবং অভক্ষ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জগন্নাথের এবং কেন্দ্রাপাড়া নামক স্থানে বলভদ্র ঠাকুরের জন্য যে খেচড়ান্ন প্রস্তুত হয়, তাহা অতি উপাদেয়, তথায় কয়েক প্রকার সুখাদ্য মিষ্টান্নও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

খণ্ডাইত জাতির আচার ব্যবহার মাহিতি জাতিদিগের সদৃশই; কিন্তু এই জাতি অধিকাংশই কৃষিকার্য্যোপজীবী, এই জাতির মধ্যে "ধৈইতো" প্রচলিত আছে। বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহের নাম "ধৈইতো।" ধৈইতোর মন্ত্র কেবল মাত্র দুটী অশ্বত্থ পত্র বরকন্যার হস্তে প্রদান করত "অশতপাতা ঘষ ঘষর্ এ গোত্র থেকে ও গোত্রে পশ" এই মন্ত্র পাঠের পরেই ভ্রতৃজায়ার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। এই জাতি বিবাহের কালে উপবীত ধারণ করে, কিন্তু মাহিতিদিগের কন্যা বিবাহ করত, এই জাতি "মাহিতি" জাতিমধ্যে পরিগণিত হইতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। খণ্ডাইত ধনসম্পন্ন হইলেই মাহিতি হইবার চেষ্টা করে, এবং কেহ কেহ মাহিতিজাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়ে। খণ্ডাইত জাতির স্ত্রীলোকদিগের আচার ব্যবহার রীতিনীতি এবং বেশবিন্যাসাদির পারিপাট্য মাহিতিদিগের স্ত্রীজাতিরই সদৃশ; কেবল ধৈইতো হইলে তাহার চিহ্নস্বরূপ একপদে বেঁকমল ধারণ করা প্রচলিত আছে।

এই সকল জাতিদিগের মধ্যে দুর্গোৎসব শ্যামাপূজা প্রভৃতি চলন প্রায়ই দেখা যায় না, কেবল গণেশপূজার পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে যেমন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক একচেটে, উড়িষ্যায় তদ্রূপ গণেশ একচেটে হইয়াছেন! বোধ হয় উড়িয়ারা মান্দ্রাজ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য হইতেই গণেশপূজার প্রথা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উড়িয়ার ভদ্র জাতিরা, মদিরিকাকে বড়ই ঘৃণা করেন, এমন কি খর্জ্জুররস পান করাও জাতিভ্রংশের কারণ বলিয়া রস ব্যবহার পর্য্যন্ত করা হয় না।

উৎকলপ্রদেশে বৈষ্ণব সম্প্রদাই অধিক, তান্ত্রিক এবং শৈব অতি অল্পই আছেন, তবে এখন সকল মিশ্রিত হইয়া ধর্ম্মের খিচুড়ি হইয়া পড়িয়াছে।

উড়িষ্যার মধ্যে কটক নগরীতে "সোণার" অর্থাৎ সুবর্ণকারদিগের আচার ব্যবহার যদিচ মাহিতি প্রভৃতি জাতিদিগের সদৃশ হইয়াছে, কিন্তু তাহারা প্রকৃত উড়িয়া নহে। (৮) এই সকল স্বর্ণকার রূপা এবং স্বর্ণের সূক্ষ্ম তারের আতরদান, গোলাপপাশ, ফুল, প্রজাপতি, ব্রেসলেট্ এবং নানা প্রকার বিলাতী ফেসনের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে, পৃথিবীর কোন স্থানে তাদৃশ তারকোষির দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় না। এই স্বর্ণকার জাতির মধ্যে কয়েকজন পেরিস প্রভৃতি স্থানের একজিবেসন মেডল প্রাপ্ত হইয়াছিল; ইউরোপের নানা স্থান হইতে কটকের সোণারদিগের নিকট দ্রব্যাদির ফর্মাস্ আসিয়া থাকে। কেবল তারকোষির কার্য্যেই যে ইহারা অদ্বিতীয় এমত নহে, ঘড়ির চাবি, চেন, অঙ্গুরী প্রভৃতি যাহা প্রস্তুত করে তাহা হেমিণ্টনের অপেক্ষা ভাল না হউক, মন্দ নহে।

উড়িয়া "গৌড়" অর্থাৎ গোয়ালা; বোধ হয় বঙ্গদেশ হইতে উৎকলে বাস্ করিয়াছিল তজ্জন্য "গৌড়" উপাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই জাতি দুগ্ধ দধি প্রভৃতির ব্যবসায় করে, এবং পাল্কী বহন করিয়া থাকে, এই জাতির স্ত্রীলোকগণ, বড়ই অপরিষ্কার বস্ত্র ব্যবহার করে তাহার উপরে সোণায় সোহাগা বিশেষ, ঘৃত দুগ্ধ প্রভৃতি পতিত হইয়া দুর্গন্ধ বৃদ্ধি করে।

বাড়ুই, অর্থাৎ ছুতার জাতির মধ্যে, কটক প্রভৃতি সহরে যাহারা বাস করে তাহারা টেবিল, কেদারা, আলমারী, খাট প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত করে।

এক্ষণে উড়িয়াদিগের প্রধান কয়েকটি জাতির রীতি নীতি যাহা বলা হইল, তদতিরিক্ত অনেকগুলি ইতরজাতি উড়িষ্যাতে বাস করে; তাহাদের আচার ব্যবহার বঙ্গদেশীয় নীচ জাতিদিগের সদৃশ। গড়জাৎ মহলের অন্তর্গত ঢাকানল নামক স্থানে এক সম্প্রদায় অসভ্যজাতি বাস করে, তাহাদিগের স্ত্রীজাতি "বাএ খাই" নামে প্রসিদ্ধ। ঐ সকল স্ত্রীজাতি বস্ত্র পরিধান করিত না। প্রত্যহ কটিদেশে কোনরূপ একটা ডোর বন্ধন, অথবা অন্য কোনরূপ বন্ধনী দিয়া কাঁচা পত্র ঝুলাইয়া লজ্জা রক্ষা করিত; কটিদেশ ভিন্ন সর্ব্বাঙ্গ আবরণশূন্য থাকিত।

---

(৮) কটকের প্রসিদ্ধ জগন্নাথ স্বর্ণকারের প্রমুখাত শুনিয়াছি যে, তাহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণ বঙ্গদেশ হইতে গিয়া উড়িষ্যাতে বসবাস করিতেছিল; তাহারা বাঙ্গালি এবং বহুকাল হইতে উড়িষ্যাতে বসবাস করাপ্রযুক্ত এক্ষণে উড়িয়া চাল চলন হইয়া গিয়াছে। জগন্নাথের পিতা, গুঁড়িদাস স্বর্ণকার, বয়স প্রায় ৭৫ বর্ষ হইবে, বলিয়াছিল যে তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ বাঙ্গালী, বঙ্গদেশ হইতেই তাহারা উৎকল দেশে বাস করিতেছে।

অল্পকাল অতীত হইল, কাকানালের মহারাজা ভাগীরথী মহেন্দ্রদেব বাহাদুরের প্রযত্নে ঐ সকল অসভ্য স্ত্রীজাতি বস্ত্র পরিধানে বাধ্য হইয়াছে, এবং সেই পর্য্যন্ত ঐ জাতি এক্ষণে আর পত্র পরিধান করে না! গড়জাৎ মহলে যে সকল জাতি বাস করে, তাহার অধিকাংশই, কতকাংশে সভ্য, কিন্তু "বেধি" প্রভৃতি গড়জাৎ মহলে "কন্দ" প্রভৃতি যে সকল জাতি বাস করে, তাহারা একেবারে অসভ্য, কিন্তু কৃষিকার্য্যোপজীবি এবং সাহসিক।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অন্তর্গত যতটুকু উৎকল ভূমি আছে, সেনসেস্ রিপোর্টে দেখা যায়, তন্মধ্যে প্রায় একলক্ষ চল্লিশ হাজার অপেক্ষাও অধিক অধিবাসী বাঙ্গালী; তৎপরে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত উৎকল দেশে যে সকল বাঙ্গালী আছেন, তাহাদিগকে ধরিলে প্রায় দেড়লক্ষ অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না। বহুকাল হইতে যে সকল বাঙ্গালি উড়িষ্যাতে বাস করিতেছেন, তাঁহারা কেরা বাঙ্গালি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই সকল কেরা বাঙ্গালি ট্যাসফিরাঙ্গীদিগের সদৃশ শঙ্করজাতি মধ্যে পরিগণিত। ইহারা কেবল "কেরা ক্যারা" রূপে বিকৃত ভাষাতে কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকেন বলিয়া "কেরা বাঙ্গালি" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন; নচেৎ কেরা বাঙ্গালিদিগের বুদ্ধি এবং আচার ব্যবহার সর্ব্বাংশেই বঙ্গদেশীয় বাঙ্গালিদিগের সদৃশ বলা যাইতে পারে। উড়িয়া ব্রাহ্মণ, মাইতি, খণ্ডাইত, গৌড় প্রভৃতিও কেরা বাঙ্গালি; ব্রাহ্মণদিগের অন্নাহার করে না এই জন্য কেরা বাঙ্গালিগণ বহুকাল হইতে উৎকলে বাস করত উৎকলীয়দিগের সহিত জাতীয় ভাবে সম্মিলিত হইতে পারেন নাই; কিন্তু এই উভয় সম্প্রদায়ে বিশেষ বিদ্বেষভাব প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু ইদানী স্থানীয় রাজপুরুষদিগের ব্যবহার দোষে অল্পকাল মধ্যে সেই সৌহার্দ্দ্য ভঙ্গ হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। উৎকলের রাজপুরুষগণ খাস উড়িয়া এবং কেরা বাঙ্গালি পৃথক্ করিয়া কর্ম্মকার্য্য প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; জাতীয় স্বার্থের যবনিকা যখন উভয় দলের মধ্যস্থানে পতিত হইয়াছে, তখন আর কত দিনই বা নিঃস্বার্থভাব বন্ধুত্ব থাকিতে পারিবে?

উড়িষ্যায় দেশীয় খ্রীষ্টান্ অনেক আছেন; দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে যে সকল অনাথ বালক অনাথা বালিকা খ্রীষ্টান্ যাজকদিগের তত্ত্বাবধারণে ছিল, তাহাদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির সংখ্যা অতিরিক্ত হইয়াছে; তাহাদের বিবাহ হওয়া ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উড়িয়া খ্রীষ্টান্‌দিগের একটু ধর্ম্ম সংস্কারের কথা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করিতেছি। উড়িয়া খ্রীষ্টান্ রমণী নিজ সন্তান সহিত পথে গমনকালে মুসলমান দেখিয়া হয় ত সন্তানকে বলিতেছেন, "ওটা পাঠান টোকা দেখিস যেন ছুঁসনে" দুর্ভিক্ষের আমদানিতে খ্রীষ্টানই অধিকাংশ।

উড়িষ্যাতে মুসলমান বিস্তর আছে। কটক সহঁরে বিস্তর গোহত্যা হইয়া থাকে,এই কারণেই উড়িষ্যা হইতে বিস্তর গোচর্ম্ম কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। মুসলমানেরাও শ্যামাপূজা প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ দিয়া থাকেন, এবং কটকের হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকেই গোঁয়ারাতে যোগ দেন এটি সুলক্ষণ।

এই স্থানে একটী পরিহাসের কথা মনে হইল। যৎকালে লর্ড মেয়োর কটকে যাইয়া দরবার করিবার অবধারিত হয়, তৎকালে উৎকলের সকল রাজাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। গড়জাৎ মহলের রাজাগণ কটকে উপস্থিত হন; তন্মধ্যে একজন জঙ্গুলি রাজা সৈন্য সামন্ত সঙ্গে কটক সহর দর্শন করিতে বাহির হইয়াছেন। দেখিলাম তাঁহার পাল্কীর অগ্রে অগ্রে প্রায় ৪০।৫০ জন লোক, কাহার হস্তে বামদা, কাহারও হস্তে তলবার, কাহার হস্তে বল্লম, ইত্যাদি অস্ত্র। প্রায় সকলের কটিবন্ধন কিন্তু পশ্চাতে একটি একটি কৃত্রিম লাঙ্গুল দোলায়মান হইতেছে। মস্তকে উষ্ণীষ, তদুপরি পাট অথবা শোন প্রভৃতির গোচ্ছা চামরের সদৃশ ফর ফর করিয়া উড়িতেছে। অনেকের মুখমণ্ডল গৈরিকাদির দ্বারা রঞ্জিত। ঢোল, সাণাই, চড়চড়ি প্রভৃতি বাদ্য হইতেছে, আর ঐ সকল বীরপুরুষগণ নৃত্য করিতে করিতে, ঢালিপাক খেলাইতে খেলাইতে, রাজার অগ্রে অগ্রে চলিতেছে। এই ব্যাপারটি দেখিয়া রামায়ণ প্রভৃতির হনুমানের কথা অত্যুক্তি বলিয়া আর মনে হইল না।

প্রাচীন উৎকলবাসিগণ প্রাচীন বঙ্গদেশের নিকট হইতে বর্ণমালা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং জাহাজ নির্ম্মাণ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

উপসংহার কালে ইহাও বলা আবশ্যক যে, উৎকলবাসীদিগের বিষয় যাহা বলা হইল, তাহা কোন ইতিহাসের অনুবাদ নহে। উড়িষ্যার ইতিহাসলেখকগণ অনবধানতাবশতঃ উড়িষ্যার বিষয় যাহা ভুলিয়া গিয়াছেন, অথবা অনুসন্ধান করিতে বিরত হইয়াছেন, সেই সকল বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা লিখিত হইল।

শ্রীদীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গঙ্গাধর শর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কাছারি গরম

ডিপুটি সাহেবের চস্‌মা মেরামত হইয়া আসিয়াছে, মফঃস্বলে চসমা হারাইলে যে নয়নতারা হাবা হইতে হয়, তাহা মৌলবি সাহেবের বিলক্ষণ ধারণা হইয়াছে, সেই জন্য একের বদলে দুই সেট চসমা আনাইয়াছেন, যখন একটি যোড়া আঁখিদ্বয়োপরি শোভমান হয়, তখন আর একটি যোড়া জেবে চলে। বিচারের দোষ চসমার উপর দিয়া যাইত, সাধারণে কহিত চসমার মধ্য দিয়া প্রকৃতির বিকৃতিই দৃশ্যমান হইয়া থাকে এ জন্যই বিচার ভুল হয়। চসমার অভাবে কাছারীর কার্য্য বন্ধ ছিল; যাহা হইয়াছে, তাহা কাণার হাতে প্রতিমা নির্ম্মাণ স্বরূপ হইয়াছে। তাহাতে ক্ষতি নাই, উর্দ্ধতর কার্য্যক্ষেত্রে মৌলবি সাহেবের বিশেষ খোসনাম আছে ও তিনি সুদক্ষ কর্ম্মচারি বলিয়া বিখ্যাত। যাহা হউক আজ একবার চসমার প্রসাদে বিচারস্রোত উচ্ছ্বসিত হইবে।

একজন চৌকিদার এই মাত্র দৌড়িয়া আসিয়া কহিল, "হাকিমের ঘোড়ার পিঠে জিণ চড়িয়াছে।" সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র শান্তিপুরে হুলস্থুল পড়িল। তাম্বুর কানাদ কয়েক দিন হইতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ঝড়ে বাদলে রজ্জুগুলি শিথিল হইয়াছিল, হাকিমের শুভাগমন সংবাদে খুটাগ্রে মুদ্গর প্রহার আরম্ভ হইল। দড়াস্ দড়াস্ শব্দ আরম্ভ হইল। শব্দে কত কত লোকের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। ভীরু জনগণের বক্ষে যেন সেই মুদ্গর প্রহার হইতে লাগিল। কেহ কেহ কহিতেছেন, "আইন-আইনের সদেগৌরব দৃষ্টি করিব, আইনের প্রভাবে উচ্চ নীচ সমতল সার লাভ করিবে," কেহ কহিতেছেন, "ভদ্রসমাজে সম্ভ্রমসোপান ভগ্ন হইবে," শিবসহায় মনে করিতেছেন, আজ সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার কুলমান বুঝি অস্তমিত হইবে। শিবসহায় স্তব্ধভাবে ভাবিতেছেন, এই সময় দন্তহীন ওষ্ঠোচ্চারিত

"নচ দৈবাৎ পরং বলম্" একটি বচন শুনা গেল, এবং পরক্ষণেই প্রাতঃ সলিলে ধৌত শিক্কাহিল্লোলিত তর্কালঙ্কার মহাশয় শিবসহায়ের সম্মুখে দর্শন দিলেন।

তর্কা। ব্যাপার কি? যাহাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তাহাদের বিপদ শুনিলেই একান্ত কাতর হইতে হয়। আমার যা শক্তি তাহা করি, শুনে কি নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারি? ভোরে গাত্রোত্থান করে প্রথমে তোমার নিকট ত্রস্ত আসিলাম।

শিবসহায় দণ্ডবৎ হইলেন, ও কেবল মাত্র কহিলেন, "উপায়?" তর্কালঙ্কার কহিলেন, "মধুসূদন নামোচ্চারণ—চণ্ডীপাঠ আজই আরম্ভ করা যাক্।" শিবসহায় কহিলেন, "যা ইচ্ছা।"

ত। এখানে হবার নয়—যবন প্রভৃতি অনেক অস্পৃষ্ঠ লোকের আজ এই গ্রামে আগমন হইবে। মনে করেছি সেই প্রান্তরে শান্তিনাথের মণ্ডপে যাইয়া শান্তি মন্ত্র পাঠ করিব।

শিবসহায় মস্তক হেলাইয়া সম্মতি দিলেন। তর্কালঙ্কার ভাণ্ডারিকে সঙ্গী করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন।

এদিকে শিবসহায়ের বাটীব কিয়দ্দূর পূর্ব্বে ক্ষুদ্র নদীর তটে একটি আম্রকাননে আজ নগর বসিয়া গিয়াছে। দূব হইতে বৃক্ষেব কাল কাল সারি সারি সমদূরবর্ত্তী স্কন্ধগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহস্তম্ভ স্বরূপ দেখাইতেছে, আম্র শাখাগুলি পরস্পর সংমিলিত, সকল বৃক্ষই যেন এক ছাঁচে প্রস্তুত, এক তুলিতেই অঙ্কিত। উত্থানের প্রান্তরে বৃক্ষশাখা নির্ব্বিরোধে বর্দ্ধমান হইয়া তলস্থ শস্যক্ষেত্রে সংলগ্ন হইয়াছে। একভাগে দেশবিভাগের কর্ম্মচারীর পটগৃহের শুভ্র ছাওনি দৃশ্যমান। একটি যেন প্রকৃতির ছবির সঙ্গে মানবনির্ম্মিত ছবি মিলিয়া গিয়াছে। যেন কোন মন্ত্রবলে গৃহটি মুহূর্ত্তমধ্যে উত্থিত হইয়াছে। এমন গৃহ দেখিতে পল্লীস্থ কোন্ বালকের বা বালকের পিতার কৌতুক না জন্মে? সাহেবের "কাপড়ের ঘর" দেখিতে অনেকেই দৌড়িয়াছে, যেখানে পথ কম পরিসর সেখানে কোন দাম্বাল বালক কোন বুড়িকে হুমড়ি করিয়া ফেলিয়া দৌড়িতেছে, বুড়িরা বালকের পিতৃপুরুষ উদ্ধার করিতেছে, ও ছাওনি দর্শনের হাতে হাতে ফলদান করিতেছে। ক্রমে গ্রামের লোক বাগানের নিকটবর্ত্তী হইয়া চতুষ্পার্শ্বে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, কোন বৃক্ষতলে মোক্তারের দল বসিয়াছে, তাহাদের পাগড়ি দেখিয়াই কত কত ছেলে হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেছে। কারও পাগড়িতে একখান, কারও অর্দ্ধখান লাগিয়াছে, কারও দুই তিন হস্ত প্রমাণ কাপড়ে যথেষ্ট হইয়াছে, কারও লাট্টুদার, কারও হাতে বান্ধা, কারো মুরেচ্ছা পাগড়ি মস্তকে শোভমান বা অশোভমান রহিয়াছে, কাহারও পাগড়ির পশ্চাৎভাগে রজতনিন্দিত শিক্কার শেষাগ্র চামরীর লাঙ্গুলাগ্র সম বিক্ষিপ্ত। প্রায় অনেকের পাগড়ি দুই একটী ছারপোকার ও ক্ষুদ্র

কীটের বিচরণভূমি। তাহাদিগকে বেদখল করিতে কেহই সাহসী নহেন, কারণ সকলেই মনে মনে জানেন, ঐ স্থান বিচারালয়। সকলেই ন্যায় নিয়মের অধীন, ফলনা আইনের ফলনা ধাবার ফলনা প্রকরণে "সি" চিহ্নিত তফসিলানুসারে কীট দলের দখলের সত্ব জন্মিয়াছে।

পাগড়ির নিম্নভাগে ভ্রূযুগল মধ্যে কোন মোক্তাবের গোল রক্তচন্দনের ফোঁটা, কাহার যজ্ঞবিভূতির রেখা উর্দ্ধগামী হইয়া শিরোভূষণে ঠেকিয়াছে। এই ফোঁটা সুনীত—সুধর্ম্মের লক্ষণ মাত্র, অহোরাত্র দুশ্চিন্তা, জাল, ফেরেপ, দলিল, কাটকুট, নূতন কথার সৃজনকৌশল, প্রকৃত ঘটনাব বিকৃতি ঘটাইবার ঘটকালির সকল পাপ, সকল দোষ ঐ পূজার বলে, ঐ ফোঁটাব মোহিনী গুণে—ধাম্মিকতার সুপরিচয়ে পরিপাক হইয়া যায়, এইরূপ অনেকেরই বিশ্বাস। মোক্তার মহাশয়দের মধ্যে দুই একটি মুসলমান, সুসজ্জিত, ইহাদেব কেহ এত বৃদ্ধ যে পুরাণ দ্রব্যের পবিচয় স্থলে, পরিদর্শনগৃহে স্থাপিত হইবার যোগ্য। ইহার মধ্যে সয়েদ ফকিরদ্দিন মিয়াই সর্ব্বপ্রধান, তাহার কত বয়স ঠিক কেহ কহিতে পাবিত না। যাহাব পিতামহেব কাছে তিনি চল্লিশ বৎসর বয়স্ক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাহাব পৌত্রকে কহেন যে তিনি পঞ্চাশ বৎসর মাত্র অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহাব পাগড়িটি সকলের অপেক্ষায় স্থূল, শ্মশ্রুদেশের শুভ্র কেশগুলি বয়োধর্ম্মে প্রায় দশ আনা উঠিয়া গিয়াছে। প্রায় দন্তহীন, তথাপি বাক্যপটু; অনর্গল কথা কহিতেছেন, কখন বাঙ্গালা, কখন হিন্দি কহিতেছেন, শত কথা কহিতে প্রায় পঞ্চবিংশতি বার "ফর্‌কে ফর্‌কে" কহিয়া থাকেন। তাঁহার গোঁফের মধ্যভাগ কেশহীন। একে দন্তহীন গোঁফ, তাহাতে দুই পাশে লম্বমান শুভ্র কেশ, মধ্যদেশ একবারেই খুঁর চাঁচা। বুড় মিয়া এই বয়সে সাত বার মাত্র বেগম পরিগ্রহ করিয়াছেন; কনিষ্ঠা চাচি অল্পবয়স্কা, এইরূপ গোঁপের পরিপক্কে বুড় মিয়া চাচিরও মন রাখিয়াছেন, খোদাকেও সন্তুষ্ট করিয়াছেন। ফলে তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অতি বলবৎ, আর ১৪ বৎসর হইতে তাঁহাকে এইরূপ বক্তৃতা করিতে শুনা যায়। "আর এ জেন্দগানি মিছা! আমার বড় পো যে সাহেবের পানা পাকড়াইয়াছে, তাহাতে আর বালবাচ্চার তক্‌লিফ থাকিবে না। আগামী পুষ মাহানায় মক্কা কুচ করিবই করিব, দরগায় দরগায় ফয়তা দিতে দিতে হজে পৌছিব, খোদা এক রুটি এক বদনা পানি দেয় বেহেস্তর, না, দেয় বেহেস্তর।" যাহা হউক কার্য্যের অনুরোধে বা অর্থের লালসায় ফকিরদ্দি সাহেব সুকামনা ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই—কখন কখন সন্দেহ করেন, তাঁহার কামনা বহুকালব্যাপী, তাহাতে হয় ত তামাদির প্রতিবন্ধকতা ঘটিয়াছে, এজন্য এখনও মোক্তারি ত্যাগ করেন নাই।

তিনি ঐ বাগিচার মধ্যেই ডেরা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, একটী স্থূল বৃক্ষতলে বিচালির বিছানার উপর সতরঞ্চি পাতিয়াছেন, সম্মুখে পিতলের গুড়গুড়ি, দুই একটি মহুরর মুসবিদা করিতেছেন, তিনি "চড়েব" জায়গায় "নাথি" "পথে মারপিট" পরিবর্ত্তে "গৃহপ্রবেশ করিয়া মারপিট," "লাটির" স্থানে "সাংঘাতিক অস্ত্র তরবাল বা সড়কি" লিখিতে অনুমতি করিতেছেন। "অহে! তোমবা ছেলে মানুষ, মামলা কিসে সাজে, কিসে খফিফবাত সঙ্গীন হয়, তাব সবক আবতক্ পাইয়াছ কি?" ক্রমে মোক্তার সাহেবের স্থানে ভিড় বাড়িল, পঞ্চ হস্ত মাত্র তাঁহার বিছানার বিস্তার কিন্তু তাহাই আশ্রয় করিয়া সাত হাত পর্য্যন্ত লোক বসিয়াছে—নূতন লোক আসিলেই স্থান হইতেছে, সকলে সবে সরে বসিতেছে লোকসংখ্যা সহিত যেন বিছানা বাড়িয়া যাইতেছে। প্রকৃতার্থ অর্দ্ধেক লোক খালি ভূমিতলে উপবিষ্ট। তাঁহার নিকট অনেক লোক আগত, কারণ তিনিই রঘুবীরের আমমোক্তার।

আর এক দিকে বামাদিন সুকুলেব বৈঠক, ইনিও একটী প্রসিদ্ধ প্রবীণ মোক্তার, মাথা হইতে পাগড়ি নামাইয়া গাছেব শাখায় রাখিয়াছেন, মাথাটী বৃহৎ, মাথা হেলাইতেছেন, তামাক টানিতেছেন, ও সাক্ষীগুলিকে কহিতেছেন, "ভয় করিও না, হাকিমেব ধমকে ভুল না, এই এজাহার প্রণালী আমার কথাগুলি মনে রেখ, ও যা বলে দিয়েছি বলো, তাহলেই শিবসহায়ের জয়।"

আম্রকাননের আর এক অংশে হায়দার বক্স চাপরাশী এজ্‌লাশ সাজাইয়াছেন। একটী পুরাণ কেম্পটেবেল তাহার একটী ভগ্নপদ রজ্জু দিয়া বাঁধা। টেবেলের উপর কতকগুলি পুস্তক কলমদান দোয়াত ও ফারসি লিখিবার একটি ওয়াস্তির কলম সংস্থাপিত হইয়াছে। একটী হস্তহীন ভগ্নপ্রায় ছারপোকার আবাসস্থান স্বরূপ কেদারা টেবিলের সম্মুখে রক্ষিত হইয়াছে, সকলে বিচারকের আগমন অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় ক্ষুদ্র খালের পার হইতে একটি হাঁক শুনা গেল, অনেকগুলি চৌকিদার সেই দিকে দৌড়িল, আমি ঘাটের পার্শ্বে এক উপকূলে দাঁড়াইলাম, অপরকূলে দেখিলাম অশ্বারোহী হাকিম সাহেব আসিতেছেন। দুই জন পদাতিক অশ্বের দুই লাশখলিন রজ্জু ধরিয়াছে, অশ্বটী তেজীয়ান্ তাহাতে জল পার হইতে হইবে। মৌলবি সাহেব খালের অপর কূল দেখিতেছেন, তবু তাঁহার ভাবনা অকূল, মনে মনে ভাবিতেছেন, "বালি না কাদা" ইচ্ছা, জলের দিকে দেখেও দেখিব না, তজ্জন্য চসমা খুলিলেন, পকেটে পুরিলেন; দুই জন চৌকিদার লাগাম ধরিল, দুইজন সাহেবের দুই পদ জিনের উপর চাপিয়া রাখিল; মৌলবি সাহেব নিস্তব্ধ। অশ্ব জলে নামিল। একজন অগ্রে চলিতেছে আড়কাটির (পাইলট) বোল বলিতেছে

"অল্প জল" "বালিসার।" সাহেবের সাহস বৃদ্ধি হইতেছে, তখন অশ্ব চাকিভোর জলে নামিয়াছে লাঙ্গুলে জলস্পর্শ হওয়ায় একবার বামে একবার দক্ষিণে বিক্ষেপ করিল, সঙ্গে সঙ্গে হ্রেষারব করিল, অশ্বারোহী মৌলবি সাহেবের মনে হইল বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। আর ভাবিবার সময় কৈ? তীরের মত অশ্ব অপর কূলে আসিয়া উপস্থিত। মৌলবি সাহেব "আল্লা হো লাহু লেল্লা" উচ্চারণ করিয়া সুজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন, ও গর্জ্জন করিয়া "আমাকে কেন ধরেছিস্" কহিয়া চৌকিদারগণকে তিরস্কার করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বিচার ধর্ম্ম

যাঁহারা বিচারপতি, তাঁহারা ধর্ম্মাবতার অধ্যায়িত, তাঁহারা ন্যায়সাধন করিয়া থাকেন, কিম্বা ন্যায়সাধন করাই তাঁহাদের কার্য্য বলিয়া এত গৌরব। সেই গৌরব রক্ষা করিতে তাঁহারা সতত তৎপর, বিচারক কিয়দ্দূর নিয়মের বাধ্য, প্রমাণের বাধ্য, আরো প্রমাণ প্রয়োগ অসম্পূর্ণ ও স্বার্থসম্ভূত মিথ্যা বর্ণনায় বিদূষিত হইলে, বিচারককে হতাশ হইতে হয়। মনে মনে জানিয়া শুনিয়াও দেশবিধির অনুরোধে, কাগজে কলমে প্রমাণাভাবে, তাঁহাকে নিজ অনুমানের বিপরীত কার্য্য করিতে হয়। ইহা এক মনোকষ্টের কারণ, তাহার উপর আমাদের দেশে সমাজের এমনি স্বভাব, এমনি স্বার্থপরতা প্রবল, এমনিই আপনার স্বরূপ অপরকে দেখিতে তৎপর যে, নিজ ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য না হইলে কেবল বিচারককে ভ্রান্তিসঙ্কুল বলিয়া আমরা সন্তুষ্ট হই না। "পক্ষপাতী" "কাণ পাতলা" "বন্ধুজনের অনুরোধরক্ষাকাঙ্ক্ষী," শেষে "বোকা হাকিমটা," কহিয়া তাঁহার সকল শ্রমের, সকল কষ্টের, পুরস্কার দিয়া থাকি।

আজ শান্তিপুরে আমতলার এজ্‌লাসে বিচারকার্য্য নিষ্পত্তি হইতেছে। শুনা যাইতেছে মৌলবি সাহেবের বিংশতিটি টুপি সঙ্গে আসিয়াছে। সকলে কহিতেছে, যেমন কোন প্রশংসিত ব্যক্তি বিশ তোপ পায়, তেমনি এই হাকিম সরকার হইতে বিশ টুপি বক্‌সিস্ পাইয়াছেন, এ জন্য তিনি "বিশ টুপিদার হাকিম" বলিয়া খ্যাত। কিন্তু কাছারীর কার্য্য এক ঘণ্টা মাত্র আরম্ভ হইয়াছে, ইহার মধ্যে দণ্ডে দণ্ডে আমরা কেবল তিনটি টুপি পরিবর্ত্তন হইতে দেখিলাম। ঘড়িটি মধ্যে মধ্যে খুলিতেছেন, ও "টোপি লাও" কহিতেছেন। টুপি লইয়া তিনটী ভৃত্য আসিতেছে, দুই জন রেখা পরিবর্ত্তন নিবারণাশয়ে কেশাগ্র উভয় কর্ণের নিকট ধরে, একজন পুরাণ টুপিটী উঠাইয়া নূতন একটী মস্তকে পরাইয়া দেয়, এটি

কলের কার্য্য! অনেক যত্ন করিয়াও মাথার মধ্যভাগ ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না, আভাষে বোধ হইল যেন, পার্শ্বদেশ অপেক্ষা মস্তকের মধ্যস্থলের কেশ খর্ব্ব, যাহা হউক মৌলবি সাহেবের টুপিতে যেরূপ সাধ, সরকারি কার্য্যেও সেইরূপ আস্থা, কলম খস্ খস্ চলিতেছে, দস্তখত করিতে বড় আমোদ "আউর দেও," "আউর দেও" আদেশ করিতেছেন, ও মধ্যে মধ্যে কহিতেছেন, "যেমন মাল থাকুক না থাকুক, লোক চড়ুক না চড়ুক, রেলের গাড়ি নিয়মিত সময়ে চলিবেই চলিবে, তেমনি নির্দ্ধারিত কাছারির সময় তাঁহার হাত থামিবার নহে, কাজ থাকিলেও চলিবে, না থাকিলেও চালাইতে হইবে। অতি সামান্য সামান্য কার্য্যে একঘণ্টা অতিবাহিত হইল। এক্ষণে মোকর্দ্দমা পেষের সময় উপস্থিত। হায়দার বক্স চাপরাসি চীৎকার শব্দে কহিল "ফরিয়াদি রঘুবীর সিং হাজির হ্যায়।" অমনি কাননের চতুষ্পার্শ্ব হইতে জনস্রোত ছুটিল; সুকুল ঠাকুর লম্বমান টিকি এক হস্তে উঠাইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর রাখিলেন, অন্য হস্তে তাহা পাগড়ীতে আচ্ছাদিত করিলেন। ফকিরদ্দী মিয়া শ্মশ্রু কেশসহ ঘন ঘন দুই তিন বার নাশাগ্রে উত্তোলন করিয়া আঁখিদ্বয় নিম্নে নিক্ষেপ করিয়া সজ্জা সিজিল কবিয়া লইলেন, পরে উভয় দলপতি এক একটী দরখাস্ত হস্তে যাত্রার আসরে বিন্দেদূতীর ন্যায় দলবল সহ বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রঘুবীরের সর্ব্বাঙ্গ আজ আবার গোময়বিকীর্ণ ও চুন হরিদ্রা প্রলেপিত, অনেক কষ্টে বসিল কিন্তু বাম উরুতেব ব্যথায় ঋজু হইয়া দাঁড়াইতে অক্ষম, তাহার কাতরোক্তিতে কানন কাতর হইল—তাহার চক্ষে দরদর অশ্রু পড়িল, কান্দিয়া কহিল, "হুজুরালি! আজ পর্য্যন্ত দরদ ভাল হয় নাই!" সে বসিয়া সাক্ষ্য দিতে অনুমতি পাইল, অমনি দুই তিন জন মুহুরি এজাহার লিখিতে বসিয়া গেল, মৌলবি সাহেব সকলের কথা শুনিতেছেন সকলকেই প্রশ্ন করিতেছেন সকলের উত্তর মুহুরিদিগকে সঠিক করিয়া লিখিতে কহিতেছেন কিন্তু মনের কথা মনই জানে, সাক্ষী সংখ্যানুসারে মুহুরিগণ আপন "তহরিকের" মুদ্রা দেওয়ানজীর নিকট আমানত করিয়া আসিয়াছেন, যাহা লিখিত হইবে তাহাও জানিয়া আসিয়াছেন।

হাকিমের এক বিচারাসন, ও আশে পাশে দশ বিচারাসন দেখিতেছি, দশ-মুখে বিচার নিষ্পত্তি হইতেছে, গাঁয়ের যাদু মণ্ডল কহিতেছে হাকিম সিংহরাশ, আর একজায়গায় সাগর আচার্য্য কহিতেছে হাকিম ন্যায্য বিচারের জন্য "আটু পাটু" করিতেছেন, যখন রঘুবীরের পক্ষ সাক্ষীকে ধমকাইতেছেন তখন তার শ্বশুর সঙ্করসিংহ কহিতেছে হাকিমের ঐদিকে টান দেখছ—এ অন্যায়, না হয় জেলায় যাইয়া দরখাস্ত দিব। শিবসহায়ের ভৃত্য রামা কহিতেছে যে দিন শিবের জয়

হইবে সেই দিন জানিব হাকিম সুবিচারক, এখন কি তোরা ভাল মন্দ বল্‌চিস ? এইরূপ নিরপেক্ষ অভিপ্রায়ই ত বিচারপতিদের সুখ্যাতির ভিত্তি !

এখন বিচারপতি স্বয়ং নাজির সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কাদম্বিনীকে হাজির আনিয়াছ ? লইয়া আইস।" নাজির কেবল মাত্র কহিলেন "জোনাব" মুহূর্ত্ত মধ্যে মরালগামিনী ছদ্মবেশী সুন্দরী গোয়ালিনী কাদম্বিনীর বেশে বিচারকের সম্মুখগামিনী হইল। বিচারালয়ে একে স্ত্রীলোকের আগমন, তাহাতে সুন্দরী অনেকের অপরিচিত, অজ্ঞাত, প্রকৃত সুন্দর যুবতী কামিনী ; সেই দৃশ্য দেখিতে কি দর্শককে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হয় ? কানন পরিপূরিত হইল, চাপরাশি চৌকিদার সকলে চুপ চুপ করিয়া গোলযোগ বাড়াইতেছে, হাতে লোক সরাইতেছে, তবুও অল্প সময় মধ্যে কাননে লোকসঙ্কুলে বায়ু প্রতিরোধ করিল—সুন্দরী আকাশে, পাতালে, সম্মুখে, না পার্শ্বে দেখিবে ? সকল দিকে অপরিচিত জনের কটাক্ষাক্রান্ত ! প্রগল্‌ভতা নাই, লজ্জার উদ্রেক হইয়াছে, জিজ্ঞাসিলে কি উত্তর দিব এই ভাবিতেছে, পূর্ব্বের শিক্ষা ভুলিয়া যাইতেছে। মৌলবি সাহেব কহিয়া উঠিলেন "তবে নাকি কাদম্বিনী ফৌত করিয়াছিল, এবা একবারে রাতকে দিন করিতে চায়, সকলে মনে করে যে আমি দারোগার রিপোর্টে নির্ভর করিয়াই কার্য্য করি। নাজির !"

না। হুজুর।

মৌ। বাবু শিবসহায় সিংহকে বোলাও।

নিমেষমধ্যে বৃদ্ধ থর থর কলেবর স্থূল শরীর প্রচুর সুপক্ক গোঁপধারী শিবসহায় সিংহ উপস্থিত। বিচারপতি কহিলেন "ইহাকে প্রতিজ্ঞা পাঠ করাও।" মন্ত্র উচ্চারণকালে শিবসহায় আপনাকে একান্ত নিঃসহায় পাপপঙ্কে পতিতোন্মুখ মূঢ় জ্ঞান করিলেন, চতুর্দ্দিক্‌ অন্ধকার দেখিলেন—পেষাদার সাক্ষী ও ধর্ম্মভীত ভদ্রের এই প্রভেদ ! শিবসহায়ের কাতরতা দেখিয়া শত্রু মিত্র সকলেই কাতর হইল। বিচারপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "দেখ এই আওরাত কাদম্বিনী নয় ?"

শি। না।

বি। তোমার কন্যা নয় ?

শি। কালী কালী ! না।

বিচারপতি ক্রুদ্ধ হইলেন ও কহিলেন, "তাহাতেই কহিয়াছিলাম এনারা রাতকে দিন করিতে পারেন, ইহার উত্তর লিখিয়া পড়িয়া শুনাও, মিথ্যাবাদীর খান দান এককালে সিকস্ত হওয়া উচিত।"

সকলে ভয়ে থর থর, কি হুকুম হইবে কে কহিতে পারে, আরো লোক সংখ্যা চতুষ্পার্শ্বে বাড়িতেছে, সকলে সমাগত, কেবল এই পুতুল খেলার যে জন

প্রকৃত খেলী সে গজানন কোথায়? তিনি বিচারালয়ে আসিতে বড় কাতর, হলফ করিতে আরো কাতর। তিনি রঙ্গভূমিতে আসেন নাই, দূর হইতে কল টিপিতেছেন, ডোর ছাড়িতেছেন, টানিতেছেন, গ্রামের কোন নিভৃত স্থানে বসিয়া আছেন, পলে পলে সকল সংবাদ পাইতেছেন।

পোষ্টমাষ্টার গাঙ্গুলি মহাশয়েরও এখানে দেখা নাই। মাজিষ্ট্রেট ক্ষুদ্র বিচারপতি, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ভৃত্য, তিনি কেবল নবাব গবর্ণর জান্দেরেলের অধীন। অধীনতম হাকিমের কাছারিতে গিয়া ন্যূনতা স্বীকার করা অপমান অথচ ফলতঃ খবর সকল বিষয়ের রাখিতে হইবে এ জন্য দুটি ডাকের ধাওয়া কাছারীতে রিপোর্টার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন, গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিলক্ষণ নিন্দাবাদপটু ও ভদ্রের গ্লানি করা তাহার বিশেষ গৌরব, তিনি মহা তীর্থ জ্ঞানবাপীর ন্যায় সমলসলিল পূর্ণ।

সকল সাক্ষীর এজাহার লিখিত হইল। কাগজাৎ পাঠ হইল। হাকিম রায় লিখিতে বসিলেন। সকলে নীরব, এমন সময় মটুকধারী বনমালী পিতাম্বর সজ্জায় কোথা হইতে শীতু ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত ও গদগদ বচনে করযোড়ে কহিলেন, "আজ ধর্ম্মাবতারের আবির্ভাব, শুনিয়াছিলাম আজ রাবণ আসিয়াছে সীতা হরণ হইবে তা ত নয়; এই আমার দরখাস্ত নিষ্করে দখল দেন আর এই সুন্দরীকে দান করুন প্রভু! আমি ঘনেশ্যাম তাহার উপযুক্ত পাত্র।" বলিয়া আপন গলদেশ হইতে মালা খুলিয়া সুন্দরীর গলায় অর্পণ করিল।

মৌলবী সাহেব ইহার ভয়ানক গোস্তাকি দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। ইঙ্গিত মাত্র বদ্ধকর হইয়া সিংহাসনেচ্ছু শীতু ঠাকুর কারাবাসে চলিলেন। মধ্যে মধ্যে কেবল মাত্র কহিতে লাগিলেন, এতদিনে দশম দশা প্রাপ্ত হইলাম, ও সঙ্গে সঙ্গে গান হাঁকিয়া দিলেন। এদিকে মৌলবী সাহেবের রায় লিখিতে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল, পশ্চিমাকাশে প্রবল ঝড় উঠিবার পূর্ব্বে যেমন উচ্চ তরুশ্রেণী স্থিরপত্রে দণ্ডায়মান হয় সেইরূপ দর্শকমণ্ডল আদেশ প্রচার হইবার পূর্ব্বে সুস্থির! এক্ষণে হাকিম কহিলেন "শিবসহায় সিংহ, তুমি রঘুকে গুরুতর আঘাত করিয়াছ, সাংঘাতিক অস্ত্র সহকারে দাঙ্গা তোমার অনুমতিতেই হইয়াছে, তুমি কাদম্বিনীর মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ দিয়াছিলে ও সেই মিথ্যার পোষকে আজ আবার সফৎ করিয়া প্রকাণ্ড বিচারালয়ে মিথ্যা কথা কহিলে যে এই আওরাত তোমার দক্তর নহে। এ সকল গুরুতর অপরাধ, আমার অভিমতে তোমার আরো উচ্চতর বিচারস্থলে দণ্ড বিধান হওয়া উচিত, অতএব তোমাকে সসিহান সুপর্দ্দ করিলাম।" একজন মোহরার কহিয়া উঠিল, "আপনি সাফায় সাক্ষীর নাম দেন।"

হুকুম প্রচার হইল। সকলে বিমর্ষ, সকলের কৌতুক, সকলের কাছারি দেখিবার উৎসাহ শেষ হইল, যে নিরাহারে আসিয়াছিল তার ক্ষুধা মনে পড়িল, আজ কৃষীদের পাক বন্ধ, ছাত্রদের পাঠ বন্ধ, গ্রামে ঘোর বিপদ, কাল প্রাতে মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে কে আর কৃষীদের বীজধানের হলকর্ষণের খবর লইবে, ছেলেদিগকে একত্র কবিয়া পরীক্ষা করিবে, কুস্তি খেলা দেখিবে, লাড়ু বিতরণ করিবে, আজ গ্রামের মাথা ভাঙ্গিয়া গেল। শিবসহায়কে দিন দিন কাছারিতে জামিন দিয়া হাজির থাকিতে আজ্ঞা হইল। একে একে পরে দলে দলে নিরিস্তুক পল্লীবাসীরা গৃহমুখে চলিল। এখন মৌলবী সাহেবের স্মরণ হইল যে সরে জমিনে তদারকে আসিয়া তিনি এ পর্য্যন্ত দাঙ্গার স্থল দৃষ্ট করেন নাই। ঘোড়া চড়িয়া সেই জমি মাড়াইয়া যাইবেন, মনে করিলেন।

কিয়ৎকাল পরেই অশ্ব প্রস্তুত হইল, ও তিনিও আরোহী হইলেন। ঘোড়া চালাইতে প্রস্তুতপ্রায় এমন সময় দেখিলেন একটি খঞ্জ দ্রুতগামী কযেকটী পাঠশালার বালকসঙ্গে দূব হইতে সেলাম ঠুকিতে ঠুকিতে তাঁহার নিকট আসিতেছে, মৌলবী সাহেব কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিলেন, খঞ্জভীম একটি সুচ্ছবি ইংরাজি লিখিত পত্র হস্তে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "স্যার আমি শ্রীনগরের পাঠশালার প্রধান শিক্ষক, এটি হুজুরের (এড্রেস) অভিনন্দন পত্র, হুজুর যে শীতু দুষ্টকে শাসন করিয়াছেন, হাজতে দিয়াছেন তাহাতে কি কহিব। দেশ বিদেশের লোক সন্তুষ্ট; হুজুর সম্মুখেই তার পরিচয় পাইয়াছেন, সে এক লম্পট বদমাইস লোক।" এই বালকদলের মধ্যে সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট "জরক বরথ" জরি বিভূষিত উজ্জ্বল বর্ণময় সজ্জাধারী নীলমণি এতক্ষণ দাঁড়ইয়াছিলেন; খঞ্জভীমের কথা শেষ না হইতেই তিনি কহিয়া উঠিলেন, "আমি একটি বকৃটিটা করিব।" মৌলবী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কে?" "I am is sir, Babu Nilmani Chaudhury আই এম ইজ বাবু নীলমণি চৌধুরী Heir apparent Dewan Gajanana Chaudhury your honour come an address, you are very happy". কোন উত্তর না দিয়া মৌলবী সাহেব খঞ্জভীমের হস্ত হইতে পত্রখানি লইলেন ও তৎক্ষণাৎ জনৈক পদাতিকরে কহিলেন "শীতুকে ছাড়িয়া দাও, সে পাগল বোধ হইতেছে।" আদেশ দিবামাত্র সকলকে সেলাম করিয়া অশ্ব চালাইলেন। খঞ্জভীম মনে করিলেন, হিতে বিপরীত, এড্রেসে শীতু খালাস পাইয়া গেল। এড্রেস ব্যবসায়ী ভদ্রগণ অনেক সময় এইরূপ গোলে পড়েন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

শুভচণ্ডী পূজা

কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম। আশুতোষ বাবুর মতানুসারে গ্রামস্থ কয়েকটি ছাত্রের নগরে যাওয়াই স্থির হইল, গজানন অগত্যা নীলমণিকে কালেজে পাঠাইবার অভিমত করিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় লম্বমান চিত্র বিচিত্র কোষ্ঠীপত্রের পাক খুলিয়া অঙ্কপাত করিতে লাগিলেন। দিন, লগ্ন স্থির হইল—আগামী বুধবার প্রত্যুষে বর্ত্তমান কার্ত্তিক মাসের সপ্তবিংশতি দিবসে শুভদিন সর্ব্বত্র প্রচার হইল, কেন শুভ দিন? কারণ, তর্কালঙ্কার মহাশয় গণিয়া বলিয়াছেন ঐ দিবসই শুভ-যাত্রিক, যাহা কিছু রিষ্ট আছে, অর্দ্ধপণ কপর্দ্দক, অর্দ্ধসের লবণ, অর্দ্ধসের তৈল, একটি ক্ষুদ্র কাটারি ও একটি অঙ্গার-খার-বিধৌত বস্ত্র রাহুগ্রহকে দান করিলেই তাহার অশুভ চিন্তা বন্ধ হইবে। গ্রহগণ এক্ষণ অপেক্ষা তখন অনেক নির্লোভী ছিলেন, অতি অল্পতেই সন্তুষ্ট হইতেন। একে অনেকের নিকট পূজা পাইতেন তাহাতে দেশ দরিদ্র বলিয়া জানিতেন। এখন শুনিতে পান দেশে ধনবৃদ্ধি হইতেছে. অনেক প্রকার রাহুও আসিয়া একত্র হইয়াছে ও তাহাদের লোভও ভয়ানক বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বে কড়িতেই অনেক কার্য্য লব্ধ হইত, কড়িতে বুড়োর বিয়ে হইত, কড়িতেই পাথর দগ্ধ মিলিত, কড়িতেই পরিণয় হইত, এখন স্বর্ণমুদ্রা, মেকেবের ঘড়ি ও গোরাকারিগরের নির্ম্মিত সোণার পেটেণ্ট চেন ভিন্ন কন্যাদায়গ্রস্তের বর ক্রয় করা দুষ্কর। তখন যে মুদ্রায় এক ভরি মকরধ্বজ পাওয়া যাইত, এখন সেই মূল্যে এক শিশি শোডা পাওয়া দুষ্কর। শুষ্কসময়ে তখন অর্দ্ধ মুদ্রায় এক বিঘায় ফসল রক্ষা পাইত। এখন শোণভদ্র, মহানদী প্রভৃতি বান্ধিয়া কি দুর্ভিক্ষ নিবারণ হইতেছে?

এখন হউক্ না হউক্ তখন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ব্যবস্থায় আমাদের গ্রহবৈগুণ্য খণ্ডন হইয়াছিল। কিন্তু যাহাদের অনেক অর্থ তাহাদের গ্রহও ভারী—আমাদের গ্রহদেব অল্পদানেই প্রফুল্ল হইলেন, নীলমণির গ্রহের পূজার আড়ম্বর বেশী হইল। আবার অন্তঃপুর হইতে শুভচণ্ডী পূজার আদেশপত্র বাহির হইল, এখন শ্রীমন্ত সওদাগরের সিংহলযাত্রা, ঢাকিয়া গেল। গজাননের গৃহদেবী সিংহবাহিনীর মন্দির বেলয়ারি সাজে সুসজ্জিত হইল, সম্মুখে একটা চন্দ্রাতপ উঠিল, চণ্ডীযাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল—মঙ্গলবার প্রাতে গ্রামের কুলকামিনীগণ কবরীবন্ধন করিতে লাগিলেন। সোণার অলঙ্কারের বাক্স বাহির করিলেন, চেলীর ফুলদার শাটী পরিধান করিতে লাগিলেন, সুসজ্জিতা প্রতিমা

পার্শ্বে লক্ষ্মী, সরস্বতীর ন্যায় সজ্জিতকলেবর মারলগামিনীগণ গজাননের চণ্ডীর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোন কোন যুবতী কেশবন্ধন করিতে সময় পান নাই; তাহাতে ক্ষতি নাই, স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতা প্রচুর মুক্তকেশীর বেশ কিছু মন্দ নহে, প্রাতঃসলিল-স্নাত চাঁচর অলকাগুচ্ছগুলি প্রাতঃসমীরণে মস্তকপার্শ্বে দুলিতেছে, এক একটি যুবতী স্তম্ভপার্শ্বে ঠেস দিয়া গণ্ডদেশে হস্ত রাখিয়া, চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দেখিতেছেন, কি দেখিতেছেন? একটী গৌরাঙ্গী এলোকেশী কিশোরী ব্রাহ্মণকন্যা নীলাম্বরী পরিধানে মন্দিরের সম্মুখে প্রাঙ্গণে বসিয়াছেন ও এক হস্তে শীলাতলে ভর দিয়া অন্য হস্ত তুলিকাসহ দুগ্ধরেখাতে আল্পনা আঁকিতেছেন। মধ্যদেশে একটি বড় শ্বেতপদ্ম, চারিপার্শ্বে গোল করিয়া আবও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প বা কলিকা, পাতা, লতা ও আরও দূরে কয়েকটি খঞ্জহংসের আকার আঁকিলেন। কোন কামিনী কহিতেছেন, "এরূপ আমরা শিখিলাম না, এর পবে কে আল্পনা দিবে?" একটী দোজবরের সোহাগী সুন্দরী কহিতেছেন, "ছাই! ও আবাব কি, কাবিকুরি যে শিখতে হবে।" তাহার নাক চোক নড়াতে অনেকে ক্ষান্ত হইলেন-- তাহাব প্রখরতায় কেহ বা ভীত হইলেন, কিন্তু বুনওলের উপর বাগা তেঁতুল আছে। বুড় সাহেবানী গোপিনী তাঁহার মুখে শ্বেত পাউডার ভস্ম প্রলেপ দেখিয়া কহিয়া উঠিল "সেকালে আমরা পিটালীর আল্‌পনা দিতাম, এখন সুন্দবীবা পিটালীর গুঁড় মুখে মেখে রং উজ্জ্বল কবেন। এইত এলোকেশী দিদির রং, ইনি ত পাউডর মাখেন নাই, আল্‌তা গুলে ঠোঁটে দেন নাই তবু কেন পদ্ম গোলাপ হেরে যায়? যাকে ভগবান্ রঙ্গ দিয়াছেন, তাকে কি রং মাখাতে হয়? এখন যুবতীরা সাবান আব পাউডর নিয়ে ব্যস্ত থাকবে না আল্‌পনা লিখতে শিখ্‌বে? অনেকের মুচকি মুচকি হাসি দেখিলাম, পাগলিনীর মত সাহেবানী কটা কথা কহিয়াই পালাইল। এদিকে আল্‌পনা লেখা সাঙ্গ হল, ঘটস্থাপনা হল, পূর্ণ ঘটে আম্রশাখা দেওয়া হল, তর্কালঙ্কার মহাশয় চসমা নাকে, পুথি ক্রোড়ে করিয়া উপস্থিত, একটি থামের পার্শ্বে আসনে বসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এক ঝারি জল আসিল, নীলমণির গর্ভধারিণীর প্রতিরূপা গজাননের গৃহিণী সেই জলে তর্কালঙ্কার মহায়ের পদপ্রক্ষালন করিয়া কেশদলে শ্রীচরণ মুছিয়া লইলেন। তর্কালঙ্কার পাঠক হইলেন, পুথি খুলিলেন, পুথিটী গৈরিক রঙ্গের বস্ত্রের উপর লেওয়ার বদ্ধ, তাহার উপর আবার প্রচুর চন্দন ছিটা বিকীর্ণ, সম্মান পুরঃসর তাহা সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিলেন, আবার উঠাইয়া লেওয়ার ও বস্ত্র খুলিলেন, পত্র মধ্য দিয়া একটী ছিদ্র পারাপার হইয়াছে, তন্মধ্য দিয়া একটী সূত্র চলিয়া গিয়াছে; পুস্তকটী বিস্তার করিয়া রাখিলেন, চসমাটি আবার নাসিকাগ্রে স্থাপিত হইল। যেরূপ মৌলবি সাহেবের চসমা স্বর্ণ পাশে আবৃত ইহা সেরূপ নহে, কেবল

আঁখিদ্বয়ের কাঁচ দুখানি বিশেষ বড় পিতলের পরিধিবেষ্টিত, একটি ধনুকাকার তারে নাকের উপরিস্থিত, সেই তার হইতে একটি সূত্র ভ্রূযুগলের কপালের শিরোদেশের মধ্যদেশ হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের শিক্কাতে আবদ্ধ। আচমন করিয়াই ভট্টাচার্য্য মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন। বুঝিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু সকলই সাধ্যাতীত বোধ হইল। একে সংস্কৃত তাহাতে দন্তহীন স্বরে বৃদ্ধ কণ্ঠের উচ্চারিত। এদিকে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে ললাটাংশ সুন্দর সিন্দুর বিন্দু শোভাময় শুভ চণ্ডীর এয়োতী সুন্দরীশ্রেণী দণ্ডায়মান। প্রদীপ জ্বলিতেছে, ধূপ ধূনার গন্ধে প্রাঙ্গণ আমোদিত, চন্দনফুলে পুষ্পপাত্র পরিপূরিত। অবশেষে দেবীর আসনের চতুষ্পার্শ্বে শুভ্র রাশি রাশি আতপ তণ্ডুল চূড় সুগোল সন্দেশ মুণ্ডিতে শোভিত, উপকরণ ফলের ছটাও সুরম্য। আজন্মকৃপণ গজাননের গৃহে অদ্য প্রচুর সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে ; নীলমণি তাঁহার একান্ত স্নেহের পদার্থ, তাহার শুভ সাধনেব জন্য কৃপণ হইলে নিজেরই অশুভ হইবার সম্ভাবনা। এই সুদৃশ্যস্থানে তর্কালঙ্কার মহাশয় পুস্তক পাঠসময়ে মনে করিতেছেন যে এ মিষ্টান্ন সকল আমারই নির্ব্বিরোধের ধন। সকলে স্থিবভাবে দণ্ডায়মান, অল্পসময়মধ্যে উপক্রমণিকা পরিচ্ছেদ অনর্গল পাঠে সমাপ্ত হইল। ভৈরব ভৃত্য কহিয়া উঠিল "হা, যাব বিয়ে তাব মনে নাই, নীলমণি বাবু কই ?" "এই ডে ডাড্ডি" বলিয়া মণি স্বয়ং গজানন চৌধুরীমহাশয়ের সমভিব্যাহারে আসিলেন। নীলমণি হরিদ্রারঙ্গের চেলির কাপড় পরিয়া উপস্থিত, দেখিতে অতি গৌরবর্ণ কিন্তু চুলগুলি কুচির ন্যায় একটি পৃথক্ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কপালটি প্রায় তিন আঙ্গুল প্রশস্ত, নাকটি আর একটু খান্দা হইলেই পাঁচ অঙ্কের রেখার ন্যায় মুখভঙ্গি প্রকাশ পাইত, শ্বেত চন্দন ফোঁটাতে প্রায় ক্ষুদ্র কপাল পরিপূরিত। শুভচণ্ডীর নাম শুনিয়া সত্বর দণ্ডবৎ হইলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "ঐ নৈবিড্ডের সন্দেশটী খাব ?" গজানন কহিলেন ক্ষেপা ছেলে, আবার প্রণাম কর ! নীলমণি আবার প্রণাম করিলেন। জটাধারী যাইয়া কাণে কাণে কহিলেন "স্থির হও পূজা শেষ হউক ।" নীলমণি নিবারণস্রোতে বদ্ধ হইলেন। এখন তর্কালঙ্কার পৃথগাসনে ঘটপার্শ্বে আসিয়া বসিলেন, পূজা একদণ্ডে সমাপ্ত হইল। এলোকেশী দিদি চণ্ডীর কথা কহিবে, তাহার সঙ্গে বরণ ডালা হস্তে এয়োতিগণ চলিল। প্রাঙ্গণপার্শ্বে বাদ্য বাজিয়া উঠিল। শীতু ক্ষেপা নীলমণির নামসম্বলিত একটি আশীর্ব্বাদসূচক গীত গাইতে গাইতে নাচিতে লাগিল। তর্কালঙ্কার মহাশয় চণ্ডী পুস্তকের পরিশিষ্ট মাঠে আবার উপবিষ্ট। পৃথক্ প্রাঙ্গণে বাজনা বাজিতেছে, চারিদিকে গোলযোগ বৃদ্ধি হইতেছে, তর্কালঙ্কার মহাশয় অনন্যমনে চণ্ডী পাঠ করিতেছেন, নৈবেদ্য চূড় হইতে মণ্ডাগুলি ক্রমে ক্রমে বেমালুম অন্তর্হিত হইতেছে, বালক বৃদ্ধের ঘন

ঘন আগমনে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সন্দেহ উত্তেজিত হইল, শেষে একবার দখিলেন নাচিতে নাচিতে একটী ক্ষুদ্র হস্তে একটী মণ্ডা চূড় উত্তোলিত হইল। যোগাসন ত্যাগ করিলে পাঠভ্রষ্ঠ হয়, প্রাঙ্গণে শিশুর আগমনে দুই হাত উঠাইয়া হু! হু! করিয়া তাড়াইয়া দেন, ইহারা অবলীলাক্রমে মণ্ডা উঠাইয়া প্রস্থান করে। অবশেষে অত্যন্ত বিভ্রাট্ দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয় পাঠ সংক্ষিপ্ত করিয়া হইলেন। এদিকে শীতু খুড় স্তুতি করিয়া দেবীকে প্রণাম করিলেন যে "কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামুণ মরে, কোথা ছেলে, কেবা বাপ কোথা এসে ছাড়ে হাঁপ, কার বা কণ্যে, কেবা বর, বামুণ যবন একাকার, সুন্দরী তোর কি বাহার সাড়ী না ঘাগরী পর, কৃষ্ণ না খোদারে ডর!! যাব জেলার আদালতে জীতিব বাজি পাঁপরেতে, পেয়ে বৃত্তি সুন্দরী যেন চণ্ডীগাঁয় ফিরি।"

১

ছুটিছে অশনি মেঘের গায়,
কে ধরিবি তোরা আয়রে আয়,
মরত ত্যজিয়া, গগনে উঠিয়া,
জলদে মিশিয়া হাসিয়া সুখে,
বসি ঘনাসনে, ঘন গরজনে,
কে ধরিবি আয় অশনি বুকে ?

২

জ্বলন্ত পাবকাসনে,
দেখে, ভয় কি পেয়েছ মনে,
হৃদয়ে জ্বালাবি দ্বিগুণ অনল,
ধক্ ধক্ তার জ্বলিবে শিখা,
"অদম্য উদ্যম" উৎসাহ প্রবল,
অনন্ত অক্ষরে রহিবে লেখা।
জ্বালাবি অনল, অনন্ত প্রবল,
মুহূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ড করিতে লয়।
(সে তেজ স'বেনা অশনির তেজ)
তবে আর তোর কিসের ভয়।

৩

এই ত দধীচি হাড় ?
তুলনা নাহি কি তার ?
হৃদয় ভাঙিয়া দেখা না জগতে
এমন নাহি কি আর ?
দেখারে জগতে দেখুক জগৎ,
এ জগতে নাই তুলনা যার,
জলন্ত পাবক উগরে সঘনে,
প্রতি পঞ্জরায় দধীচি-হাড়।

৪

এ মাটীর দেহ ক্ষণে,
না হয় মিশিবে মাটির সনে।
এ মাটী যখন মাটীতে মিশিবে,
বিফলে মিশিবে কেনে ?
লও বজ্র তুমি আসুক ছুটিয়া,
জ্বলন্ত পাবকে ব্রহ্মাণ্ড পুড়িয়া,
লও বজ্র তুমি বক্ষ বিস্তারিয়া,
কি ভয় তোমার মনে ?
এ মাটী যখন মাটীতে মিশাবে,
বিফলে মিশাবে কেনে ?

৫

চিরস্থায়ী কিছু নয়,
মাটীর শরীর মাটীতে মিশাবে,
কেন রে করিবি ভয় ?
আসুক্ অশনি ভীম গরজনে
কাঁপুক মেদিনী টল টল টল
ভাঙুক সদর্পে মহীধরগণে
সে দর্পে বসুধা যাক্ রসাতল—
এ বক্ষ পাতিয়া, লইবি সে বজ্র
সে দর্প হইবে ক্ষয়
না হয়, মাটীর শরীর মাটীতে মিশাবে
কেন রে করিবি ভয় ?

৬

জীবনে বিশ্বাস কিবা ?
কে বলিতে পারে তোমার জীবনে,
আবার ফিরিবে দিবা ?
এই অমাবস্যা গাঢ় অন্ধকারে
গর্জ্জিছে অশনি ভৈরব হুঙ্কারে
ভ্রমিছে মস্তকে কাল সর্পাকারে
সংহার এ তেজ তবে ;
লও বক্ষ পাতি তোমার অস্থিতে
শত শত বজ্র হবে।

৭

করো না আশঙ্কা তবে
দেখ, সাহসে বিজয় ভবে,
এক ধ্যানে যেই করেছে সাধনা
অসিদ্ধ হয়েছে কবে ?
লও বজ্র তবে পাতি বক্ষস্থল,
ভীম ভুজবলে ভাঙ্গ হিমাচল,
তৃণ হেন জ্ঞানে উপাড়ি ভূধর
হেলায় মথিয়ে অনন্ত সাগর
কাঁপাও সঘনে ব্রহ্মাণ্ড ভৈরবে,
সভয়ে এ বিশ্ব রহুক নীরবে,
কাঁপিয়া উঠুক জলধিজল,
কাঁপুক অনন্ত পাতাল তল,
লও বজ্র তুমি আঁকুক ছুটিয়া
জলন্ত পাবকে ব্রহ্মাণ্ড পুড়িয়া,
লও বজ্র তুমি বক্ষ বিস্তারিয়া,
কি ভয় তোমার মনে ?
এ মাটী যখন মাটীতে মিশাবে
বিফলে মিশাবে কেনে ?

৮

ওই শিখা দেখে করিও না ভয়,
দেবতা তোমারে দিতেছে অভয়,
পতঙ্গ যেমন পড়ে রে অনলে
ওই বজ্রানলে পড় কুতূহলে,
দৃঢ় বক্ষে তারে ভাঙ্গি কর গুঁড়া
সে বজ্র যেমতি ভাঙ্গে গিরি-চূড়া,
মহাসুখে মুখে গাওরে "জয়"।
আসুক অশনি ভীম গরজনে,
কাঁপুক মেদিনী টল টল টল
ভাঙ্গুক্ সদর্পে মহীধরগণে,
সে দর্পে বসুধা যাক্ রসাতল,
এ বক্ষ পাতিয়া লও রে সে বজ্র,
সে দর্প হউক ক্ষয়।
না হয়, মাটীর শরীর মাটীতে মিশাবে
কেন রে করিবি ভয় ?

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

৩

রাজ-অনুগৃহীত ব্যক্তির মধ্যে এক জনের নাম পীতাম্বর ছিল, লোকে তাহাকে পিতম পাগ্‌লা বলিত। পীতাম্বরের কোথা জন্ম, সে কাহার সন্তান, তাহা কেহ জানে না। প্রবাদ ছিল যে, যখন চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম তখন পিতম ছেলেধরার ভয়ে পলাইয়া শান্তিশত গ্রামে আসিয়া আশ্রয় লয়। "কে পিতা ছিল?" জিজ্ঞাসা করিলে পিতম নতমুখে মাথা নাড়িয়া বলিত, "জানি না," "কে মাতা ছিল?" জিজ্ঞাসা করিলে গম্ভীর ভাবে রাজার একটি বড় হাতী দেখাইয়া দিত।

পিতম প্রায় সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকিত। পথে বালকদের খেলিতে দেখিলে আর সেরূপ থাকিত না। তখন পিতম অনবরত কথা কহিত, অন্যকে না পাইলে একাই কথা কহিত, কখন কখন গীত পর্য্যন্ত গাইত। লোকে বলিত, পিতমের গীতগুলি অতি আশ্চর্য্য। কিন্তু গাইতে বলিলে পিতম বড় গোলে পড়িত, একটি গীতও আর তাহার স্মরণ হইত না।

প্রথম অবস্থায় পিতমের স্মরণশক্তি একেবারে ছিল না। লোকে যে তাহাকে পাগল ভাবিত, তাহার এই এক বিশেষ কারণ ছিল। ভাষা স্মরণ হইত না বলিয়া অনেক সময় পিতম কথার উত্তর পর্য্যন্ত দিতে পারিত না। লোকে ভাবিত পাগল, এই জন্য উত্তর দিল না। আবার, কথা কহিলে এক শব্দের পরিবর্ত্তে অন্য শব্দ মুখে আসিত। পিতম মনে করিত, প্রকৃত শব্দ ব্যবহার করিতেছি, কিন্তু লোকে হাসিত দেখিয়া পিতম আশ্চার্য্যান্বিত হইত। পিপাসা পাইয়াছে, পিতম বলিবে "জল খাব" কিন্তু জল শব্দের পরিবর্ত্তে "হাতী" শব্দ মুখে আসিল, পিতম বলিল, "হাতী খাব।" লোকে হাসিয়া উঠিল। জলের পরিবর্ত্তে হাতী খাইতে চাহিয়াছে ইহা পিতম কোন মতে জানিতে পারিত না; পুনঃ পুনঃ সেই ভুল করিত। লোকে জিজ্ঞাসা করিত, "কি খাবে?" পিতম আবার বলিত "হাতী খাব," লোকে আবার হাসিত; আবার জিজ্ঞাসা করিত, আবার হাসিত।

সাধারণে পিতমের প্রকৃত অবস্থা জানিত না। পিতমের স্মরণশক্তি নাই, তাহারা ভাবিত পিতমের জ্ঞান নাই। পিতম ভুলিত, লোকেরাও ভুলিত। পিতমের ভুলে লোকের রহস্য বাড়িত, লোকের ভুলে পিতমের রাগ বাড়িত। পাগলের রাগ বাড়িলে লোকেব আহ্লাদ বাড়ে। দুর্ভাগ্য পিতম জ্বালাতন হইয়া মধ্যে মধ্যে স্থানত্যাগ করিত। কিন্তু কিছু দিন পরে আবার ফিরিয়া আসিত। এ সকল প্রথম অবস্থার কথা।

একদিন অপরাহ্ণে রাজা ইন্দ্রভূপ কয়েকজন অমাত্য সমভিব্যাহারে পশু-শালা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। পক্ষীদের কলহ শুনিতেছেন, বানরকে কদলী দিতেছেন, ভল্লুককে তিরস্কার করিতেছেন, বনমানুষকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ব্যাঘ্রকে বনের সংবাদ দিতেছেন, এমত সময় একজন পশ্চাৎ হইতে বলিল, "বন অপেক্ষা আপনার এ গৃহ ভাল, আমি গৃহস্থ হইব, আর বনে বনে বেড়াইতে পারি না, এই গৃহে আমায় স্থানদান করুন, আমি বাস করি।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এ ব্যক্তি?" একজন সঙ্গী বলিল, "পিতম পাগ্‌লা।" রাজা কখন পিতমকে দেখেন নাই, দেখিবামাত্র তাঁহার দয়া হইল। পিতমের অঙ্গে বহুতর বেত্রাঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। কোন কোনটী রক্তোন্মুখ। রাজা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ চিহ্ন কিরূপে হইল?" পিতম চিহ্নগুলি একবার দেখিল, হাসিল, কোন উত্তর করিল না। রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতম বলিল, "মহারাজ, যে দিনে আমি পেটে না খাই সেই দিন পিটে খাই।" সকলে হাসিয়া উঠিল। রাজা গম্ভীর হইলেন, বলিলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম না। স্পষ্ট করিয়া বল।" পিতম বলিল, "পেট আমার, পিট পরের। হাতীরও তাই, ঘোড়ারও তাই, গরুরও তাই, গাধারও তাই, পেট আপনার পিট পরের। না, না, ঠিক তা নয়, ভুলেছি। আমার সঙ্গে একটু প্রভেদ আছে। গরু আর মানুষ সমান নয়। গরুকে যে আহার দেয়, সেই তার পিট দখল করে। আমায় যে কখন আহার দেয় না, সেই আমার পিট দখল করে, যে আহার দেয় সে আদর করে। এই প্রভেদ, বুঝেছেন? এখন আমি গৃহস্থ হব।"

রামসেবক নামে একজন ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "গৃহস্থ হইতে গেলে বিবাহ করা চাই, এক্ষণে ত বিবাহ করিতে হয়।"

পিতম। বিবাহ আমি অনেক দিন হইল করিয়াছি।

রাজা। কোথায় বিবাহ করিয়াছ, কে তোমার স্ত্রী।

পিতম। জগন্নাথক্ষেত্রে বিবাহ করিয়াছি। তথায় গিয়া এক আশ্চর্য্য সুন্দরী দেখি। পৃথিবীর সকলের অপেক্ষা সুন্দরী। সমুদ্রের তুলনা নাই। আমি থাকিতে না পারিয়া বিবাহ করে ফেলি।

রাজা। সমুদ্র কি বড় সুন্দরী ?

পিতম। চমৎকার সুন্দরী! রামধনুকে শ্যামাঙ্গীর কটীবন্ধন। এই জন্য তাহার যে বাহার তা আর কি বলিব। সুন্দরী অনবরত হেলিতেছে দুলিতেছে আর খিলখিল করিয়া হাসিতেছে।

রাজা। কিন্তু তোমার স্ত্রীর কুল নাই।

পিতম। কুল না থাক, কিন্তু বড় ঘরের মেয়ে। যে তার কাছে স্থান পায়, সেই বড় হয়। দেখুন, চন্দ্র সূর্য্য এখানে ক্ষুদ্র, কিন্তু যখন আমার স্ত্রীর পার্শ্বে উদয় হয়, তখন আর এক মূর্ত্তি, তখন সূর্য্য কত প্রকাণ্ড, কত মহৎ, কত সুন্দর দেখায়, সে সকল কিছুই সূর্য্যের গুণ নহে, সকলই আমার সুন্দরীর গুণ। আহা, তাহার কত রূপ, সে কত নির্ম্মল, কত গম্ভীর, তাহার কি দয়া, কি স্নেহ, সকলকে বুকে করে বহিতেছে।

রাজা। তোমার স্ত্রীকে ফেলে কেন এলে ?

পিতম। সে অনেক কথা। আমি তার রূপে ভুলিলাম, একে একে আমার সর্ব্বস্ব দিলাম, আমার হুঁকা কলিকাটি পর্য্যন্ত তাবে দিলাম। কত আদর করিলাম, কত কথা কহিলাম। প্রেমোন্মত্ত হইয়া শেষে এক দিন ঝাঁপ দিলাম, কিন্তু সে আমায় নিলে না। যতবার আমি তার অঙ্গে পড়িলাম ততবার সে আমায় ছুঁড়ে বালিতে ফেলিয়া দিল। আর আমি কত সহ্য করি বল। আমি উঠে গালি দিলাম, ঝগড়া কবিয়া চলিয়া আসিলাম। সে অতি পাজি, স্বার্থপর; কেবল লোকের সর্ব্বস্ব লবে আর লুকাইয়া রাখিবে। রত্ন বল, পলা বল, আপনি এক-দিনও পরিবে না। তবে লোকের সর্ব্বস্ব লয় কেন ? তোমাদের স্ত্রীর হাতে পার আছে কিন্তু এর কাছে আর পার নাই। বাঙ্গালির মেয়ে বড় জোর ঘর ভাঙ্গে, এ পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গে। আর অন্তরের ভিতর তাহার যে কি আছে তাহা কে বলিতে পারে। উপরে হাসিতেছেন, খিল খিল করে হাসিতেছেন কিন্তু তাহার ভিতরে যাহা আছে তাহা আমিই জানি। তাই একবার একবার দয়া হয়, বলি আমি যদি কাছে থাকিতাম, তাহা হইলে হয় ত এত যন্ত্রণা তার হত না। হাজার হউক আমি পুরুষ।

এক জন পারিষদ এই সময় পিতমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে রাগ করিয়া আসিলে সমুদ্র তোমায় সাধিল না।"

পিতম। না, তবে যখন আমি একান্ত ফিরিলাম না দেখিল, তখন হা হুতাস করিতে লাগিল, আমি কত দূর পর্য্যন্ত তাহা শুনিতে শুনিতে আসিলাম। লোকে বলে বিরহযন্ত্রণায় সমুদ্র অদ্যাপি হু হু করিতেছে।

পারিষদ। আবার ফিরে যাও।

পিতম। আর না। আমার আর যাইবার শক্তি নাই, বুড়া হইয়াছি, আমি এইখানে এই বাঘের পাশের ঘরে থাকিব। মহারাজের অনুমতি হইলেই হয়।

রাজা। না, আমার অতিথিশালায় চল, তথায় তোমার বন্দোবস্ত করিয়া দিব, সকলে যত্ন করিবে। কোন কষ্ট হবে না।

পিতম। অতিথিশালা দরিদ্রের নিমিত্ত, আমি সেখানে যাইব না। আমায় এইখানে স্থান দিন, ব্যাঘ্র সিংহের সঙ্গে থাকিলে আমার সম্মান বাড়িবে। আর কেহ তাড়না করিবে না।

রাজা। সম্মান চাও, তবে আমার সঙ্গে আইস, যাহাতে লোকে তোমাকে সম্মান করে, তাহা আমি করিব। এখানে তুমি স্থান পাইবে না।

পিতম অমনি রাজার পাদমূলে পড়িল, মিনতি করিয়া ব্যাঘ্রের পার্শ্বে স্থান লইল।

পশুশালা হইতে রাজা ইন্দ্রভূপ বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাগলটির নাম কি ভুলিয়া গিয়াছি।" পারিষদ রামসেবক চূড়ামণি উত্তর করিলেন, "পীতাম্বর।" রাজা অন্যমনস্কে কতক দূর গিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গীদিগের প্রতি চাহিয়া কিঞ্চিৎ পরে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য পাগল!" সকলেই একবাক্যে বলিলেন "আজ্ঞা হাঁ।" কেবল চূড়াধন বাবু কোন কথাই বলিলেন না। রাজা আবার কতকদূর যাইতে যাইতে দাঁড়াইলেন। সঙ্গিগণের দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন, "যে এত স্থান থাকিতে বাঘের পার্শ্বে বাস করিতে চাহে তাহার অপেক্ষা পাগল কে?" এই সময় একজন পশ্চাৎ হইতে বলিল, "পিতম একা নহে, মহারাজও বাঘ ভালবাসেন। দেখুন আপনার লাঠির মাথায় কার মুখ? বাঘের।" ইন্দ্রভূপ আগন্তুকের প্রতি না চাহিয়া প্রথমে লাঠির প্রতি চাহিলেন। তাহার পর আগন্তুক বলিতে লাগিল, "মহারাজ! মুখখানি সোণার। বাঘ আপনার নিকট সোণামুখী।"

সকলেই ফিরিয়া দেখিল, পিতম পাগলা আসিয়াছে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আবার কি? তুমি পলাইয়া আসিলে যে?"

পিতম বলিল, "আমি পলাই নাই, তাড়িত হইয়াছি। রক্ষকেরা আমার নিকট পয়সা চাহিল। আমি বাঘের মত তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া আঁচড় কামড় দিলাম, তাহারা আমাকে মেরে তাড়াইয়া দিল।"

রাজা। বল দেখি তুমি কি সত্যই পাগল ?

পিতম। হাঁ আমি পাগল, আমি পিতম পাগল।

রাজা। তুমি জান কাহাকে পাগল বলে।

পিতম। জানি—আমাকে বলে।

রাজা। পাগলের অর্থ কি।

পিতম। অর্থ পিতম—অর্থাৎ আমি।

রামসেবক। পশুশালায় আর যাইবে না ?

পিতম। না ওখানে মারে।

রাজা ফিরিলেন। পশুশালায় যাইয়া দুই তিন জন রক্ষককে পদচ্যুত করিলেন, তত্ত্বাবধারককে বিশেষ ভৎর্সনা করিলেন। পিতম সন্তুষ্ট হইয়া আবার পিঞ্জরে প্রবেশ করিল।

৪

এই সময়ে সকলেই মনে মনে পিতম পাগলের কথা অনুশীলন করিতে-ছিলেন। চূড়াধন বাবু ভাবিতেছিলেন যে, পিতম নির্ব্বোধ নহে, সময় বুঝিয়া কার্য্য করিয়াছে। পিতম ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষ ভাল সদুপায় করিয়াছে। আশ্রয় ও আহার ভিন্ন পাগলের আর কি প্রয়োজন হইতে পারে ? যে আপনার প্রয়োজন সাধন করিতে পাবে তাহারে পাগল কেন বলি ? সে নির্ব্বোধ কিসে ? পিতম আমার অপেক্ষা বুদ্ধিমান ; আমি এ পর্য্যন্ত আপনার কার্য্য সাধন করিতে পারি নাই। পাগল হইয়াও পিতম আপনার কাজ হাঁসিল করিল। আমার নিজের ঔদাস্যে আমি সকল হারাইতেছি।

রামসেবক ভট্টাচার্য্য ভাবিতেছিলেন, পিতম কি উন্মাদ ! এত স্থান থাকিতে বাঘের পার্শ্বে বাস করিতে গেল। মহারাজ অথিতিশালায় স্থান দিতে চাহিলেন, আপনার নিকট রাখিতে চাহিলেন, তাহা ভাল লাগিল না। যে মনে করে আমি সমুদ্রকে বিবাহ করিয়াছি সে এরূপ করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

দ্বারবান্ রামদীন দোবে ভাবিতেছিল পাগল কি আহার করিবে ? রোটি বা ভাত তাহাকে কেহ দিবে না ; আহারের বন্দোবস্ত রাজা ত কিছু করিয়া দিলেন না। বোধ হয় পাগলা চানা খাবে, তাহা মন্দ কি ? ভোরপেট যদি চানা পাওয়া যায় আর তাহার সঙ্গে দুই চারি সের দুগ্ধ দেয় তবে আমিও নকরি ছাড়িয়া ওখানে থাকিতে পারি।

রাজা ইন্দ্রভূপও পিতম পাগলার কথা ভাবিতেছিলেন। পিতম সম্বন্ধে তাঁহার কি ঈষৎ মনে আসিতেছিল, অথচ আসিল না। মনের একাংশে যেন

পিতমের ছায়া রহিয়াছে, তাহা দেখিতে গেলেই মিলিয়া যায়। রাজা ভাবিলেন, “পিতম কে? আর কি কখন দেখিয়াছি? কবে দেখিয়াছি? বাল্যকালে না যৌবন কালে? আমি কত লোক দেখিয়াছি তাহাদের দেখিলে এরূপ স্মরণ করিবার ত আকাঙ্ক্ষা হয় না; স্মরণ না হইলে এরূপ ত যন্ত্রণা হয় না। পিতম, পীতাম্বর! ইহার আর কি কোন নাম ছিল? কি নাম ছিল? কে এ ব্যক্তি? সত্যই কি পাগল? পিতমের কথাবার্ত্তা অসঙ্গত, কিন্তু অসংলগ্ন নহে। পাগলের কথা এরূপ হয় না। পিতমের জ্ঞান আছ, বোধ হয় পিতম পাগল নহে।

জ্ঞান থাকিলে যে পাগল বলা যায় না এমত নহে। বরং অনেক সময় পাগল শব্দে কতকাংশে জ্ঞানসম্পন্ন বুঝায়। মাধু ভিক্ষা করে, পাক করে, আহার করে, ভয় করে, অথচ মাধুকে লোকে পাগল বলে। যে ভয় করে তাহার পরিণাম বোধ আছে, সে একেবারে জ্ঞানশূন্য নহে। অভয় পুষ্পচয়ন করে, পূজা করে, সতরঞ্চি খেলে, অথচ তাহাকে লোকে পাগল বলে। নিতাই খাজনা আদায় করে, দেনা পাওনা হিসাব করে, তর্ক করে অথচ লোকে তাহাকে পাগল বলে। ইহাদের সকলেরই কিছু কিছু জ্ঞান আছে, তবে কেন লোকে পাগল বলে।

সাধারণতঃ সকল বিষয়ে কোন ব্যক্তির যে পরিমাণে জ্ঞান দেখা যায়, কোন কোন বিষয়ে সেই পরিমাণে জ্ঞান না দেখিতে পাইলে লোকে হয় ত পাগল বলে। অর্থাৎ জ্ঞানের সামঞ্জস্য না দেখিলে লোকে পাগল বলে। অন্ততঃ সকলে না বলুক কেহ কেহ বলে।

বালকে উলঙ্গ থাকে কেহ তাহাকে পাগল বলে না, অন্যান্য বিষয়ে বালকের যেরূপ জ্ঞান, এবিষয়েও তাহার সেইরূপ জ্ঞান, কাজেই, কেহ তাহাকে পাগল বলে না। ইতর লোকে চুন কালি মাখিয়া পর্ব্ব উপলক্ষে নৃত্য করে, কেহ তাহাকে পাগল বলে না, অন্য বিষয়ে তাহার যেরূপ বুদ্ধি, এ বিষয়েও তাহার সেইরূপ বুদ্ধি। কিন্তু একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি চুন কালি মাখিয়া পথে নৃত্য করেন, কে না তাঁহাকে পাগল বলিবে? অন্যান্য দিকে যেরূপ বোধাবোধ এ দিকে তাহার অন্যথা হইয়াছে লোকে বলিবে। অর্থাৎ জ্ঞানের আর পূর্ব্বমত সামঞ্জস্য নাই বলিবে। অভয় পাগল, সতরঞ্চি খেলে, সাংসারিক সকল কার্য্য করে, কিন্তু “জল পাব কোথায়” এই কথা কেহ তাহার শ্রুতিগোচর করিলেই সে গালি দিয়া উঠে আর চীৎকার করিতে থাকে। সতরঞ্চি ক্রীড়ায় বা সাংসারিক বিষয়ে তাহার জ্ঞানের যে পরিচয় পাওয়া যায়, এস্থলে তাহার জ্ঞানের সে পরিচয় পাওয়া যায় না। কাজেই তাহার জ্ঞানসম্বন্ধে সামঞ্জস্য নাই বলিয়া লোকে তাহাকে পাগল বলে।

কিন্তু জ্ঞানের সামঞ্জস্য অতি অল্প লেকের মধ্যে আছে। পূর্ব্বে কখন তাহা ছিল কি না সন্দেহ ; এখনও বড় নাই। প্রথম অবস্থায় হয় ত অসম্ভব ছিল। এখন, কতক সম্ভব হইয়াছে। এই সামঞ্জস্যের এক নাম উন্নতি।

দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে একেবারে জ্ঞানের সামঞ্জস্য ছিল না। কাজেই তাৎকালিক সেই অসামঞ্জস্য কেহ আপনাদের মধ্যে জানিতে পারিত না। কেহ কাহাকেও পাগল বলিত না। "পাগল" নূতন গালি। সামঞ্জস্যের পরে আরম্ভ হইয়াছে। সেই আদিমকালে এতই গুরুতর অসামঞ্জস্য ছিল যে এক্ষণে আমরা সেই সময়ের লোক দেখিলে তাহাকে পাগল ভাবিবার সম্ভাবনা। অন্ততঃ আশ্চর্য্য হইবার সম্ভাবনা।

এই বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে জ্ঞানের যেরূপ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। যে ব্যক্তিরা বাষ্পীয়যন্ত্র গঠন করিতেছে, চন্দ্র সূর্য্যের গতি গণনা করিতেছে, বাষ্প হইতে জলের সৃষ্টি করিতেছে, তাহারাই হয় ত বৃষ্টির নিমিত্ত দৈবচেষ্টা করিতেছে। মড়ক নিবারণ করিতে হইবে, তাহারাই হয় ত বলিবে "চল, ধর্ম্মমন্দিরে চল, বা অন্য আড্‌ডায় চল, প্রার্থনা গাই গিয়া, মড়ক অবশ্য নিবাবণ হইবে।" বুদ্ধির এইরূপ বৈষম্য দেখিলে কেহ এক্ষণে অসঙ্গত বিবেচনা করে না, কিন্তু পবে করিবে, হয় ত তখন এরূপ বুদ্ধিমান্‌কে লোকে পাগল বলিবে।

এরূপ অর্থে, পাগল এক্ষণে আমরা সকলেই। বুদ্ধির বৈষম্য বা জ্ঞানের অসামঞ্জস্য সকলেরই আছে। কিন্তু কেহ কাহাকে পাগল বলি না। পাগল রূঢ় কথা। তবে নির্ব্বোধ বলি, স্বার্থপর বলি, দাম্ভিক বলি, কৃপণ বলি, নিষ্ঠুর বলি, হিংস্র বলি। একই কথা। সকল গুলিই বুদ্ধির বিকৃতিবাচক, পাগলের পরিচায়ক। পাগলের সম্পূর্ণ নামকরণ অদ্যাপি বাকি আছে।

পিতম—পাগল, কিন্তু নিজে তাহা জানে না। বুদ্ধিতে অন্য লোক যে প্রকার, আপনিও সেই প্রকার এই পিতমের বিশ্বাস ; কোন অংশে যে ব্যতিক্রম আছে, তাহা পিতম বুঝিতে পারে না। কিন্তু পিতমের বোধ আছে যে পাগল শব্দ তাহার নামের অংশ, এই জন্য লোকে তাহাকে পাগলা বলিয়া ডাকে।

পশুশালায় লৌহপিঞ্জরে স্থান পাইয়া পিতম শয়ন করিল, শয়ন অনেক সময় তৃপ্তিবাচক।

ইন্দ্রভূপ দেখিলেন যে, পিতম আর তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিল না। রাজা হাসিলেন, পিতমও হাসিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদিগকে আর তোমার মনে থাকিবে ?"

পিতম। আজ মহারাজের পশুশালা সম্পূর্ণ হইল। ঝাঁকিয়া উঠিল।

রাজা। কেন ? তোমার নিমিত্ত ?

পিতম। আমারই নিমিত্ত, আমি মানুষপশু, এক প্রকার নরসিংহ, নৃসিংহ দেব। সে রাজা নৃসিংহকে গারদে পাঠাইতে পারেন নাই আপনি পারিলেন। আপনার জয়। মহারাজ কি জয়। এ অবতারে আমি বড় সুখী। ভক্তকে রক্ষা করিতে হয় না। ভক্তরাই আমায় রক্ষা করে। বরং বৃণু। রাজা বর লও। তথাস্তু। এখন ঘরে যাও। আমি নিদ্রা যাই।

রাজা। নৃসিংহ দেব ! তোমার প্রহ্লাদ কই ?

পিতম। তুমিই আমার প্রহ্লাদ, তুমিই আমার ভক্ত, তুমিই আমাব সর্ব্বস্ব।

রাজা। আর তোমার রাজা হিরণ্যকশ্যপ কই ?

পিতম। চূড়াধন বাবুকে দেখাইয়া ঐ আমার হিরণ্যকশ্যপ।

রাজা। চূড়াধন ত রাজা নহে।

পিতম। শীঘ্র হবেন।

হঠাৎ রাজা ও চূড়াধন উভয়েই শিহরিয়া উঠিলেন। কেমন একটা ভয়ে বাজার হৃৎকম্প হইল কিন্তু তৎক্ষণাৎ গেল। একবার তাঁহার মনে হইল পাগল কেন অশুভ কথা হঠাৎ মুখে আনিল। পরক্ষণেই মনে হইল পাগলের কথা মাত্র। আমার সন্তান থাকিতে চূড়াধন কেন রাজা হইবে ? চূড়াধনের মঙ্গল হউক, আমার সোণার চাঁদও চিরজীবি হউক।

চূড়াধন বাবুর চাঞ্চল্য কেহ দেখিতে পাইল না। তাঁহার নয়ন চকিতের ন্যায় বিস্ফারিত হইয়া আবার তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বমত ক্ষুদ্র হইয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল।

৫

পশুশালা হইতে বহির্গত হইয়া রাজা ইন্দ্রভূপ অন্যমনস্কে অতিথিশালার দিকে চলিলেন। প্রথমে দুইজন ভোজপুরী পালোয়ান বুক ফুলাইয়া মাথা হেলাইয়া ঢাল তরওয়াল লইয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের প্রায় বিংশতিহস্ত ব্যবধানে রাজা স্বয়ং, তাঁহার পশ্চাতে দ্বাদশ জন অধ্যাপক, রাজপুরোহিত এবং চূড়াধন বাবু। তৎপরে রাজচিকিৎসক, জাতিতে বৈদ্য ; পরে খাজনাখানার এক-জন মুহরি, জাতিতে কায়স্থ ; তৎপরে একজন আচার্য্য ডম্বুরাকৃতি ঘটিকাযন্ত্র দুই হস্তে ধরিয়া একাগ্রচিত্তে বালুকাক্ষরণ নিরীক্ষণ করিতে করিতে যাইতে লাগিল। আচার্য্যের পশ্চাতে পরিচারকগণ, কাহার হস্তে ব্যজন, কাহার হস্তে ক্ষুদ্র ছত্র,

কাহার হস্তে পিকদানি, কাহারও হস্তে পাণের বাটা। সর্ব্ব পশ্চাতে একখানি সুন্দর শিবিকা, বাহকস্কন্ধে হেলিতেছে দুলিতেছে। আর তাহার দুই পার্শ্বে চারি পাঁচ জন রক্ষক লাঠি শড়কি লইয়া শূন্য শিবিকা রক্ষা করিতে করিতে চলিতেছে।

রাজার বেশ ভূষা অতি সামান্য; মণি মুক্তা নাই, জরি জব্বড় নাই, সামান্য অধ্যাপকের ন্যায় একখানি পট্টবস্ত্র ত্রিকচ্ছ করিয়া পরিধান; গলায় উত্তরীয়, পদদ্বয়ে ভূর্জ্জিপত্রের পাদুকা, হস্তে একটি যষ্টি। এক্ষণকার ব্যবহার দেখিয়া বিচার করিলে দণ্ডটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইবে—অন্যূন অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণে দীর্ঘ অনুভব হইবে। রাজার লাঠি বলিয়া যে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, এমত নহে। ভদ্র-লোক মাত্রের যষ্টি এইরূপ দীর্ঘ হইত। তৎকালের চৌকিদারের লাঠি মস্তক পরিমাণ হইত। বাহকের লাঠি স্কন্ধপরিমাণ হইত। ভদ্রলোকের যষ্টি প্রায় বক্ষপরিমাণ হইত।

রাজা দণ্ডটি মুষ্টিবদ্ধকরে—ধরিয়া চলিতেছিলেন; তৎকালের প্রথাই এইরূপ ছিল। সকল দ্রব্যই মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিতে হইত, মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কার্য্য করিতে হইত। তৎকালে অঙ্গুলির ব্যবহার বড় প্রচলিত হয় নাই। কারণ শিল্প জন্মে নাই। শিল্পের পূর্ব্বে কৃষী অবস্থায় সমাজের সকল কার্য্য মুষ্টিতেই চলে, অঙ্গুলির প্রয়োজন বড় অধিক হয় না। ভূমিখনন হইতে ঘণ্টাবাদন পর্য্যন্ত সকলই মুষ্টির কার্য্য। প্রহার মুষ্টি দ্বারা, ভিক্ষাদান মুষ্টি দ্বারা, লেখা (মুট কলম) মুষ্টি দ্বারা কাজেই যষ্টি ধারণও মুষ্টি দ্বারা।

রাজা ইন্দ্রভূপ গৌরাঙ্গ পুরুষ, দীর্ঘ ঈষৎ স্থূলকায়। চাহিবামাত্রই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নাসার প্রতি দৃষ্টি পড়ে। নাসা বিশেষ উন্নত নহে কিন্তু দীর্ঘ, ক্রমে উন্নত হয় নাই, ভ্রূযুগ হইতে একই ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। ভ্রূ যুগ্ম। অঙ্গে কোথাও চন্দন নাই কিন্তু অনবরত সেই সদগন্ধ। বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর।

রাজা অতি মৃদুপাদবিক্ষেপে চলিতেছেন, দুই একবার মস্তক নাড়িতেছেন, আপনার মনের সঙ্গে আপনি কথা কহিতেছেন। রাজপথ দিয়া যে চলিতেছেন তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। এইরূপ কিয়দ্দূর গিয়া একস্থলে দাঁড়াইলেন। চারিদিকে নগরবাসীরা তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে। রাজা তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্রহাচার্য্য কই?" গ্রহাচার্য্য অগ্রসর হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "এক্ষণে কি যোগ?"

গ্রহাচার্য্য। ব্যতীপাত যোগ।

রাজা। আমার এক্ষণে কোন দশা?

গ্রহা। শনির শেষ দশা।

রাজা। কাহার অন্তর্দ্দশা ?

গ্রহা। মঙ্গলের।

রাজা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বটে বটে, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

রাজা এই বলিয়া আবার পূর্ব্বমত চলিলেন। কিন্তু ক্রমেই তাঁহার বিমর্ষ-ভাব স্পষ্ট হইতে লাগিল।

রাজা যখন পশুশালায় ছিলেন, তখনই দিবাবসান হইয়াছিল। এক্ষণে শয়ন কাল উপস্থিত। গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল। প্রথমে একটী দুইটি, এখানে সেখানে, ভগ্নস্বরে, নিম্নস্বরে, কম্পিত স্বরে, পরে একেবারে প্রতিগৃহে গম্ভীর স্বরে বাজিয়া উঠিল, শব্দে আকাশ পরিপূর্ণ হইল। রাজা আরও বিমর্ষ হইলেন। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন, মরণোন্মুখ কোন ভীষণ অসুর হতাশ স্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে। তাঁহার কর্ণে শঙ্খধ্বনি অমঙ্গলধ্বনি বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল।

রাজা আবার দাঁড়াইলেন। চূড়াধন বাবুকে ডাকিলেন। চূড়াধন বাবু সঙ্কোচিত ভাবে অগ্রসর হইলেন। রাজা বলিলেন, "আমার নিকটে আইস, আরও নিকটে আইস। তুমি আমাব পিতামহের প্রপৌত্র আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, ইচ্ছা করে তোমায় আমি বুকে করি।" শেষ কথাগুলি ভগ্নস্বরে বলিয়া চূড়াধন বাবুর হস্ত ধারণ করিয়া রাজা চলিলেন; কতক দূর গিয়া রাজা চূড়াধনকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। "তুমি অরোগী হও, তুমি চিরজীবী হও।" চূড়াধন বাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, নম্রমুখে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। এমত সময় দেবমন্দিরে নহবদ বাজিয়া উঠিল। রাম সীতার আরতি আরম্ভ হইল। নগরবাসীরা ঠাকুর দর্শন করিতে বাহির হইল।

নহবদ, সানাই, কাঁশর, ঘণ্টা, শঙ্খ, মৃদঙ্গ সকল একেবারে বাজিতে লাগিল। বালকদিগের অন্তর নাচিয়া উঠিল, সকলে সেই দিকে ছুটিল, যে ছুটিতে পারিল না সে কাঁদিতে লাগিল। এক কুটীর সম্মুখে একটি বালিকা একা বসিয়া কাঁদিতেছে, তাহার সহোদর তাহাকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল বাদ্যোত্তম হইবামাত্র ঠাকুর দর্শনে সে ছুটিয়া গিয়াছে, সঙ্গে লইয়া গেল না বলিয়া বালিকা কাঁদিতেছে। বালিকার বয়স প্রায় এক বৎসর, দরিদ্র সন্তান কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট, দেখিলেই বোধ হয় বড় স্নেহের ধন, অঙ্গে কোথাও ধূলার লেশ মাত্র নাই; নয়নে কজ্জল, ভ্রূযুগের মধ্যস্থানে একটি সূক্ষ্ম টীপ। মুখখানি অতি যত্নে মার্জ্জিত।

বালিকাকে কাঁদিতে দেখিয়া রাজা সেইখানে দাঁড়াইলেন। চূড়াধন বাবু রাজার ইচ্ছা অনুভব করিয়া বালিকাকে ভুলাইতে গেলেন। করতালি দিয়া বালিকাকে ক্রোড়ে আহ্বান করিলেন। বালিকা ভয় পাইয়া মুখ ফিরাইল, কুটীরে যাইবার নিমিত্ত পঁইঠায় উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ব্যাকুলিত স্বরে আরও কাঁদিতে লগিল। রাজা তখন চূড়াধন বাবুকে সরিতে বলিয়া আপনি অগ্রসর হইলেন, তুই একবার ডাকিলেন, বালিকা ফিরিয়া দেখিল, দেখিবামাত্র তুই বাহু বিস্তার করিয়া হাসিল। একজন অধ্যাপক পশ্চাৎ হইতে বলিয়া দিলেন "কন্যাটি ব্রাহ্মণের সন্তান।" রাজা অতি আদরে বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। কন্যাটি তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তে করতালি দিয়া এক একবার পথের দিকে হস্ত বাড়াইয়া "ঐ ঐ" বলিতে লাগিল। রাজা বালিকার মুখ চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুব দর্শন করিবে? চল, আমিও তোমার সঙ্গে ঠাকুর দর্শন করিব, অনেক দিন শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করি নাই, তোমার দ্বারা তিনি আমায় স্মরণ করাইয়া দিলেন। চল, তোমায় আমি বুকে করিয়া লইয়া যাই।" বালিকা আনন্দে হাসিতে লাগিল।

বালিকার গর্ভধারিণী জল আনিতে গিয়াছিল। কুটীরসম্মুখে অনেকগুলি ভদ্রলোকের সমাগম দেখিয়া অন্তরালে কলস কক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। সকলে চলিয়া গেলে ব্রাহ্মণী প্রতিবাসীদের নিকট সকল শুনিয়া মনে করিলেন, তাহার সন্তানকে রাজা আর ফিরাইয়া দিবেন না, অতএব রীতিমত কাঁদিতে বসিলেন।

রাজা কন্যাটিকে ক্রোড়ে লইয়া রামসীতার দ্বারে উপস্থিত হইলেন; সিংহ দ্বারে নহবৎ বাজিতেছিল; বালিকা উর্দ্ধমুখে রাজাকে সেই বাদ্যস্থান দেখাইতে লাগিল। রাজা ক্রমে মন্দিরে উঠিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই সসম্মানে সরিয়া দাঁড়াইল। রাজা বালিকাকে বুক হইতে নামাইয়া অতি ভক্তি-ভাবে প্রণাম কবিলেন। বালিকাটিও তাঁহার পার্শ্বে এক প্রকার শয়ন করিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিতে করিতে রাজার প্রতি মুখ ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। রাজা উঠিলেন দেখিয়া বালিকাও উঠিয়া দাঁড়াইল। স্বর্ণালঙ্কার-বিভূষিত দেবমূর্ত্তি দেখিয়া "ঐ ঐ" বলিয়া রাজাকে দেখাইতে লাগিল। আবার পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিল, এই সময় বাদ্যোদ্যম স্থগিত হইল। বালিকা "যা—যা" বলিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। শেষ রাজার জানু ধরিয়া দাঁড়াইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "ঘরে যাবে?" কন্যাটি অবার দেবমূর্ত্তির দিকে ক্ষুদ্র হস্ত নির্দ্দেশ করিয়া "ঐ ঐ" বলিতে লাগিল।

মন্দিরে একটী ব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ! সন্তানটি কি রাজকন্যা?" রাজা বলিলেন, "না।" এই বলিয়া বালিকাকে আবার পূর্ব্বমত বুকে তুলিলেন। বালিকা বুকে উঠিয়া একবার রাজার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর রাজস্কন্ধে মস্তক রাখিয়া স্থিরভাবে রহিল। রাজা তখন ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "বালিকাটি কাহার কন্যা আমি তাহা এ পর্য্যন্ত জানি না, পথে কন্যাটি কাঁদিতেছিল, আমাকে দেখিয়া আমার ক্রোড়ে আসিল, কোনমতে আর কাহার ক্রোড়ে গেল না।"

ব্রহ্ম। আশ্চর্য্য! বালকদেব ত এরূপ কখন দেখা যায় নাই, কখন অপরিচিত লোকের নিকট যায় না।

রাজা। বুঝি সন্তানটি নিদ্রা গেল। ইহার আত্মীয় কেহ আসিয়াছে?

"আসিয়াছে" বলিয়া একজন ব্রাহ্মণ যোড়করে সম্মুখে দাঁড়াইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কন্যাটির কে হন?"

ব্রাহ্মণ। পিতা!

রাজা। আপনি বড় ভাগ্যধর। এ কন্যা আমার হইলে আমিও ভাগ্যধর মনে করিতাম। বুক হইতে নামাইতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু আপনার কন্যা আমি কি বলিয়া রাখিব, নতুবা আমার ইচ্ছা করে আমি কন্যাটির লালনপালন করি।

এই কথায় ব্রাহ্মণ ভয়ে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল দেখিয়া একজন প্রতিবাসী বলিলেন, "মহারাজ, আপনি এ প্রদেশের রাজা, আমরা সকলেই আপনার সন্তান-স্বরূপ। আপনি যাহাই ইচ্ছা করিবেন, তাহাই করিতে পারেন। আপনি যদি কন্যাটি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা আমাদের সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে। দরিদ্রের কন্যা আপনি ক্রোড়ে করিয়াছেন, ইহাতেই আমরা সকলেই চরিতার্থ হইয়াছি। দরিদ্রের প্রতি যে দেশে রাজার ঘৃণা নাই; সে দেশের প্রজা অপেক্ষা সুখী আর কোথায়?"

রাজা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই চূড়াধন বলিলেন, "শিশু সম্বন্ধে রাজা প্রজা নাই, ধনবান্ দরিদ্র নাই। সন্তানমাত্রেই পবিত্র। যে শিশুকে ক্রোড়ে করে, সেই পবিত্র হয়, সেই চরিতার্থ হয়, সন্তানের কিছু গৌরব বৃদ্ধি হয় না।

রাজা বলিলেন "তথাপি আমি কন্যাটিকে ক্রোড়ে করিয়াছি। আমার ক্রোড়ে করা ব্যর্থ হইবে না। কন্যাটি রাজকন্যার ন্যায় প্রতিপালিত হইবে। আমি তাহার বন্দোবস্ত আগামী প্রাতে করিয়া দিব। আমার বড় যন্ত্রণা হইয়াছিল; মন কাঁদিয়া উঠিতেছিল। কন্যাটি ক্রোড়ে করিয়া অবধি আমার সকল দুর্ভাবনা

গিয়াছে। আবার স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়াছি; কন্যাটী বড় চমৎকার, আমি আন্তরিক ভালবাসিয়াছি। কন্যাটি যাহাতে সুখে থাকে, আমি তাহা অবশ্য করিব। এক্ষণে আপনার কন্যা আপনি লইয়া যান।" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দয়া! আশ্চর্য্য দয়া!"

দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজার ক্রোড় হইতে কন্যাকে গ্রহণ করিতে সাহস করিল না। চূড়াধন বাবু কন্যাকে লইয়া ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিলেন। কন্যা নিদ্রা গিয়াছিল, চূড়াধন বাবুর হস্তে জাগ্রত হইয়া পিতৃ ক্রোড়ে গিয়া কাঁদিতে লাগিল। পিতা ভুলাইবার নিমিত্ত স্ত্রীলোকের ন্যায় "ও আয়, আয় রে" বলিয়া মাথা চাপড়াইতে লাগিলেন। কন্যাটি তাহাতে শান্ত হইল না। রাজা তখন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমার ক্রোড়ে আসিবে? আইস।" কন্যাটি এই আহ্বানে মাথা তুলিয়া রাজাকে দেখিল, দেখিয়াই হস্তপ্রসারণ করিয়া রাজক্রোড়ে যাইবার ইচ্ছা জানাইল। রাজা তৎক্ষণাৎ ক্রোড়ে লইলেন, বালিকা আবার পূর্ব্বমত রাজস্কন্ধে মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। সকলেই আশ্চর্য্য হইল, রাজাও আশ্চর্য্য হইলেন।

নিদ্রা কিঞ্চিৎ গাঢ় হইয়া আসিলে রাজা ব্রাহ্মণকে কন্যাটি প্রত্যর্পণ করিয়া বিদায় করিলেন। যাইবার সময় ব্রাহ্মণকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কন্যাটির নাম কি?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "মাধবীলতা।"

পদ্য গ্রন্থ

একবার একজন আয়র্লণ্ডদেশীর সহিত ইংরেজী কাব্য সম্বন্ধে আমাদের কথা হইতেছিল। ইংরেজি শিক্ষাগুণে আমরা তাঁহার সাক্ষাতে ইংরেজি কবিত্বের প্রশংসা করি। প্রশংসা তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "সে কি কথা! ইংলণ্ড চিরসুখী, কখন কাঁদে নাই, ইংলণ্ডে কবিত্ব কিরূপে সম্ভব?"

কথাটি কতদূর সত্য তাহা জানি না তবে এই বলিতে পারা যায় যে, যে ব্যক্তি নিত্য অন্নধ্বংস করিয়া নিদ্রা গিয়াছে, এবং নিদ্রাভঙ্গে কেবল পান চিবাইয়াছে, যে শোক তাপ কিছুই জানে না, বা বুঝে না, কাব্যপ্রণয়নে তাহার অধিকার হয় না, প্রয়োজনও জন্মে না। প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া যে লিখিতে যায়, কাব্যে সে অনধিকারী। প্রয়োজন বিবেচনায় যে কাঁদিতে বসে, সে ভাল কাঁদিতে পারে না। যে একান্ত অন্তরের জ্বালায় কাঁদে কেবল তাহারই চক্ষের জলে লোকে "আহা" বলে।

বোধ হয় চিত্তমুকুর লেখকের অন্তরে জ্বালা আছে। তিনি সেই জ্বালায় কাঁদিয়াছেন। অধিকাংশ কবিতাগুলি তাঁহার আন্তরিক ক্রন্দন। "কবিতা লিখেছি কত মনের বেদনে।" যাহাই তিনি লিখিতে গিয়াছেন, তাহাতেই যেন তাঁহার চক্ষে জল আসিয়াছে। সকল অবস্থাই তিনি দুঃখের চক্ষে দেখিয়াছেন, সকল অবস্থাতেই তিনি আপনার মর্ম্মবেদনা মিশাইয়াছেন। একস্থানে ভাটের ন্যায় স্তুতিপাঠ করিতে গিয়াও সেই মনোবেদনা কতক দেখাইয়াছেন।

দুই চারিটি কবিতা হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলে এ কথা প্রতিপন্ন হইবে।

কলিকাতা ৪৪ নং বেণিয়াটোলা লেন, রায় যন্ত্রে শ্রীআশুতোষ ঘোষাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত। সন ১২৮৫। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। গ্রন্থকারের নাম লিখিত নাই।

উদাসীন নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত :—

"কিন্তু হায় এ পামর নির্ম্মম হৃদয়,
করুণা পরশে আর দ্রবিবার নয়।
পাষাণে বেঁধেছি প্রাণ পাষাণ রহিব,
এই তরু-তলে বসি একাকী কাঁদিব।
হইবে গভীর নিশি দূরে ঝিঁঝিঁরব,
আঁধারে ডুবিবে বিশ্ব জগত নীরব।
এই শুষ্ক তৃণদলে করিয়ে শয়ন।
খুলিয়ে প্রাণের দ্বার করিব রোদন।"

সলিল প্রতিমা হইতে উদ্ধৃত :—

"কত সাধ কত আশা, কত প্রেম ভালবাসা,
প্রাণেশ্বর নিরন্তর রেখেছি অন্তরে,
বারেক তোমায় যত্নে দেখাবার তরে ;
সুচিকণ পুষ্পহার, গাঁথিয়াছি কতবার,
দোলাইতে তব গলে—কতই যতনে
কবিতা লিখেছি কত মনের বেদনে।
এতই বেদনা যদি, কেন দূরে নিরবধি,
এস কাছে প্রাণেশ্বর কাঁদি দুই জনে।
মুছাইব অশ্রুজল অঞ্চল বসনে
ধন নাই—দুখ তাই, ধনে প্রয়োজন নাই,
উভয়ে পরম সুখে রব তরুতলে,
পূরিল যুগল আঁখি পুনঃ অশ্রুজলে।"

* * *

দুঃখিনী রমণী হইতে উদ্ধৃত :—

"ইচ্ছা করে ছুটে যাই কানন-মাঝারে,
পড়িয়া তরুর তলে কাঁদি একাকিনী।
এ দুঃখ কহিব কারে নির্ম্মম সংসারে,
কে বুঝিবে—কে শুনিবে—আমার কাহিনী
শরবিদ্ধ বিহঙ্গিনী মর্ম্মবেদনায়,
অস্থির যখন পড়ি লতার বিতানে।
কে বুঝে কে দেখে তার তীব্র যন্ত্রণায়,
লুটায় সাপটি পক্ষ একাকী কাননে।

* * *

ভাসাইয়া দেহ মোরে জাহ্নবীর নীরে,
এ মুখ দেখিয়া কেন পাইবে বেদন।
শুষ্ক পল্লবের মত যাইব ভাসিয়া,
প্রবল তরঙ্গ-স্রোতে সাগরের জলে।
এ ভগ্ন জীবন-তরি যাইবে ডুবিয়া,
দহিতে হবে না আর নিরাশা-অনলে।

* * *

হেন চিত্রকর যদি থাকিত ভুবনে
হৃদয়ের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিতে পারিত,
আশা তৃষ্ণা সুখ দুঃখ মনের বেদনে,
তুলিকায় চিত্রপটে হইত অঙ্কিত!
দগ্ধ হৃদয়ের ছবি তুলিয়া তোমারে
দেখাতেম সহোদরে যাতনা আমার,
দেখিতে জ্বলিছে চিতা হৃদয় মাঝারে,
আশা সুখ পরিবর্ত্তে দেখিতে অঙ্গার।"

কুলীন কামিনী হইতে উদ্ধৃত :—

"কি দুঃখ তটিনি! তুমি হেন শুষ্ক বেশে
করুণ সঙ্গীত তুলি, শৈলময় দেশে?
ললিত লহরী হায়,
বিষাদে মিশায়ে যায়,
সরস যৌবন মরি বিশুষ্ক এমন
কোন্ দুখে বল নদি এতেক বেদন!
হায় জানিতাম আমি অনন্ত সংসারে
একা অভাগিনী শুধু পাষাণে বিহরে,
শুষ্ক শুধু এই প্রাণ,
গায় বিষাদের গান,
লুকায়ে মরম জ্বালা কাঁদি নিরজনে।
একা অনাথিনী আমি অখিল ভুবনে!

তুমিও যে তটিনী রে আমারই মতন,
পাষাণে চাপিয়া বক্ষ কর সম্বরণ,
নির্দ্দয়ের পদতলে,
লুটাই নয়ন জলে,
নিষ্ঠুর গিরির পদে তুমি অভাগিনী!
লুটাইছ তরঙ্গিণী দিবস যামিনী।”

এইরূপ করুণরসের অবতারণা যে কেবল শিক্ষার গুণে বা যত্নের বলে হইয়াছে, এমত বোধ হয় না। কবির নিজের গুণে। ভাবের মধ্যে শোক তাঁহার মনে বিশেষ প্রবল বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য করুণরসে তাঁহার এত অধিকার দেখা যায়। অন্যরসে যে তিনি সম্পূর্ণ বঞ্চিত এমত বলি না, তবে যে সকল রস তাঁহার চিত্ত স্পর্শও করে না সে সকল রস উদ্দীপন করিবার নিমিত্ত তিনি দুই এক স্থানে সময় নষ্ট করিয়াছেন, বোধ হয় তাহা কেবল অনুরোধে। কেন না লেখক আপনিই স্বীকার করিয়াছেন যে মধ্যে মধ্যে তিনি কাব্যের ফরমাইস্ লইয়া থাকেন। কিন্তু ফরমাইস্ বা চেষ্টা উভয়ই কবির পক্ষে কুপথ। যিনি তাহা অবলম্বন করিয়াছেন, তিনিই নিস্ফল হইয়াছেন। “কাব্য কি”? যাঁহারা জানেন না, তাঁহারাই কাব্য লিখিতে চেষ্টা পান, বা লিখিবার নিমিত্ত অন্যকে অনুরোধ করেন। যে রস মনে কখন আসে নাই, সে রস অনুরোধে বা চেষ্টায় কিরূপে বর্ণিত হইবে। বোধ হয় তাঁহারা বলিবেন অনুভব দ্বারা। সত্য, মনে কোন ভাবের উদ্দীপন হইলে তাহার দুই একটি কার্যকেলি অনুভব করা যাইতে পারে। কিন্তু যে স্থলে ভাব কি রস কিছুই নাই, সে স্থলে কে তাহার ক্রিয়া অনুভব করাইবে। যে স্থলে মেঘ নাই, সে স্থলে কে বৃষ্টি বর্ষণ করিবে? যদি তুমি জল ছিটাইয়া বল, এই বৃষ্টি হইল দুই একটী বালক ভিন্ন কে তোমার কথা বিশ্বাস করিবে? ইদানীং বাঙ্গালার অধিকাংশ কাব্য লেখক যে কবি নহেন তাহার কারণ এই। অনেকে জল ছিটাইয়া বলেন, বৃষ্টি করিলাম; ভাব বা রস কিছুই তাঁহাদের নাই, কেবল অনুভবের উপর তাঁহাদের নির্ভর। যে কখন স্বচক্ষে পর্ব্বত কি সমুদ্র দেখে নাই সে তাহা কি অনুভব করিবে? অন্যের মুখে যাহা শুনিয়াছে বা অন্যের গ্রন্থে যাহা পাঠ করিয়াছে তাহাই লিখিবে। চর্ব্বণে যাহার রস গিয়াছে তাহাই আবার পুনশ্চর্ব্বিত করিবে। পর্ব্বতে কি সমুদ্রে কাব্যরস নাই। তাহা কেবল দর্শকের অন্তরে থাকে। পর্ব্বত কি সমুদ্র দেখিলে চিত্তের যে চাঞ্চল্য জন্মে তাহাই কাব্যরস। যে পর্ব্বত বা সমুদ্র দেখিল না, কেবল অন্যের মুখে শুনিল, সে এ চাঞ্চল্য কোথা পাইবে, অনুভবে তাহা সম্ভবে না। কাজেই অনুরোধে কাব্যের সৃষ্টি হইতে পারে না।

সমুদ্র কি পর্ব্বত দেখিলেও অনেকের চিত্তে কোন চাঞ্চল্য জন্মে না এই জন্য সকলে কবি হইতে পারে না। যাঁহার চক্ষে পর্ব্বত কেবল প্রস্তরস্তূপ, সমুদ্র কেবল জলরাশি, কাব্যে তাঁহার অনধিকার, তিনি অন্য ব্যবসা করুন। সমুদ্র কি পর্ব্বত দেখিলে কবিদের চিত্ত একরূপ চঞ্চল হয় না; ভিন্ন কবির ভিন্ন রূপ হয়। এই জন্য কবি নানা প্রকার, কাব্যও নানা প্রকার। সমুদ্র ও পর্ব্বতের কথা উদাহরণ স্বরূপ আমরা উল্লেখ করিলাম। সমুদ্র ও পর্ব্বতের কথা যাহা বলা গেল, বাহ্যবস্তু মাত্রেরই কথা সেইরূপ বলা যাইতে পারে। সঙ্গীত বা শব্দ সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে।

মূল কথা, ফরমাইসে কাব্য হয় না। চিত্তের চাঞ্চল্য না জন্মিলে কাব্য জন্মে না। চিত্তের চাঞ্চল্যের কোন বেগ নাই, অথচ আমাদের কবিরা কাব্য প্রণয়ন করেন। কেহ বা অন্যের বেগ গ্রহণ করিয়া লেখেন; অর্থাৎ অন্য কবি আপন চিত্তের বেগে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই তাঁহারা অনুকরণ করেন। অনুকরণ অন্য বিষয়ে যাহাই হউক কাব্য সম্বন্ধে দোষেব। অথচ অধিকাংশ কবি কিছু না কিছু নকল করেন। চিত্তমুকুবেব লেখক দুই একটি ভাব বোধ হয় অন্য কবি হইতে গ্রহণ কবিয়াছেন। পুরন্দরের দৌত্য নামক কবিতায় একস্থলে লিখিত হইয়াছে—

"আঘাতি অনল ছটা কন্দরে কন্দরে,
ভ্রমে যথা ক্ষণপ্রভা পর্ব্বত প্রদেশে,"

এই ভাব হেম বাবুর বিদ্যুৎ হইতে নীত। হেম বাবুব বিদ্যুৎ দেখুন:—

"কিম্বা গিরিশৃঙ্গ রাজি
মধ্যে যথা তেজে সাজি
ক্ষণপ্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা
খেলে রঙ্গে ভীমভঙ্গি,
শিখর শিখর লঙ্ঘি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া স্থূল তীক্ষ্ণ ছটা।"

এই অনুকরণটি নিতান্ত দোষের নয়।

আর একস্থানে (৯৬ পৃষ্ঠা) আমাদের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"এস তবে শশধর নামিয়া ভূতলে,
লিখে দিই তব অঙ্গে দুইটি চরণ
হেরিলে তোমার পানে, পড়িবে নয়নে তার
প্রাণের লুকান কথা, বুঝিবে বেদন।"

ইংরেজি কবি মুর এই ভাবটী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

Sweet Moon ! if like Crotona's sage,
By any spell my hand could dare
To make thy disc its ample page,
And write my thoughts my wishes there ;
How many a friend whose careless eye
Now wanders o'er that starry sky,
Should smile upon thy orb to meet
The recollection kind and sweet,
The reveries of fond regret,
The promise never to forget,
And all my heart and soul would send
To many a dear loved distant friend.

ইহা ভিন্ন অন্য দুই এক স্থলেও অনুকরণ আছে।

অনেক প্রধান প্রধান কবিরা অনুকরণ করিয়া গিয়াছেন। অনুকরণ নিমিত্ত বিশেষ দোষ দিই না। তবে এই বলি যে, এই গ্রন্থকারের ক্ষমতা আছে, ইনি দোষটি বর্জ্জন করিলে করিতে পারেন।

যে সকল কবিতা উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহা করুণরসবিশিষ্ট। অন্য দিকে চিত্তমুকুরলেখকের কিরূপ ক্ষমতা আছে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আর দুই তিনটি অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

গ্রন্থের প্রারম্ভে রাজপুতকুলকলঙ্ক জয়চন্দ্রের মানসিকভাবব্যঞ্জক একটি চিত্র আছে ; তাহার এক স্থান বড় সুন্দর। স্বীয় দুষ্কৃতিচিন্তামগ্ন জয়চন্দ্র গভীর রাত্রে একাকী উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা—

"ত্যজিল সুদীর্ঘ শ্বাস চাহি শূন্যপানে,
নিবাবার তরে যেন গগনের আলো ;
ভাবিল আলোকরাশি পশিয়া পরাণে,
অদৃশ্য ভাবনাগুলি করিছে উজ্জ্বল।
মুদিল নয়ন পুনঃ আবরিয়া কর,
কিন্তু হৃদয়েতে যাহা হয়েছে অঙ্কিত
মুদিলে নয়ন কেন হইবে অন্তর!
বরং উজ্জ্বলতর হবে অনুভূত।

(সমরসাহী-বিদায় হইতে)

মধুর সায়াহ্নে, প্রমোদ উদ্যানে,
সরসী-সলিলে, সঙ্গিনীর সনে,
সুবর্ণ তরীতে, হরষিত চিতে,
চিতোরের রাণী পৃথা বিহরে।
হৃদয়ের হর্ষ বিকাশে নয়নে,
চারু মৃদু হাসি ফুটিছে বদনে,
কুঞ্চিত কপোলে, যৌবন উথলে,
রজতের দাঁড়, শোভিছে করে।
মত্ত হংসরাজ, গ্রীবা উচ্চ করি,
আসিছে সাঁতারি, পরশিতে তরী,
তরী বহি যায়, ধরিতে না পায়,
উঠে হাস্যধ্বনি, রমণী-মণ্ডলে।

এই সমরসাহী-বিদায় সুকবির রচনা, ইহা সমুদয় উদ্ধৃত করিবার মানস ছিল, কিন্তু স্থানাভাব।

স্থানান্তরে—

নিবিড় তরুব তলে শ্যাম দূর্ব্বাদলে
পড়িয়া শীতল ছায়া শান্তি-স্বরূপিনী,
বৃন্তে বৃন্তে ফুলগুলি, আনন্দে পড়েছে ঢলি;
অদূরে উঠিছে ধীরে মানবের ধ্বনি,
বোধ হইল যেন আজ নবীন ধরণী।
দেখিনু শিশিরবিন্দু গোলাপের দলে
কিরণে উজ্জ্বল হয়ে ঢল ঢল করে,
গোলাপ পড়িল হেলে, শিশির পড়িল ঝুলে,
দেখিতে দেখিতে বিন্দু খসিয়া পড়িল,
সূক্ষ্ম বৃন্তে চারু পুষ্প নাচিয়া উঠিল।

চিত্তমুকুর পাঠ করিয়া আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, লেখক সুকবি। এক্ষণে তাঁহার যে সকল দোষ আছে তাহা সামান্য; বোধ হয়, পরে তাহা কিছুই থাকিবে না। এই পুস্তক গ্রন্থকারের প্রথম উদ্যম। তিনি যে প্রথম উদ্যমেই অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার সাধারণের উৎসাহের পাত্র।
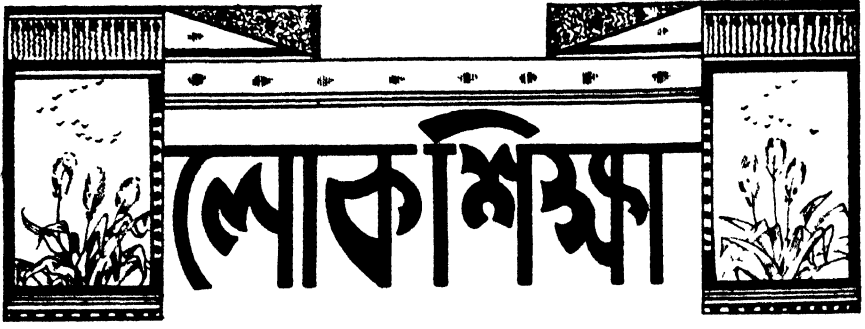
লোকসংখ্যা গণনা করিয়া জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গলা দেশে না কি ছয় কোটী ষাটি লক্ষ মনুষ্য আছে। ছয় কোটি ষাটি লক্ষ মনুষ্যের দ্বারা সিদ্ধ না হইতে পারে, বুঝি পৃথিবীতে এমন কোন কার্য্যই নাই। কিন্তু বাঙ্গালির দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইতেছে না। ইহার অবশ্য কোন কারণ আছে। লৌহ অস্ত্রে পরিণত হইলে তদ্দারা প্রস্তর পর্য্যন্ত বিভিন্ন করা যায়, কিন্তু লৌহ মাত্রেরই ত সে গুণ নাই। লৌহকে নানাবিধ উপাদানে প্রস্তুত, গঠিত, শাণিত করিতে হয়। তবে লৌহ ইস্পাত হইয়া কাটে। মনুষ্যকে প্রস্তুত, উত্তেজিত, শিক্ষিত করিতে হয়, তবে মনুষ্যের দ্বারা কার্য্য হয়। বাঙ্গালার ছয় কোটি ষাটি লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোন কার্য্য হয় না, তাহার কারণ এই যে বাঙ্গালায় লোক-শিক্ষা নাই। যাঁহারা বাঙ্গালার নানাবিধ উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা লোকশিক্ষার কথা মনে করেন না, আপন আপন বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশেই প্রমত্ত। ব্যাপার বড় অল্প আশ্চর্য্য নহে।

ইহা কখন সম্ভব নহে যে, বিদ্যালয়ে পুস্তক পড়াইয়া, ব্যাকরণ সাহিত্য জ্যামিতি শিখাইয়া, সপ্তকোটি লোকের শিক্ষাবিধান করা যাইতে পারে। সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে, এবং সে উপায়ে এ শিক্ষা সম্ভবও নহে। চিত্তবৃত্তি সকলের প্রকৃত অবস্থা, স্ব স্ব কার্য্যে দক্ষতা, কর্ত্তব্য কার্য্যে উৎসাহ, এই শিক্ষাই শিক্ষা। আমাদিগের এমনি একটুকু বিশ্বাস আছে যে, ব্যাকরণ জ্যামিতিতে সে শিক্ষা হয় না এবং রামমোহন রায় হইতে ফটিকচাঁদ স্কোয়ার পর্য্যন্ত দেখিলাম না যে, কোন ইংরেজী নবীস সে বিষয়ে কোন কথা কহিয়াছেন।

ইউরোপে এইরূপ লোকশিক্ষা নানাবিধ উপায়ে হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে প্রুসিয়া প্রভৃতি অনেক দেশে আপামর সাধারণ সকলেরই হয়। সংবাদপত্র সে সকল দেশে লোকশিক্ষার একটা প্রধান উপায়। সংবাদপত্র লোকশিক্ষার যে কিরূপ উপায়, তাহা এদেশীয় লোক সহজে অনুভব করিতে পারেন না। এদেশে

এক এক ভাষায় খান দশ পোনের সম্বাদ পত্র; কোন খানির গ্রাহক দুইশত, কোনখানির গ্রাহক পাঁচ শত, পড়ে পাঁচ সাত হাজার লোক। ইউরোপে এক এক দেশে সম্বাদপত্র শত শত, সহস্র, সহস্র। এক এক খানির গ্রাহক সহস্র, সহস্র, লক্ষ, লক্ষ। পড়ে লক্ষ লক্ষ, কোটি, কোটি লোক। তার পর নগরে নগরে সভা, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা। যাহার কিছু বলিবার আছে, সেই প্রতিবাসী সকলকে সমবেত করিয়া সে কথা বলিয়া শিখাইয়া দেয়। সেই কথা আবার শত শত সম্বাদপত্রে প্রচারিত হইয়া শত শত ভিন্ন গ্রামে, ভিন্ন নগরে প্রচারিত, বিচারিত এবং অধীত হয়; লক্ষ লক্ষ লোক সে কথায় শিক্ষিত হয়। এক একটা ভোজের নিমন্ত্রণেই স্বাদু খাদ্য চর্ব্বণ কবিতে করিতে ইউরোপীয় লোকে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, আমাদের তাহার কোন অনুভবই নাই। আমাদিগের দেশের যে সম্বাদপত্র সকল আছে, তাহার দুর্দ্দশার কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি; বক্তৃতা সকল ত লোকশিক্ষার দিক্ দিয়াও যায় না; তাহা বহু কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে, তাহা কখন দেশীয় ভাষায় উক্ত হয় না। অতি অল্প লোকে শুনে, অতি অল্প লোকে পড়ে, আর অল্প লোকে বুঝে, আর বক্তৃতাগুলি অসার বলিয়া আরও অল্প লোকে তাহা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়।

এক্ষণকার অবস্থা এইরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু চিবকাল যে এদেশে লোক-শিক্ষার উপায়েব অভাব ছিল, এমত নহে। লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে শাক্যসিংহ কি প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ষকে বৌদ্ধধর্ম্ম শিখাইলেন? মনে করিয়া দেখ, বৌদ্ধধর্ম্মের কূটতর্ক সকল বুঝিতে আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মস্তকের ঘর্ম্ম চরণকে আর্দ্র করে; মক্ষমূলর যে তাহা বুঝিতে পারে নাই, কলিকাতা রিবিউতে তাহার প্রমাণ আছে। সেই কূটতত্ত্বময়, নির্ব্বাণবাদী, অহিংসাত্মা, দুর্ব্বোধ্য ধর্ম্ম, শাক্যসিংহ এবং তাঁহার শিষ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষকে, গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মুর্খ, বিষয়ী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সকলকে শিখাইয়াছিলেন। লোক-শিক্ষার কি উপায় ছিল না? শঙ্করাচার্য্য সেই দৃঢ়বদ্ধমূল দিগ্‌বিজয়ী সাম্যময় বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত করিয়া আবার সমগ্র ভারতবর্ষকে শৈবধর্ম্ম শিখাইলেন—লোক-শিক্ষার কি উপায় ছিল না? সেদিনও চৈতন্যদেব সমগ্র উৎকল বৈষ্ণব করিয়া আসিয়াছেন। লোকশিক্ষার কি উপায় হয় না? আবার এদিকে দেখি, রামমোহন রায় হইতে কালেজের ছেলের দল পর্য্যন্ত সাড়ে তিন পুরুষ ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘুষিতেছেন। কিন্তু লোকে ত শিখে না। লোকশিক্ষার উপায় ছিল, এখন আর নাই।

একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি— সে দিনও ছিল—আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বেদী পিঁড়ীর উপর বসিয়া

ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকা মালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস্ নুদুস্ কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয় জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধিচীর আত্মসমর্পণ বিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত—শিখিত যে ধর্ম্ম নিত্য, যে ধর্ম্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্বসৃজন করিতেছেন,বিশ্বপালন করিতেছেন, বিশ্বধ্বংস করিতেছেন, যে পাপ পুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কাব আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে পরের জন্য, যে অহিংসা পরম ধর্ম্ম, যে লোকহিত পরম কার্য্য—সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্য যুবকের কুরুচির দোষে। গুল্‌কি কাওরাণী শূয়ার চরাইতে অপারগ হইয়া কুপথ অবলম্বন করিয়াছে। তাহার গান বড় মিষ্ট লাগে, কথকের কথা শুনিয়া কি হবে? দক্ষযজ্ঞে, বিশ্বযজ্ঞে ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরীর আত্মসমর্পণ শুনিয়া কি হইবে? চল ভাই, ব্রাণ্ডি টানিয়া থিয়েটারে গিয়া কাওরাণীব টপ্পা শুনিয়া আসি। এই অল্প ইংরেজিতে শিক্ষিত, স্বধর্ম্মভ্রষ্ট, কদাচার, দুবাশয়, অসার, অনালাপ্য, বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোক শিক্ষার পরম আকর কথকতা লোপ পাইল। ইংরেজী শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্দ্ধিত হইতেছে না।

কিন্তু আসল কথা বলি। কেন যে এ ইংরেজী শিক্ষা সত্বেও বাঙ্গালা দেশে লোকশিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার স্থূল কারণ বলি—শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক রামা লাঙ্গল চষে, আমার ফাউলকারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে দিন যাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ তাহা নদের ফটিকচাঁদ তিলার্দ্ধ মনে স্থান দেন না। বিলাতে কাণা ফসেট্ সাহেব এ দেশে সার অ্যাসলি ইডেন্ ইহারা তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিকচাঁদের সেই ভাবনা। রামা চুলোয় যাক্, তাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাঁহার মনের ভিতর যাহা আছে, রামা এবং রামার গোষ্ঠী—সেই গোষ্ঠী ছয়কোটি ষাটি লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি উনষাটি লক্ষ নব্বই হাজার নয়শ—তাহারা তাহার মনের কথা বুঝিল না। যশ লইয়া কি হইবে? ইংরেজে ভাল বলিলে কি হইবে? ছয়কোটি ষাটলক্ষের ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে—বাঙ্গালার

লোক যে শিখিল না। বাঙ্গালীয় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।

সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্ব্বত্রে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

শরীরপালন। ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ৮ম সংস্করণ। চিকিৎসা প্রকাশ যন্ত্র সন ১২৮৫।

মাথা মুণ্ড নাটক নবেল লিখিয়া নব্য বাবুগণ দেশের কি উপকার করেন, তাহা বলিতে পারি না। নাটক নবেল, অতিশয় উৎকৃষ্ট এবং লোকহিতকর সামগ্রী সন্দেহ নাই—যদি ভাল হয়। কিন্তু ভাল নাটক নবেল লিখিতে পারে এমন লোক শত বৎসরে একজন জন্মে কি না সন্দেহ। সকল প্রকার প্রতিভার অপেক্ষা সাহিত্যের উজ্জ্বলকারী প্রতিভাই দুর্লভ। কিন্তু বাঙ্গালায় যে কলম ধরিতে শিখিয়াছে সেই কাব্য নাটক উপন্যাসের প্রণেতা। এই সম্প্রদায়ের লোককে আমরা পরামর্শ দিই যে, যদি তাঁহাদিগের সাধ্য থাকে তবে অন্য পথ ছাড়িয়া, যদু বাবুর অনুকরণ করুন। যাহা লোকহিতকর, তাহাতে মনোযোগ দিন। বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে যদুবাবুর ন্যায় কোন বাঙ্গালি লেখকই দেশের হিতে নিযুক্ত নহেন। "ধাত্রীশিক্ষা" "চিকিৎসাদর্পণ" "শরীরপালন" প্রভৃতি গ্রন্থে চিকিৎসা শাস্ত্রের দুরূহ ব্যাপার সকল তিনি জনসাধারণের বোধগম্য করিয়া সকলকে আত্মরক্ষায় সক্ষম করিয়াছেন। যে একজন মনুষ্যের জীবন রক্ষা করে সে মনুষ্যলোকে ধন্য—যদু বাবুর এই সকল পুস্তকে বহুলোকের জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা হইয়াছে অতএব বাঙ্গালি লেখকের মধ্যে তাঁহার তুল্য লোকহিতকর আর কাহাকেই দেখি না।

বিশেষ এবিষয়ে তাঁহার উদ্যম, সাহস ও অধ্যবসায় অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়। এক চিকিৎসা কল্পদ্রুমে যে ব্যয়, পরিশ্রম, ও ক্ষতি স্বীকার তাহা আর কোন লেখকই সহ্য করিতে পারেন না। এরূপ কার্য্যে যশ বা ধনলাভ নাই—কেন না সাধারণ পাঠকে ইহার কিছুই বুঝে না পড়ে না বা উৎসাহ দেয় না। যিনি পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া লোকের হিতে নিযুক্ত তিনিই যথার্থ মহাত্মা।

তাঁহার সকল গ্রন্থের মধ্যে ধাত্রীশিক্ষা ও শরীরপালন সর্ব্বাপেক্ষা লোকের উপকারী। ধাত্রীশিক্ষার পরিচয় আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। তদপেক্ষা শরীরপালন আরও লোকহিতকর। আমরা যে সকল দৈনিক ক্রিয়া করিয়া থাকি—স্নান, আহার, পান, শয়ন, নিদ্রা, সকলেতেই আমরা প্রায় প্রত্যহ স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া থাকি—নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই তাহার ফলে পীড়া জন্মে। আমাদিগের দেশে যে এত রোগ, সকলই রুগ্ন, জ্বর প্লীহায় কাতর, ক্ষীণজীবী তাহার এক মাত্র কারণ দেশের দুরবস্থাবশতঃ, এবং দেশাচারে দৌরাত্ম্যবশতঃ স্বাভাবিক নিয়ম সকলের উল্লঙ্ঘন। লোকের দুরবস্থার কারণে যে সকল নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, শত সহস্র বিধান দিলেও তাহার পালন হইবে না। যাহার অন্ন যোটে না, তাহাকে সহস্র বার উত্তম আহারের ব্যবস্থা দিলেও তাহার স্বাস্থ্য-রক্ষার উপায় হইবে না। যে দেশে কোন গৃহই শুষ্ক হয় না, সে দেশে শুষ্ক গৃহে বাসের বিধান বৃথা। কিন্তু সকল নিয়মই এরূপ নহে। অধিকাংশ নিয়ম লঙ্ঘনের কারণ, লোকের অজ্ঞতা, এবং প্রচলিত রীতি। এই সকল কুসংস্কার দূর করিলে জনসাধারণের বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা। এ শিক্ষা বালক যুবা বৃদ্ধ বণিতা সকলেরই হওয়া উচিত। এ দেশে কাহারও হয় না। শরীর-পালন ক্ষুদ্র পুস্তক হইলেও এ দেশীয় লোকের পক্ষে শিক্ষার উপযোগী। আমরা বাঙ্গালা বা ইংরেজী আর এরূপ পুস্তক দেখি নাই। তাহার বিশেষ কারণ এই যে ইহা এ দেশের লোকের অবস্থা, দেশের অবস্থা, এবং লোকের আচার ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখিত হইয়াছে, এবং একজন বহুদর্শী চিকিৎ-সকের বহুদর্শিতার ফল ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, যাহা সাধারণে বুঝিবে না, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া পুস্তক দুর্ব্যবহার্য্য করা হয় নাই। অতি সরল ভাষায় এবং নিতান্ত পরিষ্কার রীতিতে অতিশয় প্রয়োজনীয় উপদেশ সকল লিখিত হইয়াছে। বালকে বিনা উপদেশেও ইহা বুঝিতে পারে। আমাদিগের বিবেচনায় রুগ্ন বাঙ্গালীর সন্তানকে যদি কোন গ্রন্থ পড়িতে হয়, তবে এই গ্রন্থ সকলের অগ্রে পড়া উচিত। শুনিয়াছি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সরল পুস্তকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। আমরা এমন বিবেচনা করিনা যে ইহার অপেক্ষা উত্তম পুস্তক তাঁহারা পাইবেন—বিশেষ সাহেবের লেখা গ্রন্থ কখন এ দেশীয় লোকের ব্যবহারে উপযোগী হইবে না। আমাদের বিবেচনায় এই গ্রন্থখানি যাবতীয় ভারতবর্ষীয় ভাষায় অনু-বাদিত হইয়া সর্ব্বত্র বিদ্যালয়ে প্রচলিত হওয়া বিধেয়।

ইহাতে লিখিত কয়টি প্রস্তাব আছে;—স্নান, আহার, পান, শয়ন, নিদ্রা, ব্যায়াম, পরিধান, পীড়ার সময় সাধারণ নিয়ম, কতিপয় অতি প্রয়োজনীয়

মুষ্টিযোগ। পীড়ার সময়, ও সাধারণ নিয়ম এই দুইটি বিষয় ইহাতে নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থখানি পূর্ব্বাপেক্ষাও বিশেষ উপকারী হইয়াছে।

জাতীয় উদ্দীপনা। ঢাকা গিরিশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সংগ্রহকারের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইলাম। তিনি অনেক গুলি "ভারতজাগানে" ভাল মন্দ কবিতা একত্র করিয়াছেন। প্রথমেই মুখবন্ধশীর্ষক এক বিজ্ঞাপন। কাহাব "মুখবন্ধ" কবিবাব উদ্দেশ্য তাহা আমরা ঠিক অনুভব করিতে পারি নাই। যদি সংগ্রহকারের মুখবন্ধ হইত, তাহা হইলে ভাল ছিল, কোন নূতন পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল না। যদি সমালোচকের মুখবন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সফল হয় নাই, বরং ঐ কয়েক ছত্র না লিখিলে তাহা হইতে পারিত। সংগ্রহকার এক স্থলে আহ্লাদে লিখিয়াছেন, "ভারতসমাজে ধীবে ধীরে স্বজাতি পক্ষপাতিত্ব প্রবেশ কবিতেছে।" কিন্তু অনেকে বলিবেন, এ কথা সত্য হইলে আক্ষেপের বিষয়।

প্রকৃতিতত্ত্ব। শ্রীশ্রীরাম পালিত প্রণীত। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালিকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বালক বালিকাগণের শিক্ষার্থ পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক এই পুস্তকখানি পদ্যে লিখিত হইয়াছে। পদ্য সহজেই বালকদিগের আয়ত্ত হয় বলিয়া গ্রন্থকার পদ্য লিখিয়াছেন; তাহার নমুনাস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল।

"তড়িৎ হয়েছে পুন দ্বিবিধ প্রকার,
কাচ্য ধৌন প্রকৃতিতে স্ত্রী পুরুষাকার।
স্বাভাবিক অবস্থায়
বস্তু মাত্রে রক্ষা পায়
সমভাবে স্ত্রী-আকার পুরুষ আকার,
যখন অধিক যেটী মুক্তভাব তার।"

দুঃখিনী। প্রথম খণ্ড। শ্রীহরিশ্চন্দ্র সরকার প্রণীত। পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দে দ্বারা সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। কলিকাতা। বি, পি, এমস্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

এই গ্রন্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। একদিন মেঘাবৃত অমাবস্যার রাত্রে কোন পথিক এক বনমধ্যে ভারতমাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখেন। বহু কষ্টে তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলে পূর্ব্ব সুখ সম্ভ্রম স্মরণ করিয়া ভারতমাতা কাঁদিতে লাগিলেন। কবি

সেই শোকোক্তিগুলি গ্রন্থিত করিয়া সাধারণ সমক্ষে উপহার দিয়াছেন, আমরা সাদরে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিলাম।—

আয়রে ক্ষেত্রমোহন এ বঙ্গ ভবনে
কলে পাখা টানা, আর কল ময়দার,
কে সৃজিবে এবে ?

এ ভারতমাতা কোন বনে ছিলেন ?

এই গ্রন্থের ফুট নোট গুলি আরও মধুর। ২১ পত্রের নোট এইরূপ লিখিত হইয়াছে। "সতীশচন্দ্র নবদ্বীপের রাজা ছিলেন। তিনিই প্রথমে পঞ্জিকা প্রচার করেন।"

ভুবনমোহিনী প্রতিভা। Edited and published by Nabin Chandra Mukherjee. গুপ্ত প্রেস, কলিকাতা।

অনেক দিন হইল, এই পুস্তকেব প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ আমরা পাইয়াছি ; কিন্তু নিতান্ত অপ্রয়োজন বলিয়া আমরা ইহার সমালোচনা করি নাই, কারণ এ গ্রন্থ বিলক্ষণ পবিচিত ও সমাদৃত।

কবিতানিকর। প্রথম ভাগ। গৌড়াপাড়া স্কুলের ছাত্র শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা চিকিৎসা প্রকাশ যন্ত্রে শ্রীনিত্যানন্দ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। ১২৮৪ সাল।

লেখকের বয়স ১৪ বৎসর। বালকের নিমিত্ত বালকে লিখিয়াছে।

কুসুম-বিকাশ। প্রথম ভাগ। নিম্নশ্রেণীর বালক বালিকাগণের শিক্ষার্থ ময়মনসিংহ ভারতমিহির যন্ত্রে শ্রীযদুনাথ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ১৭৯৭ শকঃ।

পুস্তকখানি যে উদ্দেশে লিখিত হইয়াছে তাহার অনুপযুক্ত নহে।

ষষ্ঠ বর্ষ ঃ নবম সংখ্যা
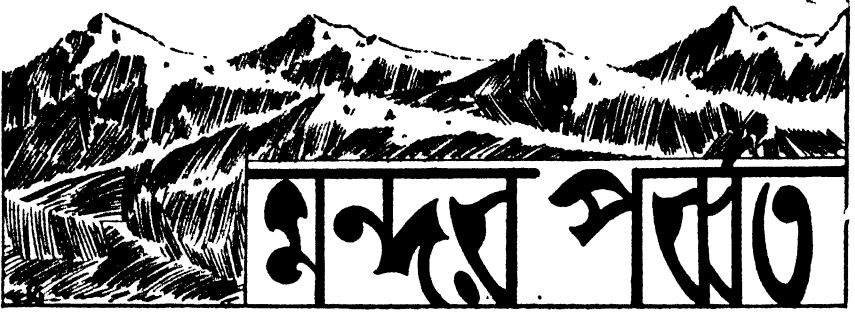
কয়েক মাস গত হইল, বঙ্গদর্শনে "বঙ্গের উন্নতি" নামক প্রবন্ধে 'মন্দরপর্ব্বতের নিকট প্রথমে আর্য্যেরা বাস করিয়াছিলেন,' উল্লেখ করা হইয়াছিল। কাম্বে উপসাগবের উপকূলে নর্ম্মদা নদীর সঙ্গম হইতে, বাঙ্গালার পশ্চিমোত্তর ভাগীরথীব মোহনা পর্য্যন্ত বিন্ধ্যাচল ব্যাপ্ত আছে। এই অচল রাজমহলের নিকট হইতে বক্রগতিতে ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে বীবভূম, বাকুড়া ও মেদিনীপুরের পশ্চিম দিয়া উড়িষ্যাপ্রদেশে নীলাচল নামে খ্যাত হইয়া, পরে মহেন্দ্র অর্থাৎ পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতের সহিত মিলিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষকে বিন্ধ্যাচল উত্তর দক্ষিণে দ্বিধাকৃত করিয়াছে। মন্দরভূধর * এই বিন্ধ্যগিরির অন্যতর শিখর। ব্লাণ্ড্ফোর্ড্ প্রভৃতি ভূতত্ত্ববিদেরা বিন্ধ্যগিরিকে হিমাচল অপেক্ষা প্রাচীন অনুভব করিয়াছেন। যখন বিন্ধ্যগিরি উন্নতমস্তকে যেন দিবাকরের গতিরোধের উদ্যোগে ছিলেন, তখন নগাধিরাজ হিমবানের এক্ষণকার ন্যায় আধিপত্য হয় নাই। বিন্ধ্যাচলের গঠনে যে প্রস্তরসমূহ দেখা যায়, তাহা ভূগর্ভে অতিশয় নিম্নস্তরে লক্ষিত হয়, কিন্তু হিমালয় তদপেক্ষা উচ্চস্তরের প্রস্তর-গঠিত এবং তাহা অপেক্ষাকৃত ভঙ্গুর। অতএব হিমাচলের সৃষ্টির পূর্ব্বে বিন্ধ্যের উদ্ভব বোধ হয়। কিন্তু উন্নতি বা অবনতি কাহারও চিরদিন থাকে না। কখন সামান্য পশু-পদ-দলিত সমতলক্ষেত্র ক্রমশঃ উচ্চ পর্ব্বতমালায় পরিণত হইয়া অভ্রভেদ করিতেছে, কখন বা চন্দ্রসূর্য্যের গতিরোধকারী অচলরাজও ক্রমে নতশির হইয়া অবশেষে প্রান্তরের আকার ধারণ করিতেছে। ফলতঃ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা উপর্য্যুপরি জলবায়ুর ঘাত প্রত্যভিঘাতে পর্ব্বতস্থ প্রস্তরখণ্ডসমূহ শিথিল হইয়া থাকে। পরে বেগবতী স্রোতস্বতী শিলাখণ্ড সকলকে চূর্ণীকৃত করিয়া সাগরাভিমুখে লইয়া ফেলে। এইরূপে কোথাও বা অধিত্যকা নিম্ন হইতেছে, কোথাও জলধি-ক্রোড়স্থ নদীমাতৃক প্রদেশ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া বিস্তৃত

---

* Asiatic Society's Journal vol. xx.

রাজ্য, নগরমালাবিরাজিত বাণিজ্য ব্যবসায়ীর আবাসভূমি হইতেছে। বিন্ধ্যাচল এক সময় হিমাচল অপেক্ষা উন্নতশির ছিল। পুরাণে দেখা যায় যে, বিন্ধ্যগিরি চন্দ্র সূর্য্যের গতিরোধ করায় দেবতারা বিন্ধ্যের গুরু অগস্ত্য ঋষিকে চন্দ্র সূর্য্যের নির্ব্বিঘ্নে গমন জন্য উপায় করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; তাহাতে অগস্ত্য বিন্ধ্যের নিকট উপস্থিত হইলে অচল প্রণাম করিল। অগস্ত্য "তিষ্ঠ" বলিয়া চলিয়া গেলেন। সেই অবধি বিন্ধ্যাচল হেঁটমস্তক। গল্পটি অপ্রকৃত হইলেও এই প্রবাদ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বিন্ধ্যাচলের অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। ক্রমেই হেঁট মস্তক।

পূর্ব্বে আর্য্যের আবাসভূমি বিন্ধ্যের উত্তরে সপ্তসিন্ধু ও সুরনদীর তীরে ছিল। তখন নর্ম্মদা গোদাবরী ও কাবেরী তীর্থ হইয়া উঠে নাই। দাক্ষিণাত্যে ও বাঙ্গালায় আর্য্যেরা প্রায় এককালীন বসতি আরম্ভ করেন। গঙ্গাসাগর ও কামাখ্যা সেই সময় পুণ্যস্থান হইয়া উঠিল। বেদে এ সকল তীর্থের উল্লেখ নাই। পুরাণে অপর তীর্থের নাম আছে, কেবল যোগিনী তন্ত্রে কামাখ্যার কথা সবিস্তারে আছে।

অগস্ত্য বিন্ধ্যাচলকে "তিষ্ঠ" বলিয়া দক্ষিণ দেশে চলিয়া যান, আর ফিরিয়া আসেন নাই। ইহাতে অনুভব করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অগস্তই দক্ষিণা-পথে প্রথম আর্য্য উপনিবেশ স্থাপন করেন। অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র লঙ্কাজয় করিয়া দক্ষিণাঞ্চলে আর্য্যনিবাস স্থাপন করেন নাই। ইহার একটি প্রমাণ এই— যদি রামায়ণাদি গ্রন্থ সত্যমূলক বলিয়া প্রতীত হয়, এবং এক্ষণকার পুরাবিদেরাও তাহাই স্বীকার করেন, তবে রামচন্দ্রের লঙ্কাগমনের পূর্ব্বে তথায় আর্য্যদিগের বাস ছিল; কেননা তথায় আর্য্য দেবতাপূজা প্রচলিত ছিল। রাবণ স্বয়ং নিকষার গর্ভে বিশ্বশ্রবার পুত্র, অতএব রাবণও আর্য্য হইতে উৎপন্ন।

বিন্ধ্যাচলের পূর্ব্বসীমা রাজমহলের নিকটস্থ পর্ব্বতের সন্নিহিত, পূর্ব্বে অনার্য্য প্রদেশ ছিল। ঐ অনার্য্যজাতি এক্ষণে পর্ব্বতশিখরাদিতে বাস করিতেছে। তাহারা সন্তাল নহে; সন্তালদিগের অপেক্ষা ভীরু ও কার্য্যে অপটু। কিন্তু এই সকল পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রাচীন হিন্দুজাতির নিবাসের অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়। দুই একটি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও পাষাণময়ী প্রতিমা অঙ্গহীন হইয়া আছে। বর্ত্তমান সন্তালভূমির মধ্যে গিরিব্রজে নওগাছি নামক স্থানে একটি মন্দির আছে; তাহার অবয়বে বোধ হয়, উহা অনেক প্রাচীন কালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুভব করেন, মুঙ্গেরে জরাসন্ধের রাজধানী ছিল। যাহা হউক আর্য্যেরা যে এই বিন্ধ্যগিরির সীমা "দামনই কূট" পর্ব্বতের অধিত্যকাদিতে প্রথমে বসতি করিয়া, পরে বাঙ্গালায় বাস করিয়াছিলেন, তাহা কথঞ্চিৎ অনুভূত হইতেছে।

মন্দর পর্ব্বত ভাগীরথীর নিকট ভাগলপুর হইতে ন্যূনাধিক ২০ ক্রোশ দক্ষিণে। ইহা প্রায় ৫৩২ হাত উচ্চ ও গ্রানাইট নামক দুর্ভেদ্য প্রস্তরে গ্রথিত। সমস্ত বিন্ধকূট যেমন ক্রমে নিম্ন হইয়া আসিয়াছে, মন্দরও বোধ হয় তদ্রূপ হইয়া থাকিবে, বর্ত্তমানকালে মন্দর অল্পোচ্চ মাত্র। এই মন্দর পর্ব্বতের নিকট দেবাসুরের সংগ্রাম হইয়াছিল। সমুদ্র মন্থন করিয়া যে সকল রত্নলাভ হইয়াছিল, তাহা কৌশলে দেবতাদিগের হস্তগত হইল। লক্ষ্মী উঠিলেন, বিষ্ণু লইলেন। উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক, ঐরাবত হস্তী ও পারিজাত পুষ্প ইন্দ্রের করে পড়িল। অবশেষে ধন্বন্তরি অমৃতপাত্র হস্তে অগাধজলরাশি হইতে উঠিলে, অমৃত লইয়া বিবাদ ঘটিল; এবং ভগবান বিষ্ণুর কুহকে দানবেরা অমৃতে বঞ্চিত হইল। ইহাতে বোধ হয়, বৈদ্যরাজ ধন্বন্তরি বাঙ্গালাপ্রদেশে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার বিদ্যাবলে ও ঔষধ দ্বারা মরণোন্মুখ আর্য্যসন্তানেরা প্রাণ পাইতেন। বৈদ্যকশাস্ত্র ও ঔষধাদি অনার্য্যদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। ভারতে বৈদ্যের উদ্ভব বাঙ্গালায়, এ কথাটী অযৌক্তিক বোধ হয় না। কারণ জঙ্গলময় নিম্নভূমি আদৌ মনুষ্যের আবাসযোগ্য ছিল না; পরে ক্রমশঃ মনুষ্যের সমাগম হইলে পীড়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। পীড়া হইলে তাহার নিবারণচেষ্টা স্বতই হইয়া থাকে। অভাব হইলেই পূরণের চেষ্টা হয়, এবং চেষ্টা দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি। এইরূপে বাঙ্গালায় ভৈষজ্য শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, পরে মগধ ও কাশী প্রভৃতি স্থানে তাহার চর্চ্চা হয়। ধন্বন্তরির পর দিবদাস বৈদ্যশাস্ত্রে খ্যাতি লাভ করেন। কোন কোন পুরাবিদের মতে দিবদাস কাশীর রাজা ছিলেন। লক্ষ্মী প্রথমে বাঙ্গালার সাগর হইতে উঠিলেন। ইহার দুই অর্থ সম্ভব; এক, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।" বঙ্গবাসীরা যানাদি দ্বারা সমুদ্রপথে নানা দিগ্‌দেশ হইতে বাণিজ্যে অর্থসংগ্রহ করিয়া আর্য্যদিগের মধ্যে ধনাঢ্য হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ বঙ্গবাসীরা যে পুরাকালে বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা সংশয়াতীত। আর একটী অর্থ—বাঙ্গালার উর্ব্বরা ভূমি। প্রচুর শস্যসমাগম দ্বারা বাঙ্গালার লোক ভাগ্যবন্ত হইয়াছিলেন। মন্দরপর্ব্বতের খর্ব্বতার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার লক্ষ্মীও চঞ্চলা হইয়াছেন। সুরভি গো ও ঐরাবত হস্তী বাঙ্গালায় জন্মিয়াছিলেন, ইহা বিচিত্র নহে। গো, মহিষ, হস্তী, বাঙ্গালায় বহুকাল হইতে আছে; এবং যদিও এক্ষণে হীনবল ও লঘুকায় হইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বকালে অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকার ছিল, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ তৃণজীবীদিগের আবাসভূমি বাঙ্গালাই সম্ভব। কিন্তু উচ্চৈঃশ্রবার বংশ কোথায় গেল? ইন্দ্র কি অমরাবতীতে লইয়া গিয়াছেন, না এই পথ দিয়া তিব্বতে গমন করিয়াছে? মন্দরের পাদদেশে আর্য্যকুল, লক্ষ্মী ভাগ্য গোমেষাদি লাভ করিয়া

বাঙ্গালা সুখের স্থান মনে করিয়াছিলেন। পীড়া হইত বটে, কিন্তু উৎকৃষ্ট বৈদ্যের দ্বারা তাহা অল্প সময়েই নিবারিত হইত; বরং তাঁহারা দীর্ঘায়ু হইতেন। কালের বিচিত্র গতি! বাঙ্গালায় আর শ্রী নাই; আর বাণিজ্য নাই; আর বৈদ্য নাই। আবার বাঙ্গালা আর্য্যের আবাসের অযোগ্য হইয়া উঠিতেছে।

মন্দরের পূর্ব্বদিক ঐ পর্ব্বত হইতে স্খলিত প্রস্তরখণ্ড সকলে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। দক্ষিণে সোপানাবলি, অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ, পাষাণমূর্ত্তি, অক্ষরাঙ্কিত প্রস্তরাদি ও তড়াগ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। এই সকল দেখিয়া বোধ হয়, প্রাচীনকালে এখানে একটি বিশিষ্ট সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে মনোহর কুণ্ড নামে এক প্রশস্ত পুষ্করিণী আছে। ঐ পুষ্করিণীর প্রান্তে বিচিত্র স্তম্ভমালা, অঙ্গহীন পাষাণমূর্ত্তি সকল আছে, এবং পর্ব্বতে উঠিবার জন্য ৪০০ সোপান আছে। পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে প্রায় ১৩০ হস্ত উর্দ্ধে অনেক দূর ব্যাপিয়া প্রাচীবের গর্ত্ত আছে, কিন্তু প্রাচীরের কোন চিহ্ন নাই। মন্দিরের ভগ্ন ও খোদিত প্রস্তর সকল পড়িয়া আছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন কেহ গঠিতে গঠিতে ফেলিয়া গিয়াছে। পর্ব্বতের মধ্যভাগে এক প্রকাণ্ড মনুষ্যমূর্ত্তি খোদিত আছে। মনুষ্যটি বসিয়া আছে, তথাচ প্রায় ৩৫ হাত উচ্চ। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে যখন ডাক্তাব বুকানন তথায় গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি শুনিয়াছিলেন ঐ মূর্ত্তি মধুকৈটভেব। বুকানন সাহেব সংস্কৃতানভিজ্ঞ, নতুবা মধু ও কৈটভ উভয়েব এক মূর্ত্তি হওয়া সম্ভব নহে অবশ্য বুঝিতে পারিতেন। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে কাপ্তেন সাবওইল শুনিয়াছিলেন যে মূর্ত্তিটি ভীমসেনের। ফলতঃ আকার পুরুষের বটে এবং মস্তকে কিরীট আছে। কিন্তু ইহার পূজা হয় না। মন্দরের শিখরে একটি ক্ষুদ্র দেবালয় আছে। তথায় মাঘ মাসে যাত্রী আসিয়া পূজা করিয়া থাকে।

হিমাচলের উর্দ্ধভাগেও হিন্দুদিগের নির্ম্মিত দেবালয় দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে গলিততুষাররাশি হইতে গোমুখাকৃতি পর্ব্বতমধ্যে ভাগীরথীর প্রবাহ পড়িতেছে, সেখানে হিন্দুদেবালয় কেদার, তন্নিম্নে হরিদ্বার। বাঙ্গালার উত্তরে দুর্জ্জয় লিঙ্গ, আসামে কামাখ্যা। এই প্রকারে প্রাচীন আর্য্যেরা পার্ব্বত্যপ্রদেশে দেবালয় স্থাপন করিতে ভালবাসিতেন, বুঝা যায়। পাষাণে দেবমূর্ত্তি খোদিত করাও তাঁহাদের বিলক্ষণ স্বভাব ছিল। অধুনাতন পুরাবিদেরা কহিয়া থাকেন যে এ বিষয়ে বৌদ্ধেরা হিন্দুদিগের গুরু। এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমমূলক; কেন না বৌদ্ধের জন্ম হিন্দু হইতে, হিন্দুদিগের নিকট বৌদ্ধের শিক্ষা এবং বৌদ্ধেরাও হিন্দুধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। কেবল তাঁহাদের সামাজিক ব্যবহার কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ও ধর্ম্মসম্বন্ধে সামান্য ভাবে কিছু পরিত্যক্ত কিছু বা পরিবর্দ্ধিত

হইয়াছিল মাত্র। আবার সেই সকল মত হিন্দুধর্ম্মে মিশিয়া গিয়াছে। ফাহিয়ান নামক চীন পরিব্রাজকের ভ্রমণবার্ত্তা ও কহ্লনভট্টের রাজতরঙ্গিণী উভয়ই ইহার সাক্ষ্য। প্রথম গ্রন্থের বারন্নুফ, লাসেন প্রভৃতির টীকা পাঠ করিলে নিশ্চয়ই উপলব্ধি হয় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণদিগের বিরোধী ছিল না, প্রত্যুত অনেকাংশে পোষক ছিল। শর্ম্মণ ও দেবশর্ম্মণ (ব্রাহ্মণ) উভয়ই পূজ্য ছিল। ইন্দ্রাদি দেবতাও পদচ্যুত হন নাই, অদ্যাপি বৌদ্ধেরা হিন্দুদেবতার পূজা করেন।* অতএব বৌদ্ধই হউক, আর হিন্দুই হউক, মন্দর প্রভৃতি পর্ব্বতাদিতে যে সকল দেবমূর্ত্তি খোদিত আছে, তাহা হিন্দুরই; তৎপক্ষে সংশয় নাই।

আকাশে মেঘ কি কুজ্ঝটিকা না থাকিলে মন্দরের শিখর হইতে উত্তরে হিমাচল ও পশ্চিমে বিন্ধ্য দেখা যায়। গঙ্গার তটস্থ পাটনা, ভাগলপুর প্রভৃতি সুরম্য নগরাদিও বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এদিকে ভাগীরথীর তটে নানা সমৃদ্ধিশালিনী নগরী বঙ্গলক্ষ্মীর আবাসভূমি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটি ও আরও দুই চারিটি প্রাচীন। পদ্মরাগ মণি বাঙ্গালার পশ্চিম প্রদেশে পাওয়া যাইত। এক্ষণে উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যে পাওয়া যায়। এই মণিই কি ভগবান্ বিষ্ণুর কৌস্তুভ! অথবা ভাগীরথীরূপা রজ্জুতে বিচিত্ররত্নমালাসদৃশী নগরীসমূহ আর্য্যপ্রবরের কণ্ঠের হার হইয়াছিল। ফলতঃ সপ্তসিন্ধুর তট হইতে আর্য্যজাতি ক্রমে পূর্ব্বাভিমুখে আগমন পূর্ব্বক মন্দরভূধরের নিকট কিম্বা বিন্ধ্যের পূর্ব্বসীমা "দামনই কূ"র নিকট উত্তুঙ্গতরঙ্গরাজিবিরাজিত প্রশস্ত ভারত-সাগরের সন্নিধি প্রথমে পাইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে কখন রত্নাকর দেখেন নাই। অতএব বঙ্গদেশে আসিয়া পশুপালনকারী, গোধনে ধনী, আর্য্যেরা কৃষি ও বাণিজ্য যুগপৎ অভ্যাস করিয়া নানা রত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সকলই রত্নাকরের কল্যাণে। দূরস্থিত সুমাত্রা যব ও লঙ্কা আর্য্যদিগের গম্যস্থল হইয়া উঠিল। আবার গঙ্গা ও তাহার শাখানদীর তীরে উর্ব্বরাক্ষেত্রসকল কর্ষণে প্রচুর শস্য-লাভ হইল।

পুরাণে কথিত আছে, দেবতারা বাসুকির লাঙ্গুলের দিকে, ও অসুরেরা মুখের দিকে ছিলেন। জ্যোতিষের মতে বাসুকি ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক এই তিন মাস পূর্ব্বশির হইয়া থাকেন। এইরূপে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে তিনমাস করিয়া বাসুকির শির ফিরিয়া থাকে। আর্য্যেরা পশ্চিম ও উত্তর হইতে গঙ্গার প্রবাহ ধরিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন সন্দেহ নাই; এবং তৎকালে মন্দরপর্ব্বতের অনতিদূরেই উক্ত প্রবাহ ছিল; এক্ষণে চিরচঞ্চলা কল্লোলিনী অনেক উত্তরে

* Cunningham's Ladak.

সরিয়া গিয়াছেন। অতএব অনার্য্য অসুরেরা ঐ পর্ব্বতের দক্ষিণ ও পূর্ব্বধারে থাকাই সম্ভব। ইহাতে এক প্রকার অনুভব হয় যে, বর্ষার সময় আর্য্য পিতামহেরা অস্মদ্দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় আসিবার কিছু পূর্ব্বে যে মিথিলা মগধ দেশে আর্য্যেরা বাস করিয়াছিলেন, তাহার সংশয় নাই। কারণ মানবধর্ম্ম-শাস্ত্রে উক্ত উভয় স্থল আর্য্য, ও বাঙ্গালা অনার্য্য বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে। অতএব মগধ ও মিথিলা হইতে মন্দর পর্ব্বত দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত থাকায় এক প্রকার অনুভূত হইতেছে যে, যখন তাঁহারা মন্দর পর্ব্বতের সন্নিধানে আসিয়াছিলেন, তখন বাসুকি দক্ষিণ কি পূর্ব্বশির ছিলেন; অর্থাৎ বর্ষা ছিল।

সমুদ্রমন্থনে যে অমৃত উঠিয়াছিল, রাহু চণ্ডাল তাহা চুরি করিয়া রাখাতে চন্দ্র তাহা প্রকাশ করেন, এবং বিষ্ণুচক্র দ্বারা রাহুকে দ্বিধা করিয়া রাহু ও কেতুর সৃষ্টি কবেন। এই গল্পটীর মূলে আমাদিগের বিবেচনায় একটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। অনুমান হয়, ঐ সময় জ্যোতিশাস্ত্রের আলোচনা বিশেষরূপে হইয়াছিল, এবং গ্রহণাদিব গণনা আরম্ভ হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে জ্যোতিষের সামান্য সামান্য জ্ঞান প্রকাশ পায়। বৈদিক জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে উক্ত শাস্ত্রের আলোচনা যে পূর্ব্ব হইতে ছিল, তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়; কিন্তু গ্রহণের প্রকৃততত্ত্ব বোধ হয় আর্য্যেরা বাঙ্গালায় আসিবার সময় প্রথমে জানিতে পারিয়া-ছিলেন। বঙ্গদর্শনেব পাঠকগণ মনে করিতে পারেন যে, বাঙ্গালায় আসিয়া আর্য্যেরা বৈদ্যকশাস্ত্র, বাণিজ্য, জ্যোতিষ তত্ত্ব সকলই উত্তম শিক্ষা করিয়াছিলেন, এ কথা বলায় কেবল গরিমা প্রকাশ মাত্র। কিন্তু যথার্থপক্ষে আর্য্যেরা বাঙ্গালায় আসিবার কালে সভ্যতা ও জ্ঞান উভয়ে উন্নতি লাভ করিবেন তাহার বিচিত্র কি? সপ্তসিন্ধুর তীর হইতে অনার্য্য দস্যু, রাক্ষস প্রভৃতি বলবান্ অথচ অসভ্য এবং মূর্খ জাতিদিগকে ক্রমে ক্রমে পরাজিত ও নির্ব্বাসিত করিতে বহুকাল গত হইয়াছিল, তৎকালমধ্যে বহুতর শাস্ত্রালোচনা ও শ্রীবৃদ্ধি সম্ভবে না। ফলতঃ যে সময় আর্য্যপ্রবরেরা বাঙ্গালায় পদার্পণ করেন, তাহার অব্যবহিত পরে চন্দ্রগ্রহণ প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। প্রকৃত কাল নিরূপণের উপায় নাই, অথবা এক্ষণে আমাদিগের সন্ধানে নাই। আমাদিগের বিশ্বাস যে বেদ ও পুরাণে নৈসর্গিক ও ঐতিহাসিকতত্ত্ব রূপকাকারে অব্যক্ত আছে। বান্ধব পত্রিকার "সমাজবিপ্লব" নামক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, বিখ্যাত ইংরাজতত্ত্বজ্ঞ বেকনের ন্যায় "প্রাচীনদিগের জ্ঞানে" অর্থাৎ প্রাচীন জাতিদিগের বিশেষতঃ ভারতীয় আর্য্য-দিগের ঐ সকল রূপকাকারে পরিণত তত্ত্বসমূহ আবিষ্ক্রিয়া করিলে সাধারণের উপকার হয় এবং অন্ধকারাবৃত ভারতীয় পুরাবৃত্তের পক্ষে যথেষ্ট আলোক পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে নানাপ্রকার ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন ও এককালীন ভিন্নমতস্থ লোকের অবস্থান এবং রাষ্ট্র ও সমাজবিপ্লবে পুরাতন হিন্দুকীর্ত্তির লোপ হইয়াছে। কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগের মতের বৈষম্যপ্রযুক্ত মন্দির ও দেবতাদির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কোথাও মহাদেব বৌদ্ধ হইয়া বসিয়া আছেন, বা কোথাও বৌদ্ধ যোগীশ্বর মহাদেবের মূর্ত্তি পাইয়াছেন, অথবা ভাস্করের প্রসাদে শুণ্ডবিশিষ্ট গণপতির আকার ধারণ করিয়াছেন। আবার কোথাও বৌদ্ধই হউন, আর কৈলাসপতিই হউন, গাজি সাহেবের দরগায় গড়াগড়ি যাইতেছেন, কি ছিন্নমস্তক হইয়া সোপানের প্রস্তরে গ্রথিত হইয়াছেন। আলেখ্যেরও ঐ গতি। অতএব ভারতের পূর্ব্ববৃত্তান্ত প্রাচীন দেবালয়, বিহারস্তূপ, কি মস্‌জিদে প্রকৃতরূপে পাওয়া দুরূহ।

মন্দিরের প্রতিমূর্ত্তির নিম্নে দুই পংক্তি অক্ষর খোদিত আছে। লেখা বহু দিনের। বর্ত্তমান দেবনাগর নহে। বৌদ্ধমতের প্রাদুর্ভাবের সময় কুটীল অথবা লাঠের অক্ষর হইতে প্পারে। প্রতিমূর্ত্তি ও লেখা এককালীন হইয়াছিল, এমত নিশ্চয় নাই ; একারণ তাহার সময় ও উদ্দেশ্য নিরূপণ হইতে পারে না। কাব্যানুরাগী ভূতপূর্ব্ব ভারতবাসীরা আপনাদের ধর্ম্মতত্ব ও ঐতিহাসিক ও নৈসর্গিক সকল তত্বই গুহায় নিহিত রাখিয়াছেন, এখন আমরা ঢেঁকির কচকচি বিবেচনায় এক একজন নূতন নূতন দেশী বা বিলাতী মহাজন ধরিয়া নানা পন্থা পাইতেছি। যে পথ ধরিয়া মহাত্মা অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র ভারতোদ্ধার করিয়াছিলেন, যে পথে বাল্মীকি বিচরণ করিতে করিতে সেই অলোকসামান্য রূপ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, যে পথ অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবগণ ভারতে অক্ষয় কীর্ত্তিধ্বজা উত্তোলন করিয়াছিলেন, যে পথে ভ্রমণ করিয়া মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহাদিগের ছবি ও তাঁহাদের উপদেষ্টা অগাধবুদ্ধি বাসুদেবের চিত্রপট দেখিয়াছিলেন, যে পথে গৌতম, কনাদ প্রভৃতি মুনিগণ যাতায়াত করিতেন, আজি তাহা সকলেই জঙ্গলময়, গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন, কে আমাদিগকে তাহা দেখাইয়া দিবে ? কেনই বা পিতামহেরা আমাদের বুদ্ধির পরীক্ষাজন্য সমস্ত তত্ব গুহায় লুকাইয়াছেন ? অথবা তাহাতেও কিছু নাই। এ সকল একবার সন্ধান করা প্রয়োজন বটে।
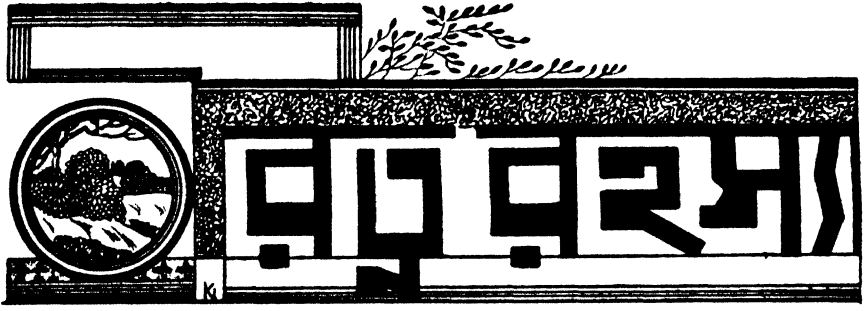
মুক্তা

ভৌজঙ্গম মুক্তা সম্বন্ধে বৃহৎ সংহিতায় লিখিত আছে "তক্ষকবাসুকিকুলজাঃ কামগমা যে চ পন্নগা স্তেষাম্ স্নিগ্ধা নীলদ্যুতয়ো ভবন্তি মুক্তাঃ ফণস্যান্তে।" "নাস্তেঽবনিপ্রদেশে রজতময়ে ভাজনে স্থিতে চ যদি বর্ষতি দেবোঽকস্মাৎ তজ্‌জ্ঞেয়ং নাগসম্ভূতম্।" অর্থাৎ যাহারা তক্ষক ও বাসুকির বংশে উৎপন্ন হইয়াছে, ইচ্ছাগামী, তাহাদের ফণান্তপ্রদেশে মণি জন্মে। তাহার কান্তি নীলবর্ণ ও অতি স্নিগ্ধ। তাহার পরীক্ষা এই যে অনাবৃত পবিত্র স্থানে রজত পাত্রে রাখিয়া দিলে যদি বৃষ্টি হয়, তবে তাহা সর্পমণি।

অতঃপর শুক্তিজ মুক্তার কথা বলা যাইতেছে।

এই মুক্তাই সর্ব্বত্র সুলভ। "তেষাস্তে শুক্তোদ্ভব মেব ভূরি।"

রত্নলক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন যে, সমুদ্রশুক্তির গর্ভেই মুক্তাফল জন্মিয়া থাকে। পরন্তু তাহার নিয়ম দৃষ্ট হয় না, বঙ্গদেশের জলাস্থানের ও নদীর শুক্তিতে ও মুক্তা পাওয়া যায়। অপিচ তাঁহারা মুক্তোৎপত্তির বৈজিকতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য কথা বলেন, তাহা সত্য কি কল্পনা মাত্র, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। তাঁহারা কহেন, বর্ষণ বিশেষের জলধারাই মুক্তোৎপত্তির বীজ। প্রবাদও আছে যে, স্বাতি নক্ষত্রের জল* শুক্তির গাত্রে লাগিলে তাহাদের গর্ভে মুক্তা জন্মে। যথা—

> যস্মিন্ প্রদেশেঽম্বুনিধৌ পপাতসুচারু মুক্তামণিরত্নবীজম্।
> তস্মিন্ পয়স্তোয়ধরাবকীর্ণং শুক্তৌ স্থিতং মৌক্তিকতামবাপ।
> স্বাত্যাং স্থিতে রবৌ মেঘৈর্যে মুক্তা জলবিন্দবঃ।
> শীর্ণাঃ শুক্তিষু জায়ন্তে তে মুক্তা নির্ম্মলত্বিষঃ।

---

* ডাইওস্‌করিডেশ্ এবং প্লিনি বিশ্বাস করিতেন যে, বৃষ্টিবিন্দু শুক্তিগর্ভে পতিত হইলে মুক্তা উৎপন্ন হয়। কবিবর মূরও ইহার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"And precious the tear as that rain from the sky,
Which turns into pearls as it falls in the sea." Moore.

যে জাতীয় মুক্তা আমরা পাইয়া থাকি, সেই মুক্তার এই কয়েক প্রকার শ্রেণী আছে। যথা—

সিংহলিক পারলৌকিক সৌরাষ্ট্রিক তাম্রপর্ণি—পারসবাঃ।
কৌবের পাণ্ড্য বিরাট* মুক্তা ইত্যাবদয়াহ্বাই।

সিংহলিক, পারলৌকিক, সৌরাষ্ট্রিক, তাম্রপর্ণ, পারসব, কৌবের, পাণ্ড্য, ও বিরাট, এই ৮ প্রদেশে মুক্তা জন্মে এবং তাহার আকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, সুতরাং শুক্তিজ মুক্তা প্রধানতঃ ৮ প্রকার। প্রত্যেক প্রকার মুক্তার লক্ষণ নির্দেশ করা যাইতেছে। যথা—

"স্থূলা মধ্যাস্তথা সূক্ষ্মা বিন্দুমানানুসারতঃ।
সুস্নিগ্ধং মধুরচ্ছায়ং মৌক্তিকং সিংহলোদ্ভবম্।"

(শব্দকল্পদ্রুম)

"বহুসংস্থানাঃ স্নিগ্ধা হংসাভা সিংহলাকরাঃ স্থূলা।"

(বৃহৎ সংহিতা)

সিংহলোৎপন্ন মুক্তা স্থূল, মধ্য, সূক্ষ্ম, ও বিন্দু পরিমাণ সকল প্রকারই হয়। এই সকলের ছায়া বা কান্তি মধুর স্নিগ্ধ।" বৃহৎ সংহিতার প্রমাণেরও এইরূপ অর্থ, বহুসংস্থান অর্থাৎ নানাপ্রকার পরিমাণ যুক্ত অর্থাৎ ছোট, বড়, মধ্যম, সকল প্রকার। 'হংসাভা' অর্থাৎ মধুর শুভ্র বর্ণ। বৃহৎ সংহিতার মতে কোন কোন সিংহলীয় মুক্তা ঈষত্তাম্রযুক্ত শুভ্রবর্ণ যথা—

"ঈষত্তাম্র শ্বেতাস্তামো বিযুক্তাশ্চ তাম্রাখ্যা।"

পারলৌকিক দেশীয় মুক্তার লক্ষণ যথা—

"কৃষ্ণাঃ শ্বেতাঃ পীতাঃ সশর্করাঃ পারলৌকিকা বিষমাঃ।"

(বৃহৎ সংহিতা)

এতদ্ভিন্ন শব্দকল্পদ্রুমে একটি প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে যথা—

"পারলৌকিকসম্ভূতং মৌক্তিকং নিবিড়ং গুরু।"

পারলৌকিক দেশীয় মুক্তা কিছু নিবিড় (কঠিন জমাট) ও ওজনে ভারি। কাল, শ্বেত, পীত এই তিন বর্ণ ই হয়। 'প্রায়শঃ শর্করা' অর্থাৎ কাঁকর থাকে এবং বিষম অর্থাৎ উত্তমরূপ গোল হয় না।

---

*কোন পুস্তকে 'বিরাট' পরিবর্ত্তে বাটক পাঠ আছে। বাটক বা বাটধন নামক প্রাচীনকালে সমুদ্র তীরবর্তী স্থান ছিল।

সৌরাষ্ট্র দেশীয় শুক্তিজ মুক্তার লক্ষণ—

"সৌরাষ্ট্রিকভবং স্থূলং বৃত্তং স্বচ্ছং সিতম ঘনম্।"
'ন স্থূলা নাত্যল্পা নবনীতনিভাশ্চ সৌরাষ্ট্রা।"

(বৃহৎ সংহিতা)

সৌরাষ্ট্রদেশীয় মুক্তাফল স্থূল, সুগোল, সুন্দর নির্ম্মল, শুভ্রবর্ণ ও ঘন (কঠিন জমাট)। ইহার আকার স্থূল নহে অর্থাৎ মধ্যম পরিমাণ এবং তাহার আভা অথবা কান্তি নবনীতের তুল্য।

তাম্রপর্ণদেশীয় মুক্তার লক্ষণ—"তাম্রপর্ণভবং তাম্রং"—তাম্রপর্ণদেশোদ্ভব মুক্তা তাম্রাভ হয়। বর্ণ ভিন্ন ইহার অন্যান্য লক্ষণ পারশব মুক্তার তুল্য।

পারশবদেশীয় মুক্তার লক্ষণ—

"পীতং পাবশবোদ্ভবম্।"
জ্যোতিষ্মন্তঃ শুভ্রা গুরবোঽতি মহাগুণাশ্চ পারশবাঃ।

(বৃহৎ সংহিতা)

বৃহৎ সংহিতার মতে পারশব মুক্তা সকল শুভ্র জ্যোতিষ্মান্ গুরু অর্থাৎ ভারে অধিক ও শুভ্রবর্ণ। পবন্তু কল্পদ্রুমধৃত প্রমাণ অনুসারে জ্ঞাত হওয়া যায় যে পারশব মুক্তা পীতাভ হইয়াও থাকে।

কৌবের অর্থাৎ উত্তরদেশীয় মুক্তা ফলের লক্ষণ—

"ঈষৎ শ্যামঞ্চ রুক্ষঞ্চ কৌবেরোদ্ভব মৌক্তিকম্।"
"বিষমং কৃষ্ণং শ্বেতং লঘু কৌবের প্রমাণ তেজোবৎ।"

(বৃহৎ সংহিতা)

কৌবের আকরোৎপন্ন মুক্তাফল ঈষৎ শ্যামবর্ণ অথবা কৃষ্ণ শ্বেতবর্ণ, লঘু, ও রুক্ষ হয় কিন্তু প্রমাণ ও তেজোহীন নহে অর্থাৎ বড় বড় হয় জ্যোতিও থাকে।

পাণ্ড্যদেশীয় মুক্তার লক্ষণ—

"পাণ্ড্যদেশোদ্ভবং পাণ্ডু"
"নিম্বফল ত্রিপুটধান্যকচূর্ণাঃ স্যুঃ পাণ্ড্যবাটভবাঃ।"

(বৃহৎ সংহিতা)

পাণ্ড্য বা পাণ্ডবাট দেশীয় মুক্তার বর্ণ পাণ্ডর এবং গঠন নিম্বফল সদৃশ।

বিরাটদেশীয় মুক্তার লক্ষণ যথা—

"সিতং রুক্ষং বিরাটজম্" (শব্দকল্পদ্রুম)

বিরাটদেশীয় মুক্তার বর্ণ শুভ্র এবং রূক্ষ অর্থাৎ লাবণ্যহীন। বৃহৎসংহিতায় ইহার কোন প্রসঙ্গ নাই।

এই সকল মুক্তা ভিন্ন বৃহৎসংহিতায় হৈম অর্থাৎ হিমপ্রধানদেশীয় মুক্তার বিষয় লিখিত হইয়াছে যথা—

"লঘুজর্জ্জরং দধিনিভং বৃহৎবিসংস্থানমপি হৈমম্।"

হৈম মুক্তা সকল লঘু (হাল্‌কা) জর্জ্জর তুল্য, দধির বর্ণ ও বড় বড় হয়, ছোটও হয়।

"রুক্মিণী" নামক এক জাতি শুক্তি আছে। তাহাতে প্রায় মুক্তা জন্মে না, যদি জন্মে তবে তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। রত্নতত্ত্ববেত্তারা এই জাতীয় মুক্তা দুর্লভ বলিয়া গিয়াছেন যথা—

"রুক্মিণ্যাখ্যাতু যাশুক্তিস্তৎপ্রসূতিঃ সুদুর্লভা।
তত্র জাতং সিতং স্বচ্ছং জাতীফল সমং ভবেৎ।
ছায়াবহুলং রম্যং নির্দোষং যদি লভ্যতে।
অমূল্যং তদ্বিনির্দ্দিষ্টং রত্নলক্ষণকোবিদৈঃ।
দুর্লভং নৃপযোগ্যং স্যাদল্পভাগ্যৈর্ণ লভ্যতে। (গরুড় পুরাণ)

অর্থাৎ রুক্মিণী নামা শুক্তিতে যে মুক্তা জন্মে তাহা দুর্লভ। রুক্মিণী শুক্তিতে যে মুক্তা জন্মে তাহা চন্দ্রকিরণ তুল্য বা শুভ্র বর্ণ, স্বচ্ছ, এবং প্রমাণে ও আকারে জাতীফল তুল্য হইয়া থাকে। রত্নলক্ষণজ্ঞেরা কহেন ছায়া থাকে ও কোন দোষ না থাকে ও দেখিতে রম্য ও বড় হয় যদি এতাদৃশ রুক্মিণীমুক্তা ভাগ্যবশতঃ লাভ হয় তবে তাহা অমূল্য। ফলত এরূপ মুক্তা দুর্লভ, রাজার যোগ্য, অল্পভাগ্য মানবেরা ইহা পায় না।

পুরাতন রত্নতত্ত্ববেত্তাগণের মধ্যে দুই দল ছিল। এক দলের পণ্ডিতেরা কথিত প্রকারে দেশবিশেষে মুক্তার আকার বর্ণাদি ভিন্ন হয় বলিয়া স্বীকার করিতেন, অপর সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা এই নিয়ম স্বীকার করিতেন না এবং কহিতেন যে সর্ব্বত্র সকল প্রকার মুক্তা হইতে পারে। যথা—

"সর্ব্বস্তু তস্যাকরজা বিশেষাৎ রূপ প্রমাণে চ যথৈব বিদ্বান্।
নহি ব্যবস্থাঽস্তি গুণাগুণেষু সর্ব্বত্র সর্ব্বাকৃতয়ো ভবন্তি।" (শব্দকল্পদ্রুমঃ)

মুক্তাধারণের শুভাশুভাদি কল্পনাকারী রত্নপরীক্ষকেরা মনুষ্যের ন্যায় শুক্তিরও চারিপ্রকার জাতি কল্পনা করিয়া তদুদ্ভব মুক্তাফলেরও চারিজাতি কল্পনা করিয়া গিয়াছেন যথা—

"ব্রহ্মাদি জাতিভেদেন শুক্তয়োপি চতুর্বিধাঃ।
তাসু সর্ব্বাসু জাতং হি মৌক্তিকং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্।
ব্রাহ্মণস্তু সিতঃ স্বচ্ছো গুরু শুক্লং প্রভান্বিতঃ
আরক্তঃক্ষত্রিয়ঃ স্থূল স্তথারুণবিভান্বিত।
বৈশ্যস্তাপীত বর্ণোপি স্নিগ্ধঃ শ্বেতঃ প্রভান্বিতঃ।
শূদ্রঃ শুক্লবপুঃ সূক্ষ্ম স্তথা স্থূলোঽসিতদ্যুতিঃ।"

(শব্দকল্পদ্রুম)

শুক্তি সকল ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে চতুর্বিধ। ইহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিজাতীয়। এই চারিজাতি শুক্তিতে উদ্ভূত মুক্তা ফলও সুতরাং চতুর্বিধ। যে সকল শুক্তি শ্বেত, নির্ম্মল, ভারি, শুক্লপ্রভাযুক্ত তাহারা ব্রাহ্মণ জাতীয়, যে সকল শুক্তি ঈষৎ রক্তবর্ণ, স্থূল ও অরুণিম প্রভাযুক্ত তাহারা ক্ষত্রিয় জাতি, যাহারা ঈষৎ পীতবর্ণ স্নিগ্ধ ও শুভ্র প্রভান্বিত তাহা বৈশ্যজাতীয় এবং স্থূল কৃষ্ণবর্ণ শুক্তি সমূহ শূদ্রজাতীয়।

শুক্তিজ মুক্তা সম্বন্ধে আমাদিগের অনেক বক্তব্য আছে তাহা পরে লিখিব এক্ষণে কেবল সকল শ্রেণীর মুক্তা সম্বন্ধে স্থূল স্থূল বিষয় বলা যাইতেছে। রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ীরা বলেন বেণু অর্থাৎ বাঁশেও পাথর জন্মে তাহাই বেণুজ মুক্তা নামে পরিগণিত যথা—

"বর্ষোপলানাং সমবর্ণ শোভং ত্বক্‌সার মধ্যপ্রভবং প্রদিষ্টম্।
তে বেণবো দিব্য জানোপভোগ্যে স্থানে প্রয়োঽস্তি ন সর্ব্বজন্যে।

(শব্দকল্পদ্রুমঃ)

ত্বক্‌সার অর্থাৎ বংশে যে মুক্তাফল জন্মে তাহা বর্ষোপলের (শিল) ন্যায় বর্ণ ও শোভাবিশিষ্ট। মুক্তাকর বংশ সকল স্থানে জন্মে না। কেহ কেহ বলেন যে স্বর্গীয় পুরুষদিগের উপভোগযোগ্য, তাদৃশ স্থানেই জন্মিয়া থাকে। কেহ কেহ "বংশলোচন"কেই বেণুজ মুক্তা কহেন বস্তুতঃ তাহা নহে। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে—

"কর্পূরস্ফটিকনিভং চিপিটং বিষমঞ্চ বেণুজং জ্ঞেয়ম্।"

বেণুজ মুক্তা কর্পূর কি স্ফটিক তত্তুল্য আভাযুক্ত চেপ্টা, বিষম অর্থাৎ অসমান হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন "কল্পদ্রুমে" আর কয়েকটি বিশেদ লক্ষণ আছে যথা—

"বংশজং শশিসঙ্কাশং কঙ্কোলী ফল মার্দ্রকম্।
প্রাপ্যতে বহুভিঃ পুণ্যৈ সুভ্রক্ষ্যং বেদমন্ত্রতঃ।"

বংশজাত মুক্তা চন্দ্ররশ্মি কি কর্পূরের ন্যায় প্রভাযুক্ত, কঙ্কোল নামক ফলের ন্যায় গঠন, স্নিগ্ধ। বহু পুণ্য না থাকিলে বংশজাত মুক্তা লাভ হয় না। ইহা বেদমন্ত্র দ্বারা গৃহে রক্ষা করিতে হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীরামদাস সেন

ইস্কুল ছাড়িয়া কালেজে ঢুকিবামাত্র ইংরেজি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত তিন ভাষার রাশি রাশি সাহিত্য বঙ্গীয় যুবকের সম্মুখে বিস্তাবিত হইল। চসার, স্পেনসার, সেক্সপীয়র, মিল্টন, ড্রাইডেন, পোপ, সেলি, বায়রণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন্; কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, নৈষধ, ভট্টীবাল্মীকি, বেদব্যাস, বেদপুবাণ, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, মাইকেল, হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবি; এডিসন, গোল্‌ডস্মিথ, স্কট, লিটন, ডিকুইন্সি, থাকারি; দণ্ডী, বাণভট্ট, বিষ্ণুশর্ম্মা; হুতোম দীনবন্ধু বঙ্কিম; প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকের গ্রন্থে তাঁহার প্রবেশ অধিকার হইল। দিনকত তিনি এই অগাধ সাহিত্যকাননে যদৃচ্ছ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন কিন্তু যতই যান কাননের শেষ নাই, সকল বৃক্ষই সুমিষ্ট সকলেই আনন্দিত। যুবকহৃদয়—সংসারের ভাবনা নাই। জগতের সৌন্দর্য্য মাত্র তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত। হৃদয়ের বৃত্তি সকল এখনও বিকৃত হয় নাই—এখনও পাকিয়া শক্ত হয় নাই। তিনি ক্রমে সকলপ্রকার সাহিত্যেরই আস্বাদ গ্রহণ করিলেন কিন্তু এই অগাধ সমুদ্রমধ্যে তিনজন লোকই তাঁহার অধিকতর প্রিয় হইল। এই তিনজনই তাঁহার চরিত্রনির্ম্মাণে নীতিশিক্ষা দানে তাঁহার সহায়তা করিল। ধর্ম্মপ্রচারকের রাশি রাশি বক্তৃতা, শিক্ষকের ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ, পিতামাতার লালন পালন ও তাড়ন এই সমস্ত একত্র হইয়া যাহা না করিতে পারিয়াছে তিনজন লোক (যাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার কোন উপায় নাই) সেই নীতিশিক্ষাদানকার্য্য সম্পন্ন করিল। তাঁহাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া তাঁহার মন ফিরিল, তাঁহার চিত্ত মথিত হইল, তিনি মনুষ্যের জন্য ভাবিতে, দুঃখ করিতে, সহানুভূতি করিতে শিখিলেন; কালেজের চারি পাঁচ বৎসরে এই তিন মাহাত্মার স্পিরিট তাঁহাকে যেরূপ গড়িয়া পিটিয়া দিল জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি তাহাই থাকিবেন। সংসারে কত যন্ত্রণা পাইতে হইবে কত কত কষ্টে পড়িতে হইবে তাঁহার কত পরিবর্ত্তন হইবে কিন্তু আদত তিনি যাহা ছিলেন তাহাই থাকিবেন।

ভারতবর্ষে ইংরেজিবিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান উন্নতি হইবার আগে রামায়ণ ও মহাভারত যুবকদিগের চরিত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিত। কথকের মুখ হইতে, গুরুমহাশয়ের পাঠশালা হইতে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে বঙ্গীয় যুবক যে উপদেশ পাইতেন তাহা তাঁহাব অস্থি মজ্জায় বিঁধিয়া থাকিত। আমরণ তিনি রাম বা যুধিষ্ঠিরকে দেবতা বলিয়া মনে মনে উপাসনা করিতেন ও উহাদিগেরই চরিত্র অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। বৃদ্ধবয়সে পুত্র পৌত্রদিগকে নিজ উপাস্য দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দিয়া যাইতেন। রামায়ণ ও মহাভারত হইতে তিনি দেবতা ব্রাহ্মণকে ভক্তি করিতে পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করিতে ভাইকে ভালবাসিতে প্রচলিত ধর্ম্ম যে পথে চালায় সেই পথে চলিতে শিখিতেন। ঐ দুই অগাধ সাহিত্যসমুদ্র মন্থন করিয়া আপনার কার্য্য-প্রণালী নিরূপণ করিতেন। আজিকার বঙ্গীয় যুবক রামায়ণ ও মহাভারত পড়েন না। যদিও পড়েন রাম বা যুধিষ্ঠিবকে তাঁহাদের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য করিতে দেন না। যাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ে একাধিপত্য করেন তাঁহাদের নাম বায়রণ, কালিদাস ও বাবু বঙ্কিমচন্দ্র। তিনজনই যুবকদিগেব চিত্ত আকর্ষণে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিবিশেষ; তাঁহাদের গ্রন্থাবলী পাঠকালে যুবকহৃদয় এমনি গলিয়া যায় যে শেষে তাঁহারা যে পথে উহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা করেন সেই পথেই উহা ধাবিত হয়।

রামায়ণ ও মহাভারত যে সময়ে লিখিত হইয়াছিল তখন পারিবারিক বন্ধন অত্যন্ত প্রবল। এই জন্য রামায়ণ ও মহাভারতের প্রধান উপদেশ সৌভ্রাত্র ও পারিবারিক প্রেম। রামায়ণ ও মহাভারতের রচনাকালে মনুষ্য দৌরাত্ম্যময় অসভ্যাবস্থা হইতে সবেমাত্র স্থির সামাজিক অবস্থায় উপস্থিত হইতেছে। সুতরাং তৎকালীন সমাজের উপর বিশ্বাস ও ভক্তি উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের দ্বিতীয় উপদেশ, তৎসমাজের বিপ্লবকারীদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব তৃতীয়। মনুষ্যগণের দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণের দমন করিয়া শান্তিভাব ধারণ করাণই উক্ত কাব্যরত্নদ্বয়ের মূলমন্ত্র। বাল্মীকি ও বেদব্যাস অথবা তাঁহাদের অনুবাদক কাশীদাস ও কৃত্তিবাস আপন আপন উদ্দেশ্যসাধনে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন যে বঙ্গীয় যুবক প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহাদের একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুগত ছিলেন। অসভ্যতা পশ্বাচার তাঁহার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়াছিল। তাঁহারা তিন চারি পুরুষ পর্য্যন্ত একান্নবর্ত্তী থাকিতে ভালবাসিতেন। দেবতা ব্রাহ্মণের তাঁহারা গোলাম হইয়াছিলেন, পরধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষভাব ভয়ানক প্রবল ছিল। পরধর্ম্মের লোক তাঁহার শান্তিময় সমাজের যত কেন উপকারী হউক না তিনি তাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। কিন্তু পশ্বাচার ও অসভ্যতা

কমিতে কমিতে তাঁহাদের শক্তিরও হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। যাহা দমন করিবার জন্য বাল্মীকি বেদব্যাস হৃদয়বিদ্রাবিণী উন্মাদিনী কবিতাবলী রচনা করিয়াছিলেন সেই পদার্থ সেই শক্তি লোপ হইয়াছিল। দৌরাত্ম্যপ্রিয় উৎপাতপ্রিয় তেজস্বী আর্য্য যুবক কবিতার মোহিনী বলে মেষশাবকবৎ নিরীহ হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের শক্তি স্বাধীনতা তেজ গিয়া উহা কারখানার একটী একটী কলের মত হইয়াছিল। যেমন বাষ্পীয় বলপ্রভাবে সহস্র সহস্র নলী একই ভাবে সকালে ছয়টা হইতে সায়াহ্নে ছয়টা পর্য্যন্ত চলে তেমনি বঙ্গীয় সহস্র সহস্র লোক জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত একই ভাবে চলিত। চালাইত কে? কোন্ বাষ্পীয় যন্ত্রের এরূপ অসীম শক্তি? হিন্দুসমাজের দমন শক্তি। যেমন মধুর সঙ্গীতে বনের মত্তহস্তী পোষ মানিয়া চালকের বশে চলে তেমনি বাল্মীকি ও বেদব্যাসের মনোমোহিনী বীণার বশ হইয়া দুরন্ত শূরজ বংশীয়েরাও দমন হইয়াছিল; বাঙ্গালী ত কোন্ ছার।

আদিম অবস্থার সমাজ-শাসনের প্রধান বিঘ্ন এই যে মনুষ্য কেহ কাহার অধীন হইতে চাহে না এবং সকলেই যাহা খুসী তাই করিতে চায়, সমাজবন্ধন করিতে গেলে obedience প্রথম প্রয়োজন। এই জন্য যাঁহারা প্রথম সমাজ বন্ধন করিয়াছিলেন তাঁহারা ঐটী শিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টা করেন। একপুরুষে সকল উদ্ধতস্বভাব লোককে শাসনাধীন করা যায় না এই জন্য ১০।১৫ পুরুষ পর্য্যন্ত এক নিয়মে থাকিয়া সমাজমধ্যবর্ত্তী সমস্ত লোককে বশ্যতা স্বীকার করান চাহি। রামায়ণ ও মহাভারত এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নির্ম্মিত। বহুকাল অবধিই হিন্দুরা রাম ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রানুকরণ করতঃ সমাজশাসনের অধীন হইয়াছেন। সমাজও উত্তমরূপে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু শুদ্ধ সমাজবন্ধনই ত মনুষ্যের উদ্দেশ্য নহে, সমাজবন্ধন পথ। এই পথে মনুষ্য সভ্যতাসোপানে আরোহণ করিবে; ক্রমে জড়জগতের উপর আধিপত্য করিবে, আপন জাতির সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবে। প্রথম আপন জাতির, ক্রমে আপন দেশের, তাহার পর সমস্ত মনুষ্যের, তাহার পর সমস্ত জীবলোকের উপকার করিবে। যাহাতে জীবলোক জড়ের সহায়তায় দীর্ঘকাল আনন্দ অনুভব করিয়া বিনা ক্লেশে দেহ ত্যাগ করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিবে তবে ত পথ সার্থক হইবে, নচেৎ বনমধ্যে পথ কাটিয়া রাখিলে তাহাতে লাভ কি?

সমাজবদ্ধ হইল কিন্তু সমাজের উদ্দেশ্য কিছু রহিল না। যেমন রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন দেখিয়া মনুষ্য শান্ত হইল সেইরূপ শান্ত হইয়া কি করিবে বুঝিতে পারিল না। তাহাতে এই হইল যে কতক লোক ভোগে আশক্ত হইল আর কতক এ জন্মের ভোগ ত্যাগ করতঃ পরলোকের ভোগের জন্য ব্যস্ত হইল। কতক সুন্দরী

রমণীসহবাসে বিচিত্র সুরাপানে রত হইয়া শীতে উষ্ণগৃহমধ্যে, গ্রীষ্মে প্রমোদ কাননে নির্ঝর গৃহে, জ্যোৎস্নায় ছাদোপরি, রৌদ্রে পুষ্করিণীমধ্যে বিহার করাই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করিল। আবার অনেকে অগ্নিকুণ্ডোপরি ঊর্দ্ধপদে অধোশিরে তপঃ করতঃ পরলোকে নন্দন কাননে উর্ব্বসী মেনকাপরিবৃত হইয়া ইন্দ্রিয়সুখে অনন্তকাল কাটানই মনুষ্য হওয়ার সুখ ভাবিলেন। কেহ দানে স্বর্গ, কেহ স্নানে স্বর্গ, মনে করিলেন। ইন্দ্রিয়সুখই সকলের উদ্দেশ্য হইল—কাহারও ইহলোকে কাহারও পরলোকে। কেহই এ কথা বুঝাইয়া দিল না যে মনুষ্যসমাজের প্রধান উদ্দেশ্য জড়জগতের উপর মনুষ্যজাতীয় আধিপত্য বিস্তার, তুমি আমি এমন কি আমার সমসাময়িক যে কোন ব্যক্তি হউন সমাজ ছাড়িয়া ধরিলে কেহ কিছুই নহেন। যেমন আমরা আমাদের এক পুরুষ আগেকার লোকে যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ভোগ করিতেছি, এইরূপ আমাদের পরে যাহারা আসিবে তাহাদের জন্য আমাদের পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বেশী রাখিয়া যাওয়া অর্থাৎ জড়জগতে কিছু আধিপত্য বিস্তার করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। মনুষ্যসমাজ বৃক্ষের পত্র। যেমন পত্র আকাশস্থ বায়ু আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষের আয়তন বৃদ্ধি করে পরে আপনার সময় আসিলে পড়িয়া যায় এবং পরবর্ত্তী পত্রসকল যাহাতে একটু উচ্চ ও পুষ্ট হয় তাহা করিয়া যায় সেইরূপ মনুষ্য সমাজবিস্তার করিয়া সমাজপরিবর্ত্ত ও সমাজসংস্কার করিয়া নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়া দেহ ত্যাগ করে। তাহাদের সন্তানেরা এই সকলের ফল ভোগ করতঃ আরও অধিকতর ক্ষমতা প্রকাশ করে।

এ কথা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে কেহ বুঝাইয়া দেন নাই সুতরাং সেই শান্তভাবে সেই রামায়ণ ও মহাভারত শুনিয়া একই ভাবে চলিয়া আসিতেছিল। রামায়ণ ও মহাভাতের উদ্দেশ্য সাধন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু উহাদের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করা যায় এমন কোন গ্রন্থ হয় নাই এইজন্য উহারাই জাতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন ইংরেজি বিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ হইল তখন অবধি রামায়ণ ও মহাভারতের নীতিশিক্ষা সেকেলে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। সমালোচকেরা বাল্মীকির অদ্বিতীয় কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করুন প্রত্নতত্ত্ববিদেরা রামায়ণ হইতে তৎসাময়িক বৃত্তান্ত রচনা করুন, রামায়ণ পাঠ করিয়া শত শত লোক আনন্দসাগরে মগ্ন হউক কিন্তু রামের চরিত্র আর কেহ অনুকরণ করিতে যাইবে না। যুধিষ্ঠিরের ত কথাই নাই। পূর্ব্বে লোকে রামায়ণ ও মহাভারত হইতে যে শিক্ষা পাইত এখন শিক্ষিত যুবকগণ কতক পরজাতীয় দৃষ্টান্ত দেখিয়া কতক ইতিহাস পড়িয়া কতক নানা পুস্তক ও ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া সেই শিক্ষা লাভ করেন। সুতরাং এরূপ সভ্য অবস্থায় একজন লোকের বা একখানি পুস্তকের

যুবকচরিত্র নির্ম্মাণে সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা হইতে পারে না। তথাপি কোমল হৃদয় যুবকের মনে যে পুস্তক ভাল লাগে তাহা হইতেই তিনি কিছু না কিছু ভাল জিনিস চিরকাল মনে করিয়া রাখেন। যে কিছু জিনিস চিরকাল মনে থাকে তাহা অনেক সময়ে কার্য্যে প্রকাশ পায় তাহাই তাঁহার চরিত্র নির্ম্মাণে সহায়তা করে।

বঙ্গীয় যুবক যে সমস্ত রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করেন তাহার মধ্যে সেক্সপীয়র সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু বোধ হয় তাঁহার চরিত্র নির্ম্মাণে সেক্সপীয়রের কোন হাত নাই। কারণ সেক্সপীয়রের উদ্দেশ্য কেবল "to please" তাঁহার সৎলোকও যেমন সুন্দর অসৎও তেমনি সুন্দর। এই দুই প্রকার চরিত্র পাঠ করিয়া যে সকল ভাবের উদয় হয় তাহা পরস্পরকে কেন্‌সেল (cancel) করিয়া দেয়। মিল্টনে Puritanic spirit এত অধিক যে উহা কোন কালে লোকে অনুকরণ করিতে সাহস করিবে না। অনেকে বরং সয়তান হইতে চাহিবে ত কেহ যীশুখ্রীষ্ট বা সামসন হইতে চাহিবে না। ড্রাইডেন ও পোপে অনুকরণীয় কিছু নাই। Essay on Criticism প্রভৃতি পুস্তক হইতে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা উপদেশ মাত্র। স্কুল মাষ্টারের উপদেশ যেমন এ কাণ দিয়া ঢুকে ও ওকাণ দিয়া বাহির হইয়া যায় ঠিক সেইরূপ। চসার ও স্পেন্সারের বানান এত উল্টা রকম যে কাহারো সাহস হয় না যে পড়ে, যদিও কেহ পড়ে ত চসার সেকেলে গল্প একেলে লোকের ভালই লাগে না। যাহারা বৃদ্ধ তাহাদের বরং ভাল লাগিতে পারে যুবকের কখনই লাগিবে না। স্পেন্‌সরের যে Ideal তাহাও ইউরোপের অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন মধ্যসময়ের, এখনকার লোকে তাহা ভালবাসে না। বিশেষ রূপকের দ্বারা যে শিক্ষালাভ হয় সে শিক্ষা সভ্যসময়ের নয়। সেলি চমৎকার কিন্তু সেলির লেখা এত জটিল ও উহার লেখার idealism এত উচ্চ যে তাহা অনুকরণের অতীত। টেনিসনের উদ্দেশ্য পুরাণ জিনিস ভাল করিয়া দেখান সুতরাং তাহাতে চরিত্রনির্ম্মাণের সহায়তা করে না। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ভালই হোক আর মন্দই হোক নিঙ্গড়িয়া তিত করিয়া দেন। একটি ফুল যদি তিনি ধরিলেন ত তাহার প্রতি পাপড়ি বর্ণনা হবে, তার কেশরের বর্ণনা হবে, তাহার রেণুর বর্ণনা হবে, তবে ছাড়িবেন। বাকী বায়রণ, তিনি পীড়িতের বন্ধু, পীড়কের শত্রু, প্রণয়ের আধার, যৌবন মূর্ত্তিমান্, মহা তেজস্বী, সর্ব্বদা চঞ্চল, আলস্যের জনসমাজের অত্যাচারে একান্ত চটা। যৌবনের মন আকর্ষণে যা কিছু চাই বায়রণের সব আছে। সুতরাং ইংরেজীসাহিত্যে এক বায়রণই বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র নির্ম্মাণে অংশী।

সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে রামায়ণ মহাভারত ত সেকেলে। বেদ পুরাণের চর্চ্চা নাই। থাকিলেও এখন আর কেহ গর্গ বিশ্বামিত্র অগস্ত্য হইতে চাহিবে না। এ একপ্রকার ঠিক। সে সমাজ নাই সে কালও নাই। কালেজের ছাত্র দুরে

থাক, ভট্টাচার্য্যদিগের টোলের ছাত্রেরাও আর বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র বেদব্যাস হইতে চাহে না। ভারবির অর্জ্জুন, মাঘের কৃষ্ণ, নৈষধের নল, বাণভট্টের তারাপীড় শ্রীহর্ষ সব সেকেলে, একটিও আমাদের মনের মত নয়। ভারবি মাঘ নৈষধ প্রভৃতি গ্রন্থের বর্ণনা প্রণালী সমালোচকেরা ভাল বলিতে পারেন, স্থানে স্থানে ভালও আছে কিন্তু সব সেকেলে। আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি উহাদের রস বোধ করিয়া উঠিতে পারি না। করিতে পারিলেও আমাদের চরিত্র পরিবর্ত্তন বা শোধন ভারবি পড়িয়া হয় না। বঙ্গীয় যুবক ভবভূতিকে ভালবাসেন। ভবভূতি তাঁহাদের ভালও লাগে, উহা তাঁহার চরিত্রেও কতক প্রকাশ পায় কিন্তু তাহা নিতান্ত অল্প বিষয়ে, কাজেই এ স্থলে গৃহীত হইল না। দশকুমার চরিতের মধ্যে অপহার বর্ম্মার চরিত্র সুন্দর, বড় চমৎকার কিন্তু তিনি চোর ডাকাত ইত্যাদি ইত্যাদি! যদি অপহার বর্ম্মার চরিত্র হইতে বঙ্গীয়যুবক নিজে কিছু লইয়া থাকেন তাহা তিনি মানের খাতিরে লুকাইয়া রাখিবেন কখন প্রকাশ করিবেন না। বাকী কালিদাস, কালিদাসের লেখা এমনি মধুর যে পড়িবা মাত্র মন আকৃষ্ট হয়। তার পর কালিদাসের অনেকগুলি পাত্র (character) লোকে এত ভালবাসে যে খানিকটা সেই রকম হইয়া যায়। সুতরাং আমাদের যুবকগণের উপর কালিদাসের ক্ষমতাও অনেক অধিক।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক গ্রন্থাকারেরই কিছু কিছু অংশ আমরা পাইয়া থাকি। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বঙ্কিম বাবু। বঙ্কিম বাবুর পুস্তকাবলী এত লোকে পাঠ করে ও এত আদরের সহিত পাঠ করে যে তাঁহার সকল পুস্তক হইতেই কিছু না কিছু লোকের অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করে। লোকে দীনবন্ধুর ইয়ারকি মুখস্থ করে, হুতুমের গান গুলি কণ্ঠস্থ করে, মাইকেলের কতক কতক অনুকরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ আজগবি কথা লইয়া ভিরকুটী করে। হেমচন্দ্রের ভারতসঙ্গীত সকলের কণ্ঠস্থ আছে—বৃত্রসংহার পাঠে চরিত্র পরিবর্ত্তন কতদূর হইবে আজি জানিবার উপায় নাই। ভারতচন্দ্রের অনুকরণ দূরে থাকুক এক্ষণে অনেকে লজ্জায় তাহা পড়িতেই পারে না। আরও অনেক গ্রন্থকার আছেন কিন্তু তাঁহাদের ক্ষমতা অতি সামান্য।

এখন দেখিতে হইবে এই তিন জন কবির কে কতদূর ও কিরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন। আমরা গ্রন্থকারদিগের দোষ গুণ পর্য্যালোচনা করিতেছি না কেবল শিক্ষিত যুবকদিগের চরিত্র নির্ম্মাণে ইঁহারা কে কি প্রকার ও কি পরিমাণে মাল মসলা দিয়া থাকেন তাহাই দেখিব। ইঁহারা একজন ইংলণ্ডের একজন মালবের আর একজন বঙ্গের। এই তিনজনের মধ্যে একজন ফরাসী বিপ্লবের সময় শিক্ষিত একজন হিন্দুদিগের গৌরব সময়ের ব্যক্তি আর একজন ভারতবর্ষে ইংরেজ

রাজ্যকালীন ইংরেজিরূপে শিক্ষিত। একজন সমাজ ভাঙ্গিতে সমাজের অত্যাচারী নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন করিতে শিক্ষা দেন, সমাজ ছাড়িয়া গেলে কিরূপ সুখ হয় তাহাই দেখান। একজন সমাজে থাকিয়া কতদূর সুখ ভোগ করা যাইতে পারে তাহাই দেখান আর একজন সমাজের সহায়তা ও উহার বিরোধে কিরূপ আনন্দ অনুভব করা যায় দেখাইয়া শেষ করেন।

তিনজনই প্রণয়ের কবি, প্রণয়গত অবশ্য তারতম্য আছে তাহা আমাদের এখানে বলার প্রয়োজন নাই। তিনজনই স্বভাবের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে শিক্ষা দেন। তিনজনই নিজে স্বভাবের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ এবং তিনজনেই লোককে আপন আপন মুগ্ধতায় অংশী করিতে পারেন। বাঙ্গালায় পর্ব্বত নাই, পাহাড় নাই, কেবল এক হরিদ্বর্ণ শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র আর মাঝে মাঝে বিশালনিতম্বা স্রোতস্বিনী আর নির্ম্মেঘ ও সমেঘ আকাশ। হঠাৎ মনে হইতে পারে বাঙ্গালায় স্বভাব সৌন্দর্য্য নাই, কিন্তু বঙ্কিম বাবুর প্রতিছত্রে বাঙ্গালার সেই সৌন্দর্য্য প্রকটিত। বাঙ্গালার সৌন্দর্য্য তিনিই সর্ব্বপ্রথম কবির চক্ষে দেখিয়াছেন ও আমাদের সৌভাগ্য ছিল বলিয়া আমরাও তাঁহার হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আবও সুন্দর বলিয়া দেখিতে পাইয়াছি। সেকালে স্বভাবের শোভানুভবের নাম দেবতার আরাধনা ছিল। প্রসন্ন পুণ্য-সলিলা গঙ্গা দেবতা, আকাশ ঋষি পূর্ণ, চন্দ্র দেবতা, সূর্য্য দেবতা ; বঙ্কিম বাবু দেবতাদিগকে অন্তরিত করিয়া শুদ্ধ সৌন্দর্য্য মাত্র দেখাইয়াছেন ও দেখিতে বলিয়াছেন। বাঙ্গালার যে কিছু সৌন্দর্য্য তাহার প্রায় কিছুই বঙ্কিমবাবু দেখাইতে ছাড়েন নাই। হীরার বাড়ীর দেয়ালে পাখী আঁকা হইতে সূর্য্যমুখীর বিচিত্র চিত্রবর্দ্ধিত গৃহ পর্য্যন্ত সবই দেখাইয়াছেন। তাঁহার চিত্রে অপরিষ্কার কিছুই নাই। সব পরিষ্কার ঝরঝরে।

কালিদাসের বর্ণনা ভারতময়। সিংহলদ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া কৈলাস পর্ব্বত পর্য্যন্ত সব কালিদাস বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা শুদ্ধ পরিষ্কার নয় বড় উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময়, যেন ইলেকট্রিক আলোকে electric light প্রতিফলিত। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে ভারতবর্ষ জগতের অনুকৃতি, আর কালিদাস এই সমস্ত ঘুঁটিয়া ফেলিয়াছেন। তন্ন তন্ন করিয়া দেখান তাঁহার কর্ম্ম নয় সেজন্য ওয়ার্ডসওয়ার্থ চাই। তাঁহার দেখান বাছিয়া বাছিয়া, ভাল ভাল বস্তুগুলি। তাঁহার বর্ণনায় শুদ্ধ সৌন্দর্য্যে নয় কিছু না কিছু অলৌকিক উহার সঙ্গে মিশ্রিত আছে। যথা রামের পুষ্পক রথ, মেঘের দৌত্য। তাঁহার ঋতুসংহারে স্বভাবের বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত আছে। এখানকার বর্ণনায় অলৌকিকতা নাই এবং পরিষ্কার অপরিষ্কার জ্ঞানও বড় বেশী নাই। কিন্তু

বর্ণনীয় বস্তু পরিষ্কারই হউক আর অপরিষ্কারই হউক বর্ণনায় হৃদয়গ্রাহিত্ব সমানই আছে।

বায়রণের বর্ণনীয় ইউরোপ। সমস্ত ইউরোপে যা কিছু বর্ণনযোগ্য—আল্পসের চূড়া, রাইনেব বিশাল জলপ্রবাহ, গ্রীসের দ্বীপমালা, মাইকেল এঞ্জিলোর চিত্র ভিনিস ও রোমের ভগ্নাবশেষ। শিল্পে ও স্বভাবে যে কিছু মহান্ ও মনোহর, সকলই তাঁহার গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহাব বর্ণনা মধ্যে এক জিনিস আছে যাহা আর প্রায় কাহারও নাই। ঐতিহাসিক দৃশ্য বর্ণনে বায়রণের অসাধারণ ক্ষমতা, ওয়াটরলুব যুদ্ধ রুসের নিবাসস্থান বল্ডেরেব গির্জ্জা বর্ণনায় বায়বণ তাঁহার বিশাল হৃদয়ের পূর্ণ প্রতিকৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনার পর তাঁহার উপদেশগুলি যুবকমণ্ডলীর অন্তঃকরণে এরূপ অঙ্কিত হয় যে তাহা আর অপনীত হইবার নহে।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পাবেন যে যুবকদিগের চরিত্রনির্ম্মাণের কথায় স্বভাবের বর্ণনা আসিল কেন? এ ধান ভানিতে শিবেব গীত কেন? তাহার উত্তর এই স্বভাব বর্ণনায়ও নীতিশিক্ষা আছে, আব সেটি দেখানও বড় সহজ, এই জন্য আগে স্বভাবের শোভা বর্ণিত দেখিয়া কি শিক্ষা পাই দেখাই, তাহার পর অন্য প্রকার শিক্ষা যথাশক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথম কালিদাসেব বর্ণনায় সব শান্তিময় সব সুখময়, পড়িলে মনের শান্তিময় ভাব জন্মে। যখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা, পাদরি সাহেবরা ও ব্রাহ্ম মিসনবিগণ দিনরাত জগৎ দুঃখময় পাপের ভরে ডুবলো ডুবলো বলিতেছেন, তখন ওরূপ পুস্তক পড়িলে বাস্তবিকই জগৎ দুঃখময় নহে বলিয়া বোধ হয়। এ বড় সামান্য শিক্ষা নহে। বঙ্কিমবাবু স্বভাববর্ণনায় শুদ্ধ শান্তি নয় তাহার উপর যেন একটু কিছু আছে, যেন যে আনন্দ যৌবনের বড় প্রিয় সেইরূপ আনন্দ যেন বেশী আছে। বায়রণের বর্ণনায় শান্তি নাই, কেবল পরিবর্ত্তন হইতেছে অসংখ্য পরিবর্ত্তন এটা ছেড়ে ওটা, ওটা ছেড়ে সেটা, যেন তৃপ্তি হইতেছে না, যেন একটু চটা চটা ভাব উদয় হইতেছে যেন যাহার অন্বেষণে স্বভাবের শোভা দেখিতে আসিয়াছি সে সুখটুকু পাইতেছি না কেবল কৌতূহলতৃষ্ণায় কাতর হইয়া যাহা কিছু সুন্দর দেখিতেছি দেখিতে যাইতেছি, দেখিতেছি, তৃপ্তি হইতেছে, কিন্তু সে তৃপ্তি বেশীক্ষণ থাকিতেছে না।

সংক্ষেপে তিনজনের বর্ণনায় তিনরূপ উদ্দেশ্য আর এক প্রকারে দেখান যায়। কালিদাস উপরে বসিয়া বিশুদ্ধ আনন্দের সহিত নীচেকার শোভা দেখিতেছেন আর দেখাইতেছেন। নিজে মনুষ্যের উপর উঠিয়া বসিয়া মনুষ্যের

কার্য্য আচার ব্যবহার নৃত্যগীত দেখিতেছেন। পাহাড় পর্ব্বত কেমন ছোট্ট ছোট দেখাইতেছে, নদীটি একছড়া হারের মত কেমন পড়িয়া আছে তাই দেখিতেছেন আর কাছে কোন ভালবাসার জিনিস আছে তাহাকে দেখাইতেছেন। যেন শাঙ্খ্যমতে পুরুষ নির্লিপ্ত বসিয়া প্রকৃতির রঙ্গ দেখিতেছেন। কালিদাস বলিতেছেন আগে মানুষের চেয়ে উচ্চ জীব হও তাহার পর স্বভাবের শোভা দেখিও কত আনন্দ পাইবে। তাঁহার আশা বড় উচ্চ। বঙ্কিমবাবু স্বভাব শোভার কেন্দ্র মনুষ্য, নগেন্দ্রনাথই হউন আর অমরনাথই হউন, আর গোবিন্দলালই হউন বা স্বয়ং বঙ্কিমবাবুই হউন, তাঁহারও নির্লিপ্ত দেখা, স্বভাব শোভা মধ্যে বসিয়া স্বভাবের শোভা দেখ আর কাছে যদি কেহ থাকে দেখাও কেমন সুন্দর কেমন গভীর। পৃথিবী ও আকাশ দেখিয়া ঈশ্বরের প্রেমে শরীর পুলকিত হউক। বায়রণের তা নয়। স্বভাবের শোভা দেখিতে চাও ঘর দোর ছাড়িয়া বাহির হও যা তোমার সম্মুখে পড়িবে তাই দেখিয়া বসিয়া থাকিবে? তা নয়। চল যেখানে সুন্দর বস্তু সেইখানে যাইতে হইবে। তুমি নির্লিপ্ত থাকিলে সব দেখিতে পাইবে কেন? ঘরে বসিয়া তুনিয়ার কারচুপি দেখিয়া শান্তিসুখ ভোগ করিবে কেন? মনুষ্যের জীবন অল্প, ইহাতে সব দেখিয়া শুনিয়া লও, যত দেখিবে ততই জ্ঞান বাড়িবে আনন্দ অধিক হইবে এই আনন্দই আনন্দ, আর সব কেবল দুঃখ আর অত্যাচার, সমাজ অত্যাচার, প্রণয় অত্যাচার, মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করিতে ভালবাসে। সবই কষ্ট কেবল স্বভাবের আনন্দই পরমানন্দ।

একজন উপর হইতে স্বভাব দেখিতেছেন। একজন মধ্য হইতে দেখিতেছেন আর একজন মাতিয়া বেড়াইতেছেন। একজনের মতে মনুষ্যজীবন অপেক্ষা অন্য জীবনে সুখ অধিক। আর একজনের মতে এ জগতেও যথেষ্ট আনন্দ। তৃতীয়ের সবই এই জগতে।

বায়রণের জন্ম ১৯ শতাব্দীর প্রজাবিপ্লবে। সুতরাং বর্ত্তমান সমাজের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে বর্ত্তমান সমাজে অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাঁহার উৎকৃষ্ট মনুষ্য চিত্রগুলি সমাজের বাহিরে। সেগুলি সকলেই সমাজের উপর চটা। কেহ কেহ আবার সমাজের শত্রু; হয় দস্যু না হয় মনুষ্যবিদ্বেষী (Misanthrope)। সমাজের যতগুলি নিয়ম আছে সব গুলিই তাঁহার চক্ষুঃশূল। কনরাড, লারা, ডনজুয়ান প্রভৃতি পাত্রগণের বাক্যেও অপার্য্যে এই সমাজবিদ্বেষ ভাব প্রতি মুহূর্ত্তে প্রকাশিত হইতেছে।

কালিদাসের সমাজ মনুর সময় হইতে এক ভাবে চলিয়া আসিতেছে। চুলমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার মত এই, এরূপ সমাজে সকলই সুখ।

বঙ্কিম বাবুর সমাজ শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকদিগের সমাজ। তিনি দেখাইয়াছেন সমাজের বিরোধী কাজ করিয়া কেহ সুখী হইতে পারেন না। এবং করিলেই শেষ আত্মদুষ্কৃতের জন্য সকলকেই অনুতাপ কবিতে হয়। নগেন্দ্র-নাথের অবৈধ প্রণয়ের ফল তাঁহার ঘোর আধ্যাত্মিক বিকার; শৈবলিনীর অবৈধ অনুরাগের ফল পর্ব্বতগুহায় ঘোর প্রায়শ্চিত্ত। গোবিন্দলালের ও রোহিণীর যেরূপ অন্ত হইল তাহাতেও ঐ কথা দৃঢ়তররূপে প্রতিপন্ন করিতেছে।

বায়রণেরও একটী মানুষ সুখী নহে, তাহাদের মধ্যে মধ্যে অলৌকিক অতিমানুষিক হৃদয়প্রমাদক আনন্দ আছে বটে কিন্তু দুঃখই সকলের স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু তাহারা ঠিক জানে যে যত দিন বর্ত্তমান সমাজ এই ভাবে চলিবে তাহাদের দুঃখের অবসান হইবে না। সুতবাং তাহারা অনুতাপ করিয়া ফিরিয়া আসিতে চাহে না। তাহাদের আমোদ সমাজের উপর অত্যাচারে। কেহ দিবারাত্র লুঠ পাঠ করিতেছে, কেহ নির্জ্জন কারাগৃহ মধ্যে উচ্চে রোদন করিয়া সমাজ-ধ্বংশের জন্য শাপ দিতেছে, কেহ সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য দিনবাত্রি ফিরি-তেছে। তাহারা দুঃখী বটে কিন্তু দুঃখে কাতর নহে, তাহাদের দুঃখের কারণ মনুষ্যসমাজ, সুতরাং মনুষ্যসমাজ ও যাহারা সেই সমাজ চালায় তাহাদের উপর দাদ তোলা চাই। বায়রণের মানুষ মনুষ্যসমাজের উপর চটা। কিন্তু মনুষ্যের প্রতি, দুর্ব্বলের প্রতি, স্ত্রীলোকের প্রতি তাহাদের সহানুভূতি বিলক্ষণ আছে। তাহারা মানুষ ভালবাসিতে চায় কিন্তু সমাজের অত্যাচারী নিয়ম আপনার মনের মত করিয়া ভালবাসিতে দেয় না; সুখে তাহারা ঘোর চটা। কালিদাসের মানুষ মানুষ হইতে কিছু উচ্চ। সব দেবতার অংশ, কেহ দেবতার অবতার, কেহ দেবতা স্বয়ং, কেহ অপ্সরা কেহ অপ্সরার কন্যা, কেহ ঋষি কেহ রাজা। ঋষি ও রাজা মানুষ কিন্তু বায়রণের মানুষ অপেক্ষা তাহাদের অতিমানুষিক ক্ষমতা অধিক। এই স্বর্গে যাইতেছে মুহূর্ত্তে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে সমস্ত পৃথিবী মুহূর্ত্তে পরিভ্রমণ করিতেছে, দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ করিতেছে অপ্সরার সহিত প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু সকলেই সেই মনুপ্রণীত সমাজের নিয়ম যত্ন পূর্ব্বক প্রতিপালন করিতেছে। মানুষের অসীম ক্ষমতা কিন্তু যথেষ্টাচার নাই।

জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ, ত্যাগে শ্লাঘা বিপর্য্যয়ঃ। এই শ্লোকে তাহাদের চরিত্রের কতকটা আদর্শ পাওয়া যায়। তাহাদের যেমন ক্ষমতার পার নাই মনের জোরও তেমনিই অধিক। সেই ক্ষমতা তাঁহারা সৎপথে চালাইতে জানেন সুতরাং তাঁহাদের জীবনে কষ্ট নাই দুঃখ নাই। ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই, যেমন

স্বভাবের নিয়ম অলঙ্ঘনীয় তেমনি তাঁহাদের মতে সমাজের নিয়মও অলঙ্ঘনীয়। লঙ্ঘনের চেষ্টাও নাই, পীড়াও নাই, অনুতাপও নাই।

বঙ্কিম বাবুর লোক সব সমাজের লোক, শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক। শিক্ষিত যুবকের জীবন কেবল অনন্ত বিবাদসঙ্কুল। তিনি দুই প্রকার শিক্ষা পান। একপ্রকার বাড়ীতে আর একপ্রকার স্কুলে। উভয় প্রকার শিক্ষা সময়ে সময়ে পরস্পর বিলক্ষণ বিরোধী। এইজন্য শিক্ষিত যুবকের চরিত্রে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিম বাবুর পাত্র গুলিতেও এই বিরোধী ভাব কতক কতক প্রকটিত আছে কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। যেখানে আছে সেখানে অতি মনোহর। বঙ্কিম বাবুর মানুষগুলি দেশী বাঙ্গালী, নিরীহ ভাল মানুষ। বাঙ্গালীরা যে স্বভাব ভালবাসে তাহারা সকলেই ঠিক সেই স্বভাবের লোক। বুদ্ধিমান্ চতুর দয়ালু সামাজিক ও গুণগ্রাহী তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব গভীর। এরূপ লোকের হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সন্ধান অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ তাহা হইতে আমাদের অনেক জ্ঞান লাভ হয়। বঙ্কিম বাবু ইহাদিগের সেইরূপে দেখাইয়াছেন।

রামায়ণ মহাভারতাদি প্রাচীন পুস্তকাবলীর প্রথম শিক্ষা এই যে পিতামাতার বশ হইবে ভাইকে স্নেহ করিবে জ্ঞাতিদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে কিন্তু আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে যে কবিত্রয় আধিপত্য করেন তাঁহাদের পিতামাতার সঙ্গে খোঁজ নাই। বঙ্কিমবাবু একবার গোবিন্দলালের মাকে বাহির করিলেন কিন্তু পাছে কোনরূপ গোল ঘটে চটপট উদ্যোগ করিয়া তাহাকে কাশী পাঠাইয়া দিলেন। বঙ্কিম বাবুর কোন নায়ক বা নায়িকার ভাই নাই। দুই একটী ভগিনী আছে। গোবিন্দলালের পিতৃব্যপুত্র হরলাল সেও কলিকাতায় থাকে। বায়রণেরও বাপ মা ভাইএর সঙ্গে বড় সম্পর্ক নাই। ডনজুয়ানের মুখে ডপাইনেজের নামও শুনিতে পাওয়া যায় না। আজো পারিসিনার কথার উল্লেখই আর প্রয়োজন নাই। কালীদাসের পুস্তকেরও পিতামাতা বড়ই অল্প কিন্তু অপরদ্বয়ের ন্যায় লোপাপত্তি নাই। অনেক অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মধ্যে দুই একবার বিশুদ্ধ সৌভ্রাত্র পিতৃভক্তি প্রভৃতিও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু বড় অল্প।

এই সকল পারিবারিক অনুরাগের পরিবর্ত্তে আমাদের কবিরা প্রতিনিধি দেন দাম্পত্যপ্রণয়। দাম্পত্যই বা কেন বলি? বায়রণ ত দাম্পত্যের কোন ধারই ধারেন না। শুধু প্রণয় বলি। সুতরাং বায়রণে পারিবারিক অনুরাগের কিছুই নাই। বঙ্কিম বাবুর পুস্তকে পারিবারিক অনুরাগের মধ্যে শুদ্ধ দাম্পত্যপ্রণয় আছে। অন্যান্য অনুরাগের পরিবর্ত্তে বঙ্কিম বাবুর স্বদেশানুরাগ, বায়রণের মানবজাতির প্রতি অনুরাগ। একজন অত্যাচারপীড়িত স্বদেশের জন্য কাঁদিতে শিখিয়াছেন আর একজন অত্যাচারপীড়িত মনুষ্য জাতির

উদ্ধারের জন্য অস্ত্র ধারণ করিতে শিখাইয়াছেন। যাহার ক্ষমতা বলে অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্তি পায় তাহাদিগকে বাহবা দিতে শিখাইয়াছেন।

কালিদাসের সমাজ ঠিক মনু হইতে এক আকারে চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার যাহা কিছু আছে সকলই শাস্ত্রসঙ্গত যুক্তিসঙ্গত অনুমাত্র তফাৎ নাই। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে প্রলোভন নাই। পাপ পুণ্যের মধ্যে পাপ বড় কম সবই পুণ্য। ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থ কেবল সুখের ছবি, নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক আমোদের ছবি। রায়রণ পাপ পুণ্য বলিয়া দুইটি পদার্থ স্বীকার করিতে চান না। সুতরাং লোকে যাহাকে প্রলোভন বলে সে বস্তু তিনি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে মনুষ্য আপন ইচ্ছায় যাহা করে তাহাই ঠিক, আপন ইচ্ছায় যাহাকে ভালবাসে সেই প্রণয়ের পাত্র। সুতরাং মনুষ্য আপনার সুখের জন্য আত্মইচ্ছার উপর নির্ভর করে; কখন কৃতকার্য্য হয় কখন অকৃতকার্য্য হয়, পরের কথায় কিছুই করিতে চাহে না সমাজের যে সকল নিয়ম আছে মানিতে চাহে না। বর্ত্তমান সমাজের যেরূপ গঠন তাহাতে সমাজ এরূপ স্বেচ্ছাচারীদিগকে দমন করিতে চায় সুতরাং উহারা সমাজের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। যে সমাজে ইচ্ছার প্রতিরোধ না থাকে তাহারা সেইরূপ নূতন সমাজ চাহে, তাহা পায় না বলিয়া ঘোরতর সমাজদ্বেষী হইয়া পড়ে।

বঙ্কিমবাবুর এক হাতে কালিদাস আর এক হাতে রায়রণ কিন্তু কালিদাসের আধিপত্য তাঁহার উপর অধিক। তিনি সমাজ সেই প্রাচীন রীতিতে চালাইতে চান। সেই জিতেন্দ্রিয়ভাব সেই সুখ সেই শান্তি কিন্তু ইচ্ছাশক্তি এক এক সময়ে দুর্দ্দম হইয়া উঠে। এইটি বায়রণের। তিনি লাগাম ছাড়িয়া দিয়া দেখান যে ইন্দ্রিয় বশ করিতে না পারিলে লোকের পদে পদে বিপদ ঘটে। তিনি একবার প্রলোভন লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেন; দেখান সকলেই প্রলোভনে ভুলে কিন্তু কেহ অন্তরের ভাব অন্তরেই রাখে, দমন করে। ইহারাই জিতেন্দ্রিয় যথা প্রতাপ। কেহ বা রাখিতে পারে না দমন করিতে পারে না যথা শৈবলিনী ও নগেন্দ্রনাথ। যেই জিতেন্দ্রিয় সেই সুখী সাহসী সর্ব্বত্র প্রশংসাপাত্র। যে অজিতেন্দ্রিয় সেই দুঃখী সাহসশূন্য এবং আত্মগ্লানি পূর্ণ।

কালিদাসের প্রলোভন নাই। বায়রণের সবই প্রলোভন কিন্তু তাহা হইতে উঠিবার ইচ্ছা নাই। বঙ্কিমবাবুর প্রলোভন আছে; তাহার দুঃখ আছে ও তাহা হইতে উদ্ধার হইলে সুখও আছে। সুতরাং আধুনিক সমাজে আমরা বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থ হইতে উচ্চতর নীতিশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

বায়রণ হইতে আমরা মানবজাতির প্রতি অনুরাগ করিতে শিখি বটে কিন্তু তিনি স্পষ্ট শিক্ষা কোথাও দেন নাই। তিনি বর্ত্তমান সমাজের অনেক নিন্দা করিয়াছেন। অত্যাচারপীড়িতদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতেই তাঁহার মতলব টের পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থ হইতে আমরা যে স্বদেশানুরাগের উপদেশ পাই সে আর একরূপ। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে কতকগুলি মূর্ত্তিমান্ স্বদেশানুরাগ আছে। যথা রমানন্দ স্বামীর। এই সকল লোকের কি আশ্চর্য্য গঠন। তাঁহারা যে ব্রতে জীবন উৎসর্গ কবিয়াছেন তাহার মাম **পরহিত ব্রত**। পীড়িত যে ধর্ম্মাবলম্বী হউক না কেন, মুসলমান হউক, হিন্দু হউক, খ্রীষ্টিয়ান হউক, তাহার উপকারের জন্য সর্ব্বদাই উদ্যুক্ত। ইঁহারা নিজ জীবন পরের উপকারের জন্য তৃণবৎ ত্যাগ করিতে কাতর হন না। নৈতিক উন্নতির বোধ হয় রমানন্দ স্বামীই পরাকাষ্ঠা, কালিদাস হইতে আমরা আর একপ্রকার অনুরাগের উপদেশ পাই। তাহার নাম সর্ব্বভূতানুরাগ। এ অনুবাগ বুদ্ধধর্ম্মের ফল। কালিদাসের সময়ে যদিও উক্ত ধর্ম্মের লোপাপত্তি হইয়াছিল তথাপি উহা অনেক অংশে হিন্দুদিগের মনে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় মাংসাশী যুবকবৃন্দ সর্ব্বভূতে দয়ার বড় একটা সম্পর্ক রাখেন না। তাঁহাদের মতে মানবজাতির প্রতি অনুরাগই মুখ্য ধর্ম্ম।

কালিদাসেব শকুন্তলার লতা পাতা হরিণ মৃগ প্রভৃতি সোদরস্নেহ। আমরাও ফুলগাছ পুঁতি গোরু বাছুর পুষি কিন্তু তাহাদের উপর আমাদের সোদরস্নেহ হয় না। কিন্তু কালিদাসের হৃদয় পশুদিগের জন্যও কাঁদিত, আমাদের কাঁদে না। বঙ্কিমবাবুর নগেন্দ্রনাথ প্রজাদিগকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন। আমাদের স্নেহ বড় ঐ পর্য্যন্তই নামে। বায়রণ সকল মানুষেরই প্রতি স্নেহ করেন। তাহার সাক্ষী তাঁহার গ্রন্থে দুর্দ্দশাপন্ন গ্রীকদিগের জন্য গভীর রোদন ও তাহাদের দুর্গতিনাশের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লোকের মন আকৃষ্ট করা।

আর একটি কথা। ইঁহাদের শিক্ষা দিবার প্রাণালী কি একরূপ? সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলেন যে, বেদ হইতে যে উপদেশ পাই তাহা আজ্ঞা, পুরাণ হইতে যে উপদেশ পাই তাহা বন্ধুর উপদেশের ন্যায় সুপরামর্শ, কিন্তু কাব্য হইতে যে উপদেশ পাই তাহা কান্তার উপদেশের ন্যায়। কান্তা যেমন নানা প্রকার গল্প গুজব করিয়া মনটি লওয়াইয়া শেষ উপদেশটি বাহির করেন যেটী বাহির করেন সেটী কিন্তু অমোঘ। কবি রাম রাবণের যুদ্ধ বর্ণন করিলেন; নানারূপ বিচিত্র পদার্থ দেখাইলেন, কখন হাসাইলেন কখন কাঁদাইলেন, শেষ একটি উপদেশ

দিলেন যে ইন্দ্রিয়-অশ্বের লাগাম ছাড়িয়া দিলে অনেক নাতানে পড়িতে হয় শেষ রাবণের ন্যায় সপুরী বিনাশও হইতে পারে। ইহাদের তিন জনেরও শিক্ষাপ্রণালী মূলত তাই কেবল কিছু তারতম্য মাত্র আছে।

কালিদাসের উপদেশপ্রদানপ্রণালী ঠিকই এইরূপ। তিনি কোথাও preach করেন না। তাঁহার কাব্যের মুখে যাহা পড়ে তাহাই বলিয়া যান কখনও উপদেশ দিব বলিয়া দোকান খুলিয়া বসেন না। বায়রণের প্রত্যেক চিত্রেই কিছু না কিছু উপদেশ আছে। তাঁহার যেখানে একটি সুন্দর বর্ণনা তাহার নীচেই দুটী বর্ত্তমান সমাজের অত্যাচারের নিন্দা। যেখানে যাও দুপাঁচটী ব্যঙ্গাত্মক উপদেশ নিশ্চয়ই পাইবে। যেমন কোন গোর স্থানে ভ্রমণকালে গোরস্তম্ভ দেখিতে দেখিতে তাহার নীচে যে সকল খোদা অক্ষর দেখিলে তাহা অনেক দিন মনে থাকে, সেইরূপ বায়রণের খোদা কথা অন্তরের সঙ্গে গাঁথা থাকে। রাইনের ধারে রাইনের শোভা দেখিতে দেখিতে বা আল্পসের চূড়ায় আল্পসের শোভা দেখিতে দেখিতে অথবা হাএদী ও জুয়াণের নিশীথ প্রণয় দেখিতে দেখিতে, বায়রণ যে সকল গম্ভীর নৈতিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠকহৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। বায়রণের মাঝে মাঝে preaching ও আছে। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর preaching বড় উচ্চ। তাঁহার কমলাকান্তের দপ্তর একটি preaching এর খণি। কত নীতিশিক্ষা উহা হইতে লাভ করা যায় তাহা বলা যায় না। তাঁহার preach করার লোকও আছে, তাঁহার সন্ন্যাসী গুলি সব নীতিশিক্ষার প্রচারক। তাঁহার নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতির স্বগত বাণী গুলিও প্রচারক ভিন্ন কিছুই নহে। হরদেব ঘোষালের পত্র অনেক মনোবিজ্ঞানতত্ত্বের গূঢ়তত্ত্ব সত্য আবিষ্কার করিয়াছে।

লোকে মনে করেন যে বায়রণ হইতে আবার কি নীতিশিক্ষা, বায়রণ অতি অশ্লীল কবি। যাঁহারা এরূপ মনে করেন তাঁহাদের বায়রণ নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহাদের নীতি সেকেলে, বায়রণ, এ কেলে নীতি শিক্ষা দেন। তিনি রুসোর স্কুলে তৈয়ারি হইয়াছেন। মানুষ সব সমান। সমাজবন্ধন শুদ্ধ দুপাঁচ জন লোকের হাতে, অত্যাচারের ও যথেষ্টাচারের ক্ষমতা দিয়া তাহারা অবশিষ্ট মানবমণ্ডলীকে নির্ব্বীর্য্য ও নিস্তেজ করে। এ অবস্থায় পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। তাঁহার কাব্যেও এই ভাব নিরন্তর প্রকাশিত। তাঁহার নিজের ও তৎকল্পিত মানবগণ যদিও দেখিতে মনুষ্যবিদ্বেষী যদিও তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া যুবক ও অনেকে এই ভাবই বিলক্ষণ প্রাপ্ত হয় তথাপি একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে এটী বাহিরে মাত্র, তাঁহার বিদ্বেষ শুদ্ধ বর্ত্তমান সমাজের উপর কিন্তু উহার নীচে মনুষ্যের জন্য সহানুভূতি পরিপূর্ণ।

বঙ্কিমবাবুর পুস্তকের পরহিতব্রত যদিও বায়রণের পরহিতব্রত অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন কিন্তু উহা তাঁহার পুস্তকে অধিকাংশ স্থলেই শুদ্ধ স্বদেশানুরাগেই পর্য্যবসিত। এইজন্য আমরা তাঁহার পুস্তকের উদ্দেশ্য স্বদেশানুরাগই বলিলাম।

উপসংহার কালে সংক্ষেপে বলি, বঙ্কিমবাবুর উদ্দেশ্য স্বদেশানুরাগ ও সামাজিক সুখ, কালিদাসের ভূতানুরাগ ও সামাজিক সুখ, বায়রণের মনুষ্যানুরাগ (Humanelarianism) ও সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনের সুখ।

প্রয়োগ।

তবু বুঝিল না মন!

শুধু চিত্ত ভেঙ্গে গেল, শুধু প্রাণ দগ্ধ হ'ল,
আশার একটি কক্ষ হ'ল না পূরণ;
তবু কেন তার আশা, তবু কেন ভালবাসা,
জাগ্রত নয়নে তবে কেন সে স্বপন?
হায় বুঝিল না মন!

এইরূপে যাবে দিন—
যাবে মাস যাবে বর্ষ, যাবে সুখ যাবে হর্ষ,
গিয়াছে হৃদয় যাবে হতাশ জীবন;
এমনি অতৃপ্ত বক্ষে, এমনি সজল চক্ষে,
অন্তিম শয্যায় শেষে করিব শয়ন,
তবু পাব না সে ধন!

ভীষণ কালের করে—
খসে ভূধরের শির, শুষ্ক হয় সিন্ধুনীর,
মানবের দগ্ধ মন সেও কি রে ডরে?
ভূতল সুখের ঠাঁই, দয়ার অভাব নাই,
অভাগারে শুধু কেহ দয়া নাহি করে,
দুখে হৃদয় বিদরে!

বিরাম।

সে ত নারীর হৃদয়—
করুণার স্রোতস্বিনী, বিপুল স্নেহের খণি,
সুধামাখা প্রণয়ের অনন্ত নিলয়,
বিরাগের লেশ নাই, অতি নিরমল ঠাঁই,
হতভাগ্য মানবের শান্তির আলয়!
তবে কেন নিরদয়?

প্রয়োগ।

তুমি নিষ্ঠুর সংসার!
নারীর কোমল মন, কেন কর নিদারুণ,
কেন দগ্ধ কর তার হৃদয় আগার?
পাষাণ হৃদয় তব, নাহি কর অনুভব,
নারীর নীরব প্রেম কত যন্ত্রণার!
দোষ নহে অবলার।

বিশাল নয়নে তার—
রুদ্ধ প্রেম প্রবাহিনী, নিরন্তর উন্মাদিনী,
দুখানি পল্লবে ত্রাসে ঢাকে অনিবার;
সদা যেন সশঙ্কিত, সদা আঁখি মুকুলিত,
পাছে নিরখিতে পায় নিষ্ঠুর সংসার;
পাছে দোষে দেশাচার!

সদা আনত বদন!
যেন কত ম্রিয়মাণ, কত উদাসীন প্রাণ—
ফাটে ওষ্ঠাধর তবু ফোটেনা বচন;
সদা ত্রাসে কথা কয়, পাছে প্রেম বাহিরায়,
নিষ্ঠুর সংসার পাছে করয়ে শ্রবণ!
সদা অস্ফুট বচন।

পত্রে কি রহে গোপন!
হৃদয় পিঞ্জর আঁকি, ছেড়ে দেয় প্রাণপাখী,
নরের মনের কথা কহে অনুক্ষণ,
হেন অবারিত পত্রে, দেখিয়াছি ছত্রে ছত্রে,
প্রেমের তরঙ্গ যেন রয়েছে গোপন;
পাছে দেখে অন্যজন!

মর্ম্মে মরি দুই জন—
সে খোঁজে আমার মন, আমি খুঁজি তার মন,
তুলনায় পরস্পরে ভাবি নিদারুণ,
সে ভাবে সে অভাগিনী, আমি হতভাগ্য জানি,
সে ভাবে বুঝে না নর রমণীর মন;
ভাবি আমিও তেমন!

উন্মত্ত উভয় চিত!
দুধারে দু সিন্ধু নাচে, অতিসূক্ষ্ম বাঁধ মাঝে,
খসিলে প্রস্তর এক হইবে মিলিত—
সন্নিকটে দুইজন, চারি চক্ষে সম্মিলন,
দুইটি বচন মুখে হ'লে উচ্চারিত—
ভাসে দুজনার চিত!

সুধু দুইটি বচন!
সুধু করে কর ধরে, সুধু পরস্পরে হেরে,
"প্রিয়তমে!" "প্রাণনাথ"! হলে উচ্চারণ—
সূক্ষ্ম বাঁধ ভেঙ্গে যাবে, দুই সিন্ধু উথলিবে,
নিষ্ঠুর সংসার তায় হইবে মগন;
তাত হবেনা কখন।

বিরাম।

তাহা হবে না কখন!
এমনি অতৃপ্ত বক্ষে, এমনি সজল চক্ষে,
অন্তিম শয্যায় শেষ করিবে শয়ন;
এমনি নীরব মুখে, এই তুষানল বুকে,
সহিবে এ তীব্র জ্বালা যাবৎ জীবন—
তবু কবে না বচন!

প্রয়োগ।

এযে নিষ্ঠুর সংসার—
(হেথা) পাপ প্রণয়ের নাম, বন প্রেমিকের ধাম
স্বার্থত্যাগ আত্মদান যত দুরাচার;
পরিণয়ে যাহা পাবে, অন্ধ খঞ্জ তাই লবে,
হয় প্রেম নয় নেই কপাল তোমার;
তবু চাহিবে না আর!

থাকে হেন কোন স্থান—
যথা পাপ পুণ্য নাই, স্বর্গ মর্ত্ত এক ঠাঁই,
উদার কবির মত সকলের প্রাণ;
প্রণয়ে কলঙ্ক নাই, মিলনে বিচ্ছেদ নাই,
অনর্গল প্রেমিকের যুগল পরাণ;
তথা করি অবস্থান!

যথা নারীর হৃদয়,
না চাহিতে প্রাণ খুলে, দেয় প্রেম হাতে তুলে,
না ধরিতে করতল নিজে ধরি লয়,
না করিতে সম্ভাষণ, দেয় প্রেম আলিঙ্গন,
না কহিতে কথা নারী আগে কথা কয়—
যাই ছুটিয়া তথায়!

যথা নারীর বদন—
স্ফুট পঙ্কজের মত, প্রফুল্লিত অবিরত,
কালের কলঙ্ক তাহে হয় না পতন,
মুখে চির মৃদুহাস, বুকে মধু বারমাস
চিরদিন বাল্যভাব বাল্য আলাপন—
দেখি সে দেশ কেমন!

যথা নারীর নয়নে—
কভু না পলক পড়ে, নিদ্রা না কাতর করে,
দিবানিশি উন্মাদিনী সুধা ক্ষরে কোণে,
যথা প্রতি আলিঙ্গনে, লোকে বারমাস গণে,
নিশি অবসান হয় প্রত্যেক চুম্বনে ;
তবে যাই সেই স্থানে !

বিরাম।

নাহি ভূতলে তেমন—
তবে কেন তার আশা ? তবে কেন ভালবাসা ?
জাগ্রত নয়নে তবে কেন সে স্বপন ?
সুধু চিত্ত ভেঙ্গে যাবে, সুধু প্রাণ দগ্ধ হ'বে,
আশার একটি কক্ষ হবে না পূরণ।
তবে কেন অকারণ ?

প্রয়োগ।

তবে কেন অকারণ ?
জলন্ত চিতায় যবে, এই দেহ দগ্ধ হবে,
বিদারিয়া বক্ষস্থল ক'রো দরশন—
অবাধ্য চিত্তের সহ, যুদ্ধ করি অহরহ,
কত অস্ত্রাঘাত তায় হয়েছে পতন ;
কত সহেছি বেদন !

নিরমল মুখ তার—
কি গোপনে কি বেদনে, ভাবিয়াছি নিশিদিনে,
নিরাশায় মরিয়াছি মর্ম্মে কতবার ;
কত যে উদাস মনে, কাঁদিয়াছি সঙ্গোপনে,
তুমি কি বুঝিবে তাহা নিষ্ঠুর সংসার ?
চিত্ত পাষাণ তোমার !

যাও শয়ন মন্দিরে—
দেখ গিয়া উপাধানে, বাতায়ন সন্নিধানে,
কলঙ্কিত হইয়াছে নয়নের নীরে ;
প্রত্যেক স্মরণে তার, ঝরিয়াছে নেত্রাসার,
বহ্নিস্রোত সম রক্ত বহিয়াছে শিরে—
যাও শয়নমন্দিরে !

দেখ চিত্রপট তার—
উন্মত্ত চুম্বনে তার, কলঙ্কিত চারিধার,
প্রত্যেক চুম্বনে বক্ষ ভেঙ্গেছে আমার ;
আন তার পত্রগুলি, পাতে পাতে দেখ খুলি,
ভয়ঙ্কর অশ্রুচিহ্ন অঙ্গে চারিধার ;
চিত্ত কাঁপিবে তোমার !

আর যথায় নির্জ্জন—
প্রাসাদের উচ্চ শিরে, গঙ্গার নির্জ্জন তীরে,
উদ্যানে তরুর মূলে কর অন্বেষণ ;
অশ্রু চিহ্ন অভাগার, কোন স্থানে আছে তার,
প্রদোষে সায়াহ্নে যথা করেছি ভ্রমণ—
দেখ করি অন্বেষণ।

এইরূপে সঙ্গোপনে—
কিবা দিবা বিভাবরী, নিষ্ফল তপস্যা করি,
ভ্রমিব এ মরুময় সংসার প্রাঙ্গণে ;
এই আশাপূর্ণ মনে, বিমোহিত দুনয়নে,
আজীবন নিরখিব তাহার বদনে ?
সহি অনন্ত বেদনে !

বর্ণমালা সংস্কার বিষয়ে বঙ্গদেশে দুই প্রবাদ প্রচলিত আছে, প্রথম—দিধীতিকার রঘুনাথ শিরোমণি যখন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়, ক, খ, শিখিতে আরম্ভ করেন তখন গুরুমহাশয়ের শ্রীমুখ হইতে সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণের একবার উচ্চারণ* শ্রবণ করিবামাত্র রঘুনাথ বর্ণমালার সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। বলিয়া উঠিলেন "হ্যাগা দুটা 'জ' দুটা 'ব' তিনটা 'শ' রাখিবার প্রয়োজন কি ?"

দ্বিতীয়—বঙ্গদেশীয় কোন কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেব একদিন কলেজের পণ্ডিতকে স্বীয় কামরায় ডাকাইয়া বলিলেন "ওএল পণ্ডিট টোমাডের বর্ণমালার টৃটীয় এবং চটুর্ঠ বর্গের কিছু ভিন্নটা ডেকাইটে পার ? আমি ট অনেক পরিশ্রম করিয়া ডেকিয়াছি ডুইরই একরূপ উচ্চারণ।"

উপরে বর্ণমালার সংস্কারবিষয়ে যে দুইটি প্রবাদ উদ্ধৃত হইল আমাদের প্রস্তাব সেরূপ সংস্কার সম্বন্ধে নহে ; রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায় আমাদের বুদ্ধির তাদৃশ প্রতিভা নাই যে পাঠারম্ভেই কতকগুলি বর্ণ এবালিস করিতে চাই এবং দ্বিতীয়টীর ন্যায় বিদেশীয় নহি যে তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্গের উচ্চারণ পার্থক্য দেখিতে পাই না। আমাদের প্রস্তাব স্বতন্ত্র তাহার কারণও স্বতন্ত্র।

ভারতের এই অসংখ্য নির্ব্বাক্ মনুষ্যের সুখ দুঃখ, ন্যায় অন্যায়, শিক্ষা অশিক্ষা সকলই ইংরেজ কর্ম্মচারীর হাতে। এই সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের এ দেশী ভাষা সকল অভ্যাস করিতে হয়, কেবল অভ্যাস নয় মধ্যে মধ্যে পরীক্ষাও দিতে হয়। বিপদের উপর বিপদ !!! তাও কি ছাই ভারতবর্ষে দেশী ভাষা একটি—মহারাট্টা, কর্ণাটি, মালবী, তৈলঙ্গী, উড়ে, বাঙ্গালা, হিন্দি, পঞ্জাবী, উর্দ্দ প্রভৃতি অসংখ্য। এই অসংখ্য ভাষার বর্ণমালাও অসংখ্য, অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষার বর্ণমালার আকার বিভিন্নরূপ।

---

* আমাদের দেশে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সচরাচর ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম অভ্যাস করান হয়।

এই বর্ণমালাগত বৈষম্যই দূর করিবার নিমিত্ত ইটন কলেজের সহকারী শিক্ষক ড্রু সাহেব একটী সুদীর্ঘ প্রস্তাবের অবতারণা করেন। প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, ভারতীয় ভাষাসমূহের বর্ণমালাগত ঐক্য সম্পাদনের নিমিত্ত রোমান বর্ণমালার ব্যবহার করা সম্পূর্ণ উচিত। তিনি নিজ মত সমর্থনের জন্য যে সকল যুক্তির উপন্যাস করিয়াছেন তাহাদের ভাবার্থ নীচে কতিপয় বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে।

প্রথম—রোমান বর্ণমালার মত অল্পাক্ষর অথচ সকল কথা লিখিবার উপযোগী বর্ণমালা আর দৃষ্ট হয় না। তাহার সকল অক্ষরগুলি পৃথক পৃথক। ইহাতে বাঙ্গালা বা হিন্দি প্রভৃতির ন্যায় সংযুক্তবর্ণ নাই এবং উর্দ্দূর ন্যায় নোক্তা (বিন্দু) বিশিষ্ট অধিক বর্ণ নাই। অতি অল্প মাত্র আয়াসে ইহাকে আয়ত্ত করা যায়। আরও দেখ ইহা দ্বারা যখন ইংরেজী, আইরিস, স্কচ, ফ্রেঞ্চ, লাটিন প্রভৃতি ইউরোপীয় বিভিন্নরূপ ভাষা সকল অনায়াসে লিখিত হইতেছে, তখন ভারতীয় ভাষা সকল কেন না লিখিত হইতে পারিবে?

দ্বিতীয়—জ্ঞানোন্নতিই সভ্যতার মূল। জ্ঞানোন্নতির মূল উত্তম উত্তম পুস্তক অধ্যয়ন করা। তাদৃশ পুস্তক অধ্যয়নের সৌকর্য্য বিষয়ে মুদ্রাঙ্কণ একটী প্রধান উপায়। অতি অল্প লোকেই সমুদয় পুস্তক স্বহস্তে লিখিয়া পাঠ করিতে সমর্থ হয়। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইল যে মুদ্রাঙ্কণ যত অল্পব্যয়ে সম্পন্ন হইবে ততই জ্ঞান, সভ্যতা এবং ভাষার উন্নতি হইবে। উত্তম পুস্তক সকল অল্পমূল্যে বিক্রীত হইলে অধিক লোকে তাহা পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয়। এদিকে অক্ষরসংখ্যার অল্পতাই মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়লাঘবের এক প্রধান উপায়। মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়ের লঘুতা হইলেই পুস্তকের মূল্য অল্প হয়। এই নিমিত্ত সচরাচর চারি আনা মূল্য ইংরেজী পুস্তকের তুল্যাকার এ দেশী পুস্তকের মূল্য প্রায় ১৲ টাকা হইয়া থাকে। আরও দেখ, রোমান অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক সকল যে পরিমাণে পরিশুদ্ধ হয় সেরূপ পরিশুদ্ধ পুস্তক এ দেশী অক্ষরে অল্পই মুদ্রিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ আর কিছুই নয় অশিক্ষিত কম্পোজিটরেরা দেশী অক্ষরের অসংখ্য বিভিন্নতাগুলি বিস্মৃত হইয়া একস্থানে অপরের বিন্যাস করিয়া ফেলে।

তৃতীয়—আদালত সমুদয়ে যে সকল হস্তলিপির ব্যবহার হয় তাহাদের নাম ভাঙ্গা বা সিকস্তা। সিকস্তা লেখা এরূপ কদর্য্য যে বিদেশীয় হাকিমের কথা দূরে থাকুক তাহা পাঠ করিতে দেশীয় মুহুরীরাও সময়ে সময়ে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হয়। বিশেষ উর্দ্দূর সিকস্তা অতি ভয়ানক। প্রথমে, উর্দ্দূর পরিষ্কৃত হস্তলিপিতেও সকল অক্ষর স্পষ্টরূপে থাকে না অনেকস্থলে কেবল নোক্তার

দ্বারা অক্ষরের অনুমান করিতে হয়। নোক্তার একটু ন্যূনাধিক হইলে 'বাপে'র জায়গায় 'তাপ' এবং তাপের স্থলে 'পাপ' পঠিত হইতে পারে। সিকস্তা লেখায় আবার সেরূপ নোক্তাও দেওয়া হয় না। এক্ষণে বিবেচনা কর এরূপ লিপি পাঠ করা কত কঠিন। কাযে কাযেই বিদেশীয় হাকিমগণ কথার অর্থ জানিয়াও আর্জ্জী বা দলিল প্রভৃতি স্বয়ং পাঠ করিতে অসমর্থ হইয়া সেরেস্তাদারের অধীন হইয়া পড়েন। সেরেস্তাদার মহাশয়েরা এ বিষয়ে নিজের অপ্রতিহত ক্ষমতা জানিয়া যে পক্ষ হইতে লম্বোদর পূর্ণ হয় দলিলগুলিকে সেই পক্ষের অনুকূলে পাঠ করেন; ধর্ম্মাবতারেরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধের মত রামের বিষয় শ্যামকে দিতে অনুমতি করেন। রোমান অক্ষরের ব্যবহার হইলে হাকিমেরা নিজে দলিল প্রভৃতি পাঠ করিতে সমর্থ হইবেন সুতরাং এতাদৃশ বঞ্চনা বা ব্যভিচারের অনেক হ্রাস হইবে।

চতুর্থ—এক্ষণে বিজ্ঞানের অনুবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে দুইটী বিভিন্ন মত দেখা যায়। প্রথম মতে বৈজ্ঞানিক পদ. সকল অনুবাদিত হইয়া ব্যবহৃত হওয়া উচিত—যেমন অক্সিজেন (Oxygen) স্থলে প্রাণপদ বাষ্প, হাইড্রজন (Hydrogen) স্থলে জলযান বাষ্প ইত্যাদি রূপে লেখা উচিত। দ্বিতীয় মতে এসকল কথার অনুবাদ করাই উচিত নয়। কারণ ইহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ ধারণ করিলে কালে মূল পদার্থজ্ঞানের প্রতি অনেক ভ্রম জন্মিতে পারে। আরও দেখ সকল ভাষায় ইহাদের এক স্বরূপ থাকিলে ঔষধালয়ের কম্পাউণ্ডর প্রভৃতির অনেক সুবিধা হয়। এই সকল কারণে অধিকাংশ পণ্ডিতেরা এই দ্বিতীয় মতের পোষকতা করেন। এক্ষণে বিবেচনা কর ঐ সকল কথার স্বরূপ রোমান অক্ষরে যেরূপ ঠিক্ ঠিক্ লেখা হয় অন্য বর্ণমালায় সেরূপ হইতে পারে না, বিশেষ উর্দ্দু বর্ণমালায় যাহাতে Act, একট্, Lecture, লেক্চর, Tax, টেক্স বিদেশীয় কথা সকল এতাদৃশ বিরূপ করিয়া লিখিত হয়।

পঞ্চম—ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুসন্ধানে স্থির করিয়াছেন যে রোমান বর্ণমালা প্রাচ্য বর্ণমালার সহিত সগোত্র অর্থাৎ এক বংশসম্ভূত। অদ্যাপি প্রাচ্য ভাষা সকলের বর্ণ বিন্যাসের সহিত ইহার বর্ণবিন্যাস সম্পূর্ণ ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করিতেছে। অতএব রোমান বর্ণমালায় প্রাচ্য ভাষা সকল লিখিত হইলে তাহাদের উচ্চারণ পূর্ব্ববৎ বিশুদ্ধই থাকিবে।

ইত্যাদি বিবিধ যুক্তি দ্বারা ড্রু সাহেব আত্মমত সমর্থন করিয়াছেন। ড্রু-সাহেবের এ উত্তম নূতন নয়। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সার বিলিয়ম জোন্স প্রথমে ভারত-

বর্ষীয় বাক্য সকল রোমান অক্ষরে লিখিতে প্রবৃত্ত হন। তদনন্তর সার চার্লস ট্রিবিল্যান, ডাক্তর ডফ, মিষ্টর পার্শ্ব, মিষ্টর টমাস প্রভৃতি তৎকালীন প্রধান প্রধান ইংরেজগণ কলিকাতায় এই বিষয়ে উদ্যম করেন কিন্তু কেহই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে ড্রু সাহেব পুনর্ব্বার সেই প্রাচীন উদ্যমকে জীবিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সিবিলিয়নগণ অতিশয় আনন্দের সহিত তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনেক স্থলে এই মতানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত সভাও সংস্থাপিত হইয়াছে। লাহোরের 'রোমান উর্দ্দু' নামক একটি সভা হইয়াছে এবং এতন্নামধেয় একখানি মাসিক পত্রও প্রকাশিত হইতেছে।

প্রোফেসর মণিয়র বিলিয়ম প্রভৃতি এই মতের পৃষ্ঠরক্ষক; কেবল লাহোর গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যক্ষ পঞ্জাব মহাবিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তর লাইটনর এবং অপর দুই একজন ইংরেজ ইহার প্রতিবাদী।

ডাক্তর লাইটনর বলেন "ভারতবর্ষস্থিত বর্ণমালা সমূহের পরিবর্ত্তে রোমান বর্ণমালার ব্যবহার সহজ উপায় নহে। কারণ দেশীয় লোকেরা স্ব স্ব বর্ণমালাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। তাহারা চিরসমাদৃত বর্ণমালাসমূহের স্থানে নূতন বর্ণমালাকে অভিষিক্ত করিতে কখনই স্বীকৃত হইবে না। রোমান বর্ণমালা দেশীয় লোকের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত; ইহার ব্যবহার হইলে দেশী লোকেরও কোন উপকার নাই অধিকন্তু ইহার ব্যবহার করিলেই যে বিদেশীয়েরা অতি সহজে দেশীভাষা সকল শিক্ষা করিতে পারিবেন ইহাও সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল। কারণ রোমান অক্ষরে লিখিত দেশী কথায় যদি বিশুদ্ধ উচ্চারণ না শিক্ষা করা যায় তবে কখনই তাহা পাঠ করা যায় না। দেখ রোমান অক্ষরে ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষা সকল লিখিত হইয়া থাকে কিন্তু কয়জন ইংরেজ রীতিমত শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন না করিয়া কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া সেই সকল ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন? যদি রোমান অক্ষরে লিখিত দেশীভাষার উচ্চারণ শিক্ষা করিবার নিমিত্ত দেশী শিক্ষকের আবশ্যক হইল তবে আর ইহাদ্বারা কি সৌলভ্য উৎপন্ন হইল।"

"আমি পঞ্জাবে দীর্ঘকাল অবস্থান এবং তদ্দেশীয়দিগের সহিত অন্তরঙ্গ লাভ করিয়া ইহা স্থির করিয়াছি যে, দেশীয় লোকেরা স্বদেশ প্রচলিত প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিকে অনেক উৎকৃষ্ট বিবেচনা করে, বাস্তবিকও তাহা উৎকৃষ্ট। তদনুসারে শিক্ষালাভ করিলে শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ হয়। ঐ সকল শিক্ষাপদ্ধতি ধর্ম্মযাজক এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দ্বারা প্রচলিত; অতএব সেই সকল সমাজের মূর্দ্ধন্য ব্যক্তিদিগের হৃদয়স্থিত সংস্কার অস্মদীয় সংস্করণের অনুগত না করিলে কোন বিষয়

সংস্করণ চেষ্টা বিফল মাত্র। কিন্তু সেই সকল লোক স্ব স্ব ধর্ম্মপুস্তকের বর্ণমালা দেবনাগরী এবং ফার্শি আরবী পরিত্যাগ করিয়া রোমান বর্ণমালা গ্রহণ করিতে কখনই প্রবৃত্ত হইবে না।"

"ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহে এমন অনেক উচ্চারণ আছে, যাহা রোমান বর্ণমালা দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না। তাহাদের প্রকাশের নিমিত্ত কতকগুলি নূতন রোমান বর্ণের আবিষ্কার করিতে হইবে, অথবা বর্ত্তমান অক্ষরনিচয়ে বিশেষ সঙ্কেত সংযোগ করিতে হইবে। তাহা হইলে রোমান বর্ণমালায় দেশীয় বর্ণমালাসমূহের ন্যায় বিভিন্নতা আসিয়া পড়িল। আরও দেখ, ইংরেজেরা যে রোমান অক্ষরে লিখিত স্বভাষা বিশুদ্ধরূপে পাঠ করেন, তাহা কেবল বহুকালকৃত অভ্যাসের ফল। অভ্যাসের বশেই তাঁহারা light কে "লাইঘট" না পড়িয়া "লাইট" রূপে পাঠ করেন। সেইরূপ অভ্যাস করিলে তাঁহারা সিকস্তা পাঠ করিতেও সমর্থ হইবেন।"

"রোমান অক্ষরে দেশীয়ভাষা লিখিত হইলে অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারে, কারণ ইহাদ্বারা ইংরেজী লেখা সহজ হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাদিগকে ইংরেজী শিক্ষা করান কেবল তাহাদের হৃদয়ে অসন্তোষ জন্মান মাত্র। কেন না দেশীলোকেরা কেবল চাকরী পাইবার প্রত্যাশায় স্কুলে বা কলেজে শিখিতে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু এখনই ত কেরাণীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সাত আট টাকা বেতনে একজন উত্তম কেরাণী পাওয়া যায়। তাহার উপর আরও বৃদ্ধি করা কেবল অসন্তোষের কারণ।"

"ইংরেজেরা অপর ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, ইহা সম্পূর্ণ অভীপ্সিত, কিন্তু ভারতবর্ষে সেটি কঠিন হইয়া পড়িয়াছে; কারণ এখানে তাঁহাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত। এখানে তাঁহারা যথেচ্ছ শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত করিতে পারেন। এখানকার লোক নির্ব্বাক্। রাজপ্রদর্শিত শিক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইলেও ইহারা তাহার প্রতিকূলে একটী কথা কহিতে পারে না। একটি উদাহরণ দেখান যাইতেছে। কতকগুলি ব্রিটীস্ অফিসর্ বিবেচনা করিলেন, পূর্ব্বে এ দেশীয় কোন কথা রোমান অক্ষরে লিখিবার সময় যে যে স্থানে 'u' ব্যবহার করা হইত তাহা অতি ভুল, সেই সেই স্থানে 'a' ব্যবহার করা উচিত; অমনি 'u' স্থানে 'a' ব্যবহার হইতে লাগিল। এমন কি 'Mussulman' কে 'Massalman' এইরূপ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কোন পণ্ডিত আবার 'a' র উপর জোর উচ্চারণ চিহ্নও দিয়া থাকেন।"

পরিশেষে ডক্তার লাইটনর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,—

"The proper way to get over the difficulties of the native character was to improve that character itself and though this

might appear a gigantic task, it was not greater than what had been achieved in other cases."

ডাক্তার লাইটনর নিতান্ত নিঃসহায় নন। দুই একজন দেশী এবং ইংরেজও ইঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন।

রেভরণ্ড জেমস্ লঙ্ সাহেব বলেন যে, তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া অবধি ভারতবর্ষীয় কথা সকল রোমান অক্ষরে লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহার ফল এই হয় যে, কেবল এক বাঙ্গালা ভাষা (যাহা ৮ কোটী মাত্র লোক দ্বারা ব্যবহৃত হয়) তাহাতেও তিনি রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কোন বাধা দেন নাই; পরীক্ষাও যত্নসহকারে হইয়াছিল, কিন্তু একখানি ন্যুটেষ্টমেণ্টের অনুবাদ ঐ অক্ষরে মুদ্রিত হয় মাত্র। সে পুস্তকখানি কাগজের মূল্য দিয়াও কেহ গ্রহণ করে নাই, আর দশ জনের অধিক লোক সেখানি পাঠ করিয়াছে কি না সন্দেহ।

তিনি আরও বলেন যে, ডাক্তর ডফসাহেব প্রথমে রোমান অক্ষর ব্যবহারের সম্পূর্ণ সহযোগী ছিলেন। কিন্তু তিনিও পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রোমান অক্ষর দ্বারা ভারতবর্ষীয় ফারসী এবং সংস্কৃত ভাষা লিখিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের মত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ নয়, ইহা একটি বিস্তৃত প্রদেশ। এত বড় বিস্তৃত প্রদেশে বর্ণমালাগত একতা সম্পাদন একপ্রকার অসম্ভব।

রাইশউদ্দীন আহমদ্ বলেন যে, আরবী ভাষাও কখনই রোমান অক্ষরে লিখিত হইতে পারিবে না, এবং উর্দ্দুর বিষয়ও ইহা বলা যাইতে পারে যে, উর্দ্দুর এবং আরবীর বর্ণমালাগত কোন বৈষম্য নাই। তবে উর্দ্দু বর্ণমালায় সংস্কৃত হইতে কতকগুলি অক্ষর দেওয়া হইয়াছে মাত্র। উর্দ্দু বর্ণমালায় ৫৫টী অক্ষর; প্রত্যেকের উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ। ইংরেজি বা রোমান বর্ণমালায় ২৬টী অক্ষর মাত্র। তাহার মধ্যে w, x এবং y এই তিনটি অক্ষর অনায়াসে পরিত্যাগ করা যায়। তাহা হইলে ২৩টী বর্ণ অবশিষ্ট থাকে; ২৩টী দ্বারা ৫৫টীর কার্য্য যে কিরূপ সুশৃঙ্খলে হইতে পারে, তাহা বুদ্ধিমান্ একটু বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন। উর্দ্দু এবং আরবী বর্ণমালায় কিছুই বিভিন্নতা নাই। কোরাণ আরবী অক্ষরে লিখিত, ভারতবর্ষে প্রায় ৮।৯ কোটি মুসলমানের বাস। এই সকল মুসলমান যত দিন কোরাণকে মান্য করিবে, তত দিন উর্দ্দু অক্ষরকে কখনই পরিত্যাগ করিবে না কারণ অন্য অক্ষরে কোরাণ পাঠ নিষিদ্ধ।

মিষ্টর পার্সন্সাহেব বলেন যে, রোমান বর্ণমালার হস্তলিপিতে যদি (i)র মস্তকে বিন্দু না দেওয়া হয়, এবং (t)র মস্তকচ্ছেদ না করা হয় তাহা হইলে যে যে

কথায় ঐ দুই বর্ণ থাকে তাহা পাঠ করিবার সময় বিষম ভ্রম উৎপন্ন হয়। এক্ষণে বিবেচনা কর, রোমান অক্ষরে লিখিত উর্দ্দু বা অন্য কোন দেশী কথার উপর উচ্চারণ চিহ্ন অবশ্যই দিতে হইবে, নতুবা যথার্থ উচ্চারণের সহিত কথাটিও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। সেই সকল উচ্চারণ চিহ্নের সম্যক্ বিধান করা অল্প দিন বা অল্প পরিশ্রমের কার্য্য নয়; আবার সেই উচ্চারণচিহ্নের এ দিক ও দিক হইলে, যে বিপদ সেই বিপদই থাকিবে।

লাইটনর সাহেবের পক্ষে যে সকল লোক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইঁহারাই প্রধান। এক্ষণে ড্রূ সাহেবের পক্ষপাতীদিগের মত কি দেখা যাক।

সরজর্জ্জ কাম্বেল সাহেব বলেন—"প্রায়ই ভাষার উচ্চারণ অনুসারে তদীয় বর্ণমালার প্রবৃত্তি হইয়াছে। প্রত্যেক ভাষার উচ্চারণ ভিন্নপ্রকার, সুতরাং ইহা সচরাচর দৃষ্ট হয় যে, এক ভাষার বর্ণমালা অপর ভাষায় ব্যবহার করিলে এক-প্রকার অসামঞ্জস্য উৎপন্ন হয়। ইহার উদাহরণ—ইংরেজি ভাষায় রোমান বর্ণমালাব ব্যবহার। ইংরেজি উচ্চারণের সহিত বর্ণবিন্যাসের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই।"

"যতদিন ভাষার রূপ বিশুদ্ধ থাকে, ততদিন তাহাদিগকে নিজ নিজ বর্ণ-মালা দ্বারা প্রকাশ করা উচিত, কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষে যে সকল ভাষা প্রচলিত, তাহাদের মধ্যে একটিরও রূপ বিশুদ্ধ নাই। এখনকার বাঙ্গালা ভাষায় শতকরা ৫টা হিন্দি, দশটা উর্দ্দু এবং পঞ্চাশটা ইংরেজি কথা ব্যবহৃত হয়; হিন্দি, উর্দ্দু প্রভৃতি অপরাপর ভাষারও এইরূপ খিচুড়ী হইয়াছে। এরূপস্থলে ইহাদের সকলের নিমিত্ত একটী রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করা অনুচিত নহে।"

কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "এক্ষণে বিশুদ্ধ হিন্দি বা বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার প্রায় দৃষ্ট হয় না, এক্ষণে উহাদের মধ্যে কতকগুলি ইংরেজি কথা আসিয়া অধিকার স্থাপন করিয়াছে।

"ঐ সকল ইংরেজি কথা নানা উপায়ে আসিয়াছে, কতকগুলি ডাক্তর প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদিগকে অবলম্বন করিয়া, কতকগুলি স্কুলের শিক্ষক বা ছাত্রদিগকে অবলম্বন করিয়া, কতকগুলি আফিসের কর্ম্মচারীদিগের সাহায্যে, আর কতক-গুলি ইংরেজদিগের সহিত অতিশয় ঘনিষ্টতা হওয়ায় আসিয়াছে। অধিক কি এক্ষণে একজন সামান্য কেরাণী বাবুর স্ত্রী তাঁহার স্বামীকে বলেন, "এখন কি আফিস যাবার টাইম হয় নি?" ইহাতে অনুমান হইতেছে যেরূপ আঙ্গলো-সাক্সন (Anglo-Saxon) ভাষা নরম্যান (Norman) ভাষার সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজি ভাষায় পরিণত হইয়াছে, ক্রমশঃ এদেশী ভাষা সকলের পরিণামও

সেইরূপ হইবে। এমনস্থলে রোমান বর্ণমালা ব্যবহারের যে উৎকৃষ্ট ফল, তাহা বলা বাহুল্য।”

আর একজন লিখিয়াছেন, “যাঁহারা রোমান বর্ণমালা ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন, তাঁহাদের যুক্তিসকল সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাঁহারা বলেন, সপ্ততি বা ততোধিক বর্ণমালার পরিবর্ত্তে একটি পঠনোপযোগী বর্ণমালা সংস্থাপন করা সম্ভাবিত নহে। কিন্তু এতাদৃশ বর্ণমালার অভাবে তাঁহারা অনেকস্থলে এরূপ ইংরেজির ব্যবহার করেন, যাহার তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত দেশী ভাষায় প্রকাশ করিলে নিঃসন্দেহ অনেক উপযোগী হইত। প্রতিবাদীরা বলেন, কতকগুলি ইউরোপীয়দিগের সুবিধার নিমিত্ত ভারতবর্ষের চিরসমাদৃত বর্ণমালাস্থলে রোমান বর্ণমালার ব্যবহার উচিত নহে। সত্য, কিন্তু বিবেচনা কর ইউরোপীয়েরা যখন ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, তখন তাঁহাদের যে অত্রত্য প্রচলিত এবং অপ্রচলিত ভাষা সমূহে বুৎপত্তি লাভ করা উচিত, এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও দ্বিধা নাই। এবং এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইলে ইহার অনুমান স্বরূপ ইহাও স্থির বুঝিতে হইবে যে, যাহাতে ইউরোপীয়গণ সহজে ভারতবর্ষীয় ভাষা সকল অভ্যাস করিতে পারেন, প্রত্যেক হিতৈষী ব্যক্তির তাদৃশ উপায় উদ্ভাবন করা উচিত।

এদেশীয় বর্ণমালাস্থলে রোমান বর্ণমালার ব্যবহার হইলে ইউরোপীয়দিগের পক্ষে এদেশীভাষা সম্যক্ শিক্ষা করিবার যে সহজ উপায় হইবে, এবিষয় প্রত্যক্ষই প্রমাণ। কোন পুস্তক ফারসী এবং রোমান অক্ষরে কাপি করিয়া দুইজনকে পড়িতে দিলে রোমান অক্ষরে লিখিত পুস্তকপাঠী নিশ্চয়ই অগ্রসর হইবেন। যদি বল ইংরেজেরা যেমন সমধিক চর্চ্চা এবং মনোনিবেশের সহিত অভ্যাস করিয়া জর্ম্মণ এবং গ্রীক অক্ষর অনায়াসে পাঠ করিতে পারেন, সেইরূপ অভ্যাস করিলে দেশী অক্ষরেও প্রভুতা লাভ করিবেন। ইহা অতি ভ্রান্ত যুক্তি। কেন না দেশী অক্ষরের সহিত জর্ম্মণ বা গ্রীক অক্ষরের তুলনা হইতে পারে না, কারণ ঐ উভয় বর্ণমালায় এদেশী বর্ণমালা সমূহের মতবিভিন্নতা বা সংযুক্তাক্ষরের বাহুল্য নাই। সত্য বটে, প্রাচ্যভাষাসমূহে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে ব্যাকরণ অভিধান এবং তদ্ভাষায় ব্যুৎপন্ন শিক্ষকের সাহায্য আবশ্যক করিবে, তথাপি রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করিলে একদিনে যে ফল লাভ হইবে, এদেশীয় অক্ষরে দশ দিনে তাহা হয় কি না সন্দেহ।”

কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন, “আমরা ফারসী তুর্কী প্রভৃতি যে সকল মুসলমান রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, সেই সকল স্থানের লোকদিগকে অসভ্য, অশিক্ষিত, নিরুৎসাহী, দুর্ব্বল এবং ধর্ম্মনীতিশূন্য দেখিতে পাই। অর্থাৎ খৃষ্টানদিগের

সহিত তুলনা করিলে মুসলমানেরা অনেক হীন বলিয়া বোধ হয়। খৃষ্টানদিগের মধ্যে যে এতাদৃশ সভ্যতাদির উন্নতি হইয়াছে, ইহার কারণ কেবল মুদ্রাযন্ত্র। যে পর্য্যন্ত মুসলানদিগের মধ্যে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত না হইবে, ততদিন তাহাদের উন্নতিও হইবে না; আর রোমান অক্ষরের ব্যবহার ব্যতীত মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলিত হওয়া না হওয়া তুল্য।"

এইরূপ অনেক সাহেব যথাশক্তি অধিক বা অল্পপরিমাণে নিজ নিজ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া রোমান অক্ষর ব্যবহারের পক্ষপাত করিতেছেন। পঞ্জাবে উর্দ্দুর স্থানে রোমান অক্ষর ব্যবহারের নিমিত্ত বিশিষ্ট উদ্যমও হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই, আজকাল সকল কার্য্য বিশেষতঃ ইংরেজদিগের কার্য্য, ভারতীয় দুর্ভিক্ষ বা এপিডেমিকের ন্যায় দেখিতে দেখিতে দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের একদেশে যখন এরূপ হইতেছে তখন দেখিতে দেখিতে অপর দেশেও যে এরূপ উদ্যম হইবে সে বিষয়ে অল্পমাত্র সন্দেহ করা যাইতে পারে।

যখন আমাদের পরিচ্ছদ ইংরেজি, ভোজন ইংরেজি, গৃহসজ্জা ইংরেজি, চিকিৎসা ইংরেজি, তখন বর্ণমালা ইংরেজি হইলে আর বিশেষ দুঃখ কি? বরং এক্ষণে বারিষ্টর মুখোপাধ্যায় এবং সিবিলসার্জ্জন চট্টোপাধ্যায়, কখন কখন বাঙ্গালা অক্ষরে তাঁহাদের নাম লেখা হয় বলিয়া যে দুঃখভোগ করেন, বাঙ্গালা বর্ণমালা রোমান অক্ষরে হইলে তাঁহাদের সে দুঃখ আর থাকিবে না। বিশেষ বাঙ্গালা বর্ণমালা পূর্ব্বকালে স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করিত না, সংস্কৃত বা দেবনাগরী বর্ণমালা পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমশঃ বাঙ্গালা বর্ণমালায় পরিণত হইয়াছে। বিদ্যাপতির সময়ের হস্তলিপির সহিত এখনকার বঙ্গীয় হস্তলিপির তুলনা করিলে তাহা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। যখন পরিবর্ত্তনই আমাদের বর্ণমালার অদৃষ্টলিপি, তখন আর একটু পরিবর্ত্তন সহকারে 'ক' যদি K আকার ধারণ করে এবং তাহাতে যদি বিশেষ উন্নতি হয়, তা হলে আমাদের কিসের ক্ষোভ বরং আনন্দেরই সম্ভাবনা। বিশেষতঃ আমরা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি করিবার নিমিত্ত বাঙ্গালা বর্ণমালায় কমা (,) সেমিকোলন (;) গুণচিহ্ন × ভাগচিহ্ন ÷ ধনচিহ্ন + ঋণচিহ্ন − কোষ্ঠ ( ) প্রশ্নচিহ্ন (?) বিস্ময় চিহ্ন (!) ষ্টার * প্রভৃতি কতকগুলি বর্ণ বা চিহ্ন রোমান বর্ণমালা হইতে বহুদিন অবধি সংগ্রহ করিয়াছি, তখন বিশেষ উন্নতি লাভের জন্য রোমান অক্ষর গ্রহণ করা আমাদের লজ্জাকর নহে।

তবে ডাক্তর লাইটনের বাক্য নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। যদি আমাদের বর্ণমালার কোনরূপ সংস্কার করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তবে পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন কি? অতএব প্রথমে বর্ণমালার সংস্কারের চেষ্টা করা উচিত।

অক্ষর সৃষ্টির বিষয় বৃহস্পতি এইরূপ বলিয়াছেন।—

"ষাণ্মাসিকে তু সময়ে ভ্রান্তিঃ সঞ্জায়তে নৃণাম।
ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা।"

অর্থাৎ—

"প্রতিভাশালী মনুষ্যেরা কোন বিষয় প্রথম শিক্ষা করিয়া ছয়মাস কাল অবধি তাহা ভালরূপে মনে রাখিতে পারেন; তাহার পর ভ্রান্তির উদয় হয়, এই নিমিত্ত বিধাতা অক্ষর সকল পত্রে আরূঢ় করিয়াছিলেন, অর্থাৎ লিখিবার সৃষ্টি করিয়া ছিলেন।" এবং সেই অবধিই লেখন পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে।

ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, যে বর্ণ সকল ভাষার উচ্চারণ অনুসারে সৃষ্ট হইয়াছে; যে ভাষায় যত উচ্চারণভেদ, সেই ভাষায় তত বর্ণভেদ হয়। এবং উচ্চারণ বৃদ্ধির সহিত বর্ণভেদও বাড়িতে থাকে। যখন ফরাসী ভাষায় কতকগুলি সংস্কৃত কথা মিলিত হইয়া উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি হইল, তখন ফারসী বর্ণমালায় সেই সকল সংস্কৃত কথার উচ্চারণোপযোগী কতকগুলি বর্ণের যোগ করাতে উর্দ্দু বর্ণমালাব সৃষ্টি হইল। এইরূপ বাঙ্গালা কথায় যত ইংরেজি কথা মিলিত হইতেছে, বাঙ্গালা বর্ণমালার অক্ষর সংখ্যার ততই বৃদ্ধি হইতেছে। দেখ বক্স প্রভৃতি কথা লিখিতে আমাদের 'ক্স' এই অক্ষরটির ব্যবহার করিতে হয়, কিন্তু বাঙ্গালা বর্ণমালায় এরূপ অক্ষর পূর্ব্বে ছিল না; বিশেষ সংস্কৃতের নিয়ম অনুসারে ইহা 'ক্ষ' হইয়া যায়। এইরূপ ইংরেজি উচ্চারণের অনুরোধে আমরা ক্স, ষ্ট, প্রভৃতি অক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছি।

ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহের মূল প্রাকৃত, এবং প্রাকৃতের মূল সংস্কৃত। অতএব সমুদয় দেশী ভাষায় সংস্কৃতের উচ্চারণ পরম্পরা সম্বন্ধে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় দেশী ভাষার বর্ণমালা সকল সংস্কৃতের অনুসরণ করিয়াছে। সুতরাং এস্থলে সংস্কৃত বর্ণমালার বিষয় কিঞ্চিৎ সমালোচন অসঙ্গত নহে।

তন্ত্রশাস্ত্রীয় মাতৃকাধ্যানে বলা হইয়াছে—

"পঞ্চাশল্লিপিভি র্বিভক্ত মুখদোঃ পন্মধ্য বক্ষঃস্থলাং
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলা মাপীন গণ্ডস্থলীম্।"

ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চাশটী মৌলিক বর্ণ। যথা—

অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ,—[১৪] স্বর। ক, খ, গ, ঘ, ঙ,। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ,। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। ত, থ, দ, ধ, ন। প, ফ, ব, ভ, ম। য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ।—[৩৩] ব্যঞ্জন ড় ঢ় য় অথবা ং, ঃ, ঁ,—[৩]।

এই পঞ্চাশটি মৌলিক বর্ণ অর্থাৎ বিশুদ্ধ আর সকল বর্ণ ইহাদের পরস্পর সংযোগাদি দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক তন্ত্রশাস্ত্রের এ বাক্যটি কতদূর বিচারসহ।

সংস্কৃত ব্যাকরণের সৃষ্টিকর্ত্তা মহেশ্বরের মতে সংস্কৃত ভাষায়—

অ, ই, উ, ঋ, ৯, এ, ও, ঐ, ঔ—[৯] স্বর। ক, খ, গ, ঘ, ঙ। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। ত, থ, দ, ধ, ন। প, ফ, ব, ভ, ম। য, র, ল, ব, শ ষ স হ। [৩৩] ব্যঞ্জন* এই বিয়াল্লিশটি মৌলিক বর্ণ।

এই বিয়াল্লিশটীর মধ্যে স্বরবর্ণ সকল প্রথমে হ্রস্ব দীর্ঘ এবং প্লুত এই তিন প্রকার। তাহার পর প্রত্যেকে আবার উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত এই তিন প্রকারে বিভক্ত হওয়ায় এক একটি স্বরের নয়টী করিয়া ভেদ হইয়াছে। অনন্তর সানুনাসিক এবং নিরনুনাসিক ভেদে প্রত্যেক স্বর অষ্টাদশবিধ রূপ ধারণ করিয়াছে। পরন্তু ৯কারের দীর্ঘ নাই, এবং এ, ও, ঐ, ঔ ইহাদের হ্রস্ব না থাকায় ইহারা প্রত্যেকে দ্বাদশবিধ মাত্র। অবশিষ্ট অ, ই, উ, ঋ, ইহারা প্রত্যেকে অষ্টাদশবিধ। সকল মিলিত হইয়া স্বরেব ভেদ একশত বত্রিশ প্রকার [১৩২]।† কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে চতুর্দ্দশ নির্দ্দেশ করা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। যদি দীর্ঘ ভেদকে মৌলিক বলিয়া গণনা করা হয়, তবে অপর ভেদ গুলিকেই বা কি নিমিত্ত মৌলিকের মধ্যে গণনা করা না হয়। যদি বল, স্বরের এই দুইটি ভেদে আকার বৈলক্ষণ্য হয় বলিয়া তন্ত্র শাস্ত্রে এই দুই ভেদকে মৌলিক বর্ণের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। একথা তাদৃশ যুক্তিযুক্ত নয়। তথাপি স্বরসংখ্যা চতুর্দ্দশ না হইয়া ত্রয়োদশ হয়, কারণ ৯ কারের যে দীর্ঘ নাই ইহা নাগোজী ভট্ট স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন "৯বর্ণস্য দ্বাদশ-তস্য দীর্ঘাভাবাৎ।" সুতরাং মূল বর্ণ পঞ্চাশটী না হইয়া উনপঞ্চাশটি হয়। আরও দেখ ড়, ঢ়, য় ইহারা কেবল ড, ঢ, য এর উচ্চারণ ভেদ মাত্র। যদি স্বরের উচ্চারণ ভেদ গণনা না করা হয়, তবে ব্যঞ্জনের উচ্চারণ ভেদে বর্ণভেদ স্বীকার করা যে কিরূপ যুক্তিসঙ্গত, তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেই অনুভব করিবেন। আর যদি ড়, ঢ়, য় এই তিনটিকে না ধরিয়া ং, ঃ, ँ, এই তিনটি ধরিয়া পঞ্চাশের পূরণ করা হয় তাহা হইলে [গুংকার], ≍ [জিহ্বামূলীয়] এবং [উপাধ্মানীয়] ইহাদিগকে কেন এক একটী বর্ণ বলিয়া পরিগণিত করা না হয়। অতএব তন্ত্রশাস্ত্রে যে কোন্ হিসাবে পঞ্চাশটী মৌলিকবর্ণ গণনা করা হইয়াছে তাহা বুঝা গেল না। বিশেষে

---

* সিদ্ধান্ত কৌমুদীর মাহেশ্বর সূত্র দেখ।

† তদিত্থং অ, ই, উ, ঋ, এষাং বর্ণানাং প্রত্যেকমষ্টাদশ ভেদাঃ। ৯ বর্ণস্য দ্বাদশ, তস্য দীর্ঘাভাবাৎ, এতামপি দ্বাদশ তেষাং হ্রস্বাভাবাৎ। নাগোজী ভট্টঃ।

সিদ্ধান্ত কৌমুদীকার অনুস্বারকে অচ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "যথা অনুস্বারস্যাপি অচ্ত্বাৎ।"

যাহা হউক এক্ষণে ব্যাকরণ শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে বিয়াল্লিশটি মৌলিকবর্ণ ধরা গেল। ইহার মধ্যে স্বর নয়টি। এই নয়টি স্বরের [১৩২] একশত বত্রিশ ভেদ।

ব্যঞ্জনবর্ণ—ইহার মৌলিক সংখ্যা (৩৩) ত্রয়স্ত্রিংশৎ মাত্র। ইহাদের মধ্যে য ব ল ইহারা অনুনাসিক এবং নিরনুনাসিকভেদে প্রত্যেকে দুই প্রকার। যথা "অনুনাসিকাঽননুনাসিকভেদেন যবলা দ্বিধা।" এতদনুসারে ব্যঞ্জনবর্ণ ষট্‌ত্রিংশৎ (৩৩+৩=৩৬) হইল; কিন্তু কোন না কোন প্রকার স্বরের সাহায্য ব্যতীত ব্যঞ্জন স্বয়ং উচ্চারিত হইতে পারে না। ব্যঞ্জনের উচ্চারণ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত এক শত বত্রিশটি স্বরের মধ্যে একটী না একটি স্বরের যোগ করিতে হইবে; তাহা হইলে কেবল স্বরসংযোগে ব্যঞ্জনের ভেদ [১৩২×৩৬=৪৭৫২] ইহার উপর তাহাদের পরস্পর সংযোগ জন্য ভেদ আছে। এই পরস্পর সংযোগ উপর নীচে এই দুইপ্রকারে হইয়া থাকে। ব্যঞ্জনদিগের পরস্পর সংযোগজনিত ভেদ অসংখ্য এবং ইহা নানাকারণে হইয়া থাকে।

১ম, প্রতিশাখ্য অর্থাৎ বৈদিক ব্যাকরণে নিয়ম আছে যে, বর্গের* আদি চারি বর্ণের যদি নীচে পঞ্চমবর্ণ সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে যে বর্ণ পঞ্চমবর্ণের সহিত সংযুক্ত থাকিবে, উহা স্বসদৃশবর্ণের সহিত পূর্ব্বে সংযুক্ত হইবে। ঐ সংযুক্তাক্ষরের নাম যম। যথা "পলিক্‌ক্নী" "চখ্‌খ্‌নতু" ইত্যাদি।

দ্বিতীয়। দ্বিত্ব বিধান দ্বারা কতকগুলি সংযুক্ত অক্ষর বর্দ্ধিত হইয়াছে। যথা "অচোরহাভ্যাং দ্বে"এই সূত্র দ্বারা "হর্য্যনুভবঃ" "ন হ্যস্তি" ইত্যাদি স্থলে র এবং হ তে দুইটি 'য' কার সংযুক্ত হইয়াছে। 'বা হত জগ্ধয়োঃ' এই বার্ত্তিক সূত্র বলে 'পুত্ত্রহতী' 'পুত্ত্রজগ্ধী' এই দুই স্থলে পুত্র শব্দের ত কারের সহিত আর একটী ত কারের সংযোগ হইয়াছে। "ত্রি প্রভৃতিষু শাটকায়নস্য" এই সূত্র দ্বারা 'রাষ্ষ্ট্রং' 'ইন্দ্র্র' ইত্যাদি পদস্থিত 'ষ' কার এবং 'ন' কার আর একটি করিয়া 'ষ' এবং 'ন' কারের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ইত্যাদি।

---

* ক হইতে ম পর্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে বর্গ বলে। ক খ গ ঘ ঙ। এই পাঁচটি কবর্গ। চ ছ জ ঝ ঞ। চবর্গ ইত্যাদি।

বর্গেষ্বাদ্যানাঞ্চতুর্ণাম্পঞ্চমে পরে মধ্যে যমো নাম পূর্ব্বসদৃশোবর্ণঃ প্রতিশাখ্যে প্রসিদ্ধঃ।" সিদ্ধান্তকৌমুদী।

৩য়। সন্ধি প্রকরণ দ্বারা। সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন; বর্ণদ্বয়ের সংহিতা * —অর্থাৎ পরম সন্নিকর্ষ হইলে তাহাদের সন্ধি অর্থাৎ মিলন হয়। এই সন্ধি দুই প্রাকার; প্রথম 'অচসন্ধি' দ্বিতীয় 'হলসন্ধি।' অচের সংহিতায় যে মিলন হয়, তাহার নাম 'অচসন্ধি,' হলের সংহিতায় যে মিলন তাহার নাম হলসন্ধি। এই উভয়বিধ সন্ধি দ্বারাই অনেক সংযুক্ত অক্ষর সৃষ্ট হইয়াছে। অচ সন্ধি দ্বারা 'সুধী উপাস্যঃ=সুধ্যুপাস্য' দ্বিত্বাদি সূত্রের নিয়মে সুধ্যুপাস্যের আবার চারি প্রকার রূপ হয় যথা 'সুধ্যুপাস্যঃ' 'সুদ্ধ্যুপাস্যঃ' 'সুদ্ধ্যুপাস্যঃ' 'সুধ্যুপাস্যঃ' এইরূপ মধ্বরিঃ পিত্রর্থঃ গব্যং নাব্যং, গব্যূতি, ক্ষয্যঃ, জয্যঃ, ক্রয্যঃ, কৃষ্ণর্দ্ধিঃ, তবল্‌ঙ্কারঃ, তবল্‌ঙ্কারঃ, তবঙ্কারঃ, তবল্ল্কারঃ, † ইত্যাদি বিবিধ সংযুক্তাক্ষর সৃষ্ট হইয়াছে। হল সন্ধি দ্বারা সচ্চিত্ত, শার্ঙ্গিঞ্জয়ঃ, বিশ্নঃ, রামষ্ষষ্ঠঃ, রামষ্টীকতে, তট্টীকা, চক্রিণ্ঢৌকসে। ষন্নবতি, ষন্নগরী, সন্‌ষষ্ঠঃ,তল্লয়ঃ, উত্থান, উত্তম্ভন, উৎথান, উৎতম্ভন, বাগ্‌ঘরিঃ, বাগ্‌হরিঃ, তচ্‌শিবঃ, তচ্ছিবঃ, তচ্ছ্লোকেন, তৎছ্লোকেন, অঞ্চিতঃ, অঙ্কিতঃ, কুণ্ঠিতঃ, শান্তঃ, গুম্ফিতঃ, কিমস্কানয়তি, কিঙ্ঘ্‌লয়তি, কিল্‌হ্লাদয়তি, প্রাঙ্খষষ্ঠঃ প্রাঙ্ক্ষষ্ঠঃ, সুগণ্ট্ষষ্ঠ, ষটৎসন্ত, সঞ্ছম্ভুঃ, সঞ্চ্ছম্ভুঃ, সঞ্শম্ভুঃ, সঞ্শম্ভুঃ, ‡ প্রত্যঙঙাত্মা, সুগণ্ণীশঃ, সন্নচ্যুত। সংসস্কর্ত্তা সংসসস্কর্ত্তা, সঁসকর্ত্তা সংংসস্কর্ত্তা, সংস্কর্ত্তা, সংস্কর্ত্তা সংস্কর্ত্তা¶। ইত্যাদি।§

---

* "সংহিতৈক পদে নিত্যা, নিত্যা ধাতুপসর্গয়োঃ।
নিত্যাসমাসে, বাক্যেতু সা বিবক্ষামপেক্ষতে।"

পরম সন্নিকর্ষরূপ সংহিতা, এক পদ, ধাতুপসর্গযোগ এবং সমাসে নিত্য হয়; অর্থাৎ এ কয়স্থলে পরম সন্নিকর্ষ হইলেই সন্ধি করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন অন্যস্থলে বিবক্ষাধীন।

† "দ্বিত্বং নস্যৈব'কস্যৈব লোভয়োরুভয়োরপি।
তবঙ্কারাদিষু বুধৈর্বোধ্যংপদ চতুষ্টয়ম।" কারীকা

‡ ঞ্ছো ন্না ঞ্চ্শা ঞ্শা বিতি চতুষ্টয়ং।
রূপাণামিহ তুকছত্ব চলোপানাং বিকল্পনাৎ।" কারীকা

¶ 'সমোবালোপমেকে ইতি ভাষ্যম্ লোপস্যাপি রু প্রকরণ স্থানুস্বারা নুনাসিকাভ্যামেক সকারং রূপদ্বয়ং দ্বিসকারং রূপদ্বয়ং। তত্রানচি চেতি সকারস্য দ্বিত্ব পক্ষে ত্রিসকার মপি রূপদ্বয়ং × × × শরঃ খয় ইতি কদ্বিত্বে ষঠ্। অনুস্বারস্য দ্বিত্বে দ্বাদশ' ইত্যাদি সিদ্ধান্তকৌমুদী দেখ।

§ যে যে পদের সংহিতা হইয়া পূর্ব্বোক্ত সন্ধি সকল হইয়াছে তাহা ক্রমশঃ দেখান যাইতেছে। মধু অরি, গো যং, নৌ যং, গোঃ যুতি ক্ষে যঃ, জে যঃ, ক্রে যঃ, কৃষ্ণ ঋদ্ধিঃ, তবঃকারঃ, শার্ঙ্গিন্ জয়, রামম্ ষষ্ঠ, তৎ টীকা, ষং নবতি, ষট্‌নগরী, তৎ লয়, উৎস্থানং, উৎ স্তম্ভনং, বাক্‌হরিঃ তৎশিবঃ, তৎশ্লোক, অংচিত, অংকিত কুংঠিতঃ, শাংতঃ গুংফিত, কিংহ্মলয়তি, কিংস্বধনয়তি, কিংহ্লাদয়, প্রাঙ্‌ষষ্ঠ, সুগণষষ্ঠ, ষট্‌সন্ত, সন্‌শম্ভু প্রত্যঙ্ আত্মা সুগণ্ ঈশঃ, সন্‌অচ্যুতঃ, সংকর্ত্তা।

৪র্থ। কতকগুলি সংযুক্তাক্ষর প্রত্যয়ের* সাহায্যে উৎপন্ন হইয়াছে। সুপ্, তিঙ্, কৃৎ, তদ্ধিৎ, যঙ্, সন্, ক্যচ, ক্যঙ্ ইত্যাদি প্রত্যয়। আমরা সামান্যরূপে প্রত্যয়ের সংযোগে যে সকল সংযুক্তাক্ষর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের উদাহরণ দেখাইতেছি, অভ্যাং, রাজ্ঞঃ, দধ্না, দংদহ্যতে, জিগৃক্ষতি, অপীপ্যৎ, জগ্মুঃ, জগ্মতুঃ, উপাস্যঃ, বিষ্ণুঃ, কৃষ্ণঃ, রুগ্নঃ, ভগ্ন, পক্ব, আত্মা, বাক্যং, দৈত্যঃ, মাহাত্ম্যং ইত্যাদি।

৫ম। কতকগুলি সংযোগ আগমের † দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। যথা রুধ্যতি প্রাপ্নুহি, অশ্নাতি, অস্যতি, পচন্তী, দিব্যন্তী, কম্পয়তি, গুম্ফিতা, সম্বপ্নে, ইত্যাদি।

তদতিরিক্ত কতকগুলি প্রাকৃতিক সংযুক্ত অক্ষর আছে। যে সকল সংযুক্তাক্ষর কোন নিয়ম অনুসারে উৎপন্ন হয় নাই তাহাদিগকে প্রাকৃতিক সংযুক্ত নামে অভিহিত করা হইল। যথা ধ্বন, ইধ্য, ঘ্রা, স্না, চক্ষ, ধ্মা, প্রী, হ্রী, শ্রি, শ্যামল, শ্বেত। ইত্যাদি।‡

চিহ্ন—পূর্ব্বোক্ত বর্ণ ভিন্ন (ং) অনুস্বার, (ঃ) বিসর্গ, ँ চন্দ্রবিন্দু ৺ গুংকার, ꣲ জিহ্বামূলীয়, ꣳ উপাধ্মানীয়। চ্ছেদ, এবং () কুণ্ডলনা এই কয়েকটী চিহ্ন সংস্কৃত বর্ণমালায় সন্নিবেশিত আছে। পরন্তু ইংরেজী বর্ণমালায় যেরূপ চিহ্নের বিস্তৃতি সংস্কৃত বর্ণমালায় তাহাব তুলনায় চিহ্ন নাই বলিলে হয়। বর্ণের অল্পতা হেতু ইংবেজী ভাষায় লিখিবাব যেরূপ অসুবিধা, চিহ্নাধিক্য জন্য ইহাতে সেরূপ বোধ সৌকর্য্য হইয়াছে। এ দিকে বর্ণের আধিক্য বশতঃ সংস্কৃত ভাষায় যেমন সকল কথা সহজে লেখা যায়, চিহ্নের অল্পতা হেতু সংস্কৃতভাষায় অর্থাবগতিব তেমনই কাঠিন্য। তবে এখন ইংরেজী হইতে অনেক চিহ্ন সংস্কৃতভাষায় ব্যবহৃত করা হইতেছে।

ক্রমশঃ

---

* প্রত্যয়—যাহা বিধান করা যায় তাহার নাম প্রত্যয়।

† প্রকৃতি এবং প্রত্যয়ের সংযোগ হইলে যে বর্ণ আগমন করে তাহার নাম আগম

‡ পাঠকগণ আমাদিগের উদাহরণ নিচয়ের কেবল সংযুক্তারকেই গ্রহণ করিবেন।

গঙ্গাধরশর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

শিকার খেল

আশুতোষ বাবুর বমণা কাননেব পশ্চিম ভাগে একটি চতুক্রোশব্যাপী "রাখা জঙ্গল" ছিল। সারি সাবি শাল মউল ও পিয়াল তরু সুশোভিত স্থানে স্থানে উচ্চ ক্ষুদ্র পাহাড়ের ন্যায় রাঙ্গা মৃত্তিকা-স্তূপ। কোথাও প্রকৃতি দেবী স্বয়ং মনোহর বেশে সজ্জিতা, কোথাও মানব চেষ্টায় বৃক্ষরাজিমণ্ডিত, আবার কোথাও ক্ষুদ্র নদী চাকচিক্যমান শ্বেত বালুকা শর্য্যোপবি ঝির ঝিব করিয়া দক্ষিণাভিমুখে বড় নদীর দিকে যাইতেছে। একটু উচ্চস্থানে দাঁড়াইলে এই প্রকৃতি ছবির সুললিত বিচিত্রতা বিশেষ প্রকাশ পায়, কোন দিকে থরে থরে রঙ্গভূমির সোপানস্বরূপ, নবীন উজ্জ্বল পত্রধারী নানাজাতীয় বন্য তরু দণ্ডায়মান। কোথাও মাধবী মালতি প্রাতঃসমীরণে দোদুল্যমান। একদিকে উচ্চতর নিবিড় বন, একদিকে ক্রমান্বয়ে নিম্ন সুদূরবর্ত্তী বালুকারাশি ব্যাপ্ত বড় নদীর কূল, তাহার পরেই রায় বাঁধ। তাহার বৃহৎ স্বচ্ছ দর্পণ স্বরূপ বারিব্যাপ্তি নয়নকে আকৃষ্ট করিতেছে, দেখিলে আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়। বৃহৎ খর্ব্ব মরালদল, সেই জলে ভাসমান। কেহ শীলাতলশায়ী হইয়া একবারে সুষুপ্ত, কেহ এক পদে মাত্র ভর করিয়া সান্ত্রির ন্যায় ঢুলিতেছে, তবু সজাগ। কেহ বধূসহ স্থির জলে সন্তরণ করিতেছে! পশ্চিম দিকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিলে নীলাভ ক্ষীণ রেখাস্বরূপ ক্ষুদ্র পর্ব্বতশৃঙ্গ আকাশপ্রান্তে চিত্রিত রহিয়াছে বোধ হয়, কিন্তু সে রেখা এত দূরে যে একবার নয়ন পথে আসে ত আবার তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়, সে রেখা প্রকৃত কি আঁখিভ্রম তাহা অনভ্যাসী জনের স্থির করা দুষ্কর। মৌল ফলের সময় কচিৎ ঋক্ষ ব্যাঘ্র কখন কখন কৃষ্ণসার হরিণদল প্রত্যূষে বিচরণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায় (রক্ষকেরা গল্প করে)। রাশি রাশি

ফুলশয্যায় কিম্বা বারিসিক্ত জলাশয়তটে বালুকার উপর পশুগণের পদচিহ্ন সময়ে সময়ে দেখা যায়। যৌবনাবস্থায় আশুতোষ বাবু সতত শিকারপ্রিয় ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, শীত ঋতু সময়ে তিনি মাসত্রয় মৃগয়া দ্বারা মাংস সংগ্রহ করিয়া ও বন ভোজনে সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেন। তাঁহার উভয় পুত্র নরেন্দ্র ও অমরেন্দ্র বাবুকে কেবল পুথিগত বিদ্যায় পাকা করিয়া ক্ষান্ত পান নাই। শস্ত্রশিক্ষায় উভয়কে সমান নিপুণ করিয়া ছিলেন, ধনুতে বাঁটুল সংযোজনায় তাঁহারা হিংস্র ডাঁরকাক, চিল, প্রভৃতি শিকারী পক্ষী সকল শিকার করিতেন, তীর বা বন্দুকের অপেক্ষা করিতেন না, এবং সময়ে সময়ে দুর্ম্মদ পাঠানের শিক্ষায় তলোয়ার হস্তে বনে বনে ঋক্ষ ব্যাঘ্রের লুক্কায়িত শয্যানুসন্ধানে ফিরিতেন। বঙ্গভূমির দৌর্ব্বল্যসাধিনী বায়ু বারি এ ক্ষত্রিয় বংশজাত যুবকগণকে শান্তি সুখ সম্ভোগে এ পর্য্যন্ত শিথিলাঙ্গ করে নাই ; এখনও তেজীয়ান্ রক্তস্রোতে তাঁহাদের শিরাপ্রণালী বলবৎ ছিল।

আজ উষা সময়ে জঙ্গলের একজন রক্ষক গদাধর রাখালের সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত। গদাধর কান্দিয়া অস্থির। তাহার ধলো বকনাকে বাঘে লইয়া "ডবরি কুদের" পাশে কড় মড় করিয়া ভক্ষণ করিতেছে, কারণ সেই দিকেই রাত্রি শেষে ফেও ডাকিয়া ছিল। সম্বাদ পাইবামাত্র বাজনা ও লোক একত্রিত করিয়া রঘুবীর ও পদাতিক দলকে "রাখায়" যাইতে আদেশ হইল। অমরেন্দ্র ও নরেন্দ্র কোমর বন্ধন করিয়া দুইটী তুকি ঘোড়ায় আরোহিত হইয়া জঙ্গলের দিকে ধাবমান হইলেন। স্বল্পকাল মধ্যে জঙ্গলের ভিতর একটি ভগ্ন দুর্গের তিন দিক শিকারী দ্বারা বেষ্টিত হইল। বাজনা বাজিয়া উঠিল। তাহার সঙ্গে হাকোয়াদের স্বর মিসিত হইয়া জঙ্গল ভেদ করিল, পশ্চাৎভাগ হইতে অমরেন্দ্র ও নরেন্দ্র ভ্রাতৃদ্বয় ভগ্ন দুর্গের স্তূপের উপর ঘোড়ার সহিত আরোহণ করিলেন। গঙ্গাধর কখনই তামাসা দেখিতে পেছ পাও কি কাহার পশ্চাতে থাকিবার নহে—একটী ক্ষুদ্র শিকারী বেশে ক্ষুদ্র ঘোড়ায় বন্দুক হস্তে নরেন্দ্র বাবুর পশ্চাতেই উপস্থিত। প্রকৃত সাহসী পুরুষ সাহস দেখিলে কি বিরক্ত হয়! আমাকে দেখিয়া উভয় সহোদর কহিয়া উঠিলেন "বাহবা গঙ্গু।" কিন্তু ব্যাঘ্র শিকার যে কি বিপদ আমি তাহা জানিতাম না, আমি উৎসাহিত হইলাম, ঘোটক হইতে অবতরণ করিলাম, পাহাড়ীয় লম্বধারে যাইয়া দেখি, নীচে লম্বতলে একটী ক্ষুদ্র জলনালী পার্শ্বে চতুর্দ্দিক্ জঙ্গলবেষ্টিত স্থানে হত গাভীটি সম্মুখে করিয়া ব্যাঘ্র ইতস্তত অবলোকন করিতেছে। আমিই প্রথমে দেখিয়া, উভয় ভ্রাতাকে কহিলাম, সত্বর তাঁহারা উভয়ে আমার নিকট আসিলেন। রাইফল হস্তে ধরিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই?" বাঘটি দেখিতে পাওয়া বড়

সহজ ছিল না। তাহার চতুষ্পার্শে লতা, পাতায় আবৃত ছিল। আমি একটি ক্ষুদ্র কঙ্কর লইয়া সেইখানে ফেলিয়া দিলাম। কে জানিত বাঘ এমত ভয়ানক জন্তু! লোক, কোলাহল, অস্ত্র, শস্ত্র তৃণবৎ জ্ঞান করে! কঙ্করটী তাহার গাত্রে স্পর্শ করিতে না করিতে একটি হুঙ্কার দিয়া উচ্চ লম্ফ ত্যাগ করিয়া বন কম্পিত করিল। কত শিকারীর হস্ত হইতে অস্ত্র পড়িয়া গেল, কত হাকোয়া বনে লুকাইল, কত কত পক্ষী কেকা রবে বৃক্ষে বৃক্ষে উড়িতে লাগিল। ব্যাঘ্র আবার একটি নিভৃত স্থানে লুকাইল। আমরা পশ্চাৎ ভাগে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কিয়ৎকাল পরেই দেখা গেল শ্যাম পিয়ারি ও মতি গজ নামক দুইটি শিকারী হস্তিপৃষ্ঠে ব্যাঘ্রের গুপ্ত গুহা অনুসন্ধানে আসিতেছে। একজন মাহুতের দৃষ্টি আমাদের দিকে পড়িল। আমরা ইঙ্গিত করিয়া দিলাম। অনিচ্ছা পূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ হস্তিদ্বয় সেই দিকে চালিত হইল। হস্তী দুই একপদ অগ্রসর হয় আবার কি এক ভয়ানক ঘ্রাণ পাইয়াই হউক, বা অন্য কারণ বশতঃই হউক ফুৎকাব করিয়া হেলিতে দুলিতে আরোহীদলকে প্রায় ফেলিয়া প্রস্থান করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু ঘন ঘন অঙ্কুশাঘাতে প্রত্যাগত হইয়া নির্দ্দিষ্ট ডুবরীতলে আনীত হয়। একবার হস্তিদ্বয় উভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। অমনি গোপনীয় গুহা হইতে ব্যাঘ্র পুনর্ব্বার গর্জ্জন পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিয়া একবারে ক্ষুদ্রতর করীটির শুণ্ড সজোরে টানিল, হস্তীর বাছা অমনি কর পাতিলেন, শিকারীবা আশেপাশে পড়িয়া গেল, মাহুতপুত্র বৃহৎ হস্তিকর্ণপাশে লুকাইল। এমন সময়ে অমরেন্দ্র বাহাদুরের বন্দুক হইতে একটি গুলি ব্যাঘ্রের কর্ণমূলে লাগিল, এই সময় নরেন্দ্র বীর আর একটি গুলি প্রয়োগ করিলেন। "বাঘ মরিয়াছে" "বাঘ মরিয়াছে" বলিয়া চতুর্দ্দিকে শব্দ হইল। ব্যাঘ্রটী মৃতপ্রায় পতিত হইল, কিঞ্চিৎ দূর হইতে অমরেন্দ্র বাবু আর একটি গুলি করিলেন; তাহাতেই যেন মৃত জন্তু জীবন প্রাপ্ত হইয়া লম্ফ ত্যাগ করিয়া একবাবে অমর বাবুর উরুদেশে মরণ কামড় দিয়া তাঁহাকে ভূমিশায়ী করিল। "হায়! কি হইল!" চারিদিকে কেবল এই শব্দ হইতে লাগিল।

বীর পুরুষের হতাশ নাই; পড়িবার সময় অমর বাবু ব্যাঘ্রের গলার উপর পড়িয়াছিলেন, অমনি পৃষ্ঠদেশ হইতে বৃহৎ ছুরিকা টানিয়া এক প্রহারেই তলদেশ হইতে ব্যাঘ্রের গলদেশের অর্দ্ধভাগ পার করিয়া দিলেন, যাহা কিছু বাকি ছিল রঘুবীর পশ্চাৎ হইতে নিকটে আসিয়া শেষ করিল। একটি পেশোয়ারি ফারসি বয়েত অঙ্কিত কিরীচফলক আমূল পর্য্যন্ত ব্যাঘ্রের পার্শ্বদেশে প্রবিষ্ট করিয়া বহির্গত করিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাপদের নাড়ী ভুঁড়ী সমস্ত বাহির হইয়া পড়িল। ব্যাঘ্র এখন নিষ্পন্দ, মৃত শব মাত্র!

আমি এখন উচ্চ স্থান হইতে অবতরণ করিলাম ও একটি ক্ষুদ্র ছড়ি হস্তে লইয়া মৃত ব্যাঘ্রকে টুক টুক করিয়া কয়েকটিবার প্রহার করিলাম। বাটীতে যাইয়া গল্প করিতে পারিব যে, আমিও ব্যাঘ্র মারিয়াছি। পাঠক আমার কথা শুনিয়া হাসিতেছ? তোমরা কি গল্পচ্ছলে দিল্লী জয় কর না? বাঘ মার না?

আমার বীরত্ব দেখিয়া অমরেন্দ্র আপনার ব্যথা ভুলিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছেন। তাঁহার জখম তাদৃশ গুরুতর হয় নাই তথাপি রক্ত অনর্গল পড়িতেছিল। সত্বর আহত স্থান বন্ধন করা হইল। প্রায় পঞ্চ ক্রোশ পথ যাইতে হইবে। আর বিলম্ব করা হইবে না কাহার কথা না শুনিয়া আবার অশ্বারোহী হইলেন। একজন সওয়ারকে অগ্রে শিকারের সম্বাদ দিবার জন্য কর্ত্তা মহাশয়ের নিকট ত্বরিত প্রেরণ করিলেন। রঘুবীরকে একখান পাগড়ি ও রজত বলয় এক যোড়া পুরস্কার দিবার হুকুম হইল। মৃত ব্যাঘ্রটি হাতীর পৃষ্ঠে বোঝাই হইল। আমাদের অশ্বশ্রেণী শ্রীনগরাভিমুখে ধাবিত হইল।

তিন ক্রোশ আসিয়া রমণা পার হওয়া গেল। জলে জঙ্গলে যে দিকে ঋজু পথ সেইদিকেই অশ্ব চালিত হইতেছে। ঘর্ম্মে অশ্ব স্নাত, সেই ঘর্ম্মে তাপ উঠিতেছে। অশ্বমুখে লৌহখানিতে ফেণা উঠিতেছে। নাসারন্ধ্র বিস্তার করিয়া লোহিত বর্ণ অশ্বদল দৌড়িতেছে। সকলের কৌতুকের বিষয় এই যে আমিও আমার ঘোড়ায় বৃহৎ অশ্ব সুনিপুণ আরোহীদের সহিত সমধাববান হইয়াছি। এখন শান্তিপুর ও শ্রীনগরের মধ্য প্রান্তরে যে ক্ষুদ্র নদী ছুটিতেছিল, তাহার কূলে কূলে আমরা যাইতেছিলাম; ছায়াহীন বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র মধ্য দিয়া পথ। সূর্য্য প্রখর হইয়া উঠিতেছে, বোধ হইল যেন অমরেন্দ্র নাথের ব্যথা বৃদ্ধি হইতেছে, অমর বাবুর মুখশ্রী কিঞ্চিৎ মলিন বোধ হইতেছে, তিনি আহত শরীরে ক্লান্তি বোধ করিতেছেন, অমরেন্দ্র কহিলেন, "সম্মুখে ঐ নদীর তটে কুটীরটি কার?" এক সওয়ার কহিল, "তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আবাসভূমি"।

অম। আমি তাই ভাবিয়াছিলাম। শ্রীনগর এখান হইতে কত দূর?

সওয়ার। প্রায় দুই ক্রোশ। অমর বাবু কহিলেন, "আমি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আশ্রমে একবার আরাম করি। তোমরা সকলে যাও, অপর কোন যান লইয়া আইস। সকলে শ্রীনগরাভিমুখে চলিল কেবল একটি বিশ্বস্ত ভৃত্যসহিত অমরেন্দ্রনাথ তর্কালঙ্কারের গৃহমুখে চলিলেন, গঙ্গাধরও ক্লান্ত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সঙ্গী হইলেন। রোজনামচায় নূতন সম্বাদের দিকে আমার সর্ব্বদাই দৃষ্টি। ভাবিলাম সঙ্গে যাই দুই এক নূতন বিষয় দেখিব। নূতন কথা শুনিবই শুনিব।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

"খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট"

সামাজিক ঘটনাসূত্রের পাক-জাল খুলিতে কোন শাস্ত্রীই আজ পর্য্যন্ত সক্ষম নহেন; বাহ্য জগতের বাণিজ্য ব্যবসায়ের দুই একটি সামান্য ঘটনার উদাহরণ দিয়াই ইদানীন্তন সমাজশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক মহাত্মারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু সামাজিক ঘটনার দীর্ঘ সূত্র আজ পর্য্যন্ত মানবপরিমিতির সাধ্যাতীত। কি হইতে কি হয়! পাশক্রীড়া হইতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। নৃশংস মৃগয়াপরিশিষ্টে স্বর্গীয় নির্ম্মল প্রণয়ের উৎপত্তি। মৃগয়ার শেষেই পুরুরবা উর্ব্বসী লাভ করেন —দুষ্মন্ত নিষ্কলঙ্ক শকুন্তলার প্রণয়পাশে বদ্ধ হন—আজ আবার শিকার খেলান্তে অমরেন্দ্রনাথ কাদম্বিনীর সরল কটাক্ষকলে চিরবদ্ধ হইলেন, তাহাতেই আবার শান্তিপুরে শান্তির ভিত্তি পত্তন হইল।

বাঘ মারিয়া আমরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আশ্রমাভিমুখে আসিয়া তাঁহার অটবী নিকট পৌছিলাম। স্থানটি বন্য। উত্তর পার্শ্বে নদী; অপর তিন দিকে বিস্তৃত হরিতময় শস্যক্ষেত্র। পূর্ব্বদিকে প্রথমতঃ একটি চতুষ্পাঠী, তাহার পশ্চিমে নারীগণের প্রাচীরবেষ্টিত আবাসস্থান; তাহার পশ্চিমে একটি বৃহৎ অটবী, আম্র, পনসের অনেকগুলি সুন্দর তরু; একপার্শ্বে কতকগুলি কদলি বৃক্ষ ও নিত্যপূজোপকরণ পুষ্পপ্রদায়ী জবা, করবী, বেল, চামেলি বেলা, যূঁই বৃক্ষ। উদ্যানের প্রান্তরে ঈশান কোণে একধারে নদীকূলে একটি বৃহচ্ছায়াশালী মালতি-লতাবেষ্টিত পুরাতন বটবৃক্ষ। সেই বটবৃক্ষের প্রকাণ্ড শাখাতলে একটী বেদি, ফুল, ফল, সুগন্ধ চন্দন প্রভৃতি উপচারে সুশোভিত। বেদির কিঞ্চিৎ দূরে একটি বৃদ্ধ মালতিতলে, নীলাম্বরপরিধানা মুক্তকেশী একটি পদ্মমুখী এক হস্তে পুষ্পপাত্র ও অন্য হস্তে একটি আকর্ষণী ধরিয়া সুগোল কাঞ্চন আভাময় বাহু উত্তোলন করিয়া পুষ্পশাখা টানিতেছেন। এই ছবিটি সর্ব্বাগ্রে অমরেন্দ্র নাথের নয়নপথে পড়িল। তিনি কি ভাবিতেছিলেন বলিতে পারি না—আমার বোধ হইল, যেন হিমালয়ে জাহ্নবীতটে পতিপ্রাপ্তি কামনায় ভগবতী পুষ্পচয়ন করিতেন এই কুলকামিনীও সেইরূপ কোন নিগূঢ় কামনায় এখানে পূজার আয়োজন করিতেছেন। অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "এই তর্কলঙ্কার মহাশয়ের পবিত্র গৃহ, এইখানেই আরাম করা যাউক।" গৃহ হইতে তর্কালঙ্কার মহাশয় এই বাক্য শুনিয়াই কহিলেন, "অহো! ভাগ্য! কে অমরেন্দ্র নাথ বাবু! আসুন আসুন মুখশ্রী একবারে পরিম্লান দেখিতেছি কেন?" এই কথা কহিতে কহিতে একটি

বংশছিলকা নির্ম্মিত কপাট খুলিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় শশব্যস্ত; ব্রাহ্মণেরা লোভী আর দক্ষিণাপ্রিয়, কিন্তু অতিথি সৎকারে, অন্নদানে কখন কাতর নহেন। বিশেষ অমরেন্দ্র তাঁহার গোষ্ঠীপালক; এই উদ্যান এই ব্রহ্মোত্তর তাঁহারই পিতা আশুতোষ বাবুর দত্ত। অমরেন্দ্রবাবুকে কিসে আপ্যায়িত করিবেন, এই ভাবিয়াই তর্কালঙ্কার মহাশয় ব্যস্ত, বেদির দিকট যে জলপাত্র ছিল, তাহা স্বয়ং লইয়া অমরেন্দ্রের মুখে সিঞ্চন করিলেন; পরক্ষণেই দুই তিনটি চতুষ্পাটির ছাত্র ধরিয়া একটি ক্ষুদ্র খাট আনিয়া বটতলে সংস্থাপিত করিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় কহিয়া উঠিলেন, "কাদম্বিনী, মা! জলমানয় তুমি একান্ত বালিকা লজ্জা কি মা?" ক্ষুদ্র ঘটকক্ষে কাদম্বিনী নদীতীরে ধীরে ধীরে গমন করিলেন, অমরেন্দ্রনাথ এখন শয্যাশায়ী, নদীর দিকে তাঁহার দৃষ্টি। মুক্তকেশরী মরালগমন সন্দর্শনে তাঁহার নয়ন তৃপ্ত হইতে লাগিল; বোধ হইল, যেন দেখিতে দেখিতে ব্যথার অৰ্দ্ধেক লাঘব হইল। শীতল বটচ্ছায়াতে হউক, বা শ্যামা স্ত্রী সন্দর্শনে হউক, বা ক্লান্তি বশতই হউক, স্বল্পকাল মধ্যেই অমরেন্দ্র নিদ্রিত হইলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে একজন চিকিৎসক লাউসেন দত্ত শ্রীনগর হইতে উপস্থিত হইলেন, তিনি অতি যত্নে আহত স্থান দেখিলেন, ও প্রক্ষালিত করিয়া বন্ধন করিলেন। দুই এক বার মস্তক হেলাইলেন, মনে করিলেন, আঘাত নিতান্ত সহজ নহে, পুনর্ব্বার বাঘের বিষ নামাইবার জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, ঝাড়িলেন, ফুকিলেন, ধূলা ছড়াইলেন, আবার কহিলেন, বাবুর নিদ্রা ইচ্ছা থাকে কিঞ্চিৎকাল এখানে আরাম করুন। সকলেই উদ্যান হইতে বাহিরে আসিল, তর্কালঙ্কার অনতিদূরে বেদিপার্শ্বে উপবেশন করিয়া স্বস্ত্যয়নে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহারই অনুমত্যনুসারে কাদম্বিনী তালবৃন্ত লইয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন, কিঞ্চিৎকাল পরেই অমরেন্দ্রনাথের তন্দ্রা ভঙ্গ হইলে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে তালবৃন্ত হস্তে মুক্তকেশী দণ্ডায়মানা। এ মিলন অরুণ উষার মিলন!

"নিত্য নব, নিত্য হাসে, হাসায় জগতে"

অমরেন্দ্র হস্ত প্রসার করিয়া কহিলেন, "ধর, আমি বসিব।" মুক্তকেশী যেন মনের কোন অনিবার্য্য ভাবোদ্রেকে অমরেন্দ্রের ব্যথায় একান্ত ব্যথিত হইয়া করাবলম্বনে তাঁহাকে বসিতে সহায়তা করিলেন, করস্পর্শ সুখলাভে অমরেন্দ্রনাথ তেজীয়ান্ হইলেন, ব্যাঘ্রকে ধন্যবাদ দিলেন। আহত স্থান যেন এককালে ব্যথাচ্যুত হইয়াছে বোধ হইল।

এদিকে সন্তানের বিপদ সংবাদে আশুতোষবাবু একান্ত অস্থির হইয়া স্বয়ং তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গ্রামে আসিলেন, কিন্তু তিনি অধ্যাপক মহাশয়ের ভদ্রাসন

বা উদ্যানে প্রবেশ করিলেন না। যখন এই সকল ভূমি তর্কালঙ্কার মহাশয়কে দান করিয়াছেন, তখন তিনি স্বয়ং বা তাহার উত্তরাধিকারীগণ ভবিষ্যতে কেহ কখন সেই সীমামধ্যে পদার্পণ করিলে পতিত হইতে হইবে, কাজেই অন্যস্থানে একটি নিম্ব বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিলেন ; কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ তর্কালঙ্কারের ব্রহ্মস্ব বৃত্তিতে প্রবেশ করিয়াছেন দেখিয়া বড় কষ্ট পাইলেন, শেষ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সত্বর অমরেন্দ্রনাথকে তাঁহার নিকট আনিতে বলিলেন ; তাঁহার আগমন বার্ত্তা শুনিবামাত্র তর্কালঙ্কার মহাশয় নিকট আসিয়া কহিলেন, "কোন চিন্তা নাই, সামান্য একটু ব্যথা হইয়াছে মাত্র, সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হইবে।" আশুতোষ বাবু কহিলেন "সে মহাশয়ের আশীর্ব্বাদ—এখন আর একটি অনিষ্ট দেখিতেছি। আপনি স্মরণ করিয়া দেন নাই যে, এ স্থান আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ; অমরেন্দ্রকে কেন আপনার অধিকারের মধ্যে যাইতে অনুমতি দিলেন ?" তর্কালঙ্কারের হাসি রাখিতে জায়গা নাই, একটি বচন পাঠ করিলেন ও কহিলেন, "ইহার আর দ্বিগুণ স্থান দান করিলেই ত প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে।" আপাততঃ আশুতোষ বাবু কোন উত্তর দিলেন না।

এদিকে অমরেন্দ্র নাথ শয্যা ত্যাগ করিয়া শিবিকাতে উঠিতে ইচ্ছা করিতেছেন, আবার মনে মনে এ চিরস্মরণীয় স্থান ত্যাগ করিতেও অনিচ্ছুক ; কাতরভাবে বলিলেন "এই ব্যথার স্থানটি আর একবার ধুইয়া ভাল করে বান্ধিয়া লইলে ভাল হয়, কে বান্ধিবে ? গঙ্গু তুমি পারিবে ? তোমার নিতান্ত কোমল হাত।" আমি কহিলাম, "এই মুক্তকেশী দিদির হাত আরও কোমল, দিদি দাও তো।" উভয়ের মনের মত কথা হইল বলিয়া বোধ হইল। মুক্তকেশীর সুকুমার হস্ত দ্বারা আহতস্থান ধৌত হইল। বস্ত্র বন্ধন সমাধা হইলে অমরেন্দ্র ভাবিলেন, "আর ব্যথা নাই," বসিলেন, দাঁড়াইলেন, দুই এক পদ চলিলেন ; আবার কহিলেন "কেমন বন্ধন ? খুলে গেল।" আমি কহিলাম, মুক্তকেশী দিদি আবার বেন্ধে দাও। এবার অমরেন্দ্রনাথ দণ্ডায়মান, মুক্তকেশী পদতলে উপবিষ্ট ; কোমল হস্তযুগলে পাদস্পর্শ করিয়া শুভ্র বস্ত্রাংশ বন্ধন করিতেছেন। বোধ হইতেছে যেন চন্দ্রশেখরের পদপার্শ্বে মোহিনী মূর্ত্তিধারিণী উমাসুন্দরী মর্ত্তে অবতীর্ণা। এমন শ্রীমান শ্রীমতীর এক স্থানে মিলন বিরল। এখন বন্ধন শেষ হইল, মনেও মন বাঁধা পড়িল, অমরেন্দ্রনাথ পাল্কিতে শুইলেন, তর্কালঙ্কার আশীর্ব্বাদ করিলেন, ও ভ্রু উত্তোলন করিয়া কহিতে লাগিলেন।

ধেনুবৎস প্রযুক্তা বৃষ, গজ, তুরগা, দক্ষিণে তপ্ত বহ্নি।
দিব্য স্ত্রী, পূর্ণ কুম্ভ, দ্বিজ নৃপ গণিকা পুষ্প মালা পতাকা।

সদ্য মাংস ঘৃতোবা, দধি রজত কাঞ্চন,
শুক্ল ধান্ত দৃষ্ট্বা স্তত্বা পঠিত্বা মানসে প্রস্থি কামঃ।

সকলে আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় আশুতোষ বাবুর নিকট আগত হইলেন; সকলেই উৎসাহিত কেবল দেখিলাম, মুক্তকেশী নিমেষশূন্য লোচনে অমরেন্দ্রনাথের দিকে যেন কিঞ্চিৎ হতাশ বদনে চাহিতেছেন।

আমি কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া ভাবিলাম, এ মুক্তকেশী কে? তর্কালঙ্কার মহাশয় কহেন, তাঁহার শিষ্যকন্যা। আমি ইহাকে আর কোথাও দেখিয়াছি। সেই গজাননের চণ্ডীর মন্দিরে ইনিই না আলপনা দিতেছিলেন? না আর কোথাও দেখিয়া থাকিব, আভাষমাত্র স্মরণ হইল ইনিই বোধ হয় ছদ্মবেশী কুলকামিনী সেই কাদম্বিনী, দাঙ্গার সময় ইহাকেই না বাবু শিবসহায় সিংহের অট্টালিকায় দেখি! বিসর্জ্জনের দিন এই রত্ন হারাইয়াই অমরেন্দ্রনাথ কি অস্থির হইয়াছিলেন?

ষষ্ঠ বর্ষ : দশম সংখ্যা

নানক শিখসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, গোবিন্দ সিংহ শিখসম্প্রদায়ের উন্নতি-বিধাতা। নানকের সময়ে শিখগণ একটি বিশেষ সম্প্রদায়নিবদ্ধ হইয়া পরমাত্মসংযত যোগীর ন্যায় আপনাদের ধর্ম্মপদ্ধতি অনুমোদিত কার্য্য সম্পাদনে ব্যাপৃত থাকে; গোবিন্দ সিংহের সময়ে শিখসমাজে রাজনৈতিক সাধারণতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। আমরা নানকের বিবরণ বঙ্গদর্শনের পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছি, এক্ষণে শিখদিগেব রাজনৈতিক সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দ সিংহের বিবরণ লইয়া তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছি।

১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নানকের মৃত্যু হইলে অঙ্গদ নামে তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য শিখদিগের গুরু হন। অঙ্গদের পর অমরদাস ও রামদাস যথাক্রমে শিখ সম্প্রদায়েব অধিনায়কতা করেন। চতুর্থ গুরুর নাম অর্জ্জুন মল। এপর্য্যন্ত যে যে ব্যক্তি শিখদের গুরু হন, তাঁহাদের মধ্যে অর্জ্জুনেরই নানকের প্রচারিত ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশিষ্ট অধিকার ছিল। অর্জ্জুন আপনাদের ধর্ম্মপুস্তক আদিগ্রন্থ একত্র সংগৃহীত ও বিধিবদ্ধ করেন। এই সময়ে জহাঙ্গীরের পুত্র খসরু বিদ্রোহী হইয়া পঞ্জাবে বাস করিতেছিলেন, অর্জ্জুন তাঁহার অনুকূলে আপনাদের ধর্ম্মানুশাসনের অনুমোদিত কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করাতে জহাঙ্গীর তাঁহাকে দিল্লীতে আনিয়া কারাবদ্ধ করেন। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে কারাগারের কষ্টে অথবা ঘাতকদিগের কুঠারাঘাতে অর্জ্জুনের মৃত্যু হয়। অর্জ্জুনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হরগোবিন্দ গুরুর পদ অধিকার করেন। পিতার শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে মুসলমানদিগের প্রতি হরগোবিন্দের মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ জন্মে। প্রতিহিংসা বৃত্তি হরগোবিন্দকে অস্ত্রধারণও যুদ্ধকার্য্যে উত্তেজিত করিয়া তুলে। হরগোবিন্দ সর্ব্বদা দুইখানি তরবারি ধারণ করিতেন, কেহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসিলে তিনি অম্লান বদনে উত্তর দিতেন। "এক-খানি পিতার অপঘাত মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য, অন্য খানি মুসলমানদের শাসন

উচ্ছেদের জন্য রক্ষিত হইতেছে।” হরগোবিন্দই শিখসমাজে অস্ত্রশিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তক।

হরগোবিন্দের পাঁচ পুত্র গুরুদিত্য, সুরতসিংহ, তেজবাহাদুর, অম্নরায় ও অটলরায়। ইহাদের মধ্যে পিতার জীবদ্দশাতেই সর্ব্বজ্যেষ্ঠটির মৃত্যু হয়। শেষ দুইজন অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগত হন, এবং অবশিষ্ট দুইজন মুসলমানদের অত্যাচারে পাঞ্জাবের উত্তরবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গুরুদিত্যের দাহর মল ও হররায় নামে দুই পুত্র ছিল। ইহার মধ্যে দ্বিতীয়টী হরগোবিন্দের পদ গ্রহণ করেন। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় দুই পুত্র রামরায় ও হরেকৃষ্ণের মধ্যে গুরুর পদ লইয়া মহাগোলযোগ আরম্ভ হয়। কোন প্রকারে এই গোলযোগের মীমাংসা না হওয়াতে উভয় পক্ষ দিল্লীতে গমন করেন। সম্রাট্ অওরংজেব শিখদিগকে আপনাদের গুরু নির্ব্বাচন করিয়া লইতে অনুমতি দেন। এই অনুমতি ক্রমে শিখগণ হরেকৃষ্ণকে আপনাদের গুরুর পদে বরণ করে। কিন্তু দিল্লী পরিত্যাগের পূর্ব্বে ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বসন্তরোগে হরেকৃষ্ণের মৃত্যু হয়; কাজেই রামরায় মনে করিলেন হরেকৃষ্ণের অবর্ত্তমানে আমিই গুরুর পদে বরণ হইব কিন্তু শিখেরা তাঁহাকে গ্রহণ না করিয়া তাঁহার খুল্ল পিতামহ তেজবাহাদুরকে গুরু করিল।

হরগোবিন্দের ন্যায় তেজবাহাদুরও কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমশীল ছিলেন। যখন শিখগণ তাঁহাকে গুরুরপদে বরণ করে, তখন টেগবাহাদুর নম্রভাবে কহিয়াছিলেন, তিনি হরগোবিন্দের অস্ত্রধারণ করিবার উপযুক্ত পাত্র নহেন। তাঁহাকে অস্ত্রও বড় ধরিতে হইল না; রামরায়ের চক্রান্তজালে তিনি জড়িত হইয়া কারারুদ্ধ হইলেন। কারাগারে তাঁহার দুইবৎসর অতিবাহিত হয়। পরিশেষে তিনি জয়পুররাজ জয়সিংহের বিশেষ অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করিয়া কিছুকাল আসাম, পাটনা প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করেন। যৎকালে ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা নগরে বাস করেন তৎকালে তাঁহার এক পুত্র সন্তান জন্মে। সেই পুত্র গুরুগোবিন্দ।

তেজবাহাদুর নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া শেষ আবার পঞ্জাবে উপনীত হন। পঞ্জাবে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তেজবাহাদুর দিল্লীশ্বরের বিরাগভাজন হইয়া উঠেন। তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়। তৎকর্ত্তৃক তেজবাহাদুর পরাজিত ও বন্দীভূত হইয়া দিল্লীতে আনীত হইলে অওরঙ্গজেব তাঁহার মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা করেন।

দিল্লীতে গমন সময়ে তেজবাহাদুর স্বীয় তনয় গোবিন্দকে পিতৃদত্ত তরবারি দিয়া গুরুর পদে বরণপূর্ব্বক এই কথা বলিয়া যান যে, মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ যেন শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য না হয়, এবং এক সময়ে যেন এই মৃত্যুর প্রতিশোধ দেওয়া

হয়। ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ঘাতকদিগের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়। ধর্ম্মান্ধ অওরঙ্গজেব নিহত শিখগুরুর দেহ প্রকাশ্য রাস্তায় নিক্ষেপ করেন।

যখন তেজবাহাদুরের মৃত্যু হয়, তখন গোবিন্দ সিংহের বয়স পঞ্চদশ বৎসর মাত্র। পিতার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড স্বজাতির ও স্বদেশের অধঃপতন গোবিন্দ সিংহের মনে এমন গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, যবনবিনাশ ও যবনরাজ্য হইতে স্বদেশের উদ্ধার সাধনই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল। তিনি সকলকে একভূমিতে আনিয়া একটি মহাজাতি করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন কিন্তু বয়সের অল্পতা ও মোগল শাসনকর্ত্তৃগণের সাবধানতা প্রযুক্ত গোবিন্দ পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই। যাহা হউক তিনি জনৈক নীচ জাতীয় লোক দ্বারা পিতার শব আনাইয়া প্রেতকৃত্য সম্পাদন পূর্ব্বক যমুনার তটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করেন। এই স্থানে মৃগয়া, পারস্য ভাষা অধ্যয়ন ও স্বজাতির গৌরব কাহিনী শ্রবণে তাঁহার সময় অতিবাহিত হয়।

মোগল সাম্রাজ্য অওরঙ্গজেবের সময়েই সাতিশয় উৎকর্ষপ্রাপ্ত হয়। অওরঙ্গজেব ছলে বলে ও কৌশলে অনেককে দিল্লীর শাসনাধীন করেন। যে কয়েকটী পরাক্রান্ত রাজ্য পূর্ব্বে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, অওরঙ্গজেবের সমকালে তাহা নানা কারণে উচ্ছৃঙ্খল ও ক্ষমতাশূন্য হইয়া পড়ে। একদিকে প্রতাপ সিংহের অভাবে রাজপুতরাজ্য ক্ষীণতেজ হয়, অপর দিকে শিবজীর বিরহে নব অভ্যুদিত মহারাষ্ট্ররাজ্য মস্তকশূন্য হইয়া পড়ে। অওরঙ্গজেবের সময়ে শিবজীই কেবল স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু অসময়ে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে মোগল রাজত্ব অনেকাংশে নিষ্কণ্টক ও নিরুদ্বেগ হয়। শিবজির অভাবে অওরঙ্গজেবের প্রতাপ সকলেরই ভীতিস্থল হইয়া উঠে। মোগল সাম্রাজ্যের এই প্রতাপের সময়ে গোবিন্দ সিংহ শিখদিগের নূতন রাজত্ব স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হন।

যমুনার পার্ব্বত্য প্রদেশে অপরিজ্ঞাত অবস্থায় গোবিন্দ প্রায় বিংশতিবর্ষ যাপন করেন। ইহার মধ্যে তাঁহার অনেক শিষ্য সংগৃহীত হয়। গোবিন্দ এক্ষণে পঞ্জাবে আসিয়া এই শিষ্যদল লইয়া জীবনের মহৎ ব্রত সাধনে সমুদ্যত হইলেন। শিক্ষাদ্বারা তাঁহার অন্তকরণ প্রশস্ত হইয়াছিল, ভূয়োদর্শন তাঁহার বিচারশক্তি পরিমার্জ্জিত করিয়াছিল, এবং প্রগাঢ় কর্ত্তব্যজ্ঞান তাঁহার স্বভাব সমুন্নত করিয়াছিল, এক্ষণে একতা ও স্বার্থত্যাগ তাঁহার বীজমন্ত্র হইল। তিনি সাধনায় অটল, সহিষ্ণুতায় অবিচলিত, ও মন্ত্র সিদ্ধিতে অনলস হইলেন। তিনি শিষ্যদিগের হৃদয়ে

নূতন তেজ ও নূতন সাহস সঞ্চারিত করিলেন। গোবিন্দ প্রবল পরাক্রান্ত মোগল রাজত্বে বাস করিয়া সেই রাজত্বই বিপর্য্যস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং বদ্ধমূল হিন্দু ধর্ম্মের আশ্রয়ক্ষেত্রে অভ্যুদিত হইয়া সেই ধর্ম্মানুশাসনেরই বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন।

গোবিন্দ সাহসী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও স্বজাতিবৎসল ছিলেন। তিনি পৃথিবীর পাপাচার দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন এবং বিধর্ম্মীর অত্যাচারে অপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। তিনি জানিতেন, মানবজাতি সাধনাবলে মহৎকার্য্য সাধন করিতে পারে, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে মানবী ইচ্ছার একাগ্রতা ও মানবহৃদয়ের তেজস্বিতা সম্পাদনার্থ এক্ষণে প্রগাঢ় সাধনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার স্মৃতি বিগত সময়ের ঋষি ও যোদ্ধৃবর্গের কার্য্যকলাপে পরিপূর্ণ থাকিত, তাঁহার কল্পনা পৃথিবীর শিক্ষাপথ সুপরিষ্কৃত করিবার উপায় উদ্ভাবনায় নিয়োজিত থাকিত এবং তাঁহার অন্তঃকরণ কুসংস্কারের সুদৃঢ় আবরণ ভেদ করিতে সচেষ্ট থাকিত। শিষ্যদিগকে মহাসত্ত্ব করিবার জন্য তাহাদের সম্মুখে ভূতপূর্ব্ব কাহিনী কীর্ত্তন করিতেন, দেবতাগণ কি প্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়া দৈত্যগণের উপর আধিপত্য করিয়াছেন, সিদ্ধগণ কি প্রকারে আপনাদের সম্প্রদায় প্রতিস্থাপিত করিয়াছেন, গোরক্ষনাথ ও রমানন্দ কি প্রকারে আপনাদের অনুশাসন প্রচারিত করিয়াছেন, মহম্মদ কিরূপ কষ্ট বিপত্তি অতিক্রম পূর্ব্বক আপনাকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া লোকের মনের উপর আধিপত্য করিয়াছেন ইহাই তাঁহার বর্ণনীয় বিষয় ছিল। তিনি আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের একজন ভৃত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। তাঁহার মতে হিন্দু ও মুসলমানদিগের অনুমোদিত ক্রিয়াপদ্ধতি অকার্য্যকর, তাহার ধারণায় ঈশ্বরজ্ঞানে পুত্তলী অথবা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের উপাসনা ক্ষুদ্রতার পরিচায়ক। তিনি কহিতেন, ঈশ্বর কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে আবদ্ধ নহেন; হৃদয়ের সরলতা ও মনের সাধুতাতেই তিনি বিরাজ করিতেছেন।

গোবিন্দ এইরূপে আপনার মত প্রচার করিলেন, এইরূপে তাঁহার শিষ্যগণ পৌরাণিক কাহিনী ও উদার উপদেশ শ্রবণ করিয়া মহাপ্রাণ ও মহাসত্ত্ব হইতে লাগিল। গোবিন্দ যত্নপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিতেন, যত্নপূর্ব্বক বৈদিকতত্ত্ব ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপের পর্য্যালোচনা করিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াও তিনি শারীরিক তেজস্বিতালাভের প্রতি উদাসীন হন নাই। কথিত আছে, তিনি নইশ পর্ব্বতে যাইয়া অর্জ্জুনের বীর্য্য, অর্জ্জুনের তেজস্বিতা লাভের নিমিত্ত গভীর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিতেন। ঈদৃশ আত্মসংযম ও ঈদৃশী গভীর চিন্তার শিখ-সমিতিতে গোবিন্দের সম্মান ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

গোবিন্দ এক্ষণে নূতন পদ্ধতিতে শিখসমাজ সংশোধিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শিষ্যদিগকে একত্রিত করিয়া কহিলেন, "সর্ব্বান্তঃকরণে একেশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে। কোনরূপ পার্থিব পদার্থ দ্বারা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমপিতার মাহাত্ম্য বিকৃত করা হইবে না। সকলেই সরল হৃদয়ে ও একান্ত মনে ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিবে, সকলেই একপ্রাণ হইয়া একতাসূত্রে সম্বদ্ধ হইবে। এই সমাজে জাতির নিয়ম থাকিবে না, কুমর্য্যাদার প্রাধান্য লক্ষিত হইবে না। ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ভদ্র ইতর সকলেই সমান ভাবে পরিগৃহীত হইবে, সকলেই এক পংক্তিতে এক হাঁড়িতে ভোজন করিবে; ইহা হিন্দুদিগের ক্রিয়াপদ্ধতি মুসলমানদিগের ধর্ম্মানুশাসন পরিত্যাগ করিবে, তুরুকদিগকে বিনাশ করিতে যত্নপর থাকিবে, এবং সকলকেই সজীব ও সতেজ হইতে শিক্ষা দিবে।" গোবিন্দ ইহা কহিয়া স্বহস্তে একজন ব্রাহ্মণ একজন ক্ষত্রিয় ও তিনজন শূদ্রজাতীয় বিশ্বস্ত শিষ্যের গাত্রে চিনির সরবত প্রক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে "খালসা"* বলিয়া সম্বোধন কহিলেন; এবং যুদ্ধকার্য্য ও বীরত্বের পরিচয় সূচক "সিংহ" উপাধি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। গোবিন্দ স্বয়ংও "সিংহ" উপাধি গ্রহণ করিয়া গোবিন্দসিংহ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

গোবিন্দ সিংহ এইরূপে জাতিগত পার্থক্য দূর করিয়া সকলকেই এক সম-ভূমিতে অনায়ন করিলেন, এবং সকলের হৃদয়েই নূতন জীবনীশক্তি ও নূতন তেজ সঞ্চারিত করিলেন। জাতিভেদ রহিত হওয়াতে উচ্চ বর্ণের শিষ্যগণ প্রথমে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু গোবিন্দ সিংহের তেজস্বিতা ও কর্ত্তব্যকুশলতায় সে অসন্তোষ দীর্ঘস্থায়ী হইল না। শিষ্যগণ গুরুর অনির্ব্বচনীয় তেজোমহিমা দর্শনে আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া যথানির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা একেশ্বরবাদী হইয়া আদিগুরু নানক এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিবর্গের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল, রাজপুতদিগের ন্যায় সিংহ উপাধিতে বিশেষিত হইয়া দীর্ঘকেশ ও দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিতে লাগিল, এবং অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া প্রকৃত যুদ্ধবীরের পদে সমাসীন হইল। তাহাদের পরিচ্ছদ নীলবর্ণ হইল।† "ওয়া! গুরুজি কি খালসা! ওয়া! গুরুজি কি ফতে!" (গুরু কৃতকার্য্য হউন, জয়শ্রী তাঁহাকে শোভিত করুক) তাহাদের সম্ভাষণ বাক্য হইল। গোবিন্দ

---

* আরব্য ভাষা হইতে "খালসা" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার অর্থ পবিত্র, বিমুক্ত। যে ভূমির সহিত অপরের কোন সংশ্রব নাই সচরাচর সে ভূমিকে খাল্‌সা বলা যায়। গুরু গোবিন্দ এই জন্য শিখদিগের সাধারণ সংজ্ঞা "খালসা" দেন।

† গোবিন্দ সিংহের প্রতিষ্ঠিত অকালী নামক শিখ সম্প্রদায় অদ্যাপি নীলবর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকে।

সিংহ গুরুমঠ নামে একটি শাসন সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অমৃতসরে এই সমিতির অধিবেশন হইতে লাগিল। যাহাতে সর্ব্ব প্রকার কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ হয়, যাহাতে শিখশাসন অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে অটল থাকে, সংক্ষেপে যাহাতে একপ্রাণতা সমবেদনা প্রভৃতি শিখদিগের অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় প্রসারিত হয়, তাহাই গুরুমঠের লক্ষ্য হইল।

গোবিন্দ সিংহ এইরূপে ধীরে ধীরে নূতন উপাদান লইয়া নূতন শিখসমাজ সংগঠিত করিলেন, এবং এইরূপে ধীরে ধীরে নবঅভ্যুদিত শিখসমাজে রাজনৈতিক সাধারণতন্ত্র স্থাপিত করিলেন। যে শিখগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিয়া সংযতচিত্ত যোগীর ন্যায় নিরীহভাবে কালাতিপাত করিত, তাহারা এক্ষণে একপ্রাণ হইয়া সাধারণতন্ত্র সমাজে সম্মিলিত হইল। গোবিন্দ সিংহ জীবনের এক সাধনায় সুসিদ্ধ হইলেন; কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর এক উৎকট সাধনা তাঁহার সম্মুখে পতিত রহিল। তিনি মোগলদিগের মধ্যে সশস্ত্র খালসাদিগকে "সিংহ" উপাধিতে বিশেষিত করিয়াছিলেন, ধর্ম্মান্ধ পণ্ডিত ও পীরদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে এক সমাজে নিবেশিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাটের সৈন্যধ্বংস করিতে পারেন নাই। গোবিন্দ আসন্নমৃত্যু পিতার বাক্য, পিতৃসমীপে নিজের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া পিতৃহন্তা অত্যাচারি যবনদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেন।

ভারতবর্ষের সমুদয় স্থলে শাসন বদ্ধমূল ছিল না। অন্তর্ব্বিদ্রোহ প্রভৃতিতে মোগলসাম্রাজ্য প্রায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকিত। মোগলসাম্রাজ্যের সংস্থাপয়িতা বাবর নিরুদ্বেগে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তৎপুত্র হুমায়ুন পাঠানবংশোদ্ভব সের সাহের পরাক্রমে রাজ্যতাড়িত হইয়া দেশান্তরে ষোড়শ বর্ষকাল অতিবাহিত করেন। আকবর প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞতা ও যুদ্ধকুশলতা প্রভাবে প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষকাল ভারতবর্ষে আধিপত্য করেন। তাঁহার বিচক্ষণতায় হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে জাতিবৈর অনেকাংশে তিরোহিত হয়; তথাপি তাঁহাকে স্বীয় তনয় সেলিমের কঠোর ব্যবহারে ও বঙ্গদেশের বিদ্রোহে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। সাজিহান জীবদ্দশাতেই সিংহাসন লইয়া তনয়দিগকে পরস্পর যুদ্ধ করিতে দেখেন, পরিশেষে ইহাদের মধ্যে অধিকতর ক্ষমতাপন্ন অওরঙ্গজেবের ক্রূরাচারে কারাগারে আবদ্ধ হন। অওরঙ্গজেব ধর্ম্মান্ধতা ও কুটিলতায় ভারত ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তাঁহার কঠোর রাজনীতি অনেকেই তৎপ্রতি বিরক্ত ও হতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন। আকবর হিন্দু ও মুসলমানদিগকে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত করিতে যে যত্ন করেন, সে যত্ন অওরঙ্গজেবের রাজ্য হইতে সর্ব্বাংশে দূরীভূত হয়। অওরঙ্গজেব নিজের সন্দিগ্ধতা, ধর্ম্মান্ধতা ও কঠিন ব্যবহারে অনেক শত্রু সংগ্রহ করেন। একদিকে

দুর্গাদাস স্বজাতির অপমানে উত্তেজিত হইয়া সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হন, অপরদিকে শিবজী বিধর্ম্মীর শাসনে উত্ত্যক্ত হইয়া স্বদেশীয়ের মুহ্যমান হৃদয়ে তাড়িত তেজ সঞ্চারিত করেন। এক্ষণে গোবিন্দসিংহ পুনর্ব্বার সেই তেজের উৎপত্তি করিয়া জাঠদিগের উপর নূতন রাজ্য স্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন। তেজস্বী শিখগুরুর এই অভ্যুত্থান অসাময়িক বা হঠকারিতাজনক বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

গোবিন্দ সিংহ এই উৎকট সাধনায় সফল হইবার জন্য আপনার সৈন্যদিগকে এক এক দলে বিভক্ত করিয়া শিক্ষিত সৈন্যশ্রেণীতে পরিণত করিলেন। অপেক্ষাকৃত বিশ্বস্ত ও উন্নত শিষ্যদিগের প্রতি এই সৈন্যদিগের অধিনায়কতা সমর্পিত হইল। এতদ্ব্যতীত গোবিন্দ সিংহ শিক্ষিত পাঠানসৈন্য আনিয়া আপনার দল পরিপুষ্ট করিলেন। শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত সমূহের পাদদেশে তিনটী দুর্গ প্রতিষ্ঠাপিত হইল। নাহনের নিকটবর্ত্তী পবন্ত নামক স্থানে তাঁহার একটী সেনানিবাস ছিল, এই সেনানিবাস ব্যতীত তাঁহার পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত আনন্দপুর মাখোয়ানে আর একটি আশ্রয়স্থান তাঁহার অধীনস্থ হয়। গোবিন্দ সিংহের তৃতীয় আশ্রয়স্থান চম্পকুমার। ইহা শতদ্রুর তটে অবস্থিত। পার্ব্বত্য প্রদেশে সৈন্যস্থাপন পূর্ব্বক মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করা সুবিধাজনক ভাবিয়া গোবিন্দ সিংহ দুই দুর্গ ও আশ্রয়স্থানসমূহ সুব্যবস্থিত করিয়া পার্ব্বত্যপ্রদেশের সর্দ্দারদিগের সহিত সম্মিলিত ও তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করিলেন। এইরূপে ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দ সিংহ বিধর্ম্মী মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা কবেন। তিনি ধর্ম্মপ্রচারক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়া নানাস্থান হইতে শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে যুদ্ধবীর সেনানায়কের পদে সমাসীন হইয়া সেনানিবেশ নিরাপদ ও দুর্গসমূহের শৃঙ্খলাবিধানে যত্নপর হইলেন।

নাহনের সর্দ্দারের সহিত গোবিন্দ সিংহের প্রথম যুদ্ধ হয়। গোবিন্দের সেনাদলে যে সমস্ত পাঠান ছিল, বেতন বাকি পড়াতে তাহারা গোবিন্দ সিংহের সম্পত্তি লুঠ করিবার জন্য শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করে। কিন্তু এই যুদ্ধে গোবিন্দ সিংহের জয়লাভ হয়। শিখগুরুর এই প্রথম কৃতকার্য্যতা দর্শনে অনেকেই আসিয়া গোবিন্দ সিংহের দল পরিপুষ্ট করে; ইহার কিয়ৎকাল পরে মিয়া খাঁ নামক জনৈক মোগল সর্দ্দার নাদোনের রাজা ভীম চাঁদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। নাদোন রাজ্য শ্রীনসরের উত্তর পশ্চিম ও জম্বুর দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত। জম্বুরাজ এই যুদ্ধে মিয়া খাঁর পক্ষ অবলম্বন করাতে ভীম চাঁদ গোবিন্দ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গোবিন্দ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ভীমচাঁদের সাহায্যার্থ সমরস্থলে উপনীত হন।

এ যুদ্ধেও গোবিন্দ সিংহ ও ভীমচাঁদের সম্পূর্ণ জয়লাভ হয়। মোগল সর্দ্দার ও জম্বুরাজ পরাজিত হইয়া শতদ্রু উত্তরণ পূর্ব্বক পশ্চাদ্ধাবিত শত্রুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন।

মিয়া খাঁর সহিত যুদ্ধের পর দিলির খাঁর পুত্র গোবিন্দ সিংহের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন কিন্তু শিখদিগের কৌশলে তাঁহাকেও অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। দিলির খাঁ পুত্রের অকৃতকার্য্যতায় ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদয় সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক হুসেন খাঁকে প্রেরণ করেন। প্রথম যুদ্ধে শিখদিগের কয়েকটী দুর্গ হুসেনের অধিকৃত হয়। কিন্তু পরিশেষে হুসেনখাঁ পরাজিত ও নিহত হন। গোবিন্দ সিংহ এই যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন না, কেবল তাঁহার অনুচরগণই বিশিষ্ট পরাক্রম প্রকাশ করিয়া এই যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল।

গোবিন্দ সিংহ ও তাঁহার শিষ্যগণের এইরূপ পরাক্রম দর্শনে অওরঙ্গজেব চিন্তিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া লাহোর ও সর্হিন্দ প্রদেশের শাসনকর্ত্তাকে ইহার প্রতিবিধান করিতে কঠোর ভাবে আদেশ কবিলেন। সম্রাটের এই কঠোর আজ্ঞায় এবার যুদ্ধের সমৃদ্ধ আয়োজন হইল। ১৭০১ অব্দে দিলির খাঁ ও রস্তম খাঁ গোবিন্দের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। অওরঙ্গজেবের পুত্র মোজাইমও ইহাদের সহিত সম্মিলিত হইলেন। এই সংবাদে শিষ্যগণের অনেকে ভীত হইয়া সন্নিহিত পর্ব্বতে আশ্রয় লইল। গোবিন্দ সিংহ তাহাদিগকে ভীরু বলিয়া অনেক তিরস্কাব করিলেন, কিন্তু তাহারা নিবৃত্ত হইল না। অবশেষে ৪০ জন সাহসী শিখ গুরুর জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইল। গোবিন্দ সিংহ আনন্দপুরে মোগল সৈন্যকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন। তাঁহার মাতা ও স্ত্রী দুইটী শিশু সন্তানের সহিত সর্হিন্দে পলায়ন করিলেন। কিন্তু শিশু সন্তান দুইটী মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হওয়াতে নির্দ্দয়রূপে বিনষ্ট হইল। এদিকে গোবিন্দ সিংহ রাত্রিকালে মোগলসৈন্যগণের দৃষ্টি পরিহার করিয়া চম্পকুমারে উপনীত হইলেন।

শত্রুগণ চম্পকুমারও আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে খোজা মহম্মদ ও লহর খাঁ মোগল সৈন্যের অধিনায়ক হন। যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এই সেনাপতিদ্বয় গোবিন্দ সিংহকে আত্মসমর্পণ করিতে অনুরোধ করিয়া একজন দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু গোবিন্দ সিংহের পুত্র অজিত সিংহ আত্মসমর্পণের প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হইয়া দূতকে তিরস্কার পূর্ব্বক বিদায় দেন। দূত তিরস্কৃত হইয়া শিবিরে প্রত্যাগত হইলে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। অজিত সিংহ বিশিষ্ট পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। গোবিন্দ সিংহ জয়ের কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া অন্ধকার রাত্রিতে চম্পকুমার পরিত্যাগ করেন। প্রস্থান সময়ে দুইজন পাঠান তাঁহাকে দেখিতে পায়; এই পাঠানদ্বয় পূর্ব্বে গোবিন্দ

সিংহের নিকট উপকার পাইয়াছিল বলিয়া এ সময়ে তাঁহার বিশেষ সাহায্য করে। গোবিন্দ সিংহ এইরূপে চম্পকুমার হইতে বিলোলপুরে উপনীত হন। এই স্থানে পীরমহম্মদ নামে একজন মুসলমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। গোবিন্দ সিংহ পীরমহম্মদের সহিত একসময়ে একত্র কোরাণ পাঠ করিয়াছিলেন, পীরমহম্মদ এজন্য সহাধ্যায়ীর প্রতি বিশিষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করেন। গোবিন্দ পীরমহম্মদদের সহিত আহার করিয়া ছদ্মবেশে ভাটিণ্ডায় উপস্থিত হন। এই স্থানে শিষ্যগণ পুনর্ব্বার যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট সমাগত হয়। গোবিন্দ শিষ্যদলসহকারে অনুসরণকারী মোগলদিগকে যুদ্ধে নিরস্ত করিয়া হালসী ও ফিরোজপুরের মধ্যবর্ত্তী দমদমায় উপস্থিত হন। যে স্থানে গোবিন্দ সিংহ মোগলদিগকে তাড়িত করেন, সেই স্থান অদ্যাপি "মুক্তার" নামে প্রসিদ্ধ আছে।

দমদমায় অবস্থানকালে গোবিন্দ সিংহ বিচিত্র নাটক ও একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গোবিন্দ শিখদিগের দশম গুরু। এজন্য তৎপ্রণীত পুস্তক "দশম পাৎসাকা গ্রন্থ" নামে প্রসিদ্ধ হয়। গোবিন্দ সিংহ যে সমস্ত যুদ্ধ করেন, বিচিত্র নাটকে তৎসমুদয় বর্ণনা আছে, এই বর্ণনা সাতিশয় ওজস্বী ও হৃদয়োদ্দীপক। যাহা হউক ; গোবিন্দ সিংহ যখন এইরূপ নির্জ্জনবাসে পুস্তক রচনাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন তখন অওরঙ্গজেব তাঁহাকে নিজের নিকট উপস্থিত হইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু গোবিন্দ এই অনুরোধ প্রথমে রক্ষা করেন নাই। প্রত্যুত ঘৃণাসহকারে কহিয়াছিলেন তিনি সম্রাটের প্রতি কোনরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। এক্ষণেও খালসাগণ সম্রাটের পূর্ব্বকৃত অপরাধের প্রতিশোধ লইবে। ইহার পর তিনি নানকের ধর্ম্মসংস্কার, অর্জ্জুন ও তেজবাহাদুরের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড এবং নিজের অপুত্রকাবস্থার উল্লেখ করিয়া কহেন, "আমি এক্ষণে কোনরূপ পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ নই। স্থির চিত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি। সেই রাজার রাজা অদ্বিতীয় সম্রাট্ ব্যতীত কেহই আমার ভীতিস্থল নহেন।" এই উত্তর পাইয়াও অওরঙ্গজেব তাঁহার সহিত সাক্ষাতে পুনর্ব্বার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। গোবিন্দ সিংহ এবার সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু তাঁহার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ মোগল সম্রাটের পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি অওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র মোজাইম "বাহাদুর সা" নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। বাহাদুর সা যখন তদীয় ভ্রাতা কামবক্সের সহিত দক্ষিণাপথে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন গোবিন্দ সিংহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আহূত হন। বাহাদুর

সা গোবিন্দের প্রতি বিলক্ষণ সম্মান ও সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। গোবিন্দ সিংহ এইরূপে দিল্লীর সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আপনার শিষ্যসম্প্রদায়ের শৃঙ্খলাবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি জনৈক পাঠানের নিকট কতকগুলি ঘোটক ক্রয় করেন। ঘোটকের মূল্যের জন্য পাঠান একদা গোবিন্দ সিংহের প্রতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করে। গোবিন্দ এই অপমান সহিতে না পারিয়া পাঠানকে নিহত করেন। কিন্তু এই ঘটনার বিষয় নিহত পাঠানের পুত্রের মনে গাঢ়রূপে অঙ্কিত থাকে। একদা সুযোগ পাইয়া এই পাঠানতনয় গোবিন্দের শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করে। এই আঘাতেই গোবিন্দ মানবলীলা সম্বরণ করেন। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে গোদাবরীর তীরবর্ত্তী নাদর নামক স্থানে এই শোচনীয় কাণ্ড সংঘটিত হয়। মৃত্যুর সময় গোবিন্দ অষ্টচত্বারিংশ বর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন।

গোবিন্দ সিংহ শিখসমাজের জীবনদাতা। তাঁহার সময় হইতেই শিখগণ তেজস্বী বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হয়। গুরু নানক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু গোবিন্দ সিংহ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের এক প্রণেতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার নিদান। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ, তাঁহার সাধনা গভীর, তাঁহার বীরত্ব অসাধারণ এবং তাঁহার মানসিক স্থিরতা অতুল্য। তিনি সমুদয় জাতিকে একতাসূত্রে আবদ্ধ ও এক ধর্ম্মাক্রান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া নিজের গভীর উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি জাতীয় জীবনের গৌরব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সকলে এক উদ্দেশ্যে একসূত্রে আবদ্ধ না হইলে যে নির্জ্জীব ভারতের উদ্ধার নাই, ইহা বিলক্ষণরূপে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। এইজন্যই তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে একভূমিতে আনয়ন করেন, এই জন্যই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রকে একসূত্রে নিবদ্ধ করেন, এইজন্যই তিনি গর্ব্বসহকারে সম্রাট্ অওরঙ্গজেবকে লিখেন :—"তুমি হিন্দুকে মুসলমান করিতেছ, কিন্তু আমি মুসলমানকে হিন্দু করিব। তুমি আপনাকে নিরাপদ ভাবিতেছ কিন্তু সাবধান! আমার শিক্ষাবলে চটক শ্যেনকে ভূতলে পাতিত করিবে।" তেজস্বী শিখগুরুর এই তেজস্বী বাক্য নিষ্ফল হয় নাই, তাঁহার মন্ত্রবলে চটকগণ যথার্থ শ্যেনকে যথোচিত শিক্ষা দিয়াছে।

গোবিন্দ সিংহ আরও কিছুদিন জীবিত থাকিলে অনেক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিতেন। মহম্মদ নিরাপদে মদিনায় পলায়ন করিতে না পারিলে সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইত, গোবিন্দ সিংহ আপনার

মহামন্ত্র সাধনে প্রবৃত্ত না হইলে শিখদিগের নাম ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইত। যাহা হউক, গোবিন্দ সিংহ এই অল্প বয়সে অল্প সময়ের মধ্যে শিখসমাজে যে জীবনীশক্তি, যে তেজ, ওজস্বিতা প্রসারিত করেন তাহারই বলে নির্জ্জীব, নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় ভারতে শিখগণ আজ পর্য্যন্ত সজীব রহিয়াছে, তাহারই বলে রামনগর ও চিলিয়ান ওয়ালার নাম আজ পর্য্যন্ত ইতিহাসপত্রে অক্ষরে অক্ষরে লিখিত আছে।

গঙ্গাধর শর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

পরামর্শ

শিবসহায় সিংহ উচ্চ আদালতে অর্পিত হইয়াছেন, এই কথা দেশবিদেশে রাষ্ট্র হইল। সকলেই দুঃখিত, কারণ শিবসহায়ের সহৃদয়তা ও সরলতায় সকলে মুগ্ধ ছিলেন। কেবল গজাননের ও রঘুবীরের আনন্দের সীমা নাই; একে শত্রুদমন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে আর একটি গুহ্য অভিসন্ধি সাধনের বিলক্ষণ সুযোগ উপস্থিত। শিবসহায় নগরে গিয়াছেন, তাঁহার গৃহে কয়েকটি অবলা মহিলা মাত্র আছেন, কিন্তু তাঁহার গৃহ নানাবিধ দ্রব্যের ভাণ্ডার। গজানন ভাবিতেছেন ডাকাতি করিলে কি হয়? রঘুবীর মনে করিতেছেন একবার হুকুম পাইবার অপেক্ষা। আজ শুক্লাষ্টমী, জ্যোৎস্না প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত দীপ্তিমান্ থাকিবে, তার পর অন্ধকার, অন্ধকারই ত ডাকাতের সহায়; অন্ধকারে কার্য্য অনায়াসে সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

গোলাবাটীতে একটি মঞ্চে আজ গজানন সন্ধ্যার পর বসিয়াছেন। বাহিরে কেহ আসিলে "দেওয়ানজী বাটীতে নাই" শুনিয়া চলিয়া যাইতেছে। সব নিস্তব্ধ, প্রদীপ জ্বলিতেছে না কেবল গোয়াল ঘরের মধ্যে "গুজ্ গুজ্" বাক্য ও "হুঁকার ভুড়ভুড়ি" শব্দ হইতেছে। গজানন কহিলেন, রঘুবীর, আমার কতকগুলি টাকা বৃথা অপচয় হইল, এই স্ত্রীলোকের অনুরোধে—একটি ছেলেখেলা বলিলেই হইল—কি না শুভচণ্ডী পূজায় শত টাকা ব্যয় হইয়া গেল!

রঘু। এক যাত্রাওয়ালাই ত শখানেক টাকা লয়ে গেল মহাশয়।

গ। তুমি সব খবর রাখ, ভৃত্যের দরদ না থাকিলে প্রভুর কখন কি ভাল হয়? সে যা হবার হয়ে গেল, আবার বাবাজিকে—কি করি, কর্ত্তামহাশয়ের দুকথা ঠেলিতে পারি না—রদেশে পাঠাইতে হইবে।

রঘু। প্রায় পনর, বিশ ত্রিশ ক্রোশ। সেও ত আর এক শয়ের ধাক্কা।

গ। এ সকল আঞ্জাম কিসে হয়, ঘরের টাকা ভেঙ্গে বাহিরের কাজ করা কর্ত্তব্য নয়। বাজে আদায়ের উপর দিয়ে গেলেই ভাল হয়।

রঘু। আপনি একবার মহলে শুভাগমন করুন "এবার ধান আবাদ বেশ, প্রজারা সা অন্ন, একটি চাঁদার যোগাড় করুন" এই বলিয়া রঘুবীর একবার চতুষ্পার্শ্ব দেখিল, আবার উঠিয়া প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্বে মায় গৃহের ফটক পর্য্যন্ত দৌড়িয়া দেখিয়া গেল ও আবার আরম্ভ করিল "কেহ কোথাও নাই।"

গ। ওদিকে কেহ কোথাও নাই।

র। জাল ফেলা যাক্।

গ। পাছে মাছি লাগে।

র। এ কি "নড়িস চড়িস পড়িস্ না, তেমন শিকারী কি আমি?

গজানন কহিলেন, সেরূপ শিকারীকে কি আমি শিকার করিতে বলি। যদি এদেশে তোমার মত পালওয়ান, তোমার মত খেলী, তোমার মত বীর আর একটি থাকিত তাহাকেও এ বৈঠকে আনাইতাম। কিন্তু এদেশে আর দ্বিতীয় নাই, ক্রমে আমরাই দেখিতেছি সকল লোপ হইতেছে। তোমার পিতামহ দল বল সহ এই গ্রাম হইতে মারহাট্টা অশ্বারোহীদিগকে তাড়িত করে, কত প্রজার প্রাণ, কত লোকের মান সেই পঞ্চম সর্দ্দার হইতে রক্ষা পায়। তার গর্জ্জনে ভূকম্প হত, এখানে হাঁক দিলে সেই দূরে নদীর জল কাঁপিয়া উঠিত, নারিকেল পত্র শিহরিয়া উঠিত, সে বীবদর্প আর কোথায়! যা কিছু আছে তা রঘুবীরেই আছে ওই গেলেই সব গেল, গেলরে রঘু গেল।

রঘু। আর যে আইন কানন, আর থাকে!

খুঁটির পাশে একটি বালস্বর কহিয়া উঠিল "কেন টাকবে না জেটা আমি বীর হব।"

গজানন চমৎকৃত হইয়া কহিয়া উঠিলেন "এ কে! বাবা নীলমণি, তুমি এখানে কেমন কোরে এলে?"

নী। তোমার দপ্তরের কাগজে কালী ঢেলে দিয়ে লুকিয়ে আছি। মশায় বেটা হাটে করে ডোরে এসেছিল ও ঐ গরুর জিন পালানের তিতর লুকিয়েছিলাম।

গ। ক্ষেপা ছেলে, কাগজ কলম দপ্তর কার? গুরুমহাশয় জানে না? সব তোমার, কালি পড়েছে বৈ ত নয়।

রঘু কহিল, কালি পড়া ভাল লক্ষণ। গজানন কহিলেন বাবু, আমাদের কথা ত শুনিস নাই, শুনে থাক ত কাহাকেও বল না।

নী। আমি ছেলে মানুষ। কি বুঝি।

গ। বুঝ না বুঝ কাহাকেও বল না। এখন হরি সেকরাকে দোকান জাঁতা লয়ে এখানে আনাতে হবে যে, সঙ্গে সঙ্গে মাল পার করা চাই, গলান চাই।

রঘু কহিল, সে তুই ফুকে সব ফুকে দিবে—আমি এখন সাজ সরঞ্জম করি।

গজানন কহিলেন, রঘু, আজ শিবসহায়ের গোমস্তা এসেছিল, মোকর্দ্দমার খরচের জন্য দেড়টি হাজার টাকা রাঙ্গা ঠাকুরুনকে বলে কয়ে কর্জ্জ দেওয়াইয়াছি। ঠাকুরাণী নোট দিতে ছিলেন, আমি রোক্ টাকাটী এই সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্নে দেওয়াইয়াছি। সে শিবসহায়ের বাহিরের সিন্দুকেই থাকিবে, দেখিস্ মাল যেন হস্তগত হয়! আমার পাল্‌কিবাহক প্রস্তুত, আমি এই রাত্রেই মহলে বেরোব, সকল তোমার জিম্বা।

রঘুবীর প্রণাম করিয়া কালী মায়িকে স্মরণ করিয়া গোলাবাটী হইতে বাহির হইলেন।

নীলমণি কহিল, "বাবা কিসের কথা হতেছিল?"

গজানন কহিলেন তুমি সহরে যাবে, নূতন অলঙ্কার হবে তাই হরি সোনার আসবে—

নী। আর যে সব কথা কহিতেছিলে?

গ। সে সব শুনে তোমার কি আবশ্যক, তুমি ছেলে মানুষ।

নী। আমি এই বড় হইছি, তুমি যে বলে ছিলে টোড্‌ড বটরের। কথা কহিতে কহিতে হরি সোনার উপস্থিত। তলব হওয়াতেই সে অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছে, সোনা রূপা গলাইবার সমস্ত সরঞ্জাম লইয়া প্রস্তুত হইয়া এক ঘরে গোপনে বসিয়া রহিল। এ দিকে গজানন তেল মশালের হুকুম দিলেন, লোকে জানিল তিনি রাত্রেই মহলে গমন করিবেন কিন্তু গজাননের মনের কথা এক মনই জানে, আর রঘুবীর জানে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

চাঁদ ডুবিল

শুক্লাষ্টমীর চাঁদ! নিজের আলোকে জগৎ শুদ্ধ আলোকময় করিয়াছেন। দূরে উচ্চ নারিকেল খর্জ্জুরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রশির মন্দ বায়ুচালনে কম্পিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খদ্যোত পত্রপুঞ্জে হীরকখণ্ডের ন্যায় মহীর কুন্তলে জ্বলিতেছে, শিশিরবিন্দুসমূহ

বিচ্ছিন্ন মুক্তাহারের স্বরূপ বসুমতীর উরসে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আরও নিকটে আশুতোষ বাবুর প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মী নারায়ণের উচ্চ শুভ্র মন্দিরচূড়ে সুবর্ণ চক্র চক চক করিতেছে ও একটি যন্ত্র কৌশলে সামান্য বায়ুর তেজে থর থরিত হইয়া যেন রত্নকণা নিঃক্ষেপ করিতেছে। মন্দির সম্মুখে থরে থরে সোপানসেতুর চরণে সুন্দর সরসী আরসী স্বরূপ চন্দ্রমণ্ডলের ছবি বক্ষে ধরিয়া ঢল ঢল করিতেছে, জল কিনারায় প্রস্ফুটিত কুমুদিনীনিচয় সুধাকরের স্বর্গীয় অমল কিরণ ভোগ করিতেছে। সুমধুর চন্দ্রকিরণ সুন্দর-হরিত-দূর্ব্বাদলময়-নিম্নগসরসীকূল-কোমল-শয্যাশায়ী।

এ দিকে আশুতোষ বাবুর সুবৃহৎ অট্টালিকার পশ্চিমভাগ সেই আলোকে ধপ্ ধপ্ করিতেছে এবং সেই পশ্চিম ধারে উচ্চ কক্ষে একটি বারেন্দায় সুকোমল শয্যায় অমরেন্দ্র বাবু শয়ন করিয়া প্রকৃতির এই ছবিখানি মধ্যে মধ্যে দেখিতেছেন। প্রায় সব নিস্তব্ধ, প্রহরী একা শশী জাগিতেছেন, আবার এক একবার ফিণ ফিণে শুভ্র মেঘের চাদরে কলানিধির মুখ ঢাকিতেছে, মেঘ উড়িয়া গেলে হাসিতেছেন, জগৎকে হাসাইতেছেন। অমরেন্দ্র বাবুর হৃদয়াকাশও এইরূপ মধ্যে মধ্যে চিন্তা-মেঘে আবৃত হইতেছে আবার তৎক্ষণাৎ আশার আলোকে হাসিতেছে। "তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আশ্রমে যে সুকুমারী আমার কাতরতায় এত কাতরা হইয়াছিলেন তিনি কে? এ কথা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেও বা কেন লজ্জা হয়? তাঁহাকে কি এ জন্মে আর দেখিব না"? এইরূপ ভাবিতেছেন, আবার চিন্তা করিতেছেন যে, "আমার আহত স্থান ত প্রায় ব্যথা শূন্য হইয়াছে, আর দুই এক দিন পরেই ঘোড়ায় চড়িব, আবার সেই আশ্রমের দিকে গমন করায় দোষ কি?" এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় বারেন্দার পার্শ্বে একটি দ্বার নড়িয়া উঠিল ও পরক্ষণেই দেখিলেন তাঁহার পিতৃব্যপত্নী সমদুঃখশালিনী কোমলমুখী রাঙ্গা ঠাকুরাণী একটি তালবৃন্ত হস্তে সমাগতা।

রাঙ্গা। কি বাবা, ব্যথায় নিদ্রা আসিতেছে না, রাত্রিও প্রহর অতীতপ্রায়, আমি বস্ব? এই বলিয়াই উপবেশন করিলেন। তালবৃন্ত স্বয়ং হেলাইতে আরম্ভ করিলেন ও কহিলেন, "বাবা তোমার শিকারের গল্প কর, কেমন করে বাঘ মারিলে?"

অমরেন্দ্র অতিযত্নে সে সমস্ত কথা বর্ণন করিয়া আশ্রমে বিশ্রামের বার্ত্তা কহিতে কহিতে বলিলেন "সে মেয়েটী কে? কত যত্নে আহত স্থান ধুইয়া দিল, তার ত ঘৃণা মূলেই দেখিলাম না।"

রাঙ্গা ঠাকুরাণী কহিলেন, "সেটি কে তুমি জান না, বাবা, তাকে বৌ করিলে কেমন হয়।"

এখন ঝিলমিলির পার্শ্বে পশ্চিম আকাশের চাঁদ হেলিয়া পড়িয়াছে, সেই আলোকে রাঙ্গা ঠাকুরাণী দেখিলেন যে অমরেন্দ্রনাথের মুখভঙ্গী তাঁহার কথা মাত্রেই প্রফুল্ল হইল, ও অমরেন্দ্র কহিলেন, "হবার হয় ত তাতে ক্ষতি কি।" কথা উচ্চারিত হইবামাত্র আবার অমরেন্দ্র লজ্জায় গলিত হইলেন। নাশাগ্রে ভ্রূযুগলোপরে শ্বেত সলিলবিন্দু চন্দ্রকিরণে পদ্মকেশরে শিশিরবিন্দু সম উজ্জ্বলরূপে দেখা দিল আবার কিঞ্চিত স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন "খুড়িমা সে কে? তুমি ত ঐ আশ্রমের নিকটবর্ত্তী শান্তিপুর গ্রামের ঝিয়ারি!"

রাঙ্গাঠাকুরাণী প্রফুল্লবদনে কহিলেন "তুমি জান না আমার পিতৃগৃহের নিকটবর্ত্তী সেই মহাদেব প্রসাদ—নাম করিতে নাই—"

অ। কে, শিবসহায়?

রাঙ্গা। হাঁ। যাহাকে "পশ্চিমে বাবু" কহে, ঐ বালিকা সেই বাবুরই কন্যা, বাল্যকাল অবধি উহাকে কোলে কাঁকে লইয়া মানুষ কবিয়াছি, সে আমার নিতান্ত স্নেহের পাত্রী, উহার নামটী কাদম্বিনী। উহাব যতখানি রূপ দেখেছ বাবা, উহার গুণ তার চতুর্গুণ; বাবুর এক মেয়ে, ঐ সর্ব্বস্ব, প্রাণতুল্য প্রিয়।

অমরেন্দ্র কহিলেন "উহার সোদর আর কেহ নাই?"

রাঙ্গা ঠাকুরাণী আবার আরম্ভ করিলেন, "কালীপূজা করে ঐ একটী কন্যা হয়েছিল কিন্তু যেমন রূপগুণসম্পন্ন তেমনি হতভাগী, তোমাদেরই সঙ্গে ত ৪।৫ বৎসর জায়গিরের মোর্দ্দমায় ঐ বাবুরা খরচান্ত হন, তার পর সে ঝঞ্ঝাট না শেষ হইতেই মেয়েটির মাতৃ বিয়োগ হইল—ওদের আবার সেই পশ্চিম থেকে বর এনে বিবাহ দেওয়া প্রথা আছে, এই সব নানা কারণে মেয়েটি এত বড় হয়ে পড়েছে, তার উপর আবার এখনকার বিপদ শুন নাই?"

অমরেন্দ্র কহিয়া উঠিলেন, "তবে ঐ সেই কন্যা যার মিথ্যা মরণ সম্বাদ দিয়াছিল?"

"বাবা সেই ঐ—ঐ বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য ওদের অধিষ্ঠাতা কি না—তাই গুরু ওকে লুকিয়ে রেখেছে, তা তুমি দেখেছ? আজ রাত্রে কিন্তু তাকে ঘরে লয়ে গেছে—ওদের বাটীতে আজ সত্যনারায়ণের পূজা—পূজা হয়ে গেলে মোকর্দ্দমা চালাইতে কাল লোক যাবে—এই ভোরেই যাবে।"

অমরেন্দ্র ব্যগ্রচিত্তে কহিলেন "আপনি এসকল কথা কেমন করে জানিলেন?"

রাঙ্গাঠাকুরাণী কহিলেন "তোমায় সব কথা ভেঙ্গে বলবো, আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে ওদের লোক এসেছিল, দেওয়ানজী থেকে ওদের দুই হাজার টাকা আমি কর্জ্জ দিলাম। কি করি দায়গ্রস্ত, পরের বিপদ শুনিলে কি স্থির থাকা যায়!

আবার আমার বুড়ো বাপের সঙ্গে ঐ বাবুর বড় সদ্ভাব ছিল ; তাঁহাকে সাহায্য করে কি মন্দ কাজ করেছি ?"

অমরেন্দ্র কহিলেন "পরোপকারই আপনার চিরব্রত, আপনার মতই আপনার কাজ, আমি কি সুখী হইলাম বলিতে পারি না—"কিঞ্চিৎ স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, "তবে কাদম্বিনীর কোথায় বিবাহ হবে ?" মনে মনে ভাবিলেন, আমরাও ত ক্ষত্রিয়। ভাবিতে ভাবিতে চক্ষু মুদিলেন, রাঙ্গা ঠাকুরাণী মনে করিলেন রাত্রি বৃদ্ধি হইতেছে। এইজন্য তিনি ত্বরায় আপন মহলে চলিলেন। এ দিকে চন্দ্রঠাকুর অস্তশয্যাশায়ী। কাল মেঘ ধীরে ধীরে তাহার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিতেছে, দিঙ্মণ্ডল আঁধার হইতেছে, অমরেন্দ্রের নয়ন সেই দূরে পশ্চিম গগনে নিপতিত। এই দেখিতে দেখিতে চন্দ্রমণ্ডলের পরিধির ক্ষীণরেখা নয়নান্তরিত হইল, যেন বিশাল জাহ্নবীবক্ষে একটি দ্বীপ টলমল করিয়া ডুবিয়া গেল। এই সময়েই একটি "বম্ কালী" শব্দ দূর হইতে অমরেন্দ্রের কর্ণগোচর হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটি বোমের শব্দ হইল ও কপাটার্গল ভাঙ্গিবার জন্য ডক ডক কর্ণভেদী শব্দ ঘন ঘন দূর হইতে আসিতে লাগিল। অমরেন্দ্র বাবু ভাবিতেছেন এ কি বিজাতীয় রব! বিকট হুঙ্কার! নরক ঘোষিল, ভূত নাচিল, দেশে আবার কি মারহাট্টা আসিল। বহির্দ্দেশ হইতে একটি সান্ত্রী কহিয়া উঠিল "মানুষেব বিপদ যখন হয় এমনই হয়! কালিন্দী সায়েরের পাহাড়ে চড়িয়া দেখিলাম আলো দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, উত্তরে ডাকাতি হইতেছে ওদিকে আর লক্ষ্মীমন্ত লোক কে আছে, তর্কালঙ্কারের আলো চাল, কাঁচকলা চুরি করিতে কি আর ডাকাত আসিবে ? না! এ পশ্চিমে বাবুদের বাড়ীতে ডাকাতি। ব্যাটারা খালি ঘর পেয়েছে কি না!"

কথা শুনিবা মাত্র অমরেন্দ্র কহিলেন আমার আরব ঘোড়া সাজাইতে বল। তাঁহার মনে আশঙ্কা হইল পাছে তাঁহার কাদম্বিনীর কোন বিপদ ঘটে, এমন চিন্তা কালে প্রণয়িনীর বিপদাশঙ্কা উপস্থিত হইলে সাহসী স্বজন কি স্থির থাকিতে পারে সে উন্মত্ততায় আর কোন জ্ঞান থাকে ? শয্যা হইতে ত্বরিত উত্থিত, দণ্ডায়মান। সজ্জাগৃহে যাইয়া নিমেষমধ্যে অমরেন্দ্রনাথ রণবেশ লইয়া বহির্দ্দেশে আসিলেন। পদের ব্যথা কি আর থাকে, কেহ কিঞ্চিন্মাত্র কাতরতা দেখিল না, স্বয়ং অশ্বশালার সান্নিধ্যে যাইয়া আপন প্রিয় বিশ্বাসী বাহনোপরি আরূঢ় হইয়া ডাকাতি দেখিব বলিয়া শান্তিপুরের দিকে ধাবিত হইলেন।

প্রাকৃত প্রকরণ

সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত ভাষা এবং সংস্কৃত বর্ণমালা হইতে প্রাকৃত বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রসিদ্ধ অভিধানকার হেমচন্দ্র বলিয়াছেন "প্রকৃতি শব্দের অর্থ সংস্কৃত, তাহা হইতে উৎপন্ন ভাষার নাম প্রাকৃত।"

সংস্কৃত অক্ষর সকলের উচ্চারণ অতিশয় কঠিন, স্ত্রী, বালক এবং মূর্খলোক দ্বারা ইহার কঠিন উচ্চারণ সকল কোমলরূপে পরিণত হইয়া প্রাকৃত ভাষার এবং তদীয় বর্ণমালার উৎপত্তি করিয়াছে।

দেশভেদে প্রাকৃত ভাষাব স্বরূপ ও সংজ্ঞা বিভিন্নরূপ হইয়াছে। যথা, শৌরসেনী, মাগধী, কর্ণাটী, মহারাষ্ট্রীয় ইত্যাদি। যাহা হউক কঠিন সংস্কৃত বর্ণকে কোমল করিয়া উচ্চারণ করাতে প্রাকৃতিক বর্ণমালার অক্ষরসংখ্যার অনেক ন্যূনতা হইয়াছে, যথা—ইহাতে ঋ, ঌ, ঐ, ঔ এই চারিটী স্বরের ব্যবহার একবারে দৃষ্ট হয় না। ব্যঞ্জনের মধ্যে ঙ, ঞ; ন, য শ, ষ, ইহাদের এবং এতৎসংযুক্ত বর্ণের ব্যবহারও প্রাকৃত ভাষায় হইতে পারে না। ইহাতে ন স্থলে ণ, য স্থলে জ, শ, ষ স্থানে স ব্যবহৃত হয়।*

প্রাকৃতিক বর্ণমালায় ভিন্নরূপ বর্ণদ্বয়ের সংযোগ দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ ইহাতে স্ক, স্ব, ষ্ট্র জ্ঞ ড্‌ড প্রভৃতি সংযুক্ত বর্ণ দেখা যায় না। ইহাতে কেবল একরূপ বর্ণের সংযোগই দৃষ্ট হয়। যথা—ক্ক, চ্চ, স্ম, প্প, স্স, ব্ব ইত্যাদি। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে প্রাকৃত ভাষায় যতগুলি সংযুক্ত বর্ণ আছে সমুদয়ই দ্বিবর্ণনিষ্পন্ন। ইহাতে তিন বা ততোধিক বর্ণের সংযোগ দৃষ্ট হয় না।

---

*"নোণঃ সর্ব্বত্র" "আদের্য্যোজঃ" "শষোঃ সঃ" ইত্যাদি প্রাকৃতপ্রকাশ দেখ।

যদ্যপি প্রাকৃত প্রকাশকার বররুচি বলিয়াছেন প্রাকৃতে "ঋ ৯ বর্ণে ৌঃ ন স্তঃ" কেবল ঋ৯ বর্ণ নাই তথাপি "ঐৎ এৎ" "ঔৎ ওৎ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা প্রাকৃতে ঐ ও ঔ কারের ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে।

প্রাকৃত ভাষায় অনুস্বার ভিন্ন অপর কোন চিহ্নেরই ব্যবহার নাই। স্থলবিশেষে ইহাতে বিসর্গের স্থানে "ও" লেখা হয় মাত্র।

পূর্ব্বোক্ত বাক্য দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রাকৃতের বর্ণসংখ্যা সংস্কৃত অপেক্ষা অনেক ন্যূন; ইহাতে ক, খ, গ, চ, ছ, জ, ঝ, প্রভৃতি যে কয়টী বর্ণও আছে, অনেকস্থলে তাহাদের আবার সকলটির ব্যবহার হয় না। কারণ ইহাতে 'মুকুল' শব্দ স্থলে 'মুউল' 'মুখ' স্থলে 'মুহ' 'আগার' স্থানে আআর, সূচী স্থানে সূঈ এইরূপ লেখা হয়। প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণে এইরূপ লিখিবার নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে।*

এই প্রাকৃত হইতেই বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি দেশী ভাষা সকল উৎপন্ন হইয়াছে। যদ্যপি এই সকল ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা দেশ কাল পাত্রভেদে ভিন্নরূপে পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে, কিন্তু ইহাদের বাল্যাবস্থা দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে ইহারা এক প্রাকৃতরূপ মূল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। কারণ তৎতৎকালের হিন্দী এবং বঙ্গভাষার আকারগত অনেক সাদৃশ্য ছিল এবং তাহাতে প্রাকৃতের চিহ্ন অনেক পরিমাণে লক্ষিত হইত। হিন্দী প্রভৃতি ভাষা অদ্যাপি অধিক পরিমাণে সেই বাল্যকালের প্রাকৃতভাব ধারণ করিতেছে। এই সকল ভাষায় অদ্যাপি ন্ত, ন্দ, ম্প, প্রভৃতি বর্গের পঞ্চমবর্ণসংযুক্ত বর্ণস্থলে প্রাকৃতের নিয়ম অনুসরণ করা হয়। প্রাকৃতে এইরূপ স্থলে ং পূর্ব্বে দিয়া লেখা হয়, যথা—দন্ত স্থলে দংত ইত্যাদি কিন্তু আজকালকার বঙ্গভাষা "বাঁশ অপেক্ষা কঞ্চী শক্ত" হইয়াছে। ইহাতে অনেকস্থলে প্রাকৃতের অনুযায়ী উচ্চারণ অবস্থান করিলেও লেখনপদ্ধতি প্রাকৃতকে তুচ্ছ করিয়া সংস্কৃতানুরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে। আমরাও যদিও উচ্চারণ করিবার সময় কাজ, দ্দার, বিস্সাস কৃশ্ন বা কৃস্ন ইত্যাদি রূপ উচ্চারণ করি কিন্তু লিখিবার সময় কায, দ্বার, বিশ্বাস, কৃষ্ণ এইরূপ লিখি, এরূপ না লিখিলে সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তাও মূর্খ হন। সুতরাং এক্ষণে বাঙ্গালা বর্ণমালা প্রায় সংস্কৃতের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বাঙ্গালাভাষার উন্নতি প্রার্থনা করি, কিন্তু বাঙ্গালা বর্ণমালার বিস্তার আমাদের অল্পমাত্রও অভীপ্সিত নয়। কারণ বর্ণমালার বিস্তারের সহিত মুদ্রণ (ছাপা) বিষয়ে প্রয়াস এবং ব্যয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মুদ্রণব্যয় অনুসারে পুস্তকের মূল্য বর্দ্ধিত হয়। পুস্তকের মূল্যাধিক্যই সাধারণের জ্ঞানলাভের প্রতি একটি মহৎ অন্তরায়। এই নিমিত্ত আমরা বাঙ্গালা বর্ণমালার সেইরূপ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলাম, যাহাতে পুস্তক

* "ক গ চ জ ত দ প যবাং প্রায়োলোপঃ" "খ ঘ ধ ভাং হঃ" ইত্যাদি সূত্র দেখ।

মুদ্রণসম্বন্ধে ব্যয় এবং আয়াসের লাঘব হয়, অথচ ভাষার উচ্চারণাদি সম্বন্ধে কোন ক্ষতি না হয়, এবং বিদেশীয় ও অস্মদ্দেশীয় প্রথম শিক্ষার্থীরা সহজে বর্ণপরিচয় করিতে পারেন।

এক্ষণে অভীপ্সিত সংস্কারের সহিত প্রথমে বাঙ্গালার বর্ত্তমান বর্ণমালার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

এ স্থলে ইহাও বলা যাইতেছে আমরা যে সকল সংস্কার করিব তাহা কেবল বাঙ্গালা ভাষার নিমিত্ত। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবেন তাঁহাদিগের সংস্কৃত অক্ষর লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করা উচিত। কারণ তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প সুতরাং তাঁহাদের জন্য অধিক লোকের ক্ষতি সহ্য করা উচিত হয় না।

* * * *

স্বরবর্ণ—

সংস্কৃতে যে একশত বত্রিশ প্রকার স্বরভেদ দেখান হইয়াছে, তন্মধ্যে সাধারণতঃ কেবল হ্রস্ব এবং দীর্ঘ এই উভয় ভেদে স্বরের আকারভেদ লক্ষিত হয়। অবস্থান অনুসারে উচ্চারণ বৈলক্ষণ্য হওয়ায় অপর ভেদগুলি উৎপন্ন হইয়াছে। পরন্তু সানুনাসিক ভেদের উচ্চারণ বৈলক্ষণ্য আবার অনেক প্রাচীন কাল হইতে উঠিয়া গিয়াছে। নাগোজীভট্ট বলেন "প্রতিজ্ঞানুনাসিক্যাঃ পাণিনীয়াঃ।" পাণিনীয় শিষ্যেরা কেবল পরম্পরা প্রবাদ অনুসারে সানুনাসিক এবং নিরনুনাসিক ভেদজ্ঞানে সমর্থ হন উচ্চারণ দ্বারা নহে। যাহা হৌক ক্রমশঃ কালবশে উচ্চারণ জন্য ভেদের লোপ হওয়ায় দেশীবর্ণমালাসমূহে স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ এই দুইটি ভেদমাত্র ব্যবহৃত হয়।

বাঙ্গালা বর্ণমালায় সচরাচর—

অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, এই চতুর্দ্দশ স্বরের ব্যবহার হয়। এক্ষণে বক্তব্য এই যে সংস্কৃত ভাষায় ৡ কারের ব্যবহার নাই বলিয়া সিদ্ধান্তকৌমুদীকার স্বরভেদ গণনার সময় যখন ৡ কারকে পরিত্যাগ করিয়াছেন তখন আমরা বাঙ্গালার ৠ, ঌ, ৡ, এই তিনের কুত্রাপি ব্যবহার না দেখিয়া এই তিনটীকে আনায়াসে বর্ণমালা হইতে বিদায় দিতে পারি। এই তিনটীকে বর্ণমালা হইতে বিদায় দিলে বাঙ্গালা স্বরবর্ণ চতুর্দ্দশ না হইয়া একাদশ হইল। যথা—

অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ।

ইহাদের মধ্যে 'অ' যখন কোন ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত যুক্ত থাকে তখন উহা সেই ব্যঞ্জনবর্ণের আকারে অলক্ষিত রূপে মিশ্রিত হয়। অপরগুলি ব্যঞ্জন সংযোগে সেরূপ হয় না; তাহারা তখন যথাক্রমে নিম্নলিখিত আকার ধারণ করে যথা—

া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ে, ৈ, ো, ৌ, এই দশটী।

আমাদের বর্ণমালা সংস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য মুদ্রাঙ্কণের সৌলভ্যসাধন। অর্থাৎ ভাষার উচ্চারণের কোন হানি না হয় অথচ মুদ্রাঙ্কণের সৌলভ্য হয় ইহাই আমাদের অভিপ্রেত। এক্ষণে দেখা যাউক পূর্ব্বোক্ত একবিংশতি প্রকার স্বরাকারের মধ্যে কিছু লাঘব করা যায় কি না। আমরা দেখিতেছি 'অ' এর সহিত 'া' যোগ করিলে 'আ' হয় এবং 'ে'র সহিত 'া' র যোগ করিলে 'ো' হয় সুতরাং মুদ্রাকারেরা এই দুইটী বর্ণকে আনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারেন। এবং 'ো' কে তাঁহারা সর্ব্বদাই ঐরূপে লিখিয়া থাকেন তবে 'আ' একটি স্বতন্ত্র বর্ণ রক্ষা করেন বটে। এই দুইটী ভেদ উঠাইয়া দিলে আমাদের স্বরাকার কেবল উনবিংশ প্রকার থাকে। যথা—অ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ও, ঐ, ঔ,—১০ া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ে, ৈ, ৌ,*—৯

আবার দেখ যদি ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ও, ঐ, ঔ, ইহাদিগকে যথাক্রমে অি, অী, অু, অূ, অে অো, অৈ, অৌ, এইরূপ করিয়া লেখা যায়, তাহা হইলে আপাতত দেখিতে কিছু কেমন কেমন ঠেকে মাত্র, আসলে কিছুই হানি হয় না। ওদিকে কম্পোজিটর এবং ডিষ্ট্রিব্যুটরদিগের অনেক সুবিধা হয়; প্রেসের অধিকারীরও ঐ সকল অক্ষর ক্রয় করিতে হয় না এবং উহাদের স্থাপনের নিমিত্ত কেসবক্স অর্থাৎ অক্ষরাধারের কোষ্ঠ বাড়াইতে হয় না। মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলে বরং ইহা জানিতে পারা যায় যে পূর্ব্বে 'ই' প্রভৃতির আকার 'অি' 'অী' ইত্যাদি রূপ ছিল, কালবশে পরিবর্ত্তন লাভ করিয়া 'অি' ই এবং 'অী' ঈ হইয়াছে,কারণ অদ্যাপি আমরা অনেক নাগরাক্ষরে লিখিত পুস্তকাদিতে 'ও' স্থলে 'অো', ঔ স্থলে 'অৌ' এবং ঋ স্থলে 'অৃ' লিখিতে দেখি। হিন্দীভাষায় সচরাচর 'ঔর' এই কথাটী ত 'অৌর' এই রকমে লিখিত হয়।

যাহা হৌক প্রস্তাবিত পদ্ধতি অবলম্বন করিলে আমাদের স্বরাকারের ভেদ কেবল দশটী থাকে। যথা—

অ, া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ে, ৈ, ৌ,—১০

অর্থাৎ প্রেসওয়ালাদিগের এই দশটীর অধিক স্বর রাখিতে হয় না। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে সচারাচর মুদ্রাকারেরা শব্দের আদি, মধ্য, এবং অন্তে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত া,ি, প্রভৃতি 'সমাত্রিক' এবং 'নির্ম্মাত্রিক' এই দুই ভেদ রক্ষা করেন। যথা া, া, ি, ি, ইত্যাদি রূপ। কিন্তু আমরা এরূপ প্রভেদের কোন উপযোগিতা বিবেচনা করি না কারণ দধি' এই কথাটিকে যদি দধি' এই রকমে লেখা যায় তাহা

*যদ্যপি মুদ্রাকারদিগের 'ৌ' এরূপ একটি অক্ষর নাই তাঁহারা এস্থলে 'ে' র সহিত ৗ র যোগ করেন ৗ র অনুরোধে আমরা '' যুক্ত করিয়া লিখিলাম।

হইলে কিছুই হানি লক্ষিত হয় না, তবে অল্পমাত্র শোভার জন্য আমরা এতগুলি বিভিন্নতা রাখি কেন ?

ব্যঞ্জন বর্ণ—

বাঙ্গালা বর্ণ মালায়—

ক, খ, গ, ঘ, ঙ। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। ত, থ, দ, ধ, ন। প, ফ, ব, ভ, ম। য, র, ল, ব, শ, ষ, স হ। এই তেত্রিশটি এবং ৎ, ড়, ঢ়, য়, এই চারটী ত, ড, ঢ, য, এর প্রকার ভেদে সর্ব্বশুদ্ধ সপ্তত্রিংশৎ অর্থাৎ সাঁইত্রিশটি অমিশ্র ব্যঞ্জনবর্ণ লক্ষিত হয়। পূর্ব্বে এই অমিশ্র ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত 'ক্ষ' এই অক্ষরটি লিখিত হইত। কিন্তু এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়া দিয়াছেন যে উহা একটি সংযুক্তবর্ণ। এখনকার বর্ণমালা গ্রন্থে উহা সংযুক্তবর্ণের সহিত লিখিত হয়।

বাঙ্গালা বর্ণমালায় ং, ঃ, ঁ এই তিনটি চিহ্ন অতি প্রাচীন কাল অবধি নিবেশিত হইয়া আসিতেছে। ইহাদের স্বতন্ত্র রূপে ব্যবহার নাই, অপর বর্ণের সহিত সর্ব্বদাই সংযুক্ত থাকে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের অধিকারীরা এই তিনটি চিহ্নকে স্বতন্ত্র রূপে রাখিয়া থাকেন। তবে এক্ষণে অনেক চন্দ্রবিন্দুযুক্ত অক্ষরও প্রস্তুত হইয়াছে।

সংযুক্তবর্ণ—

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হইতে পারে না, অতএব ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণের নিমিত্ত কোন না কোন প্রকার স্বরের সাহায্য আবশ্যক করে। অতএব পূর্ব্বোক্ত একাদশবিধ স্বরের সংযোগে, সাঁইত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণের চারি শত সাতচল্লিশ (৪৪৭) ভেদ হয়। এতদ্ভিন্ন—হলোঽনন্তরাঃ সংযোগাঃ। ১। ১। ৭।

এই সূত্রানুসারে অচ্ রহিত ব্যঞ্জনবর্ণ সংযুক্ত হয়। যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনবর্ণ একত্র হয় এবং তাহাদের মধ্যে এক বা ততোধিক ব্যঞ্জনবর্ণের অচের যোগ না থাকে তাহা হইলে অচ্‌রহিত ব্যঞ্জনবর্ণ সকল অচ্‌যুক্ত পরবর্ত্তী ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত সংযুক্ত হয়। কারণ একটি পারিভাষিক সূত্র আছে যে "অজ্‌ঝীনং পরেণ" অচ্ রহিত ব্যঞ্জনবর্ণ অচ্‌যুক্ত পরবর্ত্তী ব্যঞ্জনের সহিতই যুক্ত হয় পূর্ব্বের সহিত নয়। এই সূত্রানুসারে সংযুক্ত অক্ষর অসংখ্য হইতে পারে বটে কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় ক্ল, গ্ল, প্ল, ম্ল, ল্ল, ব্ল, হ্ল, ল্ক, স্ল,—এই ১০টি ল সংযুক্তবর্ণ গ্ন, হ্ন, ত্ন, ম্ন, ন্ন, হ্ন, শ্ন, এবং ন্ত, ন্থ, ন্দ, ন্ধ,—এই ১১টি ন সংযুক্তবর্ণ ক্ম, গ্ম, ঙ্ম, ট্ম, ণ্ম, ত্ম, দ্ম, ধ্ম, ন্ম, ম্ম, ল্ম, ক্ষ্ম, শ্ম, ষ্ম, স্ম, হ্ম, এবং

স্প, স্ফ, স্ব, স্ত, এই ২৪টি ম সংযুক্তবর্ণ ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ, ঙ্ক্ষ, এই পাঁচটি ঙ সংযুক্তবর্ণ ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ, ঞ্ঝ, ঞ্চ্র, ঞ্জ্র, এই ৬টি ঞ সংযুক্ত বর্ণ, ণ্ঢ, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ড্র, ণ্ব, ণ্ম, ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড এই ৯টি ণ সংযুক্ত বর্ণ।

স্ক, স্খ, স্ত, স্থ, স্প, স্ফ	এই ৬টী স সংযুক্তবর্ণ
ষ্ক, ষ্ট, ষ্ঠ, ষ্প, ষ্ফ	এই ৫টী ষ সংযুক্তবর্ণ
শ্চ, শ্ছ,	এই ২টী শ সংযুক্তবর্ণ
দ্গ, দ্ঘ, দ্দ, দ্ব, দ্ধ,	এই ৫টী দ সংযুক্তবর্ণ
দ্গ, গ্ধ,	এই ২টী গ যুক্তবর্ণ
ক্ষ, ক্ক, ক্ত	এই ৩টী ক যুক্তবর্ণ
চ্চ, চ্ছ	এই ২টী চ যুক্তবর্ণ
জ্জ, জ্ঝ, জ্ঞ	এই ৩টী জ সংযুক্ত
ট্ট	এই ১টী ট সংযুক্ত
ত্ত	ঐ ঐ ত সংযুক্ত
ত্থ	ঐ ঐ থ সংযুক্ত
ড্গ	ঐ ঐ ড সংযুক্ত

এই তিরানব্বইটী সংযুক্তবর্ণের ব্যবহার হয় মাত্র। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে আমরা একস্থলে যে অক্ষরটীর গণনা করিয়াছি অপর স্থলে তাহাদিগের গণনা করি নাই, যেমন ঙ্ম ইহাকে 'ম' সংযুক্তের সময় গণনা করিয়াছি এই জন্য ঙ সংযুক্তের সময় গণনা করি নাই। আমরা 'য' সংযুক্ত অক্ষরের এখানে গণনা করি নাই কারণ প্রকরণে তাহার রূপ দেখান যাইবে। বাঙ্গালাতে 'ত্প', ত্ক,' ইত্যাদি ত কার সংযুক্ত অক্ষর আছে কিন্তু তাহারা সংযুক্তরূপে লেখা হয় না, 'ৎক', 'ৎপ', এইরূপ লেখা হয়। (৫) খণ্ড ত কে যখন আমরা স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করিয়াছি তখন 'ৎক' কে সংযুক্ত বর্ণের মধ্যে গণনা করা উচিত বিবেচনা করিলাম না। উপরে যে সকল সংযুক্ত বর্ণ কথিত হইল তদ্ব্যতীত যদি দুই একটি সংযুক্ত বর্ণ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হয় তবে ইংরেজী কথায় লিখিত অন্য রূপ সংযুক্ত বর্ণেরও ব্যবহার হইতে পারে। যাহা হউক সংযুক্ত অক্ষরের সংখ্যা ১০০ একশতই রাখা গেল। ইহাদিগের উচ্চারণও স্বরের সাহায্য অপেক্ষা করে, এই নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত একাদশ বিধ স্বর সংযোগে সংযুক্তবর্ণ (১০০ × ১১) একাদশ শত (১১০০) প্রকার হয়।

ফলা—

যে সকল বর্ণ স্বাভাবিক আকার পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ আকার ও উচ্চারণের সহিত অপর বর্ণের নীচে বা উপরে সংযুক্ত হয় তাহাদিগের নাম ফলা। প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালা ব্যাকরণে নিম্নলিখিত কয়টি ফলা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ্য, ্র, ্ল, ্ব, ্ন, ্ম, ৃ, ৯, র্, এই নয়টী ইহাদের মধ্যে ৯ কারের ব্যবহার বাঙ্গালায় নাই ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। 'ৃ' কে আমরা স্বরের মধ্যে গণনা করিয়াছি। ল, ন, ম, ইহারা যে সকল বর্ণে সংযুক্ত হয়, তাহাও সংযুক্তবর্ণ গণনার সময় দেখান গিয়াছে। আমাদের মতে এই তিনটীকে 'ফলা' বলা উচিত নয়, যেহেতু অন্য বর্ণ সংযোগের সময় ইহাদের আকার কিছু বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হয় না, এবং 'ল' ও 'ন' ফলার উচ্চারণেরও বৈলক্ষণ্য নাই। তবে 'ম' ফলার উচ্চারণটা আমাদের হয় না বটে ; আমরা 'পদ্ম'কে 'পদ্দ' 'লক্ষ্মী'কে 'লক্ষী' 'লক্ষ্মণ'কে 'লক্ষ্ণ' 'শ্মশান'কে সশান উচ্চারণ করি। যাহা হউক অবশিষ্ট ্য, ্ব, ্র, র্, এই চারিটি ফলাযুক্ত যেকটী অক্ষর বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হয় দেখান যাইতেছে।

্য=ক্য, খ্য, গ্য, ঘ্য, চ্য, ছ্য, জ্য, ট্য, ঠ্য, ঢ্য, ণ্য, ত্য. থ্য, দ্য, ধ্য, ন্য, প্য, ফ্য, ব্য, ভ্য, ম্য, ল্য, শ্য, ষ্য, স্য, হ্য। ঙ্গ্য, ক্ষ্য, ত্ম্য, র্ম্য, র্য্য, র্ষ্য, র্দ্দ্য, র্য, ন্দ্য, ক্ষ্য। এই (৩৬) ষট্‌ত্রিংশৎ এবং যথাযোগ্য স্বরসংযোগে ইহাদের আরও কতকগুলি ভেদ।*

্ব=ক্ব, ঙ্ব, ত্ব, দ্ব, ধ্ব, ন্ব, ষ্ব, শ্ব, স্ব, চ্ছ্ব, জ্জ্ব, ত্ত্ব, দ্ব্ব, ন্ধ্ব, র্শ্ব, ক্ষ্ব এই (১৬) ষোড়শ এবং যথাযোগ্য স্বরসংযোগে ইহাদের আরও কতকগুলি ভেদ।

্র, ক্র, গ্র, ঘ্র, দ্ধ্র, ত্র, দ্র, ধ্র, প্র, ব্র, ভ্র, ম্র, শ্র, স্র, হৃ, ; ষ্ট্র, জ্ব্র, ম্ব্র, ম্প্র, ক্ষ্র, ম্প্র, ম্ভ্র, স্ত্র, স্প্র, ষ্ট্র, চ্ছ্র এই (২৫) পঞ্চবিংশতি এবং যথাযোগ্য স্বরসংযোগে ইহাদের আরও কতকগুলি ভেদ।

র্=র্ক, র্গ, র্ঘ, র্চ, র্ছ, র্জ্জ, র্ত্ত, র্থ, র্দ্দ, র্দ্ধ, র্ণ, র্প, র্ব্ব, র্ত্ত, র্ভ, র্ম্ম, র্ধ্য। এই (১৭) এবং ইহাদের যথাযোগ্য স্বরসংযোগে ভেদ।

এক্ষণে দেখা যাউক এই সকল ভেদের মধ্যে কিরূপ সংস্কার হইতে পারে। ঙ=বঙ্গভাষায় 'ঙ' র পৃথক্‌রূপে ব্যবহার নাই অর্থাৎ ইহাতে এরূপ একটি কথা নাই যাহাতে ঙ স্বতন্ত্র রূপে অবস্থান করে। কেবল ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ, ঙ্ক্ষ, ঙ্ম, এই ছয়টি অক্ষর 'ঙ' যুক্ত ব্যবহৃত হয়। এক্ষণে যদি এই দুইটি অক্ষরের উচ্চারণ ঠিক্ রেখে আমরা অন্যরূপে লিখিতে পারি তবে পঞ্চমবর্ষীয় বঙ্গবালকের বিষম ভীতির

* সমুদয় ফলাযুক্তবর্ণে কিছু সকলগুলি স্বরের যোগ হয় না, কোন স্থলে কোনটির। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষায় স্বরসংযুক্ত ফলা নির্দ্ধার করা কঠিন।

স্থান, বর্গীদিগের মত বৃহৎ উষ্ণীষধারী এই অক্ষরটাকে হাস্যমুখে বর্ণমালা হইতে বিদায় দিতে পারি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন। প্রাকৃত ভাষায় উপরে বর্গের পঞ্চমবর্ণ সংযুক্ত কোন বিজাতীয় বর্ণ নাই। ইহাতে ন্ন এবং সস ভিন্ন উপরে বর্গের পঞ্চমবর্ণ সংযুক্ত অক্ষর স্থলে পূর্ব্বে অনুস্বার দিয়া সেই বর্ণ অসংযুক্ত রূপে লেখা হয়। যেমন 'পর্য্যঙ্ক' স্থলে পর্য্যংক, 'পঞ্চ' পংচ 'কণ্ঠ' স্থলে কংঠ। প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হিন্দী প্রভৃতি অপর ভাষায়ও ঐ নিয়ম অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। কারণ ওরূপ লিখিলে ভাষার কোন ক্ষতি নাই, অথচ উচ্চারণানুরূপ লেখা হয়। হাঁ ওরূপ লিখিলে সংস্কৃত শিক্ষার্থীদিগের কিছু উপকার হয় বটে, কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা অতি অল্প এবং তাঁহাদের জন্য মহর্ষি পাণিনী "অনুস্বারস্য যাষপর সবর্ণঃ" এই সূত্র করিয়াছেন। আর আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সংস্কৃত বর্ণমালা স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। বাঙ্গালাকে সংস্কৃতানুরূপ করিলে অধিক লোকের বৃথা ক্ষতি সহ্য করিতে হয় মাত্র।

আমাদের সিদ্ধান্তানুসারে যদি 'ঙ' প্রভৃতি বর্গের পঞ্চমবর্ণ দ্বারা উপরে সংযুক্তবর্ণ গুলিকে পূর্ব্ববর্ণে অনুস্বার যোগ করিয়া লেখা হয়, তবে ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ, ঙ্ক্ষ, ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ, ঞ্ঝ, ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ, ন্ত, ন্থ, ন্দ, ন্ধ। ম্প, ম্ফ, ম্ব, ম্ভ, এই দ্বাবিংশতি বর্ণ এবং তাহাদের স্বর এবং ফলাযুক্ত ভেদ সকলকে অনায়াসে বিদায় দেওয়া যায়।

কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন 'দন্ত' কে 'দংত' 'লম্ফ' কে 'লংফ' ইত্যাদি রূপ লিখিলে উচ্চারণভেদ হইতে পারে। এ কথা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু 'দংত' এইরূপ লিখিলে যেরূপ উচ্চারণ হয় মনুষ্যের প্রকৃত উচ্চারণ সেইরূপ, 'দন্ত' এরূপ সংস্কৃত উচ্চারণ মাত্র। বৈদিকমন্ত্রে ঐরূপ স্থলে অনুস্বর দিয়া লেখা হয়। আর প্রাকৃত এবং হিন্দী প্রভৃতিতেও পূর্ব্ব বর্ণে অনুস্বর যোগ করিয়া লেখাতে উচ্চারণের কিছু বৈলক্ষণ্য প্রতীত হয় না। এবং অদ্যাপি অনেক বাঙ্গালা পুস্তকে 'অসংখ্য' 'সংপ্রতি' সংবৎ' এইরূপ লেখা হয়, কিন্তু উচ্চারণের ত কোন বৈলক্ষণ্য শুনা যায় না। তবে এ বিষয় যাঁহারা নৈসর্গিক নিয়মের উপর দৃষ্টি না করিয়া সংস্কৃতের অনুসরণে দৃঢ় থাকিবেন, তাঁহারা আমাদিগের পরে অপর সংযুক্ত বর্ণস্থলে যে নিয়ম করিয়াছি এখানে তাহার অনুসরণ করিবেন। অর্থাৎ ন, ম, প্রভৃতির নীচে (্) হসন্ত যুক্ত করিয়া দিবেন। যথা 'দন্ত' ইহাকে 'দন্‌ত' এইরূপ লিখিবেন।

* * * *

ঞ—উপরি লিখিত নিয়ম অবলম্বন করিয়া আমরা 'ঞ' কেও একবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতাম। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ একটি কথা নাই যাহাতে

'ঞ' পৃথক্‌রূপে ব্যবহৃত হয়। উপরে ঞ সংযুক্ত ঞ্চ প্রভৃতি স্থলে পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতের নিয়ম অবলম্বনে ইহা দূরীকৃত হইল বটে; কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় একটী কথা আছে যাহা নীচে 'ঞ' দ্বারা সংযুক্ত। সে কথাটী 'যাজ্ঞা' বাঙ্গালীদিগের একমাত্র ভরসাস্থান। অম্লানমুখে দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিতে এমন আর কোন জাতিই নাই। সুতরাং 'ঞ' টীকে রাখিতে হইতেছে। 'যাজ্ঞা' উঠান অপেক্ষা বাঙ্গালাভাষার লোপ করাও সহজ।*

রঘুনাথ গুরুমহাশয়ের নিকট যেকটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অপর গুলির উত্তর আমরা বুঝি না বুঝি, মৌখিক দিতে পারি; কিন্তু বাঙ্গালায় যে দুটা ব কেন ইহার উত্তর আমরা দিতে পারি না। ইহা দ্বারা আমরা এ কথা বলি না যে দুটা "ব" একই; সংস্কৃতে ইহাদের আকার এবং উচ্চারণ ভিন্ন আছে। যথা ন ন। কিন্তু বাঙ্গালায় এ দুই এর কিছুই নাই অধিকন্তু বাঙ্গালায় ্ব ফলা একটি স্বতন্ত্র অক্ষর রহিয়াছে, যাহা উচ্চারিত হোক না হোক দ্বিতীয় 'ব' র সংযোগ স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব বর্ণমালার মধ্যে কেবল একটি 'ব' রাখিলে আমরা কিছুই হানি দেখিতে পাই না।

সংযুক্ত বর্ণ। বাঙ্গালা সংযুক্তবর্ণগুলি অতি ভয়ঙ্করাকৃতি। বর্ণপরিচয়ের সংযুক্ত বর্ণবিষয়ক পত্রগুলি দেখিলে বোধ হয় যেন "কুস্তির আখড়া" একটার উপর আর একটা চড়াই করে বসেছে। এইরূপ বিলাতি কুলুপের মত নানা প্রকার পেঁচদার সংযুক্ত বর্ণগুলির গুণেই বিদেশীয়েরা বঙ্গভাষা শিখিতে অগ্রসর হন নাই। বিদেশীয় কেন, এ গুলির ভয়ে দেশীয় কত ছেলে যে পীড়িত হইয়া পাঠশালা কামাই করে তাহা বলা যায় না। বাস্তবিক 'হ্ম' 'হ্ব', প্রভৃতি অক্ষরগুলিকে বাল্যকালে মহিষাসুরের ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ হইত। অতএব এ গুলির বিশেষ রূপ সংস্কার করা উচিত।

অচ সংযুক্ত। প্রেসওয়ালারা প্রায় অচ সংযুক্ত বর্ণ স্বতন্ত্ররূপে রক্ষা করেন না। ইঁহারা অক্ষর বিন্যাসের সময় অচের যোগ করিয়া দেন। তবে এক্ষণে দুই একটি অচযুক্ত বর্ণ প্রস্তুত হইতেছে বটে। যাহা হোক অচসংযুক্ত বর্ণের মধ্যে এই কয়টি বর্ণ পৃথক্‌রূপে রক্ষিত হয় এবং ইহাদের আকারও কিছু অস্বাভাবিক। যথা গু, রু, শু, হৃ, স্তু, ণ্ড, প্র, ন্তু, শ্রু, শ্র, স্রু, ক্র। ইহাদের এই অস্বাভাবিক প্রকৃতির নিমিত্ত শিক্ষক বা শিক্ষার্থী কেহই সুখী নহেন। ইহাদিগকে স্বাভাবিক

---

* 'জ্ঞ' এই অক্ষরটি জ এর নীচে ঞর যোগে সম্পন্ন হইয়াছে বটে। কিন্তু এ তত্ত্ব আমরা সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ে। বাঙ্গালায় ইহার আকার ও উচ্চারণে ইহাতে যে ঞর সম্পর্ক আছে তাহা ত বোধ হয় না।

রূপে লিখিলে কোন হানি হয় না বরং শিক্ষার সৌলভ্য হয়। এবং এই আটটি স্বাভাবিক হইলে কম্পোজিটরদিগের উপদ্রব অনেক কমিয়া যায় ; তাঁহারা এখন অনেক স্থলে 'শু' স্থলে 'গু' লিখিয়া বসেন কিন্তু ইহারা স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ শ্‌ু, গ্‌ু, এইরূপ হইলে তাদৃশ ভ্রমের সম্ভাবনা নাই।

ব্যঞ্জনসংযুক্ত। ব্যঞ্জন সংযুক্ত বর্ণ স্থলে আমরা এইরূপ একটি সাধারণ নিয়ম করিতে চাই যে সংযুক্ত বর্ণদ্বয়কে একত্র না লিখিয়া তাহাদের মধ্যে অচহীন বর্ণের নীচে যদি হসন্ত দিয়া লেখা যায় তাহা হইলে কোন হানি হয় না বরং বর্ণপরিচয়ের অনেক সৌকর্য্য উৎপন্ন হয়। শ্ব, দ্ধ ইত্যাদি বর্ণ যে কিসে কিসে সংযুক্ত তাহা সহজে বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু আমাদের মতে যদ্যপি স্থানব্যয় হইবে বটে কিন্তু কোনরূপ ভ্রমের সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ আমাদের মতে 'বুদ্ধি' 'বুদ্‌ধি' একই। আর সংযুক্তবর্ণ যে একত্র করিয়া লিখিতে হইবে তাহার কোন বিধি নাই। পাণিনী বলিয়াছেন অচ দ্বারা অব্যবহিত হল বর্ণকে সংযুক্ত বলা যায়। এক্ষণে দেখ পূর্ব্বোক্ত একশত প্রকার সংযুক্তাক্ষর স্থলে ২২ শটীকে ত ও র সহিত বিদায় দিয়াছি। অবশিষ্ট ৭৮ টীর মধ্যে 'ক্ষ' 'জ্ঞ' এই দুইটি রক্ষা করিয়া অপর গুলি স্থলে যদি একত্রিশ্‌টী অৰ্দ্ধবর্ণ এবং একটি ' ্ ' হসন্ত চিহ্ন এই বত্রিশটী রাখা যায় তাহা হইলে উদ্দেশ্য সাধনের কোন ব্যাঘাত হয় না।

অনুস্বার, বিসর্গ এবং চন্দ্রবিন্দুযুক্ত বর্ণের মধ্যে অনুস্বাব এবং বিসর্গ ত স্বতন্ত্র রূপেই যুক্ত হয় তবে চন্দ্রবিন্দু যুক্তস্থলে পূর্ব্বোক্ত অৰ্দ্ধ অক্ষরে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। ফলাযুক্ত বর্ণ স্থলে এই নিয়ম অবলম্বন করিলে কোন হানি হয় না তবে ' ্র ' ফলাযুক্ত কতকগুলি যে অস্বাভাবিক আকৃতিবিশিষ্ট বর্ণ আছে তাহাদিগকে স্বাভাবিক করিয়া লইতে হয়। ক্র, ত্র, স্ত্র, ন্ত্র, ইহাদিগকে ক্‌্র, ত্‌্র, ংত্র, স্‌ত্র এইরূপে লিখিতে হয় এবং ' ্ব ' ফলা যুক্ত 'হ্ব' এই অক্ষরটিকে 'হ্ব' এইরূপ লেখায় কোন হানিই নাই প্রত্যুত শিক্ষার্থীদিগের বোধসৌকর্য্য সাধিত হয়। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে রফলা যুক্তবর্ণ যে দ্বিত্ব করিয়া লেখা হয় সে কেবল সংস্কৃতের নিয়মানুসারে ; সংস্কৃতেও তাদৃশ দ্বিবিধির নিত্যতা নাই। যাহা হৌক ভাষায় ওরূপ দিত্ব না লিখিয়া যদি একটি বর্ণের উপর রেফ দিয়া লেখা হয় অর্থাৎ 'কৰ্ম্ম' যদি 'কর্ম' এইরূপে লেখা হয় তাহা হইলে কিছুই হানি নাই।

পরিশিষ্ট

আমাদের সংস্কার দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইলে এখনকার বিকৃত বাঙ্গালা বর্ণমালায় যে কয়েকটি অক্ষর থাকিলে কার্য্য চলিবে তাহা নীচে লিখিত হইতেছে।

স্বরবর্ণ

অ, া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ে, ৈ, ৌ, = ১০

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক, খ, গ, ঘ। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ,। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। ত, থ. দ, ধ, ন। প, ফ, ব, ভ, ম। য, র, ল, শ, ষ, স, হ। এই একত্রিশ এবং এই একত্রিশটির অঙ্গীকার = মিলিত হইয়া = ৬২

(্) হসন্ত, (ং) অনুস্বার (ঃ) বিসর্গ এবং (ँ) চন্দ্রবিন্দু এই পাঁচটি = ৫

ক্ষ, জ্ঞ = এই দুইটি = ২

ফলা

্য, ্ব, ্র, ্ল, ্ন এই পাঁচটি ফলা = ৫ সর্ব্বশুদ্ধ ৮২টী অক্ষর রাখিলেই হয়। এক্ষণে দেখ, এদেশী বর্ণমালা সমূহের স্থানে রোমান বর্ণেব ব্যবহারের কথা হইতেছে তাহাতেও ৭৮টী অক্ষব রাখিতে হয় ২৬টি ক্যাপিটল, ২৬টী স্মল, ২৬টী ইটলিক, আমাদের উল্লিখিত বাঙ্গালা অক্ষরের অপেক্ষা চারটি অক্ষর কম মাত্র।

কেহ বলিয়াছিলেন সংযুক্তবর্ণ লিখিবার সময় পূর্ব্বস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণের নীচে (্) হসন্ত না দিয়া যদি পূর্ব্ববর্ণের পর অর্থাৎ সংযুক্ত বর্ণদ্বয়ের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র হাইফেন (-) দেওয়া হয় এবং তাহাকে সংযোগের চিহ্ন বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে কম্পোজিটরদিগের আরও সুবিধা হয়। একথা সত্য কিন্তু আমরা বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিতে পারিলাম না কারণ তাদৃশরূপে লিখিত বর্ণকে সংযুক্ত বলিয়া বোধ করিতে কিছু কালসাপেক্ষ করিবে। সংযুক্ত স্থলে অক্ষর না থাকিলে এখনও পূর্ব্ববর্ণে (্) হসন্ত যোগ করিয়া লেখা হয় সুতরাং ইহা একপ্রকার স্বীকৃত পদ্ধতি।

পৃথিবীতে কতকগুলি লোক আছেন তাঁহারা ভাবেন পৃথিবী ডুব্‌লো ডুব্‌লো ডুব্‌লো। ক্রমে মনুষ্য অধঃপাতে যাইতেছে। যতই দিন যাইতেছে ততই মানুষ খারাপ হইতেছে। মানুষে এখন পাপ বেশী করে, মিথ্যা কথা বেশী কয়। দুষ্কর্ম্মান্বিত বেশী। পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ রোজ রোজ দুর্ভিক্ষ হইতেছে, রোজ রোজ অনাবৃষ্টি, রোজ রোজ ম্যালেরিয়া। মানুষ অসুখী হইতেছে, রোগা হইতেছে, অল্পায়ু হইতেছে। মানুষের বুদ্ধিশক্তি কমিতেছে। বাপ ছেলেকে ভালবাসে না, ছেলে বাপেব উপর ভক্তি করে না, ভয়ানক অরাজক, ভয়ানক উল্টা পাল্টা। ঘোর কলি, প্রলয় সন্নিকট।

আর একদল আছেন তাঁহারা বলেন, পৃথিবীর ক্রমশই উন্নতি হইতেছে। ক্রমে মনুষ্যেব আয়ু বৃদ্ধি হইতেছে। বল বৃদ্ধি হইতেছে, জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে, ধন বৃদ্ধি হইতেছে। ক্রমে জড়গতের উপর মনুষ্যের আধিপত্য বিস্তার হইতেছে। মনুষ্যের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হইতেছে। মনুষ্য ভাল বুঝিতেছে, ভাল খাইতেছে, ভাল পরিতেছে, ভাল কার্য্য করিতেছে, মনুষ্যের সকলই ভাল। আর এই সবে পৃথিবীর বাল্যাবস্থা ইহা হইতে অনেক উন্নতি হইবে, অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইবে। মনুষ্য ত সৃষ্টির অধিশ্বর আছেই ক্রমে সৃষ্টির হাফ কর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইবে।

এই রকম কথা আমরা প্রত্যহই শুনিতে পাই। নিত্যই দেখিতে পাই, কতক লোকে পৃথিবী ডুবাইতেছে আবার আর কতক লোকে পৃথিবী উদ্ধার করিতেছে। কেহ বলিতেছে কলির সন্ধ্যা, কেহ বলিতেছে সত্যযুগের আরম্ভ। কেহ নিরাশ-সাগরে ডুবিতেছে ও আর পাঁচজনকে ডুবাইতে চাহিতেছে, কেহ ভরসায় নৃত্য করিতেছে ও সকলকে ভরসায় যাগাইয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছে। দুর্ভাবনায় কাহারও মুখ চিন্তারেখায় অতি অঙ্কিত হইতেছে কাহারও গণ্ডদেশ লালের আভাযুক্ত হৃদয়গ্রাহী বর্ণ ধারণ করিতেছে।

পরের কথায় কাজ কি ? আমরা নিজেই দেখিতে পাই এই সকাল বেলায় বোধ হইল, সব ভাল চলিতেছে বড় আনন্দ; আবার বৈকালে বোধ হইল সব মন্দ। আজ ভাবিলাম পৃথিবীতে পাপ অপেক্ষা পুণ্য দুঃখ অপেক্ষা সুখ অধিক, আবার খানিক গৌণে ঠিক উল্টা ভাবিলাম।

এরূপ নিত্য বিরোধের অর্থ কি ? কেন এরূপ ঠিক বিপরীত প্রতীতি মনোমধ্যে উদয় হয় ? কেনই বা কতক লোক একেবারে ডুব্‌লো ডুব্‌লো, আবার আর কতক উঠলো উঠলো বলে। শুধু বলিয়াই ত ক্ষান্ত নয় তাহাদের মনোমধ্যে দৃঢ়সংস্কারই এই।—অনেকে এইরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া নানারূপ কষ্ট পায়। তাহাদের জীবনের প্রত্যেক দিনেই পূর্ব্বোক্তরূপ সংস্কারের কার্য্যকলাপ প্রকাশ পায়। প্রথম মনে হইতে পারে বৃদ্ধলোক "ডুবলোর" পোষক আর যুবকেরা "উন্নতির" পোষক। কিন্তু তাহা নহে, দুদলেই যুবাও আছেন বৃদ্ধও আছেন। বরং অনেক যুবা "ডুবলোর" অধিক পক্ষ।

এই পরস্পর বিরোধী মতদ্বয় শুনিলে প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, কেন এত মতভেদ হয়, দ্বিতীয় এই যে এ দুইয়ের মধ্যে কোনটার কতটুকু সত্য। দুইই সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে না তবে একটা সত্য হউক। অধোগতিই সত্য হউক; পৃথিবীশুদ্ধ লোক ক্রমশঃ অধিক মিথ্যাবাদী হইতেছে, অধিক চোর হইতেছে, অধিক আহাম্মুক হইতেছে, দুঃখী হইতেছে, অধিক কষ্টভোগ করিতেছে এই সত্য হউক। কিন্তু ইহাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণবিরুদ্ধ গত শতাব্দীর লেখাপড়া তুলনা করিলে কি দেখা যায় ? মিথ্যা কথার অবশ্য হিসাব নাই কিন্তু চুরি কমিতেছে, লোক অধিক সেয়ানা হইতেছে, দুঃখ হ্রাস হইতেছে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, এ সকল ত প্রত্যক্ষ লেখা পড়ার কথা, statistics এই বলে। অতএব ডুব্‌লো মত ঠিক নহে।

তবে কি উন্নতি মত ঠিক ? পৃথিবীশুদ্ধ লোক ধার্ম্মিক হইতেছে, ধনী হইতেছে, কলহ নাই, বিবাদ নাই, সকলই উন্নত হইতেছে। সভ্যতাস্রোতে জগৎ ভাসিয়া যাইতেছে। এই মত কি সত্য ? তা যদি সত্য হইত ত পৃথিবীই ত স্বর্গ, আর স্বর্গকামনায় কাজ কি ? তাও নয়। সর্ব্বাঙ্গীণ সর্ব্বজাতীয় উন্নতি ঠিক নহে। প্রত্যক্ষপ্রমাণ; মুসলমানেরা ক্রমশঃই অধঃপাতে যাইতেছে। হিন্দুস্থানের মুসলমানেরা ত বাবুগিরি করিয়া ইন্দ্রিয়দোষে মনুষ্যনামের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছে। তাহার পর এই একশত বৎসরের মধ্যে তুর্কি ধ্বংস হইল, পারসিয়া রুসিয়ার করায়ত্ত হইয়া আসিতেছে। ঈজিপ্ত যায় যায় হইয়াছে অথবা গিয়াছে, তাহারা পরের হাতে রাজকার্য্য দিয়া স্বয়ং ঘরে বসিয়া থাকে

তাহাদের আর আছে কি? তুর্কিস্থান গিয়াছে, আফগান গেল, আলজিয়ার্স গত, বার্ব্বরি ষ্টেট হীনবীর্য্য। কাসগড় মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল তাহারও নাম লোপ হইয়াছে, মুসলমানের কাছে এখন জগৎ "গেল" "ডুবিলই ত" বোধ হইল। মুসলমান জগতের প্রায় ষষ্ঠাংশ। এই ষষ্ঠাংশের যখন অবনতি প্রত্যক্ষ, তখন জগতের উন্নতি হইতেছে কেমন করিয়া বলিব।

আর এক মত আছে। জগৎ যে ভাব সেই ভাবেই আছে ৪০০০ বৎসর আগেও যেমন, ১৮৭৯ বৎসর আগেও তেমনি ছিল, আবার আজও তেমনই। কেহ উঠিতেছে কেহ পড়িতেছে, চাকা ঘুরিতেছে। রাশিচক্র যেমন ভাবে চলিতেছিল তেমনি আছে কিছু ব্যত্যয় হয় নাই তবে গ্রহ কাহারও বিগুণ কাহারও অনুকূল। কাহারও বৃহস্পতির দশা কাহারও শনির, কিন্তু উভয়েরই প্রভুত্ব আজিও বজায় আছে সমান আছে। এই মতের অনেকে আবার এতদূর গোঁড়া আছেন যে তাঁহারা বলেন যে পৃথিবীর লোকের অবস্থা ঠিক একই আছে।

ইহাদের কথায়ও বিশ্বাস করা যায় না। এক বৎসর দুই বৎসর করিয়া গণিলে সর্ব্বদা উন্নতি দেখা যাউক আর নাই যাউক কিন্তু অনেক দিনের পর জগতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে আর সেই পরিবর্ত্তেব মধ্যে অনেকগুলি মন্দ হইতে ভাল হইয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যেখানে লোকে ভূতের ভয়ে যাইত না এক্ষণে তথা হইতে ভূত পলাইয়াছে। যে নদী পর্ব্বত নক্ষত্রকে আমরা দেবতা দেখিতাম সে সকল এখন কেবল নদী পর্ব্বত ও নক্ষত্র মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে দেবতারা অন্তরিত হইয়াছেন। যে মেঘ শালপাতা খাইয়া অভ্র বমন করিত সেই মেঘ এখন "ধূমজ্যোতিঃ সলিল মরুতাং সন্নিপাতঃ" হইয়াছে। দাসব্যবসায়ীদের যে সকল অত্যাচার আমরা বুঝিতেই পারিতাম না এখন সেই সকল অপনয়নে আবালবৃদ্ধবণিতা চেষ্টা করিতেছে। রেল গাড়ী ব্যোমযান প্রভৃতির দ্বারা যে সকল লাভ ও উপকার হইয়াছে তাহার ত আর কথাই নাই। অতএব যখন দেখা যাইতেছে জড়জগতে, অন্তর্জগতে, শরীরে, মনে, শিক্ষায়, নীতিতে, কার্য্যে, কর্ম্মে, চাল চলনে, সর্ব্বত্র ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং সেই পরিবর্ত্তের অধিকাংশ মনুষ্যের সুখবৃদ্ধি করিতেছে তখন জগৎ মান্ধাতার সময়ও যেভাবে ছিল এখনও সেইভাবে আছে বলি কিরূপে।

অতএব জগৎ সমভাবে নাই, পরিবর্ত্ত হইতেছে এ কথায় কাহারও অবিশ্বাস নাই। যে হিন্দুসমাজ সর্ব্বাপেক্ষা স্থির ও পরিবর্ত্তবিরোধী সেই হিন্দুসমাজেই কত পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। মনুর শাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায় যে কত পরিবর্ত্ত হইয়াছে। মনু বলেন ব্রাহ্মণে ৩৬ বৎসর, ২৭ বৎসর, ১৮ বৎসর

নিতান্ত না হয় ৯ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিবে। আমরা এখন ৯ রাত্রি তেরাত্রি বা এক রাত্রি পৈতার ঘরে থাকিয়াই সেই ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করি। মনু বলিয়াছেন ৫০ বৎসরের পর বানপ্রস্থ হইবে অর্থাৎ বনগমন করিবে। এখন আমরা ৮০ বৎসরের সময় কাশীবাস করিয়া সেই নিয়ম রক্ষা করি। মনু বলেন ব্রাহ্মণ চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহ করিতে পারিবে। এখন এক ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণে বিবাহ করিলে তাহার জাতিপাত হয়। অতএব এ সকল বিষয়ে যে ঘোর পরিবর্ত্ত হইয়াছে তাহার আর সংশয় নাই। কিন্তু এই পরিবর্ত্ত হইয়া হরেদবে হাঁটু জল হইয়া দাঁড়াইয়াছে কি না দেখা চাই। আমাদের যে দিকে পরিবর্ত্ত হইয়াছে পৃথিবীর আর কোনদিকে ঠিক তাহার উল্টা পবিবর্ত্ত হইয়াছে কি না? ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে কোথাও সেরূপ হয় নাই বরং দেখা যায় সমস্ত জগতেরই পরিবর্ত্ত একমুখে ধাবিত। সর্ব্বত্রই দেখা যায় জাতিগত বৈষম্য যাহাতে না থাকে তাহারই চেষ্টা—যাহাতে দাসত্ব বন্ধ হয় তাহারই উদ্যোগ। ভারতের শূদ্র, আমেরিকার স্লেভ, গ্রীসের হিলট, ইউরোপের সর্ফ ক্রমে দাসত্ববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। যেখানে যেখানে পুরোহিতের আধিপত্য ছিল সর্ব্বত্র তাহার আধিপত্য কমিয়াছে। যেখানে যেখানে জমিদার ও রাজার আধিপত্য প্রবল ছিল সেই সেইখানেই তাহাদের প্রতাপ হ্রাস হইয়াছে। কুসংস্কার সকল ক্রমেই অস্তমিত হইতেছে। এ সকল পরিবর্ত্ত পৃথিবীর সর্ব্বত্র একই দিকে হইয়াছে। আমরা এমন বলি না যে এক সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই একভাব পরিবর্ত্ত হইয়াছে কিন্তু যখন যখনই পরিবর্ত্ত হইয়াছে এই একদিকেই হইয়াছে। রোম বল গ্রীস বল ইংলণ্ড বল ফ্রান্স বল প্রথম অবস্থায় পুরোহিতদিগের সকলেই পদানত ছিলেন ক্রমে যত সভ্যতা বাড়িতে লাগিল ততই পুরোহিতদিগের ক্ষমতা কমিতে লাগিল। এই সকল দেশেই প্রথম অবস্থায় জমীদার ও প্রজার গোলমাল ছিল যতই উন্নতি হইতে লাগিল জমীদারের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া তত সর্ব্বত্রই প্রজার ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এক্ষণে বলিতে হইবে যে, পরিবর্ত্ত হইতেছে এবং ইহাও বলিতে হইবে যে পরিবর্ত্তস্রোত ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একইমুখে ধাবিত। এখনও এক কথা আছে এখনও "হরে-দরে-হাটু—জল" বাদী বলিতে পারেন যে কোন এক সময়ে পৃথিবীশুদ্ধ ধরিলে এ দেশে ভাল হইল, ও দেশে মন্দ হইল সুতরাং যা ছিল তাহাই দাঁড়াইল। এই তাঁহাদের প্রধান আপত্তি। এইটি খণ্ডন করিতে পারিলে তাহারা নিরস্ত হইবেন। কোন্ সময় ধরিয়া প্রমাণ করিব। রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সময় ধরা যাউক। রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ন্যায় ইউরোপের দুর্দ্দিন বোধ হয় আর কখন হয় নাই হবেও না।

এই সময়ে পাশ্চাত্য রোমান্ সাম্রাজ্য অসভ্য বর্ব্বরজাতির হস্তে পতিত হইল। গল, বৃটেন, স্পেন, ইতালি প্রভৃতি সভ্যদেশ হইতে সভ্যতা দূরীভূত হইল। প্রাচ্য রোমানদেশও পুরোহিতের আধিপত্যে মগ্ন হইয়া নিস্তেজ নির্ব্বির্য্যপ্রায় রহিল। সুতরাং সমস্ত ইউরোপ যেন অন্ধতমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু ঠিক এই সময়েই ভারতবর্ষের গৌরবের দ্বিতীয় দিন উপস্থিতপ্রায়। এই সময়ে ভারতবর্ষীয়েরা পাশ্চাত্যআক্রমণকারীদিগকে দূরীভূত করিয়া, নানাবিধ কাব্য-কলাপ সৃষ্টি করিয়া, জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের গুহ্য তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া, সভ্যতার চূড়ান্ত করিয়া তুলিলেন। ৪।৬ খৃঃ অব্দে রোমে বর্ব্বরাধিপত্য স্থাপিত হইল ৫১১ খৃঃ অব্দে রবাহমিহির অমূল্য জ্যোতিষ তত্ত্ব রচনা করিলেন। সম্ভবতঃ কালিদাসও এই সময়ের লোক। আবার ঠিক এই সময়েই চীনের এক নূতন উন্নতির সময়। এই সময়েই চীনবাসীরা প্রাচীন সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ সকল অনুবাদ করিতেছে আর চিনের পবিত্রাজকেরা ভারতবর্ষে ভ্রমণ করতঃ স্বদেশের জ্ঞানোন্নতিসাধন করিতেছে, আবার আরবদেশ এই সময়েই এক ভীষণ সমাজবিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, প্রাচীন পারস্যেরও অবস্থা এ সময় খুব ভাল। বোমেব ধ্বংস হেতু জগতের যে অনিষ্ট হইয়াছিল এতগুলি দেশের উন্নতিতে তাহার কি সামঞ্জস্য অপেক্ষা অধিক হইল না? যখন প্রায় সমস্ত পৃথিবীর লোকের উন্নতি হইতেছে তখন এক রোমানসাম্রাজ্যেব ধ্বংসে কত ক্ষতি হইবে।

বাস্তবিক জগতেব উন্নতি হইতেছে বা অবনতি হইতেছে নির্ণয় করিতে হইলে যে প্রাণালীতে আমবা এতক্ষণ যাইতেছিলাম সে প্রাণালীতে যাইতে সুবিধা হইবে না, উহার আর এক উপায় আছে। যেমন বাহ্যজগতে উৎপত্তি স্থিতি ও লয় দেখা যায়, যেমন মনুষ্যের জন্ম মৃত্যু দেখা যায় এইরূপ মনুষ্যজাতির হউক আর নাই হউক ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যসমাজের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় আছে। মনুষ্য যতক্ষণ নিজে আপনার জন্য সব করিয়া লয় ততক্ষণ সমাজ হয় না, যে মুহূর্ত্তে মনুষ্য পরস্পরের মুখাপেক্ষা করিতে আরম্ভ করে যে সময় হইতে রাম হরির বোনা কাপড় পরিতে ও হরি রামের চাষের চাল খাইতে থাকে সেই সময় হইতে সমাজ আরম্ভ। যতক্ষণ সকল লোকই আপন আপন উদরান্নের জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করে ততক্ষণ সমাজের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। উন্নতি হইতে গেলে সমাজমধ্যে এমন একদল লোক চাই যাহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষিকার্য্যে বা শিল্পকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হয় না, যাহারা সমাজের লোককে শিক্ষা দেয়, শাসন করে, সৎপথে প্রবর্ত্তিত করে। ইহারা শিক্ষিত লোক, এই দলের উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি। সুতরাং এই দলের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল কিন্তু সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মানসিক উন্নতিও হওয়া চাই। নচেৎ বড়ই সর্ব্বনাশ। যদি ইহাদের

সংখ্যা বৃদ্ধি হয় কিন্তু মানসিক উন্নতি না থাকে তাহা হইলে ইহারা জনসমাজের ভয়ানক শত্রু হয় ; কেবল নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য দিবারাত্র ব্যস্ত থাকিয়া প্রজাবৃন্দের ভীষণ কষ্টের কারণ হয়। নিজের অলীক আমোদের জন্য সহস্র লোকের প্রাণবধ করিতেও কাতর হয় না। নিজের সামান্য উপকারের জন্য পরের ভয়ানক অপকার করিতে কষ্ট বোধ করে না। এইরূপ অত্যাচারী লোক অর্দ্ধ সভ্য অবস্থায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপের ব্যারণ ও বিশপ, ভারতের ব্রাহ্মণ, এবং প্রায় সর্ব্বত্রই রাজকর্ম্মচারিগণ এই তন্ত্রের লোক। যদি শিক্ষিত দলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং তাহাদের মানসিক উন্নতিও ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে তাহা হইলে তাঁহারা অশিক্ষিতদিগের মঙ্গল কামনা করেন। তাহাদের সত্য বজায় করিবার ও তাহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি কবিবার পরামর্শ দেন, তাহাদের যাহাতে নিজকর্ম্ম করিয়া সময় থাকে ও যাহাতে তাহারাও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্য হইতে পারে তাহাব চেষ্টা কবেন। এইটি করিলেই সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইল। কিছু দিন এইরূপ উন্নতি হইবার পর সমাজের ধ্বংস হয়। সমাজ-ধ্বংসের কারণ শিক্ষিত লোকদিগের তেজোহ্রাস। অনেকদিন পরিশ্রম ও ক্রমাগত চিন্তা করিলে যেমন মনুষ্যের চিন্তাশক্তি ক্রমে অবশ হইয়া আইসে, সমাজস্থ শিক্ষিত লোকদিগেরও তেমনি হয়, দশ পনর পুরুষ ক্রমাগত উন্নতি হইবার পর সমাজের মৌলিকতা হ্রাস হইতে থাকে, নূতন আর কিছু আবিষ্কার হয় না, দিন কত কেবল রুটিন বাঁধা সভ্যতা থাকে, এই রুটিন কাজের নাম সমাজধ্বংস. যেমন সমাজের মৌলিকতা হ্রাস হইল উন্নতির স্রোতঃ রুদ্ধ হইল অমনি যদি সমাজ ছত্র ভঙ্গ হইয়া পড়ে অথবা আর একদল লোক উঠিয়া নিস্তেজঃ শিক্ষিতদিগের স্থান দখল করে তবেই মঙ্গল তবেই আরও দিনকত উন্নতির সম্ভাবনা নচেৎ সমাজের ক্রমেই অবনতি হয়। রুটিন ক্রমে খারাপ হইতে থাকে। সমাজস্থ লোকদিগের শিক্ষা ভাল হয় না। কুসংস্কার, ভীরুতা, সমাজ আক্রমণ করিয়া থাকে। সমাজের নাম থাকে, তেজ থাকে না। যেমন মৃতদেহ রক্ষা করায় কোন ফল নাই সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত প্রকার মৃত বা ধ্বংসাবশিষ্ট রুটিন সমাজও কোন কার্য্যের হয় না বরং বহুসংখ্যক লোককে কুসংস্কারে মগ্ন করিয়া জগতের অনিষ্ট করে। যদি কুসংস্কারেরও বৃদ্ধি না হয় তথাপিও তাহারা জগতের অপকার করে। তাহারা আপনাদের গৌরবের স্মৃতিতে অহঙ্কৃত হইয়া পুরাণ সেকেলে সকল মতের পোষকতা করে। নূতন মত প্রচার হইতে দেয় না। প্রচার হইলে প্রাণপণে তাহার লোপ যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা করে। নূতন মত প্রচার হইতে না দেওয়ার মত জগতের অনিষ্ট আর নাই। অতএব যখন যে সমাজের শিক্ষিতগণের মৌলিকতা হ্রাস হইতে থাকে সে সমাজে হয় আমূলক পরিবর্ত্তন বা বিনাশ হাওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা

পৃথিবীর যে অংশে সে সমাজ থাকিবে সে অংশে পক্ষপাতগ্রস্ত অঙ্গের ন্যায় নিস্তেজ ও চলৎশক্তিবিহীন হইয়া পড়িবে।

এইরূপ দেখান গেল যে সকল সমাজের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় আছে। প্রায়ই দেখা যায় যে, যে সমাজের ধ্বংস হইতেছে তথাকার শিক্ষিত লোকেরাই ডুব্‌লো মন্ত্রের উপাসক,আর যেখানে সমাজের উন্নতি হইতেছে সেইখানকার লোকই উন্নতি মতের প্রতিপোষক। যেমন জগতে মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম অধিক সেইরূপ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাজধ্বংস অপেক্ষা সমাজস্থিতি ও উৎপত্তি অধিক, সুতরাং অধিক লোক উন্নতিবাদী। ইহাতে একমাত্র বাদ আছে—পুরোহিত জাতি সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে "ডুব্‌লো" বাদী। সুতরাং যে দেশে পুরোহিতের ক্ষমতা নাই সেখানে "ডুব্‌লোর" বড় আদর নাই।

যেমন সমাজের উন্নতি অবনতি আছে তেমনি সমাজের বিশেষ বিশেষ অংশেরও উন্নতি অবনতি আছে। সর্ব্বত্রই উন্নতি অপেক্ষা অবনতি কম। সকল সমাজেই সমাজের সাধারণ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের অবনতি দেখা যায়। সুতরাং যত সমাজের উন্নতি হয় ততই ধর্ম্মযাজকগণ ডুব্‌লো ডুব্‌লো বলিয়া গোল বাঁধান, কিন্তু কে তাঁহাদের কথা শুনে। যে সম্প্রদায়েরই যখন অবনতি তাহারাই তখন ডুব্‌লো বলিয়া উঠে। অতএব বড় বড় সমাজেও যেমন, সমাজের মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায় সমূহে তেমনিঁ, একই নিয়ম।

আমাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল যে, কেন উন্নতি ও অবনতি দুই মতাবলম্বীর লোক হয়? তাহার উত্তর একপ্রকার দেওয়া হইল। এখন দেখিতে হইবে যে, এই দুই মতের কোনটীতে কত সত্য আছে।

প্রমাণ করা হইয়াছে যে, সকল সমাজেরই উন্নতি ও অবনতি আছে। আজি মুসলমান অস্ত যাইতেছে কাল খ্রীষ্টিয়ান অস্ত যাইবে, হিন্দু বহুকাল অস্ত গিয়াছে। আজই দেখিতেছি খ্রীষ্টিয়ান উন্নত, মুসলমান অস্তমিত, হিন্দু ধ্বংসাবশেষ মাত্র। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সমাজের উন্নতি অবনতি হইলেও সাধারণতঃ মানবজাতির ক্রমেই উন্নতি হইতেছে। তাহার ধ্বংস নাই, সে উন্নতি অবিশ্রান্ত। সমাজ-বিশেষের অবনতি হইলেও সে সমাজ জগতের কোন না কোন উন্নতি করে, উন্নতি করা যেন সমাজ মাত্রেরই মিশন। নিজের উৎপত্তি হয় স্থিতি হয় ধ্বংস হয় কিন্তু উন্নতিসময়ে সে সমাজ যদি একটী নূতন কথা কহিয়া যায়, একটি নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়া যায়, একটি বিষয়ে জড়জগতের উপর মনুষ্যের আধিপত্য বিস্তার করিয়া যায়, তবে সে তাহার মিশন পূর্ণ করিয়া গেল। সেই নূতন আবিষ্ক্রিয়া, ক্রমে সমস্ত মানবজাতির উপকার সাধন

করে। এই সকল আবিষ্ক্রিয়া দেখিয়াই ঠিক করিতে হইবে জগতের উন্নতি হইতেছে কি অবনতি হইতেছে। শুদ্ধ যে প্রাকৃতিক আবিষ্ক্রিয়া লইয়াই উন্নতি তাহা নহে, যাহা কিছু নূতন কেহ করিতে পারে তাহাই উন্নতি। উন্নতির এইরূপ অর্থ করিলে দেখা যাইবে মান্ধাতার সময় হইতে ক্রমেই জগতের উন্নতি হইতেছে এবং এই উন্নতি যে কোথায় গিয়া শেষ হইবে তাহার ঠিকানা নাই। প্রথম অবস্থায় অবশ্য উন্নতি (নূতন আবিষ্ক্রিয়া) এত শীঘ্র হইত না। কারণ তখন নূতন আবিষ্ক্রিয়ার এত সুবিধা হয় নাই, মনুষ্যের বুদ্ধি শুদ্ধি এত পরিপক্ব হয় নাই, এমন কি তখন পাঁচটা দেখিয়া শুনিয়া একটা নূতন করার প্রণালী (Inductive method) পর্য্যন্ত লোকে জানিত না। যতই মনুষ্যের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হইতেছে ততই উন্নতি শীঘ্র হইতেছে। একটি নূতন idea যখন প্রচার হইয়া গেল তখন তাহার আর ধ্বংস নাই, সে মত অন্য উৎকৃষ্টতর idea দ্বারা তিরোহিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার ধ্বংস নাই, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারে আবির্ভূত হইয়া জগতের ক্রমেই সে উপকারে আসিবে। সুতরাং যখন idea ধ্বংস নাই তখন তজ্জনিত উন্নতিরও ধ্বংস নাই।

সমস্ত মনুষ্যজাতির যে ক্রমে উন্নতি হইতেছে তাহার আর এক প্রমাণ যে, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের আকার ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে। অতি প্রাচীন কালে পারিবারিক রাজত্ব প্রবল ছিল। একজন কর্ত্তা ছিলেন তাঁহার পরিবার তাঁহার তুল্য লোক, অবশিষ্ট সকলে তাঁহার দাস। ক্রমে এই পরিবারস্বামিগণ একত্র হইয়া tribal বা সম্প্রদায়প্রধান শাসন হইল। ক্রমে নানা সম্প্রদায় এক হইয়া নাগরিক শাসন হইল। ক্রমে নগরসমবায়, তাহার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ। যথা ডিউকডম, আরলডম, ছোট ছোট রিপবলিক, ক্রমে এক্ষণে নেশন্যাল বা জাতীয় শাসন উপস্থিত হইয়াছে। ক্রমেই দেখা যাইতেছে সমাজের কলেবর বৃদ্ধি হইতেছে। প্রাচীনকালে প্রবল পরাক্রান্ত আথেন্সে পাঁচ হাজারের উপর নাগরিক লোক ছিল। অবশিষ্ট লোকেরা রাজ্যশাসন সম্বন্ধে কোন কথাই কহিতে পারিত না। এখন ফ্রান্স ও আমেরিকার সমস্ত লোকই নাগরিক, সকলেরই রাজ্যশাসন সম্বন্ধে কথা কহিবার ক্ষমতা আছে। পূর্ব্বকালেও বড় বড় রাজ্য ও সাম্রাজ্য ছিল কিন্তু বৃহৎ জাতি বা নেশন ছিল না। সর্ব্বত্রই একজন লোক বা এক সম্প্রদায় বা এক নগর অবশিষ্টের উপর আধিপত্য করিত, কাহারও নিকট তাহাদের জবাবদিহি ছিল না। যখন দেখিতেছি সভ্যতাবৃদ্ধি-সহকারে ক্রমেই মনুষ্যসমাজের কলেবর বৃদ্ধি হইতেছে তখন নিঃসন্দেহই ভরসা করিতে পারি যে, যত কেন দেরিতে হউক না এমন দিন অবশ্য উপস্থিত হইবে যখন সমস্ত পৃথিবী একশাসনাধীন হইবে, সমস্ত মানবগণ এক পরিবারের ন্যায় পরস্পরের সহায়তায় পরমসুখে

দিনাতিপাত করিবে। এখন যেমন একটী idea ইংলণ্ডে আবিষ্কৃত হইল ত ফ্রান্সে সেটি প্রচার হইতে দুই শত বৎসর, ভারতবর্ষে পাঁচশত বৎসর লাগে, তখন শীঘ্র শীঘ্র সমস্ত মানবমণ্ডলীতে সেটী প্রচার হইয়া পড়িবে। আমরা যতই বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করি তত আমাদের দৃঢ় সংস্কার হয় যে এমন দিন অবশ্যই উপস্থিত হইবে। কিন্তু এখনও দেরী আছে, এখনও একজাতি অপর জাতির মুদ্রা ব্যবহার করে না, ভাষা ব্যবহার করে না, তুলাদণ্ড ব্যবহার করে না। সকলেরই স্বতন্ত্র মুদ্রা, ভাষা, তুলা-পরিমাণ। কিন্তু অনেক বিষয়ে ক্রমে এক হইতেছে। যদিও অল্পে অল্পে একাকার হইতেছে কিন্তু একাকার যে হইতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখনও সকল জাতি আপন আপন স্বাধীনতা বা স্বার্থপরতা রক্ষা করিতেছে। না করিয়াই বা কি করে? এখনও কোন জাতি এমন সভ্য হয় নাই যে অধীন জাতিকে সমান স্বত্ব প্রদান করে। এখনও স্বার্থপরতার প্রয়োজন আছে, ক্রমে ইহার লোপ হইবে এবং সমস্ত জগৎ ভাই ভাই হইয়া উঠিবে।

৬

আরতি শেষ হইলে সকলেই প্রণাম করিয়াছিল, কেবল ব্রহ্মচারী বক্ষে বাহু-বিন্যাস করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন প্রণাম করেন নাই। তিনি দেবমূর্ত্তিকে কখন প্রণাম করেন না; একথা সকলে জানিত অথচ সে জন্য কেহ তাঁহাকে অভক্তি করিত না, বরং সকলেই বলিত ব্রহ্মচারী জ্ঞানী তাহাই তিনি রামসীতার মূর্ত্তিকে প্রণাম করেন না।

ব্রহ্মচারী মাসে মাসে একবার করিয়া সন্ধ্যার সময় রামসীতার আরতি দর্শন করিতে আসিতেন। যাঁহারা এই সময় সেখানে উপস্থিত থাকিতেন সকলের সহিত অতি সস্নেহে কথাবার্ত্তা কহিতেন। অনেকের নাম জানিতেন, তাহাদের সাংসারিক অবস্থাও জানিতেন; নাম ধরিয়া তাহাদের ডাকিতেন এবং সংসারের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন। কিন্তু কেহ সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর করিতেন না, কখন কখন বলিতেন, আমি সংসারি নহি, এসকল বিষয়ের মন্ত্রণা আমা অপেক্ষা অন্যে ভাল দিবে।

শান্তিশত গ্রামের প্রায় ক্রোশান্তর দূরে এক প্রান্তর মধ্যে একটি ভগ্ন মন্দিরে ব্রহ্মচারী একাকী বাস করিতেন। মন্দিরটি কোন দেব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে সে সময়ে মন্দিরে কোন মূর্ত্তি ছিল না। প্রবাদ আছে যে, এক কালী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত তথায় আনীত হইয়াছিল কিন্তু রাত্রিকালে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কতকগুলি নিরীহ শান্ত লোক আসিয়া প্রতিমাকে নিকটস্থ দীর্ঘিকায় নিক্ষেপ করে। এবং কালীমূর্ত্তি স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া সেই রাত্রিকালে তাহারা অবগাহন স্নান করে। প্রবাদ সত্য হউক বা মিথ্যা হউক দীর্ঘিকার নাম কালীদহ।

ব্রহ্মচারীর সহিত এই স্থানে সাক্ষাৎ করিতে গেলে সাক্ষাৎ হয় না। মন্দিরের দ্বার সর্ব্বদাই খোলা থাকে, অথচ প্রবেশ করিলে কখন ব্রহ্মচারীর দেখা পাওয়া

যায় না। মন্দিরের তিন দিকে প্রান্তর একদিকে কালীদহ। তথায় একটি বকুল দুইটি বেল বৃক্ষ ভিন্ন আর কোন বৃক্ষ কি লতা নাই। চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে কোথায়ও ব্রহ্মচারীকে দেখিতে পাওয়া যায় না। যখনই অনুসন্ধান করা যায় তখনই এইরূপ অথচ লোকে বলে ব্রহ্মচারী এই স্থানে বাস করেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও সেই কথা বলেন। মাসান্তরে কেবল রামসীতার মন্দিরে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। লোকের শ্রদ্ধা তাঁহার সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য। দেব ভক্তি তাঁহার একেবারে ছিল না, তিনি কখন দেবতাকে প্রণাম বা পূজা করেন নাই, কেহ কখন তাঁহাকে সন্ধ্যা পাঠ করিতে শুনে নাই অথচ সকলেই তাঁহাকে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া জানিত। তিনি কখন কোন ভবিষ্যৎ কথা বলেন নাই অথচ জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান আছে বলিয়া রাষ্ট ছিল। তিনি কখন কাহাকে ঔষধ দেন নাই কিন্তু লোকের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি মনে করিলেই সকল রোগই আরাম করিতে পারেন। লোকের এরূপ বিশ্বাস, এরূপ শ্রদ্ধা কেন হইল তাহা অনুভব করা কঠিন কিন্তু চূড়াধন বাবু মনে মনে তাহা এক প্রকার অনুভব করিয়া রাখিয়াছিলেন। দেওয়ান পুত্র নবকুমারকে তিনি একদিন এই কথার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মচারী হয় জুয়াচোর নতুবা অদৃষ্টবান্ পুরুষ। নবকুমার তাঁহাতেই মত দেন।

রামসীতার মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মচারী আপন আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। কতক দূর যাইতে যাইতে কয়েকজন গ্রাম্যলোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা কার্য্য উপলক্ষে প্রাতে শান্তিশত গ্রামে আসিয়াছিল, এক্ষণে কার্য্য সমাধান্তে স্ব স্ব গ্রামে প্রত্যাগমন করিতেছে। ব্রহ্মচারী তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে চলিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ নানা কথার পর বলিল "ঠাকুর, আজ এই মাত্র আমরা একটা বড় কুসম্বাদ শুনিয়াছি। রাজা আমাদের দেবতা স্বরূপ, রাজার ধর্ম্মে প্রজার ধর্ম্ম, রাজা যদি এরূপ হন ত আমাদের কি দশা হইবে! শুনিলাম, রাজা নাকি এই মাত্র সন্ধ্যার সময় লোক জন লইয়া স্বয়ং একটী ব্রাহ্মণ কন্যা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। যুবতী কত চীৎকার করিতে লাগিল কেহ তাহার রক্ষার্থে আসিল না, যে রক্ষক সেই যদি ভক্ষক হয় তবে আর কে কথা কহিবে! ভয়ে তাহার পিতা পলায়ন করিয়াছিল, স্বামী বাটী নাই নতুবা সে রাজা বলিয়া বড় ভয় করিত না, তা সে যাহাই হউক পৃথিবীর দশা হল কি? এ যে ঘোর কলি উপস্থিত, রাজা হইয়া প্রজার কন্যাহরণ! তাহাতে আবার ব্রাহ্মণের কন্যা! কি সর্ব্বনাশ! আর বৃদ্ধ বয়সে রাজার এই দুর্ম্মতি, ইহা অপেক্ষা দেশের আর কি অমঙ্গল হইতে পারে।"

বৃদ্ধ চুপ করিল দেখিয়া একজন সঙ্গী বালক বলিল "পিতম পাগলার কথা বল। রাজা তাহাকে পিঁজরায় পুরিয়াছেন।"

বৃদ্ধ বলিল "ভাল কথা মনে! ঠাকুর, দুঃখের কথা কি বলিব! একটা পাগল পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত, কাহারও অনিষ্ট করিত না, তাহাকে ধরিয়া না কি বাঘের মুখে দিবার হুকুম হইয়াছিল। শেষ কে চূড়াধন বাবু আছেন তিনিই না কি তাহাকে রক্ষা করেন। তথাপি দেওয়ানজীর পরামর্শে রাজা তাহাকে পিঁজরায় বদ্ধ করিয়াছেন। বাঘের পার্শ্বে রাখিয়াছেন সে এক-প্রকার বাঘের মুখেই দেওয়া! এতক্ষণ হয় ত বাঘ তাহাকে উদরে পুরিয়াছে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি বাঘ তাহাকে দেখিয়া লাপাইতেছে ঝাপাইতেছে এক একবার গরাদের উপর দুই পা দিয়া দাঁড়াইয়া পিতমকে দেখিতেছে আর হাঁ করিতেছে।"

বালক বলিল "এক পাশে বাঘ এক পাশে ভালুক।"

বৃদ্ধ। কি আপশোষ কি আপশোষ! এত পাপ! পৃথিবী আর বহিতে পারিবেন কেন। রাজ্য আর থাকে না!

ব্রহ্মচারী কোন উত্তর দিলেন না। কতক দূর অন্যমনস্কে চলিলেন, পরে যখন উত্তর দিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ ফিরিলেন তখন দেখিলেন, গ্রাম্য লোকেরা অন্য পথে চলিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী কতক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন শেষ কি মনে করিয়া শান্তিশত গ্রামের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইলে পর ব্রহ্মচারী দেওয়ানজীর অতিথি-শালায় প্রবেশ করিলেন। তৎসম্বাদ শুনিয়া দেওয়ানজী তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রণাম করিয়া বসিলে, ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন "সমস্ত কুশল?"

দেওয়ান। মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদে সকলই কুশল বলিতে হইবে।

ব্রহ্মচারী। তাহা শুনিলেই আমাদের সুখ। অনেক দিন দেখি নাই, কোন সম্বাদও লইতে পারি নাই, তাহাই একবার আসিলাম।

দেওয়ান। অনুগ্রহ আপনার।

ব্রহ্মচারী। রাজার কুশল?

দেওয়ান শারীরিক কুশল বটেই, মানসিক মন্দ বলিয়াও বোধ হয় না।

ব্রহ্মচারী। রাজকার্য্য সম্বন্ধে কিরূপ?

দেওয়ান। তাহাও মন্দ নহে। তবে বোধ হয় ইদানীং সকলেই তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহে।

ব্রহ্মচারী। আমি তাঁহা কতক বুঝিয়াছি। তবে সবিশেষ জানি না, এক্ষণে শুনিতেও বড় ইচ্ছা করি না, মনে জানি যে, যখন আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রাজার পরামর্শী তখন তাঁহার মঙ্গলই সম্ভব, সকল বিপদ হইতেই উদ্ধার হইবেন। তবে বোধ হয় বিপক্ষদল কিঞ্চিৎ প্রবল হইয়া থাকিবে অথবা তাহাদের কার্য্যকারিতা শক্তি কিছু বৃদ্ধি পাইয়া থাকিবে।

দেওয়ান। তাহা সত্য, এই মাত্র তাহার পরিচয় পাইয়াছি।

ব্রহ্মচারী। কিরূপ ?

দেওয়ান। রাজার প্রতি যাহাতে প্রজার শ্রদ্ধা কমে এরূপ অপবাদ রটান হইতেছে। তাহা হউক, এরূপ হইয়াই থাকে, তাহার নিমিত্ত আমি বড় ব্যস্ত নহি, কিন্তু এক কথার নিমিত্ত আমার কিছু সন্দেহ হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় রাজা ব্রাহ্মণকন্যাকে ক্রোড়ে করিয়াছেন কিন্তু রাত্রি এক প্রহর না হইতে হইতেই সে কথা বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মচারি। যখন আপনি এ সকল বুঝিয়াছেন. তখন আর ভাবনার বিষয় কিছুই নাই। এক্ষণে আমি আশ্রমে যাই।

দেওয়ানজী প্রণাম করিয়া ব্রহ্মচারীকে বিদায় দিলেন। অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিলেন না।

৭

পরদিন প্রাতে একজন চোপদার রামসীতার পাড়ায় রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হস্তে মুসলমানি গঠনের এক দীর্ঘ শূল ছিল, তাহা সজোরে মৃত্তিকায় প্রহার করায় শূল প্রোথিত হইয়া বিনাস্পর্শে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন চোপদার অতি গম্ভীরভাবে সেই স্থানে পাদচারণ করিতে আরম্ভ করিল। পল্লীস্থ অধিবাসীরা একে একে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ক্রমে অনেক গুলি লোক আসিয়া জমিল। চোপদারের এ সময়ে এ স্থানে একা আসা অসম্ভব বলিয়া দুই একজন হেতু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলে, চোপদার কেবলমাত্র প্রশ্নকারীর মুখপ্রতি একবার কটাক্ষ করিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। চোপদার হিন্দুস্থানী, কাজেই দ্বিতীয়বার তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে আর কেহ সাহস করিল না। কিছু বিলম্বে বৃত্তান্ত অবশ্য জানা যাইবে এই বিবেচনায় সকলে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। চোপদার পূর্ব্বমত পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

বালকেরা রৌপ্য শূলের চাকচিক্য পরস্পর পরস্পরকে দেখাইতে লাগিল। যুবকেরা আপনাদের মধ্যে চুপি চুপি নানা তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল। কেহ বলিল যে এখানে কোথাও একটি মন্দির নির্ম্মিত হইবে তাহাই চোপদার আসিয়াছে।

কেহ বলিল যে তাহা নহে, এখানে অতিথিশালা হইবে। আবার কেহ বলিল, ইট কাঠের ব্যাপার নহে কিছু গুরুতর ব্যাপার আছে ইহার পর জানিতে পারিবে। চতুর্থ আর এক ব্যক্তি বলিল ব্যাপার আর কিছুই নহে এখানে একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইবে, যে স্থানে চোপদার শূল গাড়িয়াছে ঠিক ঐস্থানে হইবে। এই কথা বলিয়া সে ব্যক্তি ঈষৎ মুখভঙ্গী করিয়া হাসিল। মুখভঙ্গী দেখিয়া হাসির অর্থ অনেকের মনে পড়িল, "ঠিক বলিয়াছ ঠিক বলিয়াছ" বলিয়া প্রকাশ্য হাসি পড়িয়া গেল। হাসি থামিলে একজন বলিল স্তম্ভ তবে আর একটু সরিয়া হইবে, এই বলিয়া নিকটস্থ একটী বাটীর প্রতি কটাক্ষ করিল, আবার হাসি উঠিল।

যে বাটীর উদ্দেশে এই হাসি হইল সে বাটীর দ্বার খোলা ছিল। এক বৃদ্ধা বিধবা, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, পরিধানে মলিন ছিন্ন বস্ত্র, দ্বারে আসিয়া অতি তীব্র দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। বহু লোকের সমাগম স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া সভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বলিল "বিপদ দেখ, কার জঞ্জাল কোথায় আসিল।" পরে বৃদ্ধা পুত্রবধূর উদ্দেশ্যে বলিল "আজ আর জল আনিতে কি অন্য কার্য্যে যাইবার প্রয়োজন নাই, জলের আবশ্যক হয় আমি আনিয়া দিব।" পুত্রবধূ গৃহ মার্জ্জনা করিতেছিল কোন উত্তর করিল না, সস্নেহে কন্যার প্রতি চাহিয়া মাথা আন্দোলন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "জল আনিতে হয় পুটু আনিয়া দিবে, কেমন পুটু ?" পুটু ধূলায় বসিয়া শুষ্ক খই খাইতেছিল, গর্ভধারিণীর স্বর শুনিয়া তাঁহার প্রতি চাহিল। মাতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন পুটু ?" পুটু খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, ক্ষুদ্র হস্তে একটি খই তুলিয়া মাকে দেখাইতে লাগিল "এ এ", মা বলিলেন "খাও, খাও, দেখ মা যেন কাকে লয় না।" কাকের নাম হইবামাত্রই ভীত ভাবে পুটু চারিদিকে দেখিতে লাগিল। পুটু যদিও এক বৎসরের বালিকা, নিজে কথা কহিতে পারে না কিন্তু দুই একটি কথা বুঝিয়া থাকে। কাকের নামমাত্রেই হয় ত আপনার বিপদ বুঝিতে পারিল। প্রাতে উঠিয়া কেবল গুটিকতক খই পাইয়াছিল তাহা এখনি কাকে লইয়া যাইবে এই ভয়ে চারিদিক দেখিতে লাগিল।

বাস্তবিকই তৎকালে কাক আসিয়া চালে বসিয়াছিল। পুটু তাহাকে দেখিয়া কাঁদিবার উদ্যোগ করিলে তাহার গর্ভধারিণী আসিয়া কাক তাড়াইয়া দিল। পুটু আহ্লাদে হাসিয়া উঠিল, যা যা বলিয়া দুই হাত নাড়িতে লাগিল। মাতা যত্নে পুটুর ক্ষুদ্র মুখখানি ধরিয়া চুম্বন করিলেন, আদর করিয়া বলিলেন "খাও মা এইখানে বসিয়া খাও। খই ধূলায় ফেল না, থামিতে রেখে খাও, কাল

তোমার সঙ্গে রাজপুত্রের বিবাহ হবে, তখন তুমি সোণার থামিতে খই খাবে, কেমন পুটু?" পুটু আবার হাসিয়া দুই হাত বাড়াইল। মা মুখচুম্বন করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবামাত্র আবার কাক আসিল। এবার চালে না বসিয়া পুটুর নিকট আসিয়া বসিল। পুটু ভয়ে চক্ষু বুজিল। কাক ক্রমে খইগুলি সংগ্রহ করিয়া উড়িয়া গেল। তখন পুটু চক্ষু চাহিয়া থামি দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। ক্রন্দন শুনিয়া পুটুর মা দৌড়িয়া আসিলেন, থামি শূন্য দেখিয়া প্রথমে কাককে পরে আপনার অদৃষ্টকে গালি দিতে লাগিলেন। শেষ পুটুকে ক্রোড়ে লইয়া চোখের জল মুছাইতে মুছাইতে বলিতে লাগিলেন "কেন মা এ অভাগিনীর গর্ভে জন্মিয়াছিলে? আবার এখন খই আমি কোথা পাইব?"

পুটু শীঘ্রই কান্না ভুলিয়া গেল, আপনিই চক্ষের জল মুছিল কিন্তু মুছিতে গালে নাকে হাতে চক্ষের অঞ্জন লাগিয়া গেল। "ঐ! কি করিলি" বলিয়া গর্ভধারিণী গাত্রমার্জ্জনী আনিয়া কালি মুছাইতে মুছাইতে বলিতে লাগিলেন "পুটু আমার কেমন সুন্দর মেয়ে, পুটু আমার আজ আবার রাজার কোলে উঠিবে— রাজা আবার আজ কোলে লইতে আসিবেন, না পুটু?" মাধবীলতার আদরের নাম পুটু।

গৃহমধ্যে এইরূপে যখন গর্ভধারিণী মাধবীলতাকে লইয়া আদর করিতে ছিলেন সেই সময়ে রাজপথে একজন কারকুন আসিয়া নিকটস্থ গৃহস্থদিগের নাম ইত্যাদি লিখিয়া লইতেছিল, কাহার কাহার বাটীর দৈর্ঘ্য প্রস্থ মানদণ্ডের দ্বারা পরিমাণ করিতেছিল। গৃহস্বামীদের আর ইহা দেখিয়া বুঝিতে বাকি রহিল না। এক্ষণে গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে তাঁহাদের নিশ্চয় বোধ হইল। গৃহস্থের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে! পূর্ব্বের হাস্য রহস্য কাজেই লোপ হইল, সকলেই গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া মনে মনে মাধবীলতার পিতা রামানুজকে তিরস্কার করিলে লাগিল। রামানুজ তৎকালে বাটী ছিলেন না, প্রাতেই আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহের নিমিত্ত বহির্গত হইয়াছিলেন।

কিয়ৎকাল পরে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বস্ত্রাগ্রে কতকগুলি শাক, কদলি, বিল্বপত্র, হস্তে একটি বার্ত্তাকু। তাঁহাকে চিনিবামাত্র চোপদার আসিয়া প্রণাম করিল এবং যোড়করে বলিল যে তাঁহার সেবার যে সকল দাস দাসী নিযুক্ত হইয়াছে তাহারা আগতপ্রায়, বস্ত্র অলঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া আসিতেছে। আপাততঃ চারিজন দ্বারবান্ উপস্থিত আছে, তাঁহার যেরূপ অনুমতি হয়। রামানুজ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, চোপদার আর কাহাকে নিবেদন করিতেছে মনে করিয়া পশ্চাতে দেখিলেন সে দিকে কেহই নাই। হতবুদ্ধি হইয়া শাক

বার্ত্তাকু ফেলিয়া চোপদারের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অগত্যা একজন প্রতিবেশী বলিয়া উঠিল, আমাদের দেশত্যাগী করিবার নিমিত্ত তোমার যদি মনে ছিল পূর্ব্বে বলিলেই আমরা আপনারাই চলিয়া যাইতাম এ সকল যোগাযোগ করিবার আর তোমার আবশ্যক হইত না। আর একজন বলিয়া উঠিল। তুমি বড় লোক, আমাদের মত সামান্য লোকের উপর এ সকল অত্যাচার করা উচিত হয় নাই। রামানুজ কাতরনয়নে সকলের মুখপ্রতি চাহিতে লাগিলেন। এমন সময় রাজবাটী হইতে দ্রব্যাদি আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। সকলেই অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল। দেখিয়া কাহারও আহ্লাদ হইল না, প্রথমে সকলের মুখ ভার হইল। ক্রমে তাহাদের মধ্যে গোপনে উপহাস আরম্ভ হইল, কেহ কটাক্ষ দ্বারা, কেহ বা অঙ্গস্পর্শ দ্বারা উপহাস করিতে লাগিল। গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও তাহাদের রহস্যপ্রবৃত্তি ক্ষান্ত হইল না। ধনাঢ্যের প্রতি উপহাস, দরিদ্রের প্রতি উপহাস, বৃদ্ধের প্রতি উপহাস, যুবতীর প্রতি উপহাস, সতীত্বের প্রতি উপহাস ঘরে ঘরে আরম্ভ হইল।

তাহাদের গৃহিণীরাও ঈর্ষাপরবশ হইয়া নানা কথা আরম্ভ করিল। অনেকেই স্থির করিল যে "গহনা পরার গলায় দড়ি।"

৮

অপরাহ্নে যখন রাজা ইন্দ্রভূপ আত্মীয়গণপরিবেষ্টিত হইয়া পুরাণ শ্রবণ করিতেছিলেন একখানি শিবিকা তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। একজন পরিচারক আসিয়া যোড়হস্তে বলিল যে পাল্কী আসিয়া পৌঁছিল। রাজা ইঙ্গিত দ্বারা সম্বাদ গ্রহণ করিলেন; পুরাণপাঠ পূর্ব্বমত চলিল।

অন্তঃপুরে শিবিকা রক্ষিত হইলে, তিন চারি জন পরিচারিকা আসিয়া পাল্কীর দ্বার খুলিল। "যা যা" বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকা ক্ষুদ্র হস্তে করতালি দিয়া উঠিল, পরে পাল্কী হইতে অবতরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জনৈক পরিচারিকা তাহাকে কোলে করিয়া লইল। ক্রোড় হইতে বালিকা মাকে ডাকিতে লাগিল। পাল্কীতে একটী যুবতী ছিলেন, তিনিই বালিকার মা। পরিচারিকারা তাঁহাকে সসম্মানে আহ্বান করিলে, তিনি ধীরে ধীরে অবতরণ করিলেন। তাঁহার পরিধানে মুরসিদাবাদী পট্টবস্ত্র, আপাদমস্তক নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত। কিন্তু সকলগুলি অঙ্গোপযোগী নহে, অনেক গুলি অঙ্গ হইতে স্খলিতোন্মুখ। পাল্কীর নিকট দাঁড়াইয়া যুবতী সে গুলি অঙ্গে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু পারিতেছেন না দেখিয়া জনৈক পরিচারিকা সাহায্য করিল। অলঙ্কারের দৌরাত্ম্য শেষ হইলে যুবতী আবার দেখিল বস্ত্র আয়ত্তর মধ্যে রাখা ভার হইল।

পরিচারিকারা তাহা বুঝিতে পারিয়া যত্ন জানাইবার উপলক্ষে সবস্ত্র তাঁহার অঙ্গ ধরিয়া রাণীর নিকট লইয়া চলিল।

রাণী তৎকালে কিঞ্চিৎ দূরে বারাণ্ডায় ব্যজন হস্তে দাঁড়াইয়া ঈষৎ বামে মস্তক হেলাইয়া দেখিতেছিলেন। যুবতী অতি কুণ্ঠিতভাবে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রাণী আশীর্ব্বাদ করিয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক যুবতীকে তুলিলেন এবং নিকটে উপবেশন করিতে বলিয়া আপনি অগ্রসর হইয়া পরিচারিকার ক্রোড় হইতে বালিকাকে লইলেন। পরিচারিকার ক্রোড়ে বালিকা ম্লানভাবে থাকিয়া কাঁদিবার উদ্যোগ করিতেছিল, ক্রোড় পরিবর্ত্তন হওয়াতে সে ভাব কতক গেল। রাণীর ক্রোড়ে গিয়া বালিকা প্রথমে স্বর্ণখচিত বস্ত্রাগ্র দেখিতে লাগিল, তাহার পর একবার মুখ তুলিয়া রাণীর প্রতি চাহিল। কাপালে হীরক জ্বলিতেছে তাহা স্পর্শ করিবে বলিয়া ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারণ করিল, হস্ত সে পর্য্যন্ত গেল না। এই সময় কণ্ঠের হীরকের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বালিকা তৎক্ষণাৎ তাহা ধরিয়া বলিতে লাগিল "এ এ।" রাণী বালিকার মুখচুম্বন করিয়া শয্যায় বসিলেন, বালিকাকে আপন ক্রোড়ে বসাইলেন। তাহার গর্ভধারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটির নাম কি?" গর্ভধারিণী বলিলেন "পুটু।" রাণী বলিলেন কল্য মহারাজা বলিয়াছিলেন নাম মাধবীলতা। তা হউক। মাধবীলতা অপেক্ষা পুটু নাম ভাল। পুরুষেরা মাধবীলতা বলুন আমরা পুটু বলিব।

এই সময় মাতার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় পুটু রাণীর ক্রোড় হইতে মাতার ক্রোড়ে গেল, আবার মার ক্রোড় হইতে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া রাণীর ক্রোড়ে বসিয়া মার প্রতি চাহিয়া হাসিতে লাগিল। "আয়" বলিয়া মা হাত বাড়াইলে পুটু হাসিয়া রাণীর বস্ত্রান্তরালে মুখ লুকাইল, আবার অল্পে অল্পে মুখ বাহির করিয়া মাকে দেখিতে লাগিল। তাহার প্রতি মার দৃষ্টি পড়িবামাত্র আবার হাসিয়া মুখ লুকাইল।

রাণী একজন পরিচারিকার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "রাজকুমার আমার এরূপ খেলা জানে না। রাজকুমার কোথায় একবার এইখানে আনিয়া পুটুর কাছে বসাইয়া দেও দুইজনে কি করে দেখি।" পরিচারিকা উঠিয়া গেল।

আর একজন পরিচারিকা আসিয়া পুটুর হাতে মিষ্টান্ন দিল। পুটু তাহা খাদ্য বলিয়া অনুভব করিতে পারিল না, খেলিবার দ্রব্য মনে করিয়া ভাঙ্গিল। স্তন্যদুগ্ধ, খই আর গুড় ভিন্ন পুটু অন্য দ্রব্য কখন খায় নাই, মোণ্ডা কখন দেখেও নাই কাজেই ফেলিয়া দিল।

এই সময় অন্তঃপুরের দ্বারে নাগরা বাজিয়া উঠিল। রাণী বলিলেন "রাজা আসিতেছেন।" একজন পরিচারিকা পুটুর মাকে কক্ষান্তরে লইয়া গেল! রাজা

হাসিতে হাসিতে আসিলেন। রাজাকে দেখিবামাত্র পুটু হাত বাড়াইয়া দিল, রাজা পুটুকে ক্রোড়ে লইয়া রাণীর নিকট বসিলেন। রাণীকে বলিলেন, "আমি রাত্রে যে বলিয়াছিলাম মেয়েটি চমৎকার, বাস্তবিক তাহা নয় ?"

রাণী। মেয়েটিকে কোলে করে যেন আমার কোল যূড়াল।

রাজা। শরীর চমৎকার নরম।

রাণী। আমি তা বলিতেছি না, ছেলেদের শরীর এইরূপ নরম হয়। রাজকুমারের শরীর বরং আরও নরম।

রাজা। তবে কি বলিতেছিলে ?

রাণী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "অন্য ছেলে কোলে করে এত সুখ হয় না। এই খুদে মেয়ে যেন কি মন্ত্র জানে।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "তাহা কিছুই নয়। আমি বড় ভালবাসিয়াছি বলিয়া তোমারও ভাল লাগিয়াছে।"

রাণী। তাই হবে, মেয়েটির ত কোন খুঁত নাই সকলই গুণ ; অন্য ছেলে হলে এতক্ষণ কত কাঁদিত ; পুটু এসে অবধি কেবলই হাসিতেছে। আর দেখুন পুটুর হাসি যতবার দেখিলাম ততবারই আপনাকে মনে পড়িল, কেন বলুন দেখি।

রাজা। মাধবীর হাসি বুঝি কতক আমার মত।

রাণী। তা আমি ঠিক বুঝিতে পারি না, কিন্তু এর হাতের গড়ন দেখুন ঠিক আপনার মত।

রাজা। তাহা আমি ভাল বলিতে পারি না কিন্তু চোখ দুটি নিশ্চয় তোমার মত। প্রথমে দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলাম।

রাণী। কি আশ্চর্য্য ! মানুষের মত ত মানুষ হয় ?

রাজা। এ জগতে কিছুই বিচিত্র নহে। রামসীতার মত যদি কোন ঘটনা আমাদের হইত তবে বলিতাম এ আমারই লব। কিন্তু সেরূপ আমাদের কোন ঘটনাই ত নাই।

রাণী। বালাই ! বালাই ! তাঁরা দেবতা মাথার উপর থাকুন।

রাজা। প্রায় সন্ধ্যা হল। ব্রাহ্মণকন্যাকে আর অধিকক্ষণ রাখা না হয়। আমি এখন যাই।

রাজা চলিয়া গেলেন, অন্তঃপুর অতিক্রম করিলে আবার পূর্ব্বমত বন্তোত্তম হইয়া উঠিল। বন্তোত্তম শুনিবামাত্র রাজ অঙ্গনে স্বর্ণ মূসল হস্তে নকিব হিন্দি-

ভাষায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া রাজার বহির্গমনবার্ত্তা প্রচার করিতে লাগিল। অমনি নহবৎ বাজিয়া উঠিল। দ্বারে সুসজ্জিত হস্তী উপস্থিত ছিল বৃংহিত নাদ করিয়া উঠিল। অমাত্যগণ অগ্রসর হইলেন, পরিচারকগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। রাজা পুষ্প-উদ্যানে গেলেন।

ইন্দ্রভূপ উঠিয়া গেলে পুটুর মা রাণীর নিকটে আসিয়া বিদায় চাহিলেন। রাণী হাসিয়া বলিলেন, "পুটুকে রাজকুমারের সহিত আলাপ করিয়া দিই আর একটু থাক।" এই সময় পরিচারিকা রাজকুমারকে আনিয়া পুটুর সম্মুখে বসাইয়া দিল। উভয়ের একই বয়স, দেখিতে প্রায় একই রূপ। রাজকুমার কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল মাত্র। পুটু তখন মৃত্তিকায় বসিয়া অন্যমনস্কে স্বর্ণমুদ্রা লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। রাণী যখন প্রথমে পুটুকে ক্রোড়ে লইয়াছিলেন স্বর্ণমুদ্রা কয়েকটি তখন তাহার হস্তে দিয়াছিলেন। জনৈক দাসী তাহা পুটুর হস্ত হইতে লইয়া আপনার নিকটে রাখিয়াছিল এক্ষণে বিদায়ের সময় উপস্থিত দেখিয়া স্বর্ণমুদ্রা গুলি আবার পুটুর হস্তে দিয়াছিল, পুটু তাহা লইয়া আপন মনে খেলা করিতেছিল। রাজকুমারকে পুটুব সম্মুখে বসাইয়া দিলে পুটু ক্রীড়া ত্যাগ করিয়া রাজকুমারকে দেখিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র হস্তটী রাজকুমারের অঙ্গে দিল সভয়ে হাত আবার সরাইয়া সকলের দিকে চাহিতে লাগিল। রাজকুমার কাঁদিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ পুটু একটী স্বর্ণমুদ্রা তুলিয়া "ন্যা ন্যা" বলিয়া রাজকুমারের সম্মুখে ধরিল। রাজকুমার প্রথমে শান্ত হইয়া পুটুর হস্তস্থিত স্বর্ণমুদ্রার প্রতি চাহিল পরে পুটুর হাত হইতে তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার ক্রন্দন আরম্ভ করিল। রাণী বলিলেন, "ও পোড়া কপাল।" একজন সখী রাজকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিল।

পুটুর মা রাণীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। বিদায় দিবার সময় রাণী আর কোন কথা কহিলেন না কেবল মাত্র একজনকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন। সঙ্গিনী পুটুকে ক্রোড়ে লইয়া পাল্কীতে দিয়া আসিল। পাল্কীতে প্রবেশ করিবার সময় পুটুর মা সঙ্গিনীর দুটি হস্তধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "রাজ্যেশ্বরী কি আমার উপর রাগ করিলেন?" সঙ্গিনী হাসিয়া বলিল, "সে কি কথা?" বাহকগণ আসিয়া পাল্কী তুলিল।

রাণী শয়নঘরে প্রবেশ করিলেন, একবার দুই একখানি চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আর এক কক্ষে যাইয়া রাজকুমারকে আনিতে বলিলেন। সখী রাজকুমারকে তথায় উপস্থিত করিলে রাণী ইঙ্গিত দ্বারা ক্রোড়ে দিতে বলিলেন।

সখী রাজকুমারকে রাণীর ক্রোড়ে দিয়া আপনি পার্শ্বে বসিল। রাণী সন্তানকে বুকে করিলেন, মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "আমার সোণার চাঁদ।" সখী তখন প্রফুল্লিত অন্তঃকরণে রাজকুমারের শত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাণী অবাধে তাহা শুনিতে লাগিলেন।

যে সঙ্গিনী পুটুকে ক্রোড়ে লইয়া পাল্কীতে দিতে গিয়াছিল সে ধীরে ধীরে অন্য এক মহলে প্রবেশ করিল। রাজার কনিষ্ঠা ভগিনী, বিধবা, নিঃসন্তান, তথায় বাস করেন। মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনমত রাণীর অন্তঃপুরে আসিয়া থাকেন নতুবা রাজভগিনী নিয়ত পূজা অর্চ্চনায় সময় অতিবাহিত করেন। তাঁহার পরিচারিকারা সকলেই বিধবা, বৃদ্ধা, অধিকাংশ ব্রাহ্মণকন্যা। একজন তাহার মধ্যে পঞ্জিকা দেখিতে এবং গ্রন্থপাঠ করিতে পারিত। সেই ব্রাহ্মণী প্রত্যহ অপরাহ্নে রাজ-ভগিনীকে কালীকীর্ত্তন শুনাইত।

রাণীর সঙ্গিনী যখন প্রবেশ করিল তখন কীর্ত্তন পাঠ সমাধা হইয়াছে, সকলে তুলা চরকা তুলিতেছে। নিত্য ব্রাহ্মণপরিচারিকারা অপরাহ্নে সূতা কাটে বা পৈতা তোলে। রাজভগিনীর ব্রতে পৈতা সর্ব্বদাই প্রয়োজন হয়।

সঙ্গিনীকে দেখিয়া রাজভগিনী বলিলেন "আসিয়াছ ভাল হইয়াছে, আমি রাজার জন্য স্বহস্তে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়াছি।" এই বলিয়া তাহাকে কক্ষা-ন্তরে লইয়া গেলেন। রৌপ্যপাত্রে করিয়া দুই তিন প্রকার মিষ্টান্ন দিলেন। সঙ্গিনী তাহা হস্তে লইয়া বলিল, একটা কথা বলিতে আসিয়াছিলাম।

রাজ, ভ। কি?

সঙ্গিনী। আজ সেই মেয়ে দেখিলাম।

রাজ, ভ। কোন্ মেয়ে?

সঙ্গিনী। আপনি সকল ভুলে গেছেন?

রাজ, ভ। আমার ত কই কিছুই মনে হয় না।

সঙ্গিনী। সেই হতভাগিনী।

রাজ, ভ। কোন্ হতভাগিনী?

সঙ্গিনী। আপনি কি সেই বিপদের রাত্র ভুলিয়া গিয়াছেন?

রাজ, ভ। এখন বুঝিলাম। কোথায় দেখিলে?

সঙ্গিনী। এই রাজবাটীতে, এই মাত্র।

রাজ, ভ। সে কি? কে আনিল? চল আমি দেখি গে।

সঙ্গিনী। এক্ষণে আর দেখিতে পাইবেন না, তারে লয়ে গিয়াছে।

রাজ, ভ। আহা! আমি দেখিতে পেলেম না। কে আনিয়াছিল?

সঙ্গিনী। তার মা।

রাজ, ভ। রাণী কি বলিলেন?

সঙ্গিনী। দরিদ্রের কন্যা বলিয়া কয়েকখান মোহর দিলেন। মেয়েটিকে রাজা বড় ভালবেসেছেন। আপনি কোলে নিলেন মুখে চুমা খেলেন।

রাজভগিনী চক্ষের জল মুছিয়া অন্যমনস্কে বসিয়া রহিলেন। সঙ্গিনী চলিয়া গেল।

পার্সিদের মূল ধর্ম্মগ্রন্থের নাম 'জেন্দ অবস্থা।' এই প্রাচীন গ্রন্থের ভাষা অর্থ বিধি ব্যবস্থা লইয়া পাশ্চাত্য কতকগুলি পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর বিচার চলিতেছে। কয়েক বৎসর মধ্যে ফরাসিস, জারমন, দিনামার ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ হইয়া গিয়াছে। এক সময় আমাদের সংস্কৃত ভাষায়ও ইহার অনুবাদ হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে আমাদের বাঙ্গালীর মধ্যে দুই চারি জন ভিন্ন বোধ হয় আর কেহই জেন্দ অবস্থার নামও শুনেন নাই।

গ্রন্থখানি জেন্দ ভাষায় লিখিত। বহুকাল পূর্ব্বে পারস্য রাজ্যে এই ভাষা প্রচলিত ছিল উইলিয়ম আস্কিন সাহেব বিবেচনা করেন যে জেন্দ ভাষা সংস্কৃতের অপভ্রংশ মাত্র। বিখ্যাত দিনামার পণ্ডিত রাস্ক সাহেব সে মতের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন যে, জেন্দ ভাষা কোন ভাষারই অপভ্রংশ নহে, স্বয়ং স্বতন্ত্র ভাষা। মক্ষমূলরেরও সেই মত; তবে তিনি এই বলেন যে অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতের সহিত জেন্দ ভাষার কিঞ্চিৎ নিকট সম্বন্ধ আছে, এমন কি জেন্দভাষায় এরূপ অনেক কথা পাওয়া যায় যে, তাহার দুই একটি বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে সংস্কৃত হয়, যথা—"অহুর" হপ্তহিন্দু" ইহার হ স্থলে স করিলে অসুর ও সপ্তসিন্ধু হয়। এইরূপ অনেক কথা পাওয়া যায়।

জেন্দভাষা হইতে এখনকার পারস্য ভাষার উৎপত্তি। এইজন্য জেন্দভাষার কোন কোন শব্দ পারস্য ভাষায়ও পাওয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃতের সহিত জেন্দ ভাষার সমসাদৃশ্য অধিক। মক্ষমূলর বলিয়াছেন যে যাঁহারা জেন্দভাষা ব্যবহার করিতেন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ভারতবর্ষে বাস করিতেন। তাহা হইলে সংস্কৃত ভাষা হইতে জেন্দভাষার উৎপত্তি এরূপ অনুভব করা নিতান্ত অন্যায় নহে। কথিত আছে যে পূর্ব্বে যজাতি রাজার এক পুত্র পিতৃকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে তিনি বহু লোক সমভিব্যাহারে সপ্তসিন্ধু অতিক্রম করিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করেন, তাঁহা হইতেই যবনের উৎপত্তি। এইটি স্মরণ রাখিলে কতক বুঝা যায় যে, বৃত্রাসুর বধ বা তদ্বৎ সংস্কৃত গ্রন্থমূলক কথা কেন জেন্দ অবস্থায় পাওয়া যায়।

জেন্দভাষা আর এক্ষণে প্রচলিত নাই। দুই সহস্র বৎসরের বরং অধিক হইবে এই ভাষা পৃথিবী হইতে একেবারে লোপ পাইয়াছে। এ ভাষার আর উপদেষ্টা নাই এক্ষণে শিখিতে হইলে কতক আপনা আপনি শিখিতে হয়। গ্রীক্ বলুন সংস্কৃত বলুন ইহার মধ্যে কোন ভাষাই আর প্রচলিত নাই কিন্তু তাহা বলিয়া এ সকল ভাষার লোপ হয় নাই, ইহাদের অধ্যয়ন অধ্যাপন চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু জেন্দভাষার অধ্যয়নও নাই অধ্যাপনাও নাই। কাজেই এই ভাষা এক্ষণে বুঝিবার উপায় গিয়াছে। বিলাতে যে কয়েকজন পণ্ডিত দৃঢ়সংকল্প হইয়া জেন্দ অবস্থার উদ্ধারসাধন করিতেছেন তাঁহারা যে কি প্রকারে এই ভাষা শিখিয়াছেন তাহার পরিচয় অতি বাহুল্য। এখানে এই পর্য্যন্ত বলা আবশ্যক যে তাঁহারা এ ভাষায় সম্পূর্ণ অধিকারী হয়েন নাই। তাঁহারা যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশ স্থলে ভুল আছে। আপনারাও তাহা জানেন। ক্রমে সে ভুল সংশোধনের চেষ্টা করিতেছেন।

বিলাতীয় পণ্ডিতসম্বন্ধে এইরূপ। কিন্তু জেন্দ অবস্থা যাঁহাদর মূল ধর্ম্ম-গ্রন্থ তাঁহাদের সম্বন্ধে আর একরূপ। তাঁহারা কেহই ইহার ভাষা বুঝেন না, বুঝিতে বা শিখিতে চেষ্টাও করে না। অথচ ভক্তিভাবে গ্রন্থখানি পুরুষানুক্রমে রক্ষা করিতেছেন। ধর্ম্মযাজকেরা এই গ্রন্থের দোহাই দিয়া ধর্ম্মযাজন করেন। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা দিতে হইলে বা কোন তর্ক করিতে হইলে জেন্দ অবস্থার মুণ্ডপাত করেন, তাঁহাদের পরস্পর সকলের যুক্তি, সকলের ব্যবস্থা, সমুদয় জেন্দ অবস্থায় আছে বলেন অথচ কেহ জেন্দ অবস্থা পাঠ করেন নাই, তাহার ভাষাও কেহ জানেন না। আমাদের বাঙ্গলায় ধর্ম্মযাজকমধ্যেও এইরূপ। কেহই বেদ পাঠ করেন নাই, বেদে কি আছে তাহা একেবারে জানেন না, অথচ তাঁহারা বেদের ব্যবস্থা দেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন দশমীর দিন তুলসী তলায় দশবার গোময় লেপন করিতে হইবে। জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন বেদে ইহার স্পষ্ট বিধান আছে।

বম্বের পার্সিরা জেন্দ অবস্থায় লিখিত বিষয় কিছুই অবগত নহেন অথচ সেই গ্রন্থোক্ত ধর্ম্ম অনুসরণ করেন বলিয়া তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তিন চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থোক্ত স্তব অভ্যাস করা রীতি ছিল। পিতা পুত্রকে শিখাইতেন, পুত্র আবার পৌত্রকে শিখাইতেন। এইরূপ পুরুষপরম্পরা স্তবগুলি মুখস্থ থাকিত, স্তব সম্বন্ধে আর গ্রন্থপাঠের প্রয়োজন হইত না। সেই প্রথা পার্সিদের মধ্যে অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। ভাষা লোপ পাইয়াছে কিন্তু সে ভাষার স্তবগুলি আছে। কি বড় কি ছোট সকলেই দিনে রাত্রে ষোলবার জেন্দ ভাষার স্তব পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু মাথা মুণ্ড কি পাঠ করেন তাহার

অর্থ তাঁহারা আপনারাও বুঝেন না তাঁহাদের দেবতারাও বুঝেন না। এইরূপ না বুঝায় এক মহৎ লাভ আছে। ধর্ম্মগ্রন্থ না বুঝিলে ধর্ম্ম টেকসই হয়। পার্সি-ধর্ম্ম যে এতকাল চলিয়া আসিতেছে তাহার এই বিশেষ কারণ। যে অবধি বাইবেল চলিতভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে সেই অবধি খ্রীষ্টানধর্ম্ম দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণের মূর্খতা পারত্রিক ধর্ম্মের জীবন স্বরূপ। ধর্ম্মগ্রন্থের দুর্জ্ঞেয়তা সেই ধর্ম্মের পরমায়ু স্বরূপ।

আমাদের হিন্দুধর্ম্ম যে এতকাল চলিয়া আসিতেছে তাহারও প্রতি সেই কারণ। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে অধিকাংশ লোকের প্রতি নিষেধ ছিল। কাজেই সাধারণও সকলেই অন্ধের ন্যায় ধর্ম্মপথে চলিত। অন্ধের আর যতই দোষ থাক পথদর্শকের বড় আজ্ঞাকারী। ধর্ম্মযাজক বলিলেন এইদিকে জল ছিটাও ধর্ম্ম-ভীতেরা জল ছিটাইলেন। মনে করিলেন শাস্ত্রে ইহার বিশেষ তাৎপর্য্য লিখিত আছে। ধর্ম্মযাজক বলিলেন অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা কর্ণমূল ঘর্ষণ কর অন্ধাত্মারা তৎক্ষণাৎ তাহা করিল, কোন ওজর নাই। উত্তর কি পূর্ব্বদিকে জল ছিটাইলে পরকালের কি উপকার হইবে তাহা তাহাদের জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই। জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও নাই, যখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিধি দিতেছেন তখন অবশ্য তাহা শাস্ত্রে আছে। শাস্ত্র দেবপ্রণীত; সংস্কৃত দেববাক্য। মন্ত্রের মহাশক্তি; ভূত ছাড়ে, বিষ উড়ে, গাছ পড়ে। মারণ, বশীকরণ, উচাটন সকলই মন্ত্রবলে। মন্ত্রে দেবতা বশ হয়, পরকালও আয়ত্তের মধ্যে আসিবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু আমাদের মধ্যে এক্ষণে যাঁহারা ভক্তিভাবে ত্রিসন্ধ্যা করেন তাঁহাদের যদি বাঙ্গালা ভাষায় সন্ধ্যা করিতে বলা যায় বোধ হয় অধিকাংশই একেবারে সন্ধ্যা ত্যাগ করিবেন। অনেকেই বলিবেন বাঙ্গালায় সন্ধ্যা করিলে কোন ফল হইবে না। সংস্কৃত দেববাক্য, বাঙ্গালা নর বাক্য। দেবতাদিগের নিকট নরবাক্যে কোন ফল হয় না। বাস্তবিক তাহা না হইতে পারে, কেন না আমরা ভাল লোকের মুখে শুনিয়াছি অনেক দেবতা বাঙ্গালা ভাষা একেবারে বুঝিতে পারে না। তাঁহাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় নাই কাজেই মাতৃভাষা (সংস্কৃত) ভিন্ন আর কোন ভাষা তাঁহাদের শিক্ষা বা অধিকার হয় না।

মূল কথা বাঙ্গালা ভাষায় সন্ধ্যা অনুবাদিত হইলে সন্ধ্যার প্রতি লোকের আর শ্রদ্ধা থাকিবে না। অনুবাদ যতই মূলানুরূপ হউক যতই সুন্দর হউক তাহাতে শ্রদ্ধার হ্রাস হইবে। অর্থ না বুঝাই শ্রদ্ধার প্রতি কারণ, বাঙ্গালায় সন্ধ্যা সকলে বুঝিবে কাজেই গোদাবরী আমায় শুদ্ধ কর নর্ম্মদা আমায় শুদ্ধ কর, এ সকল উক্তি ফলদায়ক বলিয়া আর কাহার বোধ হইবে

না। সন্ধ্যার অর্থ যতদিন সংস্কৃত ভাষায় গোপন আছে ততদিন তাহার মহিমা অপ্রতিহত চলিয়া আসিতেছে। পার্সি ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছে। জেন্দ অবস্থা পার্সিরা কেহ বুঝেন না তাহাই তাঁহাদের নিকট জেন্দ অবস্থার এত গৌরব।

জেন্দ অবস্থার মূল প্রণেতার নাম জরতুষ্ট্র অথবা জরোস্তর। ইদানীং কেহ কেহ তাহাকে জরদোস্ত বলেন। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা প্রথমে সহস্রাধিক বৎসরের মধ্যে লিখিত হয় নাই। স্মৃতিরূপে শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা চলিয়া আসিয়াছিল পার্সিদের মধ্যে যে জেন্দ অবস্থা প্রচলিত আছে তাহা মক্ষমূলার বলেন প্রায় সতের শত বৎসর হইল লিখিত হইয়াছিল। জরতুষ্ট্র নিজে সমুদয় জেন্দ অবস্থা রচনা করেন নাই কতক তিনি করিয়াছিলেন বাকী তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা করিয়াছিল। পুরাতন গ্রন্থ মাত্রেই এইরূপ হইয়া থাকে।

ধর্ম্মপ্রচারকগণ বলিয়া থাকেন যে ঈশ্বরের আদেশমত ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিত হয় তিনি নিজে কোন কথার উপদেশ দেন না আর একজন তাহার মধ্যবর্ত্তী থাকে। ঈশ্বরের আদেশ মতে মহাম্মদ কোরান সরিফ প্রচার করেন সে স্থলে মধ্যবর্ত্তী গেবৃল ছিলেন। গেবৃল আসিয়া মহম্মদের কর্ণে ঈশ্বর আদেশ জানাইয়া যাইতেন মহম্মদ তাহা চেলাদের নিকট প্রকাশ করিতেন। চেলারা তাহাই অভ্যাস করিত। জেন্দ অবস্থায় সেই প্রথা অবলম্বন করার কথা আছে। জরতুষ্ট্র ঈশ্বরবাক্য অর্ম্মজের নিকট শুনিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। অর্ম্মজ আমাদের ব্রহ্মার ন্যায় সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই প্রথমে অরণ্যবীজ নামে দেশ সৃষ্টি করেন তথায় জরতুষ্ট্রের জন্ম হয়। অরণ্যবীজ কেহ বলেন আর্য্যবীজ। অরণ্যবীজ শব্দ ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে নিতান্ত অপরিচিত নহে। অদ্যাপি বাঙ্গালার বৃদ্ধারা রাজা রাণীর গল্পে বনের বর্ণনা করিতে হইলে অরণ্যবীজের উল্লেখ করিয়া থাকে। 'অরণ্যবিজুবন' তাঁহারা বলিয়া থাকেন।

জেন্দ অবস্থার মতে পৃথিবী সৃষ্টি করিতে একবৎসর লাগিয়াছিল। পৃথিবীর পরমায়ু দ্বাদশ সহস্র বৎসর। এই বার হাজার বৎসর চার যুগে বিভক্ত। প্রত্যেক যুগ তিন হাজার বৎসর করিয়া স্থিতি। প্রথম তিন হাজার বৎসর পৃথিবীর সৃষ্টি ও উন্নতি। দ্বিতীয় যুগে আদি মনুষ্যের নির্ব্বিঘ্নে জীবন যাপন, অপ্রতিহত সুখ। তৃতীয় যুগে দুঃখের আগমন সুখ দুঃখের যুদ্ধ। এক্ষণে সেই যুগ চলিতেছে। চতুর্থ যুগে দুঃখের পতন ও সুখের রাজ্য।

ক্রমশঃ।

ষষ্ঠ বর্ষ : একাদশ সংখ্যা

বাঙ্গালি মাত্রেই বাঙ্গালার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। কতকগুলি নৈসর্গিক কারণ বঙ্গোন্নতির প্রতিকূল আছে। সেই সকল কারণের সমালোচনা প্রায় কেহই করেন না। ঈদৃশ সমালোচনা এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

একজন মুসলমান্ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "বঙ্গভূমির উর্ব্বরতা দেখিলে বাঙ্গালাকে পার্থিব নন্দনকানন (বেহেস্তই আলম্) বলা যাইতে পারে, কিন্তু তথাকার জল ও বায়ু এমন দূষ্য, যে সে দেশকে নরকের প্রান্তভূমি বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"

প্রথম পরিচ্ছেদ

উর্ব্বরতা ও পৌরুষ

ভূমির উর্ব্বরতা যে মহামঙ্গলময়ী ইহা বলা বাহুল্য। বুভুক্ষার ন্যায় মনুষ্যের কোন প্রবৃত্তি বলবতী নহে। সংসারে প্রায় সকলেই আহারের সংস্থান জন্য প্রত্যহই ব্যস্ত; অতএব ভূমির যে গুণে আহার্য্যের উৎপত্তি হয়, সেই গুণের কীর্ত্তন জন্য মসিব্যয় করায় প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে অনাবৃষ্টি-জাত দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর মৃত্যু হইয়াছে। উর্ব্বরতা গুণে বহুকাল বাঙ্গালার সে দুর্দ্দশা ঘটে নাই।

উর্ব্বরতা মহোপকারসাধিনী হইয়াও নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গলের কারণ নহে। যাহারা স্বল্পায়াসলব্ধ ভক্ষ্য পাইয়া সন্তুষ্ট হয়, তাহারা প্রায় শ্রমশীল হয় না। শ্রমাভাবে পৌরুষের হানি হয়। উর্ব্বরা দেশবাসীরা প্রায় কোথাও পৌরুষ জন্য বিখ্যাত নহে। বাঙ্গালিদের পৌরুষের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই।

গত বারশত বৎসরের ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করিলে আসিয়ার অধিবাসী-দের মধ্যে আরবীয়েরা বলবিক্রমে সর্ব্বপ্রধান, এবং তাতারগণ প্রায় আরবীয়দের

সদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ইউরোপীয়েরা এক্ষণে আসিয়াবাসীদিগকে মনুষ্য বলিয়াই গ্রাহ্য করেন না। তাঁহাদের একবার স্মরণ করা উচিত যে আরবীয়েরা ইউরোপে স্পেন, সিসিলি, ও ফ্রান্সের দক্ষিণভাগ জয় করিয়াছিল এবং কনস্তন্‌তনিয়ার ইউরোপীয় সম্রাটকে করদ রাজার শ্রেণীতে অবনত করিয়াছিল।*

এই আরবীয়দেশ মরুভূমি। মাঞ্চু তাতারগণ চীন জয় করে; বর্ত্তমান চীনের সম্রাট তাতার বংশোদ্ভব। তুর্কোমান তাতারগণ ইউরোপে ইউনান সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছে। রুশ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্লেব্‌নার সমরক্ষেত্রে পৌরুষের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছে। রোম সাম্রাজ্যের যত বর্ব্বর অরি ছিল, হুনতাতারদের অধিরাজ আতিলা তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, ১৪০০ বৎসর হইল ইহার নামে পৃথিবী কাঁপিত।

মোগল তাতারগণ ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিল। এই সমস্ত তাতারদের আদিনিবাস মরুভূমি।

বস্তুতঃ এবিষয়ের প্রতিপাদন জন্য অধিক দূর দৃষ্টি করার প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষে বীরপ্রসূতি রাজস্থানকে প্রাচীনগণ ইরিনদেশ অর্থাৎ মরুভূমি বলিতেন।† শত শত সমরক্ষেত্রে রাজপুতগণ পরিচয় দিয়াছে যে, তাহারা প্রাণাপেক্ষা মানের অধিকতর গৌরব করে। চিতোর দুর্গের রক্ষকগণ যাদৃশ স্বাধীনতানুরাগ ও আত্মবিসর্জ্জনের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, এমন কোন পাষণ্ড নাই যে, সে কথা স্মরণ করিয়া চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারে। এই ভারতবর্ষ যে অর্জ্জুনের জন্মভূমি ছিল, ইহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে সে কথায় শীঘ্র বিশ্বাস হয় না। তবে রাজপুত ও শিখদের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে মনোমধ্যে এবিষয়ে কতকটা প্রতীতি জন্মে! রাজপুতগণের যেরূপ পৌরুষ যদি সেরূপ রণকৌশল ও একতা থাকিত—জয়পুর, যোধপুর ও উদয়পুরের প্রতি তাহাদের যাদৃশ অনুরাগ, ভারতের প্রতি যদি তাদৃশ অনুরাগ থাকিত, তাহা হইলে ভারতে যবনাধিকার হইত কি না সন্দেহ। এই রাজপুতদের দেশের ভূমি বালুকাপ্রধান। তাহাতে বার্ব্বরবৃক্ষ যত জন্মে, শস্য তত জন্মে না।

---

* সম্রাট্ নিকেফরুস করদান বন্ধ করিবেন বলিয়া খলিফা হারুণরসিদকে পত্র লেখায়, খলিফা এই উত্তর পাঠাইয়াছিলেন, 'কুকুরীপুত্র কাফের, তোমার পত্রের উত্তর পড়িতে হইবে না, দেখিতে পাইবে।' সম্রাট্ যখন দেখিলেন আরবসেনা অগ্নি ও তরবার দ্বারায় ইউনান সাম্রাজ্য নষ্ট করিতেছে, তখন কৃতাঞ্জলি হইয়া খলিফাকে পুনর্ব্বার কর দিলেন।

† মারবার শব্দ মরু হইতে উৎপন্ন। মরু মারবার প্রদেশের পূর্ব্ব নাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অধিত্যকাবাস ও পৌরুষ

মহাকবি মিল্টন গাইয়াছেন—

'মহীধর-অধিষ্ঠাত্রী, স্বাধীনতা দেবী।'*

বাঙ্গালা যদি পার্ব্বত্যদেশ হইত, তাহা হইলে বাঙ্গালিদের পৌরুষ, নেপালের গোরক্ষদের ন্যায় না হউক, অন্ততঃ কাশ্মীরীদের ন্যায় হইতে পারিত।

যদি আফ্‌গানস্থান পার্ব্বত্য দেশ না হইত তাহা হইলে পঞ্জাব জয় পরেই ঐ দেশ ইংরেজাধিকৃত হইত সন্দেহ নাই।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে যে যুদ্ধারম্ভ হয়, সে যুদ্ধে আফ্‌গানস্থানের উপত্যকা প্রদেশ ব্রিটিস সেনা অনায়াসে জয় করিয়াছিল; অধিত্যকা জয় অতি দুরূহ ব্যাপার। যদি অমাদের রাজপুরুষগণ ভারতের ন্যায় আফ্‌গানস্থান অধিকৃত করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইতেন না এমন কথা বলা যাইতে পারে না; কিন্তু আফ্‌গানদের এরূপ পৌরুষ ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা যে অর্থব্যয়ে আমাদের রাজকোষ শূন্যপ্রায় হইত এবং ভারতসৈনিকদের রক্তে অধিকৃত দেশ প্লাবিত হইত। নেপাল পার্ব্বত্যদেশ বলিয়াই নেপালরাজের পদ মহারাজা সিন্ধিয়া ও মহারাজা হোল্‌কারের পদাপেক্ষা উন্নত।

নেপালে ইংরেজ রেসিডেণ্ট আছেন। ভোটে তাহাও নাই। ভোটরাজ সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন। ভোট পার্ব্বত্যদেশ না হইলে এই স্বাধীনতা কোন্ কালে অন্তর্হিত হইত। কেহ কেহ এই আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন, 'পার্ব্বত্যদেশে বাসের সহিত পৌরুষের কি সম্বন্ধ? পার্ব্বত্যদেশ একটি বৃহৎ দুর্গস্বরূপ; সেই দুর্গই স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে; পৌরুষের কি কার্য্য?

ইহার উত্তর এই যে অধিত্যকাবাস পৌরুষবর্দ্ধন ও পৌরুষসহায়। পৌরুষ ব্যতীত কেবল দুর্গবলে স্বাধীনতার রক্ষা হয় না। বস্তুতঃ পৌরুষ হইতে যেমন বুদ্ধিবলও অস্ত্রবল বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, তেমন দুর্গবলেরও বিচ্ছেদ হইতে পারে না। মনুষ্যের যদি কেবল প্রকৃতিদত্ত নখ ও দন্তের উপর নির্ভর করিতে হইত, তাহা হইলে মনুষ্যের ন্যায় দুর্ব্বল জীব অতি বিরল; এতদিন সিংহ ও ব্যাঘ্রে মানবকুল ধ্বংস করিয়া ফেলিত। বীরেন্দ্র অর্জ্জুনের যদি গাণ্ডীব না থাকিত, যদি তিনি নিরস্ত্র হইতেন, তাহা হইলে একজন সাধারণ অস্ত্রধারী কৌরবসৈনিক

* "The mountain-nymph, sweet Liberty."

তাঁহাকে নষ্ট করিতে পারিত। তাহা হইলে ব্যাসদেবকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের পৌরুষ-গুণকীর্ত্তন হইত না। জর্ম্মণ ও ইংরেজ জাতির যদি উৎকৃষ্ট আগ্নেয় অস্ত্র—ক্রুপ্-গণ, আরমষ্ট্রংগণ, নীডলগণ, হেনরিমাটিনী রাইফল—না থাকিত, যদি তাঁহাদের উত্তমরূপে রণকৌশল শিক্ষা না হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের পৌরুষের খ্যাতি কে শুনিত? যদি অস্ত্রের সাহায্য লইলে পৌরুষের হানি না হয়, পর্ব্বতরূপ দুর্গ সাহায্য লইলে, পৌরুষহানি কেন স্বীকার করিব?

পার্ব্বত্যদেশে অধিক পরিশ্রম না করিলে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। শারীরিক পরিশ্রম যে পৌরুষবর্দ্ধক তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, বাঙ্গালা পার্ব্বত্যদেশ হইলে, বাঙ্গালিদের কাপুরুষ বলিয়া কলঙ্ক হইত না।

ক্রমশঃ

তা, প্র, চ।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

ডাকাতি

কেহ জাগ্রত হইতে না হইতেই অমরেন্দ্রনাথ অদৃশ্য হইলেন। এখন চারিদিকে ডাকাতির গোল উঠিয়াছে, এই মাত্র জ্যোৎস্না অস্তমিত হইয়াছে, জগৎ শুদ্ধ তমোময়, সেই তমোরাশি ভেদ করিয়া এক একটী বিজাতীয় শব্দ শুনা যাইতেছে "নিলে রে" "গেল রে" "মেলে রে" প্রভৃতি বাক্যগুলির মধ্যে মধ্যে হুঙ্কারমিশ্রিত ঘন ঘন শব্দ শুনা যাইতেছে। শ্রীনগর গ্রামবাসীরা সকলেই উঠিয়াছে, দরিদ্রজন আসিয়া পথে দাঁড়াইয়াছে, ধনিগণ আপন আপন কপাটে দৃঢ় অর্গল বন্ধ করিয়া ছাদে উঠিয়া এক একটি বন্দুক ছাড়িতেছেন। কেহ কহিতেছেন, "এইপথ দিয়া দুই জন লাঠিয়াল সড়্কি হস্তে দৌড়িয়া গেল," কেহ কহিতেছেন, "আজ সন্ধ্যাবেলা ভয়ানক দেখিয়াছিলাম।" দাসীরা বলাবলি করিতেছে, "আজ ঘাটের নিকট তেঁতুল তলায় দুই জন পাগড়ীওয়ালা দেখিয়াছিলাম, তারাই হবে।" আর একটি বৃদ্ধা কহিতেছে, "চুপ কর তাদের নামে আর কাজ নাই।" আমাদের ভোলা সিং দ্বারবানের এমন সময় দেখা নাই; সেই কহিত, "যব শুগুরা আওয়ে ত ভোলা ভাগে।" সেই কথা প্রসমাণ জন্য সে কোন নিবিড় বৃক্ষশাখায় গা আড়াল দিয়াছে। ফলতঃ ডাকাতি যে কোন্ গ্রামে কোথায় হইতেছে এ পর্য্যন্ত তাহার নিশ্চয় সংবাদ আইসে নাই। গঙ্গাধর জাগ্রত হইবামাত্র শুনিলেন যে গ্রামের বারইয়ারি তলায় তামুলিদের ঘরে ডাকাত পড়িয়াছে, বারইয়ারি তলা আমাদের বাটীর নিকট, ডাকাতি দেখিতে হইবে বলিয়া মল্লবেশে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে বুড়ি দাই মা কান্দিয়া জড়াইয়া ধরিল, ফলতঃ তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। অমরেন্দ্রনাথ ঐ বিষয়ের গল্পচ্ছলে বারম্বার যাহা কহিয়াছেন, তাহা আমি শুনিয়াছি।

যে সময় গ্রামে গোলযোগ হইতেছে, বাবুদের ফটকে ঢং ঢং করিয়া বারটা বাজিল ও তারপর পাহারাদার ঘন ঘন ঘড়িতে মুদগর প্রহারে যেন নিষ্ঠুর নিশার বক্ষে কতকগুলি আঘাত করিল, তাহার গোলে গোল মিশাইল। বোধ হইল যেন ডাকাতগণ আরো নিকটে আসিতেছে। সেই ঘড়ি বাজাইবার সময় অমরেন্দ্রনাথ শ্রীনগর ও শান্তিপুর-মধ্যবর্ত্তী নদীকূলে অশ্বপৃষ্ঠে উপনীত হইয়াছেন। নদীর জল অনেক মরিয়া গিয়াছে, তথাপি গভীর, পারাপার এখনও নৌকাতেই হইয়া থাকে। কিন্তু নৌকা, নাবিক সংগ্রহ করিবার সময় নাই, তিনি অপর কূলে দূরে দেখিতেছেন মসালশ্রেণী দৌড়াদৌড়ি করিতেছে "মার" "কাট" "ধর ধর" শব্দ সঙ্গে কোমলকণ্ঠ নিঃসৃত শব্দ ও ক্রন্দনরোল উঠিয়াছে, অবলাগণ ঘন ঘন আশ্রয় চাহিতেছে কিন্তু কোথায় আশ্রয় পাইবে? দুই পদ অগ্রসর হয় এমন সাধ্য, এমন সাহস কার আছে? অমরেন্দ্রনাথ আরও ব্যগ্র হইলেন। তাঁহার পর মনে হইল, যেন তাঁহার কাদম্বিনী কোন নৃশংস দুর্ব্বৃত্তের হস্তে পতিত হইয়াছেন, যেন তাহারই কাতরোক্তি শুনিতেছেন, বিলম্ব করিবার সময় নাই, অশ্বের রজ্জু ছাড়িয়া দিলেন, অশ্ব জলতরঙ্গে ঝাঁপ দিল। তীববেগে নদী পার হইয়া ঘোটকটী প্রথমে হ্রেষারব করিল, পরে ঘন ঘন গাত্র কাঁপাইয়া জলকণা সমূহ ঝাড়িয়া ফেলিল; আবার কর্ণদ্বয় পতঙ্গাকৃত করিয়া বেগে দৌড়িল। শান্তিপুর গ্রামে প্রবেশ করিবার সময় গোপাল চৌকিদার আপনাপনি বলিতেছে, "হায়! কি হইল, আমি থাকিতে এই গ্রামে এই ঘরে এমন অত্যাচার! লোকে চিরকাল নিমকহারাম বল্‌বে? কি বলিব ঘুমাইয়া ছিলাম, হস্ত পদ বান্ধিয়া খাটিয়া ঢাকা দিয়া দস্যুরা চলিয়া গিয়াছে, দেখি একবার দড়ি ছিঁড়িতে পারি কি না। পারি না। অতিদৃঢ় বন্ধন জোর দিতে বাগ পাইতেছি না, কেহ কি এসময় এ বন্ধন মুক্ত করে না?"• অমরেন্দ্র নাথ কাতরোক্তি শুনিবামাত্র গোপালের নিকট উপস্থিত হইয়া একটী ছুরিকাতে তাহার বন্ধনগুলি কাটিয়া দিলেন, ঘোড়াটি সেই খানেই রাখিতে কহিলেন, ও স্বয়ং পদব্রজে সিংহ বাবুদের গৃহাভিমুখে গেলেন। প্রথমতঃ বাটীর পশ্চিম পার্শ্বে উপনীত হইলেন; এখানে ডাকাতের ঘাটি বসিয়াছে, এক একটি মশাল উত্তোলন করিয়া তাহার চারি পার্শ্বে চারটি করিয়া চোয়াড় চতুর্ম্মুখ একস্থানে সংলগ্ন করিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া রহিয়াছে, চতুষ্পার্শ্বে সমভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে। কয়েক জন ভোতা তরোয়াল বা তরবালাকৃতি তালশাখা হস্তে লম্ফ দিয়া ডাকাত খেল খেলিতেছে, হুঙ্কার ছাড়িতেছে। কিন্তু ছাদে চিলা গৃহের পার্শ্বে কারনিসে অমরেন্দ্রনাথ কি দেখিলেন? নীচে মশালের আলো প্রায় সে উচ্চ স্থান স্পর্শ করে নাই, কেবল আভাস মাত্র লাগিয়াছে, তাহাতে দেখিতেছেন, যেন মেঘমালার ছায়াবাজির পুতুল শূন্যে আকাশপথে হেলিতেছে।

কারনিসে পদ স্থাপিত একটি মূর্ত্তির আভাসমাত্র দেখিলেন, কর্ণে যেন তার কি উজ্জ্বল অলঙ্কার দোদুল্যমান রহিয়াছে। সে উচ্চ প্রাসাদ হইতে ছবিটি যেন পড়ি পড়ি করিতেছে। অমরেন্দ্র ব্যাকুলচিত্তে ভাবিলেন "কি হবে? এ কে? আমারই কাদম্বিনী না?" অমরেন্দ্রনাথ মাথার উপর দিয়া দুই হস্ত হইতে দুইটি বন্দুক ছুড়িলেন, শব্দের পর চক্ষু চাহিতে কাহার অবসর না হইতেই ঘাটি পার হইয়া দেউড়ি প্রবেশ করিলেন। বাটীর মধ্যে গিয়া দেখেন সকল দ্বারই মুক্ত, কিন্তু প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে দুই চারিজন অস্ত্রধারী পুরুষ রহিয়াছে পশ্চাতে দেখেন গোপাল চৌকিদার আসিতেছে, সেই পথ দেখাইয়া চলিল, ডাকাইতেরা নির্ভয়। বাহির হইতে কোন আক্রমণের আশঙ্কা নাই। তাঁহাকে দেখিয়া মনে করিল ইনি গৃহবাসী কোন লোক প্রস্থান করিতেছেন। অমরেন্দ্রনাথ সত্বর প্রাসাদের উপর যেখানে আকাশে সেই ছবি দেখিয়াছিলেন, সেইখানেই উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন একটি সাক্ষাৎ কালমূর্ত্তি গদা হস্তে ছাদের উপর দণ্ডায়মান, তাহাব ভয়েই অবলা কাদম্বিনী কারনিসের উপর বসিয়া আছেন, ডাকাইত কহিতেছে, "এই দিকে আইস, না হলে তোমার নাকের ঐ বড় মুক্তাটি ছিঁড়িয়া লইব।" কুমারী কহিতেছেন, 'তুই জানিস আমি তোর দেবী সাক্ষাৎ কালী, আমাকে ছুঁইবার জন্য হাত বাড়াইবি কি এই অবলম্বন ত্যাগ করিয়া ঐ নীচে পোস্তার উপরে ঝাঁপ দিব।" ভাগ্যক্রমে অমরেন্দ্র নাথ সেই সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এক হস্তে পিস্তলের উল্‌টা দিক দিয়া কাল পুরুষের মস্তকে বজ্রপ্রহারে তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া অপর হস্তে সুন্দরীর হস্তদ্বয় দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন। ডাকাতের হস্তদ্বয় হইতে গদকা ও মশাল স্খলিত হইয়া পড়িল। কাদম্বিনী তাঁহার উদ্ধার কর্ত্তাকে—অবলাবান্ধবকে—চিনিয়াছেন, আর ভয় নাই। কারনিস হইতে প্রাসাদে নীত হইলেন—কিন্তু ক্ষণমাত্র মধ্যেই অমরেন্দ্রনাথের কোলে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। নীচ লোকের নিকট আপন শস্ত্র নিপুণতা প্রদর্শন করা অমরেন্দ্র নাথের অভিপ্রায় ছিল না, তাঁহার কাদম্বিনীর উদ্ধার করার একমাত্র উদ্দেশ্য, কাদম্বিনীকে ক্রোড়ে লইয়া গোপালের দর্শিতমত গুপ্ত পথে বাটীর বহির্দ্দেশে জলাশয়ের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। এখন ডাকাতেরা জানে না যে তাহাদের সর্দ্দার ছাদে মৃতপ্রায় শয্যাশায়ী হইয়াছে। তাহারা লুণ্ঠনকার্য্যে ব্যস্ত। এদিকে কাদম্বিনীর অধরে জলসেচন করায় তাহার সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল। অমরেন্দ্রনাথ পুনরায় তাহাকে লইয়া গ্রামের বাহিরে আসিলেন। গোপাল চৌকিদারকে কটু দিব্বি দিয়া কহিলেন, "আমি ইহাকে তর্কালঙ্কারের আশ্রমে লইয়া যাই, তুমি কোন মতে অন্য কাহার নিকট এ ঘটনা ব্যক্ত করিও না।" অমরেন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ পরে

আশ্রমের নিকটবর্ত্তী স্থানে উপনীত হইয়া কাদম্বিনীকে কহিলেন, "ঐ তর্কালঙ্কার-গৃহে যাও, কহিও গুরুদেবই তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। গোপাল চৌকিদার অনেক সাহায্য করিয়াছে, দেখ যেন কোন মতে আমার নাম প্রসঙ্গে প্রকাশ না পায়।" কাদম্বিনী আশ্রমকাননে প্রবেশ করিলেন। অন্ধকার গগন ভেদ করিয়া অমরেন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট মনে আপনার প্রাসাদ লক্ষ্য করিয়া প্রিয় ঘোটককে চালিত করিলেন। তাহার অস্ত্র সকল শোণিত স্পর্শ করে নাই—তরবাল কোষমধ্যেই রহিয়াছে, মনে করিতেছেন, লোকের কি ভ্রম, ডাকাত মারিতে কি বীরত্ব দরকার করে ? তাহারা নৃশংস বিশ্বাসঘাতকী লোক, প্রকৃত সাহসী জনকে তাহারা যম স্বরূপ দেখে।" এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছেন, এমত সময়ে দেখিলেন একটী শ্মশ্রুধারী অশ্বারোহী পুরুষ দল বলে শান্তিপুরাভিমুখে যাইতেছেন। অমরেন্দ্র নাথ একটী জঙ্গলবেষ্টিত বটবৃক্ষপার্শ্বে স্থির ভাবে লুক্কায়িত রহিলেন। তাহাদের কথায় জানিলেন দারোগা সাহেব ডাকাত ধরিতে যাইতেছেন। কিয়ৎ-কাল পরেই পাটনির নাম ধরিয়া হাঁক পড়িল। কারণ পাটনি না আসিলে পুলিসের বীরগণের নদীপার হইবার উপায় কি ? অমরেন্দ্র এই ভাবিয়া মনে মনে হাসিতে হাসিতে চলিতেছেন, এমন সময় আবার ঘড়ি বাজিয়া উঠিল, তিনি জানিতে পারিলেন যে, আবাব ঘরে আসিলেন, আবার রোগীর বেশে শয্যাশায়ী হইতে হইবে।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দারগার চালাকি

বীরপুরুষ দারগার নদীপার হইতে একঘণ্টা মাত্র দেরি হইল। তিনি ওজোগুণশালী কর্ম্মণ্য কর্ম্মচারী, অপর লোক হইলে হয়ত পার হইতে প্রভা-তের তারা এখানেই উদয় হইত। পাঠক হাসিবেন না, এই চালাকিতে গোলাম রহমান "ভেরি গুড" অর্থাৎ প্রথম বর্গভুক্ত হইয়াছেন—ঢাল, ক্রিচ পুরস্কার পাইয়া-ছেন, কবে ফৌজদার হইয়া পড়িবেন। আবার লোকে বলাবলি করে আস্‌ছে দরবারে "খাঁ বাহাদুর" উপাধিও পাইবেন। যাহা হউক দারগা সাহেব ওকু-স্থলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই "জাল গুড়াইয়া" ডাকাতগণ "চম্পট" দিয়াছে—গোপাল চৌকি-দার আবার হাত পায়ে দড়ি বান্ধাইয়া কাঁদিতেছে, বান্ধা লোককে মারা বড় সহজ, দারগা সাহেব স্বয়ং গোপালকে দুই একটি প্রহার করিলেন—গোপাল কহিল "ক্ষমা করুন, মাল, চোর সব হস্তগত করিব। এই যে বান্ধা দেখিতেছেন এ

কৌশলের কর্ম্ম, আমি খাটিয়াতে ঘুমাইতেছিলাম, প্রথমে দস্যুগণ বান্ধিয়া গিয়াছিল, পুনরায় এই পথে পলাইবার সময়ও আমাকে বান্ধা দেখিয়া গিয়াছে, মধ্যে যে আমি তাহাদের সর্দ্দারকে ছাদের উপর খুন করে রেখে এসেছি তা জানে না— এই 'বমাল' দেখুন—"—এই কথা বলিয়াই গোপাল একটী বহুমূল্য অলঙ্কার দেখাইল—তার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধনমুক্ত হইল। এখনও নিশাকাশ ঘোর রহিয়াছে, অমনি দারগা দলবলসহ বাবু শিবসহায় সিংহের গৃহাভিমুখে চলিলেন, দুইজন বিশ্বস্ত পদাতিক সহিত দারগা সাহেব গৃহের সমস্ত স্থান পরিদর্শন করিলেন। গৃহের আকারটি ভয়ানক। সকল কপাটই খোলা "খাই খাই" করিতেছে। গৃহবাসিগণ অপরগৃহে আশ্রয় লইয়াছে। দারগার আগমন সম্বাদে এক একজন হস্তপদভগ্ন বা অগ্নিদাহিত অঙ্গ ভৃত্য আসিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিল ; কারও পৃষ্ঠে খোঁচার দাগ, কার মস্তক-ত্বক্ ভোতা তলবারে কর্ত্তিত—বাহিরের মালখানার ভাণ্ডারির সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দশা, তাহার নিকট হইতে কুঞ্জিকা লইবার জন্য স্থানে স্থানে মশালাগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছে, কারণ রাঙ্গা ঠাকুরাণীর প্রদত্ত দুই সহস্র টাকার থলিটি তাহারই জিম্মায় ছিল। গৃহের চতুষ্পার্শ্বে অর্দ্ধদগ্ধ মশাল, টাঁটি, তৈলভাণ্ড, তাল-শাখা-নির্ম্মিত চুণলেপিত তরবাল প্রভৃতি স্থানে স্থানে পতিত, বহির্দ্বারে কপাটে কয়েকটি টাঙ্গির প্রহার মাত্র দৃষ্ট হইল। বৃদ্ধ রামা ভৃত্য কহিল, "আমি সত্য-নারায়ণের পূজান্তে শিরণি বণ্টন করিয়া তামাক খাইতেছি আর বেটারা হঠাৎ আসিয়া পড়িল। কপাট ভালরূপ বন্ধ করিতে পারি নাই ; একটী মাত্র খিল দিয়াছিলাম, ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উদ্যোগ দেখিয়া ঐ পূজার দালানের বড় সিঁড়ির নীচে ফুকরে হামা দিয়া লুকাইয়াছিলাম।" দারগা কহিলেন, "তুমি অবশ্যই দুই চার জন ডাকাইতকে চিনেছ।" রাম কহিল, "তা বড় বলিতে পারি না।" দারগা মনে মনে ভাবিলেন, না বলিলে কেন হবে। দুই চার জনকে না চিনিলে এমন বড় মোকর্দ্দমা প্রমাণ হয়? এই কথার পর দারগাসাহেব, দুইজন বিশ্বস্ত পদাতিক ও গোপাল চৌকিদার সঙ্গে প্রাসাদোপরি আরোহণ করি-লেন ; তথায় দেখিলেন, এক কাল মূর্ত্তি ভীষণকায় দস্যু মৃতপ্রায় হইয়া প্রাসাদে পড়িয়া রহিয়াছে। সার্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দিত, রক্তপ্লাবনে কেশদল ভিজিয়া অঙ্গে কয়েকটি রেখা হইয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ছাদে পড়িয়াছে ; এক ক্ষুদ্র বস্ত্র দস্যুর শ্মশ্রু কর্ণদ্বয় হইয়া মুণ্ডচূড়ে আবদ্ধ—কপাল, চক্ষু, নাসিকার যে ভাগ বস্ত্রের বাহিরে রহিয়াছে তাহা কালিতে লেপিত ও সেই প্রলেপের উপর বৃহৎ বৃহৎ চুণের ফোঁটা। ঊষা উপস্থিত, কিন্তু গগন এখনও ঘোর রহিয়াছে, দস্যু নয়ন বন্ধ করিয়া রহিয়াছে অনেক চেষ্টাতেও কোন উত্তর দিল না। সে আর কথা কহিবে না, লজ্জায় মুখ দেখাইবে না, তাহার ধাতু ক্ষীণ হইয়াছে, ডাক্তার সাহেবের পরীক্ষার জন্য প্রেরণ

করা আবশ্যক বোধ হইল। দারগা তাহারই উদ্যোগের জন্য একজন পদাতিককে সত্বর নিম্নে পাঠাইলেন, পরে গোপাল চৌকিদারকে লইয়া দস্যুর অঙ্গান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। লুণ্ঠিত দ্রব্য মধ্যে ডাকাতের কোমরে কুঞ্চিত বস্ত্রে মোহরের একটি থলি, কয়েকটি রত্নখচিত অঙ্গুরী একটীতে স্বয়ং শিবসহায় সিংহের নাম সন তারিখ মুদ্রিত, আর একটী থলিতে কতকগুলি জড়ওয়া অলঙ্কার বাহির হইল। দারগা কহিলেন "মর দিয়া—ডাকাইতও ধরিলাম, মালও বাহির হইল"—গোপাল কহিল "আমারও নেকনামি হইতে পারে—"

দারগা কহিলেন, আমার হলেই তোর ; তোরও পুরস্কার না হবে কি ?

রামা কহিল এত মালের চতুর্থাংশও নয়, এক বাহিরের সিন্ধুক হইতেই নগদ দুটি হাজার টাকা গেছে—কাল সন্ধ্যার পরেই তা আমদানি হয়েছিল। দারগা বিরক্ত হইয়া কহিলেন "তোদের ঐ সব বাহুল্য কথা—মোকদ্দমা মিছা সঙ্গিণ করা কি ভাল, টাকা ছিল ? টাকা ছিল ? তুই দেখেছিলি ? বল দেখি—"

দারগা সাহেবেব ভঙ্গি দেখিয়াই রামা কহিল "দেখি নাই, শুনিয়া-ছিলাম --" তবে শুনা—সে কথায় কাজ নাই, এখন ত্বরায় লাশ চালান করা চাই —কয়েকটী চৌকিদার দ্বারা দস্যুকে প্রাসাদ হইতে বাহির বাটীতে আনয়ন করা হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অঙ্গ মায়না হইয়া শুরথালের কাগজ প্রস্তুত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই একটি চালান দ্বারা বাঁশের খাটুলির উপর অচিহ্নিত পুরুষের লাস বাহিত হইল। গ্রাম হইতে কিয়দ্দূর যাইয়া প্রাতঃসমীরণে দস্যুর কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা হইল· গোঁঙ্গা স্বরে কহিল "তোদের চিনি রে—জল দে।" একজন চৌকিদার কহিল "সমন্ধিকে ভূতে পেয়েছে আমার কাছেও ঔষধ আছে, এই কুড়ালের এক প্রহারেই মাথাটি ভাঙ্গিয়া দিব।" রঘুবীর এই ছদ্মবেশী দস্যু, আর কেহ নহে—ভয় পাইল। তৃষ্ণায় প্রাণাবশেষ, তবু পরশুর প্রহারভয়ে মুখ বন্ধ করিয়া শাস্তি ভোগ করিতে লাগিল।

এদিকে দারগা সাহেব অনেক জাঁকজমক করিয়া তদারকে প্রবৃত্ত। মালের অৰ্দ্ধেক মোহর ও অলঙ্কার আত্মসাৎ করিয়াছেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন শতকরা ৫০ টাকা মূল্যের দ্রব্য উদ্ধার হইলেই পুলিষের কৃতকার্য্যতার উত্তম পরিচয় দেওয়া হয়—ছোট সাহেব বড় সাহেব সকলেই সন্তুষ্ট থাকেন অতএব সেই পরিমাণেই দ্রব্য উদ্ধার করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে। অপহৃত ব্যক্তির কিছু ক্ষতি হইবে কিন্তু তাহাতে তাঁহার নিজ লাভের ও নিজ কার্য্যদক্ষতার কি ত্রুটি হইবে ? ফলতঃ আর চারি পাঁচজন আসামি ও সাক্ষী চাই—দুই একজন একরারী

হইলে কেমন হয় ? তাইদ আনন্দরাম বাঁড়ুয্যে হাসিয়া কহিয়া উঠিলেন "তবে ত সোণায় সোহাগা মহাশয়" কিন্তু এ সকল তদ্বির জন্য প্রতিপত্তিশালী দেওয়ানজী গজানন চৌধুরী মহাশয়ের সাহায্য আবশ্যক।

পাঠক একবার গজাননের গোশালার প্রাঙ্গণকোণে নয়ন নিক্ষেপ কর। তথায় গজানন রাত্রিশেষে যা কিছু মাল পাইয়াছেন উড়াইতে পুড়াইতে ফুঁকিতে ব্যস্ত। টাকার তোড়া দুইটী নিজ ধনাগারে বন্ধ করিয়াছেন, কেবল বাহককে দুই হাতে দুই ফাকা মুষ্টিতে কয়েকটি টাকা উড়াইয়া পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়াছেন, জানিতেছেন রঘুবীর এখন কিয়দ্দিবসের জন্য স্থানান্তরে "গাঢাকা" দিয়াছে—দারগা সাহেবের লোক আসিয়া তাঁহার ফটকে বসিয়াছে, খবর পাইলেন। গজানন কহিলেন, গরজ পড়িলে অনেক লোক তল্লাস করে—সংবাদ পাঠাইলেন যে তাঁহার হাতে অনেক কর্ম্ম, সব শেষ করে কল্য প্রাতে দারগা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিব। দেওয়ানজি বুঝিয়াছেন যে "যেমন তিনি সর্প হইয়া কাটিয়াছেন, ওঝা হইয়া আবার বিষ ঝাড়িবেন।"

আবার দারগার নিকট গজাননের আসিবার বিলম্ব সম্বাদ পৌঁছিবামাত্র গোলাম রহমান ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহার চক্ষু স্বভাবতঃ আবক্তবর্ণ আর দুই পোঁচ রাঙ্গা হইল। দাড়ি আঁচড়াইতে লাগিলেন। এবং কহিলেন এই পল্লী ত এখন শ্রীনগর জমিদারীর অন্তর্গত ? দেওয়ানজী এ ঘটনার কোন সম্বাদ দেন নাই, কুন্দে বাঁক সারিব—বাঁড়ুয্যে অনন্তরামকে হুকুম নামা লিখিয়া গজাননের কৈফিয়ত তলব করিতে অনুমতি দিলেন। এই অকু গোপন করিবার চেষ্টার জন্য জমিদারের নামে কেন না পৃথক্ অভিযোগ করা যাইবে ? সঙ্গে সঙ্গে একজন পদাতিক আবার গজাননের নিকট হুকুমনামা লইয়া দৌড়িল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিদেশ যাত্রা

এদিকে আমাদের নগরে যাত্রা করিবার দিন উপস্থিত। নীলমণি মায়াতে মুগ্ধ—"কানকাটা" "ফটকা" "ছব্‌লা" "বাঘা", "বেঁড়ে" "আহ্লাদে"—তাহার এক পাল প্রিয় কুকুর রহিয়াছে ; আবার ছবলা, পরুপা, মুখি, গলাফুল ও গ্রহবাজ এক "খাপান" কবুতর ভিন্ন ভিন্ন কাবুতে পালিত হইত ; যখন কপোতদল প্রাতে উড়িত ও তণ্ডুল বিতরণ হইত তখন নীলমণি বাবু দ্বিতীয় লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের তুল্য হু হু আ—আহা শব্দে উন্মত্ত হইতেন, তাঁহার বড়ই আমোদ হইত।

কেমন করিয়া এই সকল প্রিয় পালিত জীব ছাড়িয়া যাইবেন এই চিন্তায় চঞ্চল হইয়াছেন। এমন সময় গোলাবাটির দ্বারে পুঁটে বাগ্‌দি আসিয়া উপস্থিত। নীলমণি বাবুর দিকে চাহিয়াই পুঁটে কহিল, ইহার চিন্তা কি, এই চার মাস বাদে বাবুজীর বিবাহ হইবে, বর সাজিয়া আসিবেন, এ দাস আপনার সকল সামগ্রী রক্ষা করিবে, এক মুঠ টাকা দিয়ে যাবেন, খুব চাল ছোলা খাওয়াইয়া পায়রা কুক্কুর মোটা করিয়া রাখিব।

নীলমণি কহিল তাকার অভাব কি? বাবার যে চোরা কুঠারিতে তাকা থাকে সব দেখিছি, তুই চাবি আন্‌তে পারিস? পুঁটে কহিল, আমার জ্যেঠা রঘুবীরের অনেক চাবি আছে। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে পুঁটে এক গোছা চাবি আনিল। নীলমণি বস্ত্র মধ্যে ঢাকিলেন—অন্দরে মাতাঠাকুরাণীর নিকট গিয়া কহিলেন "মা! আগামীকল্য প্রাতে আমরা যাইব।" গৃহিনী কহিলেন "ষাট যাই বলিতে নাই বাছা, কাল আস্‌বে!" নীলমণি এ আসা যাওয়ার প্রভেদ কিছু বুঝিতে পারিলেন না কিন্তু সেদিকে এখন সুবুদ্ধি চালনা করিবার অবসর নাই। কহিলেন "মা বাবা ডারগার সঙ্গে ডেখা করতে গিয়াছেন, আমরা ছাদে যাইয়া পায়রাগুলি গুনিয়া পুঁটের জিম্মা করিয়া আসি, কুঁজিদাও।" নীলমণি সোহাগের ধন, তাহার ইচ্ছা অন্যথা হইবার নহে, কুঁজি লইয়া পুঁটের সঙ্গে সঙ্গে গৃহের উপর দ্বিতীয় তলে যাইলেন। গজাননের ধনাগার একটি ক্ষুদ্র কুঠারী, তাঁহার শয়নঘরে প্রথমতঃ প্রবেশ করিতে হইবেক। সেই ঘরের মধ্যে ছাদের সোপানতলে আর একটী ক্ষুদ্র দৃঢ়দ্বার বিশিষ্ট ডবল তালা বদ্ধ, লোহার পাত হুড়কা, অর্গল, লোহার গোল মেক সংলগ্ন ক্ষুদ্র গৃহ দ্বার, এটি ঘরের ভিতর ঘর! এখানে দস্যু চোরের প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই কিন্তু ঘরের চোর হইলে কোন দ্বার ভেদ না হইতে পারে? যে রিং সহিত কুঁজি-গুলি নীলমণি আপন মাতার নিকট হইতে আনিলেন, তাহার মধ্যে গজাননের শয়নগৃহদ্বার খুলিবার সুবিধা হইল। সেই দ্বার খুলিয়াই চাবির উপর চাবি প্রবেশ করাইয়া ধনাগারের তালা খুলিবার চেষ্টা হইল। কিঞ্চিৎ কাল মধ্যেই নীলমণি ও পুঁটে উভয়ে ঘর্ম্মসিক্ত হইলেন। নীলমণি সকল দিকে সুবুদ্ধি, দক্ষিণে হেলাইতে বামে কুঞ্জিকা হেলাইয়া ক্লান্ত হইলেন; বসিয়া পড়িলেন ও কহিলেন "পুঁটে টুই ডেখ।" যতই হউক পুঁটে চোরের গোষ্ঠী পেঁচ বুঝিত, তাহার কুঁজিতেই একটি চাবি খুলিল, আবার চেষ্টাতে কস্তা কস্তিতে কিঞ্চিৎকাল মধ্যে আর একটি তালাও খুলিল এখন নীলমণি পুঁটের প্রতি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন "টুই খুব বাহাডুর।" এই সন্তুষ্টি ঈশ্বর দত্ত, অদ্য হউক কল্য হউক না হয় দুইদিন বাদেই হউক "চোরের ধন বাটপাড়ে" পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তেই যাইবে। তালা খুলিল, বাহির হইতে ভিতরের অর্গল

এক পেঁচেই খুলিল। কুঠারীর মধ্যে—নরকাকাশ ঘোর কন্ধকার—অন্ধকারে পাপকার্য্য অর্জ্জিত পাপের কোষের উপযুক্ত স্থানে গজাননের বহুধন স্থাপিত হইয়াছে। এই আলোকবর্জ্জিত স্থানে নীলমণি প্রবেশ মানসে দ্বারমধ্যে মস্তক সমর্পণ করিলেন। করিবামাত্র চিক্ চিক্ শব্দ শুনিলেন, অমনি ত্রাসে বাহিরে আসিলেন, "এর ভিটর কিরে ?" পুঁটে কহিল "চামচিকা" নীলমণি কহিল "ওরে ! চর্ম্ম চটি" পুঁটে আবার কহিল আমিই ভিতরে যাই। নীলমণি কহিলেন "ছাট বাড়া, ডেক, কিসে হাত পড়ে।" কুঠারীর অন্তরস্থান তোড়ায় তোড়ায় আবদ্ধ, হস্ত প্রক্ষেপ করিবামাত্র একটীতে হাত লাগিল। পুঁটে বাহিরে আনিয়া মুখের বন্ধনরজ্জু কর্ত্তন করিল। এটি শিব সিংহের গৃহ হইতে অপহৃত দুই সহস্র মুদ্রার থলি। দুই জনে চারি মুঠা ভরিয়া যত পারিল টাকা বাহির করিয়া একটী বস্ত্রাংশে বান্ধিলে, পুটলিটি বড় হইল, কেমন করিয়া লইয়া যাইবেন ভাবিতে লাগিলেন। পুঁটে কহিল বেশ বুদ্ধি আছে। কুঠারীর কপাটটী শীঘ্র বন্ধ করিয়া কহিল আমি গৃহের পশ্চাতে ময়দানে যাইয়া দাঁড়াই, আপনি এই জানালার রেলমধ্য দিয়া তোড়াটি ফেলিয়া দিন। কহিয়াই পুঁটে প্রস্থান করিল। নীলমণি পুটলি নিম্নে নিক্ষেপ করিলেন, পুঁটেকে দৌড়িয়া যাইতে দেখিয়া নীলমণির মাতা ভীতা হইলেন। মনে করিলেন তাঁহার নীলমণি একা সন্ধ্যাবেলা ছাদে রহিয়াছে। "নীলমণি নীলমণি" জপোচ্চারণ করিতে করিতে উপরতলে উপস্থিত। নীলমণি চমকিত হইয়া বারান্দায় আসিলেন ও কহিলেন, পায়রা ধরিতে ঘামে ভাসিয়াছি এই বাতাসে বারেন্দায় এখন বসি।

পরদিন প্রাতে আমাদের যাত্রিক লগ্ন উপস্থিত। তর্কালঙ্কার মহাশয় আশীর্ব্বাদী পুষ্প লইয়া উপস্থিত ; মাথায় ফুল দিয়া তিনি অপরস্থানে চলিয়া গেলেন। মাতা সস্নেহবদনে আমার মস্তেকোপরি আপন সুকোমল হস্তে ধরিয়া আপনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মনে মনে উচ্চারণ করিয়া সেই দেবীর হস্তেই আমার শুভাশুভ চিরদিনের জন্য অর্পণ করিলেন। মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার নয়ন অশ্রুতে বিসিক্ত হইল। গঙ্গাধর বড় নিষ্ঠুর, নগরে যাইবে, জ্ঞানলাভ করিবে, নূতন নূতন দেশ ও কত প্রকার মনোহারী দ্রব্য দেখিবার আশয়ে আহ্লাদিত। এখনও নির্ব্বোধ—এখনও অজ্ঞান অন্ধ জানে না যে, যে ধন আজ ত্যজিয়া যাইতেছে তাহার স্বরূপ গুরুতর নিস্বার্থ স্বর্গীয় পদার্থ জগতে আর কোথাও পাইবার নাই ! সেই ধন সুপবিত্র চিরানন্দদায়ী মাতৃস্নেহ। সেই ধন হারাইলে তত্তুল্য বস্তু এই পৃথিবীতে আর পাইবার সম্ভাবনা নাই। সেই ধন না হারাইলেও তাহার প্রকৃত মর্ম্ম কেহ জানে না, যাহারা হারাইয়াছে তাহারাই জানিয়াছে। মাতার কাতরতা দেখিয়াই আমার সব উৎসাহ শেষ হইল। মন কান্দিল, আঁখিতে

কেহ জল দেখিয়াছিল কি না সন্দেহ কিন্তু অন্তঃকরণ একান্ত অস্থির হইল। সেই অস্থিরমনে গৃহ ত্যজিয়া গ্রামের বহির্দ্দেশে আসিলাম। দেখিলাম একটী পুষ্করিণীর তটে প্রিয়অনুচরগণ নগেন্দ্র, গোপাল, প্রিয়তম ভগিনী প্রফুল্লতাহীন বদনে আমার দিকে চাহিতেছেন, কাঁদিতেছেন প্রফুল্ল আমার প্রিয় হরিণ শাবকটীকে ধরিয়া কহিতেছে "দাদা এটী থাকে না, তোমার সঙ্গে যাইতে চায়।" আমার সব উৎসাহ নিঃশেষ হইল। এই দুইটি নির্ম্মলা প্রীতির পদার্থ দেখিয়া অশ্রুধারা রহিল। দায় মা একবার চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠিল, উভয়ে উভয়ের দিকে দেখিতে দেখিতে চলিলাম। অনেক দূর আসিয়া দূরাকাশ উভয়ের উভয় হইতে প্রভেদ করিল।

গ্রামান্তরে আসিয়া দেখিলাম, নীলমণির পালকী নদীতটে উপস্থিত। একটি বেঁড়ে কুক্কুর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে ও পাল্কির ছাদে একটি পিঞ্জরে কতকগুলি গোলা পায়রা আনিয়াছেন। মনে করিলাম বিদ্যাভ্যাসের বিলক্ষণ সরঞ্জম হইয়াছে।

বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার

আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণায় যে মতগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার সকল গুলিই প্রায় বিদেশীয় পণ্ডিতের। এদেশীয় পণ্ডিতের মধ্যে অতি অল্প লোকেই এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। যাহা হউক আমাদের দেশের প্রধান স্কলার (scholar) ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের এতদ্বিষয়ক মতটী প্রকাশ না করায় প্রস্তাবটী এ পর্য্যন্ত অপূর্ণ রহিয়াছে বলিতে হইবে। সুতরাং এস্থলে তাঁহার মতটি প্রকাশ করিয়া আমরা প্রস্তাব সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা করি।

হিন্দীভাষার মূল নিরূপণ নামক প্রস্তাবে* রাজেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—

"The question is one of great importance. It has already engaged the attention of some of the most distinguished scholars of Europe and it would be presumptuous on my part to dispose it off at the fag-end of an article in a different subject. But as a native, who feels deeply interested in the prospect of the vernacular of his country, I can not allow this opportunity to pass without observing that the question has been hitherto discussed mainly, if not entirely, from an European standpoint. The benefits which European scholars, officials and missionaries are to derive by substituting the Roman characters in their writing and printing the Indian dialects, are what have been most elaborately discussed, but little consideration has been shown as to the advantage which the natives are to derive by accepting the Roman as a subs-

* See Journal of the Asiatic Society No. V 1864,

titute for their national alphabet. It is that point therefore that I wish to discuss the question here."

"অর্থাৎ বিষয়টী অতি গুরুতর ; ইহার প্রতি অনেক অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ মনোনিবেশ করিয়াছেন। অপর প্রস্তাবের প্রসঙ্গে এইরূপ একটী গুরুতর বিষয়ের সমালোচনা করা আমার পক্ষে অবিমৃষ্যকারিতা হইলেও আমি যখন এদেশীয় এবং এতদ্দেশীয় ভাষার উন্নতিতে লাভ বিবেচনা করি তখন আমি এখানে ইহা না বলিয়া থাকিতে পারি না যে, আজ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে যে সকল মত প্রকাশিত হইয়াছে ইউরোপীয়দিগের সুবিধাই তাহাদিগের সম্পূর্ণরূপে না হউক প্রধান লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভরতবর্ষীয় ভাষা সকল রোমান বর্ণমালায় লিখিত বা মুদ্রিত হইলে ইউরোপীয় বিদ্যোৎসাহী, মিসনরী বা কর্ম্মচারীদিগের যে সকল উপকার হইতে পারে তাহাই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার করা হইয়াছে কিন্তু দেশীয় বর্ণমালার পরিবর্ত্তে রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করিলে দেশীয়দিগের কি লাভ হইবে তদ্বিষয় বিবেচনা করা হয় নাই। অতএব সেই উদ্দেশ্যেই আমি এস্থলে এতাদৃশ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলাম।"

"ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুসারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে নাদ সমুদয়কেই প্রচলিত ভাষাদিগের সার বলিয়া বোধ হয় এবং ইহাও জানা যায় যে ঐসকল নাদ প্রকাশকারী বর্গ বা চিহ্নের আকারের সহিত ভাষার কিছুই সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ 'কমল' এই শব্দকে 'Kamala' এইরূপে লিখিলে ভাষার কিছুমাত্র হানি হয় না। এক্ষণে দেখ যদি ঐ সকল বর্ণের আকারবিশেষ গ্রহণ করিলে লিপি ও মুদ্রাদির সৌকর্য্য হয় এবং উচ্চারণও যথাবৎ প্রকাশিত হয় তাহা হইলে জাতীয় গর্ব্বকে জলাঞ্জলি দিয়া সেইরূপ বিশেষ আকারের ব্যবহার অবশ্যই উচিত। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় বর্ণমালা স্থলে রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইবে কি না তাহা সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল। পৃথিবীর পণ্ডিত মাত্রেই রোমান বর্ণমালার অপূর্ণতার বিষয় স্বীকার করিয়া থাকেন। বড় বড় পণ্ডিতদিগের মতে সংস্কৃত বর্ণমালার মত সম্পূর্ণ বর্ণমালা আর দৃষ্টিগোচর হয় না অতএব তাদৃশ সম্পূর্ণ বর্ণমালা স্থলে একটী অপূর্ণ বর্ণমালা ব্যবহার কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে এবং তাহা দ্বারা অভিপ্রায় সিদ্ধিরও সম্ভাবনা নাই।"

"সত্যবটে দেশীয় হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় নানাবিধ কোণশালী অক্ষর থাকায় তাহা লিখিতে অনেক সময় লাগে। এপক্ষে তৎতৎ বর্ণমালা অপেক্ষা রোমান বর্ণমালার শ্রেষ্ঠতা অবশ্যই স্বীকার্য্য কিন্তু একমাত্র লিপিসৌকর্য্যই বর্ণমালার উত্তমতার সাধক নহে। আরও দেখ যদি রোমান বর্ণমালায় সম্যক্ প্রকার লিপি সৌকর্য্য গুণ থাকিত তাহা হইলে বক্তৃতাদি লিখিবার নিমিত্ত নানাবিধ লঘু হস্ত

লিপির (short hand writing) কেন অবিষ্কার হইত। ইহাও সচরাচর দেখা গিয়া থাকে যে আদালতে ইংরেজি ভাষায় সাক্ষী জবানবন্দী প্রভৃতি রোমান বর্ণমালায় লিখিতে যে সময় লাগে ; বাঙ্গালা উর্দ্দু সাক্ষী জবানবন্দী নিজ নিজ বর্ণমালায় লিখিতে তাহা অপেক্ষা অধিক সময় লাগে না। বিশেষ যখন ইহা বিবেচনা করা যায় যে, রোমান বর্ণমালায় দেশী ভাষা সকল লিপিবদ্ধ করিবার সময় দেশীয় বাক্যের ঠিক ঠিক উচ্চারণ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অনেক অক্ষরে বিন্দু ভাস, কথা প্রভৃতির যোগ না করিলে চলিবে না, তখন যে লিপি সৌকর্য্যের নিমিত্ত ইহার ব্যবহার অভীপ্সিত হইয়াছিল তাহা সুদূরপরাহত হইল। লেপসিয়স সাহেব দেশী অক্ষর লিখিবার জন্য যে রোমান বর্ণমালা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে ১৮৯ প্রকার বিভিন্ন বর্ণ প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাতে এরূপ নূতন নূতন আকারের অক্ষর সন্নিবেশিত হইয়াছে যে তাহা লেখা দূরে থাকুক পরিচয় করাই কঠিন। রোমান অক্ষরে দেশীয় ভাষা সকল লিখিবার জন্য যতগুলি পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এরূপ একতা নাই যে, তাহাদের মধ্যে যে কোন একটি সমুদয় ইউরোপে বোধগম্য হইতে পারে।"

"কেহ বলিয়াছেন যে হাঁ আপাতত দেশী ভাষা লিখিবার জন্য রোমান বর্ণমালায় কতকগুলি চিহ্নের যোগ করিতে হইবে বটে কিন্তু পরে ভারতবর্ষীয়েরা যখন ইহাতে সম্যক্ পরিচয় লাভ করিবে তখন তাদৃশ চিহ্ন ব্যবহারের কোনরূপ আবশ্যকতা হইবে না এবং ঐ সকল চিহ্ন ত্যাগ করিলে যে লেখনাদির সমধিক সৌকর্য্য সাধিত হইবে তাহা বলা বাহুল্য। এ যুক্তি যে সম্পূর্ণ ভ্রমাচ্ছন্ন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহার অকিঞ্চিৎকারিতা দেখাইবার জন্য নীচে একটি উদাহরণ দেখান যাইতেছে। হিন্দুস্থানে কুটিয়াল হিন্দী নামক এক প্রকার দেবনাগর অক্ষর ব্যবহার হয় ইহাতে মাত্রা বা স্বর চিহ্ন কিছুই থাকে না কেবল ব্যঞ্জনবর্ণের বিন্যাস করা হয় মাত্র। কোন সময় একজন গমস্তা আগরা হইতে তাহার মনিবের বাড়ী ঐরূপ অক্ষরে এই অভিপ্রায়ে এক চিঠি লেখে যে—

"বাবু আজমীর গয়ে বড়ীবহী ভেজ দিজীয়ে" বাবু আজমীরে গিয়েছেন বড় খাতা খানি পাঠাইয়া দিবেন। বাবুর বাড়ীর লোকেরা পাঠ করিল "বাবু আজ মর গয়ে বড় বহু ভেজ দিজীয়ে" বাবু আজ মরে গেছেন বড় বহুকে পাঠাইয়া দিবেন, সতী হইবার অভিপ্রায়ে অথবা মুখাগ্নি প্রভৃতি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিমিত্ত!!! গল্পটী সত্য হোক বা না হোক উপযুক্ত চিহ্নাদির যোগ না করিয়া ভারতবর্ষীয় ভাষায় রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করিলে ইহা অপেক্ষা যে অধিক গোলযোগ হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

"এইরূপ চিহ্ন যোগ করিয়া রোমান অক্ষর ব্যবহার করা নেটিবদিগের পক্ষে ত সুকর নহেই ; ইউরোপীয়দিগের পক্ষেও বিলক্ষণ কঠিন, কারণ প্রথমে তাঁহাদের বর্ণপরিচয় গ্রন্থ হইতে সচরাচর যে রোমান বর্ণগুলি লিখিত, তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া তাহাদের স্থানে লেপসিয়স বা মোক্ষমূলর প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসারে বর্ণ স্থাপন করিতে হইবে। তাহার পর ভারতবর্ষীয় ভাষা সকল লিখিবার জন্য ঐ সকল বর্ণপ্রয়োগ শিক্ষা করিতে হইবে। কেবল যথেচ্ছরূপে বর্ণ প্রয়োগ করিলে হইবে না যাহাতে সমুদয় দেশে সকল লোকে অক্লেশে পাঠ করিতে পারে সেইরূপ নিয়মাদির অবিষ্কার করিতে হইবে। এক্ষণে দেখ ২৬টী অক্ষর স্থলে ১৮৯ এতগুলি অক্ষর শিক্ষা করিতে কোন ইউরোপীয় সহজে সম্মত হইবেন না, তাহার পরে ত অন্য নিয়ম। ফল বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত যাহাদের সময় আছে এবং আগ্রহ আছে তাহাদের পক্ষে সেই সেই ভাষার বর্ণমালা শিক্ষা কিছু কঠিন নয় বর্ণমালা শিক্ষা করিতে অতি অল্পমাত্র সময়ই ব্যয়িত হয়। আর যিনি অল্প সময় ব্যয় করিয়া বর্ণমালা শিক্ষা করিতে অক্ষম তিনি যে ভাষা শিক্ষা করিবেন তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না।"

পরিশেষে রাজেন্দ্র বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "বাবেলস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবার সময় মানবজাতির উপর যে শাপ নিপতিত হয়, তাহা অদ্যাপি আমাদের উপর প্রভুতা করিতেছে অতএব এক্ষণে একরূপ ভাষা বা একরূপ বর্ণমালা প্রচার করিবার প্রয়াস বিফল মাত্র।!"

প্রাচীন ভারতবর্ষে যত রাজা রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অশোক* সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অশোকের প্রতাপ ও অশোকের শাসন এক সময়ে পাটলীপুত্র হইতে হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত, ধাযুলী হইতে কটক পর্য্যন্ত, এবং ত্রিহুতের উত্তরাংশ হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। হোমার অবিসম্বাদিতরূপে বীররসের শ্রেষ্ঠ কবি নহেন, দিমস্থিনিস অবিসম্বাদিতরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী নহেন, নেপোলিয়ন অবিসম্বাদিতরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ নহেন, কিন্তু অশোক সমুদয় প্রাচীন নরপতিগণের শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তিনি অন্যান্য নৃপতিদিগকে এতদূর পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে কখনই তাঁহার পার্শ্বে উপস্থাপিত করা যায় না।

মহারাজ অশোক সুপ্রসিদ্ধ পাটলীপুত্ররাজ বিন্দুসারের পুত্র। যে চন্দ্রগুপ্তের শাসনমহিমা এক সময়ে যুনানী সম্রাট্গণের গৌরবস্পর্দ্ধী হইয়াছিল, যাঁহার সময় হইতে প্রাচীন ভারতের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ও আলোকিত হইয়াছিল, অশোক সেই মৌর্য্যকুলগৌরব মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র।

বিন্দুসার যখন পাটলীপুত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন চম্পাপুরীবাসী একজন ব্রাহ্মণের নিকট একটী কন্যারত্ন লাভ করেন। কন্যার নাম সুভদ্রাঙ্গী। সুভদ্রাঙ্গীর সম্বন্ধে একদা গণকেরা কহিয়াছিলেন, ইনি একজন প্রসিদ্ধ রাজার মহিষী ও একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতির মাতা হইবেন। ব্রাহ্মণ এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী করিবার আশায় তনয়াকে বিন্দুসারের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করেন।

বিন্দুসার কন্যাটিকে পাইয়া অন্তঃপুরে রাখিলেন। কিন্তু সুভদ্রাঙ্গীকে দেখিয়া অন্তঃপুরবাসিনী মহিষীদিগের নিদারুণ ঈর্ষার সঞ্চার হইল। তাঁহারা

---

* Proceedings of the A. Soc. Beng. No. 1, 1879. Wheeler's India, III. &c.

সুভদ্রাঙ্গীকে সর্ব্বদা নিকৃষ্ট কার্য্যসাধনে নিয়োজিত রাখিতেন। ক্রমে তাঁহার প্রতি ক্ষৌর কার্য্যের ভার সমর্পিত হইল। সুভদ্রাঙ্গী তাহাতে অপমানিতা বোধ না করিয়া এই কার্য্যে সাতিশয় মনোযোগী হইলেন। একদা রাণীগণের আদেশে তিনি মহারাজ বিন্দুসারের ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করেন। মহারাজ বিন্দুসার সুভদ্রাঙ্গীর কার্য্যপটুতা দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহার যে কোন প্রার্থনা পূরণে প্রতিশ্রুত হইলেন। সুভদ্রাঙ্গী ইহাতে বিন্দুসারের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার প্রস্তাব করিলেন। বিন্দুসার তাঁহাকে কোন নীচবংশোদ্ভবা মনে করিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তাহাতে সুভদ্রাঙ্গী উত্তর করিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ-তনয়া। পিতা আপনার সহিত বিবাহ দিবার ইচ্ছা করিয়াই আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।" সুভদ্রাঙ্গীর এই উত্তরে ভূতপূর্ব্ব সমস্ত বিবরণ বিন্দুসারের স্মৃতিপথবর্ত্তী হইল। বিন্দুসার তাঁহাকে যথাবিধানে বিবাহ করিলেন। সুভদ্রাঙ্গী ক্রমে নিজগুণে অন্তঃপুরের প্রধানা মহিষী হইলেন।

এই দম্পতী হইতে অশোকের উদ্ভব হয়। কথিত আছে পুত্রমুখ নিরীক্ষণে মাতার শোক দূরীভূত হওয়াতে ভূমিষ্ঠ সন্তান অশোক নামে অভিহিত হয়। কিন্তু সুভদ্রাঙ্গীর কি শোক ছিল তাহা প্রকাশ নাই। অশোক অতি কদাকার ছিলেন; আকৃতির সঙ্গে অশোকের প্রকৃতিও সাতিশয় অপ্রীতিকর হইয়াছিল। এজন্য তিনি "চণ্ড" নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। বিন্দুসার পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থ পিঙ্গলবৎস নামে একজন জ্যোতির্ব্বিদের হস্তে সমর্পন করেন। এই জ্যোতির্ব্বিৎ একদা গণনা করিয়া কহেন, অশোক পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইয়া পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করিবেন। অশোক ব্যতীত সুভদ্রাঙ্গীর আরও একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাঁহার নাম বীতশোক বা বিগতাশোক।

মহারাজ বিন্দুসারের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ তনয়ের নাম সুসীম। ইহার সহিত অশোকের সম্প্রীতি ছিল না। বিন্দুসার তাঁহাকে স্থানান্তরে রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময়ে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। বিন্দুসার অশোককে ঐ বিদ্রোহদমনার্থ পাঠাইয়া দিলেন।

অশোক তক্ষশিলায় উপস্থিত হইলে তত্রত্য অধিবাসিগণ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিল। অশোক বিদ্রোহ দমনে কৃতকার্য্য হইলেন। ইতিমধ্যে সুসীম পাটলীপুত্রে উৎপাত আরম্ভ করাতে মন্ত্রিগণের পরামর্শে বিন্দুসার সুসীমকে তক্ষশিলায় পাঠাইয়া অশোককে পাটলীপুত্রে আহ্বান করিলেন।

ক্রমে বিন্দুসারের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল; তিনি জীবনের শেষ সীমায় পদার্পণ করিলেন। বিন্দুসার এই আসন্নকালে অমাত্যের পরামর্শে কিন্তু নিজের সম্পূর্ণ

অমতে জ্যেষ্ঠপুত্রের অনুপস্থিতি পর্য্যন্ত অশোককে রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ আদেশ দিয়া পরলোক গমন করিলেন। এদিকে সুসীম তক্ষশীলা হইতে প্রত্যাগত হইয়া পাটলীপুত্র আক্রমণ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অশোক তাঁহার কার্য্যকুশল অমাত্য রাধাগুপ্তের সাহায্যে সুসীমকে পরাভূত ও নিহত করিলেন।

ইহার পর ভাবী অনিষ্ট ও উপদ্রবের আশঙ্কায় অশোক স্বহস্তে রাজবংশীয় অনেক ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করেন। এইরূপ আরও অনেক কার্য্যে তাঁহার প্রচণ্ড স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। একদা তিনি শুনিতে পাইলেন, কয়েকটী কামিনী পুষ্পচয়ন উপলক্ষে একটি অশোকবৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়াছে। এই অপরাধ বড় গুরুতর মনে করিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সেই অপরাধিনী কামিনীদিগকে প্রজ্বলিত অনলে দগ্ধ করিবার জন্য চণ্ডগিরিক নামে একজন নরহন্তাকে আদেশ করিলেন। নিষ্ঠুর চণ্ডগিরিক অবিলম্বে কঠোর-প্রকৃতি প্রভুর এই কঠোর আজ্ঞা সম্পাদন করিল।

একদা সার্থবাহ নামে একজন ধনাঢ্য বণিক্ সপরিবারে একশত বণিকের সহিত বাণিজ্যার্থ সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। এই সমুদ্রবাস সময়েই তাঁহার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়; সার্থবাহ তাঁহার নাম সমুদ্র রাখেন। সার্থবাহ বাণিজ্যের নিমিত্ত দ্বাদশবর্ষকাল নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগত হইতে-ছিলেন, তখন একদল দস্যু আসিয়া তাঁহাকে সপরিবারে নিহত করে, কেবল সমুদ্র নামে তাঁহার পুত্র ঘটনাক্রমে পলায়ন করেন। সমুদ্র এইরূপে পিতৃমাতৃহীন হইয়া বৌদ্ধ যতিবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। একদা ভিক্ষা-প্রার্থী হইয়া তিনি চণ্ডগিরিকের গৃহে সমুপস্থিত হন। চণ্ডগিরিক এই বৌদ্ধযতিকে হত্যা করিতে যথাশক্তি চেষ্টা পায়, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। ইহাতে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া চণ্ডগিরিক এই বিবরণ অশোককে বিজ্ঞাপিত করে। মহারাজ অশোক এই সংবাদে ভ্রমণকারী ভিক্ষুকে দেখিতে আসিলেন এবং তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং চরিত্র দেখিয়া অশোকের জ্ঞানলাভ হইল। নিজ চরিত্র সংশোধনের ইচ্ছা জন্মিল। কিন্তু প্রথমে দুরাচার চণ্ডগিরিকের শিরশ্ছেদ না করিয়া নিরস্ত হইতে পারিলেন না।

এই অবধি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অশোকের আস্থা ও শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। অশোক ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মহারাজ অশোকের ধর্ম্মগুরুর নাম উপগুপ্ত। উপগুপ্ত মথুরার একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির তনয়। শোনবাসী নামে একজন বৌদ্ধ-ভিক্ষু ইহাকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। উপগুপ্ত বৌদ্ধধর্ম্ম তত্ত্বে সাতিশয় প্রবীণ ছিলেন। তিনি অশোককে নানা প্রকার ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাঁহার হৃদয়

প্রশস্ত, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বলবতী ও সাধনা মহিয়সী করিয়া তুলেন। অশোক এইরূপে গুরুসহবাসে ও গুরূপদেশে ধর্ম্মনিরত ও ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠেন।

ক্রমে ধর্ম্মাচরণে ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় অশোকের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চারিদিকে বিস্তৃত হইল। নানা স্থানে স্তূপ ও মঠ প্রভৃতির নির্ম্মাণে তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। তক্ষশিলাবাসিগণের প্রার্থনায় তথায় ৩,৫১০,০০০,০০০ স্তূপ নির্ম্মিত হয়; সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানেও দশলক্ষ স্তূপ প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া উঠে। ঈদৃশ ধর্ম্মাচরণে ও ধর্ম্মসম্মত কার্য্যানুষ্ঠানে অশোকের পূর্ব্বতন "চণ্ড" নাম তিরোহিত হয়; তিনি ধর্ম্মাশোক নামে সাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন।

যখন উপগুপ্ত আপনার আশ্রমে প্রত্যাগমন করেন, তখন অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম তাঁহার সাম্রাজ্যের ধর্ম্ম বলিয়া সাধারণ্যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, এবং এই ধর্ম্মের মহিমা ও এই ধর্ম্মের উন্নতিবিধানে সমুদয় সম্পত্তি ব্যয়িত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠেন। বুদ্ধগয়ার যে তরুমূলে বসিয়া মহামতি বুদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন, সেই বোধী বৃক্ষের রক্ষাবিধানে তাঁহার একাগ্রতা ও চেষ্টা সাতিশয় বলবতী হইয়া উঠে। মহারাজ অশোকের প্রধানা মহিষী পবিষ্যরক্ষিতা ভর্ত্তাকে এইরূপ পুরুষানুগত চিরন্তন ধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ ও নূতন ধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান্ দেখিয়া সাতিশয় বিরক্ত হন। কথিত আছে, একদা পবিষ্যরক্ষিতা মাতঙ্গী নামে এক চণ্ডালীকে গুপ্তভাবে উক্ত বোধীবৃক্ষ বিনষ্ট করিতে আদেশ করেন। চণ্ডালী যাদুবিদ্যাপ্রভাবে ও ঔষধ-প্রয়োগে বৃক্ষটীকে ক্রমে বিশুষ্ক করিয়া তুলে। অশোক এই সংবাদ শ্রবণে সাতিশয় ক্ষুব্ধ হন। রাণী তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় না। পরিশেষে পবিষ্যরক্ষিতার আদেশে মাতঙ্গী বৃক্ষটীকে পুনর্ব্বার সজীব করে; বৃক্ষের সজীবতার সঙ্গে সঙ্গে অশোকও সজীব ও সুপ্রসন্ন হইয়া উঠেন।

এই সময়ে তক্ষশিলা শান্তিপ্রবণ ছিল না। অন্তর্ব্বিদ্রোহে উহা সাতিশয় অব্যবস্থিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহারাজ অশোক স্বীয় পুত্র কুনালকে এই বিদ্রোহ দমন জন্য তক্ষশিলায় প্রেরণ করেন। কুনাল অশোকের সাতিশয় প্রিয় ছিলেন। অশোক মহা আড়ম্বরে কাঞ্চনমালা নামে একটি রূপবতী কামিনীর সহিত কুনালের বিবাহ দেন। কাঞ্চনমালার চরিত্র অতি পবিত্র ছিল। কুনাল সৈন্যদল সমভিব্যাহারে তক্ষশিলায় উপনীত হইলে বিদ্রোহীদিগের দলপতি কুঞ্জরকর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে। এরূপ প্রবাদ আছে, কুনাল বিদ্রোহদমনার্থ তক্ষশিলায় প্রেরিত হইলে অশোক একদা স্বপ্নে দেখিলেন প্রাণপ্রিয় পুত্র কুনালের মুখ

বিবর্ণ, বিশীর্ণ ও বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। অশোক এই স্বপ্নের বিবরণ গণকদিগকে জানাইলে তাঁহারা গণনা করিয়া কহিলেন, প্রস্তাবিত স্বপ্নে তিনটি অনিষ্ট সূচিত হইতেছে, প্রথম প্রাণহানি, দ্বিতীয় পার্থিব বন্ধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক যতিবেশ ধারণ, তৃতীয় দর্শনশক্তির বিনাশ। মহারাজ অশোক প্রিয়তম পুত্রের সম্বন্ধে এইরূপ অনিষ্টের সূচনায় সাতিশয় খিন্ন হইয়া সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্য হইতে বিরত হইলেন। ইহাতে অশোকের অন্যতমা মহিষী ও কুনালের বিমাতা তিশ্যরক্ষিতা কুনালের অনিষ্ট সাধনের উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া স্বয়ং রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার মতানুসারে আদেশলিপি প্রচারিত হইতে লাগিল, এবং তাঁহার মতানুসারে সমুদয় কর্ম্মচারিগণ যথা নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি গোপনে একখানি পত্র লিখাইয়া কুঞ্জরকর্ণকে আদেশ করিলেন যে, অবিলম্বে কুনালের দর্শনশক্তি বিনষ্ট করিতে হইবে। পত্র রাজনামাঙ্কিত মোহরে শোভিত হইয়া যথাস্থানে প্রেরিত হইল। কুঞ্জরকর্ণ এই পত্র পাইয়া কি প্রকারে আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে ভাবিতেছেন, ইত্যবসরে কুনাল রাজাজ্ঞা জানিতে পারিয়া আপনি কুঞ্জরকর্ণর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া রাজাজ্ঞা দেখিতে চাহিলেন। কুঞ্জরকর্ণ বড় কুণ্ঠিত হইলেন কিন্তু কি করেন মহা পরাক্রান্ত কুনালের নিকট বাক্‌চাতুরী করিবার তাঁহার সাধ্য হইল না। রাজলিপি কুনালের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কুনাল ধীরে ধীরে পড়িলেন্। পত্রে রাজার নাম রাজার মোহর রহিয়াছে, সন্দেহ আর কিছুই রহিল না। তখন কুনাল বলিলেন কুঞ্জরকর্ণ, রাজাজ্ঞা প্রতিপালন কর। কুঞ্জরকর্ণকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া কুনাল বলিলেন, অপনি ইতস্ততঃ করিবেন না , রাজাজ্ঞা অবহেলা করিলে তাহার প্রতিফল এখনই আমি দিব, বলিয়া কুনাল কটী হইতে অসি নিস্কোষিত করিলেন। কাজেই রাজাজ্ঞা রক্ষা হইল। কিন্তু এ বিষয়ে মতান্তর আছে। পরে অন্ধ কুনাল পরিব্রাজক বেশে তক্ষশিলা হইতে বহির্গত হইয়া বহুকষ্টে পাটলীপুত্রে উপনীত হইলেন। তিনি গোপনে রাজকীয় হস্তিশালায় আসিয়া নিশীথ সময়ে বংশীধ্বনি করিয়া আমোদ করিতে লাগিলেন। ধ্বনি রাজবিলাসভবনের গবাক্ষদেশ দিয়া অশোকের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। ইহা অশোকের হৃদয়ের প্রতিস্তর অমৃতরসে অভিষিক্ত করিয়া তুলিল। মহারাজ অশোক নিশীথকালে দূরাগত বংশীধ্বনিতে সাতিশয় প্রীত হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি বংশীবাদককে নিকটে আনয়ন করিতে লোক পাঠাইলেন। রাজ আজ্ঞায় যতিবেশধারী বংশীবাদক যথাস্থলে উপনীত হইলেন। তখন মহারাজ অশোক বিস্ময়সহকারে দেখিলেন, বংশীবাদক তাঁহার প্রিয়তম তনয় কুনাল অন্ধ। অশোক কুনালের এতদবস্থা দেখিয়া অধৈর্য্য হইলেন। কুনালকে ঈদৃশ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে

কুনাল কিছুই বলিলেন না। পরে অশোক অন্যত্র সমুদয় বিবরণ শুনিয়া যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া নীচাশয় ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতি মহিষীর শিরশ্ছেদের জন্য তরবারি গ্রহণ করিলেন। কুনাল পিতাকে ঈদৃশ ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনে সমুদ্যত দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বুদ্ধের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

অশোক বিন্দুসারের জীবদ্দশায় কিয়ৎকাল উজ্জয়িনী রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি অনেকস্থলে পরিভ্রমণ করেন। ভ্রমণ সময়ে একদা দেবী নামে একটী পরমাসুন্দরী রাজবালার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। এই দেবীর গর্ভে একটী পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম হয়। পুত্রের নাম মহেন্দ্র এবং কন্যার নাম সঙ্ঘমিত্রা। ইঁহারা উভয়েই তরুণ বয়সে সিংহল দ্বীপে যাইয়া তত্রত্য রাজাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

অশোক পাটলীপুত্রের সিংহাসন গ্রহণ করিবার সময় যেরূপ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বনের পর অশোকের তাদৃশ নির্দ্দয়তার নিদর্শন লক্ষিত হয় না। অশোক যখন সুসীম প্রভৃতিকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন সেই সময়ে সুসীমের পত্নী গর্ভবতী ছিলেন। তিনি অকস্মিক বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবাব আশায় চণ্ডাল-পল্লীতে যাইয়া একজন চণ্ডালের আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানে তাঁহাব একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। অশোক এই সন্তানের জীবনের সম্বন্ধে কোনরূপ অনিষ্ট করেন নাই। কথিত আছে, সুসীম-তনয় বৌদ্ধধর্ম্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক যতিবেশে নানাস্থান পর্যটনে প্রবৃত্ত হন।

কথিত আছে নূতন ধর্ম্মের প্রতি অশোকের আন্তরিক যত্ন ও প্রগাঢ় আস্থা দর্শনে কতিপয় তীর্থক অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীতশোককে বৌদ্ধধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে নিষেধ করেন। অশোক ভ্রাতাকে আপনার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে যথাশক্তি চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে তাঁহার অমাত্য এই কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং রাজ্য দিবার লোভ দেখাইয়া বীতশোককে বৌদ্ধধর্ম্মে আনয়ন করিলেন। অমাত্য বীতশোককে যথাবিধানে রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে কাতর হইলেন না। কিন্তু এই কার্য্যে অশোকের হৃদয়ে অঘাত লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বীতশোকের শিরশ্ছেদ করিতে আদেশ প্রচার করিলেন। এই সময় তাঁহার অমাত্য বহু চেষ্টা করিয়া বীতশোককে একসপ্তাহের জন্য আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। এই এক সপ্তাহ পরে বীতশোক উপগুপ্তের আশ্রয়প্রার্থী হন, এবং তদীয় শিষ্য গুণাকরের নিকট মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহশূন্য পরিব্রাজকত্ব অবলম্বন করেন।

বীতশোক এইরূপ পরিব্রাজক হইয়াও মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন না। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষী এক সন্ন্যাসী আপনার প্রতিকৃতির পাদমূলে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া সেই আলেখ্য সমুদয় স্থানে প্রচার করেন। অশোক এই বিষয় শুনিয়া সেই ধর্ম্মদ্বেষ্টা চিত্রকরের মস্তকের জন্য একটী বিশেষ পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হন। অচিরাৎ এই প্রতিশ্রুতির বিষয় চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়। একজন গোরক্ষক এই সংবাদ শুনিয়াছিল, সে একদা জটাচিরধারী, দীর্ঘশ্মশ্রু, অখণ্ডিতনখ, বীতশোককে দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষ্টা সেই সন্ন্যাসী জ্ঞানে রাত্রিকালে তাঁহার শিরশ্ছেদ করে, এবং নির্দ্দিষ্ট পারিতোষিক লাভের আশায় সেই ছিন্ন মস্তক অশোকের নিকট লইয়া যায়। অশোক স্নেহাস্পদ ভ্রাতাব মস্তক দেখিয়া, সাতিশয় শোকাতুর হইয়া বহুক্ষণ বিলাপ করেন, এবং এই নির্দ্দয়তা ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টা উপগুপ্তের পাদমূলে পতিত হন। এই কাহিনী কতদূর সত্য, নির্দ্দেশ করা যায় না। বোধ হয় বীতশোক বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া অশোকের সহিত তাঁহার অপ্রণয় সংঘটিত হইয়াছিল। তাহা হইতেই এই কিম্বদন্তী বদ্ধমূল হইয়াছে।

অশোক ৩৭ বৎসর কাল রাজ্য ভোগ করিয়া পরলোকগত হন। প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁহাব আধিপত্য প্রসারিত হইয়াছিল। নর্ম্মদা হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে, বিহার ও বঙ্গের শ্যামলক্ষেত্রে, পঞ্জাব ও আফগাণস্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশে তাঁহার বিজয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। অশোকের নামান্তর প্রিয়দর্শী। ইনি বিক্রমাদিত্য সংবতের ২০৫ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অধীশ্বর হন, এবং বুদ্ধের মৃত্যুর ২০২ বৎসর পরে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

অশোকের মৃত্যুর পর তদীয় তনয়গণ তাঁহার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লন। কুনাল পঞ্জাবের আধিপত্য গ্রহণ করেন। এই কুনালই ধর্ম্মবর্দ্ধন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় রাজকুমার জনোক কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, এবং তৃতীয় পুত্র পাটলীপুত্রের শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন।

এই গুলি মহারাজ অশোকের জীবনীর কঙ্কাল মাত্র। প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস হইতে ইহা অপেক্ষা আর কিছু অধিক বিবরণ এপর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। আমরা এই জীবনীকে আর নানাপ্রকার অপ্রাসঙ্গিক কিম্বদন্তীতে পল্লবিত করিলাম না। অতঃপর মহারাজ অশোকের ধর্ম্মানুশাসন সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

১

"এই নেও"—শিশিরের চন্দ্রের কিরণে,
বসি বাঁধা ঘাটে, ক্ষুদ্র তটিনীর তটে,
যুবক যুবতী দুই, যেন চিত্র পটে।
শিশিরের চন্দ্রলোক, বিষাদের হাসি,
হাসিছে বিষাদ হাসি, তটিনীর নীরে।
দুই পার্শ্বে ঝাউ শ্রেণী দাঁড়াইয়া তীরে,
গাইছে বিষাদ গীত, অতি ধীরে ধীরে।
একটী কুসুম দাম বিহ্বল যুবায়
দুই করে চাপি বক্ষে, রহেছে চাহিয়া
নৈশ নীলাম্বর পানে। বামে সিমন্তিনী
প্রসারি দক্ষিণ কর, রয়েছে বসিয়া,—
প্রত্যাখ্যান-মুখী বামা। বহুক্ষণ পরে
যুবক ফুলের মালা করিয়া মোচন,
অর্পিয়া একটি ফুল প্রসারিত করে
কহিল কাতর কণ্ঠে,—"এই নেও তবে,
নিশ্চয় যত্তপি মালা ফিরাইয়া লবে।
না জানি হায় রে! ওই জ্যোৎস্নার সনে
কি সম্বন্ধ জীবনের! কত সুখ, কত
আশা, কত ভাল বাসা, শোক দুঃখ কত,
রয়েছে মিশিয়া চন্দ্র কৌমুদীর মত!
কত দিন কত বর্ষ!—এমনি নিশীথে;
এমন চাঁদের আলো! এমন দেখিতে
মনোহর; কিন্তু নহে এমন মলিন;
এমন বিষণ্ণ;—মনে আছে ত সে দিন?
কুটিল সংসার ছায়া হৃদয়ে আমার
পড়ে নাই, ছিল চিত্ত দর্পণ আকার—
স্বচ্ছ, নিরমল শোভা! যে দিন প্রথম,
দর্পনে একটি ছায়া হইল পতন।

২

সেই ছায়া,—
বসন্ত চন্দ্রমা মাথা সুনীল সুন্দর
পাথর সলিলে নব নীরদের ছায়া!
সেই ছায়া—
বিষবৃক্ষ ছায়া কুন্দ কুসুম কাননে!
ভরিল হৃদয়, মেঘে ঢাকিল অম্বর!
কত চাহিলাম ছায়া ফেলিতে মুছিয়া
অশ্রুজলে। জ্বালি কত পরিতাপানল
চাহিলাম সেই ছায়া করিতে অন্তর।
সকলি বিফল, ছায়া বাড়িতে লাগিল।
বলিয়াছি,—ক্রমে ছায়া, হৃদয় দহিল।
চাহি মুছিবারে ছায়া হৃদয় দর্পণ
চাহে ভাঙ্গিবারে, ছায়া হয় না মোচন।
ছায়া যার, সে কাহার? সে কি গো আমার?
উঠিত এ প্রশ্ন মনে দিনে শতবার।
কে দিবে উত্তর? আর কেবা দিতে পারে?
যে পারে কেমনে হায় জিজ্ঞাসিব তারে?
যদি সে উত্তর নাহি হয় অনুকূল!
চিন্তায় উঠিত বুকে তুফান তুমুল।

না, না,—
সেই ছায়া, এ হৃদয় করি নিষ্পেষণ
রাখিতাম লুকাইয়া যেন চোরা ধন।
প্রাণাধিকে!—ক্ষমা কর, ক্ষম সম্বোধন;
দুরন্ত হৃদয়াবেগ মানে না বারণ।—
প্রথম যৌবনে এই আত্মনির্য্যাতন,
পদ্মা গর্ভে বরিষার প্রথম প্রবাহ,—
তীব্র যন্ত্রণার স্মৃতি করিল তখন
যুবকের কণ্ঠরোধ। যুবা রহিল চাহিয়া
স্থির নেত্রে ঊর্দ্ধমুখে আকাশের পানে,
বিষাদের মূর্ত্তি যেন গঠিত পাষাণে।

৩

পুষ্পহারে রমণীর মৃদু আকর্ষণে
ভাঙ্গিল যুবার ধ্যান;—"এই নেও প্রাণ!"
আবার একটী ফুল করিল প্রদান।
সেই ছায়া বক্ষে করে, আশু দেশান্তরে
বলিলাম, সে কথা কি মনে আজ পড়ে?
আঁধারে আনন্দে তুমি ছিলে দাঁড়াইয়া
মাতৃপাশে, নত শিরে নমিনু তোমারে।
সকলে ভাবিল ভ্রম; হাসিলাম আমি
মনে মনে। ধরে প্রেম কি দিব্য নয়ন,
অন্ধকারে দেখে, থাকে যথা প্রিয়জন।
কি যে বিজুলির খেলা মানবহৃদয়ে
খেলে নাহি জানি, তব নিকটে আসিলে,
খেলিত যে ঊর্ম্মি মম শোণিত সলিলে,
আঁধারে, অদৃশ্যে তুমি থাক লুকাইয়া,
যাইত শোণিতে মম বিজুলি খেলিয়া।
নহে ভ্রম; কহিলাম নমিয়া চরণে
বিদায়ের কালে—থাকি যথায় যখন,
রহিলাম উপাসক জন্মের মতন।
অন্ধকারে সঙ্কোচিত দিলে আলিঙ্গন,
দেখিলে না তরলাগ্নি বর্ষিল নয়ন।
হৃদয়, প্রণাম সহ চরণে রাখিয়া,
চলিলাম দেশান্তরে, হায় ভাসাইয়া
সংসারের সুখসাধ প্রথম যৌবনে,
বিনিময়ে,
লইয়া একটী ছায়া হৃদয় দর্পণে।"

৪

বহুক্ষণ স্থির নেত্রে নিস্পন্দ যুবায়,
যুবতীর মুখ চাহিছে কেবল।
যুবতী আনত মুখে, চিন্তা স্বরূপিণী—
ছিঁড়িছে কুসুমকরে কুসুমের দল।
ঝুলিছে অসাবধানে মুক্তকেশরাশি,
আবরিয়া বদনার্দ্ধ—অতুল সে শোভা!
লতাকুঞ্জ অন্তরালে বাসন্তি নিশায়,
এই রূপে মরি পূর্ণচন্দ্র শোভা পায়।
"এই মুখখানি,—
দেশে দেশে বহুবর্ষ ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
তীব্র বাসনার স্রোত গিয়াছে নিবিয়া
নিরাশয়ে অন্ধকারে। হৃদয় তখন
চন্দ্রাস্তে অবাত ক্ষুব্ধ জলধি যেমন।
কদাচিত তব স্মৃতি হৃদয়ে উঠিয়া
যাইত ঝটিকা বহি সিন্ধু উচ্ছ্বসিয়া।
কভু সান্ধ্য সমীরণ কি যেন কহিয়া
কানে কানে মৃদুস্বরে, যাইত বহিয়া
সন্ধ্যালোকে দেহ প্রাণ যাইত মিশিয়া।
নিরমল চন্দ্রালোকে করি দরশন,
কখন কি যেন মনে হইত স্মরণ।
অস্ত সরোবরে, কিম্বা অনন্ত সাগরে,
কদাচিত দেখিতাম বিস্মিত অন্তরে
কি যেন ভাসিছে। গোলাপ দেখিয়া
শিহরিত অঙ্গ কভু কি যেন ভাবিয়া।

৫

"চন্দ্রশেখরের" চন্দ্র—পরশি শেখরে
বসিয়াছি; দিবাকর সমুদ্র শয্যায়।
মুগ্ধ চিত্ত বনদেবী সঙ্গীত শোভায়।

অচল শেখরে বসি অচল নয়নে
দেখিতে ছিলাম দূরে পর্ব্বত গহ্বরে,
বেষ্টিত লতিকা জালে একটী কুসুম।
দেখিতে, দেখিতে, পুষ্প হলো রূপান্তর,
সেই মুখ, চোখ, বর্ণ চন্দ্রকর গ্লানি,
সর্ব্ব শেষ দেখিলাম এই মুখ খানি!
কি তীব্র মদিরা স্মৃতি দিল যে ঢালিয়া,
উন্মত্তের মত বেগে গেলাম ছুটিয়া।
কুসুমের দলে দলে কত যে চুম্বন,
কত যে আদরে, সুখে, করিনু বর্ষণ।
কত হাসিলাম সুখে কাঁদিলাম দুখে,
কতবার, শতবার, লইলাম বুকে
কত কাল সেই ফুল রাখিনু তুলিয়া,
বাঁচাইয়া প্রেমভরে চুম্বিয়া চুম্বিয়া।
ক্রমে শুষ্কবাসনার প্রবাহ ছুটিয়া
ক্ষুদ্র তৃণ মত বেগে গেলাম ভাসিয়া,—
কোথায়?" বসিল যুবা বামার চরণে
জানুপাতি, শিলাসনে নীচের সোপানে।
পরশি চরণ দ্বয়, বলিল—"এখানে।
সেই আমি, সে চরণ, সেই নিশিথিনী,
তুমি এ আমার সেই প্রেম প্রবাহিণী।
সেই নিশি, মহানিশি জীবনে আমার!
সেই নিশি,—অহে! প্রিয়ে ক্ষম একবার।"

৬

যুবক অবশ শির অঙ্কে যুবতীর
রাখিয়া আবেশে, গদ গদ কণ্ঠে ধীরে
কহিতে লাগিল,—"সেই নিশি প্রিয়তমে!
রাখিয়াছি এ হৃদয়ে লিখিয়া যতনে
প্রেমের অমর বর্ণে। দ্বাদশ বৎসর
করিয়াছি অনিবার তপস্যা যাহার,
সেও হায়! তপস্বিনী শুনিনু আমার।
যে কথা শুনিতে হায়! দ্বাদশ বৎসর
ছিলাম প্রস্তুত প্রাণ করিতে অর্পণ,
শুনিলাম সেই কথা— বেসেছি যেমন,
দ্বাদশ বৎসর ভাল বেসেছে তেমন।
দেখিলাম কত ক্ষুদ্র তুচ্ছ নিদর্শন
রাখিয়াছে প্রাণাধিক করিয়া যতন।
দেখিলাম—
প্রথম মিলনে দুই ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী
অজানিত পরস্পর হইয়া নির্গত,
ভ্রমি দেশ দেশান্তরে দ্বাদশ বৎসর,
হইয়াছে প্রবাহিণী ভীমা বিপ্লবিনী।
উত্তাল তরঙ্গে আলিঙ্গিয়া পরস্পরে,
সে নিশীথে পরিণত হইল সাগরে।

৭

দেখিলাম এক স্রোত পুণ্য প্রবাহিণী—
মহাতীর্থ সুরধুনী, স্বরগ সম্ভূতা!
চলেছে অনন্ত মুখে স্থির অবিচল।
অন্য স্রোত তরঙ্গিনী পদ্মা বিপ্লবিনী।
স্বভাবতঃ নিরমল সুধা পয়স্বিনী,—
প্রশস্ত আকাশ খণ্ড প্রসারিত যেন!
অচঞ্চল! কিন্তু যদি হইল পতিত
করাল কমলা রূপী কাল মেঘ ছায়া,
উন্মত্ত তরঙ্গে বক্ষ হলো বিঘূর্ণিত।
জগত গ্রাসিতে যেন ভীমা ভয়ঙ্করী
ছুটিল ভীষণ বেগে, মত্ত উন্মাদিনী—
সপঙ্কিল কলেবরা! প্রলয় কারিণী!
বুঝিলাম—
হেন দুই মহাস্রোত প্রেম সম্মিলনে
বহিবে না বহুদূর। হৃদয় খুলিয়া—
রাখিনু চরণতলে; কহিনু কাঁদিয়া—
বিগত জীবন মম উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে।
কহিলাম—'দয়াময়ি! দারুণ নিরাশা
দ্বাদশ বৎসর বক্ষে করিয়া বহন,
কত পাপে ডুবাইতে করেছি যতন।
হেন পাপারণ্যে কেন করিবে অর্পণ,
পবিত্র প্রণয় তব—ত্রিদিব রতন?
প্রাণ সমর্পিতে পারি সেই রত্ন তরে

শুষ্ক তৃণ মত, কিন্তু না পারি তাহারে !
লইতে, জীবনাধিকে ! বঞ্চিয়া তোমারে।
ঘৃণা কর, ঘৃণা তুমি করিবে নিশ্চয়,
সহিবে তা অকাতরে এ ভগ্ন হৃদয়।
বল প্রিয়ে, ঘৃণা কর, এখনি হাসিব।
বলিও না ভাল বাস—দ্বিগুণ কাঁদিব।
সময়েতে এ দু কথা করিলে শ্রবণ,
এই পাপারণ্য হত নন্দন কানন,
পবিত্র কুসুমাসন। আরাধ্যে ! তোমারে
বসাতেম—আহা ! বুক চাহে ফাটিবারে !—

৮

"উন্মত্তের মত প্রিয়ে লইয়া হৃদয়ে
মুছিয়া নয়ন মম,—অনন্ত নির্ঝর !
কহিলে উচ্ছ্বাস কণ্ঠে—'জীবন আমার !
এ দুর্লভ সরলতা কোথা আছে আর ?
নহ দোষী ; দোষী আমি ; দোষী অভিমান,
দ্বাদশ বৎসর আমি ছিলাম পাষাণ।
ক্ষমিবে কি ? না না, তুমি পার না ক্ষমিতে,
নাহি মম ক্ষমা, প্রিয় ! এই অবনীতে।
জানিতাম নহি আমি অপ্রিয় তোমার।
কিন্তু ভাবিতাম, আমি যেই পরিমাণ
বাসি ভাল, নাহি পাব তার প্রতিদান।
এই অভিমানে এই উন্মত্ত হৃদয়
রাখিয়া দলিয়া বলে চাপিয়া পাষাণ।
হায় ! এ সংসার স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া
কত কীর্ত্তি—শৈলতত্ত্ব করিনু দর্শন,
যে বালক মূর্ত্তি মম আছিল হৃদয়ে
দেখিলাম এ জগতে সেই অতুলন !
অনন্ত সমুদ্রগর্ভে মহার্ণব-যান
পাব স্থান শত শত, কিন্তু প্রিয়তম !
বালিকা হৃদয় চারু ক্ষুদ্র সরোবর,
একটি তরণী মাত্র পারে ভাসিবারে !
আমার কৈশোর স্বপ্ন ! নাহি জান তুমি,
সেই বালকের রূপ কত ভাল বাসি।
বালকের সরলতা পূরিত প্রণয়,
আইস ঢালিয়া দেও হৃদয়ে আমার ;
জুড়াও পিপাসা মম, কহ একবার
উন্মত্ত বালক মত—তুমি কি আমার ?
সহস্র গোলাপ বৃষ্টি করিলে আমার
অধরে, ললাটে, সিক্ত যুগল নয়নে।
সহস্র কুসুম—দীর্ঘ সহস্র চুম্বনে।
জীবন্ত মদিরা সিক্ত অবশ মস্তক
রাখি অংশে অংশে, ক্লান্ত চারিটি নয়ন,
নীরবে কাঁদিল কত, অশ্রু সুখকর !
সে রোদন, এ রোদন কতই অন্তর !"

৯

উঠিল যুবক। যুবা উঠিতে খসিয়া
পড়িল কতটী ফুল ছিন্ন মালা হতে।
রমণী অমনি তাহা লইল তুলিয়া।
অধোমুখে, ধীরে যুবা ভ্রমিতে লাগিল।
গম্ভীর মুখশ্রী, মেঘে আচ্ছন্ন বদন ;
কেশের কীরিট সহ মিশেছে বরণ।
কখন বা ছিন্নহার গলায় পরিয়া ;
কখন বা হৃদয়েতে রাখিছে চাপিয়া।
"যেই দিন এ মালা করিলে অর্পণ,
সেই দিন—সে রহস্য—আছে কি স্মরণ ?
অপরাহ্ণ বেলা। দৃশ্য সমুদ্রের তীর।
দুজনে বিজনে বসি। জলধির নীর
তরঙ্গে তরঙ্গে আসি গর্জ্জিয়া, ঢলিয়া
তরল রজত রাশি, যাইছে সরিয়া।
ফেণ শীর্ষ উর্ম্মিমালা মধ্য পারাবারে,
কি রঙ্গ করিছে বক্ষে লয়ে সবিতারে !
সিন্দুরমণ্ডিত যেন সুবর্ণ কলসী,
শোভিছে ভাস্কর সিন্ধু নীলিমা ঝলসি।
কথায় কথায় তুমি করি অভিমান,
বলিলে প্রণয় তব সমুদ্র সমান।
তেমতি অনন্ত, প্রেম তেমতি গম্ভীর,
তেমতি অমর ! বুঝি তেমতি অস্থির—

বলিলাম আমি—'পূর্ণ জোয়ারে এখন,
কে জানে ভাঁটায় কোথা হইবে পতন।'
রমণীর অভিমানে ভরিল বদন
দলিত ফণিনী মত বলিলে তখন—
'অবিশ্বাস ভালবাসা পদ্মপত্র জল।
এই আছে, এই নাই, নিরাশা কেবল।'
কর হতে করপদ্ম করিয়া মোচন,
অভিমানে প্রবেশিলে কুসুম কানন।
অভিমানে বেলাভূমে রহিনু শুইয়া,
সিন্দুর কলসী গেল সমুদ্রে ভরিয়া।
পশিয়া কুসুম বনে দেখি একাকিনী
গাঁথিতেছ এই মালা বসি বিষাদিনী।
নীলোৎপল ভ্রষ্ট মুক্তা চুম্বি রক্তোৎপল
শিক্ত করিতেছে চারু কুসুমের দল।
অলক্ষিতে থাকি চিত্র দেখিতে দেখিতে,
মোহিত হইল প্রাণ। এ সংসার ভুলি
লইনু প্রতিমাখানি নিজ অঙ্কে তুলি।
বলিলে—'জান না, প্রাণ! কত কষ্টকর
তব অবিশ্বাস। বুকে লইয়া আমারে
এ প্রতিজ্ঞা কর আজি, প্রণয়ে আমার
হেন অবিশ্বাস নাহি করিবে আবার।'
'তথাস্তু' বলিয়া বুকে লইনু যেমন
সচুম্বন কণ্ঠে মালা করিলে অর্পণ।
নৈশ চন্দ্রাতপে দেখা দিল শশধর,
উভয়ে রহিনু চাহি মোহিত অন্তর।
জিজ্ঞাসিলে—'কোথা আমি বল প্রাণেশ্বর?'
'এ হৃদয়ে'—'স্বর্গে আমি' করিলে উত্তর।
আজিও গগনে ভাসে সেই শশধর।
সেই নিশি, এই নিশি—কতই অন্তর!"

১০

যুবতী বলিল—"নিশি হলো কি প্রহর,
দেও অবশিষ্ট মালা যাই ফিরে ঘর।"
পশিল ভুজঙ্গ বিষ যুবার অন্তরে।
সমর্পিল শুষ্ক মালা যুবতীর করে।
"চলিলাম"—স্থির কণ্ঠে কহিল কামিনী—
"ফুরাইল, এই শেষ প্রণয় কাহিনী।
সব তীব্র অনুতাপ; কিন্তু যেন আর
ঘৃণিত বদন পুনঃ না দেখি তোমার।"
চলিল বিদ্যুৎবেগে বিদ্যুৎবরণী।
বিদ্যুতে আহত যেন দাঁড়ায়ে অমনি
চাহিয়া রহিল যুবা। মুহূর্ত্ত দেখিল।
নৈশ সৃষ্টি নেত্র হ'তে সরিতে লাগিল।
বলিল চীৎকার ছাড়ি—"প্রাণেশ্বরি প্রাণ!
কোন অপরাধে বল এই প্রত্যাখ্যান?
সে সমুদ্র ভালবাসা শুকাল কেমনে?
কেমনে এ "ঘৃণা" কথা আনিলে আননে?
চির উপাসকে তব একবার চাও।
একবার মুখখানি দেখাইয়া যাও।
আমার সর্ব্বস্ব!"—যুবা ছিন্ন তরু মত,
পড়িল ভূতলে দীর্ঘ, জীবন বিগত।
এখন সে বাঁধা ঘাটে, সেই ঝাউমূলে,
একটি সমাধি শোভে সেই নদীকূলে।
মুদ্রিত রয়েছে বক্ষে কঠিন প্রস্তরে—
"রমণী প্রণয় লেখে জলের উপরে।"

১০

পর দিবস প্রাতে পুঁটুর মা গৃহকার্য্য করিতে গেলেন। প্রথমে মার্জ্জনী লইয়া গৃহমার্জ্জনা আরম্ভ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমত সময় একজন পরিচারিকা তাঁহার হস্ত হইতে ঝাঁটা লইল। পুঁটুর মা পাকশালায় চুল্লি সংস্কার করিবার নিমিত্ত গেলেন; আর একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল "ঠাকুরাণী এ সকল আমাদের কার্য্য।" পুঁটুর মার উত্তর অপেক্ষা না করিয়া পরিচারিকা চুল্লি সংস্করণ করিতে বসিল। পুঁটুর মা উঠিয়া অঞ্চলে হস্ত মুছিতে লাগিলেন। এমন সময় একটি মৃৎকলসের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। পুঁটুর মা অমনি কলসটী কক্ষে লইয়া জল আনিতে চলিলেন। এই সময় তৃতীয় আর একজন পরিচারিকা আসিয়া কক্ষ হইতে কলস লইয়া জল আনিতে ছুটিল। পুঁটুর মা কোন কার্য্য করিতে পাইলেন না। তাঁহার মনে অভিমান জন্মিল। খিড়কি দ্বারে দাঁড়াইয়া নখদ্বারা কপাটের এক স্থান খুটিতে খুটিতে অস্ফুট স্বরে আপনাপনি বলিতে লাগিলেন "আমি কি তবে সংসারের কোন কার্য্য করিতে পাব না? আমি কি আর সংসারে কেহই নই, আমায় তবে আর কাজ কি?"

বহির্ব্বাটিতে তাঁহার স্বামীও এই দশাপন্ন। তথায় চারিজন দ্বারবান্ বসিয়াছিল। রামসেবককে দেখিবামাত্র তাহারা উঠিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া রহিল। রামসেবক অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। শয়নঘর হইতে তামাক সযত্নে সাজিয়া তাহাদের নিমিত্ত লইয়া গেলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাহারা বসিয়াছিল, তাঁহাকে দেখিবামাত্র আবার ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইল। রামসেবক তাহাদের নিকট কলিকা রাখিয়া "আপনারা তামাক খান" বলিয়া চলিয়া আসিলেন। রামসেবক যখনই বহির্ব্বাটিতে যান তখনই তাহারা ব্যস্ত হইয়া উঠে দাঁড়ায়, কাজেই রামসেবক তাহাদের সম্মুখে যাইতে কুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে স্থান নাই, বিশেষতঃ তথায় তিন চারি জন দাসী রহিয়াছে; সদরে দারবানেরা।

রামসেবক বড়ই কষ্টে পড়িলেন। কোথায় যান? পূর্ব্বে তাঁহার যতই কষ্ট থাকুক তিনি আপনার গৃহে নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পারিতেন, এক্ষণে সে সুখ গেল। তখনকার প্রচলিত কথা ছিল যে "পরভাতি ভাল, ত পর ঘরি কিছু নয়।" রামসেবক এক্ষণে প্রকারান্তরে "পরঘরি হইলেন। আপনার ঘরে পরের নিমিত্ত তাঁহাকে কুণ্ঠিত থাকিতে হইল। কেন হইল তাহা বুঝিতে না পারিয়া রামসেবক সিদ্ধান্ত করিলেন যে যাহাদের দাসদাসী আছে তাহারা সকলেই এইরূপ "পরঘরি।"

অনেকে নিজের ঘরে পরঘরি। বিশেষতঃ হিন্দুসংসারে। ইংরেজদের মধ্যে পরঘরি হইতে বড় ভয়। এই জন্য পিতা পুত্রে স্বতন্ত্র।

রামসেবক খিড়কিদ্বার দিয়া বহির্গত হইলেন, পথে একজন প্রতিবাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রতিবাসী একটু ঈষৎ হাসিলেন; রামসেবক বলিলেন চল ভাই তোমার বাটীতে যাই। প্রতিবাসী বলিল আমার কাজ আছে। পরে অন্য পথে চলিয়া গেল। রামসেবক ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে খিড়কির দ্বার দিয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন। আহারান্তে আবার খিড়কি দ্বার দিয়া চলিয়া গেলেন।

অপরাহ্নে পুঁটুর মাতা একাকী শয়ন ঘরে বসিয়া ভাবিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে আর কখনই তাঁহাকে এরূপ বিমর্ষ হইয়া দীর্ঘকাল একাকী থাকিতে হইত না; অপরাহ্নে সমবয়স্কারা আসিয়া জুটিত। অল্পবয়স্কারা একত্র হইয়া যদি কেবল বসিয়া থাকে,—কথা কব না, কবই না, বলিয়া যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া থাকে, তথাপি তাহাদের মধ্যে আহ্লাদের তরঙ্গ উছলিয়া উঠে। যে পর্য্যন্ত দাস দাসী তাঁহার বাটিতে আসিয়াছে সেই পর্য্যন্ত প্রতিবাসীদের গতিবিধি কমিয়াছে। পূর্ব্বে মধ্যাহ্নে সকল সময়েই কেহ না কেহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত "আজ এখন রাঁধচ? আজ কি রান্না হয়েছিল? বেগুন কে দিলে? তেল আর কেনা যায় না ছয় পয়সা করে পোয়া, পরে কি যে হবে তাহা বলা যায় না।" এক্ষণে এ সকল আলাপ করিতে কেহ আর আইসে না। কিন্তু সকলেই আপন আপন বাটীতে বসিয়া সর্ব্বদাই পুঁটুরমার কথা আন্দোলন করিতেছে। কেহ বলিতেছে পুঁটুর মার কি অদৃষ্ট, কেহ উত্তর করিতেছে পোড়া কপাল অমন অদৃষ্টের। কেহ বলিতেছে রাজা নাকি পুঁটুর মাকে সোনায় মুড়েছে; কেহ বলিতেছে তাহার কাপড়ে নাকি মুখ দেখা যায়; কেহ বলিতেছে এই দুই দিনে পুঁটুরমার শ্রী ফিরেছে বর্ণ ফেটে পড়িতেছে। কেহ বলিতেছে "পুঁটুরমার গলায় দড়ি আবার লোকের নিকট মুখ দেখাবে কেমন করে।"

যিনিই মুখে যাহা বলুন পুঁটুর মাকে দেখিতে সাধ সকলের অতি প্রবল হইয়াছিল, কিন্তু যাবার উপায় নাই, পুঁটুর মার কলঙ্ক রটিয়াছে, এক্ষণে তাহার বাটী

যাইতে গৃহস্থেরা আপন আপন কন্যাদের নিষেধ করিয়াছেন। পুঁটুর মা এসকল কথা কিছুই জানেন না, একাকী বসিয়া আছেন এমত সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া কেশবিন্যাস করিতে আহ্বান করিল। পুঁটুর মা সকল বিষয়েই পরিচারিকাদের আজ্ঞাবাহক হইয়া পড়িয়াছেন, কাজেই কোন উত্তর না করিয়া তাহার সঙ্গে স্বতন্ত্র স্থানে গিয়া বসিলেন। তথায় নানাপ্রকার পাত্রে নান প্রকার উপকরণ প্রস্তুত ছিল, পুঁটুর মা মনে করিলেন তাহার একটি একটি করিয়া নাম জিজ্ঞাসা করি কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না।

তখনকার বঙ্গযুবতীরা এখনকার ন্যায় খর্ব্বকেশা হন নাই, তখন সিঁন্দুরে বিষ মিশে নাই, চুল টানিয়া বাঁধা ফ্যেসন হয় নাই, কাজেই এক্ষণকার মত কেবল টাক ঢাকিতে ঘোমটার প্রয়োজন হইত না। পরিচারিকা পুঁটুর মার পশ্চাতে বসিল, মেঘের ন্যায় পুঁটুর মার কেশরাশি এলাইয়া পড়িল। পরিচারিকা তাহার মধ্যে অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে করিতে বলিল "ঠাকুরাণীর কি চুল, আমাদের মহারাণীরও এরূপ নয়।" পুঁটুর মা দর্পণ তুলিয়া প্রসন্ন বদনে আপনার চুল দেখিতে লাগিলেন। কেশরাশি অঙ্গুলি আন্দোলিত হইয়া আসনে খেলিতেছে। পুঁটুরমা ঈষৎ হাসিমুখে আপনার কেশের প্রতি কটাক্ষ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "রাণীর কেশ কি আরও ছোট?" পরিচারিকা বলিল "আহা! সে দুঃখের কথা আর কি বলিব? এবার প্রসব হওয়ার পর তাঁহার অর্দ্ধেক চুল গিয়াছে, যাহা কিছু আছে তাহা কেবল আমাদের গুণে। কেবল চুল কেন? দেখেছেন ত রাণীর বর্ণ, যেন কাঁচা সোনা, তাহাও আমাদের কল্যান। রাজা যে এতটা রাণীকে ভাল বাসিতেন তাহাও আমাদের চেষ্টায়—"

পুঁটুর মা। রাজা কি এখন আর রাণীকে তত ভাল বাসেন না?

পরি। "কই আর" এই বলিয়া পরিচারিকা চক্ষুভঙ্গি করিয়া হাসিল। পুঁটুর মা তাহা দেখিতে পাইলে আর একথার প্রসঙ্গ করিতেন না।

পুঁটুর মা। রাজার ভালবাসা গেল কেন?

পরি। তা কি জানি মা? রামি বলে আর সোহাগতৈল রাণী মাখেন না বলিয়া ভালবাসা গেল।

পুঁটুর মা। সোহাগ তৈল কি?

পরি। সে একটা তেল।

পুঁটুর মা। তা আর মাখেন না কেন?

পরি। কোথায় পাবেন? আমি ছাড়িয়া গেলেম আর তেল তাঁরে কে করে দেবে। সোহাগ তেল সকলের হাতে হয় না, আমার স্বামী আমাকে এত

ভালবাসিত যে আমার জন্য প্রাণ বার করে ছিল। তাই আমি সোহাগ তেল করে থাকি, অন্যে করিলে ফলে না ; আর কাহারও স্বামী ত স্ত্রীর জন্যে মরে নি।

পুঁটুর মা। তোমার স্বামী কি তোমার জন্য মরেছিলেন ?

পরিচারিকা। সে আমায় একদণ্ড চক্ষুর আড় করিত না, সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। আমি স্নান করিতে যেতেম অমনি সে গামছা কাঁদে ছুটিত। জল আনিতে গেলে পথে দাঁড়াইয়া থাকিত। যেখানে যাব সেখানে যাবে। এক দিন রাত্রে আমি না বলে যাত্রা শুনিতে গিয়াছিলাম, ঘুম ভাঙ্গিলে আমাকে না দেখিতে পাইয়া গলায় দড়ি দেয়। সকলে বলিতে লাগিল "কি ভালবাসা।" ব্রহ্মচারী একথা শুনিয়া একদিন আমায় বলিলেন তোমার হাতে সোহাগ তৈল ফলিবে। তাই আমায় তিনি সোহাগ তৈল শিখাইয়া দিলেন ; লোকে আমায় সেই অবধি সোহাগী বলে ডাকে। স্বামীর সোহাগী ছিলাম বলে সোহাগী। সোহাগ তেল করে সোহাগী নই।

পুঁটুর মা। তুমি যাত্রা শুনে এসে কি করিলে।

সোহাগী। কি আর করিব ? একটু কাঁদলাম, বলি তুমি কোথায় গেলে, ফিরে এস, আর আমি কখন যাত্রা শুনিতে যাব না। তা মা আমরা দুঃখীলোক আমাদের কাঁদা কাটার সময় কই ? পাঁচ জন বারণ করিলে, আর কি করি, সকলেই বলিল যে আর কেঁদে কি হবে।

পুঁটুর মা আর মাথা বাধিলেন না, হয়েছে বলিয়া উঠিলেন। সোহাগী বলিল আর একটু বসুন, গা মুছাইয়া দিই, সিন্দুর পরাইয়া দিই। সিন্দুরের নাম শুনিবামাত্র পুঁটুর মা আবার বসিলেন। বেশবিন্যাস সমাপ্ত হইলে পুঁটুর মা উঠিয়া আপনার আপাদমস্তক দর্পণে দেখিলেন। রক্তবর্ণই তখনকার ফ্যাসান ছিল, পায়ে আলতা পরিধানে রাঙ্গা শাটি, ওষ্ঠ তাম্বুলরাগে রাঙ্গা, কপালে সিন্দুর। অলঙ্কার রাঙ্গা সূতায় গাঁথা। তখন সকলেই রাঙ্গা ভালবাসিত। শাক্তেরা রক্ত মাখিত, পুষ্পের মধ্যে কেবল জবা তাঁহাদের নিকট আদর পাইত। পরে শক্তি উপাসনার সঙ্গে রক্তবর্ণেরও কিছু মান কমিয়াছিল। কৃষ্ণ উপাসনা প্রবল হইলে রক্তবর্ণের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণবর্ণের আদর বৃদ্ধি হইল, সেই সময় অবধি কালাপেড়ে ধুতী পরিচ্ছদ, দাঁতে মিসি, পিঞ্জরে কোকিল। কৃষ্ণভক্তি, কমিতেছে এখন বঙ্গবাসীদের কি বর্ণ প্রিয় তাহার নিশ্চয় নাই। অনেক দিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় উপাস্য দেবতানুসারে বর্ণ গৃহীত হইত। এক্ষণে তাহা আর হইবার বড় সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ বলেন এক্ষণে বাঙ্গালিরা "আসমানি" ভালবাসেন।

আসমানি আকাশের বর্ণ। এক দিন পিতম পাগল ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ব্রহ্মের কি বর্ণ? ব্রহ্মচারী দীপশিখা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন ইহার মধ্যস্থিত যে অস্পষ্ট বর্ণ দেখিতেছ তাহাই। পিতম বলিল বুঝেছি পুড়িলে যে বর্ণ হয়!

১১

বেশবিন্যাস সমাধান্তে পুঁটুর মা পুঁটুকে ক্রোড়ে করিয়া খিড়কি দ্বারে আসিলেন। ইচ্ছা যে কোন প্রতিবাসীর গৃহে গিয়া দুই দণ্ড বসেন অথচ যাইতে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কেন মনে এরূপ সঙ্কোচ জন্মিতেছে তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না। বোধ হয় অলঙ্কারাদি পরিয়াছেন বলিয়া লজ্জা হইতেছে, অথচ অলঙ্কার দেখাইতেও সাধ জন্মিয়াছে। যাওয়া উচিত কি না এই ভাবিতেছেন এমত সময় তাঁহার স্বামী খিড়কি দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামসেবক স্ত্রীকে দেখিয়া হঠাৎ বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। পুঁটুর মার বর্ণ পরিষ্কার হইয়াছে, অল্প বয়সের চাকচিক্য পুনঃ প্রকাশ হইয়াছে, সুন্দরী বলিয়া যেন তাঁহার নিজেরও প্রতীতি জন্মিয়াছে, আর পূর্ব্বের ন্যায় শরীরের সঙ্কোচ নাই। পুঁটুর মা অঞ্চলাগ্র ধরিয়া বামকক্ষে পুঁটুকে লইয়া ঈষৎ হেলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, পুঁটু সর্ব্বভয়নিবারক মাতৃক্রোড়ে অঙ্গুলি চুষিতেছে। রামসেবক যেন একখানি প্রতিমা দেখিলেন। গৃহিণীকে সুন্দরী দেখা সকলের অদৃষ্টে ঘটে না, ধনবানদের ত কথাই নাই, স্ত্রী অপেক্ষা চতুষ্পদের প্রতি দৃষ্টি তাঁহাদের অধিক। দরিদ্রের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু স্ত্রী সুন্দরী কি কুৎসিতা তাহা রামসেবক এপর্য্যন্ত একবারও অনুভব করেন নাই।

রামসেবক পুঁটুর মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা যাইতেছ?

পুঁটুর মা। পদ্মদের বাড়ি বেড়াইতে।

রাম। গিয়া কাজ নাই।

পুঁ, মা। কেন? আমি যাই না বলিয়া তারা আর কেহ আসে না। পদ্ম আমায় ভালবাসে, আমার ছেঁড়া কাপড় দেখে কত দুঃখ করিত, এখন আমার গহনা দেখে কত সুখী হবে।

পুঁটুর মা অল্পবয়স্কা, অদ্যাপি জানেন নাই যে, যাহারা ছিন্নবস্ত্র দেখিয়া আহা বলে, পরে তাহারা অলঙ্কার দেখিলে মুখ ভার করে। যতদিন আমার অপেক্ষা তুমি দিনদশাপন্ন থাক ততদিন আমি তোমায় ভালবাসি। তার পর স্বতন্ত্র ব্যবহার।

আমি কারে ভালবাসি। তুমি ভালবাস অথচ তুমি জান না যে কারে ভালবাস।

রামসেবক। জানি বই কি? তবে দুজনের মধ্যে ঠিক করে বলিতে গেলে একটু সন্দেহ হয়, তাই বলিতেছিলাম তোমায় হয় ত মার মতই ভালবাসি।

পুঁটুর মা। ওকি আবার কথার শ্রী?

রামসেবক। তা নয়, তা নয়, বলি তোমাদের দুজনকেই সমান ভালবাসি, হয় ত তোমার কিছু বেশী ভালবাসি।

পুঁটুর মা। আমায় যে তুমি ভালবাস তা আমি কেমন করে বুঝ্‌ব? তুমি মনে করে দেখ দেখি কখন কি আমায় ভালবাসার দুটা কথা বলেছ।

রামসেবক। সত্য কথা, বলিনে। ভালবাসার কথা কারে বলে আমি তা ঠিক জানি না, জানিলে অবশ্য বলিতাম। আমি ত কখন স্ত্রী পুরুষের একত্রে কথাবার্ত্তা শুনি নাই, শুনিলে শিখিতাম। তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন একবার গল্প শুনিয়াছিলাম যে, একজন ভট্টাচার্য্য আপনার স্ত্রীর গাল ধরিয়া আদর করিয়াছিল "তুমি আমার নিমন্ত্রণ পত্র, তুমি আমার নস্যর শামুক, তুমি আমার ভুজ্জির চাল, তুমি আমার টাকার থলি, তুমি আমার বিদায়ের ঘড়া।" যদি এরূপ ভালবাসার কথা চাও তা সময়ে সময়ে দুই একটা বলিতে পারি।

পুঁটুর মা হাসিয়া বলিলেন "না আমায় তোমার ভালবাসার কথা বলে কাজ নাই।"

রামসেবক। ভাল, বল দেখি, স্ত্রীকে ভালবাসে না এমন লোক কি জগতে আছে?

পুঁটুর মা। আছে?

রামসেবক। কে?

পুঁটুর মা। রাজা।

রামসেবক। সে কি! রাজা কি রাণীকে ভালবাসেন না, তবে তাঁহার সংসার চলে কেমন করে? না না, এ মিছে কথা।

পুঁটুর মা। আমি নিশ্চয় জানি, আমার অপেক্ষা রাজবাড়ির খবর কে জানে, আমি রাজার সকল কথা জানি। রাজা রাণীকে একেবারে ভালবাসেন না।

রামসেবক। কেন ভালবাসেন না?

পুঁটুর মা। কারণ আছে।

রামসেবক। কি, বল না।

আমি কারে ভালবাসি। তুমি ভালবাস অথচ তুমি জান না যে কারে ভালবাস।

রামসেবক। জানি বই কি? তবে তুজনের মধ্যে ঠিক করে বলিতে গেলে একটু সন্দেহ হয়, তাই বলিতেছিলাম তোমায় হয় ত মার মতই ভালবাসি।

পুঁটুর মা। ওকি আবার কথার শ্রী?

রামসেবক। তা নয়, তা নয়, বলি তোমাদের তুজনকেই সমান ভালবাসি, হয় ত তোমার কিছু বেশী ভালবাসি।

পুঁটুর মা। আমায় যে তুমি ভালবাস তা আমি কেমন করে বুঝ্‌ব? তুমি মনে করে দেখ দেখি কখন কি আমায় ভালবাসার তুটা কথা বলেছ।

রামসেবক। সত্য কথা, বলিনে। ভালবাসার কথা কারে বলে আমি তা ঠিক জানি না, জানিলে অবশ্য বলিতাম। আমি ত কখন স্ত্রী পুরুষের একত্রে কথাবার্ত্তা শুনি নাই, শুনিলে শিখিতাম। তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন একবার গল্প শুনিয়াছিলাম যে, একজন ভট্টাচার্য্য আপনার স্ত্রীর গাল ধরিয়া আদর করিয়াছিল "তুমি আমার নিমন্ত্রণ পত্র, তুমি আমার নস্যর শামুক, তুমি আমার ভুজ্জির চাল, তুমি আমার টাকার থলি, তুমি আমার বিদায়ের ঘড়া।" যদি এরূপ ভালবাসার কথা চাও তা সময়ে সময়ে তুই একটা বলিতে পারি।

পুঁটুর মা হাসিয়া বলিলেন "না আমায় তোমার ভালবাসার কথা বলে কাজ নাই।"

রামসেবক। ভাল, বল দেখি, স্ত্রীকে ভালবাসে না এমন লোক কি জগতে আছে?

পুঁটুর মা। আছে?

রামসেবক। কে?

পুঁটুর মা। রাজা।

রামসেবক। সে কি! রাজা কি রাণীকে ভালবাসেন না, তবে তাঁহার সংসার চলে কেমন করে? না না, এ মিছে কথা।

পুঁটুর মা। আমি নিশ্চয় জানি, আমার অপেক্ষা রাজবাড়ির খবর কে জানে, আমি রাজার সকল কথা জানি। রাজা রাণীকে একেবারে ভালবাসেন না।

রামসেবক। কেন ভালবাসেন না?

পুঁটুর মা। কারণ আছে।

রামসেবক। কি, বল না।

পুঁটুর মা। তা আমি বলিব না। সে কথা যাক, এখন আমায় ভাল বাসিবে বল।

রামসেবক। কারে ভালবাসা বলে আমায় শিখাইয়া দেও। কে স্ত্রীকে বিশেষ ভালবাসে বল আমি তার দেখে শিখি।

পুঁটুর মা। হাসিয়া বলিতে লাগিলেন বলিব! বলিব! এক জন স্ত্রীর জন্য আপনার প্রাণ--

পুঁটুর মা এই কথা বলিতে বলিতেই শিহরিয়া উঠিলেন "ওমা কেন অমন পোড়া কথা মুখ দিয়া বাহির হইল" এই বলিয়া কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইলেন।

সে বৃত্তান্ত কি, রামসেবক তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া পুঁটুর মাকে অন্যমনস্ক করিবার নিমিত্ত বলিলেন "পুঁটুকে আজ রাজবাটীতে লয়ে যাবে না?"

পুঁটুর মা। কই, তার কোন কথা ত নাই।

রামসেবক। তুমি কাল যখন গিয়াছিলে তখন আমি দেখি নাই। তুমি কি এই বেশে গিয়াছিলে?

পুঁটুর মা। না।

রামসেবক। আজ তোমায় বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

পুঁটুর মা প্রথমে অলঙ্কারের প্রতি পরে বস্ত্রের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "আমি যদি সুন্দর, তবে তুমি এখন আমায় ভালবাসিবে বল।"

রামসেবক। কই, পূর্ব্বে ত তুমি ভালবাসিবার নিমিত্ত কখন অনুরোধ কর নাই, আজ কেন ভালবাসার এত চেষ্টা হইয়াছে?

পুঁটুর মা। আগে আমার গহনাও ছিল না বস্ত্রও ছিল না। মনে করিতাম যে আমার কি আছে যে তুমি ভালবাসিবে। এখন আমার যে সব হয়েছে, এখন বলিলে বলিতে পারি যে আমায় ভালবাস।

রামসেবক। লোকে কি বস্ত্র অলঙ্কারের নিমিত্ত স্ত্রীকে ভালবাসে? তাহা না থাকিলে কি ভালবাসে না।

পুঁটুর মা। তা বই কি? বস্ত্র অলঙ্কার থাকিলে লোকে সুন্দর হয়। এত দিন আমার বস্ত্রালঙ্কার ছিল না, তুমি ত এক দিনও আমায় সুন্দর বল নাই। আজ আমায় সুন্দর দেখেছ, আমিও ভালবাসার দাবি করেছি, অন্যায় হয়েছে? বল?

রামসেবক। তাই বলে কি পুঁটুকে তুমি সুন্দর দেখ নাই, না ভালবাস নাই। আসল কথা বস্ত্র অলঙ্কারে লোক সুন্দর হয় না।

পুঁটুর মা। তা যদি না হয় তবে লোকে বস্ত্র অলঙ্কারের জন্য এত করে মরে কেন? তোমার ওকথা শুনি না। অলঙ্কারে নাকি লোককে সুন্দর দেখায় না।

রামসেবক। অলঙ্কারে সুন্দরীর সৌন্দর্য্য বাড়ায় সত্য, কিন্তু আবার কুৎসিতার কুরূপ আরও বাড়ায়। তোমরা আপনারাই ত বলে থাক "মাগীর ঐ ত রূপ তার উপর আবার গহনা পরেছে।"

পুঁটুর মা। মিথ্যা নয়। কুরূপীরা গহনা পরিলে বড় কুৎসিত দেখায় কিন্তু তবু লোকে গোদা পায়ে আল্‌তা পরে, খাঁদা নাকে উর্ব্বী পরে। তারা কি জানে যে এতে তাদের আরও কুৎসিত দেখায়? আমায় ত কুৎসিত দেখাচ্ছে না, বল?

রামসেবক। তোমায় বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

পুঁটুর মা। তবে আমি একবার পদ্মর কাছে যাই।

রামসেবক হাসিয়া বলিলেন। যাও।

পুঁটুর মা পুঁটুকে কোলে করিয়া খিড়কি দ্বারের দিকে গেলেন। গৃহে রামসেবক একা বসিয়া রহিলেন।

১২

যখন রামসেবক স্ত্রীপুরুষে একত্রে কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন তখন রাজা ইন্দ্রভূপ পারিষদ সমভিব্যাহারে বায়ুসেবনে যাইতেছিলেন। রামসেবকের বাটীর নিকট আসিয়া একবার দাঁড়াইলেন কিন্তু কিছুই না বলিয়া আবার পূর্ব্বমত মন্দ-পাদবিক্ষেপে চলিতে লাগিলেন। ইচ্ছা একবার মাধবীলতাকে দেখেন, তাহাকে আনিতে বলিলেই তৎক্ষণাৎ দেখিতে পান কিন্তু কি ভাবিয়া আনিতে বলিলেন না, অথচ তাহাকে দেখিবার সাধও জন্মিয়াছে। পথে হয় ত মাধবীকে কাহার ক্রোড়ে দেখিতে পাইবেন এই মনে করিয়া ইপ্সিত লোচনে ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে চলিলেন। কতক দূর যাইয়া দেখিলেন, আর একটী বালিকা এক বৃদ্ধের জানু ধরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। পড়িয়া যাইতেছে আবার উঠিয়া জানু ধরিয়া উর্দ্ধমুখে দাঁড়াইতেছে ইচ্ছা যে ক্রোড়ে উঠে। বৃদ্ধ সে দিকে একে-বারে দৃষ্টি না করিয়া অবাক্ হইয়া রাজদর্শন করিতেছে। রাজা হাসিয়া বলিলেন "এদিকে কি দেখিতেছ? নাগরী তোমার পাদমূলে।" বৃদ্ধ অপ্রতিভ হইয়া বালিকাকে ক্রোড়ে লইল, মুখচুম্বন করিল। বালিকাও হাসিয়া বৃদ্ধের মুখ চুম্বন করিল। রাজা হাসিমুখে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। হাসিতে হাসিতে চলিলা

গেলেন। কতকদূর গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন,* হাসিতে হাসিতে একজন বৃদ্ধ পারিষদকে বলিলেন, "বৃদ্ধরা প্রেম পীরিতে একেবারে বঞ্চিত নহে।" পরে কতকদূর গিয়া আবার ফিরিয়া বলিলেন "এ প্রেমের প্রতিবাদী নাই।"

এই সময় বৃদ্ধ পারিষদ বলিলেন "যথার্থই আজ্ঞা করেছেন এ প্রেমের প্রতিবাদী নাই। আবার দেখুন এ প্রেম বৃদ্ধ যুবা সকলেই অধিকারী।"

"না, সকলে অধিকারী নয়, চূড়াধন বাবুকে তাহা জিজ্ঞাসা করুন," এই কথা পশ্চাৎ হইতে একজন বলিয়া উঠিল। সকলে ফিরিয়া দেখিলেন যে পিতম পাগলা বৃক্ষতলে বসিয়া কি লিখিতেছিল, রাজাকে দেখিয়া কাগজ কলম হস্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "কি পিতম, এখানে যে? আমি তোমাকে দেখিবার জন্য পশুশালায় যাইতেছিলাম।"

পিতম। মহারাজ আমি পশু নই যে পশুশালায় দেখিতে পাইবেন। যখন লোকে পশুর ন্যায় আমার সহিত ব্যবহার করিয়াছিল তখন তথায় গিয়াছিলাম কিন্তু থাকিতে পারিলাম না, সেখানে বাঘের সঙ্গে বড় বিরোধ হইল। তা ভাবিলাম যে, আমি যেখানেই যাব সেইখানেই বিরোধ, তবে আর কেন এখানে থাকি, তাই চলিয়া আসিলাম।

রাজা। বিরোধ হল কেন?

পিতম। বাঘ কাহারেও ভালবাসে না, নিজের ব্রাহ্মণীকেও ভালবাসে না দাঁত খিচিয়া যে প্রেমালাপ করে তার সঙ্গে কেমন করে বাস করি।

রাজা। বাঘ কি তোমায় ধরে ছিল?

পিতম। ধরে নাই বরং আমিই ধরেছিলাম, তার ন্যাজ ধরে টানিয়াছিলাম তাই তার রাগ। তার পূর্ব্বে আমার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল।

রাজা। কি কথা হয়েছিল।

পিতম। বাঘ বলে যে তোমরা বড় কাপুরুষ, তোমাদের একেবারে সাহস নাই। তাহাতে আমি উত্তর করি যে বটে, বটে, তোমার এ নগরে আসাই তাহার প্রমাণ। বাঘ বলিল আমায় পিঞ্জরবদ্ধ করে রাখা তোমাদের কৌশলের পরিচয় মাত্র, তোমাদের বলবীর্য্যের পরিচয় নহে। তোমরা দুর্ব্বল, একত্র থাকাই তাহার পরিচয়, যদি তোমরা আমাদের মত বলিষ্ঠ হইতে তাহা হইলে তোমাদের সমাজ কখন সৃজিত হইত না, তোমরা কখন একত্রে বাস করিতে না, সে প্রবৃত্তিই হইত না, সকলে আমাদের ন্যায় পরস্পর একা থাকিতে। আমরা পরস্পর সকলেই বীর, কেহ কাহার সাহায্য চাই না এই জন্য আমাদের সমাজ নাই। শুনেছ ত দুর্ব্বলের বল সমাজ।

রাজা। তোমার বাঘ ত বড় জ্ঞানবান্।

পিতম। দশনীতি শুনে তার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে। ইদানী কোথা হইতে একজন পণ্ডিত এসেছে সে নিত্য দশনীতি ব্যাখ্যা করিয়া বেড়ায়। কখন কখন পশুশালায় গিয়া দশনীতি পাঠ করে। যাহারা পশুশালায় আসে তাহারা তাই শুনে, সঙ্গে সঙ্গে পশুরাও কিছু কিছু শুনে। দশনীতি আপনাদের শিখিতে হয় না, আপনারা রাজা আপনাদের নিমিত্ত রাজনীতি, আমরা প্রজা আমাদের নিমিত্ত দশনীতি। বশিষ্ঠদেব যখন রামচন্দ্রের নিমিত্ত রাজনীতি লেখেন সেই সময় পরশুরাম দশনীতি লিখিয়াছিলেন। এত দিন তাহার বড় প্রচার ছিল না, এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়াছে। শ্লোকগুলি এক একটি করিয়া সকলকে লিখিয়া দিয়াছে, আমিও দুই একটী পাইয়াছি।

রাজা। শ্লোকগুলি কি?

পিতম পাঠ করিল:—

"মনুষ্যের বল মনুষ্য, এইজন্য সমাজ।

প্রথমে সমাজ অন্ধ এই জন্য রাজা। তার পর কালি পড়িয়াছে।"

রাজা। এ কই ত শ্লোক হইল না?

পিতম। না হউক, আর একটা বলি:—

"দেশের প্রকৃতিতে সমাজের প্রকৃতি, তদনুসারে সমাজের উন্নতি বা অবনতি।"

রাজা। তোমার কাগজে অঙ্কপাত কিসের?

পিতম। ও আপনাদের ঠিকুজি গণনা করিতেছিলাম।

রাজা। জ্যোতিষ শাস্ত্র পড়া আছে তবে।

পিতম। বিলক্ষণ পড়া আছে।

রাজা। ভাল, কি গণনা করেছ?

পিতম। আপনার সময় বড় মন্দ নয়। গ্রহ আপনার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছে। আপাতত আপনার জলভীতি। এই কথা বলিবামাত্র চূড়াধন বাবু চঞ্চল হইয়া প্রখর দৃষ্টিতে পিতমের প্রতি চাহিলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর আমার? আমার কি ভীতি?"

পিতম। আপনার সময় বড় ভাল, ইচ্ছা হয় এই সময় আপনার পোষ্যপুত্র হই, আমায় পোষ্যপুত্র লইবেন? "পুত্র পিণ্ড প্রয়োজন" আমি আপনার শ্রাদ্ধ করিতে পারিব।

রাজা বিরক্ত হইলেন, পিতম তাহা বুঝিতে পারিয়া গীত গাইতে গাইতে চলিয়া গেল।

এই দিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় চূড়াধন বাবুর দ্বারে দুইজন খর্ব্বাকার পুরুষ দাঁড়াইয়া চুপি চুপি কি কথা কহিতেছিল। রাত্রি অন্ধকার, কেহ তাহাদের দেখিতে পায় নাই, দেখিলে লোকে ভয় পাইত। উভয়ের হস্তে গুপ্তি, কটিদেশে ক্ষুদ্র ভোজালি, ওষ্ঠে লোম। শেষ পরিচয়টি সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। তৎকালে বাঙ্গালি গুম্ফ বা শ্মশ্রু রাখিত না। বাঙ্গালি তখন নম্র, শান্ত, ধর্ম্মভীত। তখন গোঁফ রাখিলে বিপরীত বুঝাইত। যে গোঁফ রাখিল সে প্রকাশ্যরূপে জানাইল যে আমি রাজা মানি না, সমাজ মানি না, কিছুই মানি না। এই জন্য এক সময়ে বিষ্ণুপুরের রাজারা গোঁফ দেখিলেই শিরশ্ছেদ করিতেন। ক্রমে রাজাদের শিরশ্ছেদ হইল কাজেই প্রজার ওষ্ঠে গোঁফ গজাইল। কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত গোঁফ সাহসের পরিচায়ক ছিল এই জন্য প্রথমে লাঠিয়ালেরা গোঁফ রাখে। পরে গৃহরক্ষকেরা রাখে। তাহার পর সাহসিক যুবারা রাখে। এখন সকলেই রাখে। গোঁফ আর সাহসব্যঞ্জক নহে।

ক্ষণেক বিলম্বে চূড়াধন বাবু ধীরে ধীরে নিঃশব্দে দ্বার খুলিলেন। আগন্তুকের মধ্যে একজন বলিল, "এতক্ষণ ধরে দাঁড়াইয়া থাকিতে গেলে ত চলে না, চারিদিকে লোক লাগিয়াছে।" চূড়াধন বাবু কোন উত্তর না করিয়া তাহাদের লইয়া বৈঠকখানায় গেলেন। তথায় প্রদীপ ছিল না, অন্ধকারে তিন জনে বসিলেন। যে ব্যক্তি প্রথমে কথা কহিয়াছিল সে জিজ্ঞাসা করিল "এখানে আর কেহ নাই ত?" চূড়াধন বাবু বলিলেন নির্ভয়ে কথা কহ। কিন্তু প্রথমে জিজ্ঞাসা করি গত রাত্রে কেন আস নাই?

প্রথম বক্তা। কাল চারিদিকে বড় পাহারা ছিল। সন্দেহ করে দুই চারি জনকে ধরে লইয়া কয়েদ করেছে।

চূড়াধন। তবে কি দেওয়ান সন্দেহ করেছে?

প্র, বক্তা। বিলক্ষণ সন্দেহ করেছে, কিন্তু সুবিধা এই যে আমাদের কেহ চেনে না। চেনে না বলিয়াই নূতন লোক দেখিলেই ধরিতেছে। কাজেই দশনীতি ব্যাখ্যা বন্ধ হয়েছে। তা হউক যে কয়টি নীতি বলা হয়েছে তাহাতেই কাজ হবে।

চূড়াধন। দেওয়ানের সন্দেহ হল কেন? অবশ্য তোমরা অসাবধান হয়েছিলে।

প্র, বক্তা। কিছু মাত্র নহে। তবে কি জান, আগুন লেগেছে এখন ঘুমন্তরও ঘুম ভাঙ্গিবে। নগরের সকল লোকই রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে,

সকলেই সর্ব্বদা রাজার অধর্ম্মাচরণের কথা কহিতেছে। জানিতে কি আর বাকি থাকে ?

চূড়াধন। তা নয়, বোধ হয় তোমাদের কোন সঙ্গী দেওয়ানের হস্তগত হয়েছে, নতুবা অতি গোপন উদ্যোগ প্রকাশ পাইল কিরূপে ?

প্র, বক্তা। কোন উদ্যোগ ?

চূড়াধন। আজ একজন আসিয়া রাজাকে বলিয়া গিয়াছে যে সম্প্রতি তাঁহার জলের ভয় আছে।

প্র, বক্তা। সে কি ?

চূড়াধন। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি।

ইহার পর তিনজনে বহু তর্কবিতর্ক হইল। অনেকক্ষণ পরে সকলেই উঠিলেন। বিদায় হইবার সময় চূড়াধন বাবু বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন আর বলিলেন যে, সঙ্গিমধ্যে কে বিশ্বাসঘাতক তাহার অনুসন্ধান সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

প্র, বক্তা। আপনাকে কিছু বলিতে হইবে না, আমি তাকে সিদ্ধেশ্বরীর কাছে নরবলি দিয়ে আপনাকে সংবাদ দিব।

চূড়াধন। না, না, তা কদাচ কর না, সর্ব্বাগ্রে আমায় সম্বাদ দিবে আমি স্বহস্তে তাহার ঘাড় মুচড়াইব।

এই শেষ কথাগুলি চূড়াধন দন্তপিসিয়া বলিলেন। "আচ্ছা," বলিয়া আগন্তুকেরা চলিয়া গেল, চূড়াধন বাবু ক্ষণেক দ্বারে দাঁড়াইয়া শেষ অন্তঃপুরে গেলেন। এই সময় বৈঠকখানা হইতে চতুর্থ আর এক ব্যক্তি অতি সাবধানে বাহির হইল। দ্বারবান্ তাহারে অতি যত্নে দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিল "দেখিবেন আমি যেন মারা না যাই।" "কুচপরয়া নাই" বলিয়া অপরিচিত ব্যক্তি চলিয়া গেল।

মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য কি? একথা লইয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে আজি পর্য্যন্ত যে কত আন্দোলন হইয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। কত লোক যে কত কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহার নির্ণয় হয় না। যাঁহার যেরূপ প্রকৃতি, যাঁহার যেরূপ শিক্ষা, যাঁহার যেরূপ সহবাস, যাঁহার যেরূপ সমাজ তিনি সেই-রূপ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মত লইয়া আবার অনেকে কত বিবাদ বিসম্বাদ করিয়াছে কত বাক্ বিতণ্ডা করিয়াছে কত রাশি রাশি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছে। যখন বৈদিক সময়ে মনুষ্যজীবনের প্রথম অবস্থা, যখন মনুষ্যপ্রকৃতির অসীম ক্ষমতা দৃষ্টে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সর্ব্বত্র দেবতা দেখিত ও সেই দেবতাদিগের আরাধনা করিত তখন যাগযজ্ঞ স্তবস্তুতিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ছিল, ক্রমে যখন চিন্তাশক্তি প্রবল হইতে লাগিল যখন পৃথিবীর সুখের সঙ্গে জন্মজরামরণকৃত দুঃখ অত্যন্ত ও একান্ত মিশ্রিত বোধ হইতে লাগিল তখন ইহলোকের সুখে বিসর্জ্জন পরলোকের শুদ্ধ চৈতন্য ভাবে অবস্থান করাই (মুক্তিই) জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। যখন অসংখ্য অনার্য্য-গণের মধ্যে আর্য্যজাতির সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল তখন বংশবৃদ্ধি করিয়া পিতৃ পিতামহের নাম রক্ষা করা জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। যখন দারুণ রৌদ্রতপ্ত আরবীয়গণ মহম্মদের মত অবলম্বন করতঃ প্রথম সভ্যতা-সোপানে আরোহণ করিল—প্রথম চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইল তখন মৃত্যুর পর দিব্যাঙ্গনাসংসর্গে স্বর্গপুরে মদিরাপান করাই বিধেয় স্থির হইল। যখন পুরোহিতপদদলিত ইউরোপ অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন তখন ধর্ম্মের জন্য পুরোহিত-দিগকে অকাতরে ধনদান করাই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া সংকল্পিত হইল। ইহা অপেক্ষাও আবার যখন ইউরোপের অবস্থা ক্রমশঃ অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিল তখন পোপ মহাশয় ঈশ্বরের নায়েব দাওয়ান হইয়া স্বর্গের এক প্রকার নোট (indulgences) প্রচার করিলেন, সেই নোট ভাঙ্গাইয়া

যে টাকা দিবে তাহারই জীবন ধন্য ও সেই "স্বর্গলোকে মহীয়তে" স্থিরীকৃত হইল।

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অবস্থায় জীবনের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন পরিগণিত হইয়াছে। সমাজ যখন প্রথম উন্নতির মুখে তখন একরূপ উদ্দেশ্য, যখন উন্নতি হইতেছে তখন একরূপ, যখন অতি উন্নতি তখন আর একরূপ। আবার যখন সমাজ অধঃপাতে যাইতেছে তখন আর এক প্রকার।

ন্যায়সূত্রে প্রয়োজন নামে একটী পদার্থ আছে তাহার দুই অঙ্গ, মুখ্য ও গৌণ। সুখ লাভ মুখ্য উদ্দেশ্য, দুঃখনাশ গৌণ। বস্তুতঃ মনুষ্যজীবনে যা কিছু করা যায় তাহার উদ্দেশ্যই সুখ। কিন্তু দুঃখনাশ ব্যতীত সুখ হয় না। এজন্য দুঃখনাশও গৌণ প্রয়োজন অবধারিত হইয়াছে। দুঃখনাশ উপায়, সুখ উদ্দেশ্য। কিন্তু সুখ কি? আবার গোলযোগ! কেহ বলিবেন পরলোকের সুখই সুখ, কেহ বলিবেন ইহকালের সুখই সুখ কেহ বলিবেন দুঃখ ও সুখ দুই খারাপ, দুইএর নাশই ভাল। কৃপণ বলিবেন অর্থসংগ্রহই সুখ, কেরাণী বলিবেন গার্হস্থ্য সুখই সুখ, পণ্ডিত বলিবেন লেখাপড়ার সুখই সুখ, স্বদেশহিতৈষী বলিবেন দেশের মঙ্গলই সুখ। আবার সেইরূপ লোকের শিক্ষা, প্রকৃতি, সংসর্গ, সহবাস, জাতি, গুণে সুখের আকার ভিন্ন ভিন্ন। আমি যাহাকে দুঃখ বলি রামা চাঁড়াল তাহাকে সুখ বলে, আমি যাহাকে সুখ বলি রামা চাঁড়াল তাহাকে আহাম্মকী বলে, নবীন কেরাণী তাহাকে দারুণ কষ্ট বলে। আমি কলম চালাইয়া জীবনের উদ্দেশ্য কি ভাবিয়া অস্থির হইতেছি আমার ইহাতে যদি আনন্দ না হইত কখন একর্ম্ম করিতাম না কিন্তু আমার পাশে বসিয়া একজন বলিতেছেন, আরে ভাই যার জীবনের যে উদ্দেশ্য সেই তাহা বুঝিবে তোর এত মাথা ব্যথা কেন?

জীবনের উদ্দেশ্য কি, বুঝিতে হইলে আগে জীবন কাহাকে বলিতেছি তাহা জানা চাই। আমরা ধর্ম্মজীবন নৈতিক জীবন আধ্যাত্মিক জীবন পরমার্থিক জীবনের কোন কথাই বলিতেছি না। আমরা মনুষ্যজীবন মাত্রের কথা কহিতেছি। মনুষ্যের জীবনটা কি? শুদ্ধ জন্ম হইলেই কি জীবন হইল। তাহা নহে। জীবন বলিতে গেলে জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত মনুষ্য যে প্রকারে বাঁচিয়া থাকে তাহার নাম জীবন। মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াই বহুসংখ্যক কষ্টকর ও জীবন অতিকর প্রাকৃতিক নিয়ম ও পদার্থে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে। জীবন আর কিছু নহে এই সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে প্রতিনিয়ত নিমেষাস্ত বা ব্যবহিত যুদ্ধের নাম জীবন। মনুষ্যকে কষ্ট দিবার ও মনুষ্যজীবন নাশ করিবার জন্য কত শত কারণ রহিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। যে বায়ু মনুষ্যের পরম বন্ধু যাহা ভিন্ন এক

মুহূর্ত্ত চলে না সেই বায়ুই কত সময় পীড়ার কারণ, কত সময় ঝড়রূপে সহস্র সহস্র মনুষ্যবধের কারণ হয়। যে জল নহিলে এক দণ্ড চলে না সেই জল খারাপ হইয়া কত দেশ একেবারে জনশূন্য বিজন-অরণ্যে পর্য্যবসিত করিয়াছে। কত দেশ বণ্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। এ সকল ত উপকারী জিনিসে অপকার করিতেছে, কত কত জন্তু আছে মনুষ্যের জীবন অপহরণই তাহাদের উদ্দেশ্য, কত কত বিষাক্ত দ্রব্য আছে তাহার স্পর্শে জীবন নষ্ট হয়, কত কত পদার্থ আছে যাহাতে জীবন একেবারে নষ্ট না হউক, ক্রমে মনুষ্যের শরীর ও মন অবসন্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া আসে। স্বভাবের নিয়মে এমন অনেক মনোবৃত্তি অপর ব্যবহার জন্মাইয়া দেয় যাহাতে নিঃশব্দে অথচ নির্ব্বিরোধে মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলে। এমন বিষ আছে যাহা একবার খাইলে যাবজ্জীবন কষ্ট পাইতে হয়। নির্ব্বোধ চিন্তাশক্তিশূন্য সদসৎবিবেকরহিত এমন অনেক পশুবৎ মনুষ্য আছে যাহাদের সহিত একবার সংসর্গ হইলে যখনই তাহাদের কথা মনে হয় তখনই মনে মনে কষ্ট হয় ঘৃণা হয়। এই সকল অপকারী দুঃখদায়ক কারণ পরম্পরার সঙ্গে অনবরত রণ করিয়া জয়ী হইয়া স্বচ্ছন্দে অক্লেশে দীর্ঘকাল পৃথিবীতে থাকার নাম জীবন। এরূপ যুদ্ধে যে সর্ব্বত্র মনুষ্য জয়ী হইতে পারিবে এমত নহে, অনেক সময় এমন করিয়া চলিতে হইবে যে পূর্ব্বোক্ত প্রকার দুঃখকর সামগ্রী কোনরূপ অপকার করিয়া উঠিতে না পারে, অনেক সময় উহাদের হস্ত হইতে পলাইয়া পরিত্রাণ পাইতে হয়। উদাহরণ প্রতিবৎসর ৫।৬ বার করিয়া ঋতু পরিবর্ত্তন হয় প্রতি ঋতুতে বিভিন্ন প্রকার আহার, বিভিন্ন প্রকার পরিধেয়, বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার প্রয়োজন। ঋতু তুমি পরিবর্ত্তন করিও না বলিয়া রাখিবার ক্ষমতা মনুষ্যের আজিও হয় নাই, সুতরাং বিধিমতে চেষ্টা করা উচিত যে এই দুঃখদায়ক পরিবর্ত্তন কোন ক্ষতি করিতে না পারে। এইরূপ নানাপ্রকার দুঃখকর যন্ত্রণাময় কষ্টসঙ্কুল অবস্থায় আপনাকে এমন করিয়া চালাইতে হইবে যে কোনরূপ কষ্ট না হয়। এই প্রকারে সুন্দর রূপে আপনাকে চালানর নাম জীবন। রোগ শোক প্রভৃতি যত কিছু মনুষ্যের কষ্ট আছে সে সকলই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চলিতে না পারার দোষ। এতক্ষণ যে আমরা কেবল বাহ্য জগতের অবস্থার সঙ্গেই মিলাইয়া চলিতে বলিতেছি এমত নহে। অন্তর্জগতের অবস্থার সঙ্গেও মিলাইয়া চলিতে হইবে। মনুষ্য স্বজাতিসংসর্গ ভিন্ন চলিতে পারে না। কিন্তু যেমন নিতান্ত প্রয়োজনীয় বায়ুও অনেকস্থলে জীবননাশক হয় সেইরূপ মনুষ্যের সংসর্গও সময়ে সময়ে সর্ব্বনাশের হেতু হয়। যে মানুষ আপনাকে পূর্ব্বোক্তরূপে চালাইতে না পারে সে মানুষ খারাপ হইয়া যায় তাহার সংসর্গে লোকের অনেক দোষ জন্মায়। সে যেমন বইয়া গিয়াছে অন্য লোকও তাহার সঙ্গে থাকিলে তেমনি বইয়া যায়। অতএব দূষিত বায়ু যেমন

পরিহার্য্য দূষিত মনুষ্যও সর্ব্বতোভাবে পরিহরণীয়। এইরূপে শরীরস্থিত ও অন্তর্জ্জগৎ এবং বহির্জ্জগৎস্থিত কার্য্য কারণ পরম্পরার যে সকল বিরোধ আছে সেই সকল বিরোধের কোথাও প্রতিবিধান করিয়া কোথাও হস্ত এড়াইয়া সকল অবস্থায় শারীরিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের নাম জীবন। অনেকে বলিবেন তবে স্বার্থপরতাই জীবন? তাহার উত্তর এই যে জীবনটুকু পূর্ণ স্বার্থপরতা, ঐ স্বার্থপরতাটুকু নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই স্বার্থপরতাটুকু যে শুদ্ধ আমরাই আজি জাহির করিতেছি এমন নহে শত শত বৎসর পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় মনুও বলিয়াছেন।

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্যচ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণং॥

তাঁহার মতে আপনার প্রিয়ও একটি প্রধান ধর্ম্ম কিন্তু কোনটি আপনার প্রিয় সেটি বাছিয়া লইতে অনেক কষ্ট হয় তাহার জন্য উত্তম শিক্ষা আবশ্যক, নহিলে একজন অশিক্ষিত লোক আজি আপনার প্রিয় বলিয়া এক কাজ করিয়া বসিল কালি তাহা তাহার ঘোরতর অপ্রিয় হইল সে হয় ত ইহজন্মের মত মাটী হইল। কিন্তু শিক্ষিত লোকের চক্ষে আপনার প্রিয় কি? পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিরোধের হাত হইতে উদ্ধারের নামই সেই প্রিয় বস্তু।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নিরন্তর বিরোধ যেখানে, সেখানে সকলেই যে, সে সমস্ত বিরোধের হাত হইতে উদ্ধার হইবে তাহা কখনই সম্ভব নহে। অনেকে দুই এক জায়গায় প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিলেন না। অনেকে বাহ্যজগতের প্রাতিকূল্যের সহিত বিরোধ করিয়া রোগগ্রস্ত হইলেন, অনেকে অন্যান্য সাংসারিক সামাজিক অনেক কারণে যে ভাবে আপনাকে চালান উচিত সেভাবে আপনাকে চালাইতে পারিলেন না। তবে তাহার জীবন কি জীবন বলিয়া পরিগণিত হইবে না? অবশ্য হইবে। তাঁহারা যদি সেই অবধি সামলাইয়া বরাবর ভাল করিয়া চলিতে পারেন তাঁহাদের জীবনও জীবন, আর না পারেন তাঁহাদের দুঃখে শৃগাল কুক্কুর রোদন করে, তিনি বাঁচিয়া থাকেন বটে কিন্তু সে জীবন্মৃত তাঁহার বাঁচিয়া সুখ নাই। তিনি নিজেও ভাবেন—

দুঃখসংবেদনায়ৈব ময়ি চৈতন্য মাহিতং।

আর তাঁহার নিকটস্থ লোকদিগকে শিক্ষা দেন যে জগৎ দুঃখময়, ইত্যাদি। তাদৃশ লোকের প্রতি শ্রদ্ধা বা অনুকম্পা প্রদর্শন উচিত কি না সে বিষয়ে খুব সন্দেহ। আবার যাঁহারা একবার দুষ্কর্ম্ম করিয়া পরে শোধরাইয়া গেলেন তাঁহারাই

কি যাঁহারা কখন নিয়ম লঙ্ঘন করেন নাই তাঁহাদের মত হইতে পারেন ? কখনই না। জীবনের ঐ এক দুর্ঘটনা স্মৃতি চিরদিন তাঁহাদের মনে মনে না হয় শরীরে গাঁথা থাকে তাহাতে তাঁহাদের শরীর ও মনের সর্ব্বতোমুখী উন্নতি হইতে দেয় না।

যাহারা পূর্ব্বোক্ত বিরোধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া রীতিমত আপনাকে চালাইতে পারে তাহাদের শরীর সুস্থ থাকে, শরীর বলিষ্ঠ সুন্দর কর্ম্মক্ষম তেজস্বী হয়, তাহাদের মনোবৃত্তি সকলও পরিবর্দ্ধিত হয়। শুদ্ধ বুদ্ধিশক্তি, শুদ্ধ হৃদয়বৃত্তি, শুদ্ধ কর্ম্মক্ষমতার উন্নতি হইয়া নিবৃত্ত হয় না, সকল প্রকার মনোবৃত্তিই তাহাদের পরিপুষ্ট হয়। তাহাদের দ্বারা জগতের অনেক কাজ হয় তাহারাই সমাজের শক্তি। সুস্থশরীরে সবল মন থাকাই অনেকে মনুষ্যজীবনের প্রধান সুখ মনে করেন। তাহা নহে। সেটী সম্যক্‌পরিপুষ্ট ও উন্নত মনুষ্যজীবন মাত্র, মনুষ্যের জীবনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। সুস্থ শরীর ও সবল মন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। তাহা উদ্দেশ্য নহে। এক্ষণে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য কি দেখা যাউক।

মনুষ্য যখন জন্মগ্রহণ করিল তখন তাহার মত নিঃসহায় অকর্ম্মণ্য জানোয়ার আর নাই ; এক বৎসর যাবে কথা ফুটিতে, দুই বৎসরে হাটিতে শিখিবে, তাহার পর কত কি শিখিলে পরে তবে সে আপনার আহার সঞ্চয় করিবার মত শক্তি পাইয়া স্বাধীন হইবে। এইরূপে স্বাধীন হইতে মনুষ্যের ২৭ বৎসর লাগে। এই সাতাইশ বৎসর পর্য্যন্ত সমাজ তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া তাহার যত্ন করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিল তবে সে স্বাধীন হইয়া নিজে খুঁটিয়া খাইতে শিখিল। যদি বল সমাজ খাইতে দিল কই, দিল তার বাপ মা। সত্য, কিন্তু বাপ মাই খাইতে দেয় কেন ? সেও সমাজের নিয়ম বলিয়া ত। প্রাচীন রোমে অনেক বাপ মা ছেলে হবামাত্র রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া আসিত, আরো কত যায়গায় যে ছেলে ফেলিয়া দিবার প্রথা ছিল তাহার ঠিকানা নাই। ক্রমে সমাজবন্ধন যত দৃঢ় হইতে লাগিল ততই সন্তান প্রতিপালন পিতা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইল। তাহার পর অনেক পিতামাতা সন্তান প্রতিপালন করিয়া উঠিতে পারেন না, অনেক জায়গায় পিতামাতা বালকের বাল্যকালেই কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকেন, এ সর্ব্বত্রই ত সমাজ যে কোন রূপে ছেলেগুলিকে বাঁচাইয়া রাখে, কোন ছেলে পরের দয়ার উপর নির্ভর করে, কেহ দীর্ঘকাল শিক্ষানবিস থাকে। যে রূপেই হউক পিতামাতাই হউক, আত্মীয় বন্ধুই হউক, উদাসীনই হউক, সুনিয়মবদ্ধ দানপ্রণালীই হউক সবই সমাজ-বন্ধনের হেতুই হইয়া থাকে। সমাজবন্ধন না থাকিলে শতকরা নিরনব্বই ছেলে মারা যাইত।

অতএব যখন সাতাইশ বৎসর বয়সে মনুষ্য স্বাধীন হইয়া নিজের উপার্জ্জনে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিল তখন তাহার দেনা অগাধ। এখন হইতে সে যদি শুদ্ধ আপনার মত রোজগার করিয়াই ক্ষান্ত তবে সে মহাপাতকী জুয়াচোর, কারণ সে দেনা শোধ দিবার কোন উপায় করে না। আবার অনেকে আছেন তাঁহারা একেবারে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জনের কোন উপায়ই করেন না। তাঁহারা সমাজের পরম শত্রু, তাঁহাদিগকে ধরিয়া ফাঁসি দেওয়াই কর্ত্তব্য, যেহেতু তাঁহারা অন্য লোকের ন্যায্য উপার্জ্জনের কড়ি লইয়া অনর্থক নষ্ট করেন, কারণ যে নিজে রোজগার করিবে না তাহার জীবন ধারণই অনর্থক। ডাকাইত, জুয়ারি আর ভিক্ষুক এই তিন জন শেষোক্ত প্রকারের লোক। যাঁহারা আপন ক্ষমতাতীত দেনা করেন পরের টাকা লইয়া দাঁওমারা ব্যবসায় ও বাবুগিরি করেন তাহারাও এই শ্রেণীভুক্ত। অতএব যাঁহারা শুদ্ধ নিজের মত রোজগার করিয়া ক্ষান্ত হন ও যাঁহারা রোজগার না করেন তাঁহারা আপনাদেরও কর্ত্তব্য-সাধনে বিমুখ, তাঁহাদিগকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া উচিত। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত দেনা শোধ দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন ও দেন তাঁহারা আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্যক্ সাধন করেন। কিন্তু শুদ্ধ কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধনই ত জীবনের উদ্দেশ্য নহে। তাহার উপর আরও কিছু করিতে হইবে।

এখানে এক প্রশ্ন হইতে পাবে সমাজের দেনা কিরূপে শোধ দেওয়া যাইতে পারে। তাহার উত্তর এই যে সমাজের উপকার কর। তোমার নিজের সন্তান সন্ততির সুন্দররূপে প্রতিপালন কর, তাহাদের উত্তমরূপে শিক্ষা দাও, সমাজের যখন প্রয়োজন হইবে তখন তাহার জন্য অর্থ সামর্থ ও প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হইও না, যাহাতে সমাজের উপকার হয় সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা কর; এইরূপেই সমাজের দেনা শোধ হইবে।

কিন্তু মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যসাধন শুদ্ধ এই হইলেই হইবে না, বৃদ্ধ অবস্থায় খতাইয়া জেন যদি তোমার দেনা থাকে তবে তুমি মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পার নাই, যদি ঠিক ঠিক হয় তুমি আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়াছ মাত্র কিন্তু যদি তোমার হিসাবে বেশী থাকে তবে তোমার জীবন সার্থক। যত বেশী থাকিবে ততই তোমার বাহবা। নিজ বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পার, পরিশ্রমের দ্বারা পার, ধন দ্বারা পার কর্ত্তব্য যাহা আছে তাহার অপেক্ষা সমাজের অধিক উপকার করিলেই তোমার মনুষ্যজীবন সার্থক।

সেকালে এক গল্প শুনিয়াছি, এক রাজার এক মন্ত্রী ছিল। তাহার বেতন লক্ষ টাকা। তাহাকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন; মন্ত্রিবর, তোমার এত টাকার

কি দরকার ? সে বলিল, মহারাজ, ইহার চৌথ শোধ দিতে হয়, চৌথ ধার দিতে হয়, চৌথ আহার করা যায়, আর চৌথ অসময়ের জন্য সংগ্রহ করি। মন্ত্রিবর ঠিক বলিয়াছিলেন যে লোক ধার শোধ দিয়া ও ধার দিয়া যাইতে পারে সেই ধন্য। মনুষ্যজীবনের দেনা যে যাহার নিকট হইতে লইয়াছি তাহাকেই শোধ দিতে হইবে তাহা নহে। লইলাম সমাজের নিকট, দিলাম সমাজকে ; পিতা-মাতার খাইয়া মানুষ হইলাম, মানুষ করিলাম সন্তানকে। দাতার খাইয়া মানুষ হইলাম, দিলাম অনাথকে। দরিদ্রালয় হইতে মানুষ হইলাম, স্থাপন করিলাম বিদ্যালয় ! গুরুর নিকট উপদেশ পাইলাম, শিক্ষা দিলাম ছাত্রকে। গ্রন্থকারের নিকট উপদেশ পাইলাম, নিজে গ্রন্থ পাঠ করিয়া রচনা করিয়া তাহার ঋণ শোধ দিলাম। কিন্তু সর্ব্বত্র চেষ্টা করা উচিত যাহা পাইয়াছি তাহা অপেক্ষা অধিক দেওয়া। পৈতৃক সম্পত্তি কাহারও নয় সমাজের নিয়মে আমি তাহা পাইলাম। সমাজ আমায় দেওয়াইয়া দিল, আমি সমাজের নিকট ঋণী, 'আমি যদি সেই টাকা তিন দিনে ফুঁকিয়া দিই তবে আমি পাপী, আমি সমাজের সর্ব্বপ্রকার দণ্ডের যোগ্য ; যদি তাহা কোনরূপে সঞ্চিয়া বঞ্চিয়া রাখিয়া যাই তবে আমার মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, আমি শুদ্ধ পাকা দ্বারবানের কাজ করিলাম বটে, কিন্তু যদি সেই টাকা লইয়া খাটাই তাহাতে সহস্র লোকের জীবন নির্ব্বাহ হইয়া আবার আমার টাকা বাড়িয়া যায় তবে আমি সার্থকজন্মা। আমি যখন পৈতৃক সম্পত্তি বিনাপরিশ্রমে পাইয়াছি তখন আমি যে না পাইয়াছে তাহা অপেক্ষা সমাজের নিকট অধিক ঋণী, সেই ঋণ পরিশোধের জন্য আমার তাহাদের অপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম চেষ্টা ও যত্ন করা একান্ত উচিত। যিনি স্বাভাবিক বুদ্ধিশক্তি অধিক পাইয়াছেন তাঁহার একটা মস্ত সুবিধা বিনা পরিশ্রমে পাওয়া হইয়াছে, তাঁহার উচিত সেই পরিমাণে সংসারের উন্নতির চেষ্টা করা। যে বালক অনেক সুবিধায় উত্তমরূপ শিক্ষা পাইয়াছেন তাঁহার নিকট সমাজ অনেক আশা করে। যেহেতু সমাজে তাঁহার চারিদিক হইতে সুবিধা করিয়া দিয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই যে খতাইয়া যে অল্প বা অধিক স্থির করিতে হইবে তাহার উপায় কি ? কোনরূপ তুলাদণ্ড ত নাই যাহাতে কার কাজ বেশী হইল কার কম হইল তা জানা যাবে, তাহার নিখতি নাই সের বাটখারা নাই ওজন নাই মাপ নাই ; টাকায় তাহার মূল্য করা যায় না যে জানিলাম ৫০০ টাকা ধার আর এই ১০০০ টাকা জমা, ধার শোধ দিয়াও ৫০০ টাকা অধিক থাকিবে। কিন্তু মন তাহার সের বাটখারা লইয়া বসিয়া আছে, আপনার মনে যে আত্মপ্রসাদ জন্মে সেই তাহার মাপ। আর একমাপ যশঃ বাহিরের লোকে তোমায় ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছে, তাহারা তোমার কাছ থেকে যতটুকু আশা করে তাহা অপেক্ষা

তুমি যদি অধিক করিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাহারা তোমার সুখ্যাতি করিবে। অতএব যশ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য নহে, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে তাহার পরিমাপক মাত্র। যাহারা সমস্ত জীবন কেবল কিসে লোকে ভাল বলিবে কিসে লোকে ভাল বলিবে এই ভাবনায় অস্থির কেবল লোককে খুসী করিবার চেষ্টায় ফিরে তাহাদের যদি সার না থাকে তাহা হইলে তাহাদের সমস্ত উদ্যম বৃথা তাহারা কেবল লোকের হাস্যাস্পদ হয় মাত্র। যাহাদের সার আছে তাহাদের যশঃ সুখ্যাতি বাঁধা। যাহারা যশকে জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে তাহারা সের বাটখারাকে মাপ বলিয়া কিনিয়া লয়।

অনেকে মনে করেন বিদ্যা জীবনের উদ্দেশ্য, আত্মোন্নতি জীবনের উদ্দেশ্য। আমাদের দেশে প্রথা ছিল যে বিদ্বান্‌ব্যক্তিদিগকে দান করিবে তাহাদের সর্ব্বতোভাবে উৎসাহ দিবে। কিন্তু বিদ্যা যদি খরচ না হইয়া শুদ্ধ পেটে গজ গজ করে তবে বিদ্যায় কাজ কি? ' যদি সেই বিদ্যা দ্বারা তুমি আপন দেনা শোধ দিয়া সমাজকে কিছু ঋণ দিয়া যাইতে পার তবে ত জানি তোমার জীবন সার্থক নচেৎ তোমার পেটে বাঙ্ময় পোরা থাকিলেও তুমি যদি কেবল আপনার পেট চলিলেই খুসী থাক তবে তোমার বিদ্যার মুখে আগুন।

তাহাই বলিতেছি যে বিদ্যা যশঃ ধন মান পরোপকার এই সকল অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ হইলেও ইহার কোনটিই জীবনের উদ্দেশ্য নহে। নিজের শরীর ও মনের উন্নতি হইয়া নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া তাহার পর বিদ্যা দ্বারা হউক, বুদ্ধি দ্বারা হউক, ধন দ্বারা হউক পরিশ্রম দ্বারা হউক সমাজকে কিঞ্চিৎ ঋণী করিয়া যাইতে পারিলে জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল। নচেৎ শুদ্ধ বিদ্যা লইয়া ধন লইয়া শক্তি লইয়া স্বাস্থ্য লইয়া ধুইয়া খাইলে কিছুই হইবে না।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

বাল্য উদরাময়। শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দত্ত প্রণীত। বহরমপুর। অরুণোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৷৷০ আনা।

গোবিন্দ বাবু অবতরণিকায় লিখিয়াছেন যে "বালকের একমাত্র ভাষা রোদন। রোগে রোদন, বেদনায় রোদন, ক্ষুধায় রোদন, প্রার্থনায় (?) রোদন, ঘুমাইতে রোদন, জাগিতে রোদন, রোদন বই আর কথা নাই। প্রসূতিরও দৃঢ় বিশ্বাস শিশু রোদন করিলেই বুঝিতে হইবে, তাহার ক্ষুধা হইয়াছে। অমনি জোর করিয়া ক্রোড়ে ফেলিয়া স্তন্য পান করাইতে বসেন। ইহা একবারও তাঁহার মনে হয় না পুত্রের রোদনের ক্ষুধা ব্যতীত আরও সহস্র কারণ থাকিতে পারে। এই কারণে অনেক সময়েই ক্ষুধা না থাকিলেও আহার হয়—অজীর্ণ হয়—উদরাময় জন্মে।" এইরূপ আরম্ভ দেখিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম যে গ্রন্থখানি গৃহস্থদের নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা পাঠ করিয়া সতর্ক হইতে পারিবে এবং নিতান্ত আবশ্যক হইলে আপনারাই ব্যবস্থা করিতে পারিবে। পরে দেখিলাম গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হউক, নেটিব ডাক্তারদিগের নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ নিম্নস্থ কয়েক পংক্তি ২৫ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

"স্নানের জলের উষ্ণতা ৯২ ডিগ্রি অথবা ৯৫ ডিগ্রি ফ্যারনহিট পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করা যায়। এই ঈষৎ উষ্ণ জলে সন্তানকে ছয় অথবা আট মিনিট পর্য্যন্ত নিমগ্ন করিয়া রাখিবেক এবং শীতল জলে স্পঞ্জ অথবা ন্যাকড়া ভিজাইয়া তাহার মস্তক মুছাইয়া লইবে।" ঔষধের নাম গুলিও ল্যাটিন। বিলাতি ঔষধের বাঙ্গালা নাম কোথা পাওয়া যাইবে। নেটিব ডাক্তারগণ এই গ্রন্থ পড়িয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন কি না জানি না কিন্তু যে প্রণালীতে লেখা হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় উপকার হইবে।

মানব সংস্কারক। শ্রীসেখ আবদুল লতিফ কর্ত্তৃক লিখিত। মেদিনীপুর। মূল্য ৷৹ আনা।

গ্রন্থকারের নাম পড়িয়া ভাষা সম্বন্ধে আমাদের ভয় হইয়াছিল কিন্তু পরে দেখিলাম যে গ্রন্থখানি হিন্দুর বাঙ্গালায় লিখিত, কায়স্থের ভাষায় লিখিত, ব্রাহ্মণের ভাষা বলিলেও ক্ষতি নাই। তদ্ব্যতীত প্রশংসার আর কিছুই নাই।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরিভ্রমণ

নদী পার হইয়া কিয়দ্দূর আসিতেই নভোমণ্ডল ঘন ঘোরে আবৃত দেখা গেল। তাহার সঙ্গে ঝড় উঠিল। সঙ্গিগণ কহিলেন দেবতা দুর্যোগ করিবে, সন্ধ্যা উপস্থিত, সম্মুখে ঐ পল্লীতেই অদ্য রাত্রে অবস্থান উচিত। তথায় পঁহুছিবামাত্র দেখিলাম সে পল্লীটি অতি ক্ষুদ্র, বহুজনের থাকিবার স্থানাভাব। আমি কহিলাম এখনো বেলা আছে, সম্মুখে ঐ বড় গ্রামে চল। সঙ্গীরা কহিল বেলা নাই, পথিমধ্যেই রাত্রি উপস্থিত হইবে, তাহাদের ভ্রম আমি সঙ্গে সঙ্গে দেখাইয়া দিলাম। কৃষিগণের ক্ষুদ্র মঞ্চে ঝিঙ্গা-কলিকা এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত রহিয়াছে, সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইলে অবশ্যই কোমল জরদরঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলগুলি এতক্ষণ প্রস্ফুটিত হইত, সকলে আমার কথা গ্রহণ করিলেন, বিস্তৃত ময়দান হইয়া আমরা শান্তিপুরগ্রামে পহুছিলাম। রাঙ্গাঠাকুরাণীর পিতৃগৃহে আজ থাকা উচিত বোধ হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম সম্মুখের দ্বার দৃঢ় অর্গলবদ্ধ, গৃহবাটী সব নিস্তব্ধ, "পালানে ঘর" যেন কেহ কোথাও নাই; বাটীর অলিগলি আমি সব জানিতাম, একটী গুপ্ত দ্বার হইয়া অন্তঃপুরে গেলাম, সকলে কহিয়া উঠিলেন "এ কি! বাছা, আজ এ গ্রামে আসিতে হয়? এখানে থানাদার দেড়ে দারগা আসিয়াছে।" অন্দর হইতে বাহির বাটীতে আসিয়া দেখিলাম সদর দ্বার বন্ধ—গ্রামের অধিকাংশ প্রজা স্থানে স্থানে নীরবে বসিয়া রহিয়াছে—আমাকে দেখিয়াই কেহ কেহ চমকিত হইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া কহিলাম আমি দারগা সাহেবের লোক, তোমাদিগকে ধরিতে আসিয়াছি, দুই চারিজন কুটীরে প্রবেশ করিলেন। একটী বৃদ্ধ আমাকে চিনিয়া কহিলেন "বটে ভাই, তুমিও কালে এইরূপ দোর্দ্দণ্ড হইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের

কি বিপদ উপস্থিত—কি অপরাধে গ্রামস্থ এত লোক অবরোধে আবদ্ধ? বৃদ্ধ কাণে কাণে কহিলেন "শুন নাই? গ্রামে ডাকাতি হইয়াছে—দারগা আসিয়াছে, আজ তিন দিন আমরা প্রায় অনাহারে যাপন করিতেছি।" আমি কহিলাম দারগার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তাহাকে এত ভয় কেন? বৃদ্ধ কহিলেন "এটি যথার্থই ডাকাবুক ছেলে, দারগার কাছে যাইবার আবশ্যক? দাদা, রাত্রে গোপনে এখানে নিদ্রা যাও, প্রত্যূষে প্রস্থান করিবে, এমন অসময়েও এ গ্রামে প্রবেশ করিতে হয়?" এই সময় বাহিরের কপাটে একটি ধাক্কা পড়িল—ভীরু প্রজাকুল সঙ্কুচিত হইয়া কুটীরে লুকাইল—কাহার এতদূর সাহস হইল না—দাঁড়াইতে পলাইতেও সাহস চাই, কেহ কেহ পদ সঙ্কোচ করিয়া দুইটি জানুমধ্যে মস্তক রাখিয়া চক্ষু মুদিলেন; আর ভয় কি? এদিকে আঘাত আরো বাড়িল, কেহ উত্তর দেন না—আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না, কহিলাম "কে রে?" একজন দাম্ভিক স্বরে কহিল "কে রে!" "আমি তোমার রে? এবার রে দেখিয়ে দিব। কেওয়াড়ি খোল তব দেখা জাগা।" আমি কহিলাম "উঃ আবার হিন্দি চালান"—পুরুষ তখন আরো ক্রোধে কপাটে পদঘাত করিলেন ও কহিলেন "খুল্‌বে ত খুল না হয় ভাঙ্গিয়া ফেলি"। আমি কহিলাম, জোর ত ভারি এখন ত গর্জ্জনের শেষ রহিল না—এ দিকে বৃদ্ধ আমার হাতে ধরিয়া বিনয় করিতে লাগিলেন ও কহিলেন, আর বাড়াইও না—যে ব্যক্তি বাহিরে গর্জ্জন করিতেছিলেন আমি জানিতাম। আমি কহিয়া উঠিলাম "ও কমরুদ্দি চাচা, আমায় চিনিতে পার না—কি চাই বল সব হাজির।" কুমুরুদ্দি কহিলেন চারি সের দুধ ও আট বোঝা কাঠ।" আমি কহিলাম "এই? আচ্ছা দেওয়া যাচ্চে" বৃদ্ধ প্রজাবর্গকে কহিলেন তাঁহারা খিড়কি দিয়া দৌড়িলেন, তাঁহারা গোপনেই বদান্যতার কার্য্য নিষ্পন্ন করিলেন। আমি এখন কপাট খুলিলাম। আমাকে দেখিয়াই কুমুরুদ্দি কহিলেন "বাবু আপনি এসেছেন তাই বলি বুড় চাচার সঙ্গে কে মসকরা করে।" কুমুরুদ্দিকে নিজকার্য্য সাধন জন্য রাখিয়া আমি দারগার এজলাস দেখিতে চলিলাম—এখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে আকাশ ঘোর—এই অন্ধকারেই দারগা সাহেবের এজলাস গরম হয়। কিন্তু সে এজলাস কিরূপে বর্ণন করিব। হে বাগ্‌বাণি! তোমায় কৃপায় মহৎ কবিগণ হোমর, ডেন্‌টি, মিল্টন, মধুসূদন প্রভৃতি নরক বর্ণন করিয়াছেন, পবিত্র আর্য্যকুলসম্ভূত জটাধারীর প্রতি কৃপা কেন না করিবে, আমি অনেক স্থান দেখিয়াছি, বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু এখানে আসিয়া কেন মোহে অভিভূত হইতেছি, হতাশে চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি। ইহার কারণ আছে—ইহা মিথ্যাচক্রেরও দারুণ নির্দ্দয় নিষ্ঠুরতার রঙ্গভূমি। দারগাসাহেবের আবাসগৃহ-

প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবামাত্র চারিদিক হইতে আর্ত্তনাদ শ্রবণকুহর বিদীর্ণ করিতে লাগিল—দৃষ্টি আরো ভয়ানক—এককোণে চারিটি লোকের পদযুগল উল্টাইয়া তাহাদের মস্তকের পশ্চাৎভাগে সমর্পিত হইয়াছে, কাহার পৃষ্ঠে হাত মুড়িয়া কড়কড় করিয়া বান্ধা হইয়াছে ও সেই বন্ধনসন্ধিস্থানে সমসের খাঁ বরকন্দাজের বৃহৎ চর্ম্মপাদুকাদ্বয় চট্ চট্ শব্দে পড়িতেছে, কেহ একহস্তে ও এক পায়ে রজ্জু বন্ধনে উচ্চ ধরণায় আলম্বিত, কেহ চীৎকার করিয়া কহিতেছে আমার হাত ভাঙ্গিয়া গেল বাপরে! কাহারও নখ ও আঙ্গুলির মধ্যভাগ খর্জ্জুর পত্রের কণ্টকবিদ্ধ হইতেছে, তথা হইতে রক্ত টশ টশ করিয়া পড়িতেছে। কোথাও দুইজন দাড়িতে দাড়িতে বান্ধা হইয়া লঙ্কা মরিচের নস্যঘ্রাণে হাঁচিতেছে ও উভয়ের মস্তকে মস্তকে যেন কোন কল কৌশলে টক ঠক ঠেকাঠেকি হইতেছে।

লজ্জার বিষয় কি কহিব! স্ত্রীলোকদের কি লাঞ্ছনা! তাহারা নিরাশ্রয় দরিদ্র লোক! যাহারা অনেক গোলযোগ অনেক অর্থ ব্যয় করিতে পারে তাহাদেরই আপিল আছে। কিন্তু ইহাদের আপিল ঈশ্বরের নিকট ভিন্ন আর কোথায়! কিন্তু এই প্রাঙ্গণ ইন্দ্রিয়-কেলির ক্ষুদ্র অভিনয়স্থল! যেমন একদিকে নিষ্ঠুরতা অশ্লীলতা আবার আর একদিকে হঠাৎ দেখিলে দাতব্যের রঙ্গভূমি বলিয়া বোধ হয়। তিন চারিটি শীর্ণ জ্যোতিহীন দরিদ্র নীচজাতীয় লোক আজ নূতন বস্ত্র পরিয়া প্রচুর আহার সামগ্রী অন্ন মৎস্য দধি ও দুগ্ধ মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতেছে। ইহারা কে? শুনিলাম একরারি আসামি, ইহাদের গৃহদ্বার, চালচুল ও জোৎজমি বাস্তুভূমি কিছুমাত্র নাই, বিবাহ হয় নাই কিন্তু এইবার ভাগ্যোদয় হইবে। ইহারা ডাকাইতের মুটে বা তল্পিদার হইয়া আসিয়াছিল কহিবে, দারগাকে ডাকাত ধরিয়া আহত করিতে দেখিয়াছে তাহাও উচ্চ বিচারস্থলে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবে; তাহা হইলেই সরকারের তরফ সাক্ষী হইবে, খালাস পাইবে; আর খালাস পাইলেই চৌকিদারী চাকরাণ পাইবে, চৌকিদারী কর্ম্ম পাইবে ও তাহা হইলে দেওয়ানজী সাধি বাগ্‌দিনীর মত কন্যার সহিত তাহাদের বিবাহ দিয়া দিবেন, তাহারা সন্তানসন্ততি লইয়া শ্রীমন্ত পুরুষ হইবে। দেওয়ানজী তাহাদিগকে এই সকল ভাবি সৌভাগ্যের প্রলোভ দিয়াছেন; বুঝাইয়াছেন, তাহারাও ভাল বুঝিয়াছে যে, একটু মিথ্যা বলিয়া যদি কপালে এত সুখ হয় তবে আর কাঁথা বগলে কি আবশ্যক?

এই এজলাস দর্শন করিয়া প্রভাতে পুনরায় যাত্রা করা গেল। কিয়দ্দূরে না যাইতেই ডাকবাবু চাটুয্যে মহাশয়ের দূত আসিয়া ঘেরিল। কোম্পানি বাহাদুরের হুকুম, তিনি আমাদের চারিজন বেহারা লইবেন, পশ্চিমাঞ্চলে যুদ্ধ হেতু বেহারা পাঠাইবার জন্য তাঁহার প্রতি হুকুম আসিয়াছে, কারণ এ চারি জন

বেহারা না হইলে লড়াই ফতে হইবার নহে। অনেকক্ষণ উভয়দলে বিবাদ, প্রায় দাঙ্গা উপস্থিত। নীলমণির অনেক টাকা, তিনি মুদ্রাদ্বয় দিয়া রফা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমি দূতের সর্দ্দারের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলাম এই তোমার নাম লিখিলাম; মেজেষ্টর সাহেবের কাছে লিখি, বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে কাগজ কলম লইয়া খস্ খস্ করিয়া ইংরেজি টানিতে লাগিলাম, দূত ইংরেজি লেখা দেখিয়াই ভয় পাইয়াছে। কহিল বক্‌সিস চাই না, টাকা ফেলিয়াই ডাক ঘরে সম্বাদ দিতে দৌড়িল, আমারাও এদিকে শিবিকা উঠাইয়া দিলাম।

আবার চলিতে আরম্ভ করা গেল। এতক্ষণ প্রান্তরে কোথাও শস্যক্ষেত্রের বাঁধ হইয়া কোথাও নদীর কূলে উচ্চ সেতু হইয়া আমাদের দলবল চলিতেছে। নদীর জল অনেক দূর—চরসমূহে কোথাও কেশে, কুশ, উলু, বেনার শুভ্রদল বাতাসে হেলিতেছে, ঘুরিতেছে তরঙ্গমালার স্বরূপ পুচ্ছবিস্তাব উন্নত বিন্নত হইতেছে। দূবে জলের সহিত মিশিয়া প্রকৃত জলবিস্তার বলিয়াই এইরূপ ভ্রম জন্মাইতেছে যে বিখ্যাত কোন তন্তুবায় চূড়দাস ভায়া সঙ্গে থাকিলে সাঁতার কাটীতে অবশ্যই সে বনে লম্বমান হইতেন। যাহা হউক এ দেশে "বান্ধা বাস্তা" নাই, তথাপি আমাদের গমনের এখনও অসুবিধা নাই।

কয়েকটি প্রান্তর অতিক্রম করা গেল। আকাশে হিমাগমের শুভ্র রাশি রাশি কার্পাসপিঞ্জিত মেঘাকৃতি মেঘমালা নিম্নে বিস্তৃত সমতলক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে এক একটি বৃহৎ অশ্বত্থ বা বটবৃক্ষ কিম্বা কোন স্থানে পদ্মকুসুমে শোভিত জলাশয় ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না।

এই বিস্তৃতক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া একটি ক্ষুদ্র খালের ঘাটে উপস্থিত হওয়া গেল; এইটী জেলার এক রাজমণ্ডলের (পরগণার) শেষ সীমা—এইটি পার হইলেই সদর রাজ বিভাগ। খালটি অতিক্রম করিয়া একটী বৃহৎ মৃত্তিকা নির্ম্মিত সেতু দৃষ্টি হইল, কেহ কহিয়া উঠিল "ওরে এই নয়া সড়ক।" কিন্তু সড়কে কেহ উঠিল না, তাহার তলে তলেই সকলে চলিল। আমি ভাবিলাম পথ থাকিতে বিপথে কেন গমন? কিন্তু বাহকেরা তাহা ভাবিল না, সেতুর পদতল হইয়াই আঁকিয়া বাঁকিয়া কাদা; কাঁটা, জল ভাঙ্গিয়া হুছোট খাইয়া কথা কহিতে কহিতে "কিয়দ্দূরে একটী জনপদে বিশ্রামস্থলে সকলে উপনীত হইলাম। এই চটিটি একটি বৃহৎ ক্রোশাধিক লম্বা দীর্ঘিকাতটে সংবেশিত হইয়াছে কিন্তু তাহার প্রবেশস্থলে দৃঢ় ফটকপার্শ্বে আদা হিন্দি বচনপ্রয়োগী পিয়াদাদ্বয় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমরা নিকটস্থ হইবা মাত্র কহিল "ওই! সরকারি মাসুল দিয়া

যাও।" একজন কহিল কিসের মাসুল? কিসের মাসুল মজাটা দেখাব "নূতন সড়ক দিয়া এলে না, ঢোল জারি আছে জান না।" ঢোল জারিকে ধন্যবাদ দিয়া তাহার কীর্ত্তিকে ধন্যবাদ দিয়া আমরা চটিতে প্রবেশ করিলাম। সকলে চলিল। আমি একটি সাথীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন যে, এই নন্দনপুরের থানা—খালের এই পারে চাঁদা সংগ্রহ হইয়া থাকে, সকলকে শুল্ক দিতে হয়, সেই টাকাতেই ঐ সেতু নির্ম্মাণ হইয়াছে। এই সেতুপথনির্ম্মাতা বিশ্বকর্ম্মার মহাকীর্ত্তি—শুষ্ক বা শীতকালে চলিলে পথিকের পদ পরিষ্কার থাকে। বর্ষাকালে গমন করিলে কর্দ্দমে নিমগ্ন হইয়া মরণের মাত্র আশঙ্কা থাকে। একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঐরূপ কর্দ্দমে মরায় এই ময়দানের নাম বামনমারী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

এদিকে আর একটি কীর্ত্তি দেখা গেল। ঐ ক্রোশাধিক বিস্তৃত দীর্ঘিকা, সকলে উহাকে "অসুর খাদ" বলে—শত শত বৎসর উহার একই ভাব, একই আকার রহিয়াছে, জলের হ্রাস বৃদ্ধি বড় কেহ দেখে নাই, চতুঃসীমায় দশখানি গ্রামের সহস্র সহস্র খান ধান্যভূমি এই জলে কর্ষণ হইয়া থাকে, প্রচুর মৎস্য জন্মে—ইহাও আশুতোষ বাবুর জমিদারীর অন্তর্গত, ইহা তাঁহার প্রজাদের বিশেষ সম্পত্তি—এই দীর্ঘিকা পল্লীস্থ, দেশস্থ, পথস্থ সহস্র সহস্র লোকের জীবনস্বরূপ। দীর্ঘিকার চতুঃপার্শ্বের মৃত্তিকারাশি পাহাড়ের স্বরূপ উচ্চ, তাহার উপর মধ্যে মধ্যে এক একটি পুরাতন শাল্মলী বা তেতুল বৃক্ষ দণ্ডায়মান, একটি তেতুল তলে পুরাতন ইষ্টকরাশি। সকলে কহে অসুর এই দীর্ঘিকা খনন করে, ঐ স্থানে তাহার গৃহ ছিল, এখন তিনি পীর হইয়াছেন, কারণ হস্তপদবিচ্ছিন্ন কতকগুলি মৃণ্ময় হস্তী হয় সেইস্থানে রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে। দেশে এরূপ অসুরের আর জন্ম নাই।

এই দীর্ঘিকাতটেই আমরা বিশ্রাম করিলাম। বিপণিশ্রেণীর সম্মুখে পঁহুছিবা মাত্র একটী বৃদ্ধা তামুলিনী যেন কতকালের পরিচিতা জনের ন্যায় আমার পিতামহঠাকুরের নাতি বলিয়া নিকটে আসিয়া আমাকে ও কতকগুলি অন্য বালককে কত আদরসহ গৃহে লইয়া গেল। বুড়ি হাসে আর বলে "এই—গঙ্গাধর "মেজেষ্টর" এই নীলমণি দেওয়ানজীর আদরের পুত্র—না জানি বাবাজির মায়ের প্রাণটা আজ কত ধড়ফড় করিতেছে।" সেই গৃহ কিয়ৎক্ষণের জন্য আমাদের গৃহ হইল। বৃদ্ধার নাতি নাতিনী সকল শিশুরা আমাদের সঙ্গী হইল। বৃদ্ধার একটি গৌরাঙ্গী বন্ধ্যা বধূ গাভীদোহন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুগ্ধ আনিয়া দিল। এক সন্তান বড়সি লইয়া মৎস্য আহরণে দীঘির দিকে দৌড়িল। একটি ছেলে পিয়ারা বৃক্ষে আরোহণ করিল আর একটি শশা

বনে আকশী হস্তে প্রবেশ করিল। আহারান্তে মহাদেবার মা আমাদের তিন পুরুষের গল্প আরম্ভ করিল—কখন পিতামহ মহাশয় তাহার ঘরের দুগ্ধ ভাল বলিয়াছিলেন, কখন জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় তার হাতের মুড়ি ভাজা বড় "লুণখর" বড় মিষ্ট কহিয়াছিলেন, কখন দেওয়ানজী তাহার গাছের আমড়া অতি মধুরাম্বল বলিয়া সুখ্যাতি করিয়াছিলেন এই সব অভ্যস্ত ছড়ার ন্যায় কহিল। আবার কাহার কাছে কয় গণ্ডা কড়ি বা কাপড় পুরস্কার পাইয়াছিল তাহাতেও ত্রুটি করিল না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার নিকট ও আমার সঙ্গী বালকদের নিকট ও নিলমণি বাবুর নিকট কি কি সামগ্রী পাইবার হকদার তাহাও অগ্রে গাইয়া রাখিল।

কথা শেষ হইলে ভৈরব কহিয়া উঠিল "তামুলী মাসির পনর আনা মিথ্যা।" তামুলী মাসি তাহার পিতাকে অভিশম্পাত দিয়া উত্তর দিল দোকানে দ্রব্য লইয়া মূল্য না দিয়া প্রস্থান করা অপেক্ষা এ গল্প ভাল।

ভৈরব। যদি কবুব গল্প
তবে কেন হয় অল্প।

আমি ভাবিতেছি কতক্ষণ পথের শেষ হইবে। যাত্রা করিতে ব্যস্ত হইয়াছি, মহাদেবার মা কহিল এত ত্বরা করিবার আবশ্যক কি? এই ঘাট পার হইলেই পাদরি সাহেবের গিরজার চূড়া দেখা যাইবে। তাহার সুপরামর্শে আমরা কর্ণপাত করিলাম না, বিলম্ব করিলে রাত্রি হইবে বুঝিয়া তাহার প্রাপ্য বস্ত্র দিয়া যাত্রা করিলাম। এখন পথনির্ম্মাতার গৌরব ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল—নূতন মাটীতে এক হস্ত পরিমাণ গভীর কর্দ্দম। যেখানে মাটী নাই এক বুক জল, কোথাও জল এড়াইবার জন্য কণ্টকবনপরিপূর্ণ উচ্চ জাঙ্গাল দিয়া যাইতে হয়, কোথাও আবার শিবিকা বাহকগণের মস্তকোপরি উত্থিত হইয়া জলা উত্তীর্ণ হইতে হয়—কোথাও ক্ষুদ্র খাল। যে খালের সেতুর উপর এখন পথিক প্রথম শ্রেণীর শকটে কোমল শয্যাশায়ী হইয়া নিদ্রাবস্থায় বাষ্পীয়যানে বাহিত হন সেকালে তাহার উপর কোন বদান্য জনের সাহায্যে একটি বুড় শুষ্ক অশ্বত্থ বৃক্ষশাখা প্রপাত হইয়া সাঁকোর কার্য্য করিত। এখানে শিবিকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া বৃক্ষশাখায় ভদ্র পথিকজনকে আরোহণ করিতে হইত, গুঁড়ি পার হইয়া ক্ষুদ্র শাখা অবলম্বন করিয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হইতে হইত। আবার কোথাও যেখানে বাদশাহী সড়কের পাকা পুলের দুই পার্শ্ব হইতে মৃত্তিকারাশি বন্যার স্রোতে বাহিত হইয়াছে সেস্থানে গ্রাম্য ডোঙ্গাতে চারিজন করিয়া পরপারে যাইতে হইত, ঐ নৌযানে চড়িয়া প্রাণ যথার্থই হাতে রাখিতে হইত। যান টলমল

করিলেও আরোহিগণকে স্থির হইয়া থাকিতে হইবেক এই পণে চড়িতে হইত। এইরূপ একটি খাল পার হইতে হইতেই আমাদের এক বিপদ উপস্থিত, নিলমণির প্রিয় কপোতপিঞ্জর খসিয়া জলে পড়িল আর ভাসিয়া গেল। নগরে উহা অপেক্ষা ভাল পায়রা পাওয়া যায় কহিয়া তাহাকে সকলে সান্ত্বনা করিলাম।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রেইলওয়ে ষ্টেসন

যে দুর্গম পথে আমরা এই মাত্র ভ্রমণ করিতেছিলাম তথায় এক্ষণে ক্ষেত্রমধ্যে একটী সুন্দর সেতু গ্রন্থিত অতি ঋজু পথ দেখিতে পাওয়া যায়, দূর হইতে সেতুটির বড় শোভা, শত শত উন্নত খিলানের সুগোল পরিধিসূত্র আকাশপটে অঙ্কিত বোধ হইতেছে, সেই খিলানের গর্ভ দিয়া অপর দিকে বহুদূরে শ্বেতীকাশ শস্যক্ষেত্রে সংমিলিত; আবার সেতুপার্শ্বে সুগঠিত স্তম্ভোপরি তাড়িতবার্ত্তাবাহী তার লম্বমান —যেন ভূমণ্ডলের যজ্ঞোপবীত সুশোভিত। বাস্তবিক পাশ্চাত্য পথের দুরাবস্থার সহিত এই পথের সৌন্দর্য্য ও সুবিধা আলোচনা করিয়া দেখিলে অনুভব হয় যেন স্বর্গারোহণের পথ।

স্বর্গারোহণের পথ অতি দুর্গম্। পথে বিপদ থাকুক বা না থাকুক দ্বারটি দুষমনের বাস। যমদূতের হাত অতিক্রম করিতে পারিলে সেই পথের পথিক হইতে পারা যায়, আবার শুনা যায় সেই দ্বারে সেই দূতগণের সাহায্যার্থ ভয়ানক কাল নেপালী কুকুর বিদ্যমান; যমালয়ের নিয়মানুসারে সকলকে দ্রংষ্টা বিস্তার পূর্ব্বক ভয়প্রদর্শন করানই তাহার প্রধান কার্য্য, উদর পূরণের প্রধান উপায়। এই যমদ্বারের প্রতিরূপ মর্ত্ত্যে রেইলওয়ে ষ্টেসন ঘর। ইতিপূর্ব্বে এই পথে একক চলিতে চলিতে যে সেতু দেখিতে পাই তাহার পাশে সত্বর একটি শুভ্র প্রাসাদ নয়নপথে পড়ে। এটি একটী গাড়ি থামিবার স্থান। "ষ্টেশন ঘর।" তথায় পঁহুছিয়া দেখিলাম সে স্থানটি অতি সুন্দর, স্বল্পকাল মধ্যে সুরম্য কানন শোভিত মানববাসোপযোগী অট্টালিকা পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু গৃহটি সুন্দর হইলেও যমালয়, যমদূতের অধিকার, চারিদিকে কেবল কাল চাপকান কম্বলের কোট সজ্জিত, প্রস্তর কয়লা চূর্ণ প্রলেপিত, মাসক তৈলসিক্ত দূত ভূতের দুষমন মুখশ্রী ইতস্ততঃ ভ্রমিতে দেখা যায়। যেখানে কেবল অসভ্য ক্ষেত্রজীবের বাক্য শুনা যাইত এখন সেইখানে সুসজ্জিত সুসভ্য নানা লোক পাদচালনা করিতেছে। কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল বিনিময়ে বিপণিশ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছে। কাদা জল বিনিময়ে ভজন ভজন সোডা-ওয়াটরের অগ্নিঅস্ত্ররূপ কার্ক ছুটিতেছে। জঙ্গলজাত পরিকুল সেকুল পরিবর্ত্তে

রম্ভা, আম্র, বেদানা, ও আতার এলাইচদানার ছড়াছড়ি। যেখানে ভাণ্ড হস্তে করিয়া কাঙ্গালি শিশু, ছিন্ন বস্ত্র দরিদ্র দিগম্বরীগণ ক্ষেত্র হইতে শস্য খুঁটিত, যেখানে চটের থলিতে ধান্য সংগ্রহ হইত এখন সেখানে সুরঙ্গিণ রেশমি ছাতা, কারপেট ও চাকচিক্য বার্ণিস লেদার নির্ম্মিত ব্যাগ, প্রকৃতার্থে হাতে হাতে ঠেকিতেছে বিবাদ লাগাইতেছে। ক্রমে ভিড় বাড়িল; তিলকধারী উড়ের দল, শ্মশ্রুধারী নেড়ের পাল, বিদায়ের কলসী হস্তে ব্যতিব্যস্ত তর্কভূষণ, জাহাজের সারেঙ্গ মিয়া মাজন, পাত্রপূর্ণ সন্দেশ হস্ত কুঞ্জর মা চাকরাণী, তার পাশে স্থূলকায় অবগুণ্ঠনবতী রাম ঘোষের গৃহিণী; পাদরি ফিরিঙ্গি, মলঙ্গি, ব্যাপারি মহাজন সকলেই এক সংকীর্ণ রেলবেষ্টিত পান্থগামী। পাগড়ি পড়িতেছে, ছাতা হস্তান্তর হইতেছে, সন্দেশের হাঁড়ি ভাঙ্গিল, ক্রন্দনের রোল উঠিল "গেলাম" "গেলাম" "ধাঁ ধাঁ" চড় চাপড়ের শব্দ শুনা যাইতেছে; তার মধ্যে কর্কশ কণ্ঠোচ্চারিত চীৎকার বাক্য "বেটিকিট ওয়ালা বাহার যা" বলিবৃন্দ কর্ণভেদ করিতেছে। এই তৃতীয় শ্রেণীস্থ পথিক দলের টিকিট বিক্রয়স্থল।

অপর শ্রেণীর টিকিটক্রয়ের গবাক্ষের নিকট আর এক শোভা বিস্তার হইয়াছে। সেই কক্ষসংলগ্ন একটী সুচারু কামরা রসময় কোমল মুখশ্রীতে সুশোভিত। তন্মধ্যে একটি ধনাঢ্য যুবা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী একটী চঞ্চলনয়না স্বর্ণালঙ্কারা-বৃত কৃশাঙ্গী কামিনী যাদৃশ সুন্দর ততোধিক সুন্দরী দেখাইবার কামনায় ওষ্ঠে, গণ্ডে গোলাপী আলতা রাগে রঞ্জিত করিয়া সদ্যস্নাত কেশগুলি মুক্তভাবে দুই পার্শ্বে ফিন্‌ফিনে বস্ত্রমধ্যে আলম্বিত করিয়াছে। এদিকে গাড়ি আসিবার দেরি নাই, কারণ গাড়ি বারান্দায় ঘণ্টা বাজিয়াছে; সুদূরে শুভ্র মাস্তুলের একটী হাত খট করিয়া নামিয়াছে, টিকিট বাবুও কট কট করিয়া টিকিট কাটিতেছেন, ব্যঙ্গ করিতেছেন, দম্ভ দেখাইতেছেন, গালি পাড়িতেছেন মধ্যে মধ্যে চড় চাপড়ও তুলিতেছেন, আবার উচ্চ শ্রেণীস্থ জেন্‌টলম্যান অর্থাৎ বিলাতী সাহেব মানুষ দেখিলে বিনীতভাবে করযোড়ে "লিটল ওয়েট সার টিকিট গিব" কহিয়া নম্রতা রাশির পরিচয় দিতেছেন। তাঁহার চালাকি, ভঙ্গিরঙ্গি, প্রভুশালিত্ব দেখিয়া মনে করিলাম টিকিট ক্রয় করা বড় বিভ্রাট, এখানে মানী লোকের মান থাকা দুষ্কর। আবার যেমন দ্বারী তেমনি তাহার আজ্ঞাবাহী শান্তিরক্ষক। টিকিট বাবুর ইঙ্গিতমাত্র দরিদ্র পথিকজনের অংশ মর্দ্দন, কর্ণমলন প্রভৃতি কার্য্যে তৎপর, আবার কাহার প্রতি বিশেষ সানুকূল দেখিলাম প্রায় শত পদের বাহিরে একটি স্তম্ভপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। টিকিট বাবুর মুখশ্রী এখন বিলক্ষণ করিয়া দেখিলাম। ঘোর শ্যামবর্ণ মুখে আঁখির কণিকা হইতে সৃক্কণী পর্য্যন্ত নিবিড় শ্মশ্রুকেশ ভূষিত মুখশ্রী, কেশ পেটী প্রচুর

তৈলসিক্ত, মস্তকে ঘেসও রঙ্গের টুপি, সামনে তিনটি জরির অক্ষর বিনির্ম্মিত, টেবিলের উপরিভাগে মাষ্টার বাবুর বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে, কাল আলপাখার চাপকানে, নীলসুতের সেলাই দেদীপ্যমান, সর্ব্বোপরি সাদা বোতামটি ঘর হইতে খসিয়া উল্টাইয়া পড়িয়াছে ও গলার নীচে সুপক্ক জামের আভা বাহির করিয়াছে। তাঁহারে আমি দেখিয়াই চিনিলাম ছুষমন চেহারা—আমার সঙ্গী ভৈরব কহিয়া উঠিল এই ত সকলের ভীম মাষ্টার।

টিকিট বাবু এক একটী লোকের প্রতি আবার দয়াবান; কাহাকে খুড়া বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন ও "কম কম কেন সিংগলে কম" "রেলজম্পে কম" বলিয়া ইংরাজিতে আহ্বান করিতেছেন; একটি ভদ্র পথিক আমার নিকট দাঁড়াইয়া কহিলেন "দেখ্‌ছেন কি? জাতে কর্ম্মকার যেমন লোহার মত চেহারা তেমনি লৌহনির্ম্মিত অন্তকরণ; এদেশে উহার নাম লোহার কার্ত্তিক, আইরণ অক্‌টোবর রাষ্ট হইয়াছে। কোথায় স্কুল মাষ্টার ছিলেন কিন্তু মাষ্টার বাবু বলিলে ক্ষিপ্ত প্রায় রাগান্ধ হন, প্রহার করিতে দৌড়াইয়া যান।"

আমি কহিলাম বিলক্ষণ চিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন। এদিকে পুলিস ম্যান কঙ্কর তেয়ারী দন্ত কিচমিচ করিয়া পাটি যুগলে দশ সালের খদির তাম্বুলের পাটকেল রঙ্গের গাঢ় প্রলেপ প্রদর্শন করিতেছেন; সেই দন্তের অনতি উপরে গোঁফের দল, হস্তীশিরে স্থূল কেশ স্বরূপ দণ্ডায়মান; মস্তকে পীতাম্বরজড়িত উষ্ণিষ, অঙ্গে কাল কম্বলের কোট, হাতে দণ্ড, ঠিক দণ্ডধর। তাহাকে সান্ত্বনা করিবার এই উপায় দেখিলাম। পান খাইবার জন্য দুটি পয়সা তাহার হস্তে অর্পণ করিলে টিকিট পাওয়া যায়। ভৈরব সর্দ্দার অগ্রসর হইয়া তাহাই দিল ও আমাদের প্রত্যেক জনের কত ভাড়া লাগিবে কহায় ১৩ আনা করিয়া কহিল। ভৈরব কহিল এক আনা কমিবে না? পাহারাদার কহিল বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা কর। বড় বাবু কহিলেন "বারেন্দায় টেবিল রহিয়াছে পড়িতে চক্ষু নাই।" ভৈরব অগ্রসর হইয়া বাবুকে চিনিল ও সুস্বরে গাহিয়া উঠিল "চুড়া ছেড়ে এবার পাগড়ি বেন্দেছে, এত আমাদের সেই মাষ্টার মশয়! টিকিট দেন ত।" একে "মাষ্টার তাতে মশয়" "বাবু" পর্য্যন্ত বলিল না, সম্বোধন শুনিয়া টিকিট বাবু মনে করিলেন যেন তাঁহার অঙ্গে অগ্নিরাশি বিকীর্ণ হইল, যে লৌহ যন্ত্রে টিকিটে কট কট করিয়া চিহ্ন দিতে ছিলেন দুই হস্তে উঠাইয়া ভৈরবের মস্তকে নিক্ষিপ্ত করিতে চেষ্টা করিলেন; ভাগ্যক্রমে তাহা কাষ্ঠাসনে দৃঢ় আবদ্ধ ছিল। আমি ত্বরায় বিবাদস্থলে গমন করিলাম ও কহিলাম "বড় বাবুজী, ভৈরব চাষা, আপনার মর্ম্ম কি জানে টীকিট দেন।" যেন খঞ্জ ভীমকে আমরা কেহই চিনিতে পারি নাই এইরূপ ব্যবহার করা গেল। টীকিট লওয়া সাঙ্গ হইলে "খোঁড়া ভাল আছ।" বলিয়াই

আবার ভৈরব প্রস্থান করিল। টিকিট বাবু জানিতেন যে স্কুল মাষ্টার অপেক্ষা সহকারী এস্‌টেশন মাষ্টারের পদ অনেক মানশালী। হুকুমে "ট্রেণ টচ" করে ট্রেণ ষ্ট্যার্ট করে গাড়ী থামে গাড়ী ফিরে গাড়ী চলে। হুকুমে রাজা মহারাজেরও গতি বন্ধ হইয়া যায়। এখনো জানেন না যে আবার ঘন ঘন ফৌজদারি সুপদ্দ হইতে হয়।

যাহা হউক আমরা এখন সকলে টিকিট ক্রয় করিলাম। ভৈরব ইত্যবসরে হারাইয়াছে শুনা গেল, দূরে যাইয়া তামাক টানিতেছে, গাড়ি আগতপ্রায়, ত্বরায় আসিতে আদেশ করায় ক্রুদ্ধস্বরে কহিল "পয়সা দিয়াছি ডাকিবে না?" যাহা হউক সকলে একত্র হইয়া গাড়ি বারেন্দায় দণ্ডায়মান হইতেই শকটশ্রেণী দূরে দেখা গেল। ভৈরব তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া, অগ্নিরাশি ধূমপুঞ্জ দেখিয়াই পলাইল ও কহিল এ বড় আপদ আমি ৪ ক্রোশ পথ পায়ে শেষ করিব।

সম্প্রতি রেলগাড়ীর কথা যাক, পূর্ব্বকালিক পথের কষ্ট বর্ণন করিতে করিতে এই কথা পড়িয়াছিল। আমরা কয়েক দিনের মধ্যে নগরের নিকটস্থ হইলাম একদিন প্রাতে নগরের শত শত অট্টালিকা শ্রেণী, কত শত ধ্বজা মন্দির চূড়া শত শত অর্ণবপোতের পটদণ্ড যেন পত্রশাখা বিরহিত শাল জঙ্গল গোধূলির গগন ভেদ করিয়া নয়ন পথে আসিল। ক্রমে আমাদের ভ্রমণ শেষ হইল। আমরা নগরে উপনীত হইলাম।

বিদেশ হইতে আমদানী জিনিষ কিনিতে হইলে এক্সচেঞ্জ দিতে হয়। এই এক্সচেঞ্জের দরুণ কখন কখন লাভও হয়। লাভই হউক, আর লোকসানই হউক, শতকরা ২।৩ টাকার উপর এক্সচেঞ্জ প্রায়ই কখনই দিতে হয় না। কিন্তু আজি কালি শতকরা প্রায় ২২ টাকা এক্সচেঞ্জ দিতে হইতেছে। যদি কোনরূপ এক্সচেঞ্জ না থাকে তবে এক পৌণ্ডের জিনিষ এখানে ১০৲ টাকায় বিক্রয় হয়। এক পাউণ্ডের রীতিমত দাম ১০৲ টাকা। ১০ পাউণ্ডের জিনিষ ১০০ টাকায় বিক্রয় হয়। কিন্তু এখন ১০ পাউণ্ডের জিনিসের মূল্য ১২২ টাকা হইয়াছে। ইহার দরুণ যে শুদ্ধ যাহারা বিলাতী জিনিস কেনে তাহাদেরই অসুখ হইতেছে তাহা নহে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে প্রতি বৎসর বিলাতে প্রায় এক কোটী পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড অথবা পনর কোটী টাকা পাঠাইতে হয়। এখন এই এক্সচেঞ্জ গোলমালের দরুণ প্রায় ৪ কোটী টাকা অধিক পাঠাইতে হইতেছে। ইহার দরুণ সমস্ত ভারতবর্ষবাসী প্রজাদিগেরই কষ্ট হইতেছে। যেখানে ১৫।.৬ কোটী টাকায় হইত, সেখানে এখন ১০।২০ কোটী লাগিতেছে। এরূপ এক্সচেঞ্জ গোলমাল হইবার কারণ কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে প্রতিপাদ্য বিষয় দুইভাগে বিভক্ত করিতে হয়। ১ম বিদেশীয় বাণিজ্য হইলেই অল্পবিস্তর এক্সচেঞ্জ কেন দিতে হয়? ২য় আজি কালি সেই এক্সচেঞ্জ এত বেশী কেন হইল?

প্রথম নিয়মমত এক্সচেঞ্জ হইবার কারণ এই যে, যখন দুইটি দেশে বাণিজ্য কার্য্য আরম্ভ হয়, তখন কিছু ক্রয় বিক্রয় নগদ টাকায় হয় না। বাণিজ্য— বিশেষতঃ বিদেশীয় বাণিজ্য ধারেই নির্ব্বাহ হয়। ফ্রান্সের লুইস যখন ইংলণ্ডের হেনেরির নিকট ব্র্যাণ্ডি বিক্রয় করিল তখন হেনেরি তাহাকে এক খত লিখিয়া দিল যে উহার দাম ছয় মাস পরে দিব। আবার যখন ইংলণ্ডের জন ফ্রান্সের চার্লসের নিকট কাপড় বিক্রয় করিল তখন চার্লসও পূর্ব্বোক্তরূপ খত লিখিয়া দিল। এইরূপ ইংলণ্ডের উপর ফ্রান্সের ও ফ্রান্সের উপর ইংলণ্ডের অনেক খত জমিল। ইংলণ্ডের লোক ফ্রান্সে ঠাকা পাঠাইতে হইলে নগদ টাকা না পাঠাইয়া

ফ্রান্সের কোন সওদাগরের সই করা খত ফ্রান্সে পাঠাইবার চেষ্টা করে। ফ্রান্সের লোকও ইংলণ্ডে টাকা পাঠাইতে হইলে ইংলণ্ডের কোন সওদাগরের সহী করা খত পাঠাইবার চেষ্টা করে। সুতরাং ঐ খতের নিয়মিত ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায় চলে! দালালেরা এই ব্যবসা চালায়। যেমন অন্য ব্যবসায়ে জিনিষ কম ও খরিদদার বেশী হইলে জিনিসের দাম অধিক হয় ও খরিদদার কম ও জিনিস বেশী হইলে জিনিসের দাম কম হয়, খতের ব্যবসায়েও ঠিক তাহাই হয়। কখনও খত অধিক মূল্যে কখন অল্প মূল্যে বিক্রয় হয়। কেবল অধিকের মধ্যে এই যে অন্যান্য জিনিসের মূল্য অনেক বাড়িতে ও অনেক কমিতে পারে, খতের ব্যবসায়ে তাহা হয় না; যদি নিতান্ত অধিক মূল্য হইয়া উঠে তবে লোকে খত না কিনিয়া টাকাই পাঠায় সুতরাং খতের মূল্য টাকা পাঠানর খরচ পর্য্যন্ত বাড়িতে কমিতে পারে ইহার অধিক বা অল্প হইতে পারে না। মনে কর ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে এক শত পাউণ্ড পাঠাইতে ২ পাউণ্ড খরচ হয়। ১০০ পাউণ্ড খতের দাম যদি ১০৩ পাউণ্ড উঠে লোকে সে খত কিনিবে কেন? তাহাতে তাহাদের কি উপকার হইবে। তাহারা নিজের খরচে টাকা পাঠাইলে তাহাদের এক পাউণ্ড লাভ হইবে। অতএব নিয়মিত ব্যবসায়ের এক্সচেঞ্জ, টাকা পাঠানর খরচের অধিক বা অল্প হইতে পারে না। সচরাচর আমরা যে অল্প বিস্তর এক্সচেঞ্জ দিয়া থাকি তাহার কারণ এই, আর কিছুই নহে। মনে যেন থাকে যে টাকা পাঠানর খরচ অপেক্ষা এই এক্সচেঞ্জ অধিক হইতে পারে না। আর এই এক্সচেঞ্জ প্রত্যহ পরিবর্ত্তনশীল। আজ শতকরা ২ টাকা বেশী দিতে হইল, কালি আবার শতকরা ২ টাকা কম। কিন্তু দুই টাকার অধিক কখন উঠিবে না।*

এখন লোকে মনে করিতে পারেন যে যাহারা খত কিনিবে তাহারাই এক্সচেঞ্জ দিবে। অন্য লোকে দিতে যাবে কেন? তাহার উত্তর এই যে বিদেশে টাকা অধিকাংশই ব্যবসায়ীদিগের পাঠাইতে হয় সুতরাং তাহাদের নিকট হইতে জিনিস কিনিতে হইলে তাহারা সেই এক্সচেঞ্জ খরিদদারের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবে। সুতরাং যে কেহ বিদেশের আমদানী জিনিস কিনিবে তাহাকেই এক্সচেঞ্জ দিতে হইবে।

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে সাজে। কারণ দুই জায়গায়ই সোণার টাকা চলন। রূপার টাকার চলন এই দুই দেশে প্রায় নাই

* মিল বলেন টাকা পাঠানর উপর আরো কিছু দিতে হয়। যে দালাল হইবে তাহার লাভও দিতে হয়।

বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষের সঙ্গে একথা নহে, ভারতবর্ষে রূপার টাকা চলন ইংলণ্ডে সোণার টাকা চলন সুতরাং ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের ব্যবসায়ে এই দুই ধাতুর মূল্যের ন্যূনাধিক্য প্রযুক্ত আর এক প্রকারে এক্সচেঞ্জ হইবার সম্ভাবনা। কখন সোণাঁর দর অধিক হয় কখন সোণার দর কম হয়, কখন রূপার দর অধিক হয় কখন উহার দর কম হয়, ভারতবর্ষে রূপার টাকা চল্‌তি, ভারতবর্ষের লোক রূপার দাম কম বৃদ্ধি বুঝিতে পারে না। তাহারা মনে করে রূপার দাম যা ছিল তাই আছে। যখন রূপার দাম বাড়ে তখন তাহারা ভাবে সোণার দাম কমিয়াছে। যখন রূপার দাম কমে তখন ভাবে সোণা মহার্ঘ হইয়াছে এইরূপ ইংলণ্ডের লোকও ভাবে। কিন্তু চিন্তাশীল লোক মাত্রেই দেখিতে পান কাহার দাম বাড়িয়াছে ও কাহার কমিয়াছে। যাহারা দুই দেশে বাণিজ্য করে তাহারা টের পায় যে এক্সচেঞ্জ বাড়িতেছে ও কমিতেছে। যে দেশের এক্সচেঞ্জে লোকসান তাহাদের টাকার দাম কমিয়াছে যে দেশের লোকসান নাই বা লাভ আছে তাহাদেরই টাকার দাম বাড়িয়াছে। যখন রূপার দাম কম হয় বা সোণার দাম বেশী হয় তখন এক্সচেঞ্জে ভারতবর্ষের লোকসান ও যখন রূপার দাম বেশী হয় বা সোণার দাম কম হয় তখন ভারতবর্ষের লাভ। বর্ত্তমান সময়ে সোণার দাম বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে। যে সোণা ১৬ টাকায় তোলা বিক্রয় হইত তাহারই মূল্য এখন ১৯৷৷০ সাড়ে উনিশ টাকা। যে পাউণ্ড ১০ টাকা ছিল তাহার দাম সুতরাং ১২ টাকার উপর উঠিয়াছে।

যখন এক্‌স্‌চেঞ্জে বড়ই লোকসান হইতে লাগিল, যখন এক্‌স্‌চেঞ্জে শতকরা দুই টাকা লাভ থেকে একেবারে শতকরা ১০। ১২ টাকা লোকসান হইতে লাগিল, তখন সকলে ভাবিত যে এক্‌সচেঞ্জের এ লোকসান প্রথম কারণ বশতঃ হইয়াছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের উপর বিল অধিক হইয়াছে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের উপর বিল কম হইয়াছে। ব্যবসায়ের রিপোর্টে দেখা যায় যে প্রতি-বৎসর ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ৬০ কোটী টাকার দ্রব্য বিলাতে যায় বিলাত হইতে ৪০। ৪২ কোটি টাকার জিনিস আসে; সুতরাং ভারতবর্ষে বিলের দাম সস্তা হইয়া এক্সচেঞ্জে ভারতবর্ষের লোকসান। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে প্রথম প্রকারে এক্সচেঞ্জে শতকরা ২। ৩ টাকা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে টাকা পাঠাইবার খরচ যাহা তাহা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। তাহার পর আরও প্রমাণ হইল যে, ভারতবর্ষ হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে প্রতিবৎসর ১৫। ১৬ কোটি টাকা নানাবাবদে বিলাতে পাঠাইতে হয়। ঐ ১৫। ১৬ কোটি টাকা নগদ না গিয়া উহার পরিবর্ত্তে মাল যায়। সুতরাং ইংলণ্ড হইতে যে মাল আসে, তাহা অপেক্ষা ভারতবর্ষ হইতে বর্ষে বর্ষে ১৫। ১৬ কোটি

টাকার অধিক মাল যাওয়া চাহি। তাহার উপর ইংলণ্ডের লোকের অনেক টাকা ভারতবর্ষে খাটিতেছে, তাহার সুদ প্রতিবৎসর ইংলণ্ডে যাইতেছে। সেও নগদ যায় না জিনিসে যায়; সুতরাং ভারতবর্ষে যদি ৪০।৪২ কোটী টাকার জিনিস আসে ত ভারতবর্ষ হইতে ৬০ কোটি টাকার জিনিষ যাইবে; যখন বিলাতে পেঁছিবে তখন পথখরচ সমেত এই জিনিসের দাম ৬৪ কোটী টাকা হইবে। এই ৬৪ কোটি ভারত দিল, ইহা হইতে ইংলণ্ড হইতে আমদানীর দাম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হোমচার্জ্জেস ও বিলাতীয় টাকার সুদ সব প্রদত্ত হইবে। এক্‌সচেঞ্জ কম বেশী হওয়ার দরুণ ব্যবসায়ে ভারতবর্ষীয়দিগের লোকসান হইতে পারে কিন্তু এরূপ ব্যবসায়ের দরুণ ভারতবর্ষের এক্‌সচেঞ্জ লোকসান হয় নাই। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের উপর যত বিল রাখে ইংলণ্ডেরও বিল, সেক্রেটরী অব ষ্টেটের ড্রাফ্টে ও অন্যান্য রকমে প্রায় ততই হইয়া উঠে সুতরাং ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের উপর অধিক বিল থাকিলে যে এক্‌সচেঞ্জ গোলমাল ঘটিত তাহা আর ঘটে না, কারণ বাস্তবিক বিল উভয় দেশে সমান সমান আছে।

অনেকে আবার বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে রূপা সস্তা হওয়ায় দরুণ এক্‌সচেঞ্জে লোকসান হইতেছে। ১৮৫১ সাল হইতে যখন সোণা বড়ই সস্তা হইতে আরম্ভ হইল, তখন ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্ট সকল রূপার টাকা ভাঙ্গিয়া এসিয়ায় পাঠাইতে লাগিল। আবার ঠিক এই সময়েই ভারতবর্ষে বড় বড় রেলওয়ে স্থাপিত হইতে লাগিল। সমস্ত রেলওয়েই বিলাতের টাকায় তৈয়ারি, সুতরাং অনেক রূপা ঐ সময়ে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসে। ভারতবর্ষে রূপার টাকা চলিত সুতরাং রূপা পাঠানতেই রেলওয়ে কোম্পানীর সুবিধা হইতে লাগিল। রূপার দরকারও বিলাতে কম হইতে লাগিল। এইরূপে অধিক রূপা দেশে আসার দরুণ এদেশে রূপা সস্তা হইত, যদি যত রূপা আসিয়াছিল সমস্তই টাকা হইয়া চলিত। কিন্তু অনেক রূপা টাকা রূপে চলিতেছে না অনেক লোক টাকা পুতিয়া রাখিয়াছে। ব্যাঙ্কিং এখানে ভাল নাই সুতরাং এ দেশের লোক যাহা কিছু সঞ্চয় করে তাহা হয় গহনা গড়াইয়া রাখে না হয় পুতিয়া রাখে সুতরাং রূপা যখন বাজারে অতিরিক্ত পরিমাণে না রহিল তখন রূপা সস্তা হইল কেমন করিয়া বলিব। আর এদেশে রূপা সস্তা হইলে জিনিস পত্রের দাম মহার্ঘ হইত তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হয় নাই। অকাল দুর্ভিক্ষ পড়ার দরুণ যে সকল জিনিসের দাম মহার্ঘ হইয়াছে মাত্র, তাহা ছাড়া আর সর্ব্বত্র যে দাম ৫।৭ বৎসর ধরিয়া ছিল সেই দামই আছে সুতরাং রূপা সস্তা হয় নাই। অতএব দুই চারি জন প্রধান সংবাদপত্র-ওয়ালা যে বলিয়াছিলেন যে জর্ম্মনির বাতিল রূপা কিনিয়া রাখিলে এক্‌সচেঞ্জে সুবিধা হইবে, তাহা ঠিক নহে। এরূপ কিনিলে এক্‌সচেঞ্জে একটু লাভ

হইত সন্দেহ নাই কিন্তু যে টাকা দিয়া কিনিতে হইত তাহার সুদ দিত কে ?

এখন অনেক অনুসন্ধানের পর জানা গিয়াছে যে সোণা মহার্ঘ হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাহারা তলাইয়া না বুঝে তাহাদের কাছে রূপা সস্তা হওয়াও সোণা মহার্ঘ হওয়া দুইয়েরই এক প্রকার ফল সুতরাং তাহারা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না সোণা মহার্ঘ হইল কি রূপা সস্তা হইল। বর্ত্তমান উদাহরণে তাঁহারা ঠিক উল্টাটি বুঝিয়াছেন।

যদি বল সোণা মহার্ঘ হইল কিরূপে জানা গেল। আজি কালি ইংলণ্ডে বাণিজ্যে বড় গোলযোগ, অনেক হাউস ফেল হইতেছে লাভ কম হইতেছে, ব্যবসায়ে মন্দা পড়িয়া গিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করায় প্রকাশ পায় যে ইংলণ্ডে ৫ বৎসর আগে যখন ব্যবসায় বড়ই ভাল ছিল তখন যে জিনিস যত আমদানী ও রপ্তানী হইত এখন তাহা অপেক্ষা জিনিস পত্র বেশী আমদানী রপ্তানী হইতেছে কিন্তু যখন দাম ধরিয়া দেখা যায় তখন প্রমাণ হয় যে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প দামের জিনিস আমদানী রপ্তানী হইতেছে। আর বাজার দৃষ্টান্ত দেখিলেও সকল জিনিসেরই দাম কমিয়াছে যেমন রূপার দাম শতকরা ২২ করিয়া কমিয়াছে তেমনি সকল জিনিসেরই দাম শতকরা ২২ করিয়া কমিয়াছে। সুতরাং সোনার দাম শতকরা ২২ করিয়া বাড়িয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে যদি ৩০ মণ জিনিস রপ্তানী হইত তাহার দাম হইত ১৫০ পৌণ্ড এখন হয়তঃ ৩৫মণ রপ্তানী হইতেছে, কিন্তু দাম হয়ত ১৪৫ পৌণ্ড বই নয়। এরূপ যদি একটা আধটা জিনিসের দাম কম হয় তবে জানা যায় যে অধিক উৎপন্ন হওয়ার দরুণ না হয় সেই জিনিষটাই সস্তা হইয়াছে, কিন্তু যখন সকল জিনিসেই এই রকম তখন তাহাতে কি বুঝায় ? যে, যে বস্তু দ্বারা দাম নির্ণয় হয় তাহার মূল্য অধিক হইয়াছে, এই না ! ইংলণ্ডে সোণা দ্বারা দাম নির্ণয় হয় সুতরাং সোণার মূল্য অধিক হইয়াছে।

এখনকার চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে সোণা মহার্ঘ হওয়ার জন্য এক্সচেঞ্জ গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু কথা এই সোণা মহার্ঘ হয় কেন ? অষ্ট্রেলিয়া কালিফোর্ণিয়ায় এত সোণা আবিষ্কার হইল, সোণা কোথায় সস্তাই হইবার কথা তাহা না হইয়া উপরন্তু মহার্ঘ হইয়া গেল ! এ কেমন করিয়া হইবে ! উত্তর এই যে ১৮৫১ সালের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে স্বাধীন বাণিজ্য প্রবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ ইংলণ্ড স্থির করে যে, যে জিনিষ যেখানে সস্তা পাইব সেই জিনিষ সেইখানে কিনিব ও যেখানে যে জিনিষ মহার্ঘ দেখিব সেইখানে সেই জিনিষ বেচিব। এই সিদ্ধান্তানুযায়ী কার্য্য করার দরুণ ইংলণ্ডের শীঘ্র শীঘ্র ধনোন্নতি হইতে লাগিল।

১৮১৬ খ্রীঃ অব্দ হইতে ইংলণ্ডে কেবল সোণার টাকা চলিতেছে, তাহার দরুণ ইউরোপীয় রৌপ্যমুদ্রাদেশ সকলকে মধ্যে মধ্যে এক্সচেঞ্জে লোকসান দিতে হইত। তাহারা মনে করিত যে ইংলণ্ডের উন্নতির মূল স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার, উহাতে অপরাপর জাতির হানি করিয়া ইংলণ্ড বড়মানুষ হইতেছে, তাহার উপর আবার যখন স্বাধীন বাণিজ্য অবলম্বনের জন্য ইংলণ্ডের অতি শীঘ্র ধনোন্নতি হইল তখন উহাদের পূর্ব্ব সংস্কার দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। যেমন অষ্ট্রেলিয়া ও কালিফর্ণিয়ায় স্বর্ণ আবিষ্কার হইল, যেমন এসিয়ায় অনেক রৌপ্য চালান হইতে লাগিল ইয়ুরোপের জাতিরা অমনি স্বর্ণমুদ্রা আশ্রয় করিলেন। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে জর্ম্মনিতে শুদ্ধ রৌপ্য মুদ্রা ছিল। ফ্রান্সে স্বর্ণ রৌপ্য দুই প্রকারের মুদ্রাই ব্যবহার ছিল! একটা অনুপাত বাঁধা ছিল যেমন এক তোলা সোণার দাম ১৬ তোলা রূপা। ২০০০০ হাজার ফ্রাঙ্ক তোমায় দিতে হইল, সে কালে তুমি ফ্রান্সে সোণা বা রূপার যে কোন মুদ্রা ইচ্ছা দিতে পারিতে। (ইংলণ্ডে এরূপ হবার যো নাই ২ পৌণ্ড পর্য্যন্ত রূপায় দিতে পার তাহার উপর সোণা দিতেই হইবে) আমেরিকায় মাঝে দিনকত কাগজের টাকা চলিতেছিল যুদ্ধের সময় আমেরিকায় অনেক টাকার দরকার হয় অত সোণা বা রূপা উপস্থিত না থাকায় কাগজের টাকা কিছু দিনের জন্য বাহির করিতে হয়। ১৮৭০।৭১ সালে দেখা গেল জর্ম্মানি রূপার টাকা তুলিয়া দিয়া সোণার টাকা ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সুইজর্লণ্ড, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, ইতালি একত্রে পরামর্শ করিয়া ইচ্ছামত রৌপ্যমুদ্রা মুদ্রাঙ্কন বন্ধ করিয়া দিয়াছে অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা আশ্রয় করিয়াছে। আমেরিকাও কাগজের পরিবর্ত্তে স্বর্ণমুদ্রা ছাপাইতেছে। ইংলণ্ডেও বাণিজ্য বিস্তারের জন্য অনেক স্বর্ণমুদ্রা আবশ্যক হইয়াছে। সুতরাং অনেক সোণার দরকার হইয়াছে, সোণার বাজার গরম হইয়া উঠিয়াছে, সোণার দাম ক্রমে উঠিতেছে। ওদিকে আবার ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে অর্থাৎ প্রথম প্রথম অষ্ট্রেলিয়া ও কালিফর্ণিয়ায় যে স্বর্ণ উৎপন্ন হইত এখন আর তত হয় না। সোণার দাম কাজেই আরও বাড়িয়া গেল শেষ এখন শতকরা ২২ টাকা অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে যখন আমেরিকায় অনেক রূপার খনি আবিষ্কৃত হয় তখন একবার সোণা রূপার দামে এইরূপ তফাৎ হইয়া উঠে। তখন রূপা প্রায় শতকরা ৩৩ টাকা সস্তা হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তখন শুদ্ধ স্বর্ণমুদ্রা দেশ ছিল না সকল দেশেই দুই প্রকারের মুদ্রা ছাপা হইত। স্বর্ণমুদ্রা অধিক পরিমাণে না ছাপিয়া রৌপ্যমুদ্রা অধিক পরিমাণে ছাপাইলে সে গোলযোগ অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিত। কিন্তু তখনও এত গোলমাল হয় নাই। রূপা সস্তার দরুণ যে ক্ষতি তাহাই মাত্র হইয়াছিল। এবার যদি স্বর্ণ সস্তা হইয়াই ক্ষান্ত হইত তাহা হইলে

সেবারের মত ঠিক হইয়া দাঁড়াইত কিন্তু এবার ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের আহাম্মুকিতে সোণার দাম সস্তা না হইয়া আরও মহার্ঘ হইয়া উঠিল। যদি মহার্ঘ হইয়াই ক্ষান্ত হইত তবেও ভাল ছিল। জানিলাম, বর্ত্তমান শতাব্দীতে আর ১৬ টাকায় সোণার ভরি মিলিবে না ১৯ টাকাই ভরি হইবে। সেই পরিমাণে এক্‌স-চেঞ্জ বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া যাইত। কিন্তু তাহা ত নহে। কেহই এখন পর্য্যন্ত অবগত নহে যে কত পরিমাণে সোণার দাম বেশী হইবে। জর্ম্মনি হইতে সব রূপার টাকা এখনও বাহির হয় নাই, এখনও জর্ম্মনিকে অনেক পরিমাণে সোণা কিনিতে হইবে, সোণার দাম তাহা হইলে আরও মহার্ঘ হইবে। এক্‌সচেঞ্জও কয়েক বৎসর ধরিয়া ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে, যে জিনিস বিলাত হইতে পাঠাইবার সময় এক রেট, সেই জিনিষ ভারতবর্ষে পঁহুছিবার সময় রেট তাহা অপেক্ষা বেশী। এইরূপ এক্‌সচেঞ্জ রেট অনির্ণয়ে ব্যবসাদারদিগের সমূহ ক্ষতি হইতেছে, খরিদদার-দিগেরও অনেক অসুবিধা হইতেছে।

অনেকে আছেন তাঁহারা বলেন এই সময় ভারতবর্ষও স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করুক, তাহা হইলে তাহাকে আর দ্বিতীয় প্রকারের এক্‌সচেঞ্জ দিতে হইবে না, প্রথম প্রকারের এক্সচেঞ্জ দিলেই হইবে। এখন যদি ভারতবর্ষও আবার সোণার খরিদদার হইয়া দাঁড়ান তাহা হইলে সোণার দাম অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিবে, কারণ ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা চালাইতে হইলে অল্প স্বর্ণে হইবে না তত স্বর্ণ বাজারে নাই সুতরাং সোণার দর এখন যদি শতকরা ২২ বেশী থাকে তখন শতকরা ৫০ বেশী হইয়া দাঁড়াইবে।

১৮৫১ খৃঃ অব্দ হইতে এপর্য্যন্ত যত সোণা রূপা পাওয়া গিয়াছে তাহার এক তালিকা প্রদত্ত হইতেছে ইহা দেখিলেই জানা যাইবে এত সোণা আবিষ্কার হইয়াও কেন সোণা মহার্ঘ রহিয়াছে। পাঁচ ছয় বৎসর আগে কেয়ারণ সাহেব ও লেডি ফসেট বলিয়াছিলেন সোণা সস্তা হইয়াছে, লেডি ফসেট বলেন যে, তখন শতকরা ১৫ টাকা সোণার দাম কমিয়াছিল, কিন্তু এখন ইংলণ্ডের এক প্রসিদ্ধ মাগাজিনে প্রতিপন্ন করিয়াছে যে সোণার মূল্য শতকরা ২২৲ টাকা বাড়িয়াছে। ১৮৫১ সালের পূর্ব্বে পৃথিবীর সমস্ত খনি হইতে ৬ কোটী টাকার স্বর্ণ পাওয়া যাইত এই ছয় কোটীর ৪ কোটী ইংলণ্ডে আসিত। তাহার পর লেডি ফসেট যখন তাঁহার পুস্তক লিখেন তখন গড়ে ১৯ কোটী টাকার সোণা প্রতিবৎসর উত্তোলিত হয় ও তাহা হইতে ১৪ কোটী টাকার সোণা ইংলণ্ডে আসিত। ইংলণ্ড ব্যবসায়ের দেশ, অন্যান্য দেশের লোক স্বর্ণ সমস্তই ইংলণ্ড হইতে পায়। অতএব ইংলণ্ডে যে স্বর্ণ আসে তাহাই ছড়াইয়া পড়ে। অবশিষ্ট স্বর্ণ যে দেশের খনি সেই দেশেই থাকে। সেও অল্প নয়। স্বর্ণ আবিষ্কারের পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ায় টাঁকশাল ছিল না। ২।৫

হাজার টাকা দরকার হইলেই ইংলণ্ড হইতে ছাপা হইয়া আসিত। এখন অষ্ট্রেলিয়ায় মস্ত টাঁকশাল হইয়াছে, কালিফর্ণিয়া অথবা ইয়ুনাইটেড ষ্টেটে যদিও টাঁকশাল ছিল মধ্যে দিন কতক সেখানে টাকা ছাপাই হইত না। এখন আবার সোণা রূপার প্রচুর পরিমাণে ছাপা হইতেছে। নিম্নলিখিত হিসাব দৃষ্টি করিলে সোণা কি রূপা মহার্ঘ হইল কতক উপলব্ধি হইবে।

প্রথম রূপা

১৮৭১ সাল হইতে ১৮৭৮ পর্য্যন্ত ৪৫ কোটী নাবারা রৌপ্য খনিতে পাওয়া যায়।

১৮৭৬ পর্য্যন্ত ৩২ কোটী জর্ম্মণি বিক্রয় করে।

১৮৭৬ হইতে ১৮৭৯ পর্য্যন্ত ২৬ কোটী।

ইহার মধ্যে শেষোক্ত ২৬ কোটীর মধ্যে ২৫ কোটী টাকার রৌপ্য শুদ্ধ ভারতবর্ষে আসিয়াছে। এই পরিমাণে বরাবর ১৮৭১ সাল হইতে ভারতবর্ষে টাকা আসিতেছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অনেক দিন অবধি ইংলণ্ডে টাকা ধার করিয়া এ দেশে পবলিক ওয়ার্কস চালাইতেছেন সে টাকার ইংলণ্ড হইতে রূপার চাঁই আসে। এইরূপে ১৮৭১ হইতে এ পর্য্যন্ত যত নূতন রূপা বাহির হইয়াছে তাহার অনেক ভারতবর্ষে আসিয়াছে। ৪।৫ বৎসর হইল একবার ফ্রান্স ও ইতালিতে রেশম হয় না সে বৎসর চীন হইতে সমস্ত রেশম যায় চীনেরা বিলাতী জিনিষ বড় লয় না। তাহারা রূপা লয়। তাহাতেও এই বাড়তি রূপার কিয়দংশ গিয়াছে। ১৮৭১ সালের পূর্ব্বে যে রূপা প্রতি বৎসর বাহির হইত এখনও তাহা হয় তাহার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প। চীনের সঙ্গে বাণিজ্যে ৮।১০ বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডকে প্রায় ৭ কোটী টাকার রৌপ্য দিতে হয়। চীনের চা নহিলে বিলাত চলে না। বিলাতী জিনিষ চীনেরা লইতে চায় না। সুতরাং অনেক টাকার রৌপ্য প্রতিবৎসর দিতে হয়। চীনের সঙ্গে এরূপ বিস্তৃত বাণিজ্য হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৭১ সালের পূর্ব্বে এক ভারতবর্ষে রেলওয়ে কোম্পানি সমূহের ৬০ কোটী টাকা খরচ হয়, ইহার কিয়দংশ সোণায় আসে, কিয়দংশ ভারতবর্ষেও পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ ইংলণ্ড হইতে রূপার চাঁই খরিদ হইয়া আসে। সুতরাং বিলাতে রূপা (কি পুরান কি নূতন) অধিক নাই প্রতিপন্ন হইল। প্রায় সমস্ত রূপাই ভারতবর্ষ ও চীনে পঁহুছিয়াছে। সমস্ত রূপা টাকাভাবে নাই। অনেকই কুলগৃহিণীদিগের পঁইচারূপে পরিণত হইয়াছে।

এক্ষণে সোণার হিসাব। ১৮৫১ সালের পূর্ব্বে পৃথিবীতে ছয় কোটী টাকার সোণা উৎপন্ন হইত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—

১৮৫২	হইতে	৫ বৎসরে গড়ে	২৯ কোটী	করিয়া হইয়াছে।
১৮৫৭	”	”	২৪	”
১৮৬২	”	”	২২	”
১৮৬৭	”	”	২১	”
১৮৭২	”	৪ ”	১৯	”

গড়ে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৬০০ কোটী টাকার স্বর্গ খনি হইতে উত্তোলিত হইয়াছে। ইহার এক চতুর্থাংশ গড়ে অষ্ট্রেলিয়া ও কালিফর্ণিয়ায় রহিয়া গিয়াছে। আগে যে রূপেই হউক, এক্ষণে বাহিরে যত সোণা যায় সমুদয়ই ইংলণ্ড হইতে। যাহারই সোণা কেনার দরকার হয় সেই ইংলণ্ড হইতে কিনিয়া লয় সুতরাং অষ্ট্রেলিয়া ও কালিফর্ণিয়ায় এই ৬০০ কোটীর মধ্যে ১৫০ কোটী রহিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লেডি ফসেটও বলিয়াছেন যে যখন ১৯ কোটি উৎপন্ন তখন ইংলণ্ডে ১৪ কোটি আসে। সেই অনুপাত ধরলেও ১৫০ কোটিই দাঁড়ায়। ইহার উপর এক জর্ম্মনি ১৮৭৬ পর্য্যন্ত ৮৪ কোটী টাকার স্বর্ণ খরিদ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছে। ইংলণ্ডের করেন্‌সি টাকা তিন গুণ বাড়িয়াছে। ১৮৬৫ সাল হইতে ইটালি ফ্রান্স সুইজর্লণ্ড বেলজিয়ম লাটিন কনফ্রারেন্স নামক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া রৌপ্য মুদ্রাঙ্কন বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এখানকার পুরান রূপাও কতক ইংলণ্ড হইতে ও কতক নিজ ফ্রান্স হইতে ভারতবর্ষ চীন প্রভৃতি দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। ১৮৭৬ সালে আমেরিকায় ৩০ কোটী টাকার সোণার Reserve ছিল। এখন ফ্রান্স ইংলণ্ড ও বার্লিন ব্যাঙ্কে ৩৭ কোটি টাকার রূপা ও ৯৮ কোটি টাকার সোণা Reserve আছে। সে টাকা না থাকিলে ব্যাঙ্ক চলে না। হিসাব করিয়া বেশ দেখান যায় যে ৬০০ কোটি টাকার সোণা পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কারণে বাজার হইতে অন্তর্হিতপ্রায় হইয়াছে। দেখিবে? আচ্ছা ৬০০ কোটি হইতে অষ্ট্রেলিয়া ও কালিফর্ণিয়ায় ১৫০ ও জর্ম্মনির ৮৪ বাদ দাও বাকী ৩৬৬। ইহা হইতে আমেরিকায় ৩০,=৩৩৬। ব্যাঙ্ক Reserve সব বাদ দিতে পার না কারণ ১৮৫১ সালের পূর্ব্বেও ব্যাঙ্কে রিসার্ভ ছিল। ১৮৪৬ সালে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে সোণায় রূপায় ১৪ কোটি ছিল ইহার মধ্যে যদি ১০ কোটি সোণা হয় আর ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সেও যদি সেই পরিমাণে সোণা থাকে তাহা হইলে ২০ কোটি হইল। জর্ম্মনির রিসার্ভ রূপায় ছিল। তবে এখন যে এই তিন ব্যাঙ্কে ৯৮ কোটি সোণা আছে তাহার অন্ততঃ ৭৬ কোটিও ১৮৫১ সালের পর আসিয়াছে। আচ্ছা ৩৩৬ হইতে ৭৬ বাদ দাও বাকী রহিল ২৬০ কোটি।

১৮৫১ সালের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে ৪ কোটি টাকার স্বর্ণ আসিত ইহার মধ্যে ২০ লক্ষ আন্দাজ গহনা আদি তৈয়ার হইত। মিল বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছিলেন যে,

গহনাদিতে (art and manufactures) উহা অপেক্ষা বৎসরে অধিক স্বর্ণ লাগে না। তখনও ইংলণ্ডের অনেক স্বর্ণ বাহিরে যাইত অতএব আমরা যদি আন্দাজ করিয়া ধরি যে ২॥০ কোটি টাকার সোণা প্রতিবৎসর ইংলণ্ডে ছাপা হইত বোধ হয় আমাদের অধিক ভুল হইবে না। এখনকার অনেকে স্বীকার করেন যে ইংলণ্ডের করেন্‌সি তিন গুণ হইয়াছে তবে ৭॥ কোটী প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে ছাপা হয়। প্রায় ২৮ বৎসর এইরূপ হইতেছে সেও প্রায় ২০০ কোটী। বাকী রহিল ৬৬ কোটী, এখনও ফ্রান্স আছেন ও আরও কত দেশে কত রকম সোণার খরচ আছে তাহার ঠিকানা নাই। এ পর্য্যন্ত হিসাবে দেখাইয়া দিল যে, অদ্যাবধি যত সোণা আসিয়াছিল সব চুকিয়া গিয়াছে।

এখন আর একটী জিনিস চাই। উপস্থিত যে সোণা বাজারে আসিয়া পড়ে তাহাতে পৃথিবীর সংকুলান হয় কি না? যদি হইয়া বাঁচে ভারতবর্ষে স্বর্ণ মুদ্রা চালানয় ভালই হইবে। যদি না থাকে চালাইলে সর্ব্বনাশ হইবে। বাজার শব্দের অর্থ ইংলণ্ড। কারণ ইংলণ্ডেই স্বর্ণ ও রৌপ্য জমিয়া থাকে ও তথা হইতেই লোক উহা খরিদ বিক্রয় করে। ইংলণ্ডে ৫ বৎসর আগে ১৪ কোটী স্বর্ণ আসিত; এখন স্বর্ণ উঠা কমিয়াছে ইংলণ্ডে আসাও কমিয়াছে। যে পরিমাণে কমিয়া আসিতেছে তাহাতে এখন কমিয়া ১২ কোটী হইয়াছে। এক ইংলণ্ডেই তাহার ৭॥ কোটী ছাপা হয়। বাকী ৪॥ কোটি। জর্ম্মনি প্রায় তিন কোটী ছাপিতেছেন, লাটিনকনফরেন্সও তথৈবচ। সাড়ে তের কোটী প্রায় দরকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কুল জমায় ১২ কোটী বই ঘরে নাই, এমনি টানাটানি দাঁড়াইয়াছে যে জর্ম্মনিও আবার রূপা ছাপাইতে হুকুম দিয়াছেন। এখন আবার যদি ভারতবর্ষ স্বর্ণ ধরেন তবে আর রক্ষা নাই।

পাঠকবর্গ দেখিবেন যে ব্যবসায়ে শতকরা ২।৩ টাকা এক্‌সচেঞ্জ প্রায়ই দিতে হয়। তাহার উপর সোণা ও রূপার টাকা চলন লইয়া আর এক রকমের এক্‌সচেঞ্জ হয় এবং বর্ত্তমান সময়ে স্বর্ণের মূল্য অধিক হওয়ার দরুণ এই এক্‌সচেঞ্জে ভারতবর্ষের ভয়ানক লোকসান হইতেছে। কেন স্বর্ণ মহার্ঘ হইল তাহাও একপ্রকার প্রতিপাদিত হইয়াছে। এসকল ভিন্ন ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে আর এক রকমের এক্‌সচেঞ্জ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ৬০ কোটী টাকার জিনিস ইংলণ্ডে যায়, আর ইংলণ্ডের, ভারতবর্ষে রপ্তানী সেক্রেটারী ষ্টেটের ড্রাফ্‌ট ও টাকার সুদে সেটা ভুক্তন হইয়া যায়। দেনাটা এক রকম গায়ে গায়ে শোধ যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে যদি কোন বার ইংলণ্ড হইতে কোন রেলওয়ের জন্য ১০ কোটি টাকা পাঠাইতে হয়, সেবার এক্‌সচেঞ্জ ভারতবর্ষে

একটু না একটু সুবিধা নিশ্চয়ই হয়। আর মধ্যে মধ্যে এরূপ টাকা ধার হইয়া ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসেই। এই ধারী টাকার অনেক রূপা আসে, যে অল্প বিল আসে তাহাতেই আমাদের কিছু সুবিধা হয়।

এখন এই এক্‌সচেঞ্জ গোলযোগের ঔষধ কি? উত্তর এই যে, কোন ঔষধই আমাদের হাতে নাই। আমরা কোনরূপেই ইহার প্রতিবিধান করিতে পারি না। তবে সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে অতি অল্প দিনের মধ্যে রূপার দাম মহার্ঘ হইয়া আসিবে। রূপার বড় বড় খনিতে মাল তলায় পড়িয়াছে ২০০০।৩০০০ ফুটের নীচে বসিয়া রূপা তুলিতে হইলেই রূপার দাম একটু একটু করিয়া মহার্ঘ হইবে। আর সোণার দাম বেশী হওয়ার দরুণ, ইউরোপীয় অনেক গভর্ণমেণ্টের চক্ষু খুলিয়া যাইতেছে। জর্ম্মনি ত রূপা ছাপিবার হুকুম দিয়াছেন। ইংলণ্ডেও রূপার টাকা অল্প বিস্তর ছাপা হয় এবিষয়ে আন্দোলন হইতেছে। আমাদের গভর্ণমেণ্টের এখন উচিত চুপ করিয়া থাকা, অথবা ইউরোপীয় গভর্ণমেণ্ট সকল যাহাতে রূপার টাকা ছাপেন তাহার চেষ্টা করা।

উপসংহার কালে আমাদের একজন প্রধান সংবাদপত্র যে বলেন পৃথিবী শুদ্ধ রূপার টাকা হইলে এক্‌সচেঞ্জ গোল হইবে না তাহার বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। জর্ম্মনি ফ্রান্স কেবল সোণার টাকা করিতে গিয়া এখন যেমন গোল বাঁধাইয়াছেন, যদি তাঁহারা ঐরূপ কেবল রূপার ধরিতেন তাহা হইলেও ঠিক এইরূপ গোল হইত। এখন সোণা মহার্ঘ হইয়াছে তখন রূপা মহার্ঘ হইত এই মাত্র বিশেষ।
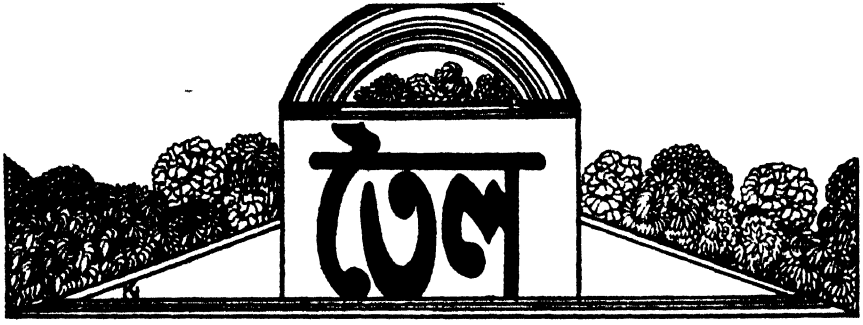
তৈল যে কি পদার্থ তাহা সংস্কৃত কবিরা কতক বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতে তৈলের অপর নাম স্নেহ—বাস্তবিকও স্নেহ ও তৈল একই পদার্থ, আমি তোমায় স্নেহ করি, তুমি আমায় স্নেহ কর অর্থাৎ আমরা পরস্পরকে তৈল দিয়া থাকি। স্নেহ কি? যাহা স্নিগ্ধ বা ঠাণ্ডা করে তাহার নাম স্নেহ। তৈলের ন্যায় ঠাণ্ডা করিতে আর কিসে পারে!

সংস্কৃত কবিরা ঠিক বুঝিয়াছিলেন। যে হেতু তাঁহারা সকল মনুষ্যকেই সমানরূপ স্নেহ করিতে বা তৈল প্রদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন!

বাস্তবিকই তৈল সর্ব্বশক্তিমান্, যাহা বলের অসাধ্য, যাহা বিদ্যার অসাধ্য, যাহা ধনের অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য, তাহা কেবল একমাত্র তৈল দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

যে সর্ব্বশক্তিময় তৈল ব্যবহার করিতে জানে সে সর্ব্বশক্তিমান্। তাহার কাছে জগতের সকল কাজই সোজা, তাহার চাকরির জন্য ভাবিতে হয় না—উকিলিতে পসার করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না—বিনা কাজে বসিয়া থাকিতে হয় না, কোন কাজেই শিক্ষানবিশ থাকিতে হয় না।

যে তৈল দিতে পারিবে তাহার বিদ্যা না থাকিলেও সে প্রফেসার হইতে পারে, আহাম্মুক হইলেও মাজিষ্ট্রেট হইতে পারে, সাহস না থাকিলেও সেনাপতি হইতে পারে এবং দুর্লভরাম হইয়াও উড়িষ্যার গভর্ণর হইতে পারে।

তৈলের মহিমা অতি অপরূপ, তৈল নহিলে জগতের কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। তৈল নহিলে কল চলে না, প্রদীপ জ্বলে না, ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না, চেহারা খোলে না, হাজার গুণ থাকুক তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। তৈল থাকিলে তাহার কিছুরই অভাব থাকে না।

সর্ব্বশক্তিময় তৈল নানা রূপে সমস্ত পৃথিবী ব্যপ্ত করিয়া আছেন। তৈলের যে মূর্ত্তিতে আমরা গুরুজনকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম ভক্তি, যাহাতে গৃহিণীকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম প্রণয়, যাহাতে প্রতিবেশীকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম মৈত্রী, যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম শিষ্টাচার ও সৌজন্য "ফিলনথ্রপি।" যাহা দ্বারা সাহেবকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম লয়েলটি, যাহা দ্বারা বড়লোককে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম নম্রতা বা মডেষ্টি, চাকর বাকর প্রভৃতিকেও আমরা তৈল দিয়া থাকি, তাহার পরিবর্ত্তে ভক্তি বা যত্ন পাই। অনেকের নিকট তৈল দিয়া তৈল বাহির করি।

পরস্পর ঘর্ষিত হইলে সকল বস্তুতেই অগ্ন্যুদ্গম হয় সেই অগ্ন্যুদ্গম নিবারণের একমাত্র উপায় তৈল। এইজন্যই রেলের চাকায় তৈলের অনুকল্প চর্ব্বি দিয়া থাকে। এইজন্যই যখন দুইজনে ঘোরতর বিবাদে লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হয়, তখন রফা নামক তৈল আসিয়া উভয়কে ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। তৈলের যদি অগ্নিনিবারণী শক্তি না থাকিত তবে গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে পিতা পুত্রে স্বামী স্ত্রীতে রাজায় প্রজায় বিবাদ বিসম্বাদে নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে তৈল দিতে পারে সে সর্ব্বশক্তিমান্ কিন্তু তৈল দিলেই হয় না। দিবার পাত্র আছে সময় আছে কৌশল আছে।

তৈল দ্বারা অগ্নি পর্য্যন্ত বশতাপন্ন হয়। অগ্নিতে অল্প তৈল দিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে আবদ্ধ রাখা যায়। কিন্তু সে তৈল মূর্ত্তিমান্।

কে যে তৈল দিবার পাত্র নয় তাহা বলা যায় না। পুঁটে তেলি হইতে লাট সাহেব পর্য্যন্ত সকলেই তৈল দিবার পাত্র। তৈল এমন জিনিষ নয় যে নষ্ট হয়। একবার দিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই কোন না কোন ফল ফলিবে। কিন্তু তথাপি যাহার নিকট উপস্থিত কাজ আদায় করিতে হইবে সেই তৈলনিষেকের প্রধান পাত্র।

সময়—যে সময়েই হউক তৈল দিয়া রাখিলেই কাজ হইবে। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে অল্প তৈলে অধিক কাজ হয়।

কৌশল—পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যেরূপেই হউক তৈল দিলে কিছু না কিছু উপকার হইবে। যেহেতু তৈল নষ্ট হয় না তথাপি দিবার কৌশল আছে। তাহার প্রমাণ ভট্টাচার্য্যেরা সমস্ত দিন বকিয়াও যাহার নিকট ।১০ পাঁচ সিকা বই আদায় করিতে পারিল না—একজন ইংরেজীওয়ালা তাহার নিকট অনায়াসে ৫০ টাকা বাহির করিয়া লইয়া গেল। কৌশল করিয়া একবিন্দু দিলে যত কার্য্য হয় বিনা কৌশলে কলস কলস ঢালিলেও তত হয় না।

ব্যক্তিবিশেষে তৈলের গুণতারতম্য অনেক আছে। নিষ্কৃত্রিম তৈল পাওয়া অতি দুর্লভ। কিন্তু তৈলের এমনি একটি আশ্চর্য্য সম্মিলনী শক্তি আছে যে তাহাতে যে উহা অন্য সকল পদার্থের গুণই আত্মসাৎ করিতে পারে। যাহার বিদ্যা আছে তাহার তৈল আঁমার তৈল অপেক্ষা মূল্যবান। বিদ্যার উপর যাহার বুদ্ধি আছে তাহার আরও মূল্যবান্। তাহার উপর যদি ধন থাকে তবে তাহার প্রতি বিন্দুর মূল্য লক্ষ টাকা। কিন্তু তৈল না থাকিলে তাহার বুদ্ধি থাকুক, হাজার বিদ্যা থাকুক, হাজার ধন থাকুক কেহই টের পায় না।

তৈল দিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এ প্রবৃত্তি সকলেরই আছে এবং সুবিধা মতে আপন গৃহে ও আপন দলে সকলেই ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকে কিন্তু অনেকে এত অধিক স্বার্থপর যে বাহিরের লোককে তৈল দিতে পারে না। তৈল দান প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও উহাতে কৃতকার্য্য হওয়া অদৃষ্টসাপেক্ষ।

আজ কাল বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি শিখাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা হইতেছে। যাহাতে বঙ্গের লোক প্রাক্টিক্যাল অর্থাৎ কাজের লোক হইতে পারে তজ্জন্য সকলেই সচেষ্ট কিন্তু কাজের লোক হইতে হইলে তৈলদান সকলের আগে দরকার—অতএব তৈলদানের একটী স্কুলের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব আমরা প্রস্তাব করি বাছিয়া বাছিয়া কোন রায়বাহাদুর অথবা খাঁ বাহাদুরকে প্রিন্সিপ্যাল করিয়া শীঘ্র একটী স্নেহনিষেকের কালেজ খোলা হয়। অন্ততঃ উকিলি শিক্ষার নিমিত্ত লা কালেজে একজন তৈল অধ্যাপক নিযুক্ত করা আবশ্যক। কালেজ খুলিতে পারিলে ভালই হয়।

কিন্তু এরূপ কালেজ খুলিতে হইলে প্রথমতই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তৈল সবাই দিয়া থাকেন—কিন্তু কেহই স্বীকার করেন না যে আমি দিই। সুতরাং এ বিদ্যার অধ্যাপক জোটা ভার, এ বিদ্যা শিখিতে হইলে দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে হয়। রীতিমত লেক্‌চার পাওয়া যায় না। যদিও কোন রীতিমত কলেজ নাই তথাপি যাঁহার নিকট চাকরীর বা প্রোমোসনের সুপারিস মিলে তাদৃশ লোকের বাড়ী সদাসর্ব্বদা গেলে উত্তমরূপ শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালির বল নাই, বিক্রম নাই, বিদ্যাও নাই বুদ্ধিও নাই। সুতরাং বাঙ্গালীর একমাত্র ভরসা তৈল—বাঙ্গালায় যে কেহ কিছু করিয়াছেন সকলই তৈলের জোরে। বাঙ্গালিদিগের তৈলের মূল্য অধিক নয়। এবং কি কৌশলে সেই তৈল বিধাতৃ-পুরুষদিগের সুখসেব্য হয়, তাহাও অতি অল্প লোক জানে। যাঁহারা জানেন

তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিই। তাঁহারাই আমাদের দেশের বড় লোক তাঁহারাই আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া আছেন।

তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হইবে ইচ্ছা করিলে সে শিক্ষা এদেশে হওয়া কঠিন। তজ্জন্য বিলাত যাওয়ার আবশ্যক। তত্রত্য রমণীরা এ বিষয়ের প্রধান অধ্যাপক, তাহাদের থ্রু হইলে তৈল শীঘ্র কাজে আইসে।

শেষ মনে রাখা উচিত এক তৈলে চাকা ঘোরে আর তৈলে মন ফেরে।

যখন ভগবান্ মরীচিমালী দৈবসিক ব্যাপার সমাধা করিয়া পৃথিবীর স্থূল কলেবরের অন্তরালে বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করেন ও যখন আমরা রজনীর নিবিড় তিমিরসংহতির মধ্যে নিমজ্জিত হই তখন কে ঐ গগন প্রদেশে নিজ পরিচিত মুখখানি সময়ে সময়ে দেখাইয়া আমাদের আলোকবিরহসম্ভূত ভীতিকে চিত্ত হইতে দূর করে ও স্বচ্ছ সুনির্ম্মল কিরণরাশি বর্ষণ করিয়া প্রকৃতিকে রজতসন্নিভ করে তুলে? আমরা সকৃতজ্ঞচিত্তে আজি উক্ত মহৎ পদার্থের নাম, ধাম ও গুণ কীর্ত্তন করিয়া পাঠকগণের সন্নিধানে পরিচয় দিব। ঐ প্রিয়দর্শনকে অবনীবাসিগণ চন্দ্র এই অভিধানে আখ্যাত করে। চন্দ্র পৃথিবীর চিরসহচর। যখন পৃথিবীতলে মনুষ্যজাতির পদচিহ্ন পড়ে নাই, যখন জীবনব্যাপার পৃথিবীতে অজ্ঞাত ছিল তখনও এই চন্দ্র তৃণহীন পর্ব্বতশীর্ষ সকলকে রজত কিরীট প্রদান করিত, তখনও বিশাল বিস্তীর্ণ মরুপ্রদেশ সকলকে নিজ করে উদ্ভাসিত করিত, তখনও নীরব ভূপৃষ্ঠকে নিভৃত ভাবে শীতল করিত। এমন চিরসহচর বন্ধুর বিষয় যতদূর জানা সম্ভব আমাদের জানা উচিত।

চন্দ্রের কলাবত্তা বহুদিবস হইতেই মানবজাতির বিচার্য্য বিষয়। চন্দ্রের ক্ষয় বৃদ্ধির নিয়মানুসারে প্রাচীন জাতিরা যে সময় পরিমাণ করিত তাহার সন্দেহ নাই। টিউটনিক ভাষায় চন্দ্রের নাম ও তাহাদের মাসার্থবোধক শব্দ একই ছিল। কালডীয় জাতীয়েরা চন্দ্রের গ্রহণ নির্ণয়েও কিয়ৎপরিমাণে ক্ষমবান্ হইয়াছিল। কালডীয়ের পরে মিসরীয়েরাও গ্রহণ নির্ণয় করিত। গ্রীক্ রোমানগণ কালডীয়ের ও মিসরের নিকট চন্দ্রসম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞানলাভ করে। তাহাদেরই নিকট হইতে গ্রীকগণ চন্দ্রের উপাসনা শিখে। গ্রীকদিগের নিকট চন্দ্র সাধারণপ্রিয় একজন উপাস্য দেবতা ছিলেন। আমাদের হিন্দুগণ অতি পূর্ব্ব কালেই চন্দ্রসম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন সকলের মীমাংসা করিয়াছিলেন। চন্দ্র যে পৃথিবীকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ঘুরে ও সূর্য্যকিরণপাতে চন্দ্রের দীপ্তিমত্তা ইহা কালিদাসাদি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ জানিতেন।

বপ্তৌ চ সম্পর্কমুপেত্য বালা নবেন দীক্ষা বিধিশায়কেন।
করেণ ভানোর্বহুলাবসানে সন্ধুক্ষ্যমাণেব শশাঙ্করেখা। [কুমার-সম্ভব।

চন্দ্রের ক্ষয়বৃদ্ধি-সম্বন্ধে পৌরাণিকেরা আর এক গল্প বলেন।

দক্ষপ্রজাপতির আটাইশ কন্যা। প্রথম সাতাইশটির সহিত চন্দ্রের বিবাহ হয়। কনিষ্ঠা সতী শিবরমণী হন। উক্ত দক্ষতনুজা সাতাইশ নক্ষত্র নামে অভিহিতা। চন্দ্র সকল স্ত্রীর মধ্যে রোহিণীতে (Aldebaron) কিছু বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বক্রী ছাব্বিশটী স্ত্রী মনের ক্লেশে পিতাকে চন্দ্রের কার্য্য জানান। দক্ষ চন্দ্রকে বারণ করিয়া বলেন যে, কেবল রোহিণীকে অত ভালবাসিলে চলিবে কেন; চন্দ্র মুখে স্বীকার করিলেন যে সকলের প্রতি সমান ভালবাসা রাখিবেন কিন্তু কার্য্যতঃ যে রোহিণীগতপ্রাণ সে রোহিণীগতপ্রাণই রহিলেন। কন্যারা পুনরায় পিতাকে জানানতে দক্ষ রাগিয়া অভিসম্পাত করিলেন, চন্দ্র যক্ষ্মা হইয়া মরুক। চন্দ্র যখন মরেন মরেন তখন কন্যারা দেখিলেন বড়ই বিভ্রাট্, সকলেই ত বিধবা হয়! তখন আবার কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার পায়ে হাতে ধরেন। পিতা তখন একটু নরম হইয়া আজ্ঞা দিলেন, "আমার বাক্য ত ব্যর্থ হইবে না। চন্দ্র ক্ষয় নিশ্চয়ই হইবেন, তবে তিনি ১৫ দিন ক্ষয় হইবেন; পনর দিন সেই ক্ষয় পূরণ করিবেন। সুতরাং চন্দ্রের নানা অবস্থা ভেদ।

পৌরাণিক মতে চন্দ্র অত্রিনেত্রসম্ভূত :—

"ব্রহ্মণো মানসঃপুত্র স্ত্বত্রিনাম মহাতপাঃ
স্রষ্টুকামঃ প্রজা বৎস তপস্তেতেপে সুদুস্তরং।
ত্রীণিবর্ষ সহস্রাণি দিব্যানীতীহ নঃ শ্রুতং
ঊর্দ্ধমাচক্রমে তস্য রেতঃ সোমত্বমীচিবৎ।
নেত্রাভ্যাং তস্তসুস্রাব দশধা দ্যোতয়দ্দিশঃ
তং গর্ভং ব্রহ্মণাদিষ্টা দশদেব্যো দধুর্দিশঃ।
সংগত্যৈব মহারাজ নৈব তাঃ সমশক্নুবন্।
যদা ন ধারণে শক্তা স্তস্য গর্ভস্য তাঃ দিশঃ
ততস্তাভিঃ সহৈবাসৌ নিপপাত বসুন্ধরাং
পতিতং তংসমালোক্য ব্রহ্মলোকপিতামহঃ
রথমারোপয়ামাস লোকানাং হিতকাম্যয়া
স তেন রথমুখ্যেন সাগরান্তাং বসুন্ধরাং
ত্রিসপ্তকৃত্বো দ্রুহিণো কারয়ন্তং প্রদক্ষিণং
তস্য তৎ প্রাবিতং তেজঃ পৃথিবী মন্বপদ্যত
তেনৌষধ্যঃ সমুদ্ভূতা যাভিঃ নন্ধার্য্যতেজগৎ
সলব্ধতেজা ভগবান্ ব্রহ্মণা বৰ্দ্ধিতঃ স্বয়ং।"

অর্থাৎ ব্রহ্মার মানসপুত্র ভগবান্ অত্রি প্রজাসৃষ্টি কামনা করিয়া দেবলোকীয় ৩০০০ বৎসর দুস্তর তপস্যাচরণ করেন। তাঁহার তেজোরাশি তাঁহার চক্ষুপথ দিয়া লব্ধমার্গ হইয়া দশদিক উজ্জ্বল করিয়া দশভাগে বিভক্ত হয়। ব্রহ্মার আদেশে সেই চন্দ্রত্বপ্রাপ্ত তেজোরাশিকে দশদিক গর্ভে ধারণ করেন। কিন্তু ধারণে অশক্ত হইয়া চন্দ্রের সহিত তাহারা পৃথিবীতে পড়িয়া যায়। চন্দ্রকে পতিত দেখিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহাকে রথে তুলিয়া লন। এবং সেই দিব্য রথে উঠাইয়া তাহাকে একুশবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করান। তাহাতে চন্দ্রের তেজঃ পৃথিবীতে পড়ে; তাহাতে ওষধি সকল উৎপন্ন হইয়াছে, যদ্‌গুণে পৃথিবী রক্ষা পাইতেছে।

মহাভারতের মতে চন্দ্র সমুদ্রমন্থনকালে উৎপন্ন হইয়া পৃথিবী হইতে দুই লক্ষ যোজন দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যখন নারায়ণ মোহিনীবেশে দেবগণকে সুধা পরিবেশন করেন, তখন দৈবাৎ রাহুদৈত্য দেবসমাজে লুকাইয়া সুধাপান করিতে থাকে।

"সবাকারে ক্রমে সুধা বাঁটিয়া মোহিনী
অবশেষে যত পান করেন আপনি
হেনকালে ডাকিয়া বলিল রবিশশী
হের দেখ রাহুদৈত্য সুধা খাইল আসি
শুনি সুদর্শনে আজ্ঞা দেন নারায়ণ
দুইখান করিয়া কাটিল তত্ক্ষণ
তথাপি না মরিলেক সুধাপান হেতু
মুখ হৈল রাহু কলেবর হৈল কেতু।" কাশীদাস

নারায়ণের আজ্ঞায় খণ্ডদেহ হইলেও তাহারা আজিও চন্দ্র ও সূর্য্যের শত্রুতা সাধন করিতেছে।

চন্দ্রের কলঙ্কের কারণ চন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রীকে হরণ করেন। চন্দ্র একবার অভিমন্যুরূপে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। চন্দ্র অত্যন্ত রোহিণীভক্ত ছিলেন। গর্গমুনি চন্দ্রের বাটীতে গিয়া আতিথ্য স্বীকার করেন; চন্দ্র অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলেন না। গর্গমুনি শাপ দিলেন তুমি পৃথিবীতে যাও। চন্দ্র পায়ে পড়েন। তখন সদয় হইয়া মুনি বলিলেন যে তোমাকে অধিককাল পৃথিবীতে থাকিতে হইবে না। এই জন্যই অকালে অভিমন্যুবধ। চন্দ্র সৌম্যমূর্ত্তি রজোগুণবিশিষ্ট ছিলেন।

যাহা হউক আমরা এক্ষণে পুরাণ ত্যাগ করিয়া প্রকৃত বিজ্ঞানের কথা লইয়া আলোচনা করি। চন্দ্র পৃথিবীর একমাত্র পারিপার্শ্বিক; ইহা পৃথিবী অপেক্ষা বহু

এরূপ গল্পকথা সকল অযৌক্তিক। চন্দ্র অবয়বে পৃথিবীর প্রায় সার্দ্ধ উনপঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। পৃথিবীর ব্যাস ৭৯২৬ মাইল, চন্দ্রের ব্যাস ২১৫৩ মাইল। উভয়ের ঘনফলের যে অনুপাত উভয়ের অবয়বেরও সেই অনুপাত। চন্দ্র দেখিতে একটী ছোট রেকাবের মত কিন্তু চন্দ্রের পরিমাণফল ইউরোপ অপেক্ষা অধিক। ইহা বর্ত্তুলাকার ও পৃথিবী হইতে ২৪০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। চন্দ্র এক বৎসরে পৃথিবীকে প্রায় তের বার প্রদক্ষিণ করে। সুতরাং সম্বৎসরে চান্দ্র মাস সর্ব্বশুদ্ধ তেরটী। চন্দ্র যে সময়ে পৃথিবীকে একবার বেষ্টন করে, ইহার আপন মেরুদণ্ডে একবার ঘুরিতে ঠিক সেই সময় লাগে। যেমন একটা বর্ত্তুলকে সূত্রলগ্ন করিয়া অঙ্গুলির চতুষ্পার্শ্বে ঘুরাইলে সেই বর্ত্তুলের একবারের পর পুনরায় পূর্ব্বস্থানে আসিতে যে সময় লাগে, বর্ত্তুলের আপন মেরুসীমা ব্যতীত যে কোনদিক, পুনরায় সেইদিকে আসিতে ঠিক সেই সময়কে প্রয়োজন করে। তৈলযন্ত্রের বলীবর্দ্দের পূর্ব্বদিকস্থ পার্শ্বের পুনরায় পূর্ব্বদিকস্থ হইতে যে সময় অতিবাহিত হইবে, ঠিক সেই সময়েই বলদ একবার ঘানিগাছকে প্রদক্ষিণ করে। চন্দ্রের একপার্শ্ব সতত আমাদেব সম্মুখীন থাকে। চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠ কোন কালে কখন আমাদের নেত্রগোচর হইবার নহে। ইহা বলা বাহুল্য যে চন্দ্র পৃথিবীর আকর্ষণ বশতই শূন্যমার্গে ঘুরিতেছে। যেমন অঙ্গুলি কর্ত্তৃক ঘূর্ণ্যমান বর্ত্তুলের এক পৃষ্ঠ নিরন্তর অঙ্গুলির পুরোবর্ত্তী থাকে, অপর পৃষ্ঠ চিরপরাঙ্মুখ থাকে, সেইরূপ চন্দ্রেরও একদিক সর্ব্বদা পৃথিবীর সম্মুখীন থাকে, অপর দিক চিরবিবর্জ্জিত।

আমরা চন্দ্রসম্বন্ধে এতদূর যাহা বলিলাম তাহাতে গণিতনির্ণীত যুক্তি কিছুই দিলাম না। বস্তুতঃ তাহা দিতে গেলে সাধারণের বোধগম্য হওয়া সুকঠিন হইবে। খগোলকের সমস্ত জ্যোতিষ্কের মধ্যে চন্দ্রের গতি যেমন জটিল এমন আর কাহারও নহে। চন্দ্র পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক বটে কিন্তু চন্দ্রের কক্ষ পৃথিবীর কক্ষের সহিত সমধরাতলস্থ নহে, সুতরাং পৃথিবীর উষ্ণ কটিবন্ধের অপেক্ষাকৃত স্ফুরিত অংশের দ্বারা যখন চন্দ্র আকৃষ্ট হয় তখন ইহা কিয়ৎপরিমাণে পৃথিবীর নিকটস্থ হয়। চন্দ্রের কক্ষ এ জন্য ঠিক বৃত্তাকৃতি না হইয়া বৃত্তাভাসাকৃতি। তাহাতে আবার চন্দ্রও কিয়ৎপরিমাণে পৃথিবীকে আকর্ষণ করে; তদ্ব্যতীত চন্দ্র যখন যে গ্রহের সমীপস্থ, তখন তাহাকর্ত্তৃক সামান্য পরিমাণে আকর্ষিত হয়। সুতরাং চন্দ্রের বর্ত্ম আরও দুর্নির্ণেয় হইয়াছে। আমরা সূর্য্যগ্রহণের বিষয় বলিবার সময় এ বিষয় বুঝাইতে কিছু চেষ্টা করিব। একটি উদাহরণ দিলে বোধ হয় চন্দ্রের খগোলস্থ গতি কতকটা উপলব্ধ হইতে পারে। তুমি একটি সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যভাগে একটি স্তম্ভোপরি বইস। সেই স্তম্ভের চারিদিকে ৪০০

রসি করিয়া তফাতে ৩৬৫টী বৃক্ষ বৃত্তাকারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ক্রমান্বয়ে সমদূরবর্ত্তী ভাবে অবস্থিত আছে। একজন অশ্বারোহী পুরুষ প্রত্যেক বৃক্ষের প্রায় ১ রসি করিয়া তফাতে থাকিয়া ১৪টী বৃক্ষের বামপার্শ্ব ও ১৪টী বৃক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। এইরূপে সেই অশ্বারোহী পুরুষ ২৬ বার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বস্থানে আসিল। ঐ অশ্বারোহী পুরুষ যে বর্ত্মে চলিল, সৌরজগতে চন্দ্রের বর্ত্ম ও ঠিক তাহাই। কিন্তু পৃথিবীর লোকেরা চন্দ্রকে ঠিক বৃত্তাকারে পৃথিবীকে বেষ্টন করিতে দেখিবে। মনে কর ঐ ৩৬৫টী বৃক্ষ আর কিছুই নহে, একটি সচল বৃক্ষের ৩৬৫ দিনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান মাত্র ও একটি বৃক্ষই অশ্বারোহী পুরুষকে টানিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে লইয়া যাইতেছে। তাহা হইলে বৃক্ষের লোক অশ্বারোহীকে কিরূপ অবস্থায় দেখিবে? তাহারা দেখিবে যে অশ্বারোহী তাহাদিগকে বৎসরে ১৩ বার অর্থাৎ ২৮ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করিতেছে। সেইরূপ পৃথিবীর লোকেরা চন্দ্রকে নিত্যই ১৫ অংশ করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে দেখে। এই জন্য চন্দ্রকে শুক্ল প্রতিপদ হইতে তিথিবৃদ্ধি ক্রমে পনর অংশ করিয়া উপর উপর উদয় হইতে দেখি। এই জন্যই ৪৮ মিনিট করিয়া চন্দ্র দেরি করিয়া উঠেন।

চন্দ্রের নিজের কিরণ নাই। সূর্য্যকিরণেই ইহার দীপ্তি। পূর্ণিমার সময় পৃথিবী, সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যভাগে পড়ে, এ জন্য চন্দ্রেব পৃথিবীসম্মুখীন পৃষ্ঠটা সমস্তই আমরা উজ্জ্বল দেখিতে পাই। ক্রমে চন্দ্র যত আপন পথে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই এ পৃষ্ঠের কিয়দংশ করিয়া রবিকরবিরহিত হইতে থাকে। আমরাও চন্দ্রকে ক্ষীয়মাণ দেখি। অমাবস্যার সময় চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যভাগে পড়ে, এ জন্য চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠে সূর্য্যের সমস্ত কিরণ পড়ে আমাদের দিকে কিছুই পড়ে না। এজন্য তখন আমরা চন্দ্রকে এককালীন দেখিতে পাই না। কোন কোন পূর্ণিমাতে চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্য সমসূত্রপাতে অবস্থিত হয় বলিয়া পৃথিবীর করাল ছায়ায় চন্দ্র আবৃত হয়। ইনিই আমাদের রাহু। এই রাহুর গ্রাসে চন্দ্রগ্রহণ হয়। দ্বিতীয়া ও তৃতীয়াতে চন্দ্রকে হাঁসুলির মত দেখায়। সূর্য্য-করদীপ্ত অংশ আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই, অবশিষ্ট ভাগ আমরা অস্পষ্ট দেখিতে পাই। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, ঐ ঐ দিনে পৃথিবীর অধিকাংশ উদ্দীপ্ত অংশ চন্দ্রের দিকে ফিরান থাকে, পৃথিবী হইতে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রকে আলোকিত করে। চন্দ্রের অপেক্ষা পৃথিবী দেখিতে ১৩½ গুণে বড়। সুতরাং ইহা বিচিত্র নহে চন্দ্রকিরণে আমরা যেমন আলোকিত হই, পৃথিবীকিরণে চন্দ্র তাহার তের গুণ উদ্ভাসিত হইবে। কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ বলেন, যে দক্ষিণ আমেরিকার নিবিড় অরণ্যানি সময়ে সময়ে চন্দ্রকে হরিদ্বর্ণ করিয়াছে।

তথাপি সূর্য্যের নিকট হইতে চন্দ্রের কিরণগ্রহণ সম্বন্ধে এক আপত্তি এই হইতে পারে যে, চন্দ্রে সূর্য্যকিরণের উষ্ণতা কই? উলাষ্টন্ সাহেব পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে চন্দ্রকর সূর্য্যকর অপেক্ষা ৮০০০০০ ভাগে হীন। অর্থাৎ ৮০০০০০ পূর্ণচন্দ্র একত্র করিলে সূর্য্যকিরণের সমান উষ্ণতা ও আলোক উপলব্ধি হইতে পারে। সচরাচর মনুষ্যরক্তের যেরূপ উষ্ণতা চন্দ্রকরের উষ্ণতা তাহা অপেক্ষা বাস্তবিক কম। এজন্য চন্দ্রকে শীতলই বোধ হয়। অনেকে অবগত আছেন যে, সচরাচর জলে কিয়ৎ পরিমাণে তাপাংশ থাকে কিন্তু আমরা তথাপি জলকে কত শীতল বিবেচনা করি!! যদি চন্দ্রকিরণে সূর্য্যকিরণের কিয়দংশ আছে, তবে চন্দ্রহীন রজনীতে আমরা অধিক শৈত্য অনুভব না করিয়া বরং উষ্ণতা অনুভব করি কেন? তাহার উত্তর এই, যে প্রত্যহই ক্ষিতিতল হইতে বাষ্পরাশি সমুদ্গত হইয়া গগনের অত্যুচ্চ প্রদেশে তরল মেঘমালার সৃষ্টি করে। তাহা এত পাতলা যে, আমাদেব নেত্রগোচব হয় না, কিন্তু সেই দিবাকালীন সঞ্চিত মেঘস্তরের অস্তিত্ব আমরা রাত্রে ফলদ্বারা জানিতে পারি। মেঘ কিয়ৎপরিমাণে অপরিচালক। সূর্য্যাস্তেব পর পৃথিবীব সঞ্চিত তাপরাশি অন্তরীক্ষে অপসৃত হইতে চেষ্টা পায়। কিন্তু উপরোক্ত মেঘ সকল প্রতিনিয়তই সেই উত্তাপাগমের প্রতিবন্ধক হয়। সার জন হার্সেল বলেন, পূর্ণিমার রাত্রে চন্দ্রকিবণে সেই মেঘ সকলের অপনয়ন হয়, কিন্তু অমাবস্যার রাত্রে তাহা হইতে পায় না এ জন্য আমরা পূর্ণিমা অপেক্ষায় অমাবস্যাতে উষ্ণতা অনুভব করি। পূর্ণিমার রাত্রে পৃথিবীত্যক্ত উত্তাপ অবাধে অন্তরীক্ষে প্রসারিত হইয়া পড়ে, আমরা তজ্জন্য শৈত্য অনুভব করি। অমাবস্যার রাত্রে আমরা পৃথিবীর তাপেই তপ্ত থাকি। চন্দ্রের সংস্কৃত নাম শীতরশ্মি, বা হিমাংশু, কিন্তু তাহার কারণ যে চন্দ্রে বরফ মাখান আছে তাহা নহে।

এক্ষণে চন্দ্রকিরণ সম্বন্ধে আর এক আপত্তির নিরাস করিতে আমাদের বাকি আছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে চন্দ্রের সর্ব্বগ্রাসের সময় পৃথিবীর সূর্য্য-বিরহিত অংশই চন্দ্রের দিক্‌স্থ থাকে, কিন্তু তথাপি সে সময়েও চন্দ্রের স্থানে স্থানে অস্পষ্ট আলোক দৃষ্ট হয় কেন? তাহার কারণ নির্ণয় বিষয়ে জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের আজিও মতভেদ আছে। যাঁহারা চন্দ্রে রাহুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন যে পৃথিবীর পশ্চাদ্দিকস্থ সূর্য্যকিরণ চন্দ্রের সীমাগত বায়ুরাশিতে তির্য্যগ্‌গতি (refraction); প্রাপ্ত হইয়া অল্পপরিমাণে চন্দ্রপৃষ্ঠকে আলোকিত করে। আবার কেহ কেহ বলেন যে চন্দ্রের ধাতুময় পাহাড় সকলের অনেকগুলি দীপক প্রকৃতিক (phosphorescent); তজ্জন্য সর্ব্বগ্রাস সময়ে পূর্ব্বসঞ্চিত কিরণরাশির এককালে অপনয়ন হয় না। আমরাও গ্রহণের কিছু পর পর্য্যন্তও চন্দ্রকে অপরিস্ফুট দেখি।

সূর্য্যকিরণে আলোক ও উত্তাপ ব্যতীত আরও অনেক গুণ আছে। সূর্য্য-কিরণে এমন এক রাসায়নিক ক্ষমতা আছে, যাহা দ্বারা উদ্ভিদগণ তাহাদের পত্রের হরিদ্বর্ণ প্রাপ্ত হয়; ও যাহার সাহায্যে তাহারা আপন কাষ্ঠাংশ প্রস্তুত করে। সূর্য্যের এই হরিজ্জননী ক্ষমতা থাকাতেই বৈজ্ঞানিকেরা সৌরচিত্রের sun-painting উদ্ভাবন করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক চন্দ্রস্থ ক্ষীণ সূর্য্যকিরণে সে গুণের কিয়দংশ আছে কি না? ইউনাইটেড ষ্টেটের আচার্য্য বস্তু সাহেব চন্দ্রকিরণ দ্বারাও সে কার্য্য সংসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

চন্দ্র যে সূর্য্যেরই নিকট হইতে কিরণরাশি ঋণ করিয়া লইতেছে, তাহার আর এক প্রমাণ চন্দ্রের দ্বিতীয় কলার সূর্য্যসন্নিহিত সীমাই আমরা সমুজ্জ্বল দেখি। চন্দ্রকে তখন হাঁসুলির মত দেখি, ও সেই হাঁসুলির স্থূলতার অংশ চন্দ্রের পশ্চিমাংশ। যদ্যপি কয়েক ঘণ্টা আমরা দ্বিতীয়া ও তৃতীয়ার চন্দ্রকে লক্ষ্য করি, তবে আমরা এক বিস্ময়াবহ ব্যাপার দেখিতে পাই। চন্দ্রের উজ্জ্বল অংশ জলস্রোতের ন্যায় সমভাবে না বাড়িয়া একটু অনিয়মে বাড়ে। প্রথমতঃ উজ্জ্বল অংশের পূর্ব্বসীমার দুই একটি অঙ্গুরীয়াকৃতি সমধিক প্রোজ্জ্বল দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়. সেই অঙ্গুরীয়ক গুলির পশ্চিমাংশ বিশিষ্টরূপ উজ্জ্বল হইতে থাকে, অল্প বিলম্বেই অঙ্গুরীয়কটী সম্পূর্ণ হইয়া গেল। মধ্যস্থান গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিয়া গেল। এই গুলি দেখিয়া বোধ হয় যে, চন্দ্রস্থ অঙ্গুরীয়াকৃতি উত্তুঙ্গ গিরিকিরীটের পশ্চিমাংশে প্রথমতঃ সূর্য্যকিরণ পড়ে, তজ্জন্য তাহা প্রথমে নেত্রগোচর হয়। তৎপরে উপত্যকায় সূর্য্যকিরণ আর না পড়িয়া একেবারে পূর্ব্বদিকের শীর্ষকে সুবর্ণমণ্ডিত করেন। তজ্জন্যই মধ্যভাগ ধ্বান্তসমাচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু যত পূর্ণিমা নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, সূর্য্য ততই চন্দ্রের পুরোবর্ত্তী হইতে থাকে, সে সময় গিরিকন্দর সকল অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন হইয়া উঠে, আমরাও কন্দরসমূহকে তত মলিন দেখি না। পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারটীর সহিত পৃথিবীর একটি ঘটনার সাদৃশ্য দেখাইলে, বোধ হয় অনেকের বিশেষ উপলব্ধি হইতে পারিবে। প্রাতঃকালে যখন সূর্য্য উঠে, তখন আমরা কোন একটি চকমিলান বাটীর পূর্ব্বদিকের ঘরগুলির ছাদ আলোকিত দেখি, পরে অনতিবিলম্বেই পশ্চিমদিকের ছাদগুলি আলোকিত দেখি। মধ্যের উঠান দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ভালরূপ কৃষ্ণিমাবিহীন দেখিতে পাই না। ঠিক চন্দ্রের গিরিগুহা সকলেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, আমরা এই পার্থিব কারাগারে থাকিয়াও পরীক্ষা দ্বারা তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

এক্ষণে আমরা দেখিব চন্দ্র হইতে পৃথিবীর কি কি উপকার সাধিত হয়। প্রথমতঃ চন্দ্রের হিমশীতলতা গুণ থাকায় মানবগণ দৈবসিক পরিশ্রমের পর হিমাংশুনিঃসৃতকর সেবন করিয়া কতই বিশ্রামসুখ অনুভব করে। ওষধি সকল

চন্দ্র হইতে তাহাদের রোগনাশক গুণ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করে। পৃথিবী সমুদ্র ও নদনদীতে যে জোয়ার ভাঁটা হয় তাহা চন্দ্রের আকর্ষণের উপরই অধিক নির্ভর করে। এই জোয়ার ভাঁটায় মানবজাতির যে কি পর্য্যন্ত উপকার সাধিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অর্ণবযান সকলের যাতায়াতের সুবিধা; কৃষকগণের ক্ষেত্রে জলসেচনের সৌকর্য্য ও বণিকগণের দেশ হইতে দেশান্তর গমনের উপায় জোয়ার ভাঁটার উপর বিস্তর নির্ভর করিতেছে। জ্যোতির্ব্বিদগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, চন্দ্র ১৭০০০ উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের আলোক ধারণ করে। পরিব্রাটগণ চন্দ্রের সাহায্যে পৃথিবীর দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ সকল নিরূপণ করিয়াছেন। শিশির-বর্ষণকার্য্যে চন্দ্রের বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে, চন্দ্রের শিশিরপ্রভাবেই ওষধি সকল বলবান্ হয়। এ জন্য চন্দ্রের একটি সংস্কৃত নাম ওষধীশ। এরূপ প্রবাদ আছে যে সমকটিবন্ধের লোকেরা চন্দ্র হইতে আর এক উপকার সাধিত করিয়া লয়। কিন্তু এ কথা কতদূর সত্য, তাহা বলা যায় না। তাহাদের শস্য কাটিবার যে সময় সেই সময়ে চন্দ্র তিন চারিদিন প্রায় একই সময়ে উদিত হয়। সচরাচর এক তিথি হইতে পর তিথিতে চন্দ্র ৪৮ মিনিট পশ্চাতে উদিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই কয়দিন চন্দ্র ১৫ মিনিট করিয়া পরে উদিত হয়। চন্দ্রের বর্ত্ম পৃথিবীর বর্ত্মের সহিত এক ধরাতলস্থ নহে, উভয় ধরাতলের অবচ্ছেদক বিন্দুর নিকটে যখন চন্দ্র থাকে, তখন চন্দ্রকে কিছু শীঘ্র শীঘ্র উঠিতে দেখি। এই ঘটনাটীর সময় যে পূর্ণিমা হয়, তাহাতে চন্দ্রকে দুই তিন দিবস প্রায় ১৫ মিনিট অন্তর করিয়া উঠিতে দেখা যায়। প্রতি বৎসর ২২ এ সেপ্টেম্বরের কাছাকাছি এই ঘটনা ঘটে। ঐ সময় ঘনঘন পূর্ণিমার আলোক পাইয়া কৃষকেরা দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া শস্য কাটিয়া লয়। এই জন্য তথায় তৎসাময়িক চন্দ্রকে "হারভেষ্ট" মুন বা ফসলের চন্দ্র কহে। এই হারভেষ্ট মুনের পরেই ঐ সকল দেশে ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে।

এ সকল ব্যতীত চন্দ্র মনুষ্যের মনোরাজ্যে কেমন আধিপত্য করিতেছে। কবিরা চন্দ্র হইতে কত কল্পনার সৃষ্টি করিতেছেন। প্রণয়িগণ চন্দ্রকিরণকে কি পর্য্যন্ত না প্রিয় সামগ্রী মনে করেন। ফলতঃ যদি প্রচণ্ড সূর্য্যসনাথ দিবামানের পর এককালে ঘোর তিমিরাবগুণ্ঠিতা যামিনীর তমোমধ্যে আমাদিগকে কাল যাপন করিতে হইত; যদি ক্লেশসমূহক্লিষ্ট সংসারপীড়ায় পীড়িত হইয়া আমরা চান্দ্রমসী রজনীতে বন্ধুবান্ধবের সহিত প্রাঙ্গণে, উপবনে, বা প্রান্তরে বিশ্রম্ভালাপে কিয়ৎকাল অতিপাত করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে এই রোগ শোক জরাসঙ্কুল পৃথিবী বাস আমাদের দ্বিগুণতর যন্ত্রণার নিদানীভূত হইত সন্দেহ নাই। চন্দ্র কবিদিগের নিকট নিশানাথ, কুমুদিনীবল্লভ, প্রভৃতি সমাদরসূচক নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই অশেষগুণাকর নিশাকর নিজে কি বস্তু তাহা জানিতে কাহার কৌতূহল-শিখা উদ্দীপ্ত না হয় ? কিন্তু জানিবার যো নাই। অনেককাল হইতে অনেক পণ্ডিত বিবিধপ্রকার অনুমান করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আজিও একটীর প্রমাণ হয় নাই ; যাহা হউক চন্দ্র যে মৃত্তিকাদি পার্থিব পদার্থঘটিত একটি প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড তাহাতে সন্দেহের বিশেষ কারণ বিদ্যমান নাই। চন্দ্রে জীবলোক আছে কিনা, এই প্রশ্ন বহুকাল অবধি শুনিতেছি। কিন্তু জীবলোক থাকা আশ্চর্য্য নহে। যখন অগ্নিমধ্যে কীট বাস করে তখন বিশ্বনিয়ন্তা চন্দ্রে জীবস্থাপন করিবেন বিচিত্র কি ? বরং এই প্রকার প্রশ্ন অনেকটা বিবেচনা সঙ্গত। পৃথিবীতে যে সকল প্রাকৃতিক অবস্থার অধীন হইয়া জীবগণ প্রাণধারণ করে চন্দ্রে সেই সকল প্রাকৃতিক ব্যাপার আছে কি না ও তদুপযোগী জীবসকল তথায় আছে কি না ? ১৮৫৬ শালে লিখিত God's glory in heavens নামক পুস্তকে আমি যাহা পড়িয়াছিলাম তাহা অতি মনোহর ; কিন্তু তাহা প্রকৃত উত্তর কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ। যাহা হউক তাহার স্থূল মর্ম্ম ও সেই মর্ম্ম হইতে যে রূপ কল্পনা জন্মিতে পারে নিম্নে সন্নিবেশিত হইল। চন্দ্রের যে পৃষ্ঠ আমাদের দর্শনাধীন, তাহা উত্তুঙ্গ গিরিপ্রদেশ ও উপত্যকায় পরিপূর্ণ, তথায় বায়ুও নাই প্রাণীও নাই। যদি বায়ু থাকিত তাহা হইলে সবুজ দেখাইত, অথবা বায়ুর কোন কার্য্য লক্ষিত হইত। কিন্তু তাহা হয় না। কিন্তু চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠে যে বিপুল বায়ুরাশি বহমান আছে, ও জীবগণ তাহাতে পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছে, বিজ্ঞান তাহাতে কোন সন্দেহ করিতে পারে না। যদি একটা বর্ত্তুলের চতুর্দ্দিকে আলগা আলগা করিয়া তুলা জড়াইয়া বর্ত্তুলটাকে সূত্রলগ্ন করিয়া অঙ্গুলির চতুর্দ্দিকে ঘুরান যায়, তবে ঐ তুলাগুলি অঙ্গুলির সম্মুখভাগ পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তুলের অপরপার্শ্ব আশ্রয় করিবে। ঠিক চন্দ্রে তাহাই ঘটিয়াছে। চন্দ্রের বিশ্লিষ্ট পারমাণব অংশ সকল অপর পৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পৃথিবীর প্রত্যহই আবর্ত্তন ঘটে, এ জন্য পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বই বায়ুরাশির দ্বারা পরিবেষ্টিত। কিন্তু চন্দ্রের একপার্শ্ব মাত্র বায়ুসমাচ্ছন্ন। চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠে যখন বায়ু ও বৃহৎ বৃহৎ সমুদ্রাদি আছে, তখন তথায় যে আমাদের ন্যায় জীবগণ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অবশ্য পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্বের বর্গমূলের সহিত সামানুপাতিক হইবে। অতএব তথায় মনুষ্য বপু এখানকার অপেক্ষা ৭ অংশে লঘু, সুতরাং তথাকার লোক অত্যন্ত দীর্ঘাকার না হইলে মনুষ্যের ন্যায় শক্তিতে ভূমিতে বিচরণ করিতে পারে না। এ জন্য বোধ হয়, সেখানকার লোক অত্যন্ত দীর্ঘাকারই বা।

চন্দ্রে চতুর্দ্দশ দিবসব্যাপী দিবামান এবং চতুর্দ্দশ দিবসব্যাপী রাত্রিমান। চন্দ্রে ঋতুবিপর্য্যয় নাই। প্রত্যেক দিনই গ্রীষ্মকাল। প্রত্যেক রাত্রিই শীতকাল। এমন হইতে পারে যে, চন্দ্রের অধিবাসীরা বিলক্ষণ কৃষক, জোয়ার ভাঁটা চন্দ্রের নদীতে নিত্য সমভাবে হইয়া থাকে। সরোবর হ্রদাদির সুগন্ধ জল কুসুম সকল প্রস্ফুটিত থাকে ও লোকেরা নৌকাযানে সেই সকল পুষ্পের আঘ্রাণ লইতে লইতে বায়ুসেবন করে। পদ্ম প্রচুররূপে ফুটিয়া থাকে।

লাইব্রেশন বশতঃ চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠের সীমাস্থ কিয়দংশ আমরা দেখিতে পাই, অবশ্য তথাকার অধিবাসীরা আমাদিগকেও দেখিতে পায়। সে স্থানে চন্দ্রে বায়ু অত্যন্ত কম, এজন্য তথায় লোক সমাগম নাই, তবে উৎসাহশীল পরিব্রাট্‌গণ কখন কখন আমাদের পৃথিবী দেখিতে আইসে। তাহারা পৃথিবীকে কি বিশালই দেখে!! আমরা চন্দ্রকে যেরূপ দেখি, চন্দ্রনিবাসী পৃথিবীকে তাহার ১৫ গুণ বৃহৎ দেখে। তাহারা পৃথিবীকে একটি সবুজ মণ্ডলাকার প্রায় দেখে। বাষ্পিক বায়ুরাশির গতি তাহারা বোধ হয় কিছু কিছু দেখিতে পায় ও উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ সকলও কখন কখন লক্ষ্য করে।

চন্দ্রের প্রকাণ্ড দিব্যমান অতীত হইলে সুদীর্ঘ রজনী আইসে। সে সময়ে ঘোর অন্ধকার ও দারুণ শীত। চন্দ্রের চন্দ্র নাই যে জ্যোৎস্না দেয়, কখন কখন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও সূর্য্যাস্তের পরে শুক্র তাঁহার ক্ষীণ আলোক বিতবণ করেন। অহো চন্দ্র! তুমি যখন নিজে নিশায় নিমগ্ন থাক, জানিতে পার না তোমার অপর পৃষ্ঠ আমাদিগকে স্বীয় করনিকব বিতরণ পূর্ব্বক উল্লাসিত করিতেছে ও শিশিরসিক্ত দৃশ্যাবলীতে কতই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেছে ও কত কত চৌর অভিসারীগণের পথদর্শক হইতেছে!

চন্দ্রলোকের অধিবাসীরা যখন পৃথিবীবাসীদিগের ন্যায় জড়পদার্থের উপর আপন আপন জীবন নির্ভর করিয়া রহিয়াছে তখন তাহারা যে মরণ ধর্ম্মশীল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তথায়ও রোগ শোক জরা আছে, সুতরাং ধর্ম্ম আলোচনাও আছে, দ্বেষ আছে, প্রীতি আছে, সমাজ আছে, কুশল আছে, রণ আছে। হয় ত আমরা যেমন নানা প্রকার মত প্রচার করিয়া পুস্তকাদি লিখি চন্দ্রেও এরূপ লেখক আছে, বিতণ্ডা আছে, হর্ষ আছে, আশা আছে, ভয় আছে। বিশ্বপতি, তোমার কাণ্ড অদ্ভুত!

কিন্তু চন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের এ সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায় যখন আমরা মেন সাহেবের লিখিত গ্রন্থ পড়ি। তিনি বলেন চন্দ্রে যদিও বায়ু থাকে তাহা এত তরল যে তাহা অপেক্ষা আমাদের বায়ু ২০০০ গুণে গাঢ়। যাহা হউক চন্দ্রে যে যৎকিঞ্চিৎ বায়ু আছে তাহার দুইটি প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

১ম। তারাগ্রহণ; যখন একটি তারা চন্দ্রের আড়ালে পড়ে, তখন তারার প্রথম প্রবেশ হইতে বহির্গমন পর্য্যন্ত যতটা সময় জ্যোতিষিক গণনাতে লাগিবার কথা বস্তুতঃ তাহা লাগে না। তারাটি শীঘ্রই বাহির হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ আর কিছুই হইতে পারে না; তারাটি চন্দ্রের অন্তরালে প্রবেশ করিলেও চন্দ্রের পার্শ্বস্থ কোন সূক্ষ্ম বায়বীয় পদার্থসংঘটিত রশ্মির বক্রীভবন (refraction) বশতঃ কিয়ৎক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এবং ঠিক ঐ কারণে বাহির হইবার কিয়ৎক্ষণ আগে আমরা দেখিতে পাই। উক্ত সূক্ষ্ম পদার্থ বায়ুরাশি ভিন্ন সম্ভবে না। বক্রীভবন কাহাকে বলে তাহা বিবেচনা করা উচিত, যদি একটি প্রদীপের কয়েক হাত অন্তরে একটী পুরু কাচ ধরা যায় ও সেই কাচ হইতে কয়েক হাত অন্তরে বসিয়া কাচের মধ্য দিয়া উক্ত প্রদীপকে দেখা যায় তবে দর্শকের চক্ষুঃপথে প্রদীপের যে অবস্থান হইবে, প্রদীপের প্রকৃত অবস্থান তাহা নহে তাহার কিছু নিম্নে। কাচের যে গুণ বশতঃ প্রদীপের রশ্মিকে কিছু উচ্চ করিল তাহাকে বক্রীভবনকারিত্ব বা refracting power কহিয়া থাকে। বায়ু জল প্রভৃতি স্বচ্ছ ও লঘু পদার্থে উক্ত ক্ষমতা আছে। বায়ুর এই গুণ থাকা প্রযুক্ত কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা তৎসাময়িক সূর্য্যের প্রকৃত অবস্থান হইতে তাহাকে কিছু উচ্চে দেখি।

২য়। গোধূলি (Twilight) শুক্ল দ্বিতীয় বা তৃতীয়ার চন্দ্রের অধিকাংশ ব্যাপার উজ্জ্বল হয়। সূর্য্যের কিরণ যত দূর পড়া সম্ভব তাহার অধিক দূর পর্য্যন্ত উক্ত তিথিতে চন্দ্রের পরিধিকে আলোকিত দেখায়। ইহার প্রকৃত কারণ কি? যেমন সূর্য্যাস্তের পরও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রশ্মির বক্রীভবন বশতঃ আমাদের বায়ুরাশি প্রভাবিশিষ্ট থাকে সেইরূপ বোধ হয় চন্দ্রেরও ঘটে। চন্দ্রের বায়ু সূর্য্যের খানিকটা রশ্মি হরণ করিয়া পার্শ্বে লইয়া যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে চন্দ্রে প্রত্যেক দিবাই এক একটি গ্রীষ্মকাল, প্রত্যেক নিশাই শীতকাল, কিন্তু সময় বিশেষে চন্দ্রে দৈবসিক উত্তাপের তারতম্য হইয়া থাকে। চন্দ্র পৃথিবীর অনিয়মিক আকর্ষণ বশতঃ কখন কখন সূর্য্যের সমীপস্থ কখন কখন দূরস্থ হয়। ইহার প্রমাণ করিতে গেলে সূর্য্যগ্রহণ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক হয়। যখন চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে পড়ে তখন যদি পৃথিবীর কোন প্রদেশের সহিত চন্দ্র ও সূর্য্য ঠিক সমসূত্রপাতে অবস্থিত হয় তখন সেই প্রদেশে সূর্য্যগ্রহণ হয়, যদি চন্দ্র ঠিক সূর্য্যের মধ্যভাগে পড়ে তখন হয় সর্ব্বগ্রাস নয় মধ্যগ্রাস হয়। চন্দ্র সূর্য্যের সমীপস্থ ও পৃথিবী হইতে দূরস্থ হইলে চন্দ্রের অবয়ব অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেখাইবে সুতরাং সে সময় সূর্য্যের মধ্যগ্রাস হইবে ও

চন্দ্র পৃথিবীর সমীপস্থ হইলে চন্দ্রকে বড় দেখাইবে সুতরাং সে সময় সূর্য্যের সর্ব্ব-গ্রাস হইবে। এইরূপ সূর্য্যের মধ্যগ্রাস ও সর্ব্বগ্রাস হওয়াতেই প্রমাণ হইতেছে যে চন্দ্র কখন কখন সূর্য্যের নিকটস্থ ও কখন সূর্য্যের দূরস্থ হয়। অতএব চন্দ্রের দিবামানের উত্তাপের তারতম্য হইয়া থাকে।

এক্ষণে চন্দ্রে উঠিতে গেলে কি উপায় করা আবশ্যক ভাবা যাউক। প্রত্যহ ৩০ মাইল করিয়া ২৪ বৎসরে চন্দ্রে পোঁছান যায়। যদি কেহ ২৪ বৎসর বয়সে চন্দ্রে উঠিতে প্রস্তুত হয় তবে ৭২ বৎসর বয়সের সময় চন্দ্রের বৃত্তান্ত পৃথিবীতে জানাইতে পারিবে। ইথরের অপেক্ষা হাল্‌কা কোন পদার্থের ব্যোমযান করিয়া প্রতি সেকেণ্ডে দুই ফিট চলে এমন বেগ তাহাতে নিয়োজিত করিতে পারিলে কর্ম্ম সমাধা হইতে পারিবে!

বিবেক

যদিই বাসিল ভাল, যাতনা কি যাবে তায়
মিটিবে কি আশা ?
শুনি জলধর ধ্বনি শৃঙ্খলিত চাতকের
মিটে কি পিপাসা ?
কুল পিঞ্জরের পাখী পিঞ্জরে রহিবে সদা
তুমি রবে কোথা ?
দীর্ঘশ্বাস হা হুতাশ পশিবে না কাণে তার
তবে কেন বৃথা ?
শুধু ভালবাসা নিয়ে কোন প্রেমিকের চিত্ত
যুড়ায়েছে কবে ?
আশার জলধি হৃদে বাসনায় আকুলিত
কিসে স্থির রবে !
আঁখির মিলনে যদি মিটিত মনের সাধ
তবে শৈবলিনী
কেন ত্যজি কুলমান অভাগা প্রতাপ তরে
হবে কলঙ্কিনী।
এ যে পাপের ধরণী পুরুষ কলঙ্কী হেথা
মত্ত বাসনায়।
হেথা—আঁখির মিলনে বাসনা জাগিয়া উঠে
তীব্র পিপাসায়
লুকায়ে বাসিলে ভাল প্রেমিক হৃদয় কাঁপে
কলঙ্কের ভরে !
আদরে চুমিলে মুখ কলঙ্ক লাগিয়া থাকে
নারীর অধরে।
গোপনে ছুঁইলে তনু রমণী শুকায়ে যায়
পাপের তরাশে,
প্রণয়ে গরল উঠে কণ্টকি লতায় হেথা
কমল বিকাশে।
অমূল্য মাণিক হেথা শোভে ভুজঙ্গের শিরে
রতন সাগরে
প্রণয়ি মনের মত দুর্লঙ্ঘ্য পিঞ্জরে বাঁধা
কে লভে তাহারে।
তবে—
ভাঙ্গা বুক যোড়া দিয়ে মুছি নয়নের জল
প্রবেশ সংসার
যাতনা পড়িবে ঢাকা সমর তরঙ্গে মাতি
ত্যজ আশা তার।

নৈরাশ্য

হায় রে জীবনে তবে কি ফল লভিনু যদি
গেল এ প্রণয়
সংসার তরঙ্গে মাতি লভি ধন মান যশ
যুড়াবে হৃদয় ?
কি কায রোগীর তবে ঔষধ সেবন করি
যদি থাকে ধন
হীরক কাঞ্চন মতি সেবনে যদি রে ব্যাধি
হয় উপশম
পীড়িত মানীর কাণে কহিলে সম্মান তার
নিরোগী কি হয় ?

কহিলে যশের গান　ব্যথিত যশখি কাণে
　　ব্যাধি কভু ক্ষয় ?
যশের ছুন্দুভি নাদে　রত্নের উজ্জল বর্ণে
　　হতাশের মন
শমিত হইত যদি　যাতনা হইত দূর
　　তবে কি এমন !
তবে কি এণ্টনি কহে　হোক্ রোম নিমগন
　　বারিধির তলে
কেনরে বিহঙ্গ তবে　সোনার পিঞ্জরে বাঁধা
　　ভাসে আঁখি জলে !
অভাগি এলিজেবেথ্　কেন লিস্টার তরে
　　হইল পাগল !
আয়েষা নবাবপুত্রী　জগৎ ! বলিতে কেন
　　নেত্রে ঝরে জল !
যদিই বাসিল ভাল　তবেই ঘুচিল দুঃখ
　　মিটিল পিপাসা।
ধন-মান-যশ-সুখ　বিশ্ব ভূমণ্ডল খানি
　　তার ভালবাসা।
আঁখির মিলনে যদি　না মিটে মনের সাধ
　　ছুটিব কাননে
হিমাদ্রি গহ্বরে পশি　পাষাণ চাপিয়া বুকে
　　হেরিব স্বপনে।
দ্বীপ দ্বীপান্তরে রহি　করিব তাহার ধ্যান
　　মুদ্রিত নয়নে
কালসিন্ধু নীরে প্রাণ　সলিল বুদ্‌বুদ্ মত
　　মিশে যতদিনে।
সঁপিয়া পরাণ পরে　কাঁদিতে প্রণয়ে তার
　　কত সুখোদয়
বণিকের পণ্যশালা　এ ভব সংসারে বুঝে
　　কয়টি হৃদয় !
ক্ষতি লাভ গণনায়　যথায় বিব্রত নর
　　স্বার্থে আপনার
প্রেমিকের মহাব্রতে　সে নহে দীক্ষিত কভু
　　ক্ষুদ্র আশা তার
উৎসর্গ ইথে সুখ　আত্মপ্রাণ বলিদান
　　অশ্রুর চন্দন
ভাবনা কুসুম ঢালি　মজি পূজা চিরকাল
　　অনিদ্র যাপন।

বিবেক

বুঝে না আপন মন　হায়রে প্রেমিক জনা
　　প্রণয়ে পাগল
এ যে মাটির ধরণী　সকলি কঠিন হেথা
　　যাতনা শৃঙ্খল !
সবারি চরণে বাঁধা　কি বণিক কি প্রেমিক
　　কে সুখী সংসারে
এক আশা না ফুরাতে পুন আশা জাগে হৃদে
　　কে তারে নিবারে !
পাষাণ চাপিয়া বুকে　দ্বীপ দ্বীপান্তরে রহি
　　লভিবে কি সুখ
নয়নের জল তব　ফুরাবে না ইহকালে
　　স্মরিলে সে মুখ !
হৃদয় পুড়িয়া যাবে　বুক চিরে রাখ যদি
　　তাহার বদন
নয়ন ঝলসি যাবে　অতৃপ্ত নয়নে তায়
　　কর দরশন
হৃদয়ে রাখিলে তায়　পাপের পরশে প্রাণ
　　হইবে চঞ্চল
অভাগা শিবের মত　সমুদ্র মন্থন করি
　　পিবে হলাহল
তবু এ আশার নেশা কেন নাহি ত্যজে হায়
　　প্রেমিকের মন
না বুঝে আপন মন　কাঁদে-পর-পর-করি
　　যাবৎ জীবন
নয়নের জলে কভু　নিবে কি প্রাণের জ্বালা
　　ওরে ভ্রান্ত মন
ও যে প্রেমিকের সাধ　ও সাধ কি মিটে কভু
　　না হলে মিলন

ভাঙ্গিলে আশার বৃন্ত কাঁদিয়া আকুল হও
তুমি রে সংসারে
কত বৃন্ত ভেঙ্গে যাবে কত তরু উৎপাটিবে
নিরাশার ঝড়ে
মুখে বল কেঁদে সুখী পরাণে কি আছে তোর
দেখেছ কখন
কালের ভীষণ মূর্ত্তি ব্যাদান করিয়া মুখ
আছে সর্ব্বক্ষণ
বেঁচে আছ মনে বাঁধা এখনো সে আছে তোর
ফুরালে জীবন—
ছিঁড়িবে সাধের গ্রন্থি অতৃপ্ত জীবনে হায়
মুদিবে নয়ন।

নৈরাশ

এস তবে এই বেলা রমণীরে দুজনায়
যাই সিন্ধুতীরে
হাত ধরাধরি করি হৃদয়ে হৃদয় চাপি
পশি তায় নীরে
পুরুষ কঠিন প্রাণ সকলি সহিতে পারি
রমণি তোমার—
নবীন বল্লরী প্রাণ উত্তাপে শুকায়ে যাবে
পীযূষ তাহার
সংসারের কোলাহল বিষম বাজিবে কাণে
নারিবে সহিতে
নির্ম্মল সিন্ধুর জল ডাকিছে তরঙ্গ তুলি
আইস ত্বরিতে
মাটীর ধরণি যদি সকলি কঠিন হেথা
কি কায এখানে
জীবন যাইলে যদি ছিঁড়িবে সাধের গ্রন্থি
অতৃপ্ত নয়নে
এস তবে সিন্ধুনীরে আলিঙ্গিয়া পরস্পরে
হই নিমগন
ভবিষ্যৎ অন্ধকার কে জানে কি ক্রিয়া তার
পলাই এখন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বীপবাসের ফলাফল

বঙ্গদেশ দ্বীপ নহে। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতগণ দ্বীপের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে লক্ষণানুসারে, চব্বিশ পরগণা, নদিয়া, যশোহর, বাকরগঞ্জ, ফরিদপুর এবং মুর্সিদাবাদের পূর্ব্বাংশ এই সমস্ত লইয়া বঙ্গে একটী দ্বীপ আছে. বলা যায়। ঐ দ্বীপ গাঙ্গেয় দ্বীপ বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে। কিন্তু এ স্থলে যে দ্বীপের কথা হইতেছে, তাহা নদীজ দ্বীপ নহে সিন্ধুবেষ্টিত দ্বীপ। নদী একটি বৃহৎ পরিখার স্বরূপ, অনেক সময়ে শত্রুসৈন্যের গতির প্রতিরোধ করে। মহারাষ্ট্রীরেয়া রাঢ়দেশ ছারখার করিয়াছিলেন ; কিন্তু গঙ্গার পূর্ব্বপারে তেমন অত্যাচার করিতে পারেন নাই। গঙ্গা পরিখাস্বরূপে পূর্ব্বাঞ্চল রক্ষা করিয়াছিলেন। এ জন্যই মহারাজা তিলকচাঁদ বৰ্দ্ধমান ত্যাগ করিয়া ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে শ্যামনগরে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেন।

নদীর যেমন প্রতিরোধিকা শক্তি আছে, সমুদ্রের সেরূপ শক্তি অনেক গুণে অধিক। পুরাণে কথিত আছে যে সেতু বন্ধ না করিয়া রামচন্দ্র লঙ্কাজয় করিতে পারেন নাই কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে যাহাদের রণতরি আছে তাহাদের পক্ষে সমুদ্রপথ অতি সুগম পথ।

আমাদের রাজপুরুষগণ দ্বীপবাসের অনেক শুভফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইতিহাসবেত্তা আলিসন বলেন যে ইংরেজ ও স্কচ জাতিদের উন্নতির প্রধান কারণ তাহাদের স্বভাবের তেজস্বিতা ও অধ্যবসায়, দ্বিতীয় কারণ দ্বীপে বাস। (১)

---

(১) The second great circumstance which has contributed to the steady progress and present greatness of the British Empire is the insular situation of Great Britain and its position in the European seas.—Alison's Europe, Chap. IX, Para : 15.

বাণিজ্যই ইংলণ্ডের লক্ষ্মী। ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড সমুদ্রবেষ্টিত বলিয়াই ইংরেজ জাতির বাণিজ্যের এরূপ প্রাধান্য। জর্মণ জাতি বিদ্যা ও শস্ত্রবলে ইংরেজদের অপেক্ষা বলীয়ান্, অধ্যবসায়ে ও বুদ্ধিবলে এবং বাণিজ্যস্পৃহায় তাহাদের সমান; অথচ বণিক্‌বৃত্তিতে তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহার প্রধান কারণ এই যে সমুদ্র-তীরে জর্মনির উপকূল অত্যল্প। ইংলণ্ডে মৃদঙ্গার ও লৌহ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; ইহা ইংলণ্ডের শিল্পনৈপুণ্য ও বাণিজ্যবিস্তারের এক প্রধান কারণ বটে। কিন্তু বিস্তৃত উপকূল না থাকিলে বাণিজ্যে এতাধিক শ্রীবৃদ্ধি হইত না।

ইংরেজরা দ্বীপবাসী বলিয়াই রাজার স্বেচ্ছাচার দমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বিজাতীয় শত্রুভয় না থাকায় নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী সেনা রাখিতে হয় নাই। ইউরোপের অন্যান্য দেশ রক্ষার জন্য নিয়ত বেতনভোগী সেনা রাখিতে হইত এবং তত্তদ্দেশের রাজগণ সেনার বলে স্বেচ্ছাচারী হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের সৌভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। (২)

সমুদ্রে মৎস্য ধরা সহস্র সহস্র ইংরেজ ধীবরের উপজীবিকা। অভ্যাস বশতঃ ইহারা অতি নিপুণ নাবিক, এবং সামান্য শিক্ষা পাইলে রণতরীর অত্যুৎকৃষ্ট সৈনিক হয়। (৩)

---

(২) যাঁহারা ইংলণ্ডের ইতিহাস বিশেষ মনোযোগ করিয়া পড়েন নাই তাঁহাদিগকে এ বিষয় সংক্ষেপে বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন। মেকলে লিখিয়াছেন "This singular felicity [exemption from despotism established by a standing army] she owed chiefly to her insular situation. Before the end of the fifteenth century, great military establishments were indispensable to the dignity and even to the safety of the French and Castilian monarchies. If either of those powers had disarmed, it would have been compelled to submit to the dictation of the other. But England protected by the sea against invasion and rarely engaged in warlike operations on the Continent, was not, as yet, under the necessity of employing regular troops—Macaulay's England Chap. I.

(৩) Around the stormy and inhospitable Hebrides, and in the dark and dangerous seas that flow round the Orkney Islands, thirty five thousand hardy seamen are engaged in fisheries which now cause to flow into the British Empire that stream of wealth which the republic of Holland so long drew from the deep seafishery in the North seas. The tempestuous German ocean and the iron-bound east coast

রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজ্যকালে যখন স্পেনরাজ ফিলিপ ইংলণ্ডের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করেন ; তখন সাগর ও পবন উভয়েই ইংলণ্ডের সহায় ছিলেন। তৃতীয় জর্জের রাজ্যকালে, সমুদ্রই ইংলণ্ডের প্রধান সহায় ছিলেন। যোধকেশরী নাপোলিয়ন প্রকাশ করিয়াছিলেন, "যদি দুই ঘণ্টা কাল চানেল্ [ইংলণ্ডের পরিখা-রূপ উপসাগর] অধিকার করিতে পারি, তাহা হইলে ইংলণ্ডের শেষ দশা উপস্থিত হইবে।" (৪)

যদি তিনি কোন প্রকারে সেনা পার করিয়া ইংলণ্ডের উপকূলে অবতীর্ণ হইতে পারিতেন, তাহা হইলে ইংলণ্ড অপদস্থ হইতেন সন্দেহ নাই। যে শূর পুরুষের ভয়ে ইউরোপ কম্পিত হইত যিনি জেত বলে ভিএনা, বর্লীন ও মস্কোভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহার পক্ষে যে লণ্ডন জয় বড় দুরূহ ব্যাপার এ কথা নিতান্ত স্বদেশপক্ষপাতী ইংরেজও বলিতে সক্ষম নহেন।

১২৮৩ সনের কার্ত্তিক মাসে দক্ষিণ সাহারাজপুর দ্বীপে যে মহা প্রলয় হইয়াছে তাহার কথা স্মরণ করিয়া বাঙ্গালিরা দ্বীপবাসের যে কিছু শুভ ফল আছে, এ কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু এই প্রস্তাবে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহাদের দ্বিধা থাকিবে না। অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ অঞ্চলের নাবিকেরা বাঙ্গালার প্রধান নাবিক, এবং তথাকার প্রজারা যেমন তেজস্বী, তেমন তেজস্বী প্রজা বাঙ্গালার আর কোথাও নাই।

ক্রমশঃ

তা, প্র, চ।

---

of England which render a voyage from London to Edinburgh more perilous to the inexperienced navigator than one to the East Indies have conspired to produce that incomparable race of seamen—in every age the nursery of the British navy—who carry on the vast coasting trade.—Alison's Europe Chap. IX, para 16.

(৪) Napoleon W. Decres, August. 9, 1805.

(অসন্তোষ, অতৃপ্তি উন্নতির মূলভিত্তি)

পদোন্নতির পন্থা সম্বন্ধে নানা মতান্তর দেখা যায়। সরলচিত্ত ব্যক্তিরা বিবেচনা করেন যে, বিদ্যা থাকিলে পদোন্নতি হয়, তাঁহারা বিদ্যাহীনের যদি কখন পদোন্নতি দেখেন, অদৃষ্টের গুণানুবাদ করিয়া আপনাদের ভ্রান্তি পুষ্টি করেন। বালকের মধ্যে "কল" শব্দ যেমন সর্ব্বব্যাপক, প্রয়োগমাত্রেই হেতু বোধ হইয়া যায়, আমাদের বয়োধিকের মধ্যে অদৃষ্ট শব্দ সেইরূপ। ইহা কলে হইয়াছে, উহা কলে হয় বলিলে বালকেরা মনে করে বুঝিয়াছি, অদৃষ্টে হইয়াছে বা হইতেছে বলিলে বয়োধিকেরা মনে করেন বুঝিয়াছি। মাথামুণ্ড কি বুঝিয়াছেন তাঁহারাই জানেন।

বিদ্যাহীনের পদোন্নতি, কিম্বা অসার ব্যক্তির পদোন্নতি অথবা দুশ্চরিত্রের পদোন্নতি সর্ব্বদাই দেখা যায়। এ দেশের ত কথাই নাই, বিদেশী কর্তৃক উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচিত হইতে গেলে, ভুল সহজেই সম্ভব। কিন্তু স্বদেশে ইংরেজেরা এরূপ ভুল সর্ব্বদাই ভুলিয়া থাকেন। কেবল ইংলণ্ড বলিয়া নহে, সকল রাজ্যে সকল সময়ে এই ভুল হইয়া থাকে। হয় ত শতশত উপযুক্ত পাত্র উপস্থিত থাকিতে অতি অনুপযুক্ত ব্যক্তি কোন বিশেষ পদে মনোনীত হয়। তাহার অতি গূঢ় কারণ আছে। তাহা অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে এইস্থলে একখানি পত্রের কতকাংশ উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা হইল। পত্রখানি বিদ্বেষভাবে পরিপূর্ণ সেই জন্য কিঞ্চিৎ রহস্যের প্রাধান্য আছে; কিন্তু তাহা থাকিলেও প্রকৃত কথার বড় ক্ষতি হয় নাই :—

"যাহাদের বিশেষ পদোন্নতি হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে দুই একটীর পরিচয় দিলে বোধ হয় সুচতুর চাকরেরা বুঝিতে পারিবেন। বহুকাল পূর্ব্বে অঙ্গদেব নামে একজন রাজকর্ম্মচারী গঙ্গাপ্রহরী পদে নিযুক্ত ছিলেন। গঙ্গায় যে

সকল নৌকা ডুবি হইত, তাহার দ্রব্যাদি উদ্ধার করা, তাহার অধিকারী থাকিলে সেই দ্রব্যাদি সমর্পণ করা ও অধিকারী না থাকিলে, তাহা রাজভাণ্ডারে প্রেরণ করা এই সকল গঙ্গাপ্রহরীর কার্য্য ছিল। অঙ্গদেব তাহা যথারীতি নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু তাঁহার আর পদোন্নতি হয় না দেখিয়া, বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক কার্য্য করিবেন মনস্থ করিলেন। গঙ্গাপ্রহরীর যাহা প্রকৃতার্থে কর্ত্তব্য, তাহা ক্রমে করিতে লাগিলেন। গঙ্গার জল চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে বলিয়া, জলের ভার ধরিতে লাগিলেন। গঙ্গাপ্রহরী হইয়া, গঙ্গার জল চুরি দেখা মহা পাপ। যে সকল গোরু গঙ্গার জল খাইত, তাহাদের নামে ফৌজদারী চার্জ্জ আনিতে লাগিলেন, যে সকল নৌকা অন্য নদী হইতে গঙ্গায় আসিয়াছিল, তাহাদের নামে অনধিকার প্রবেশ বলিয়া চার্জ্জ করিতে লাগিলেন। নৌকা আর ডুবিবার অপেক্ষা রহিল না, তাহার সমুদায় মালামাল বিক্রীত হইয়া, রাজভাণ্ডারে যাইতে লাগিল, রাজভাণ্ডার ক্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিছুদিন পরে রাজা জানিলেন যে, পূর্ব্বের গঙ্গাপ্রহরীদের সময় অল্প আয় হইত, তাহারা অবশ্য অনুপযুক্ত ছিল, এক্ষণকার গঙ্গাপ্রহরী বিশেষ দক্ষব্যক্তি, তাহাই এত আয়বৃদ্ধি হইয়াছে। অঙ্গদেবের পসার দাঁড়াইয়া গেল, সেই অবধি যখন কোন উচ্চপদ খালি হইত, অঙ্গদেব সর্ব্বাগ্রে পাইতেন।

"বর্ত্তমান সময়ের দুই একটি পরিচয় দিই। রামধন দাদা নামে একজন সদরআলা ছিলেন, তিনি কয়েক বৎসর হইল, রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন; হয় ত পৃথিবীও ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে আমি কোন নিশ্চয় সংবাদ জানি না, রামধন দাদা যদি জীবিত থাকেন, কৃপাপূর্ব্বক আমার এ অপরাধ ক্ষমা করিবেন। তাঁহার প্রকৃত উপাধি কি ছিল, আমি জানিনা, তাঁহাকে সকলেই রামধন—দাদা বলিত। তিনি সকলকেই দাদা বলিতেন, কাজেই সকলে তাঁহাকে দাদা না বলিয়া থাকিতে পারিত না; নিন্দকেরা বলিত, তিনি পঞ্চমপক্ষে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই জন্য বয়ঃকনিষ্ঠদের দাদা বলিয়া আপনার বয়স কমাইতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, তিনি পঞ্চমপক্ষে বিবাহ করিয়াছিলেন সত্য, অথচ চুলে কলপ দিতেন না; কালাপেড়ে ধুতি পরিতেন না, টপ্পা গাইতেন না, তবে ভদ্রলোকমাত্রকেই তিনি যে দাদা বলিতেন, তাহার প্রকৃত কারণ নিন্দকেরা জানিত না বলিয়া নানাপ্রকার উপহাস করিত। প্রথমতঃ তিনি একজন জজ সাহেবের সরকার ছিলেন, আবশ্যক মতে কুঠির সমুদায় কার্য্য করিতেন, খানসামারা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত, তিনি তাহাদের ভালবাসুন বা নাই বাসুন, সকলকেই ভাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সাহেবের সন্তানটীকে সর্ব্বদাই ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইতেন, তাহার সামান্য অসুখ হইলে, চক্ষের জল মুছিতেন,

কাজেই মেমসাহেবের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ বিজয়া দশমীর দিবস অতি ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ হইয়া মেমসাহেবকে প্রণাম করিতেন, প্রথমবার মেমসাহেব কারণ জিজ্ঞাসা করায় রামধন দাদা আমাদের হিন্দুপ্রথা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, মেমসাহেবের স্নেহ আরও বাড়িয়াছিল; একবার বিজয়ার দিবস প্রণমান্তে রামধন দাদা মেমসাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা আমায় কি বলে আশীর্ব্বাদ করিলেন?" মেমসাহেব আশীর্ব্বাদের প্রথা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তুমি রাজা হও এ আশীর্ব্বাদ আমি করি নাই, কেন না ফলবান্ করা আমার ক্ষমতাতীত। সহস্র বৎসর পরমায়ু সম্বন্ধেও সেইরূপ। অতএব যাহা আমার আশীর্ব্বাদে ফলিলে পারে আমি তাহাই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছি।" রামধন দাদা জিজ্ঞসা করিলেন, "মা সেটি কি?" মেমসাহেব আবার হাসিয়া বলিলেন, "তুমি শীঘ্র হাকিম হও।" রামধন দাদা বলিলেন, "যে আজ্ঞা মা, আমি তবে অদ্যই বাটিতে পত্র লিখি আমি শীঘ্রই মুন্সেফ হইব।" মেমসাহেব হাসিতে লাগিলেন। সেই দিবসেই আহারের সময় মেমসাহেব স্বজাতি কৌশলদ্বারা জজসাহেবকে আপনার আশীর্ব্বাদের পরিচয় জানাইলেন। আশীর্ব্বাদ যাহাতে সফল হয়, তাহার চেষ্টা করিবার নিমিত্ত জজ সাহেব হাসিতে হাসিতে স্বীকার করিলেন। একবার মাত্র বলিলেন "বিচারের কার্য্য অতি কঠিন, রামধন মূর্খ তাহা পারিবে না।" মেমসাহেব বলিলেন, বিচারে যাহা ত্রুটি হয়, আপীলে তাহা সংশোধন হইয়া যাইবে।

"কিছুদিন পরে রামধন দাদা মুন্সেফ হইলেন, ক্রমে সদর আমিন, সদর আলা হইয়া নানাবিধ বিবাদ ভঞ্জন করিলেন। বিচারে যত হউক বা না হউক, রফা দ্বারা অনেক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতেন। রফায় কোন দোষ নাই, তবে যাহার দাবি মিথ্যা, তাহার কিছু লাভ হয়, অপর পক্ষের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হয়। তাহা হউক, কিন্তু রামধন দাদা বিচারের দায় হইতে উদ্ধার হইতেন, বিশেষতঃ বিচারে একপক্ষের উকিল অসন্তোষ হইবার সম্ভব, রফায় সে সম্ভাবনা নাই।

"রামধন দাদা ইংরেজি কিঞ্চিৎ জানিতেন, সাহেবদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা কহিতেন; তাঁহার সকল কথা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি যে "ইয়ার আনার" (your honor) বলিয়া ছোট বড় সকল সাহেবকে সম্বোধন করিতেন তাহাতেই যথেষ্ট হইত। পুলিস দারগা জারিন সাহেবকে তিনি শতবার "ইয়ার আনার" বলিয়াছিলেন। যে অবধি তাঁহার মেম স্বকর্ণে তাহা শুনিয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত স্বামীর পদগৌরব মেমের চক্ষে বিশেষ

বাড়িয়াছিল, এবং সেই সঙ্গে দাম্পত্য কলহও কমিয়াছিল। কাজেই রামধন দাদার নিকট ফিরিঙ্গি দারগা বিশেষ বাধ্য ছিলেন।

"জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সকল সাহেবের খানসামাদের রামধন দাদা আদরে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন; "ভাই রোমজান, তোমার সাহেব কি করিতেছেন, এখন কি সাক্ষাৎ হইতে পারে?" এইরূপ সম্বোধন একজন যুবা উকিল একদিন শুনিয়া বড় আক্ষেপ করাতে রামধন দাদা বলিলেন, দাস দাসীর মান সর্ব্বাগ্রে। ইহারা সদয় থাকিলে মুনিব সদয় হন। সময় পাইলে ইহারা উপকার করিতে পারে, অপকারও করিতে পারে। আমাদের আপনার মধ্যে কি হইয়া থাকে? জান না যে, আমাদের অধিকাংশ ভ্রাতৃবিরোধ দাস দাসীর দ্বারা উৎপত্তি হয়। আমার ভ্রাতৃবধূ অপেক্ষা তাঁহার দাসীকে আমি পূজা করি। বাটী গিয়া অগ্রে তাহাকে ডাকিয়া কাপড় দিই; সেই জন্য আমার গৃহে অদ্যাপি বিরোধ আরম্ভ হয় নাই। যেদিন, দেখিব, তাহার মুখ ভার, সেই দিন জানিব, আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।"

এই উদ্ধৃত অংশ যথেষ্ট। উপসাহেের অনুরোধে লেখক কিঞ্চিৎ অত্যুক্তি করিয়াছেন; কিন্তু যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই দেখা যাইতেছে যে, রামধন দাদা আপনার বিদ্যা বুদ্ধি নিজে জানিতেন কাজেই তদনুযায়ী ব্যবহার করিতেন; সকলকে আপ্যায়িত করিতে চেষ্টা পাইতেন। ছোট, বড়, কেহ তাঁহার শত্রু ছিল না; কেহ তাঁহার উন্নতির বিরোধী হইত না। সাহেবেরা অনুগত প্রতিপালক, কেই বা তাহা নহে। আমরা সকলেই অনুগত লোক ভালবাসি। মনুষ্যমাত্রেই অনুগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। রামধন দাদা সকলের অনুগত ছিলেন, ক্ষমতাপন্নদের বিশেষতঃ; এ অবস্থায় তাঁহার উন্নতি নিশ্চয়ই সম্ভব। অনুগত হওয়া সকলের সাধ্য নহে; নম্রতা আবশ্যক, স্নেহ বা তৈল আবশ্যক, অভিমান জয় করা আবশ্যক। বিশেষতঃ অন্যের দোষ সম্বন্ধে অন্ধ হওয়া আবশ্যক। নম্রতা বা স্নেহ সহজ, অনেকেরই আছে। অন্যের দোষ সম্বন্ধে অন্ধ হওয়াও নিতান্ত কঠিন নহে; বাক্যের সতর্কতা থাকিলে, সে গুণ উপলব্ধি হইতে পারে, কিন্তু নিরভিমানী হওয়া অতি কঠিন। রামধন দাদা নিরভিমানী ছিলেন তাহাই তাঁহার উন্নতি হইয়াছিল। উন্নতির অনেক হেতু আছে। নিরভিমানিতা তাহার মধ্যে একটি বিশেষ। যাহারা প্রতিভাশালী বা যাহাদের বিশেষ যোগ্যতা আছে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। যাহাদের যোগ্যতা বিশেষরূপে নাই তাহাদের পক্ষে রামধন দাদার পন্থা উন্নতিসাধক। বিশেষতঃ কি সাহেব কি বাঙ্গালি অনেকেই উপযুক্ত অনুপযুক্ত ব্যক্তিনির্ব্বাচন আপনি করিতে পারেন

না, অন্যের কথায় নির্ভর করিয়া মীমাংসা করেন; এ অবস্থায় অন্যকে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রাখা ভাল।

যাঁহাদের পদোন্নতি হয় না, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাঁহারা বড় অভিমানী। অতি সামান্য বিষয়ে অপমানিত বোধ করেন। কাজেই কাহারও অনুগত হইতে পারেন না। হয় ত আবার কেহ কেহ আপনাদের যোগ্যতা বিষয়ে অতিরিক্ত অভিমানী। যাঁহার অধীনে কর্ম্ম করা যায়, যোগ্যতার অভিমান থাকিলে, কখন কখন তাঁহার প্রতি তাচ্ছিল্য জন্মে। অযোগ্য ব্যক্তিরা উচ্চপদ সর্ব্বদা পায়, অধীন ব্যক্তিরা যোগ্য হইলেও উভয়ের মধ্যে অসদ্ভাব ঘটে। এক পক্ষের তাচ্ছিল্য, অপর পক্ষের বিরুদ্ধতা, ফল অধীনের অনিষ্ট। এই জন্য কেহ কেহ বলেন :—

যার অধীনে কাজ করি।
কেন না তার পায়ে ধরি॥

যোগতা থাকিলে, তাচ্ছিল্য নানা বিষয়ে নানা প্রকারে উপস্থিত হয়। বালকেরা নীতিকথায় পড়িয়া থাকে যে, এক খরগস ও এক কচ্ছপ উভয়ের কথা হইল যে, আইস আমাদের মধ্যে কে অগ্রে ঐ পর্ব্বতে পৌঁছিতে পারে। মন্দগতি কচ্ছপ তৎক্ষণাৎ ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল; খরগস ভাবিল, আমি যখন ইচ্ছা তখন গেলেও কচ্ছপের পূর্ব্বে পৌঁছিব। অতএব তাচ্ছিল্য করিয়া নিদ্রা গেল, নিদ্রাভঙ্গে দেখে, কচ্ছপ বহু পূর্ব্বে পৌঁছিয়াছে। যোগ্য অযোগ্যের কার্য্যপ্রণালী প্রায় এইরূপই ঘটে। একপক্ষের যত্ন, অপর পক্ষের তাচ্ছিল্য। ফল ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির পরাজয়।

বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমানেরা অনেকে যে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, তাহার এক বিশেষ কারণ যে তাঁহারা উচিত বা উপযুক্ত বিষয়ে নিযুক্ত না হইয়া, হয় ত বিপরীত বিষয়ে লিপ্ত হন। যে ব্যক্তি বক্তৃতাশক্তিতে বঞ্চিত, তিনি হয় ত উকিল হইলেন; যিনি বক্তৃতাতে অদ্বিতীয় হইতেন, তিনি হয় ত যোদ্ধা হইলেন। যিনি মহাযোদ্ধা হইতেন, তিনি হয় ত কেরাণি হইলেন। মধ্যে মধ্যে শুনা যায় যে, কেরাণি কলম ফেলিয়া তরবারী ধরিবা মাত্র দেশ জয় হইল; তাহার মূল কারণ এই। প্রকৃত যোদ্ধা কেরাণির আসনে এতদিন বসিয়া মাটী হইতেছিলেন। সকল দেশেই এইরূপ সর্ব্বদা হইয়া থাকে, বিশেষতঃ হিন্দু-সমাজে। তাহার বিশেষ কারণ, আমরা পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করিয়া থাকি। স্বজাতিব্যবসায়ে আমাদের অধিকার বা ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, তাহা অবলম্বন

করিতে হয়, যে ব্যবসায়ে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম, তাহা গ্রহণ করা হয় না।

ইদানীন্তন পুরাতন প্রথা পরিবর্ত্তন হইতেছে। স্বজাতীয় ব্যবসা ত্যাগ করিয়া ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে পারা যাইতেছে; কিন্তু ইচ্ছার ভ্রান্তি হয়। যে বিষয়ে স্বাভাবিক শক্তি নাই, হয় ত কখন হইবেও না, সেই বিষয়ে সময় নষ্ট করিতে অনেকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কর্ণের দোষে যাহার কখন সুরবোধ হইবার সম্ভাবনা নাই, সে হয়ত ত গায়ক হইবে ইচ্ছায় বহুকাল পরিশ্রম করে। যে অদ্বিতীয় চিকিৎসক হইত, চিত্রকর হইবার সাধ তাহার হয় ত অতি প্রবল হইল। যদিও এরূপ প্রবৃত্তি সচরাচর দেখা যায়, কিন্তু তাহা স্বাভাবিক নহে। বিশেষ কারণে প্রবৃত্তির এরূপ ভ্রম ঘটিয়া থাকে; প্রশংসাপ্রিয়তা অনেক সময় এ ভ্রান্তির হেতু বলিয়া বোধ হয়। কোন সুকণ্ঠ গায়ক আবাল বৃদ্ধের বিশেষ প্রশংসাভাজন হইল দেখিয়া, কেহ গায়ক হইতে সাধ করিল। হয় ত সেই ব্যক্তি অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিলে সেইরূপ প্রশংসার পাত্র হইতে পারিত; কিন্তু সে ব্যবসায়ে প্রশংসিত ব্যক্তি কেহ তাহার চক্ষে পড়িল না বলিয়াই ভ্রমবশতঃ গায়ক হইতে তাহার চেষ্টা হইল।

স্বজাতীয় ব্যবসা ত্যাগ করিয়া আপন আপন ক্ষমতা উপযোগী বৃত্তি অবলম্বন করিবার পক্ষে ইদানীং এক বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। [University] ইউনিভারসিটি তাহা ঘটাইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় নিজ বিধানদ্বারা জানাইয়াছেন যে, নানা শাস্ত্র তুল্যানুতুল্যরূপে শিখিতে হইবে, যে তাহা না পারিবে, তাহাকে একেবারেই কিছুই শিখিতে দিব না। ইউনিভারসিটিতে প্রবেশ করিতেও দিব না; সে যদি তথাপি এদেশে থাকে, তাহাকে মূর্খ করিয়া রাখিব। সে ব্যক্তি প্রতিভাশালী হইলেও, তাহাকে কিছুই শিখিতে দিব না; রাজকার্য্যে বঞ্চিত করিব, তাহার উন্নতির ব্যাঘাত দিব। কাজেই অনেক বুদ্ধিমান্‌কে মূর্খ হইয়া থাকিতে হইতেছে। যাহার সকল বিষয়ে কিছু কিছু বুদ্ধি আছে, কোন বিষয়ে তাহার বিশেষ বুদ্ধি না থাকিলেও, সে ব্যক্তি বিদ্যোপার্জ্জনে অধিকারী বলিয়া গৃহীত হইতেছে; কিন্তু যাহার বিষয়বিশেষে অসাধারণ বুদ্ধি আছে, কিন্তু সকল বিষয়ে সমান প্রবৃত্তি নাই, তাহাকে অনধিকারী বলিয়া তাহার শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করা হইতেছে। যে ব্যক্তি রসায়ন শাস্ত্রে অসাধারণ হইয়া দেশের হিতসাধন করিতেন, তিনি সাহিত্যের শ্লোক শিখিতে অমনোযোগী বলিয়া তাঁহাকে রসায়ন শাস্ত্র শিখিতে বঞ্চিত করা হইতেছে। যিনি সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইতেন, তিনি জমি জরীপ করিতে পারেন না বলিয়া, তাঁহার সাহিত্যশিক্ষার পথরোধ করা হইতেছে। শিক্ষাদানের এরূপ পক্ষপাতিত্ব পঁচিশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু এ

পক্ষপাতিত্ব দ্বারা দেশের কি বিশেষ ইষ্ট-সাধন হইয়াছে, তাহা অদ্যাপি স্পষ্ট জানা যায় নাই। যাহা হইয়াছে, অপক্ষপাতী শিক্ষাদানে তাহা যে কোন মতে হইত না এমতও লক্ষণ পাওয়া যায় না। এই পঁচিশ বৎসরের মধ্যে অনেকে বি, এ, অনেকে এম, এ, উপাধিলাভ করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহারা কোন বিষয়ে যে বিখ্যাত-নামা হইয়াছেন, এমত আমরা শুনি নাই। সকলেই দশকর্ম্মা হইয়াছেন এইমাত্র শুনা যায়, বরং তাহাদের অধিকাংশই মধ্যবিধ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বোধ হয় নানা বিষয় তাঁহাদের শিখিতে হয় বলিয়া, কোন বিষয় বিশেষ করিয়া তাঁহারা শিখিতে পারেন নাই ; কাজেই খ্যাতিমান্‌ও হন নাই। নানা শাস্ত্র অল্প অল্প শিক্ষা ভাল, কি এক শাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষা ভাল ; এ বিচার করিবার নিমিত্ত আমরা এ কথা তুলি নাই। আমরা এইমাত্র বলিতেছি যে, এক বিষয়ে কোন ব্যক্তির যদি বিশেষ বুদ্ধি বা প্রতিভা থাকে, তাহার সেই বিশেষ বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি, হইবার পক্ষে আমাদের ইউনিভারসিটি নিতান্ত বিরোধী, এতদূর পর্য্যন্ত বিরোধী যে, পাছে সে ব্যক্তি কোনরূপে আত্মশক্তি অনুযায়ী শিক্ষা পায়, এই আশঙ্কায় সকল কালেজের দ্বার রুদ্ধ করা হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, যদি সে ব্যক্তি স্বচেষ্টায় আপনার উন্নতি সাধন করিতে যায়, ইউনিভারসিটি যেন বিমাতার ন্যায় তাহার উন্নতির পন্থা রোধ করেন। বিমাতা যদি শুনেন, ওকালতিতে তাঁহার বিশেষ অধিকার হইয়াছে, অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার চুল ধরিয়া বলেন, “তুমি আমার নও, কাজেই তোমার উন্নতি নাই, তুমি আপনার চেষ্টা করিতে পাইবে না, আমার বাছাদের অন্নের ব্যাঘাত দিতে পাইবে না, তোমায় আমি উকিল হইতে দিব না।” হয় ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এরূপ ব্যবহার সাধারণের পক্ষে মঙ্গলকর ; কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের উন্নতিপক্ষে অনিষ্টকর। আমরা তাহাই বলিতেছিলাম যে, আপন ক্ষমতোপযোগী বৃত্তি অবলম্বন পক্ষে নূতন ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে।

যাঁহারা জানেন যে আমাদের কলিকাতা ইউনিভারসিটি বিলাতের লণ্ডন ইউনিভারসিটির অনুকরণ, তাঁহারা মনে করিতে পারেন আমরা যাহা বলিতেছি বাস্তবিক তাহা সত্য হইলে লণ্ডন ইউনিভারসিটির অন্য নিয়ম হইত। বিলাতে যে পদ্ধতি ভাল বলিয়া গৃহীত হইয়াছে বাঙ্গালায় তাহা মন্দ কেন হইবে ? কিন্তু তাঁহারা একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া যদি এ বিষয় বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখেন তাহা হইলে বুঝিবেন ইংরেজদের বুদ্ধি বহুমুখী, নানা শাস্ত্র শিক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে অতি সহজ। কেবল সাহিত্য আর শুভঙ্করী অঙ্ক আমরা পুরুষানুক্রমে শিখিয়া আসিয়াছি কিন্তু ইংরাজেরা নানা শাস্ত্র অনেক পুরুষ অবধি আলোচনা করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে নানা শাস্ত্র শিক্ষা বৈজিক কারণে সহজ,

আমাদের পক্ষে তাহা তত নহে, কিছু পুরুষ পরে সহজ হইতে পারে আপাততঃ নহে। লণ্ডন ইউনিভারসিটির শিক্ষিত সাহেবেরা সকল বিষয়ে মজবুদ, চৌকস, চালাক, আমাদের সেইরূপ কর্ম্মঠ করিবার নিমিত্ত লণ্ডন ইউনিভারসিটির অনুকরণ এখানে স্থাপন করা হইয়াছে। আমাদের পণ্ডিত করিবার নিমিত্ত কলিকাতা ইউনিভারসিটি হয় নাই। সেই জন্য যাঁহারা পণ্ডিত হইতে পারিতেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শিক্ষায় বঞ্চিত হইতেছেন। বিলাতে এ ভুল সংশোধিত হইবার অন্য উপায় আছে। আমাদের মোটে একটী ইউনিভারসিটি তাহাতে প্রবেশ করিতে না পারিলে কোন কালেজে অধ্যয়নের উপায় নাই।

উন্নতির বিরোধী আর এক বিশেষ কারণ আছে—নিস্পৃহতা। আকাঙ্খা-শূন্য হওয়া প্রশংসার বিষয় বটে; কিন্তু উন্নতি সম্বন্ধে নহে। আকাঙ্খা না থাকিলে বিশেষ চেষ্টা হয় না। উন্নতির ইচ্ছা অনেকের আছে সত্য, কিন্তু সে ইচ্ছা বিশেষ প্রবল নহে। নিজ নিজ অবস্থায় নিতান্ত অসন্তুষ্ট অল্প লোকে; উন্নতি হইলে ভাল হয়, তাহা না হইলেও ক্ষতি নাই ইহা অনেকের মনোগত ভাব। তাঁহাদের চেষ্টা বা উদ্যোগ কাজেই সামান্যরূপ হয়। তাহাই আমরা এ প্রবন্ধের শিরোভাগে বলিয়াছি "অসন্তোষ, অতৃপ্তি, উন্নতির মূলভিত্তি।" নীতিজ্ঞেরা আমাদের এ কথায় খড়্গহস্ত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা নীতি কথা বলি নাই, উন্নতির কথা বলিতেছি। তাঁহাদের আপত্তি থাকে, উন্নতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরুন। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যে নিয়ম, সমাজের পক্ষেও সেই নিয়ম; যেমন চলিয়া আসিতেছে, সেইরূপ চলিবে বলিয়া বসিয়া থাকিলে, একপক্ষে ব্যক্তিবিশেষের উন্নতি হয় না; অপর পক্ষে সমাজেরও উন্নতি হয় না। যে সকল সমাজ বিশেষ উন্নত, সে সকল সমাজের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় অতৃপ্তই উন্নতির মূল।

আর একটি কথা আছে। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা রাজপদে থাকিয়া উন্নতির প্রার্থী হন, তাঁদের ইংরেজিতে বাক্‌পটুতা আবশ্যক। ইংরেজেরা গুণগ্রাহী যতই হউন, তাঁহারা বিদেশী, আমাদের দোষ গুণ বুঝা তাঁদের পক্ষে সহজ নহে। তাঁহারা আপনা আপনি যতই সে বিষয়ে আস্ফালন করুন, আমরা জানি তাঁহাদের ভ্রান্তি হইয়া থাকে। একশত বৎসর অবধি তাঁহারা এই আস্ফালন করিতেছেন; কিন্তু অদ্যাপি কিছু বুঝিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। সে যাহাই হউক, এক্ষণে দেখা যায় যে, তাঁহাদের নিজ ভাষায় আমরা বিশুদ্ধ ভাবে কথা কহিলে, দোষ গুণ বুঝিতে পারুন আর নাই পারুন, ভাষার গুণে বক্তার প্রতি তাঁহাদের কতক শ্রদ্ধা হয়, বিশেষতঃ বিশুদ্ধ ইংরেজী শিখিতে পারিলে, যে পরিমাণে অধ্যয়ন আবশ্যক, তাহাতে ইংরেজি ভাব অনেক শিক্ষা হয়। সহজেই তাহা কথায় বিস্তৃত

হইয়া বাঙ্গালি ভাব গোপন করে। সঙ্গে সঙ্গে বক্তার দোষও ঢাকা পড়ে। এই জন্য ইদানীন্তন অনেক নীচপ্রবৃত্তির লোক ইংরেজীর গুণে উচ্চ পদাভিষিক্ত হইতেছে।

ইংরেজী আর এক কারণে বিশেষ করিয়া শিক্ষা করা আবশ্যক। যে সকল ব্যবহার আমাদের চক্ষে ভাল, ইংরেজের চক্ষে মন্দ, ইংরেজি জানিলে তাহা বর্জ্জন করা যায়। হেঁট মস্তক নিম্নদৃষ্টি আমাদের চক্ষে নম্রতার পরিচায়ক; ইংরেজি চক্ষে তাহা অপরাধের চিহ্ন। আমাদের ব্যবহারানুরূপ যে ব্যক্তি সাহেবদিগের নিকট নম্রতা দেখাইল, সে একেবারে মজিল। এই সকল ব্যবহারের ও প্রথার তারতম্য জানিবার নিমিত্তও ইংরেজি বিশেষ করিয়া জানা আবশ্যক।

এই স্থলে পরিচ্ছদ সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিলে, ভাল হয় না। পরিচ্ছদ অনেক সময়ে উন্নতির সহায়তা করে; আবার অনেক সময় বৈরিতা সাধে, অতএব বুঝিয়া পরিচ্ছদ পরা আবশ্যক। আমরা সচরাচর বুঝি যে, পরিচ্ছদ ধন সম্পত্তির পরিচায়ক। ইংরেজেরা তাহার অতিরিক্ত আর একটু বুঝেন। পরিচ্ছদ মানসিক বৃত্তির পরিচায়ক; কে অসার ব্যক্তি, কে আঁড়ম্বরের লোক, কাহার নীচ প্রবৃত্তি, কে শাদাসিদে লোক, তাহা পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহারা বিচার করেন, এ বিচার নিতান্ত অসঙ্গত নহে; অতএব পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি রাখা ভাল। বিশেষতঃ কতকগুলি ইদানীন্তন পরিচ্ছদ হইতে আমাদের কার্য্য পর্য্যন্ত অনুভব করিতে চাহেন। আমরা তাঁহাদের সম্মান করিতে গিয়াছি কি অপমান করিতে গিয়াছি, তাহা তাঁহারা দূর হইতে আমাদের পোষাক দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। যেখানে এতদূর অনুভব চলিতেছে, সেস্থলে অবশ্য বলিতে হইবে, পোষাক ভাল মন্দ ফল দিবার কতক মালিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক সময়ে আমরা দেখিয়াছি, জুতার দোষে একজনের অবনতি হইয়াছিল; টুপিতে আর একজনের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, পয়সা দিয়া এ শত্রু কেন ঘরে আনিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিতেন। এ দেশের প্রচলিত কথা আছে যে "আবরুচি খানা পররুচি পেহেন্না" এ পুরাতন কথা ভুলিবার প্রয়োজন কি? অন্যের যাহাতে বিরক্তি জন্মে এমত পরিচ্ছদ পরিয়া আপনার অনিষ্টসাধনের প্রয়োজন কি? সংসারে সকল ভার বহন করিয়া সামান্য এক পাগড়ির ভার যাহাদের অসহ্য বোধ হয় তাহারা কাপুরুষ'। আমরা তাহাদের অশ্রদ্ধা করি।